সূচী-পত্র
তফসীরে
মা'আরেফুল
কোরআন
প্রথম খণ্ড

তফসীরে

মা'আরেফুল কোরআন

প্রথম খণ্ড

[সূরা ফাতিহা থেকে সূরা বাকারা পর্যন্ত]

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

অনুবাদ

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (প্রথম খণ্ড)
হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)
অনুবাদ : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
ইফা প্রকাশনা : ৬৮৫/১৩ (রাজস্ব)
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0119-9

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৮০

চতুর্দশ সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ২০১১
আশ্বিন ১৪১৮
শাওয়াল ১৪৩২

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৮

প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ আইউব আলী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা মাত্র।

TAFSIR-E-MA'REFUL QURAN (1st Vol) : Bangla version by Maulana Muhiuddin Khan of Tafsir-e-Maareful Quran, an Urdu Commentary of Al-Quran by Mufti Muhammad Shafi (R) and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181538

September 2011

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www.islamicfoundation.org.bd

Price : Tk. 350.00; US Dollar : 15.00

সূচিপত্র

[চার]

[পাঁচ]

[ছয়]

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের সুবিশাল ভাণ্ডার এ গ্রন্থের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত, বিশুদ্ধতম ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশনাগ্রন্থ, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস হলো চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বস্তুত, এই প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাস্সিরে কুরআন, লেখক, গ্রন্থকার। ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে, তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে।

[আট]

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ গ্রন্থটি তরজমার জন্য দেশের খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পাঠক-চাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের তেরটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর চতুর্দশ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে যাঁরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন !

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ হলো 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন'। উপমহাদেশের বিদগ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় আলিম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের সরল তাফসীর এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা করেন।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) নিজে মাযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারীগণের কাছে স্বীকৃত মুফতী ছিলেন বিধায় তাঁর বক্তব্যগুলোতে সকল মাযহাবের নিজস্ব মতামত ও নিজস্ব ব্যাখ্যাগুলো বিশুদ্ধভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই গ্রন্থের তাফসীর বিষয়ে ইতোপূর্বে রচিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সার-নির্যাস আলোচনা, কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নতুন মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা, বিশেষত মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং এ অগ্রগতিকে কাজে লাগানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিদগ্ধতার সাথে পেশ করেছেন। মূল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত, গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটি মূল উর্দু থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করে। এটি অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

পূর্ববর্তী সংস্করণে গ্রন্থটির মুদ্রণে কিছু প্রমাদ ছিল। ইফা প্রেসের প্রিন্টার মাওলানা মোঃ ওসমান গণী (ফারুক) প্রমাদগুলো সংশোধন করেন। এত বড় তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এগুলো নিরসনের জন্য সহৃদয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর চতুর্দশ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সুধীমহলে সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তওফীক দিন। আমীন !

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

অনুবাদকের আরয

সকল প্রজ্ঞার উৎস পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকেরই সমস্ত প্রশংসা। তিনিই অনুগ্রহ করে মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন। মানব জাতির হেদায়েতের জন্য পাক কালাম নাযিল করেছেন। তাঁর পবিত্র কালাম হৃদয়ঙ্গম করার মত বোধশক্তি দিয়েছেন। তাঁরই অনুগ্রহপ্রাপ্ত কিছুসংখ্যক সাধক মনীষী পাক কোরআন অনুধাবন এবং অন্যদের নিকট তা ব্যাখ্যা করার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এ সাধক জামাতের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে। হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী মানবকুলের মধ্যে এরাই সর্বোত্তম এবং সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান লোক।

আল্লাহ্র পাক কালাম অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করার যে পদ্ধতি খোদ রাসূল (সা) শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সত্যপন্থী সাধক আলিমগণ যে পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছেন, পরিভাষায় সেটিই 'ইলমে-তাফসীর' নামে খ্যাত। তাই, তফসীর কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী-বিশেষের মস্তিষ্কপ্রসূত খেয়ালখুশি নয়, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র পরম্পরায় প্রাপ্ত দীনী ইল্মের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার। এ উত্তরাধিকারকে পাশ কাটিয়ে যাঁরা কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, তাঁদের সে প্রচেষ্টাকে প্রতি যুগে উম্মতের জ্ঞানীগণ অনধিকার চর্চা এবং পরিত্যাজ্য বলে বিবেচনা করেছেন।

আরবী ভাষার প্রভাব-বলয় থেকে বহু দূরে অবস্থিত বাংলা ভাষাভাষী এলাকার লোকদের পক্ষে আল্লাহ্র কালাম অনুধাবন করার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তরজমা এবং তফসীর--উভয়েরই প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র। দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমানগণের তুলনামূলক হার অনুপাতে বাংলাভাষী মুসলমানের সংখ্যা বেশি। সেদিক থেকে বাংলায় পবিত্র কোরআনের তরজমা ও তফসীর এ পর্যন্ত খুব কমই হয়েছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরিগণ এ ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সাধনার ঐতিহ্য রেখে গেছেন, তা নিতান্ত কম না হলেও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

কোরআন সর্ববিধ জ্ঞানের এমন এক অফুরন্ত উৎস, যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হওয়ার নয়। কারণ, দুনিয়ার লয়কাল পর্যন্ত যত মানুষ আসবে, তাদের সবারই জীবন-পথের সর্বপ্রকার সমস্যার সঠিক সমাধান কোরআন পেশ করবে। এ কারণেই তফসীরের অনুসরণীয় ঐতিহ্য লক্ষ্য করে প্রতি যুগের জীবন জিজ্ঞাসার আলোকে কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার সাধনা অব্যাহত থাকবে। বলা বাহুল্য, এ সাধনা ধারার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাংলা ভাষায় কোরআন পাকের তরজমা ও তফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্তই অপ্রতুল।

[এগার]

সুখের বিষয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সে অভাব দূর করার জরুরী প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করেই কতকগুলো প্রামাণ্য তফসীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পর বাংলা ভাষায় পাক কোরআনের তফসীর-এর ক্ষেত্রে বিরাজিত অভাব অনেকটা দূর হবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের পরিকল্পনাধীন তফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে এ যুগের সর্বজন শ্রদ্ধেয় গবেষক আলিম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) সাহেবের আট খণ্ডে সমাপ্ত উর্দুতে রচিত 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন'-এর অনুবাদের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়।

আমার পক্ষে এ বিরাট তফসীরগ্রন্থটি অনুবাদ করার দায়িত্ব গ্রহণ করা রীতিমত একটা দুঃসাহস ছাড়া আর কিছু নয়। এতদসত্ত্বেও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এ মহোত্তম পরিকল্পনার সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে বাংলা ভাষায় প্রকাশিতব্য এ সর্ববৃহৎ তফসীর গ্রন্থের অনুবাদ কার্যে আত্মনিয়োগ করাকে আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যের বলে গ্রহণ করেছি। এ বিরাট কাজের পরিসমাপ্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল।

আধুনিককালের পাঠকগণের রুচির প্রতি লক্ষ্য রেখেই অনুবাদে সাধারণ চলতি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তরজমা যথাসম্ভব সরল ও সহজবোধ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে অনুবাদ যাতে কোন অবস্থাতেই মূলের সাথে সামঞ্জস্যহীন হয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে। গ্রন্থকার তাঁর পূর্বসূরি হযরত শাহ্ রফীউদ্দীন (র) ও শায়খুল-হিন্দ মাওলানা মাহ্মুদুল হাসান (র)-এর অনুসরণে কোরআন শরীফের আয়াতগুলোর উর্দু অনুবাদ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এ উভয় বুযুর্গই আয়াতের আক্ষরিক অনুবাদ না করে মর্মানুবাদ করেছেন। তবে এতে মূলের সাথে তরজমা বিন্দুমাত্রও সামঞ্জস্যহীন হয়নি। বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রেও আমরা যত্নের সাথে সে ধারা অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি।

এ বিরাট গ্রন্থ যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তরজমার কাজ দ্রুততর করার লক্ষ্যে আমাকে আরো কয়েকজন বিজ্ঞ আলিমের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছে। যাঁরা আমাকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে জনাব মাওলানা আবদুল আযীয, মাওলানা সৈয়দ জহীরুল হক, মাওলানা আবদুল মান্নান এবং অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়ার নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হয়। আল্লাহ পাক তাঁদের যোগ্য প্রতিফল দান করুন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব আ. জ. ম শামসুল আলম, সচিব জনাব সাদেকউদ্দিন, প্রশাসক জনাব মেজর এরফান উদ্দীন, প্রকাশনা বিভাগের হাফেজ মাওলানা মঈনুল ইসলাম এবং মাওলানা আবুল খায়ের আহমদ আলীর অফুরন্ত প্রেরণা ও সহযোগিতা এ মহাগ্রন্থ দ্রুত প্রকাশনার ব্যাপারে কতটুকু কাজ করেছে, তা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। আল্লাহ্ পাক

এঁদের প্রত্যেককেই তাঁর কালামের এ খিদমতের যোগ্য প্রতিদান দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে প্রদান করুন—এ দোয়া ছাড়া আমার পক্ষে করবার মত আর কিছু নেই।

রাব্বুল আলামীন ! তুমি আমাদের সকলেরই অন্তরের খবর রাখ। যাকে ইচ্ছা তুমি তোমার দীনের বিভিন্নমুখী জিহাদে নিয়োজিত কর। তোমার তওফীক ছাড়া তোমার কালাম বোঝা এবং অন্যকে বোঝানোর সাধ্য কারো নেই। তুমি দয়া করে আমাদের সকলের এ শ্রম-সাধনা কবূল কর! এর উসিলায় আমাদের সকলের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন কল্যাণময় কর।

মাওলা ! আমি পাপী, এই ছিয়াহ্‌কারকে তুমিই দয়া করে এ কাজে নিয়োজিত করেছ। এ মহতি কাজের সুসমাপ্তি তোমারই তওফীকের উপর নির্ভর করে। দয়া করে তুমি কবূল কর। আমীন ! ইয়া রাব্বুল আলামীন !!

বিনীত

মুহিউদ্দীন খান

লেখক পরিচিতি

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত তফসীরগ্রন্থসমূহের মধ্যে 'মা'আরেফুল কোরআন' সর্ব বৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠরূপে স্বীকৃত । এ অসাধারণ গ্রন্থটিতে তফসীর শাস্ত্রের মূল উৎস থেকে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাদির উদ্ধৃতি ও পর্যালোচনার পাশাপাশি আধুনিক কালের নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাবও এমন চমৎকার যুক্তি ও মনীষাঋদ্ধভাবে দেওয়া হয়েছে, যা প্রচলিত অন্য কোন তফসীরগ্রন্থে তালাশ করা অর্থহীন। হাদীস, ফিকহ্, তাসাউফসহ দীনী ইল্মের সবগুলো শাখায় একটা অসাধারণ ব্যুৎপত্তির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর যেন 'মা'আরেফুল কোরআনে'র প্রতিটি পাতায় সমভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।

প্রায় সাত হাজার পৃষ্ঠার এ অনন্য তফসীর গ্রন্থটির আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, পবিত্র কোরআনের মর্মকথা যেন এর দ্বারা সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকটই সমভাবে বোধগম্য করে দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, যেন এ যুগের অস্থিরচিত্ত পথহারা মানুষগুলোকে পবিত্র কোরআনের কাওসার-সুধা পান করিয়ে চিরশান্তি ও কল্যাণের পথে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই পরওয়ারদেগার তাঁর এক সাধক বান্দার হৃদয়-মন উদ্বেলিত করে তুলেছিলেন মা'আরেফুল কোরআনের ন্যায় একটি অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করার আকুতিতে।

এ অনবদ্য তফসীর গ্রন্থটির লেখক হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) (জ. ১৮৯৭ খৃ., মৃ. ১৯৭৬ খৃ.) মা'আরেফুল কোরআনের ভূমিকা অংশে তিনি স্বীয় পরিচিতি পেশ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

বান্দা মুহাম্মদ শফী ইবনে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াছীন (র) এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবে না যে, মহান আল্লাহ্ পাক দীনী ইল্মের কেন্দ্রভূমি দেওবন্দকে তাঁর জন্মভূমি রূপে নির্বাচিত করেছেন। এতদসঙ্গে এমন এক মহান পিতার কোলে তাঁর লালন-পালন হয়েছে, যিনি ছিলেন হাফেজে কোরআন ও আলেমে দীন। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাকালেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। ফলে সেখানকার উলামায়ে হাক্কানীর নিকট-সান্নিধ্যে উপকৃত হওয়ার অবারিত সুযোগ তিনি লাভ করতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন দারুল উলূমের প্রাথমিক যুগের মহান বুযুর্গগণের একজন জীবন্ত স্মৃতি। জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত দারুল উলূমের পরিবেশেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এখানেই লেখাপড়া করেছেন এবং এ প্রতিষ্ঠানেই তালীমের খেদমতে জীবন কাটিয়ে গেছেন।

ওয়ালেদ সাহেবের ইচ্ছাতেই আমি অধমের শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় দারুল উলূমের হেফজ বিভাগে জনাব হাফেজ আবদুল আজীম ও জনাব হাফেজ নামদার খান (র)-এর তত্ত্বাবধানে। অতঃপর ওয়ালেদ মুহতারিমের নিকট উর্দু, ফারসী, অংক, জ্যামিতি এবং আরবী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অতঃপর ১৩৩১ হিজরীতে দারুল উলূমে নিয়মিত ভর্তি হয়ে ১৩৩৫ সন পর্যন্ত

দরসে নেজামীর সমগ্র পাঠ্যসূচি এমন সব দক্ষ উস্তাদের নিকট সমাপ্ত করার সৌভাগ্য হয়, যাঁদের তুল্য বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের উস্তাদ বর্তমানে দুনিয়ার যে কোন অঞ্চলে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

শিশুকাল থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পর্যায়ের আরবী জামাতে পড়ার সময় পর্যন্ত আরব আজমের সর্বজনশ্রদ্ধেয় বুযুর্গ উস্তাদ শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)-এর খেদমতে হাযির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। কোন কোন সময় তার বুখারী শরীফের দরসে বসে বরকত হাসিল করারও সুযোগ লাভ করেছি। মাল্টার বন্দী জীবন থেকে ফিরে আসার পর তাঁর পবিত্র হাতেই সর্বপ্রথম বায়'আত হওয়ারও ভাগ্য হয়। আরবী ইল্‌মের বিভিন্ন বিষয় যে সব যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গের নিকট শিক্ষালাভ করার সুযোগ হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ঃ হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশমিরী (র), আরেফ বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা মুফতী আজীজুর রহমান (র), আলেমে রব্বানী হযরত মাওলানা আসগর হোসাইন সাহেব (র), শায়খুল ইসলাম হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র), শায়খুল আদব ওয়াল ফিক্‌হ হযরত মাওলানা এজাজ আলী সাহেব (র)। এ ছাড়াও ছিলেন হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইবরাহীম ও হযরত আল্লামা রসুল খান সাহেব (র)।

দারুল উলূমের মহান উস্তাদগণের স্নেহদৃষ্টি প্রথম থেকেই এ অধমের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। ১৩৩৬ হিজরী সনে উচ্চতর কয়েকটি বিষয়ের কিতাব পড়া অবস্থাতেই মুরুব্বীগণ দারুল উলূমের দু'-একটা করে সবক পড়াতে নির্দেশ দেন। পরবর্তী বছর (১৩৩৭ হি.) থেকেই নিয়মিত একজন শিক্ষকরূপে নিয়োজিত হই। দীর্ঘ বারো বছর ধরে মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চতর জামা'আত পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর দায়িত্ব পালন করতে হয়। হিজরী ১৩৪৯ সনে আমাকে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতীর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এতদসঙ্গে উচ্চতর পর্যায়ে হাদীস এবং তফসীরের দু'-একটা কিতাব পড়ানোর দায়িত্বও পালন করতে হয়। অবশেষে ১৩৬২ হিজরীতে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এবং আনুষঙ্গিক আরও কিছু কারণে দারুল উলূমের সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করতে হয়। দারুল উলূমে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছরের শিক্ষকতা ও ফাতওয়া দানের খেদমতে নিয়োজিত থাকার সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু কিছু লেখার কাজও শুরু হয়েছিল। মুজাদ্দিদে মিল্লাত হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)-এর খেদমতে যাতায়াত শিক্ষাজীবন থেকেই শুরু হয়েছিল। তবে ১৩৪৬ হিজরীতে তাঁর পবিত্র হাতে বায়'আত নবায়নের পর থেকে ১৩৬২ হিজরীর রজব মাসে অর্থাৎ হযরতের ওফাত কাল পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত নিয়মিত যাতায়াত মাঝে মাঝে খেদমতে অবস্থানেরও সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

হযরত থানবী (র)-কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রকার ইল্‌মে পূর্ণতা দান করেছিলেন। তফসীর এবং তাসাউফ ছিল তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বিষয়। তফসীরে বয়ানুল কোরআন এবং তাসাউফ বিষয়ক তাঁর রচনা 'আত্-তাকাসসুফ' এবং 'আত্-তাশাররুফ' প্রভৃতি মূল্যবান পুস্তক-পুস্তিকা এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শেষ জীবনে হযরত থানবী (র) পবিত্র কুরআনের আলোকে আধুনিক সমস্যাদির সমাধান সম্পর্কিত একখানা পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কাজটি দ্রুত সমাপ্ত করার

উদ্দেশ্যেই কয়েকজনের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে দেওয়া হয়। এর এক অংশের দায়িত্ব আমার উপরও অর্পণ করা হয়েছিল। আরবী ভাষায় রচিত এ মূল্যবান গ্রন্থটি 'আহকামুল কুরআন' নামে প্রকাশিত হয়েছে। আমার উপর ন্যস্ত অংশটুকুর অধিকাংশই হযরত থানবী (র)-এর জীবিত কালেই সমাপ্ত হয়েছিল। অবশিষ্ট অংশটুকু পরে রচিত ও দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বলতে গেলে 'মা'আরেফুল কোরআন' রচনার ভিত্তিভূমি সেখান থেকেই রচিত হয়। কারণ হযরত থানবী (র)-এর নিকট-সান্নিধ্যে অবস্থান করে পবিত্র কোরআন চর্চার যে রুচি এবং পদ্ধতি আয়ত্ত হয়েছিল, তারই আলোকে পরবর্তী পর্যায়ে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা সাধারণ মানুষের মধ্যে সহজ-সরল ভাষায় পরিবেশন করার আগ্রহ জন্মলাভ করে।

হিজরী ১৩৬৫ মোতাবেক ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের জন্য একটা স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবি একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হওয়ার মুহূর্তে হযরত থানবী (র)-এর জীবদ্দশায় প্রদত্ত ইঙ্গিত এবং বর্তমান মুরুব্বীগণের নির্দেশের আলোকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। এক পর্যায়ে জমিয়তে ওলামার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করতে হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমার উস্তাদ, মুরুব্বী ও ফুফাতো ভাই শায়খুল ইসলাম হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র) ইসলামের আলোকে পাকিস্তানের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের একটি রূপরেখা তৈরির প্রয়োজনে আমাকে জন্মভূমি দেওবন্দ ত্যাগ করে করাচী চলে আসতে নির্দেশ দেন। ফলে ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের ১লা মে তারিখে প্রিয় জন্মভূমি দেওবন্দ ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে আসি এবং কুদরতের ইশারাতেই সম্ভবত করাচীকে স্থায়ী বসবাসের স্থানরূপে গ্রহণ করতে হয়।

যে উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, উপমহাদেশের মুসলিম জনগণ যে মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান অর্জনের জন্য নজিরবিহীন ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, পরবর্তীতে অন্ধ স্বার্থ চিন্তা এবং আদর্শহীনতার কারণে সে স্বপ্ন একটা পরিপূর্ণ দুঃস্বপ্নে পরিণত হলেও ওলামায়ে কিরাম মুসলিম জনগণের মধ্যে আদর্শ সচেতনতা অব্যাহত রাখার প্রয়াস কখনও ত্যাগ করেননি। একই উদ্দেশ্যে এই অধমও করাচীর আরামবাগ মসজিদে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক দরস শুরু করি। দীর্ঘ সাত বছরে এ দরস সমাপ্ত হয়।

এরপর রেডিও পাকিস্তান থেকে 'মা'আরেফুল কোরআন' নামে একটা ধারাবাহিক কথিকা প্রচারের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়। কথিকাগুলো ছিল বিষয়ের ভিত্তিতে বাছাই করা কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা। আল্লাহ্‌র রহমতে ধারাবাহিক এ কথিকাগুলো এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, এগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান এমনকি দেশের বাইরে বসবাসরত উর্দু ভাষাভাষীদের মধ্য থেকে ক্রমাগত পত্র আসতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মা'আরেফুল কোরআন রচনা শুরু করতে হয়। ১৩৯০ হিজরী নাগাদ এর তেরোটি পারা লেখা সমাপ্ত হয়। এরপর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সূরা ইবরাহীম থেকে সূরা নহল পর্যন্ত দুটি পারার তফসীর সমাপ্ত হয়ে মূল কোরআনের অর্ধেক কাজ হয়ে যাওয়ায় হিম্মত অনেকটা বেড়ে গেল। কিন্তু সুদীর্ঘ রোগভোগ, বার্ধক্যের জড়তা এবং দেশের প্রতিকূল পরিবেশ উপেক্ষা করেই আল্লাহ্‌র অসীম

[ষোল]

রহমতে ১৩৯২ হিজরীর ২১ শাবান তারিখে 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' লেখার কাজ সমাপ্ত হলো। ঘটনাচক্রে এ তারিখটিতেই আমার জন্ম হয়েছিল এবং এ তারিখেই আমার বয়সের সাতাত্তরটা মনযিল পূর্ণ করে আটাত্তরের পথে যাত্রা শুরু করেছে।

উল্লেখ প্রয়োজন যে, রোগ-ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেলে আমার পরম স্নেহাস্পদ সন্তান মৌলভী তকী উসমানী 'মা'আরেফ' লেখার কাজে আমাকে সাহায্য করেছে। অনেক সময় আমি বলে গিয়েছি, সে লিখেছে। আবার কখনও বা সে লিখে আমাকে শুনিয়েছে, আমি প্রয়োজনীয় সংশোধনীর পর তা পাণ্ডুলিপির সাথে শামিল করেছি। আল্লাহ্ পাক তার ইল্‌ম এবং ওমরে বরকত দান করুন।

'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' রচনা সমাপ্ত হওয়ার চার বছর পর ১৩৯৬ হিজরীর ৯ ও ১০ই শাওয়ালের মধ্যবর্তী রাতে হযরত মুফতী সাহেব দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। করাচীর চৌরঙ্গী এলাকায় প্রতিষ্ঠিত আলমে ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূমে লক্ষাধিক লোক তাঁর জানাযা ও দাফন-কাফনে শরীক হয়। জানাযা পড়ান হযরত থানবী (র)-এর অন্যতম খলীফা আয়েফ বিল্লাহ্ ডা. আবদুল হাই সাহেব। দারুল-উলূমের মসজিদ সংলগ্ন সংরক্ষিত কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ٠

ওহীর তাৎপর্য

কোরআন করীম যেহেতু 'ওহী'র মাধ্যমে সরওয়ারে-কায়েনাত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, সেহেতু কোরআন চর্চার আগে ওহী সম্পর্কিত কিছু দরকারী কথা জেনে নেওয়া কর্তব্য।

ওহীর প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক মুসলমানই জানেন যে, আল্লাহ্ পাক পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মানব জাতিকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন এবং তাদের উপর কতকগুলো বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করে সমগ্র সৃষ্টি জগতকেই মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন। তদনুসারে জীবনে প্রত্যেক মানুষের উপরই দু'টি মৌলিক কর্তব্য বর্তায়। প্রথমত, সৃষ্টি জগতের যেসব বস্তু সে ব্যবহার করবে, সেগুলোর ব্যবহার যেন যথার্থ হয় এবং দ্বিতীয়ত, আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি বস্তু ব্যবহার করার সময় তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও আদেশ-নিষেধের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখতে হবে। সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যেন তার কোন কাজ বা আচরণ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে না হয়।

উপরিউক্ত দু'টি বিষয়ে পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করার জন্যই ইল্ম বা জ্ঞানের প্রয়োজন। কেননা, প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে থাকা বস্তুনিচয়ের কোন্‌টির মধ্যে কি গুণ নিহিত রয়েছে, আর কোন্ প্রক্রিয়ার দ্বারাই বা সেগুলোর মাধ্যমে উপকার লাভ করা যায়, সে সম্পর্কিত সুস্থ জ্ঞান আয়ত্ত করা ছাড়া বস্তুজগত দ্বারা পরিপূর্ণ উপকার লাভ করা সম্ভব নয়।

অপরদিকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথ কোন্‌টি, কোন্ কোন্ কাজ আল্লাহ্‌র পছন্দ এবং কোন্‌গুলো অপছন্দ সে ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকেফহাল না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি মোতাবেক জীবন যাপন করা সম্ভব হবে না।

এ কারণেই আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লাভ করার অবলম্বনস্বরূপ মানুষকে তিনটি বিষয় দান করেছেন। প্রথমটি তার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, দ্বিতীয়টি বোধি বা জ্ঞান এবং তৃতীয়টি ওহী।

মানুষ অনেক কিছুই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পারে। বোধির মাধ্যমেও সে অনেক জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু যে সমস্ত বিষয় ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা কিংবা বোধিরও আওতার বাইরে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সেসব জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ওহীর জ্ঞান দান

করেছেন। ওহীর মাধ্যমেই মানুষ তার বোধগম্য জগতেরও বহু উর্ধ্ব জগতের খবর প্রাপ্ত হয়েছে।

'ইল্ম' বা জ্ঞানের উপরিউক্ত তিনটি উৎস আবার পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত। প্রতিটিরই আবার একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল রয়েছে। নিজস্ব পরিমণ্ডলের সীমারেখার বাইরে এর কার্যকারিতা থাকে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, বুদ্ধি সেখানে কোন কাজ দেয় না। যেমন, একটা চুনকাম করা দেয়াল চোখে দেখে আপনি বলে দিতে পারেন যে, দেয়ালটির রং সাদা। কিন্তু চোখে না দেখে আপনি যতই বুদ্ধি খাটান না কেন, দেয়ালের রং সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা আপনার পক্ষে সহজ হবে না।

অনুরূপ বুদ্ধির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করতে হয়, তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মাধ্যমে সহজ হয় না। যেমন, কোন একটা জিনিস শুধু চোখে কিংবা হাতে স্পর্শ করেই আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না যে, এটা প্রকৃতির সৃষ্টি, না কোন কারিগরের তৈরি। বলা বাহুল্য, বস্তুর গুণাগুণ বিচার করে এ ব্যাপারে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য।

মোটকথা, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় যে সীমারেখা পর্যন্ত কাজ করে, বুদ্ধির সেখানে প্রয়োজন পড়ে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সীমা যেখানে শেষ হয়ে যায়, সেখান থেকেই বুদ্ধির কার্যকারিতা শুরু হয়। বুদ্ধির কার্যকারিতাও কিন্তু সীমাহীন নয়। একটা পর্যায়ে এসে বুদ্ধির কার্যকারিতাও শেষ হয়ে যায়। তাই দেখা যায়, এমন অনেক তথ্য এবং মানব মনের এমন অনেক জিজ্ঞাসা রয়েছে, যেগুলোর জবাব দিতে গিয়ে বুদ্ধি এবং অনুভূতির সম্মিলিত শক্তিও ব্যর্থ হয়ে যায়।

আবার সেই দেয়ালটির প্রসঙ্গেই আসা যাক। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, দেয়ালটি কিভাবে ব্যবহার করলে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হবেন এবং কিভাবে ব্যবহার করলে অসন্তুষ্ট হবেন। তবে এ প্রশ্নের জবাব ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধির নিকট থেকে আশা করা যায় না। এ ধরনের বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার অতীত বিষয়াদি সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দান করার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কিরামকে ওহীর জ্ঞান দান করেছেন। এ জ্ঞান কিছুসংখ্যক মনোনীত বান্দার মাধ্যমে মানব জাতিকে দান করা হয়েছে। ওহীর জ্ঞানপ্রাপ্ত সেসব মনোনীত বান্দাগণই 'নবী-রাসূল' নামে অভিহিত হয়েছেন।

মোটকথা, ওহী মানব জাতির প্রতি প্রদত্ত জ্ঞানের সেই উচ্চতর উৎস, যে উৎসের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অপরিহার্য সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হতে পারে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান-অভিজ্ঞতা কিংবা বুদ্ধির প্রখরতা সেখানে সম্পূর্ণ অপারগ।

এতদসঙ্গে এ সত্যটুকুও স্বীকার করতে হয় যে, শুধুমাত্র বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা মানুষকে অভ্রান্ত পথনির্দেশ করার ব্যাপারে যথেষ্ট নয়, প্রকৃত পথনির্দেশ বা হেদায়েতের জন্য ওহীর ইল্ম অপরিহার্য।

বুদ্ধির সীমা যেখানে শেষ, এরপর থেকেই যেহেতু ওহীর জ্ঞানের কার্যকারিতা শুরু হয়, সে জন্য ওহীর বিষয়বস্তু শুধু বুদ্ধির মাপকাঠিতে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যেমন, যে কোন একটি বস্তুর বর্ণ নিরূপণ করার জন্য দৃষ্টিশক্তির ব্যবহার জরুরী, শুধু বুদ্ধির প্রয়োগ কার্যকর নয়; তেমনি দীনী আকীদার অনেক বিষয়ই ওহীর জ্ঞানের দ্বারা বুঝতে হয়। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধির উপর নির্ভর করা বৈধও নয়, যথার্থও নয়।

যদি কোন লোক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বই স্বীকার না করে, তবে তার সামনে ওহীর প্রমাণ উত্থাপন করা অর্থহীন। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাঁর অপরিসীম ক্ষমতার প্রতি ঈমান রাখে, তাদের পক্ষে বুদ্ধির মাধ্যমেই ওহীর যথার্থতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা অনুধাবন করা অসম্ভব নয়।

যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, এ মহাবিশ্ব এবং এতে যা কিছু আছে, সে সবই একজন মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি, তিনিই পরম নিপুণতার সাথে এ বিশ্ব-প্রকৃতির পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করছেন, কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি মানুষকে এ দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করতে হয় যে, দয়াময় সেই সৃষ্টিকর্তা এ অন্ধকার দুনিয়াতে কোন একটা ইঙ্গিত-ইশারা এবং আমাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করার নিয়ম-কানুন না দিয়ে প্রেরণ করেন নি। কেননা, আমরা এ দুনিয়ায় কেন প্রেরিত হয়েছি, এখানে আমাদের দায়িত্ব কি, আমাদের এ জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যই বা কি, কিভাবেই বা আমরা জীবনের সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হবো এ সম্পর্কিত পরিপূর্ণ জ্ঞান স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই আমাদেরকে দিয়েছেন, প্রতিটি প্রয়োজনের মুহূর্তে পরম যত্নে তা পরিবেশন করেছেন।

যে কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষ সম্পর্কে কি এরূপ ভাবা যায় যে, তিনি তাঁর কোন লোককে বিদেশে সফরে পাঠালেন, কিন্তু পাঠানোর সময় কিংবা তারপরেও লোক মারফত বা পত্রযোগে তার কি কর্তব্য, কোন্ কোন্ কাজ সমাধা করে তাকে ফিরতে হবে, সফরে কিভাবে সে জীবন-যাপন করবে, সে সম্পর্কিত কোন নির্দেশই দিলেন না। যদি একজন সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সম্পর্কে এরূপ দায়িত্বহীন আচরণ আশা করা না যায়, তবে সেই মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ সম্পর্কে এরূপ ধারণা কি করে হতে পারে যে, যিনি এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং কল্পনাতীত নৈপুণ্যের সাথে এ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস প্রভৃতি সবকিছু একটা সুনির্ধারিত নিয়মের ভেতর পরিচালনা করছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের এ দুনিয়ায় কিছু গুরু-দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু তাদের জন্য কোন নির্দেশনা, জীবনপথে চলার মত সঠিক হেদায়েত বা পথনির্দেশ প্রেরণ করার সুব্যবস্থা করেন নি।

আল্লাহ্ তা'আলার মহাপ্রাজ্ঞ অস্তিত্ব সম্পর্কে যাদের ঈমান রয়েছে, তারা অবশ্যই স্বীকার করতে বাধ্য যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে অন্ধকারে হারিয়ে ফেলার জন্য হেদায়েতবিহীন অবস্থায় ছেড়ে দেননি--বান্দাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান বাতলানোর উদ্দেশ্যে একটা নিয়মিত পন্থা দান করেছেন। বলা বাহুল্য, সেই নিয়মিত পন্থাটিই ওহীয়ে-ইলাহী নামে পরিচিত।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ওহী ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত একটা বিষয়ই শুধু নয়, বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবেই একটা বাস্তব প্রয়োজনও বটে, যা অস্বীকার করা আল্লাহ্ তা'আলার প্রজ্ঞাবান অস্তিত্বকেই অস্বীকার করার নামান্তর মাত্র।

হুযূর (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার পদ্ধতি

ওহী এবং রিসালাতের এ পবিত্র ধারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত এসে সমাপ্তি লাভ করেছে। তারপর আর কোন মানুষের প্রতি ওহী নাযিল হয়নি--হওয়ার প্রয়োজনও নেই।

রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি বিভিন্নভাবে ওহী নাযিল হতো। সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রা) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন ঃ হুযূর, আপনার

নিকট ওহী কিভাবে আসে ? হুযূর (সা) জবাব দিলেন ঃ কোন কোন সময় আমি ঘন্টার আওয়াজের মত শুনি। ওহী নাযিলে এ অবস্থাটা আমার পক্ষে খুব কঠিন প্রতীয়মান হয়। এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর ঘন্টার মত আওয়াজের মাধ্যমে আমাকে যা কিছু বলা হয়, সে সবই আমার কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। কখনও কখনও আমার সামনে ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে হাযির হন। (বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২)

এ হাদীসে ওহীর আওয়াজকে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক ঘন্টার আওয়াজের সাথে তুলনা দেওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কানে এক ধরনের নৈসর্গিক আওয়াজ অনুভূত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র কালাম প্রাপ্তিও ছিল ওহী নাযিল হওয়ার একটা পদ্ধতি। এ আওয়াজকে হুযূর (সা) ঘন্টার অবিরাম আওয়াজের মতো বলে বর্ণনা করেছেন।

বিরতিহীনভাবে ঘণ্টা যখন একটানা বাজতে থাকে, তখন এ আওয়াজ কোন্ দিক থেকে আসছে, তা নির্ণয় করা সাধারণত শ্রোতার পক্ষে সম্ভব হয় না। মনে হয়, চারদিক থেকেই বুঝি আওয়াজ ভেসে আসছে। ওহীর আওয়াজ কেমন অনুভূত হতো--একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই তা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য করার উদ্দেশ্যেই সেই পবিত্র আওয়াজকে ঘণ্টাধ্বনির সাথে তুলনা করা হয়েছে। (ফয়যুল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯, ২০)

আওয়াজ সহকারে ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর তা অত্যন্ত কঠিন অনুভূত হতো। উক্ত হাদীসের শেষ ভাগে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, শীতের দিনেও আমি হুযূর (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হতে দেখেছি। ওহী নাযিল হওয়া শেষ হলে পর প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও হুযূর (সা)-এর ললাটদেশ সম্পূর্ণরূপে ঘর্মাক্ত হয়ে যেতো। অন্য এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শ্বাস-প্রশ্বাস ফুলে ফুলে উঠতো, পবিত্র চেহারাও বিবর্ণ হয়ে শুকনো খেজুর শাখার ন্যায় ধূসর মনে হতো। একদিকে ঠাণ্ডায় সামনের দাঁতে ঠোকাঠুকি শুরু হতো এবং অপরদিকে শরীর এমন ঘর্মাক্ত হতো যে, মুক্তার মতো স্বেদবিন্দু ঝরতে থাকতো। (আল-এতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬)

ওহীর এই পদ্ধতি অনেক সময় এমন গুরুভার হতো যে, হুযূর (সা) কোন জানোয়ারের উপর সওয়ার অবস্থায় থাকলে সে জানোয়ার ওহীর চাপ সহ্য করতে অপারগ হয়ে মাটিতে বসে পড়তো।

একবার হুযূর (সা) সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর কোলে মাথা রেখে একটু আরাম করছিলেন। এ অবস্থায়ই ওহী নাযিল হতে শুরু করলো। হযরত যায়েদ (রা) বলেন, তখন তাঁর উরুদেশে এমন চাপ অনুভূত হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল, তাঁর উরুর হাড় বোধ হয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। (যাদুল-মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮, ১৯)

এ পদ্ধতিতে নাযিল হওয়া ওহীর হালকা মৃদু আওয়াজ কোন কোন সময় অন্যদের কানে গিয়েও পৌঁছত। হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন, কোন কোন সময় ওহী নাযিল হওয়া অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলের চারদিকে মধুমক্ষিকার গুঞ্জনের ন্যায় গুন গুন শব্দ শোনা যেতো। (মসনদে আহমদ, কিতাবুস সিরাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২)

ওহী নাযিল হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল--ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) মানুষের বেশে আগমন করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পয়গাম পৌঁছে দিতেন। এ অবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আ)-কে সাধারণত প্রখ্যাত সাহাবী হযরত দাহিয়া কালবী (রা)-এর আকৃতিতে দেখা যেতো। কোন কোন সময় তিনি অন্য লোকের আকৃতি ধারণ করেও আসতেন।

মানুষের বেশে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর আগমন এবং ওহী পৌঁছে দেওয়ার এ পদ্ধতিটাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা সহজ মনে হতো বলে তিনি ইরশাদ করেছেন। (আল্-এতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬)

তৃতীয় পদ্ধতিটি ছিল, হযরত জিবরাঈল (আ) অন্য কোন রূপ ধারণ না করে সরাসরি নিজের আসল রূপেই আবির্ভূত হতেন। জীবনে মাত্র তিনবার আল্লাহ্র রাসূল (সা) হযরত জিবরাঈলকে আসল রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। একবার হযরত জিবরাঈল (আ)-কে আসল রূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় তিনি স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার মি'রাজের রাতে ও তৃতীয়বার নবুয়তের প্রাথমিক যুগে মক্কা শরীফের 'আজইয়াদ' নামক স্থানে। প্রথম দু'বারের কথা সহীহ্ সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয়বারের দেখা সম্পর্কিত বর্ণনা সনদের দিক দিয়ে দুর্বল ও সন্দেহযুক্ত। (ফতহুল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮ ও ১৯)

চতুর্থ পদ্ধতি ছিল, কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আল্লাহ্র সঙ্গে বাক্যালাপ। এ বিশেষ মর্যাদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জাগ্রত অবস্থায় মাত্র একবার মি'রাজের রাতে লাভ করেছিলেন। অন্য একবার স্বপ্নযোগেও তিনি আল্লাহ্র সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন। (আল-এতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬)

ওহীর পঞ্চম পদ্ধতি ছিল, হযরত জিবরাঈল (আ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখা না দিয়ে হুযূর (সা)-এর পবিত্র অন্তরের মধ্যে কোন কথা ফেলে দিতেন। পরিভাষায় এ পদ্ধতিকে 'নাফছ ফির-রূহ' বলা হয়। (এতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩)

কোরআন নাযিলের ইতিহাস

কোরআন শরীফ আল্লাহ্‌র কালাম। তাই সৃষ্টির সূচনা থেকেই তা লওহে মাহফুজে সুরক্ষিত রয়েছে। খোদ কোরআনের ইরশাদ ঃ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِى لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ "বরং তা (সেই) কোরআন (যা) লওহে মাহফুজে সুরক্ষিত রয়েছে।" অতঃপর দুই পর্যায়ে কোরআন নাযিল হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ কোরআন একই সঙ্গে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে 'বাইতুল-ইয্‌যতে' নাযিল করা হয়। 'বাইতুল-ইয্‌যত' যাকে বাইতুল মা'মুরও বলা হয়, এটি কা'বা শরীফের বরাবর দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে ফেরেশতাগণের ইবাদতগাহ্। এখনে পবিত্র কোরআন এক সাথে লাইলাতুল ক্বদরে নাযিল করা হয়েছিল। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ধীরে ধীরে প্রয়োজনমত অল্প অল্প অংশ নাযিল হয়ে দীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

কোরআন নাযিলের এ দু'টি পর্যায়ের কথা খোদ কোরআনের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। এ ছাড়া নাসায়ী, বায়হাকী, হাকেম প্রমুখ মুহাদ্দিস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এমন কতগুলো রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, যার মর্মার্থ হচ্ছে যে, কোরআন মজীদ এক সাথে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে এবং পরে ধীরে ধীরে দীর্ঘ তেইশ বছরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছে। (আল-এতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১)

কোরআন এক সাথে দুনিয়ার আসমানে নাযিল করার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ শামাহ (রা) বলে, এতদ্বারা কোরআনের উচ্চতম মর্যাদা প্রকাশ করাই ছিল উদ্দেশ্য। তাছাড়া ফেরেশতাগণকেও এ তথ্য অবগত করানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এটিই আল্লাহ্‌র শেষ কিতাব, যা দুনিয়ায় মানুষের হেদায়াতের জন্য নাযিল করা হচ্ছে।

শায়খ যুরকানী (র) অন্য আর একটি তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন--এভাবে দুইবারে নাযিল করে একথাও বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এই কিতাব সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। তদুপরি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র বক্ষদেশ ছাড়াও আরো দু'জায়গায় ইহা সুরক্ষিত রয়েছে-- একটি লওহে-মাহফুজে এবং অন্যটি বাইতুল মা'মুর। (মানাহেলুল ইরফান ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯)

এ ব্যাপারেও প্রায় সবাই একমত যে, রসূলে করীম (সা)-এর প্রতি কোরআনের পর্যায়ক্রমিক অবতারণ শুরু হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। সহীহ বর্ণনায় একথাও জানা যায় যে, এ অবতারণ শুরু হয়েছিল লাইলাতুল ক্বদরে। রমযান মাসের সেই তারিখে, যে তারিখে হিজরতের পর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সে রাতটি রমযানের কত তারিখে ছিল এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কারো মতে সতেরই রমযান, কারো মতে উনিশে রমযান এবং কারো মতে সাতাশে রমযানের রাত। (ইবনে জরীর)

সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযিল হয়, সেগুলো ছিল সূরায়ে আলাক-এর প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত।

সহীহ বোখারীতে এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন--হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহী নাযিলের সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। এরপর থেকেই তাঁর মধ্যে নির্জনে ইবাদত করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ সময় তিনি হেরা গুহায় রাতের পর রাত ইবাদতে কাটাতে থাকেন। এ অবস্থাতেই এক রাতে হেরা গুহায় তাঁর নিকট আল্লাহ্র ফেরেশতা আসেন এবং তাঁকে বলেন--اِقْـرَاْ। 'ইকরা' (পড়ুন)। হুযূর (সা) জবাব দেন ঃ আমি পড়তে জানি না।

পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে হুযূর (সা) বলেন ঃ আমার জবাব শুনে ফেরেশতা আমাকে জড়িয়ে ধরেন এবং এমনভাবে চাপ দেন যে, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এরপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, 'পড়ুন'। আমি এবারও বলি, আমি পড়তে জানি না। তখন ফেরেশতা পুনরায় আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন চাপ দিলেন যে, আমি অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করতে থাকি। এরপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন'। এবারও আমি সেই একই জবাব দেই যে, আমি পড়তে জানি না। এ জবাব শুনে ফেরেশতা আবারও আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভীষণভাবে চাপ দিলেন যে, আমি চরম ক্লান্তি অনুভব করতে থাকি।

অতঃপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলতে লাগলেন ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ... .

"পড়ুন, আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। পড়ুন এবং আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত অনুগ্রহপরায়ণ।"

এই ছিল তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সর্বপ্রথম কয়েকটি আয়াত। এরপর তিন বৎসরকাল ওহী নাযিলের ধারা বন্ধ থাকে। এ সময়টুকুকে 'ফাতরাতুল ওহী'র কাল বলা হয়।

তিন বছর পর হেরা গুহায় আগমনকারী সেই ফেরেশতাকেই তিনি আসমান ও জমিনের মধ্যস্থলে দেখতে পেলেন। ফেরেশতা তাঁকে সূরা মুদ্দাস্সির-এর কয়েকটি আয়াত শোনালেন। এরপর থেকেই নিয়মিত ওহী নাযিলের ধারাবাহিকতা শুরু হলো।

মক্কী ও মদনী আয়াত

আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, কোরআন শরীফের সূরাগুলোর উপরে কোন কোনটিতে 'মক্কী' এবং কোন কোনটিতে 'মদনী' লেখা রয়েছে। এব্যাপারে নির্ভুল ধারণা লাভ করা জরুরী।

মুফাস্সিরগণের পরিভাষায় মক্কী সূরা বা আয়াতের মর্ম হচ্ছে যেসব সূরা বা আয়াত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পূর্ব পর্যন্ত নাযিল হয়েছে এবং মদনী আয়াত হলো যেগুলো মদীনায় হিজরত করার পর নাযিল হয়েছে।

কোন কোন লোক মক্কী আয়াত বলতে যেগুলো মক্কা শহরে এবং মদনী বলতে যেগুলো মদীনায় নাযিল হয়েছে সেগুলোকে বুঝে থাকেন। এ ধারণা ঠিক নয়। এমনও অনেক আয়াত

আছে, যেগুলো মক্কা শহরে নাযিল হয়নি, কিন্তু যেহেতু হিজরতের আগে নাযিল হয়েছে এজন্য এগুলোকে মক্কী বলা হয়। তেমনি যেসব আয়াত মদীনা, আরাফাত কিংবা মি'রাজের সফরে নাযিল হয়েছে, এমন কি হিজরতের সময় মদীনায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত পথে পথে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলোকেও মক্কী বলা হয়।

তেমনি অনেক আয়াত আছে, যেগুলো মদীনা শহরে নাযিল হয়নি, কিন্তু সেগুলো মদনী। হিজরতের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অনেকগুলো সফরে বের হতে হয়েছে। অনেক সময় মদীনা থেকে শত শত মাইল দূরেও গিয়েছেন, কিন্তু এসব স্থানে অবতীর্ণ আয়াত-গুলোকেও মদনীই বলা হয়। এমনকি যে সমস্ত আয়াত মক্কা বিজয়, হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রভৃতি সময়ে খোদ মক্কা শহর কিংবা তার আশেপাশে নাযিল হয়েছে, সেগুলোকেও মদনী বলা হয়।

কোরআন শরীফের আয়াত ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا .

খাস মক্কা শহরেই নাযিল হয়েছে, কিন্তু হিজরতের পরে নাযিল হওয়ার কারণে এই আয়াতও মদনী। (আল-বুরহান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮; মানাহেলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮)

কোন কোন সূরার সম্পূর্ণটাই মক্কী, যেমন—সূরা মুদ্দাস্‌সির অপরদিকে কোন কোন সূরার সম্পূর্ণটাই মদনী, যেমন সূরা আলে-ইমরান। কিন্তু এমনও রয়েছে যে,সম্পূর্ণ সূরা হয়ত মক্কী, কিন্তু তার মধ্যে দু'-একটি মদনী আয়াত সন্নিবেশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ মদনী সূরার মধ্যে দু'-একটা মক্কী আয়াত সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যেমন, সূরা আ'রাফ মক্কী কিন্তু সূরার ঃ

وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ .

থেকে শুরু করে اِذَا اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِىْٓ اٰدَمَ পর্যন্ত কয়েকটি আয়াত মদনী। অনুরূপ সূরায়ে হজ্জ মদনী। কিন্তু এ সূরার মধ্যেই

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِىٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى থেকে শুরু করে عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ পর্যন্ত চারটি আয়াত মক্কী অর্থাৎ হিজরত-পূর্ববর্তী সময়ে অবতীর্ণ।

উপরিউক্ত আলোচনায় এও জানা গেল যে, কোন সূরাকে মক্কী বা মদনী গণ্য করার ব্যাপারে অধিকাংশ আয়াতের অনুপাত গণ্য করা হয় অর্থাৎ মক্কী আয়াতের সংখ্যা বেশি হলে সে সূরাকে মক্কী ও মদনী আয়াতের সংখ্যা বেশি হলে সে সূরাকে মদনী গণ্য করা হয়েছে

যেসব সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো হিজরতের আগে নাযিল হয়েছে, সেগুলোর অবশিষ্ট আয়াত হিজরত-পরবর্তী সময়ে নাযিল হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে মক্কী সূরা বলেই অভিহিত করা হয়েছে। (মানাহেলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২)

মক্কী ও মদনী আয়াতসমূহের বৈশিষ্ট্য

ইলমে-তফসীরের বিশেষজ্ঞগণ মক্কী ও মদনী সূরাগুলো বাছাই করে এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন, যে বৈশিষ্ট্যের আলোকে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, সূরাটি মক্কী না মদনী। তাঁদের নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যগুলোর কয়েকটি এমন যে, সেগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতির পর্যায়ে ফেলা যায়। কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আবার এরূপ যে,

এগুলো দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে, এ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সূরাগুলো মক্কী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, না মদনী হওয়ার।

মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) যেসব সূরায় كَلاَّ শব্দ অর্থাৎ 'কখনই নয়' ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো মক্কী। এ শব্দটি বিভিন্ন সূরায় তেত্রিশবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং সবগুলো সূরা কোরআনুল করীমের শেষার্ধে রয়েছে।

(২) যেসব সূরায় (হানাফী মাযহাব মতে) সিজদার আয়াত এসেছে, সেগুলো মক্কী।

(৩) সূরা বাকারাহ্ ব্যতীত যেসব সূরায় আদম (আ) ও ইবলীসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো মক্কী।

(৪) যে সব সূরায় জিহাদের নির্দেশ অথবা নিয়ম-কানুন বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো মদনী।

(৫) যেসব আয়াতে মুনাফিকদের প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে সেগুলো মদনী।

নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু স্থান বিশেষে বিপরীতও হয়ে থাকে।

(১) মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে সাধারণত يَاَيُّهَا النَّاسُ অর্থাৎ 'হে মানব সন্তানগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী সূরায় يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

(২) মক্কী আয়াত সাধারণত ছোট ও সংক্ষিপ্ত। অপরপক্ষে মদনী সূরা ও আয়াত সাধারণত দীর্ঘ ও বিশ্লেষণাত্মক।

(৩) মক্কী সূরাগুলোতে সাধারণত তওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সপ্রমাণ করা, হাশর ও শেষ বিচারের চিত্র বর্ণনা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলোতে আহকাম ও আইন-কানুন অপেক্ষাকৃত কম বিবৃত হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী আয়াতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক নিয়মনীতি, আইন-কানুন, জেহাদের নির্দেশ এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

(৪) মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে প্রতিপক্ষ হিসাবে সাধারণত মুশরিক ও মূর্তিপূজকদের দেখানো হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী সূরাগুলোর মধ্যে আহ্‌লে কিতাব ও মুনাফিকদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

(৫) মক্কী সূরাগুলোর বর্ণনারীতি সাধারণত অত্যন্ত অলংকারবহুল এবং এগুলোতে উপমা-উৎপ্রেক্ষা অত্যন্ত বর্ণাঢ্য ভঙ্গীতে উপস্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু এসব সূরায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ শব্দসম্ভারের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। অপরপক্ষে মদনী সূরাগুলোর বর্ণনাভঙ্গী অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজবোধ্য।

মক্কী ও মদনী সূরার বর্ণনাভঙ্গী ও শব্দ ব্যবহারে ক্ষেত্রে এ পার্থক্য হয়েছে সাধারণত সমাজ-পরিবেশ, যাদের সম্বোধন করা হয়েছে তাদের রুচির তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করে। মক্কার জীবনে মুসলমানদের মোকাবিলা ছিল যেহেতু আরবের মূর্তিপূজক মুশরিকদের সাথে এবং যেহেতু তখনও পর্যন্ত ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি সেজন্য

তখনকার দিনে অবতীর্ণ আয়াতগুলোতে সাধারণত প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সংস্কার, চরিত্র সংশোধন, মূর্তিপূজার অসারতা প্রমাণ এবং কোরআন করীমের অনন্য বর্ণনাভঙ্গীর মোকাবিলায় ভাষাজ্ঞানের গর্বে গর্বিত আরব সমাজকে নির্বাক করে দেওয়াই ছিল প্রধান লক্ষ্য। সেজন্যই অত্যন্ত আবেগ-ময় বর্ণনাভঙ্গীর অবতারণা করা হয়েছিল। অপরদিকে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লোক দলে দলে এসে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছিল। শির্ক ও মূর্তিপূজার অসারতা অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই সপ্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। সর্বোপরি আদর্শের ক্ষেত্রে সকল মোকাবিলা ছিল আহ্‌লে-কিতাব সম্প্রদায়ের সাথে, সে জন্য এই সময়কার আয়াতগুলোতে আইন-কানুন, নিয়মনীতি ও আহ্‌লে-কিতাবদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের যুক্তিপূর্ণ জবাব দানের প্রতি বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে বর্ণনাভঙ্গীর ক্ষেত্রেও যুক্তিপূর্ণ সরল পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে।

কোরআন পর্যায়ক্রমে নাযিল হলো কেন

আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআনুল করীম একবারে একই সঙ্গে নাযিল না হয়ে ধীরে ধীরে তেইশ বছরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। কোন কোন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) খুব ছোট একখানা আয়াত, এমনকি কোন আয়াতের ছোট একটা অংশ নিয়েও এসেছেন। কোন কোন সময় আবার কয়েকটি আয়াতও এক সাথে নাযিল করা হয়েছে।

কোরআনের সর্বাপেক্ষা ছোট যে আয়াতাংশ নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর আগমন হয়েছে, তা ছিল সূরা নিসার একটি দীর্ঘ আয়াতের ছোট এক অংশ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ অথচ অপরদিকে সমগ্র সূরা আন্'আম একই সঙ্গে নাযিল করা হয়েছে।

কোরআন শরীফকে একবারে নাযিল না করে অল্প অল্প করে কেন নাযিল করা হলো, এ প্রশ্ন আরবের মুশরিকরাও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে উত্থাপন করেছিল। এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রদান করেছেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيْلاً . وَّلاَ يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا .

অর্থাৎ "এবং কাফেররা বলে, কোরআন তার প্রতি একবারে কেন নাযিল করা হলো না ? এভাবে (ধীরে ধীরে আমি পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি) যেন আপনার অন্তরে তা দৃঢ়মূল করে দেওয়া যায়। এবং আমি ধীরে ধীরে তা পাঠ করেছি। তা ছাড়া এরা এমন কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না, যার (মোকাবেলায়) আমি যথার্থ সত্য এবং তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেশ করব না।"

উপরিউক্ত আয়াতের তফসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম রাযী কোরআন শরীফ পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়ার যে তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, সেটুকু বুঝে নেওয়াই এখানে যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। তিনি লিখেছেন ঃ

(১) রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উম্মী ছিলেন, লেখাপড়ার চর্চা করতেন না। এমতাবস্থায় কোরআন যদি একই সাথে একবারে নাযিল হতো, তবে তা স্মরণ রাখা বা

অন্য কোন পন্থায় সংরক্ষণ করা হয়ত তাঁর পক্ষে কঠিন হতো। অপর পক্ষে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যেহেতু লেখাপড়া জানতেন, সেজন্য তাঁর প্রতি তওরাত একই সঙ্গে নাযিল করা হয়েছিল। কারণ তিনি লিপিবদ্ধ আকারে তওরাত সংরক্ষণে সমর্থ ছিলেন।

(২) সমগ্র কোরআন যদি একই সঙ্গে নাযিল হতো, তবে সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের প্রতিটি হুকুম-আহকামের প্রতি আমল করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াতো। এতদ্বারা শরীয়তে-মুহাম্মদীতে ধীরে ধীরে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিটি আহকাম অনুসারিগণের গা-সওয়া করে নেওয়া এবং হাতে-কলমে সেসব নির্দেশের উপর আমল করার যে পন্থা অবলম্বিত হয়েছে, তা ব্যাহত হতো।

(৩) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রতিদিনই তাঁর কওমের তরফ থেকে যে নতুন নতুন নির্যাতনের সম্মুখীন হতেন, এ অবস্থায় কোরআনের আয়াতসহ হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ঘন ঘন আগমন তাঁর মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে সহায়ক হতো।

(৪) কোরআন শরীফের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব এবং বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। এমতাবস্থায় সেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার পর এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তে সে সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়াই ছিল স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। এতে একাধারে যেমন মু'মিনদের অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে, তেমনি সমকালীন বিভিন্ন প্রেক্ষিতে অগ্রিম সংবাদ প্রদানের ফলে কোরআনের অভ্রান্ততার দাবি অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য হয়েছে। (তাফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩৬)

শানে নুযূল প্রসঙ্গে

কোরআনের আয়াতসমূহ দু' ধরনের। এক ধরনের আয়াত হচ্ছে যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা নিজের তরফ থেকে কোন নির্দেশ বা উপদেশমূলক প্রসঙ্গ বর্ণনা উপলক্ষে নাযিল করেছেন, কোন বিশেষ ঘটনা কিংবা কারো কোন প্রশ্নের জওয়াব প্রদান প্রভৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে সেগুলো নাযিল হয়নি। অন্য এক ধরনের আয়াত রয়েছে, যেগুলো বিশেষ কোন ঘটনা উপলক্ষে কিংবা কোন প্রশ্নের জওয়াবে নাযিল হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঘটনা কিংবা প্রশ্নগুলোকে সে সব আয়াতের পটভূমি হিসেবে গণ্য করা যায়। এসব আয়াতের পশ্চাৎবর্তী সে পটভূমিকেই তফসীরের পরিভাষায় 'শানে-নুযুল' বা 'সববে-নুযুল' বলা হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যেমন ঃ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ .

অর্থাৎ "মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যে পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে। একজন মু'মিন বাঁদীও একটি মুশরিক নারী থেকে উত্তম, তোমাদের চোখে সে নারী যত আকর্ষণীয়ই মনে হোক না কেন।"

এ আয়াত একটা বিশেষ ঘটনার পটভূমিতে নাযিল হয়েছিল। ঘটনাটি হচ্ছে, হযরত মারসাদ ইবনে আবি মারসাদ নামক এক সাহাবীর জাহেলিয়াত যুগে 'এনাক' নাম্নী এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে গভীর প্রণয় ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত মারসাদ (রা) হিজরত করে মদীনায় চলে যান, কিন্তু এনাক মক্কাতেই থেকে যায়। একবার কোন কাজ উপলক্ষে হযরত

মারসাদ (রা) মক্কায় আগমন করলে এনাক তাঁকে পূর্ব আসক্তির ভিত্তিতে তাঁর সাথে রাত কাটানোর আমন্ত্রণ জানায়। হযরত মারসাদ (রা) সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বললেন ঃ ইসলাম তোমার সাথে আমার অবাধ মিলনের পথে প্রাচীর সৃষ্টি করে দিয়েছে। এখন যদি তুমি একান্তই আমার সাথে মিলিত হতে আকাঙ্ক্ষী হও, তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুমতি নিয়ে তোমাকে বিবাহ করতে পারি।

মদীনায় ফিরে এসে হযরত মারসাদ (রা) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট উক্ত স্ত্রীলোককে বিবাহ করার অনুমতি প্রার্থনা করলে এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে মুমিনদের পক্ষে মুশরিক নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। (আসবাবুন নুযুল, ওয়াহেদী, পৃ. ৩৮)

উপরিউক্ত ঘটনাটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আয়াতের শানে-নুযুল বা আসবাবে-নুযুল। তফসীরের ক্ষেত্রে শানে-নুযুল অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এমন অনেক আয়াত রয়েছে, যেগুলো নাযিল হওয়ার পটভূমি বা শানে-নুযুল জানা না থাকলে সেগুলোর প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য উদ্ধার করা দুষ্কর।

সাত হরফ বা সাত ক্বেরাআত প্রসঙ্গ

উম্মতের সব শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই তেলাওয়াত সহজতর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনের কিছুসংখ্যক শব্দ বিভিন্ন উচ্চারণে পাঠ করার সুযোগ প্রদান করেছেন। কেননা কোন কোন লোকের পক্ষে বিশেষ পদ্ধতিতে অক্ষর বিশেষের উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় সে সমস্ত লোক যদি তাদের পক্ষে সহজপাঠ্য এমন কোন উচ্চারণে সে শব্দটি পাঠ করে, তবে সে উচ্চারণও তাদের পক্ষে শুদ্ধ হবে।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, একদা রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গিফার গোত্রের জলাশয়ের পাশে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) এসে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি হুকুম পাঠিয়েছেন, আপনি যেন আপনার উম্মতকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন, যেন তাদের সকলে একই উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিলেন ঃ আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রার্থনা জানিয়ে বলছি যে, আমার উম্মতের পক্ষে তা সম্ভব হবে না।

জওয়াব শুনে হযরত জিবরাঈল (আ) ফিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি হুকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি আপনার উম্মতকে এ মর্মে নির্দেশ দিন, যেন তারা অনধিক দুই উচ্চারণে কোরআন তেলাওয়াত করে। রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিলেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা ও অনুগ্রহের দরখাস্ত পেশ করে বলছি, আমার উম্মতের এতটুকু ক্ষমতাও নেই। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) ফিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর পুনরায় ফিরে এসে বললেন ঃ আল্লাহ পাক আপনাকে হুকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি উম্মতকে এ মর্মে আদেশ দিন যেন তারা সর্বাধিক তিন উচ্চারণে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র বিশেষ ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করে বলছি, আমার উম্মতের এতটুকু ক্ষমতাও নেই। জিবরাঈল (আ) এবারও ফিরে গেলেন এবং চতুর্থবার ফিরে এসে বললেন ঃ আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতি হুকুম প্রেরণ করেছেন, আপনি আপনার উম্মতকে সাত উচ্চারণে কোরআন

তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিন। অনুমোদিত সে সাত উচ্চারণের মধ্যে যিনি যে উচ্চারণেই পাঠ করুন না কেন, তার তেলাওয়াতই শুদ্ধ বলে গ্রহণ করা হবে। (মানাহেলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩)

এক হাদীসে রাসূলে মকবুল (সা) ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَوُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ .

অর্থাৎ এই কোরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে। এর মধ্যে তোমাদের যার পক্ষে যেভাবে সহজ হয় সেভাবেই তেলাওয়াত কর। (বোখারী)

রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইরশাদে উল্লিখিত 'সাত হরফ'-এর অর্থ কি--এ সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তত্ত্বদর্শী আলিমগণের নিকট এ সম্পর্কে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ পাক কোরআন শরীফ যে ক্বেরাআতের সাথে নাযিল করেছেন, তার মধ্যে পারস্পরিক উচ্চারণ পার্থক্য সর্বাধিক সাত রকম হতে পারে। অনুমোদিত সে সাতটি ধরন নিম্নলিখিত ভিত্তিতে হওয়া সম্ভব ঃ

(১) বিশেষ্যের উচ্চারণে তারতম্য। এতে এক বচন, দ্বি-বচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তারতম্য হতে পারে। যেমন এক ক্বেরাআতে تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ এ আয়াতে 'কালেমাতু' শব্দটি এক বচনে এসেছে। কিন্তু অন্য ক্বেরাআতে শব্দটি বহুবচনে উচ্চারিত হয়ে تَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ পঠিত হয়েছে।

(২) ক্রিয়াপদে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতকালের বিভিন্নতা অবলম্বিত হয়েছে। যেমন প্রচলিত ক্বেরাআতে رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا পঠিত হয়েছে। এ আয়াতের অন্য ক্বেরাআতে رَبُّنَا بَاعَدَ بَيْنَ اَسْفَارِنَا পঠিত হয়েছে।

(৩) রীতি অনুসারে এরাব চিহ্ন বা যের-যবর-পেশ ইত্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মত-পার্থক্যের কারণে ক্বেরাআতে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে।

যেমন وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ-এর স্থলে কেউ কেউ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ পাঠ করেছেন। অনুরূপ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ-এর স্থলে ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ পাঠ করেছেন।

(৪) কোন কোন ক্বেরাআতে শব্দের কম-বেশিও হয়েছে। যেমন, تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ-এর স্থলে কেউ কেউ مِنْ শব্দ বাদ দিয়ে تَجْرِى تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ পাঠ করেছেন।

(৫) কোন কোন ক্বেরাআতে শব্দের আগ-পাছও হয়েছে। যেমন--এক ক্বেরাআতে وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ-এর স্থলে وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ এসেছে। এখানে ক্বেরাআতের পার্থক্যে 'হাক্ব' ও 'মাউত' (শব্দ দু'টি) আগে-পিছে হয়ে গেছে।

(৬) শব্দের পার্থক্য হয়েছে। এক ক্বেরাআতে এক শব্দ এবং অন্য ক্বেরাআতে তদস্থলে অন্য শব্দ পঠিত হয়েছে। যেমন-- نُنْشِزُهَا-এর স্থলে অন্য ক্বেরাআতে نُنْشُرُهَا পঠিত হয়েছে। فَتَبَيَّنُوْا-এর স্থলে فَتَثَبَّتُوْا এবং طَلْحٍ-এর স্থলে طَلْعٍ-ও পঠিত হয়েছে।

(৭) উচ্চারণ পার্থক্য, যেমন কোন কোন শব্দের উচ্চারণভঙ্গী লম্বা, খাটো, হালকা, কঠিন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে শব্দের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না, শুধু উচ্চারণে

বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। যেমন مُوْسٰى শব্দটি কোন কোন ক্বেরাআতে مُوْسِىْ রূপে উচ্চারিত হয়েছে।

মোটকথা, উচ্চারণের সুবিধার্থে সাত ক্বেরাআতের মাধ্যমে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে যেসব পার্থক্য অনুমোদন করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অর্থের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। শুধুমাত্র বিভিন্ন এলাকা ও শ্রেণী-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত উচ্চারণ-ধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেই সাত ধরনের উচ্চারণ-রীতির অনুমোদন করা হয়েছে।

প্রাথমিক অবস্থায় কোরআনের উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যাপারে সাধারণ মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণরূপে ওয়াকেফহাল হওয়া সম্ভব ছিল না বলেই আয়াতের উচ্চারণভঙ্গীতে সুবিধামত পন্থা অবলম্বন করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রতি রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সাথে কোরআন শরীফের পারস্পরিক তেলাওয়াত করতেন। একজনে পড়তেন, অন্যজনে তা শুনতেন। এভাবে শুদ্ধতম ক্বেরাআত-পদ্ধতিও সুনিশ্চিত হতো। শেষ বিদায়ের বছর রমযানে এ তেলাওয়াতের দু'টি খতম সম্পন্ন হয়েছিল। এ খতমকেই ক্বারীগণের পরিভাষায় عرضة اخيره বা 'শেষ-দাওর' বলা হয়। এ উপলক্ষে তেলাওয়াত-পদ্ধতির শুদ্ধতম পন্থাগুলো বলে দিয়ে অন্যা সকল পঠন পদ্ধতি বাতিল করে দেওয়া হয়। তারপর থেকে শুধু ঐসব ক্বেরাআতই অবশিষ্ট রাখা হয়েছে, যেগুলো আজ পর্যন্ত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় রক্ষিত হয়ে আসছে।

তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ভুল বোঝাবুঝি দূর করার উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রা) কোরআন শরীফের সাতখানা অনুলিপি তৈরি করেছিলেন। প্রতিটি অনুলিপি এমনভাবে লেখা হয়েছিল যে, এতে অনুমোদিত সাতটি ক্বেরাআতই পাঠ করা সম্ভব হতো। তখনও পর্যন্ত আরবী লেখন-পদ্ধতিতে যের-যবর-পেশ প্রভৃতি হরকত-এর প্রচলন না থাকায় সাধারণ যের-যবর-পেশ-এর পার্থক্য পাঠকগণ নিজেরাই নির্ণয় করে নিতে পারতেন। যেসব ক্ষেত্রে শব্দের বদল কিংবা অগ্রপশ্চাৎ অনুমোদিত রয়েছে, স্বতন্ত্র সাতটি নোসখাতে সে পার্থক্যগুলোও পৃথক পৃথকভাবে লিখে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে উম্মতের আলেম-ক্বারী ও হাফেযগণ ক্বেরাআত-পদ্ধতিগুলো সংরক্ষণ করার ব্যাপারে এত শ্রম ও সাধনা নিয়োগ করেছেন যে, অনুমোদিত ক্বেরাআত-রীতির বাইরে কোথাও নোক্তার পার্থক্যও আর কোরআন-পাকের পাঠ-রীতিতে অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হয়নি। সাধক আলেম-হাফেয-ক্বারীগণের অগণিত লোক সে যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এ ক্বেরাআত পদ্ধতির সুষ্ঠু সংরক্ষণের লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করে রেখেছেন।

হযরত উসমান (রা) তাঁর লিপিবদ্ধকৃত সাত ক্বেরাআতের অনুলিপি মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করার সময় সঙ্গে প্রতিটি ক্বেরাআতের দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্বারীও প্রেরণ করতেন। সেসব ক্বারী নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ পাণ্ডুলিপির অনুলিপির অনুরূপ পদ্ধতিতে ক্বেরাআত শিক্ষা দান করতেন। এভাবেই বিভিন্ন এলাকার অধিবাসিগণ অনুমোদিত কেরাআত পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল হয়ে যান। এসব শিক্ষক-সাহাবীর কাছ থেকে যাঁরা শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই 'ইল্‌মে-ক্বেরাআত' চর্চা এবং অন্যকে শিক্ষা দানের ব্যাপারে সমগ্র জীবন ওয়াক্‌ফ করে দেন। এভাবেই 'ইলমে-ক্বেরাআত' একটা স্বতন্ত্র বিষয়রূপে গড়ে ওঠে। প্রতিটি এলাকা থেকেই কিছু লোক 'ইলমে ক্বেরাআতে' অধিকতর ব্যুৎপত্তি অর্জন করার উদ্দেশ্যে এ ইল্‌মের ইমামগণের শরণাপন্ন হতে থাকেন। কেউ কেউ

আবার দুই-তিন বা সাত ক্বেরাআতেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ক্বেরাআতের ক্ষেত্রে এ ধরনের আগ্রহ ও সাধনার ফলে 'ইলমে ক্বেরাআতের' বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি এমন কি ধ্বনিবিদ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত কাওয়ায়েদ-এর সৃষ্টি হয়। সর্বসম্মত এসব কাওয়ায়েদ মুসলিম-জাহানের সকল জ্ঞানী কর্তৃক সমভাবে সমর্থিত ও অনুসৃত হতে থাকে।

ক্বেরাআতের পার্থক্যের ক্ষেত্রে যে কয়টি মূলনীতি সর্বসম্মতভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে, সংক্ষেপে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

এক. হযরত উসমান (রা) কর্তৃক লিপিবদ্ধ লিখন পদ্ধতির সাথে প্রতিটি ক্বেরাআত সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

দুই. আরবী ভাষার কাওয়ায়েদ বা ব্যাকরণের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হবে।

তিন. পদ্ধতিটি নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে বর্ণিত এবং এ বর্ণনা ইল্‌মে ক্বেরাআতের মশহুর আলেমগণের মধ্যে পরিচিত হতে হবে।

কোন ক্বেরাআতের মধ্যে যদি উপরিউক্ত তিনটি শর্তের যে কোন একটির অভাব দেখা যায়, তবে সে শব্দ, বাক্য বা পঠন পদ্ধতি কোরআন শরীফের অংশরূপে কোন অবস্থাতেই গণ্য হবে না।

ক্বেরাআতের ব্যাপারে আলেমগণের এ অনন্য সাবধানতার ফলে বহু শিক্ষার্থী বিভিন্ন ক্বারীর ক্বেরাআত সংরক্ষণ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ সংরক্ষণ প্রচেষ্টার দ্বারাই বিশ্বস্ত বর্ণনাকারিগণের বর্ণনাসূত্রের মাধ্যমে ইলমে ক্বেরাআতের শুদ্ধতম পদ্ধতিগুলো যুগপরম্পরায় চলে আসছে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে একই ইমাম বিভিন্ন পদ্ধতির ক্বেরাআত আয়ত্ত করে তা শিক্ষা দান করতে থাকেন। অনেকে আবার বিশেষ এক ধরনের ক্বেরাআতই আয়ত্ত করেন এবং তা শিক্ষা দান করতে থাকেন। ফলে সেই ক্বেরাআত সংশ্লিষ্ট ওস্তাদের নামে খ্যাত হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে আলিমগণ ক্বেরাআত পদ্ধতিগুলোর খুঁটিনাটি সব দিক বিশ্লেষণ করে কিতাব লেখা শুরু করেন। সর্বপ্রথম ইমাম আবূ ওবায়েদ কাসেম বিন সালাম, ইমাম আবূ হাতেম সাজেস্তানী, কাজী ইসমাঈল ও ইমাম আবূ জাফর তাবারী এই ইল্‌ম সম্পর্কে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে আবূ বকর ইবনে মুজাহিদ (ওফাত ৩২৪ হি.) একটি প্রামাণিক কিতাব লেখেন। এই কিতাবে সাত ক্বারীর ক্বেরাআতই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তাঁর এই কিতাব এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, পরবর্তী যুগে তাঁর কিতাবে উল্লিখিত সাত ক্বারীর ক্বেরাআতই সর্বসাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়। অনেকের মধ্যে এমন একটা ধারণা পর্যন্ত সৃষ্টি হয়ে যায় যে, ইমাম আবূ বকর কর্তৃক উল্লিখিত সাত ধরনের পঠন পদ্ধতিই শুদ্ধতম বর্ণনাভিত্তিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে এ পদ্ধতিগুলোই নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইমাম ইবনুল-মুজাহিদ এ উদ্দেশ্যে সাতজন ক্বারীর ক্বেরাআত পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেননি যে, এই সাতজনের ক্বেরাআতই শুদ্ধতম—-এরূপ দাবিও তিনি কোথাও করেননি। ইমাম ইবনুল-মুজাহিদের কিতাব থেকে আরো একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি এই হয়েছে যে, হাদীস শরীফে উল্লিখিত 'ছাবআতা-আহরূফ' বা সাত হরফের যে বর্ণনা রয়েছে তা বোধ হয় এ সাতজন ক্বারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধারণাও সত্য নয়। কেননা ইতিপূর্বেই

উল্লিখিত হয়েছে যে, হাদীসে উল্লিখিত যে সাত পদ্ধতিতে কোরআন শরীফ নাযিল হয়েছে উপরে বর্ণিত তিন শর্তের মাপকাঠিতে যে সব পঠন-পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোই সেই সাত-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

সাত ক্বারী

ইমাম আবু বকর ইবনুল-মুজাহিদের কিতাব দ্বারা যে সাতজন ক্বারী সর্বাপেক্ষা বেশি খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১. আবদুল্লাহ্ ইবনে কাসীর আদদারী (র) (ওফাত ১২০ হি.) ঃ ইনি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা) ও হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) প্রমুখ তিনজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন। তাঁর ক্বেরাআত মক্কা শরীফে বেশি প্রচলিত হয়েছে। তাঁর ক্বেরাআতের বর্ণনাকারিগণের মধ্যে হযরত বাযযী (র) ও হযরত কান্‌বাল (র) অধিকতর খ্যাতি লাভ করেছেন।

২. নাফে বিন আবদুর রহমান বিন আবূ নায়ীম (ওফাত ১৬৯ হি.) ঃ ইনি এমন সত্তর জন তাবেয়ী থেকে ইলমে-ক্বেরাআত শিক্ষা লাভ করেছিলেন, যাঁরা সরাসরি হযরত উবাই বিন কা'ব (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর শাগরেদ ছিলেন। তাঁর ক্বেরাআত মদীনা শরীফে বেশি প্রসার লাভ করেছে। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আবু মূসা কালুন (ওফাত ২২০ হি.) ও আবু সায়ীদ দরশ (ওফাত ১৯৭ হি.) অধিক খ্যাতি লাভ করেছেন।

৩ আবদুল্লাহিল হিসবী (ওফাত ১১৮ হি.) ঃ ইবনে 'আমের নামে খ্যাত। ইনি সাহাবীগণের মধ্যে হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা) ও হযরত ওয়াছেলা বিন আসকার (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। ইলমে ক্বেরাআত হযরত মুগীরা বিন শেহাব মাখযমী থেকে হাসিল করেন। মুগীরা বিন শেহাব হযরত উসমান (রা)-এর শাগরেদ ছিলেন। তাঁর ক্বেরাআতের বেশি প্রচলন হয়েছে সিরিয়ায়। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে হেশাম ও যাকওয়ান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

৪. আবু আ'মার যাব্বান ইবনুল-আলা (ওফাত ১৫৪ হি.) ঃ ইনি হযরত মুজাহিদ (রা) ও সায়ীদ ইবনুল জুবাইর (র)-এর মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও হযরত উবাই ইবনুল কা'ব (রা)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ক্বেরাআত বসরায় বেশি প্রসার লাভ করেছে। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আবু উমারুদ-দুয়ালী (ওফাত ২৪৬ হি.) ও আবু শোয়াইব সূমীর (ওফাত ২৬১ হি.) খ্যাতি সমধিক।

৫. হামযা বিন হাবীব আয-যাইয়্যাত (ওফাত ১৮৮ হি.) ঃ ইনি ইকরামা বিন রবী আত্-তাইমীর মুক্ত-করা ক্রীতদাস ছিলেন। সুলায়মান আল-আ'মাশ-এর শাগরেদ। সুলায়মান বিন ওয়াসসাব-এর নিকট থেকে, তিনি যর বিন হোবাইশ-এর নিকট থেকে এবং ইয়াহ্ইয়া তিনি হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে খাল্‌ফ বিন হেশাম (ওফাত ১৮৮ হি.) ও খাল্লাদ বিন খালেদ (ওফাত ২২০ হি.) বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

৬. আসেম বিন আবিননাজুদ আল্-আসাদী (ওফাত ১২৭ হি.) ঃ ইনি যর বিন হোবাইশ-এর মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) আবু আবদুর রহমান ছুলমার মাধ্যমে হযরত

আলী (রা)-এর শাগরেদ। তাঁর ক্বেরাআতের বর্ণনাকারিগণের মধ্যে শা'বা বিন আইয়্যাশ (ওফাত ১৯৩ হি.) ও হাফস বিন সুলায়মান (ওফাত ১৮০ হি.) অধিক খ্যাতি লাভ করেছেন। বর্তমানে হাফ্স বিন সুলায়মানের বর্ণিত ক্বেরাআত-পদ্ধতিই সর্বপেক্ষা বেশি প্রচলিত।

৭. আবুল হাসান আলী বিন হামযা আল্-কাসায়ী (ওফাত ১৮৯ হি.) ঃ ইনি আরবী ভাষার প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ। তাঁর বর্ণনাকারিগণের মধ্যে আবুল হারেস মারওয়ারী (ওফাত ২৪০ হি.) ও আবু উমারুদ দাওরী সমধিক প্রসিদ্ধ।

শেষোক্ত তিন জনের ক্বেরাআত প্রধানত কুফা এলাকায় প্রচলিত হয়েছিল।

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপরিউক্ত সাতজন ছাড়া আরো কয়েকটি ক্বেরাআত পদ্ধতি বহুল-বর্ণিত বিশ্বস্ত বর্ণনা সূত্রের মাধ্যমে পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে যখন সাধারণের মধ্যে এরূপ একটা ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়লো যে, শুদ্ধতম ক্বেরাআত-পদ্ধতি উপরিউক্ত সাত ক্বেরাআতেই সীমাবদ্ধ, তখন সমকালীন আলিমগণের অনেকেই, বিশেষত আল্লামা শাযায়ী ও আবু বকর মেহরান সাতের স্থলে দশটি ক্বেরাআত-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করে পুস্তক রচনা করেন। তাঁদের পুস্তকে পূর্বোল্লিখিত সাতজন ছাড়া আর যে তিন জনের ক্বেরাআত উল্লিখিত হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন ঃ

১. ইয়াকুব বিন ইসহাক হাযরামী (ওফাত ২০৫ হি.) ঃ তাঁর ক্বেরাআত বসরা এলাকায় বেশি প্রচলিত হয়েছিল।

২. খালফ বিন হিশাম (ওফাত ২০৫ হি.) ঃ ইনি হামযার ক্বেরাআতের বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁর ক্বেরাআত কুফায় বেশি বিস্তার লাভ করেছে।

৩. আবু জাফর ইয়াযীদ বিন কা'কা' (ওফাত ১৩০ হি.) ঃ তাঁর ক্বেরাআত মদীনা শরীফে সর্বাধিক প্রচলিত হয়।

পরবর্তীকালে কোন কোন গ্রন্থকার চৌদ্দ জন ক্বারীর ক্বেরাআত উল্লেখ করেছেন। পূর্বোক্ত দশজন ছাড়াও তাঁরা নিম্নোক্ত চারজনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

১. হযরত হাসান বসরী (র) (ওফাত ১১০ হি.) ঃ তাঁর ক্বেরাআতের চর্চা বসরাতে বেশি হয়েছে।

২. মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন মাহীয (ওফাত ১২৩ হি.) ঃ তাঁর ক্বেরাআতের কেন্দ্র ছিল মক্কা শরীফ।

৩. ইয়াহইয়া বিন মোবারক ইয়াযীদী (ওফাত ২০২ হি.) ঃ ইনি বসরার অধিবাসী ছিলেন।

৪. আবুল ফারজ শিনবুযী (ওফাত ৩৮৮ হি.)ঃ ইনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন।

কেউ কেউ চৌদ্দজন ক্বারীর তালিকায় হযরত শিনবুযীর স্থলে সুলায়মান আ'মাশ-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

উপরিউক্ত চৌদ্দটি ক্বেরাআতের প্রথম দশটি সর্বসম্মত বহু বর্ণনা সমর্থিত। পরবর্তী চার জনের ক্বেরাআত বিরল বর্ণনাভিত্তিক–(মানাহেলুল-ইরফান, মুনজেদুল-মোকাররেঈন-ইবনুল জাযারী)।

কোরআন সংরক্ষণের ইতিহাস

রাসূল (সা)-এর আমলে

কোরআন শরীফ যেহেতু এক সাথে নাযিল হয়নি, বরং বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন-মত অল্প অল্প করে নাযিল করা হয়েছে, এজন্যে নবুওয়ত যুগে কোরআনকে গ্রন্থাকারে একত্রে লিপিবদ্ধ করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এজন্য প্রথম প্রথম কোরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে হেফ্‌জ বা কণ্ঠস্থ করার প্রতিই বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। প্রথমাবস্থায় যখন ওহী নাযিল হতো তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওহীর শব্দগুলো সাথে সাথে দ্রুত আবৃত্তি করতে থাকতেন, যেন সেগুলো অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ক্বেয়ামায় আয়াত নাযিল হলো, যাতে আল্লাহ পাক তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, কোরআন কণ্ঠস্থ করার জন্য ওহী নাযিল হতে থাকা অবস্থায় শব্দগুলো দ্রুত সাথে সাথে উচ্চারণ করে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলাই আপনার মধ্যে এমন তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি সৃষ্টি করে দেবেন যে, একবার ওহী নাযিল হওয়ার পর তা আর আপনি ভুলতে পারবেন না। তাই ওহী নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যেতো। এভাবেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সিনা কোরআনুল করীমের এমন সুরক্ষিত ভাণ্ডারে পরিণত হয় যে, তন্মধ্যে সামান্যতম সংযোগ-বিয়োগ কিংবা ভুল-চুক হওয়ার কোন আশংকা ছিল না। এরপরও অধিকতর সাবধানতার খাতিরে প্রতি বছর রমযান মাসে তিনি সে সময় পর্যন্ত নাযিলকৃত সমগ্র কোরআন হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তেলাওয়াত করে শোনাতেন, হযরত জিবরাঈল (আ)-এর নিকট থেকেও শুনে নিতেন। ওফাতের বছর রমযানে হুযূর (সা) দু'দুবার হযরত জিবরাঈল (আ)-কে শোনান এবং জিবরাঈল (আ) থেকে শোনেন। (বোখারী শরীফ)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে প্রথমে কোরআনের আয়াতগুলো ইয়াদ করাতেন, তারপর আয়াতের মর্মার্থ শিক্ষা দিতেন। সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যেও কোরআন মুখস্থ করা এবং মর্মার্থ শিক্ষা করার এমন প্রবল আগ্রহ ছিল যে, প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে অন্যদের ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতেন। অনেক মহিলা পর্যন্ত বিবাহের মোহরানা বাবদ এরূপ দাবি পেশ করতেন যে, স্বামীরা তাদেরকে শুধু কোরআন শরীফের তা'লীম দেবেন, এ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না। শত শত সাহাবী সব কিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে শুধু কোরআনের তা'লীম গ্রহণ করার সাধনাতেই জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা কোরআন শরীফ শুধু মুখস্থই করতেন না, নিয়মিত রাত জেগে নফল নামাযে তেলাওয়াতও করতেন। হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বর্ণনা করেন যে, মক্কা থেকে কেউ হিজরত করে মদীনায় এলেই তাকে কোরআনের তা'লীম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে কোন একজন আনসারের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হতো। মসজিদে নববীতে সর্বক্ষণ কোরআন শিক্ষা দান ও তেলাওয়াতের শব্দ এমন বেড়ে গিয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ প্রদান করতে হয় যে, সবাই যেন আরো আস্তে কোরআন পাঠ করেন, যাতে পরস্পরের তেলাওয়াতের মধ্যে টক্কর না হয়। (মানাহেলুল-ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৪)

সীমাহীন আগ্রহ ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে খুব অল্প দিনেই সাহাবীগণের মধ্যে একদল হাফেজে কোরআন তৈরি হয়ে গেলেন। এ জামায়াতের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীন বা প্রথম চার খলীফা ছাড়াও হযরত তালহা (রা), হযরত সা'আদ (রা), হযরত ইবনে মসউদ

(রা), হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা), হযরত সালেম (রা), হযরত আবু হুরায়রা (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), আমর ইবনুল-আস (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা), হযরত মুয়াবিয়া (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত হাফসা (রা), হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

মোটকথা, প্রাথমিক অবস্থায় কোরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হিফ্‌জ-এর প্রতিই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। কারণ তখন লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। বই-পুস্তক প্রকাশের উপযোগী ছাপাখানা এবং অন্য উপকরণের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং সে অবস্থায় যদি শুধু লেখার উপর নির্ভর করা হতো, তবে কোরআনের সংরক্ষণ যেমন জটিল সমস্যা হয়ে পড়তো, তেমনি ব্যাপক প্রচারের দিকটিও নিঃসন্দেহে অসম্ভব হয়ে যেতো। তাছাড়া আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল এমন প্রখর যে, এক এক ব্যক্তি হাজার হাজার কবিতা গাঁথা মুখস্থ করে রাখত। মরুভূমির বেদুইনরা পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে তাদের পরিবার ও গোত্রের কুষ্ঠিনামার ইতিহাস প্রভৃতি মুখস্থ করে রাখত এবং যত্রতত্র তা অনর্গল বলে যেতো। কোরআন হেফাজতের কাজে সেই অনন্য স্মৃতিশক্তিকেই কাজে লাগানো হয়েছে। হেফজের মাধ্যমেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরবের ঘরে ঘরে পবিত্র কোরআনের বাণী পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ওহী লিপিবদ্ধকরণ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোরআন পাক হিফ্‌জ করানোর পাশাপাশি লিপিবদ্ধ করে রাখারও বিশেষ সুব্যবস্থা করেছিলেন। বিশিষ্ট কয়জন লেখাপড়া জানা সাহাবীকে এ দায়িত্বে নিয়োজিত করে রাখা হয়েছিল।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি ওহী লিখে রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। যখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হতো, তখন সর্ব শরীরে মুক্তার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিত। এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর আমি দুম্বার চওড়া হাড় অথবা লিখন উপযোগী অন্য কোন কিছু নিয়ে হাযির হতাম। লেখা শেষ করার পর কোরআনের ওজন আমার শরীর পর্যন্ত এমন অনুভূত হতো যে, আমার পা ভেঙে পড়তো, মনে হতো আমি যেন চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছি।

লেখা শেষ হলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ যা লিখেছ আমাকে পড়ে শোনাও। আমি লিখিত অংশ পড়ে শোনাতাম। কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা শুদ্ধ করিয়ে দিতেন। এরপর সংশ্লিষ্ট অংশটুকু অন্যদের সামনে তেলাওয়াত করতেন। (মাজমাউয-যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬; তিবরানী)

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) ছাড়াও যাঁরা ওহী লিপিবদ্ধ করে রাখার দায়িত্ব পালন করতেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম চার খলীফা, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম, হযরত মুয়াবিয়া, হযরত মুগীরা ইবনে শোবা, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ, হযরত সাবেত ইবনে কায়েস, হযরত আব্বাস ইবনে সায়ীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। (ফত্‌হুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮; যাদুল মা'আদ. ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০)

হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি কোন আয়াত নাযিল হওয়ার পর পরই ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত সাহাবীকে ডেকে

সংশ্লিষ্ট আয়াতটি কোন্ সূরায় কোন্ আয়াতের পর সংযোজিত হবে তা বলে দিতেন এবং সেভাবেই তা লিপিবদ্ধ করা হতো। (ফতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮)

সে যুগে আরবে যেহেতু কাগজ খুবই দুষ্প্রাপ্য ছিল, এজন্য কোরআনের আয়াত প্রধানত পাথর-শিলা, শুকনা চামড়া, খেজুর গাছের শাখা, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা এবং পশুর হাড়ের উপর লেখা হতো। কোন কোন সময় কেউ কেউ কাগজের টুকরা ব্যবহার করেছেন বলেও জানা যায়। (ফতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১১)

লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে এমন একটি ছিল, যেটি স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিশেষ তত্ত্বাবধানে নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেটি পরিপূর্ণভাবে কিতাব আকারে না হয়ে পাথর-শিলা, চামড়া প্রভৃতি সে যুগের প্রচলিত লেখন সামগ্রীর সমষ্টিরূপে রক্ষিত হয়েছিল। নিয়মিত লেখকগণ ছাড়াও সাহাবীগণের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু আয়াত এবং সূরা লিখে রেখেছিলেন। ব্যক্তিগত লিখনের রেওয়াজ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় তাঁর বোন ও ভগ্নিপতির হাতে কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত সম্বলিত একটি পাণ্ডুলিপি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। (সীরাতে ইবনে হেশাম)

হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে চামড়া, হাড়, পাথর-শিলা, গাছের পাতা প্রভৃতিতে লিখিত কোরআন শরীফের নোসখা একত্র করে পরিপূর্ণ কিতাবের আকারে সংকলিত করার তাকিদ প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগেই অনুভূত হয়। সাহাবীগণ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যেসব অনুলিপি তৈরী করেছিলেন, সেগুলো পূর্ণাঙ্গ ছিল না। অনেকেই আবার আয়াতের সাথে তফসীরও লিখে রেখেছিলেন।

হযরত আবূ বকর (রা) সবগুলো বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপি একত্র করে পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করত কোরআন পাককে একত্রে সংরক্ষিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

কি কারণে হযরত আবূ বকর (রা) কোরআন শরীফের একখানা পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি তৈরি করে সংরক্ষিত করার আশু প্রয়োজনীয়তার কথা বেশি করে অনুভব করেছিলেন, সে সম্পর্কে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন ঃ ইয়ামামার যুদ্ধের পর একদিন হযরত আবূ বকর (রা) আমাকে জরুরী তলব দিলেন। আমি সেখানে পৌঁছে দেখি, হযরত উমর (রা) সেখানে রয়েছেন। আমাকে দেখে হযরত আবূ বকর (রা) বললেন ঃ হযরত উমর (রা) এসে আমাকে বলছেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফেজে কোরআন শহীদ হয়ে গেছেন। এমনভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে যদি হাফেজ সাহাবীগণ শহীদ হতে থাকেন, তবে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়, যখন কোরআনের কিছু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। সে মতে আমার অভিমত হচ্ছে, অনতিবিলম্বে আপনি বিশেষ নির্দেশ প্রদান করে কোরআন শরীফ একত্রে সংকলিত করার ব্যবস্থা করুন।

আমি হযরত উমর (রা)-কে বলেছি যে, যে কাজ হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম করেন নি, সে কাজ আমার পক্ষে করা সমীচীন হবে কিনা।

হযরত উমর (রা) জবাব দিয়েছেন ঃ আল্লাহ্র কসম, এ কাজ হবে খুবই উত্তম। একথা তিনি বারবার বলতে থাকায় আমার মনও এ ব্যাপারে সায় দিচ্ছে। অতঃপর হযরত আবূ বকর

(রা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "তুমি তীক্ষ্ণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন উদ্যমী যুবক; তোমার সততা ও সাধুতা সম্পর্কে কারো কোন বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ নেই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যমানায় তুমি ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজ করেছ। সুতরাং তুমিই বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে কোরআনের বিক্ষিপ্ত সূরা ও আয়াতসমূহ একত্র করে লিখতে শুরু কর।"

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এঁরা যদি আমাকে একটি পাহাড় স্থানান্তর করার নির্দেশ দিতেন, তবুও বোধ হয় তা আমার পক্ষে এতটুকু কঠিন বলে মনে হতো না, যত কঠিন মনে হতে লাগলো পবিত্র কোরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করার কাজটি। আমি নিবেদন করলাম ঃ আপনি কি করে সে কাজ করতে চান, যে কাজ খোদ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম করেন নি। হযরত আবূ বকর (রা) জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, এ কাজ খুবই উত্তম হবে। বারবার তিনি আমাকে একই কথা বলতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ কাজের যথার্থতা সম্পর্কে আমার মনেও প্রত্যয় সৃষ্টি করে দিলেন। এরপর থেকেই আমি খেজুরের ডাল, পাথর, হাড়, চামড়া প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন সূরা ও আয়াত একত্র করতে শুরু করলাম। লোকজনের স্মৃতিতে সংরক্ষিত কোরআনের সাথে যাচাই করে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ সমাপ্ত করলাম। (সহীহ বোখারী, কিতাবু ফাযায়িলিল কোরআন)

প্রসঙ্গত এখানে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) কর্তৃক কোরআন শরীফ একত্রে সংকলন করার ব্যাপারে গৃহীত কার্যক্রমটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি নিজেও হাফেজে কোরআন ছিলেন। সুতরাং নিজের স্মৃতি থেকেই সম্পূর্ণ কোরআন লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ ছিলেন। তাছাড়া শত শত হাফেজ বর্তমান ছিলেন। তাঁদের একত্র করেও সমগ্র কোরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করা সহজ ছিল, বিশেষত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানে যে পাণ্ডুলিপিটি তৈরি হয়েছিল, সেটি থেকেও তিনি নকল করে নিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে সবগুলো উপকরণ একত্র করেই এ কাজ সম্পাদন করেন। প্রতিটি আয়াতের ক্ষেত্রেই তিনি নিজের স্মৃতি, লিখিত দলীল, অন্যান্য হাফেজের তেলাওয়াত প্রভৃতি সবগুলোর সাথে যাচাই করে সর্বসম্মত বর্ণনার ভিত্তিতেই তাঁর পাণ্ডুলিপি লিপিবদ্ধ করেছেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেসব লোককে দিয়ে ওহী লিপিবদ্ধ করাতেন, সাধারণ ঘোষণা প্রচার করে সে সবগুলো নোস্‌খা একত্র করার ব্যবস্থা করেন। যেসব লিখিত দলীল সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক হযরত যায়েদ (রা)-এর নিকট হাযির করা হলো, সেগুলো যাচাই করার জন্য নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করলেন ঃ

১. সর্বপ্রথম তিনি তাঁর স্মৃতিতে রক্ষিত কোরআনের সাথে সেগুলো যাচাই করতেন।

২. হযরত উমর (রা)-ও হাফেজে কোরআন ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকেও হযরত যায়েদ (রা)-এর সঙ্গে এ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁরা যৌথভাবেই লিখিত নোসখাগুলো গ্রহণ করতেন এবং একজনের পর অন্যজন স্ব-স্ব স্মৃতির সঙ্গে যাচাই করতেন। (ফতহুল বারী, আবূ দাউদ)

৩. এমন কোন লিখিত আয়াতই গ্রহণ করা হচ্ছে না, যে পর্যন্ত অন্তত দু'জন বিশ্বস্ত সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য না দিতেন যে, এগুলো খোদ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। (এতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০)

৪. অতঃপর লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপির সাথে সুষ্ঠুভাবে যাচাই করে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত করা হতো। (আল-বোরহান, ফী উলুমিল-কোরআন, যারাকশী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮)

হযরত আবূ বকরের যমানায় কোরআন সংকলন করার ব্যাপারে অবলম্বিত উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলো উত্তমরূপে অনুধাবন করার পরই হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর কথাটির অর্থ পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, সূরা বারাআত-এর শেষ আয়াত--

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ .

থেকে শেষ পর্যন্ত অংশটি শুধু হযরত আবূ খুযায়মা (রা)-এর কাছে পাওয়া যায়। এ কথার অর্থ এ নয় যে, এ আয়াত কয়টি শুধু সাহাবী হযরত আবূ খুযায়মা (রা)-ই জানতেন, অন্য কেউ জানতেন না কিংবা অন্য কারো স্মৃতিতে ছিল না অথবা অন্য কারো কাছে লিখিত আকারে ছিল না বরং এ কথার অর্থ এই যে, খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানের লিখিত দলীল হিসাবে এবং উপরিউক্ত চার শর্তে উত্তীর্ণ এ অংশটুকু কেবল আবূ খুযায়মা (রা)-ই পেশ করেছিলেন। অন্যথায় শত শত হাফেজের স্মৃতিতে ও লিখিত পূর্ণ কোরআনের নোসখায় এ কয়টি আয়াতও অবশ্যই ছিল। শুধু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যমানায় ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য পৃথকভাবে লিখিত এ আয়াত আবূ খুযায়মা (রা)-ই পেশ করেছিলেন। (আল বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪-২৩৫)

মোটকথা, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) অসাধারণ সাবধানতার সাথে কোরআন শরীফের পরিপূর্ণ নোসখা তৈরি করে ধারাবাহিকভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। (আল-এতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০)

কিন্তু যেহেতু প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক করে লেখা হয়েছিল, এজন্য সেটি অনেকগুলো 'সহীফায়' বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখনকার পরিভাষায় এ সহীফাগুলোকে 'উম্ম' বা মূল পাণ্ডুলিপি বলে আখ্যায়িত করা হতো। এ পাণ্ডুলিপির বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ

১. আয়াতগুলো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত ধারায় লিপিবদ্ধ করা হলেও সূরাগুলোর ধারাবাহিকতা ছিল না। প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক লিখিত হয়েছিল। (আল-এতকান)

২. এ নোসখায় পূর্ববর্ণিত কোরআনের সাতটি ক্বেরাআতই সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। (মানাহেলুল-এরফান, তারীখুল-কোরআন, কুর্দী)

৩. যেসব আয়াতের তেলাওয়াত প্রচলিত ছিল সবগুলো আয়াতই এতে ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

৪. নোসখাটি এ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল, যেন প্রয়োজনবোধে উম্মতের সবাই এইটি থেকে নিজ নিজ নোসখা শুদ্ধ করে নিতে পারেন।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর উদ্যোগে সংকলিত এ নোসখাটি তাঁর কাছেই রক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর এটি হযরত উমর (রা) নিজের হেফাজতে নিয়ে নেন। হযরত উমর (রা)-এর শাহাদাতের পর নোসখাটি উম্মুল-মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর কাছে রক্ষিত থাকে। শেষ পর্যন্ত হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সূরার তরতীব অনুসারে লিখন পদ্ধতিসহ কোরআনের সর্বসম্মত শুদ্ধতম নোসখা প্রস্তুত হয়ে চারদিকে বিতরিত হওয়ার পর হযরত

হাফসা (রা)-এর নিকট রক্ষিত নোসখাটি নষ্ট করে ফেলা হয়। কেননা তখন সর্বসম্মত লিখন-পদ্ধতি ও সূরার তরতীববিহীন কোন নোসখা অবশিষ্ট থাকলে সর্বসাধারণের পক্ষে বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল বলেই এরূপ করা হয়েছিল। (ফতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৬)

হযরত উসমান (রা)-এর আমলে

হযরত উসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর ইসলাম আরবের সীমান্ত অতিক্রম করে ইরান ও রোমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি নতুন এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর যেসব মুজাহিদ কিংবা বণিকের মাধ্যমে তারা ইসলামের দৌলত লাভ করেন, তাঁদের নিকটই কোরআন শরীফ শিক্ষা করতেন। ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন শরীফ সাত হরফ বা ক্বেরাআতে নাযিল হয়েছিল। সাহাবীগণও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে বিভিন্ন ক্বেরাআতেই কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করেছিলেন। সে জন্য প্রত্যেক সাহাবীই যে ক্বেরাআতে শিক্ষা করেছিলেন সে ক্বেরাআতেই স্ব স্ব শাগরেদগণকে কোরআন শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। এভাবেই বিভিন্ন ক্বেরাআত পদ্ধতিও বহু দূরদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। যেসব এলাকার লোকেরা এ তথ্য অবগত ছিলেন যে, কোরআন শরীফ সাত ক্বেরাআত পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে, সে সব এলাকায় কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু দূর-দূরান্তের লোকদের কাছে কোরআনের বিভিন্ন ক্বেরাআত ইত্যাদি সম্পর্কিত পূর্ণ তথ্য ও জ্ঞানের অপ্রতুলতা হেতু কোথাও কোথাও ক্বেরাআতের পার্থক্যকে কেন্দ্র করে নানা মতভেদ এমনকি ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত হতে আরম্ভ করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্বেরাআত পদ্ধতিকে শুদ্ধ এবং অন্যদের ক্বেরাআতকে ভুল বলে চিহ্নিত করতে শুরু করে। ফলে ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয় এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকে বহুল সমর্থিত, নিঃসন্দেহ বর্ণনা-সূত্রে প্রাপ্ত, ক্বেরাআত রীতিকে ভুল অভিহিত করার গোনাহ থেকে মানুষকে রক্ষা এবং পারস্পরিক মতবিরোধের আশু একটা নির্ভরযোগ্য সমাধান অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তখন পর্যন্ত মদীনা শরীফে রক্ষিত হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা) কর্তৃক লিখিত নোসখা ব্যতীত অন্য কারো নিকট এমন কোন নোসখা ছিল না, যা অভ্রান্ত দলীলরূপে দাঁড় করানো যেতে পারে। কেননা অন্য যেসব নোসখা ছিল সেগুলো যেহেতু ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল, সুতরাং সেগুলোর লিখন পদ্ধতিতে সবগুলো শুদ্ধ ক্বেরাআত উল্লিখিত থাকত না। এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা ছিল এই যে, এমন এক লিপি-পদ্ধতির মাধ্যমে কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করে সমগ্র মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে দেওয়া, যার মাধ্যমে সাত ক্বেরাআতেরই তেলাওয়াত সম্ভব হয় এবং ক্বেরাআতের ক্ষেত্রে কোন মতভেদ দেখা দিলে সে নোস্খা দেখে মীমাংসা করে নেওয়া যায়। হযরত উসমান (রা) তাঁর খিলাফতের যমানায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিরাট কাজটিই সম্পাদন করে গেছেন।

এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করার যে পটভূমি হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) আর্মিনিয়া ও আযারবাইজান এলাকায় জিহাদে নিয়োজিত হন। সেখানে তিনি লক্ষ্য করেন যে, কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরনের মতভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। তখন মদীনায় ফিরে এসেই তিনি সোজা হযরত উসমান (রা)-এর দরবারে হাযির হলেন এবং নিবেদন করলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! এ

উম্মত আল্লাহ্‌র কিতাবের ব্যাপারে ইহুদী-নাসারাদের ন্যায় মতভেদের শিকারে পরিণত হওয়ার আগেই আপনি এর একটা সুষ্ঠু প্রতিবিধানের ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

হযরত উসমান (রা) বিষয়টি খুলে বলতে বললেন। হযরত হুযায়ফা (রা) বললেন ঃ আমি আর্মেনিয়া এলাকায় জিহাদে লিপ্ত থাকা অবস্থায় লক্ষ্য করেছি, সিরিয়া এলাকার লোকেরা হযরত উবাই ইবনে কা'ব-এর ক্বেরাআত পদ্ধতি অনুসরণে কোরআন তেলাওয়াত করছে। অপরপক্ষে ইরাকের লোকেরা আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের ক্বেরাআত পদ্ধতি অনুসরণ করছে। যেহেতু সিরিয়ার লোকেরা ইবনে মসউদের ক্বেরাআত পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় এবং ইরাকের লোকদের পক্ষেও উবাই ইবনে কা'বের ক্বেরাআত পদ্ধতি শোনার সুযোগ হয়নি। ফলে এঁদের মধ্যে তেলাওয়াতের ব্যাপারে এমন মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত একে অন্যকে কাফের আখ্যায়িত করা পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছে।

হযরত উসমান (রা) নিজেও এরূপ একটা বিপদের আশংকা করছিলেন। খোদ মদীনা শরীফেও বিভিন্ন ওস্তাদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত শাগরেদগণের মধ্যে ক্বেরাআতের পার্থক্যকে ভিত্তি করে বেশ উত্তপ্ত মতবিরোধ সৃষ্টি হচ্ছিল। অনেক ক্ষেত্রে এ মতবিরোধের উত্তাপ ওস্তাদগণের কাতারে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছিল। এমনকি তাঁরাও একে অপরের ক্বেরাআতকে ভুল বলতে শুরু করেছিলেন।

হযরত হুযায়ফা ইবনুল-ইয়ামান (রা) কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর হযরত উসমান (রা) এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে একত্র করলেন। সকলকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমি শুনতে পেয়েছি যে, এক শ্রেণীর লোক অন্যদেরকে লক্ষ্য করে বলছে যে, আমাদের ক্বেরাআত তোমাদের চাইতে উত্তম এবং সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ। অথচ এ ধরনের মন্তব্য কুফরীর পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। সুতরাং এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আপনারা কি পরামর্শ দেন ?

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি এ সম্পর্কে চিন্তা করেছেন ? হযরত উসমান (রা) বললেন, আমার অভিমত হচ্ছে সকল শুদ্ধ বর্ণনা একত্র করে এমন একটা সর্বসম্মত নোস্‌খা তৈরি করা কর্তব্য, যাতে ক্বেরাআত পদ্ধতির মধ্যেও কোন মতভেদের অবকাশ না থাকে। সাহাবীগণ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উসমান (রা)-এর অভিমত সমর্থন করলেন এবং এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রদান করার অঙ্গীকার করলেন।

এরপর হযরত উসমান (রা) সর্বশ্রেণীর লোককে সমবেত করে একটি জরুরী খোতবা দিলেন। তাতে তিনি বললেন ঃ আপনারা মদীনা শরীফে আমার অতি নিকটে বসবাস করেও কোরআন শরীফের ব্যাপারে একে অন্যকে দোষারোপ ও মতভেদ করছেন। এতেই বোঝা যায় যে, যাঁরা আমার থেকে দূর থেকে দূরতর এলাকায় বসবাস করেন, তাঁরা এ ব্যাপারে আরো বেশি মতভেদ এবং ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্ত হয়েছেন। সুতরাং আসুন, আমরা সকলে মিলে কোরআন শরীফের এমন একটা লিখিত নোস্‌খা তৈরী করি, যাতে মতভেদের কোন সুযোগ থাকবে না এবং সবার পক্ষেই সেটি অনুসরণ করা অপরিহার্য কর্তব্য বলে গণ্য হবে।

এ উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রা) সর্বপ্রথম উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর কাছ থেকে হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক লিপিবদ্ধ 'মাস্‌হাফগুলো' চেয়ে আনলেন। এ মাসহাফ সামনে রেখে সূরার তরতীবসহ কোরআনের শুদ্ধতম 'মাসহাফ' তৈরি করার উদ্দেশ্যে কোরআন

সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত চারজন মশহুর সাহাবী হযরত যায়েদ বিন সাবেত, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের, হযরত সায়ীদ ইবনুল-আস ও হযরত আবদুর রহমান বিন হারেস বিন হিশাম (রা) সমন্বয়ে গঠিত এক জামাতের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁদের প্রতি নির্দেশ ছিল হযরত আবূ বকর (রা) কর্তৃক সংকলিত মাস্‌হাফকেই শুধু এমন একটা সর্বসম্মত লিখন-পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা, যে লিপির সাহায্যে প্রতিটি শুদ্ধ ক্বেরাআত-পদ্ধতি অনুযায়ীই তেলাওয়াত করা সম্ভব হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত চারজন সাহাবীর মধ্যে হযরত যায়েদ (রা) ছিলেন আনসারী এবং অবশিষ্ট তিনজন কোরাইশ। হযরত উসমান (রা) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যদি লিখন পদ্ধতির ব্যাপারে হযরত যায়েদ (রা)-এর সাথে অন্য তিনজনের মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে কোরাইশদের লিপি পদ্ধতি অনুসরণ করবে। কারণ কোরআন যাঁর প্রতি নাযিল হয়েছিল, তিনি নিজে কোরাইশ ছিলেন। কোরাইশদের ব্যবহৃত ভাষাই কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে চারজন সাহাবীকে লেখার দায়িত্ব অর্পণ করা হলেও অন্য অনেককেই তাঁদের সাথে সাহায্যকারী হিসাবে যুক্ত করা হয়েছিল। তাঁরা কোরআন লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করেন ঃ

এক. হযরত আবূ বকর (রা)-এর উদ্যোগে লিখিত যে নোস্‌খাটি তৈরি করা হয়েছিল, তাতে সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে না সাজিয়ে প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক নোস্‌খায় লিখিত হয়েছিল। তাঁরা সবগুলো সূরাকে ক্রমানুপাতে একই 'মাসহাফ'-এ সাজিয়ে দেন। (মুস্‌তাদরাক, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৯)

দুই. আয়াতগুলো এমন এক লিখন পদ্ধতি অনুসরণে লেখা হয়, যাতে সবগুলো শুদ্ধ ক্বেরাআত পদ্ধতিতেই তা পাঠ করা যায়। এ কারণেই অক্ষরগুলোর মধ্যে নোক্‌তা এবং যের-যবর-পেশ সংযুক্ত হয়নি। (মানাহেলুল এরফান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪)

তিন. তখন পর্যন্ত কোরআনের সর্বসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য একটিমাত্র নোস্‌খা মওজুদ ছিল। তাঁরা একাধিক নোস্‌খা তৈরী করেন। সাধারণ বর্ণনামতে হযরত উসমান (রা) পাঁচখানা নোস্‌খা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু আবূ হাতেম সাজেস্তানী (রা)-এর মতে সাতটি নোস্‌খা তৈরি হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে একটি মক্কা শরীফে, একটি সিরিয়ায়, একটি ইয়ামানে, একটি বাহ্‌রাইনে, একটি বসরায় এবং একটি কূফায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশিষ্ট একটি নোস্‌খা বিশেষ যত্ন সহকারে মদীনা শরীফে সংরক্ষিত হয়েছিল। (ফতহুল-বারী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭)

চার. লেখার ব্যাপারে তাঁরা প্রধানত হযরত আবূ বকর (রা)-এর যমানায় লিখিত নোস্‌খা অনুসরণের সাথে অধিকতর সাবধানতাবশত ঐ সমস্ত পদ্ধতিও অনুসরণ করেন, হযরত আবূ বকর (রা)-এর যমানায় মূল পাণ্ডুলিপি তৈরি করার সময় যা অনুসৃত হয়েছিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যমানায় লিখিত যে সমস্ত অনুলিপি সাহাবীগণের নিকট সংরক্ষিত ছিল, সেগুলোও পুনরায় একত্র করা হয়। মূল অনুলিপির সাথে সেসব অনুলিপিও নতুনভাবে যাচাই করে দেখা হয়। সাহাবীগণের নিকট যেসব অনুলিপি ছিল, তন্মধ্যে সূরা আহযাব-এর এ আয়াত ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ .

শুধু হযরত খুযায়মা বিন সাবেত আনসারী (রা)-এর নোস্‌খায় লিখিত পাওয়া গিয়েছিল। এর অর্থ এ নয় যে, এ আয়াত অন্য কারো স্মরণ ছিল না কিংবা হযরত আবূ বকর (রা) কর্তৃক

সংকলিত অনুলিপিতে লিখিত ছিল না। কেননা, হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা) বর্ণনা করেন যে, মাসহাফ তৈরি করার সময় সূরা আহযাবের সে আয়াতটি বিচ্ছিন্ন কোন নোস্খাতেই পাওয়া যাচ্ছিল না, সেটি আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অনেকবার তেলাওয়াত করতে শুনেছি। এ বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এ আয়াত হযরত যায়েদ (রা)-সহ অনেক সাহাবীরই স্মরণ ছিল কিংবা এতদ্বারা একথাও বোঝায় না যে, এ আয়াত অন্য কোন লিপিতেও ছিল না। বরং হযরত আবূ বকর (রা) কর্তৃক তৈরি করা নোস্খায় এ আয়াত লিখিত ছিল। বিচ্ছিন্ন নোস্খাগুলো মূলের সাথে যাচাই করার সময় খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যমানায় সাহাবীগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগে যেসব নোস্খা লিখিত হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে এ আয়াত কেবল হযরত খুযায়মা বিন সাবেত (রা)-এর লিখিত নোস্খাতে পাওয়া গিয়েছিল।

পাঁচ. কোরআন পাকের এ সর্বসম্মত মাসহাফ তৈরি হওয়ার পর সমগ্র উম্মত এ মাসহাফ-এর ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর হযরত উসমান (রা) আগেকার বিক্ষিপ্ত সকল নোস্খা আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেন। কেননা এরপরও ব্যক্তিগত ও অবিন্যস্তভাবে লিখিত নোস্খাগুলো অবশিষ্ট থাকতে দিলে সূরার ক্রমানুপাতিক গ্রন্থনা এবং সর্বসম্মতভাবে প্রতিটি ক্বেরাআতে পাঠোপযোগী লিখন পদ্ধতির ব্যাপারে ঐকমত্য সৃষ্ট হওয়ার পরও পুনরায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা অবশিষ্ট থেকে যেতো।

হযরত উসমান (রা)-এর এ কাজকে সমগ্র উম্মত প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতভাবে এ কাজ সমাপ্ত করার ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা)-এর মন্তব্য, "উসমান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ভাল ছাড়া কিছু বলো না। কেননা আল্লাহর কসম! তিনি কোরআনের 'মাসহাফ' তৈরির ব্যাপারে যা কিছু করেছেন, তা আমাদের সামনে আমাদের পরামর্শেই করেছেন।" (ফতহুল-বারী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫)

তেলাওয়াত সহজ করার প্রচেষ্টা

হযরত উসমান (রা) কর্তৃক 'মাসহাফ' তৈরির কাজ চূড়ান্ত হওয়ার পর সমগ্র উম্মত ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, হযরত উসমান (রা) অনুসৃত লিখন পদ্ধতি ব্যতীত কোরআন শরীফ অন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণে লিপিবদ্ধ করা জায়েয নয়। ফলে পরবর্তীতে সমস্ত 'মাসহাফ'ই হযরত উসমান (রা)-এর লিখন পদ্ধতি অনুসরণে লিখিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ হযরত উসমান (রা)-এর তৈরি করা মাসহাফ-এর অনুলিপি তৈরি করেই দুনিয়ার সর্বত্র কোরআন-করীম ব্যাপকভাবে প্রচার করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যেহেতু মূল উসমানী অনুলিপিতে নোক্তা ও যের-যবর-পেশ ছিল না, সেজন্য অনারবদের পক্ষে এ মাসহাফ-এর তেলাওয়াত অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর ছিল। ইসলাম দ্রুত আরবের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে 'উসমানী' অনুলিপিতে নোক্তা ও যের-যবর-পেশ সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হতে শুরু করে। সর্বসাধারণের জন্য তেলাওয়াত সহজতর করার লক্ষ্যে মূল উসমানী 'মাসহাফ'-এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়। সংক্ষেপে প্রক্রিয়াগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

নোক্‌তা

প্রাচীন আরবদের মধ্যে হরফে নোক্‌তা সংযোজন করার রীতি প্রচলিত ছিল না। বস্তুত তখনকার দিনের লোকদের পক্ষে নোক্‌তাবিহীন লিপি পাঠ করার ব্যাপারে কোন অসুবিধাও হতো না। প্রসঙ্গ ও চিহ্ন দেখেই তাঁরা বাক্যের পাঠোদ্ধার করতে অভ্যস্ত ছিলেন। কোরআন শরীফের ব্যাপারে আদৌ কোন অসুবিধার আশংকা এজন্য ছিল না যে, কোরআন তেলাওয়াতে মোটেও অনুলিপি নির্ভর ছিল না। হাফেজগণের তেলাওয়াত থেকেই লোকেরা তেলাওয়াত শিক্ষা করতেন। হযরত উসমান (রা) মুসলিম জাহানের বিভিন্ন এলাকায় কোরআনের 'মাসহাফ' প্রেরণ করার সময় সাথে বিশিষ্ট তেলাওয়াতকারী হাফেজও প্রেরণ করেছিলেন, যেন লোকজনের মাসহাফের পাঠোদ্ধারের ব্যাপারে তাঁরা পথপ্রদর্শন করতে পারেন।

কোরআন করীমের হরফসমূহে সর্বপ্রথম নোক্‌তার প্রচলন কে করেছিলেন, এ সম্পর্কিত বর্ণনায় মতভেদ দেখা যায়। কোন কোন বর্ণনাকারীর মতে এ কাজ বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ তাবেয়ী হযরত আবুল আসওয়াদ দোয়ালী (র) আনজাম দেন। (আল-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫০)

অনেকের মতে, আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী এ কাজ হযরত আলী (রা)-এর নির্দেশে আনজাম দিয়েছিলেন। (সুবহুল-আ'শা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫)

কারো কারো মতে কুফার শাসনকর্তা যিয়াদ ইবনে সুফিয়ান আবুল-আসওয়াদকে দিয়ে এ কাজ করিয়েছিলেন। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত হাসান বসরী (র), হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়ামা'র ও হযরত নসর ইবনে আসেম লাইসী (র)-এর দ্বারা এ কাজ করিয়েছিলেন। (তাফসীরে কুরতুবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬)

হরকত

নোকতার ন্যায় প্রথম অবস্থায় কোরআন শরীফে হরকত বা যের-যবর-পেশ ইত্যাদিও ছিল না। সর্বপ্রথম কে হরকত-এর প্রবর্তন করলেন এ ব্যাপারেও বিরাট মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে সর্বপ্রথম হযরত আবুল-আসওয়াদ দোয়ালী হরকত প্রবর্তন করেন। আবার অনেকেরই অভিমত হচ্ছে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়ামা'র ও নসর ইবনে আসেম লাইসীর দ্বারা একাজ করিয়েছিলেন। (কুরতুবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩)

এ সম্পর্কিত সবগুলো বর্ণনা একত্র করে বিষয়টি আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করলে অনুমিত হয় যে, কোরআন শরীফের জন্য হরকত সর্বপ্রথম হযরত আবুল-আসওয়াদ দোয়ালীই আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত হরকতসমূহ আজকাল প্রচলিত হরকতের মত ছিল না। বরং যবর দিতে হলে হরফের উপরিভাগে একটা নোক্‌তা এবং যের দিতে হলে নিচে একটা নোক্‌তা বসিয়ে দেওয়া হতো। অনুরূপ পেশ-এর উচ্চারণ করার জন্য হরফের সামনে একটা নোকতা ও তানবীন-এর জন্য দু'টি নোকতা ব্যবহার করা হতো। আরো কিছুকাল পরে খলীল ইবনে আহমদ (র) হামযা ও তাশদীদের চিহ্ন তৈরি করেন। (সুবহুল-আ'শা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬১)

এরপর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ উদ্যোগী হয়ে হযরত হাসান বসরী (র), ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়া'মার ও নসর ইবনে আসেম লাইসী প্রমুখকে কোরআন শরীফে নোকতা ও হরকত প্রদানের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। হরকতগুলোকে আরো সহজবোধ্য করার জন্য উপরে, নিচে বা

পাশে অতিরিক্ত বিন্দু ব্যবহার করার হযরত আবুল আসওয়াদ প্রবর্তিত পদ্ধতির স্থলে বর্তমান আকারে হরকতের প্রবর্তন করা হয়, যেন হরফের নোকতার সঙ্গে হরকতের নোকতার সংমিশ্রণে জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

মন্‌যিল

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের অনেকেই সপ্তাহে অন্তত এক খতম কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। এজন্য তাঁরা দৈনিক তেলাওয়াতের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। সে পরিমাণকেই 'হেযব' বা মন্‌যিল বলা হতো। এ কারণেই কোরআন শরীফ সাত মন্‌যিলে বিভক্ত হয়েছে। (আল-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫০)

পারা

কোরআন শরীফ সমান ত্রিশটি খণ্ডে বিভক্ত। এ খণ্ডগুলোকে 'পারা' বলে অভিহিত করা হয়। পারার এ বিভক্তি অর্থ বা বিষয়বস্তুভিত্তিক নয় বরং পাঠ করার সুবিধার্থে সমান ত্রিশটি খণ্ড করে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা অনেক সময় দেখা যায়, কোন একটা প্রসঙ্গের মাঝখানেই এক পারা শেষ হয়ে নতুন পারা আরম্ভ হয়ে গেছে।

ত্রিশ পারায় বিভক্তি কার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, সে তথ্য উদ্ধার করা কঠিন। অনেকের ধারণা হযরত উসমান (রা) যখন কোরআন শরীফের অনুলিপি তৈরি করেন, তখন এ ধরনের ত্রিশটি খণ্ডে তা লিখিত হয়েছিল এবং তা থেকেই ত্রিশ পারার প্রচলন হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের কিতাবেই আমরা এ তথ্যের সমর্থন পাইনি। আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী (র) লিখেন, কোরআনের ত্রিশ পারা বহু আগে থেকেই চলে আসছে, বিশেষত মাদ্রাসায় শিশুদেরকে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রেই এ ত্রিশ পারার রেওয়াজ বেশি চলে আসছে। (আল-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫০; মানাহেলুল এরফান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০২)

মনে হয়, ত্রিশ পারার এ বিভক্তি সাহাবায়ে কিরামের যুগের পর শিক্ষাদান কার্যে সুবিধার জন্য করা হয়েছে।

আখমাস ও আ'শার

প্রাথমিক যুগের লিখিত কোরআন শরীফের নোস্‌খায় আরো দু'টি আলামত দেখা যেত। প্রতি পাঁচ আয়াতের পর পাতার পাশে خمس অথবা সংক্ষেপে শুধু خ হরফটি লেখা থাকত। অনুরূপ দশ আয়াতের পর عشر অথবা ع সংক্ষেপে লিখিত হতো। প্রথম চিহ্নটিকে 'আখমাস' এবং পরবর্তী চিহ্নটিকে আ'শার বলা হতো। (মানাহেলুল এরফান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৩)

কোরআন মরীফে এ ধরনের চিহ্ন ব্যবহার জায়েয কিনা, এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ হতে দেখা গেছে। কেউ কেউ এ ধরনের চিহ্ন ব্যবহার জায়েয এবং অনেকেই মকরূহ বলেছেন। সঠিকভাবে একথা বলাও মুশকিল যে, সর্বপ্রথম এ আলামতের প্রচলন কে করেছিলেন। কারো কারো মতে এ চিহ্ন ব্যবহারের প্রবর্তনকারী ছিলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এবং অন্য অনেকের মতে আব্বাসীয় বংশের খলীফা মামুন এ চিহ্নের প্রবর্তন করেছিলেন। (আল্-বোরহান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫১)

কিন্তু উপরিউক্ত দু'টি অভিমতই এজন্য শুদ্ধ বলে মনে হয় না যে, সাহাবায়ে কিরামের যুগেও আখমাস ও আ'শার-এর চিহ্ন পাওয়া যায়। হযরত মসরুক-এর এক বর্ণনায় রয়েছে যে,

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) মাসহাফের মধ্যে আ'শার-এর চিহ্ন সংজোযন করা মাকরূহ মনে করতেন। (ইবনে আবি শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯৩)।

রুকূ

'আখমাস' ও 'আ'শার'-এর আলামত পরবর্তী পর্যায়ে পরিত্যক্ত হয়ে অন্য একটা আলামতের ব্যবহার প্রচলিত হয়। বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রচলিত এ চিহ্নটিকে রুকূ বলা হয়। এ চিহ্নটি আয়াতে আলোচিত বিষয়বস্তুর অনুসরণে নির্ধারণ করা হয়েছে। একটা প্রসঙ্গ যেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে পৃষ্ঠার পাশে রুকূর চিহ্নস্বরূপ একটা ع অক্ষর অংকিত করা হয়।

এই চিহ্নটি কখন কার দ্বারা প্রচলিত হয়েছে, অনেক তালাশ করেও এ সম্পর্কিত কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হইনি। তবে বোঝা যায় যে, এ চিহ্ন দ্বারা আয়াতের এমন একটা মোটামুটি পরিমাণ নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য, যেটুকু সাধারণত নামাযের এক রাকাআতে পঠিত হতে পারে। নামাযে এতটুকু তেলাওয়াত করে রুকূ করা যেতে পারে, এদিকে লক্ষ্য রেখেই বোধ হয় একে রুকূ বলা হয়।

সমগ্র কোরআন শরীফে ৫৪০টি রুকূ রয়েছে। যদি তারাবীহ্‌র নামাযে প্রতি রাকাআতে এক রুকূ করে পড়া হয় তবে সাতাশে রাতে কোরআন খতম হয়ে যায়। (ফতাওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪, তারাবীহ অধ্যায়)

কয়েকটি যতিচিহ্ন

শুদ্ধ তেলাওয়াতের সুবিধার্থে আয়াতের মধ্যে কয়েক প্রকারের যতিচিহ্নের প্রচলন করা হয়েছে। এ চিহ্নগুলোর দ্বারা কোথায় থামতে হবে, কোন জায়গায় কিছুটা শ্বাস নেওয়া যাবে, এ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী জানা যায়। এ চিহ্নগুলোকে পরিভাষায় 'রুমূযে আওক্বাফ' বলা হয়। এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন আরবী না জানা লোকও যেন সহজে বুঝতে পারেন, কোথায় কতটুকু থামতে হবে। কোনখানে থামলে পর অর্থের বিকৃতি ঘটতে পারে। এ চিহ্নগুলোর অধিকাংশ আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর সাজাওয়ান্দী কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল। (আন্-নশরু ফী ক্বেরাআতিল-আশ্‌র, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৫)

চিহ্নগুলো নিম্নরূপ

ط = 'ওয়াকফ মতলক্ব' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ বাক্য পূর্ণ হয়ে গেছে। এখানে থামাটাই উত্তম।

ج = 'ওয়াকফ-জায়েয' শব্দের সংক্ষেপ। অর্থ এখানে থামা যেতে পারে।

ز = 'ওয়াক্‌ফ মুযাওয়ায'-এর সংক্ষেপ। অর্থ এখানে থামা যেতে পারে, তবে না থামাই উত্তম।

ص = 'ওয়াক্‌ফ মুরাখ্‌খাছ'-এর সংক্ষেপ। অর্থ এখানে আয়াত শেষ হয়নি। তবে বাক্য যেহেতু দীর্ঘ হয়ে গেছে, তাই যদি দম নেওয়ার জন্য থামতে হয়, তবে এখানেই থামা উচিত। (আল-মানুহুল-ফিকরিয়্যা, পৃ. ৬৩)

م = 'ওয়াক্‌ফ লাযেম'-এর সংক্ষেপ। অর্থ যদি এখানে থামা না যায়, তবে অর্থের মধ্যে মারাত্মক ভুল হওয়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং এখানে থামাই উচিত। কেউ কেউ একে ওয়াকফে ওয়াজিব বলেছেন। কিন্তু এ ওয়াজিবের অর্থ এ নয় যে, এখানে না

থামলে গোনাহ হবে। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতগুলো যতিচিহ্ন রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এখানে থামাই সর্বোত্তম। (আন্-নশর, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩১)

لا = 'লা তা'কেফ' শব্দের সংক্ষেপ। অর্থ এখানে থামা যাবে না। তবে থামা একেবারেই নাজায়েয, তা নয়। বরং এ চিহ্নবিশিষ্ট এমন অনেক স্থান রয়েছে, যেখানে থামা মোটেও দূষণীয় নয় এবং এর পরবর্তী শব্দ থেকে আয়াতের তেলাওয়াত শুরু করা যেতে পারে। তবে এখানে থামলে সামনে অগ্রসর হওয়ার সময় পুনরায় আগের আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া উত্তম। (আন্-নশর, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩)

উপরিউক্ত যতিচিহ্নগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত করেই বলা চলে যে, এগুলো আল্লামা সাজাওয়ান্দী কর্তৃক প্রবর্তিত। কিন্তু এগুলো ছাড়া আরো কয়েকটি চিহ্ন কোরআনের আয়াতের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

ع = 'মোয়নাকা' শব্দের সংক্ষেপ। যে আয়াতে দু'ধরনের তফসীর হতে পারে, সেরূপ স্থানে এ চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক তফসীর অনুযায়ী এখানে বাক্য শেষ এবং অন্য তফসীর অনুযায়ী পরবর্তী চিহ্নে বাক্য শেষ বোঝায়। সুতরাং দু'জায়গার যে কোন এক স্থানে থামা যেতে পারে। তবে এক জায়গায় থামার পর পরবর্তী চিহ্নটিতেও থামা জায়েয হবে না। যেমন—

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ. وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ. كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهُ...

এ আয়াতে যদি তওরাত শব্দের মধ্যে ওয়াক্‌ফ করা হয়, তবে 'ইনজীল' শব্দের ওয়াক্‌ফ করা জায়েয হবে না। অপরপক্ষে, যদি ইনজীল শব্দে এসে থামতে হয়, তবে আগের তওরাত শব্দে থামা জায়েয হবে না। উভয় স্থানের একটিতেও যদি না থামা হয়, তবে তাতেও কোন দোষ হবে না। চিহ্নটির আর এক নাম মোকাবিলাও ব্যবহৃত হয়। এ চিহ্নটি ইমাম আবুল ফযল রাযী (র) প্রচলন করেছেন। (আন-নশর, পৃ. ১৩৭; আল-এত্‌কান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮)

سكته চিহ্নটির নির্দেশ হচ্ছে শ্বাস না ছেড়ে কিছুটা থামা দরকার। যেখানে একটু না থেমে পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পাঠ করলে অর্থের ব্যাপারে ভুল বোঝবার অবকাশ রয়েছে– এ ধরনের জায়গায় চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়।

وقفه এ চিহ্নযুক্ত স্থানে সেক্‌তার চাইতে একটু বেশি সময় থামতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শ্বাস ছুটে না যায়।

ق কারো কারো মতে এ চিহ্নযুক্ত স্থানে থামা যেতে পারে।

قف অর্থ, এখানে থামো। চিহ্নটি এমন স্থানে ব্যবহৃত হয়, যেখানে তেলাওয়াতকারীর মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, বোধ হয় এখানে থামা যাবে না।

صلے 'আল-ওয়াসলু আওলা' বাক্যটির সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ পূর্বাপর দু'টি বাক্য মিলিয়ে পড়া ভাল।

صل ক্বাদয়ূসালু–বাক্যের সংক্ষেপ। অর্থ কারো কারো মতে মিলিয়ে পড়া উত্তম এবং কারো কারো মতে থেমে যাওয়া ভাল।

وقف النبى صلى الله عليه وسلم — বাক্যটি এমন স্থানে লেখা হয়, যেখানে কোন কোন বর্ণনামতে প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তেলাওয়াত করার সময় এখানে থেমেছিলেন।

কোরআনের মুদ্রণ ঃ মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন হওয়ার আগ পর্যন্ত কোরআন শরীফ হাতে লেখা হতো। যুগে যুগেই এমন একদল নিবেদিতপ্রাণ লোক ছিলেন, যাঁদের একমাত্র সাধনা ছিল কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করা। কোরআনের প্রতিটি অক্ষর সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করার লক্ষ্যে এ সাধক লিপিকারগণ যে অনন্য সাধনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, ইতিহাসে তার অন্য কোন নযীর নেই। কোরআনের সে লিপি সৌন্দর্যের ইতিহাস এতই দীর্ঘ যে, এজন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা যেতে পারে।

মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর সর্বপ্রথম জার্মানীর হামবুর্গ শহরে হিজরী ১১১৩ সনে কোরআন শরীফ মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত সেই কোরআনের একটি নোস্‌খা মিসরের দারুল-কুতুবে এখনো রক্ষিত রয়েছে। এরপর প্রাচ্যবিদদের অনেকেই ছাপাখানার মাধ্যমে কোরআন শরীফ মুদ্রণ করেন। কিন্তু মুসলিম জাহানে সে সমস্ত মুদ্রিত কোরআন শরীফ মোটেও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলায়ে উসমান কর্তৃক রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে কোরআন শরীফ মুদ্রিত হয়। প্রায় একই সময়ে কাযান শহর থেকেও একটি নোস্‌খা মুদ্রিত হয়।

১৮২৮ খৃস্টাব্দে ইরানের তেহরানে লিথু মুদ্রণযন্ত্রে কোরআন শরীফের আর একটি নোস্‌খা মুদ্রিত হয়। এরপর থেকে দুনিয়ার অন্যান্য এলাকাতেও ব্যাপকভাবে ছাপাখানার মাধ্যমে কোরআনের নোস্‌খা মুদ্রণের রেওয়াজ প্রচলিত হয়। (তারীখুল কোরআন, কুর্দি, পৃ. ১৮৬; ডক্টর ছাবহী ছালেহ্ লিখিত গ্রন্থের গোলাম আহমদ হারিরী কৃত উর্দু তরজমা, পৃ. ১৪২)

ইলমে তফসীর

প্রসঙ্গক্রমে ইলমে তফসীর সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। আরবী ভাষায় 'তফসীর' অর্থ উদ্‌ঘাটন করা বা খোলা। পরিভাষায় ইলমে তফসীর বলতে সেই ইল্‌মকে বোঝায়, যার মধ্যে কোরআন মজীদের অর্থসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে বর্ণনা করা হয় এবং কোরআনের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত সকল জ্ঞাতব্য বিষয় ও জ্ঞান-রহস্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ .

—"আমি আপনার নিকট উপদেশ (গ্রন্থ, কোরআন) এজন্যই অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি মানুষের সামনে তাদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ বাণীসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন।"

পবিত্র কোরআনে আরও উক্ত হয়েছে ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি এটা বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের সামনে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ

পাঠ করেন এবং তাদের (অন্তরকে নাফরমানীর পঙ্কিলতা থেকে) পবিত্র করেন, তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব ও প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্বসমূহ শিক্ষা দেন।"

অতএব, মহানবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে শুধু কোরআনের শব্দই শিক্ষা দিতেন না, এর পুরো তফসীরও বর্ণনা করতেন। এ কারণেই প্রথম যুগের মুসলমানদের এক একটি সূরা পড়তে কোন কোন সময় কয়েক বছর লেগে যেত।

মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় কোন আয়াতের তফসীর অবগত হওয়া কোন সমস্যা ছিল না। কোন আয়াতের অর্থ বুঝতে যখনই কোন জটিলতা দেখা দিত, সাহাবায়ে কিরাম মহানবী (সা)-এর শরণাপন্ন হতেন। তাঁর কাছ থেকে তাঁরা সন্তোষজনক জবাব পেয়ে যেতেন। কিন্তু হযরত (সা)-এর তিরোধানের পর কোরআনের শব্দাবলীর সাথে সাথে এর নির্ভুল অর্থও যাতে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং বিধর্মী পথভ্রষ্টদের পক্ষে এর অর্থ ও প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিকৃতি সাধনের কোন প্রকার অবকাশ না থাকে, সেজন্য কোরআনের তফসীরকে একটি স্বতন্ত্র ইলম আকারে সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে মুসলিম মনীষীগণ এ মহান দায়িত্বটি এত সুন্দর ও সুবিন্যস্তভাবে সম্পন্ন করেছেন যে, আজ কোনরূপ প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করেই আমরা বলতে পারছি যে, আল্লাহ্র এই শেষ গ্রন্থের শুধু শব্দাবলীই সংরক্ষিত থাকেনি, তার নির্ভুল তফসীর বা ব্যাখ্যা যা মহানবী (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণের দ্বারা আমাদের নিকট পৌঁছেছে তাও সুসংরক্ষিত আছে।

মুসলিম জাতি কিভাবে 'ইল্‌মে তফসীর' সংরক্ষণ করল, এ ক্ষেত্রে তাদের কি পরিমাণ শ্রম-মেহনত ব্যয়িত হয়েছে এবং চেষ্টা-সাধনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে, তার এক চিত্তাকর্ষক ইতিহাস রয়েছে। সে ইতিহাস বর্ণনার অবকাশ এখানে কম। তবে কোরআন তফসীরের ব্যুৎপত্তিস্থল কি কি, 'ইল্‌মে তফসীর' সম্পর্কে প্রতিটি ভাষায় যে অগণিত গ্রন্থ রয়েছে, ঐগুলোর লেখকগণ কোরআন শরীফের ব্যাখ্যায় কোন্ কোন্ উৎস থেকে সাহায্য নিয়েছেন, এখানে সংক্ষিপ্তভাবে সেগুলো কিছুটা বর্ণনা করা যেতে পারে।

ইল্‌মে তফসীর-এর মূল উৎস মোট ছয়টি

১. কোরআন মজীদ ঃ ইল্‌মে তফসীর-এর প্রথম উৎস হচ্ছে কোরআন মজীদ। কোরআনে এ ধরনের এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, কোন আয়াতে হয়তো কোন কথা অস্পষ্ট বা সংক্ষেপে বলা হয়েছে যা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কিন্তু অপর আয়াতে উক্ত আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন সূরা ফাতিহার দোয়া সম্পর্কিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ "আমাদেরকে ঐ সকল লোকের রাস্তা দেখাও, যাঁদের তুমি পুরস্কৃত করেছ।" কিন্তু এখানে এটা সুস্পষ্ট নয় যে, ঐ সকল লোক কারা, যাদের আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেছেন। তাই অপর এক আয়াতে সেসব ব্যক্তিকে এই মর্মে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে ঃ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ط

"তারাই হচ্ছেন সেই সব লোক, যাঁদেরকে আল্লাহ্ নিয়ামত দান করেছেন, তাঁরা বিভিন্ন নবী-রসূল, সিদ্দিকীন, শহীদ ও সৎকর্মশীল।"

মুফাস্সিরগণ কোন আয়াতের তফসীর করার সময় সর্বপ্রথম এটা লক্ষ্য করেন যে, সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা খোদ কোরআন মজীদের অপর কোন আয়াতে রয়েছে কিনা। যদি থাকে তাহলে ব্যাখ্যা হিসাবে ঐ আয়াতকেই গ্রহণ করে থাকেন। যদি কোরআনে সে আয়াতের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া না যায়, তবেই অন্যান্য উৎসের মধ্যে ব্যাখ্যা তালাশ করা বিধেয়।

২. হাদীস ঃ মহানবী (সা)-এর বক্তব্য এবং কার্যাবলীকে 'হাদীস' বলা হয়। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মজীদের বাহকরূপে তাঁকে এজন্যই প্রেরণ করেছেন যে, তিনি মানব জাতির সামনে সুস্পষ্টভাবে কোরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা তুলে ধরবেন। কাজেই আল্লাহ্র রাসূল নিজের কথা ও কাজ উভয় বিষয়েই এ মহান দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ও সুপরিকল্পিতভাবে পালন করেছেন। বস্তুত মহানবী (সা)-এর গোটা জীবনই ছিল কোরআন মজীদের বাস্তব ও জীবন্ত ব্যাখ্যা। এজন্য মুফাস্সিরগণ কোরআন মজীদ অনুধাবনের জন্য দ্বিতীয় উৎস হিসেবে হাদীসের প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিভিন্ন হাদীসের আলোকেই আল্লাহ্র কিতাবের অর্থ নির্ধারণ করেছেন। অবশ্য হাদীসের মধ্যে 'সহীহ', 'যয়ীফ' ও 'মওযু' প্রভৃতি ধরনের বর্ণনা আছে বলে সত্যানুসন্ধানী মুফাস্সিরগণ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতার পরীক্ষা নির্ধারিত মূলনীতির মানদণ্ডে হতো। কাজেই কোথাও কোন হাদীস পেয়েই বাছবিচার ব্যতিরেকে তার আলোকে কোরআনের কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা স্থির করে ফেলা বৈধ নয়। কারণ হতে পারে, উক্ত হাদীসের প্রমাণ-সূত্র দুর্বল এবং অপর প্রামাণ্য হাদীসের পরিপন্থী। আসলে এ ব্যাপারটি অত্যন্ত নাজুক। এ ব্যাপারে কেবল সে সকল লোকই হস্তক্ষেপ করতে পারেন, যাঁরা নিজেদের সমগ্র জীবনকে এই হাদীসশাস্ত্র আয়ত্তে আনার জন্য নিয়োজিত রেখেছেন।

৩. সাহাবীগণের বক্তব্য ঃ সাহাবায়ে কিরাম মহানবী (সা) থেকে সরাসরি কোরআনের শিক্ষা লাভ করেছেন। এ ছাড়া ওহী নাযিলের যুগে তাঁরা বেঁচে ছিলেন। কোরআন নাযিলের গোটা পরিবেশ ও পটভূমি প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের সামনে ছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই কোরআন মজীদের ব্যাখ্যা বা তফসীরের বেলায় তাঁদের বক্তব্য যত প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য হবে, পরবর্তী লোকদের কিছুতেই সে মর্যাদা থাকার কথা নয়। অতএব যে সকল আয়াতের ব্যাখ্যা কোরআন বা হাদীস থেকে জানা যায় না, সেক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যই হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বের অধিকারী। কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবীগণ ঐকমত্যে পৌঁছুলে মুফাস্সিরগণ তাঁদের সে সর্বসম্মত ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া সেক্ষেত্রে ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা দান বৈধও নয়। তবে হ্যাঁ, কোনো আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যদি সাহাবীগণের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে থাকে, সে ক্ষেত্রে পরবর্তী তফসীরকারগণ অন্য প্রমাণাদির আলোকে এটা পরীক্ষা করে দেখতেন যে, ঐগুলোর কোন্ মতটিকে প্রাধান্য দেওয়া যায় ? এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই বহু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছে। রচিত হয়েছে 'উসূলে-ফিকাহ্' 'উসূলে-হাদীস' ও 'উসূলে-তফসীর'। সেসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে অনুপস্থিত।

৪. তাবেয়ীদের বক্তব্য ঃ এ ব্যাপারে সাহাবাগণের পরবর্তী মর্যাদা হলো তাবেয়ীনদের। যে সব মহৎ ব্যক্তি সাহাবীগণের মুখ থেকে কোরআনের ব্যাখ্যা শোনার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদেরকেই 'তাবেয়ী' বলা হয়। এ কারণে তাবেয়ীগণের বক্তব্যও তফসীরশাস্ত্রে বিরাট গুরুত্বের অধিকারী। অবশ্য তাবেয়ীগণের বক্তব্য তফসীরের ক্ষেত্রে দলীল কিনা এ নিয়ে বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। (আল-এতক্বান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯) তবে তফসীরের ক্ষেত্রে তাবেয়ীগণের বক্তব্যের গুরুত্ব যে অত্যন্ত বেশি, সে ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেন নি।

৫. আরবী সাহিত্য ঃ কোরআন মজীদ যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ সেহেতু কোরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উক্ত ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা একান্ত জরুরী। কোরআনে এমন অসংখ্য আয়াত আছে যেগুলোতে শানে-নুযূল (পটভূমি) কিংবা অপর কোন ফেকহী বা বিশ্বাস সংক্রান্ত কোন জটিলতা থাকে না। সেগুলোর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিংবা সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের বক্তব্যও না থাকায় একমাত্র আরবী সাহিত্যের ভাবধারা অবলম্বন করেই ঐ সকল আয়াতের তফসীর করা হয়। এ ছাড়া কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় যদি কোন প্রকার মতবৈষম্য থাকে, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন মতের মধ্য থেকে গ্রহণযোগ্য মত নির্ধারণে সিদ্ধান্তের বেলায়ও আরবী সাহিত্য থেকে সাহায্য নিতে হয়।

৬. চিন্তা-গবেষণা ও উদ্ভাবন ঃ তফসীরের সর্বশেষ উৎস হলো চিন্তা-গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তি। কোরআন মজীদের সূক্ষ্ম রহস্যাবলী ও তাৎপর্য এমন একটি অকূল সমুদ্র, যার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদান করেছেন, সে তাতে যতই চিন্তা-গবেষণা করবে, ততই নিত্য নতুন রহস্যাবলী তার সামনে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকবে। তফসীরকারকগণ নিজ নিজ উদ্ভাবনী প্রতিভা ও গবেষণার ফলাফল নিজেদের তফসীরসমূহে বর্ণনা করেছেন। তবে এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন সে ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত পাঁচটি উৎসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। অতএব, কোন ব্যক্তি যদি কোরআনের এমন কোন ব্যাখ্যা পেশ করে যা কোরআন, সুন্নাহ্, ইজমা বা সাহাবী-তাবেয়ীদের বক্তব্যের পরিপন্থী ও আরবী ভাষাগত তথ্যের বরখেলাফ হয় অথবা শরীয়তের অপর কোন মূলনীতির বিপরীত হয়, তা হলে ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। সূফীগণের কেউ কেউ কোরআন মজীদের তফসীরে এ জাতীয় নব নব রহস্য বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু মুসলিম মিল্লাতের কোরআন-সুন্নাহ্ বিশারদ সুপণ্ডিত উলামায়ে কিরাম সেগুলোকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। কারণ ইল্‌মে-তফসীরের ক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নাহ্ এবং শরীয়তের মৌল নীতিসমূহের পরিপন্থী কারও কোন ব্যক্তিগত মতের কোনই মূল্য নেই।

ইসরাইলী বর্ণনা সম্পর্কে নির্দেশ

'ইসরাইলিয়াত' বা ইসরাইলী বর্ণনা বলতে ঐ সকল বর্ণনা বোঝায়, যেগুলোর প্রমাণ-সূত্রের গোড়ায় আহ্‌লে-কিতাব অর্থাৎ ইহুদী খৃস্টান বর্ণনাকারীগণ রয়েছে। প্রথম যুগের মুফাস্‌সিরগণ আয়াতের নিচে এমন সকল প্রকার বর্ণনাই (রেওয়ায়েত) লিখে দিতেন, যেগুলো সনদ সহকারে তাঁদের কাছে পৌঁছাতো। সেগুলোর মধ্যে অনেক বর্ণনা ছিল ইসরাইলিয়াত তথা আহ্‌লে-কিতাবদের বর্ণিত। কাজেই সেগুলোর সত্যাসত্য সম্পর্কেও অবহিত হওয়া একান্ত জরুরী। এ জাতীয় বর্ণনার উৎস তালাশ করলে দেখা যায়, যেসব সাহাবী বা তাবেয়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আহলে-কিতাব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাঁদের সেই আগেকার জ্ঞানসূত্র থেকে প্রধানত এসব

বর্ণনা ইল্‌মে-তফসীরে অনুপ্রবেশ করেছে। কোরআন মজীদে অতীত জাতিসমূহের এমন বহু ঘটনা বর্ণিত আছে, যেগুলো তাঁরা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে পড়ে এসেছিলেন। কোরআনে উল্লিখিত এ সকল ঘটনা আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা আহ্‌লে কিতাব সূত্র থেকে প্রাপ্ত বর্ণনাগুলোরও উল্লেখ করতেন। এসব বর্ণনাকেই মুফাস্‌সিরগণ 'ইসরাইলিয়াত' নামে চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

হাফেজ ইবনে কাসীর (র) একজন বিচক্ষণ ও বিশিষ্ট মুফাস্‌সির ছিলেন। তিনি 'ইসরাইলিয়াত'-কে তিন ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

(১) যে সকল বর্ণনা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অপরাপর দলীলাদি দ্বারা প্রমাণিত। যেমন- ফিরাউনের ডুবে মরা এবং হযরত মূসা (আ)-এর তূর পর্বতে গমন প্রভৃতি।

(২) যেসব বর্ণনা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রমাণাদি দ্বারা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন। যেমন, ইসরাইলী বর্ণনাসমূহে উল্লেখ আছে যে, হযরত সুলায়মান (আ) তাঁর শেষ বয়সে (নাউযুবিল্লাহ্) মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছিলেন। খোদ কোরআন মজীদ তার প্রতিবাদ করে ঘোষণা করেছে ঃ

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ۔

"সুলায়মান আল্লাহ্‌র অবাধ্য হননি, বরং শয়তানরাই আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে।" এমনি ধরনের আরও দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, ইসরাইলী বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, (নাউযুবিল্লাহ্) হযরত দাউদ (আ) তাঁর সেনাপতি 'উরিয়া'-র স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছিলেন কিংবা নানা ফন্দি-ফিকির করে তাকে হত্যা করিয়ে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন। এটাও একটা নিছক মিথ্যা অলীক বর্ণনা। এ ধরনের বর্ণনাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা জ্ঞান করা অপরিহার্য।

(৩) যেসব বর্ণনার ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহ্ ও শরীয়তের অন্যান্য দলীল-প্রমাণ নীরব। যেমন, তওরাতের বিধান ইত্যাদি বর্ণনা সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর শিক্ষা হলো নীরব থাকা। এগুলোর ব্যাপারে সত্য-মিথ্যা কোন মন্তব্য না করা। অবশ্য এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে যে, এ সকল বর্ণনা সকল করা বৈধ কিনা। হাফেজ ইবনে কাসীরের মতে এ জাতীয় রেওয়ায়েতের বর্ণনা বৈধ বটে, কিন্তু তাতে কোন ফায়দা নেই। কারণ শরীয়তের দিক থেকে এসব বর্ণনা প্রমাণযোগ্য নয়। (মোকাদ্দমা-এ ইবনে কাসীর)

তফসীর সম্পর্কে ভুল ধারণার অপনোদন

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কোরআনের ব্যাখ্যার ব্যাপারটি অত্যন্ত নাজুক ও জটিল কাজ। এজন্য শুধু আরবী ভাষা জানাই যথেষ্ট নয়। কোরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য সকল শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা থাকতে হবে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, যিনি কোরআনের ব্যাখ্যা বা তফসীর করবেন, তাঁকে নিম্নলিখিত শাস্ত্রসমূহে পারদর্শী হতে হবে ঃ

(১) আরবী ভাষার ব্যাকরণ (২) অলঙ্কারশাস্ত্র (৩) আরবী ভাষা-সাহিত্য ছাড়াও (৪) হাদীসশাস্ত্র (৫) ফিকাহ্‌শাস্ত্র (৬) তফসীরশাস্ত্র এবং (৭) আকায়েদ ও কালামশাস্ত্রের ব্যাপারে ব্যাপক ও গভীর ব্যুৎপত্তি থাকতে হবে। এ সকল জ্ঞানশাস্ত্রের সাথে সম্পর্ক-বর্জিত কোন ব্যক্তি কোরআনের ব্যাখ্যা দানে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে না।

পরিতাপের বিষয় যে, কিছুকাল থেকে মুসলমানদের মাঝে এ মারাত্মক ব্যাধি এমন মহামারী আকারে চলে আসছে যে, অনেক লোক শুধু আরবী পড়াকেই কোরআন তফসীরের জন্য যথেষ্ট বলে ধরে নিয়েছে। ফলে যে কোন লোকই আজকাল আরবী ভাষায় মামুলী জ্ঞান অর্জন করেই কোরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করে দেয়। কোন কোন সময় এমনও দেখা গেছে যে, এক ব্যক্তি হয়তো আরবী ভাষায় তার সামান্য কিছু জ্ঞান ছাড়া দক্ষতা নেই, কিন্তু সে কেবল মনগড়াভাবেই কোরআনের ব্যাখ্যা শুরু করে না বরং পূর্ববর্তী মুফাস্‌সিরগণেরও ভুলভ্রান্তি বের করতে শুরু করে দেয়। আরও মজার ব্যাপার এই যে, শুধু অনুবাদ পড়েই অনেকে নিজেকে কোরআন সম্পর্কে মস্ত বড় আলিম মনে করতে থাকে এবং বড় বড় মুফাস্‌সিরের সমালোচনা করতে একটুও দ্বিধা করে না।

বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, এটা অত্যন্ত ভয়াবহ প্রবণতা। দীনের ব্যাপারে এটা ধ্বংসাত্মক বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকেফহাল এমন যে কোন ব্যক্তি এটা বুঝে যে, এক ব্যক্তি শুধু ইংরেজী ভাষা শিখে তার সাহায্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কয়েকটি বড় বড় বই পড়ে নিলেই দুনিয়ার কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি তাকে চিকিৎসক হিসাবে মেনে নেবে না এবং (রোগী হয়ে) নিজের জীবনকে সে ব্যক্তির হাতে সঁপে দেবে না। চিকিৎসক হতে হলে তাকে যথারীতি চিকিৎসা সম্পর্কিত মহাবিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়তে হবে। হাতে-কলমে চিকিৎসার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। তেমনিভাবে কোন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রের বই পড়ে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, তাহলে দুনিয়ার কোন সচেতন মানুষ তাকে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে স্বীকৃতি দেবে না। কারণ ইংরেজী ভাষা জানা আর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা এক কথা নয়। এ কাজ শুধু ভাষা জানার দ্বারা হয় না। এজন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের অধীনে যথারীতি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ পূর্বশর্ত। ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে যদি এসব কঠোর শর্ত পালন জরুরী হয়, সেক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার ব্যাপারেও কেবল আরবী ভাষা জেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। জীবনের সকল স্তরের মানুষ এই মূলনীতির ব্যাপারে সচেতন এবং সে অনুযায়ী কাজও করে। প্রতিটি বিদ্যা ও শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একটি বিশেষ পদ্ধতি এবং এর জন্য কিছু পূর্বশর্ত থাকে। ঐ সকল পদ্ধতি ও পূর্বশর্ত পূরণ ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিদ্যা বা শাস্ত্রের ব্যাপারে তার মতামতকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না। এ ছাড়া কোরআন-হাদীস এতই লা-ওয়ারিশ নয় যে, এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে কোন ইল্‌ম বা বিদ্যা অর্জনের প্রয়োজন হবে না এবং যার যেমন খুশি এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করে দেবে। কেউ কেউ বলেন, খোদ কোরআন মজীদেই রয়েছে যে,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ ۔

"নিঃসন্দেহে আমি কোরআন মজীদকে উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সহজ করে দিয়েছি।" কাজেই কোরআন একটি সহজ গ্রন্থ হওয়ায় এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য লম্বা-চওড়া ইল্‌ম বা বিদ্যার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ ধরনের যুক্তি মস্তবড় বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। জ্ঞানের অগভীরতা ও বিষয়ের ভাসাভাসা ধারণাই হচ্ছে এ যুক্তির ভিত্তি। আসল ব্যাপার হলো, কোরআনের আয়াতসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত।

১. কিছু আয়াত আছে যেগুলোতে সাধারণ উপদেশের কথা, শিক্ষামূলক ঘটনাবলী, শিক্ষা ও নসীহতমূলক বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, এ বস্তুজগতের স্থায়িত্বহীনতা, বেহেশ্‌ত-

দোযখের অবস্থা, আল্লাহ্র ভয়, পরকালের চিন্তা জাগ্রতকারী বিভিন্ন কথা, জীবনের অন্যান্য সহজ-সরল, সত্য ও বাস্তব বিষয়বস্তুসমূহ ইত্যাদি। এ ধরনের আয়াতসমূহ সত্যিই সহজ-সরল। আরবী ভাষা সম্পর্কে অবগত যে কোন ব্যক্তিই এসব আয়াত বুঝতে এবং এগুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে এ ধরনের শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ আমি এগুলো সহজ করে দিয়েছি। খোদ আয়াতে বর্ণিত لِلذِّكْرِ (উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে) শব্দও একথাই বোঝায়।

২. পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতসমূহ হলো বিধি-বিধান, আইন-কানুন, আকীদা-বিশ্বাস ও জ্ঞানমূলক বিষয়সম্বলিত। এ ধরনের আয়াতসমূহ যথাযথভাবে অনুধাবন এবং সেগুলো থেকে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ ও নিয়ম-বিধিসমূহের উদ্ভাবন করা যে কোন ব্যক্তির কাজ নয়। এজন্য ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে একজন লোককে পূর্ণ দক্ষতা ও প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। বস্তুত এ কারণেই সাহাবায়ে কিরামের মাতৃভাষা আরবী হওয়া এবং আরবী শিক্ষার জন্য অপর কোন স্থানে যাবার প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা মহানবী (সা)-এর নিকট দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোরআন শিক্ষা করতেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ইমাম আবূ আবদুর রহমান সিল্‌মী থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে যথারীতি কোরআন মজীদ শিক্ষা করেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত উসমান (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রা) প্রমুখ আমাদের বলেছেন ঃ আমরা যখন কোরআন মজীদের দশটি আয়াত শিখতাম তখন এসব আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানমূলক ও ব্যবহারিক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ত্তে আনার পূর্বে রাসূল (সা)-এর সামনে যেতাম না। তিনি বলতেন ঃ

تعلمنا القران والعلم والعمل جميعا .

"আমরা কোরআন এবং জ্ঞান ও ব্যবহার পদ্ধতি (আমল) এক সাথেই শিখেছি।"

হাদীসগ্রন্থ 'মুআত্তা-এ-ইমাম মালেক'-এ বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) একমাত্র সূরা বাক্বারাহ শিখতেই দীর্ঘ আট বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তেমনিভাবে মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রা) বলেছেন, আমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি সূরা বাক্বারাহ এবং সূরা আল-ইমরান পড়ে ফেলতেন, আমাদের কাছে তাঁর মর্যাদা অনেক বেড়ে যেতো। (এতক্বান, ২য়খণ্ড, পৃ. ১৭৬)

লক্ষণীয় যে, যে সকল সাহাবীর মাতৃভাষা ছিল আরবী, যারা কাব্য ও সাহিত্য চর্চায় পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন—সামান্য মনোযোগের দ্বারা যাঁরা দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ করে ফেলতেন—কোরআন শিক্ষা ও তার ভাবার্থ বোঝার জন্যে তাঁদেরকেও এত দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করতে হতো, যার জন্য মাত্র একটি সূরা পড়তেই দীর্ঘ আট বছর লেগে যেতো। তার একমাত্র কারণ ছিল এই যে, কোরআন মজীদ এবং তার অন্তর্নিহিত জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্তে আনার জন্যে শুধু আরবী ভাষার উপর দক্ষতাই যথেষ্ট ছিল না, বরং এজন্য হযরত (সা)-এর সংসর্গ ও তাঁর শিক্ষাদান থেকে উপকৃত হওয়াও জরুরী ছিল। অতএব এটা স্পষ্ট কথা যে, সাহাবায়ে কিরামকে যখন আরবী ভাষায় দক্ষতা ও ওহী নাযিলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও 'কোরআনের আলিম' হবার জন্য যথারীতি হুযূর (সা) থেকে শিক্ষা লাভ করার দরকার ছিল, তখন কোরআন নাযিলের প্রায় দেড় হাজার বছর পর আরবী ভাষায় মামুলী জ্ঞান অর্জন করে কিংবা শুধু অনুবাদ পড়েই কোরআনের মুফাস্‌সির হবার দাবি যে কত বড় ঔদ্ধত্য এবং ইলমে দীনের সাথে কিরূপ

দুঃখজনক বিদ্রূপ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ধরনের ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের মহানবী (সা)-এর বাণীটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত ঃ

من قال فى القران بغير علم فليتبوا مقعده فى النار .

"যে ব্যক্তি ইল্‌ম ছাড়া কোরআনের ব্যাপারে বক্তব্য রাখে, সে যেন জাহান্নামেই নিজের স্থান করে নেয়।" (আবূ দাউদ, ইতকান)

হযরত (সা) আরও বলেছেন ঃ

من تكلم فى القران برأيه فاصاب فقد اخطأ.

"কোরআনের ব্যাপারে যে নিজের রায়ে কথা বলে তার বক্তব্য শুদ্ধ হলেও বক্তার পক্ষে তা অমার্জনীয় অপরাধ।"

কতিপয় প্রসিদ্ধ তফসীর

মহানবী (সা)-এর তিরোধানের পর অসংখ্য তফসীরগ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কোরআন মজীদের উপর এত অধিক গবেষণা ও ব্যাখ্যা-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, বিশ্বের কোনো (ধর্ম) গ্রন্থের ব্যাপারে তা হয়নি। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা তো দূরের কথা একটি দীর্ঘ ও বিস্তারিত গ্রন্থে ঐ সকল তফসীরের পরিচিতি দান সম্ভব নয়। তবে আমি শুধু এখানে ঐ সকল গুরুত্বপূর্ণ তফসীর গ্রন্থেরই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরতে চাই, যেগুলোর থেকে এই তফসীরগ্রন্থ লেখার সময় সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং এর স্থানে স্থানে যেগুলোর হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে। এ তফসীর লেখার সময় বহু তফসীর এবং আনুষঙ্গিক জ্ঞানের শত শত গ্রন্থ আমার সামনে ছিল। কিন্তু এখানে শুধু ঐ সকল তফসীরের আলোচনাই উদ্দেশ্য, প্রধানত যেগুলোর হাওয়ালা এ গ্রন্থে প্রদান করা হয়েছে।

তফসীরে ইবনে জরীর ঃ এ তফসীরের প্রকৃত নাম 'জামেউল-বায়ান। লেখক আল্লামা আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর তাবারী (র) (ওফাত ৩১০ হি.)। আল্লামা তাবারী একজন উঁচু স্তরের মুফাস্‌সির এবং মুহাদ্দিস (হাদীসবেত্তা) ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি অব্যাহতভাবে দীর্ঘ চল্লিশ বছর রচনায় মগ্ন ছিলেন। প্রতিদিন চল্লিশ পৃষ্ঠা করে লেখা তাঁর রুটিন ছিল। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' খণ্ড ১১, পৃ. ১৪৫)

কেউ কেউ তাঁর ব্যাপারে শিয়া হবার অভিযোগ তুলেছিলেন। কিন্তু ইসলামী জ্ঞান-গবেষকগণ এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রকৃত ব্যাপারও তাই। তিনি ছিলেন "আহলে সুন্নাত আল-জমায়াতভুক্ত" অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন বিচক্ষণ ইসলামী জ্ঞান-সমৃদ্ধ পণ্ডিত। তাঁকে মুজতাহিদ ইমামগণের একজন বলে গণ্য করা হয়।

আল্লামা তাবারীর তফসীরখানা দীর্ঘ ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। পরবর্তী তফসীরসমূহের জন্য এ তফসীর গ্রন্থটি মৌলিক উৎস হিসাবে গণ্য। ইমাম তাবারী কোরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অতঃপর যে বক্তব্যটিকে তিনি প্রবল বলে বিবেচনা করেছেন সেটাকে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। অবশ্য তাঁর তফসীরে 'সহীহ' বর্ণনার সাথে 'সকীম' (প্রামাণ্য ও প্রমাণ-পদ্ধতির মাপকাঠিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে বিবেচিত) বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। এ কারণে তাঁর বর্ণিত সকল বর্ণনার উপর সমান

আস্থা পোষণ করা যায় না। আসলে এ তফসীর লেখার সময় তাঁর লক্ষ্য ছিল, ঐ সময় কোরআনের তফসীর সম্পর্কিত যত বর্ণনা যেখানে পাওয়া যায় সবগুলো একই জায়গায় সন্নিবেশিত করা, যেন এসব উপকরণ থেকে পরবর্তী গবেষকগণ উপকৃত হতে পারেন। তবে তিনি প্রতিটি বর্ণনার উদ্ধৃতি প্রমাণকালে তার সনদ অর্থাৎ প্রমাণ-সূত্রেরও উল্লেখ করেছেন। এর ফলে কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি বর্ণনাকারী সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে উক্ত বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন।

তফসীরে ইবনে কাসীর ঃ এ তফসীরের লেখক হাফেজ এমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর দামেশ্‌কী শাফেয়ী (র) (ওফাত ৭৭৪ হি.)। ইনি হিজরী অষ্টম শতকের বিশিষ্ট গবেষক-পণ্ডিত আলিমদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর তফসীরটি চার খণ্ডে প্রকাশিত। কোরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহই তাতে বেশি স্থান পেয়েছে। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, লেখক বিভিন্ন বর্ণনায় মুহাদ্দিসসুলভ সমালোচনা করেছেন। এজন্য সকল তফসীর গ্রন্থের মধ্যে ইবনে কাসীর এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তফসীরুল-কুরতুবী ঃ তফসীরের পুরো নাম "আল-জামে লি-আহ্‌কামিল-কোরআন"। স্পেনের খ্যাতনামা গবেষক আলেম আল্লামা আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবূ বকর ইবনে ফারাহ আল-কুরতুবী, (ওফাত ৬৭১ হি.) হচ্ছেন এ তফসীরের লেখক। তিনি ফিকহী মাযহাবের দিক থেকে ইমাম মালেকের মতানুসারী। ইবাদত ও সাধনার দিক থেকে বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। মূলত এ গ্রন্থের মৌলিক বিষয়বস্তু ছিল কোরআন মজীদ থেকে ব্যবহারিক বিধিসমূহের উদ্ভাবন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনি আয়াত ও জটিল শব্দসমূহের ব্যাখ্যা, 'এরাব' (স্বরচিহ্ন) ভাষার অলঙ্কার ও সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহও সন্নিবেশিত করেছেন। তফসীরে-কুরতুবী ১২ খণ্ডে বিভক্ত এবং এর বহু সংস্করণ বের হয়েছে।

তফসীরে কবীর ঃ এ তফসীর লিখেছেন ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) (ওফাত ৬০৬ হি.)। কিতাবের নাম 'মাফাতীহুল-গায়েব'। কিন্তু পরবর্তীকালে 'তফসীরে কবীর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইমাম রাযী ছিলেন 'কালামশাস্ত্রের' ইমাম। এ কারণেই তার তফসীরের যুক্তি, 'কালামশাস্ত্র' সম্পর্কিত আলোচনা এবং বাতিল পন্থীদের বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বস্তুত কোরআনের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটনের দিক থেকে এটি একটি অতুলনীয় তফসীরগ্রন্থ। এ তফসীরে যে হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে কোরআনের মর্মবাণীর বিশ্লেষণ এবং আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করা হয়েছে তা অতি চমৎকার। কিন্তু ইমাম রাযী (র) সূরা আল-ফাত্‌হ্ পর্যন্ত এ তফসীর নিজে লিখেছেন। তারপর তিনি আর লিখতে পারেন নি। সূরা আল-ফাত্‌হ থেকে অবশিষ্ট অংশ লিখেছেন কাযী শাহাবুদ্দিন ইবনে খলীলুল-খোলী দামেশকী (ওফাত ৬৩৯ হি.) মতান্তরে শায়খ নজমুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কামুলী (ওফাত ৭৭৭ হি.)। (কাশফুয-যুনুন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৭)

তৎকালীন যুগের চাহিদা মাফিক যেহেতু ইমাম রাযী 'কালামশাস্ত্রীয়' আলোচনা ও বাতিলপন্থীদের ভ্রান্ত মতবাদসমূহ খণ্ডনের ব্যাপারে তাঁর তফসীরে অধিক জোর দিয়েছেন এবং প্রসঙ্গত সেসব আলোচনা বহু স্থানে দীর্ঘায়িত হয়েছে। এ কারণে কেউ কেউ এর সমালোচনা করে বলেছেন ঃ فيه كل شئ الا التفسير এ গ্রন্থে তফসীর ছাড়া আর সব কিছুই

আছে।" তফসীরে-কবীরের ক্ষেত্রে এ ধরনের মন্তব্য অন্যায়। মূলত এর মর্যাদা তাই, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ কোরআনের ভাবার্থ উদ্‌ঘাটনের দিক থেকে এ তফসীরের গুরুত্ব অনেক উর্ধ্বে। অবশ্য বিশেষ দু'একটি স্থানে এ তফসীরে জমহুর উলামায়ে উম্মত অনুসৃত মতের বিপরীত মত ব্যক্ত হয়েছে। আট খণ্ডের এই বিশাল গ্রন্থে এ জাতীয় কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করার মত নয়।

তফসীর আল্-বাহরুল-মুহীত ঃ আল্লামা আবূ হাইয়্যান গারনাতী আন্দালুসী (ওফাত ৭৫৪ হি.) এ তফসীরের লেখক। তিনি ইসলামী জ্ঞান-প্রজ্ঞায় পারদর্শী হওয়া ছাড়াও আরবী ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর তফসীরে কালামুল্লাহ্‌র বৈয়াকরণিক ও আলংকারিক দিকের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি প্রতিটি আয়াতের শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা করেছেন। পদবিন্যাসের বিভিন্নতা ও আলংকারিক সূক্ষ্ম রহস্য বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

আহকামুল-কোরআন লিল-জাস্‌সাস ঃ ইমাম আবূ বকর জাস্‌সাস রাযী (র) (ওফাত ৩৭০ হি.) কর্তৃক এ তফসীরটি লিখিত। ফিকহী মাযহাবের দিক থেকে তিনি হানাফী মতের একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ইমাম। এ তফসীরটির বিষয়বস্তু হলো কোরআন মজীদ থেকে বিভিন্ন মাসআলা উদ্ভাবন। তিনি ধারাবাহিকভাবে আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার বদলে কেবল ঐ সকল আয়াতেরই ব্যাখ্যা করেছেন যেগুলো বিভিন্ন ব্যবহারিক নিয়ম-বিধি সম্বলিত। এ বিষয়ের উপর আরও কয়েকটি গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। তবে তাদের চাইতে 'আহকামুল-কোরআন লিল্-জাস্‌সাস'-এর স্থানই উর্ধ্বে।

তফসীর আদ্-দুররুল-মানসুর ঃ এ তফসীরের লেখক আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (ওফাত ৯১০ হি.)। এর পুরা নাম 'আদ্-দুররুল-মানসুর ফী তাফসীর বিল মাসূর'। তাতে লেখক নিজের সাধ্যানুযায়ী কোরআনের ব্যাখ্যাসম্বলিত সকল আয়াতকে এক জায়গায় সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর পূর্বে হাফেজ ইবনে জরীর (র), ইমাম বগভী (র), ইবনে মরদভিয়া (র), ইবনে হাইয়্যান (র) প্রমুখ হাদীসবেত্তা নিজ নিজ পদ্ধতিতে এ কাজ করেছেন।

আল্লামা সুয়ূতী তাঁদের সকলের বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ তাঁর গ্রন্থে একত্র করেছেন। তবে তিনি প্রতিটি রেওয়ায়েতের সাথে ঐগুলোর পুরো সনদ (প্রমাণ সূত্র)-এর উল্লেখ না করে কেবল লেখকের নামই উল্লেখ করেছেন, যিনি নিজের সনদে উক্ত রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তাতে প্রয়োজনে সনদ অনুসন্ধান করা যাবে। যেহেতু তাঁর লক্ষ্য ছিল সংশ্লিষ্ট বর্ণনাসমূহ একত্র করা, এ কারণে সুয়ূতীর এই তফসীরগ্রন্থেও প্রামাণিক ও প্রমাণ-সূত্রের দিক থেকে দুর্বল বর্ণনা স্থান পেয়েছে। প্রমাণ-সূত্রের অনুসন্ধান না করে তাঁর বর্ণিত সকল রেওয়ায়েতকে নির্ভরযোগ্য বলা যাবে না। আল্লামা সুয়ূতী (র) ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিটি রেওয়ায়েতের সাথে তার সনদ বা প্রমাণ-সূত্র কোন্ ধরনের সে ব্যাপারেও আলোকপাত করেছেন। কিন্তু হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের ব্যাপারে তাঁর দুর্বলতা স্পষ্ট। কাজেই এ ব্যাপারেও নির্বিচারে পূর্ণ আস্থা আনা মুশকিল।

তফসীরে-মাযহারী ঃ আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র) (ওফাত ১২২৫ হি.) প্রণীত। লেখক তাঁর আধ্যাত্মিক ওস্তাদ মাযহার জানে-জানান দেহলভী (র)-এর নামানুসারে এ তফসীরের নামকরণ করেছেন। এটি একখানা সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল তফসীর গ্রন্থ। সংক্ষেপে

কোরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা জানার জন্যে অতীব উপকারী। লেখক কোরআনের শব্দাবলীর বিশ্লেষণের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসেরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। অপরাপর তফসীরের তুলনায় এ গ্রন্থে হাদীসের উদ্ধৃতি দানে সতর্কতা অবলম্বনের ছাপ সুস্পষ্ট।

তফসীরে রুহুল মা'আনী ঃ তফসীরটির পুরো নাম 'রুহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল-কোরআনিল-আযীম ওসাস সাবায়ে মাসানী'। বাগদাদের পতনকালের অব্যবহিত আগের প্রখ্যাত ইসলামী জ্ঞানবিশারদ আল্লামা মাহমুদ আলূসী (র) এ তফসীরখানা লিখেছেন। তফসীরে রুহুল-মা'আনী ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। লেখক এ বিরাট তফসীর গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গীণ ও ব্যাপকভিত্তিক করার জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন। ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকার ছাড়াও তিনি এতে ইসলামী বিধি-বিধান, আকায়েদ-বিশ্বাস, কালাম-শাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, তাসাউফ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট আয়াত সম্পর্কিত জ্ঞানের কোনো দিকের পিপাসাই যাতে পাঠকচিত্তে অবশিষ্ট না থাকে লেখক সে ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। হাদীসের উদ্ধৃতি দানেও এ গ্রন্থের লেখক অন্যান্য তফসীরকারের তুলনায় সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। এদিক থেকে "তফসীরে রুহুল মা'আনী' একটি সুবিস্তৃত তফসীরগ্রন্থ। তফসীর সম্পর্কিত যে কোনো ব্যাপারে এ কিতাবের সহায়তা থেকে কেউ নিরাশ হয় না।

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন প্রসঙ্গে

কোরআন শরীফের একখানা স্বতন্ত্র তফসীর রচনা করার দুঃসাহস ছিল আমার স্বপ্নেরও অতীত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অত্যন্ত স্বাভাবিক গতিতেই আল্লাহ্ পাকের খাস রহম করমে তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন রচনার সকল উপকরণ একত্রিত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা পরিপূর্ণ 'তফসীর'-এর রূপ পরিগ্রহ করেছে। তবে দীর্ঘকাল থেকেই হযরত হাকীমুল-উম্মত থানবী (র) রচিত বয়ানুল-কোরআন আরো সহজ ভাষায় এ যুগের মানুষের মেধা ও সাধারণ পাঠকগণের চাহিদানুযায়ী সহজবোধ্য করে পেশ করার আরজু মনে মনে পোষণ করে আসছিলাম। কিন্তু সে কাজটিও অত্যন্ত জটিল এবং শ্রমসাধ্য ছিল বিধায় এতদিন তা হয়ে ওঠেনি। আল্লাহ্র শোকর যে, মা'আরেফুল-কোরআনের মাধ্যমে সে আরজুটুকুও তিনি পূর্ণ করে দিয়েছেন। কেননা এ তফসীর প্রধানত হযরত থানবী (র)-এর বয়ানুল-কোরআনকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে।

কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

এক. আরবী ছাড়া দুনিয়ার অন্য যে কোন ভাষায় কোরআন শরীফের তফসীর করার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা নাজুক ব্যাপার হচ্ছে মূল কোরআনের তরজমা। কেননা কোরআনের আয়াত ভাষান্তরিত করার অর্থ সে ভাষায় আল্লাহ্র কালামকে ব্যক্ত করা। এর মধ্যে সামান্যতম তারতম্য বা বেশ-কম করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়। এজন্য আমি নিজের তরফ থেকে আয়াতের তরজমা করার দুঃসাহসই করিনি। বস্তুত এর প্রয়োজনও ছিল না। কেননা আমাদের পূর্বসূরি সাধক আলিমগণ বিশেষ যত্ন ও সাবধানতার সাথে এ কাজ করে গেছেন। উর্দু ভাষায় সর্বপ্রথম হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র দুই সুযোগ্য সন্তান শাহ্ রফীউদ্দীন এবং শাহ্ আবদুল কাদের– এমন দক্ষতার সাথে অনুবাদের কাজ আনজাম দিয়ে গেছেন যে, অতঃপর তরজমার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির আশংকা খুবই কম।

হযরত শাহ রফীউদ্দীন কোরআন পাকের একেবারে শাব্দিক অনুবাদ করেছেন। পরিভাষার

বা উর্দু ভাষার বর্ণনাভঙ্গীর প্রতি কোন লক্ষ্য করেন নি। ফলে কোরআনের প্রতিটি শব্দ উর্দু ভাষায় চলে এসেছে। কিন্তু হযরত শাহ্ আবদুল কাদের শাব্দিক অনুবাদের সাথে সাথে পরিভাষার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছেন।

এ অনুবাদকর্ম সম্পাদন করতে শাহ্ আবদুল কাদেরকে দীর্ঘ চল্লিশ বছরকাল একাধারে মসজিদে এ'তেকাফের জীবন-যাপন করতে হয়। মসজিদেই তিনি ইনতিকাল করেন এবং মসজিদের চত্বর থেকেই এ মহাসাধকের মরদেহ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। দারুল-উলূম দেওবন্দ মাদরাসার প্রথম মোহতামেম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব-এর মন্তব্য, "নিঃসন্দেহে এ তরজমা এলহামের সাহায্যে সম্পাদন করা হয়েছে। অন্যথায় কোন মানুষের পক্ষে এমন নিখুঁত অনুবাদ কর্ম সম্ভবই হতে পারে না।"

শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র) তাঁর যমানায় যখন অনুভব করলেন যে, উর্দু পরিভাষার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হওয়ার ফলে হযরত শাহ্ আবদুল কাদেরের অনুবাদ সাধারণ পাঠকদের পক্ষে দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি নতুন করে আধুনিক পরিভাষার আলোকে তরজমা করেছেন। সে তরজমাই শায়খুল হিন্দ-এর তরজমা নামে খ্যাত হয়েছে। আমি আয়াতের অনুবাদ ক্ষেত্রে হযরত শায়খুল হিন্দের সে তরজমাই অনুসরণ করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হুবহু তুলে দিয়েছি।

দুই. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) 'তফসীরে বয়ানুল কোরআন' এমন এক চমৎকার পদ্ধতিতে লিখেছেন যে, আয়াতের তরজমা অংশে বন্ধনীর মধ্যেই সংক্ষিপ্ত তফসীরও বলে দেওয়া হয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত তফসীরটুকু এত সুন্দর ও উপকারী যে, হযরত মাওলানার জীবৎকালেই অনেকে সে তরজমা কোরআনে সংযুক্ত করে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন।

হযরত থানবী (র)-এর বয়ানুল কোরআনের একটা সহজ সংস্করণ তৈরি করাই যেহেতু আমার দীর্ঘকালের লালিত স্বপ্ন, সেজন্য তরজমার পর 'তফসীরের সারসংক্ষেপ' নামে আমি হযরত থানবী (র)-এর বিস্তারিত তরজমা অংশটুকুই উদ্ধৃত করেছি। নিজের তরফ থেকে আমি শুধু পরিভাষাগত জটিলতা কিছুটা সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র। হযরত থানবী (র)-এর 'খোলাসায়ে তফসীর' প্রকৃতপক্ষে একাধারে যেমন তরজমার বিস্তারিত রূপ তেমন অপরদিকে তফসীরের সারসংক্ষেপও বটে। সেদিকে লক্ষ্য করেই আমি তফসীরের প্রথম সে সারসংক্ষেপটুকু উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় মনে করেছি। এর মধ্যে যেসব তত্ত্বকথা একটু কঠিন মনে হয়েছে সে অংশগুলো পরবর্তী 'আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ে' সহজ ভাষায় ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছি। যদি কেউ শুধু তফসীরের সারসংক্ষেপটুকুও মোটামুটিভাবে পড়ে নেন, তবে তার পক্ষে তফসীর সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা অর্জন করা সহজ হবে।

এরপর ফেকাহ্ সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করে কোরআন শরীফের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সহজ ধারণা অর্জন করা যাতে সহজ হয়, তার চেষ্টা করা হয়েছে।

তিন. তৃতীয় কাজ হচ্ছে 'মা'আরেফ ও মাসায়েল'। প্রকৃতপক্ষে এটুকুও আমার নিজের না বলে পূর্ববর্তী সাধক আলিমগণের তফসীর থেকে মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ বলা যেতে পারে। আমি সহজ উর্দু ভাষায় যথাস্থানে হাওয়ালাসহ বক্তব্যগুলো পরিবেশন করেছি মাত্র। এ ব্যাপারেও আমি যে কয়টি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছি, তা হচ্ছে ঃ

(ক) আলিমগণের পক্ষে কোরআনের তফসীরের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, একটি শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ, ব্যাকরণগত দিক, অলংকারশাস্ত্রের বিচারে সংশ্লিষ্ট আয়াতের বিচার-ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ক্বেরাআত প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও মর্মোদ্ধারের জন্য এ দিকটা ঠিকমত উদ্ধার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু সাধারণ পাঠক তো দূরের কথা, আজকাল অনেক আলিমের পক্ষেও এসব ব্যাপারে প্রকৃত ধারণা অর্জন করার চেষ্টায় ব্রতী হওয়া বিরক্তিকর শ্রম বলে বিবেচিত হয়, বিশেষত সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে তো এসব ব্যাপারে জড়িত হওয়া কোরআন সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করার পক্ষে প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়ে যায়। ফলে তাঁদের মধ্যে এমন ধারণাও সৃষ্টি হয়ে যায় যে, কোরআন শরীফ যথার্থভাবে পাঠ করাটা সত্যি সত্যিই খুব কঠিন কাজ। অথচ কোরআনী শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে বান্দার সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ–এমন সম্পর্ক যদ্দ্বারা বস্তুজগতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। বস্তুজগতের আকর্ষণ যেন আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে না পারে এবং বান্দার মধ্যে দুনিয়ার চাইতে আখিরাতের ফিকির বেশি প্রাধান্য লাভ করে। মানুষের মধ্যে এমন একটা চিন্তাধারা সৃষ্টি হয় যে, প্রতিটি কথায় ও কাজে সে এমন চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয় যে, আমার এ কথা বা কাজ দ্বারা আল্লাহ্ এবং রাসূলের মর্জির খেলাফ কোন পদক্ষেপ হচ্ছে কিনা। এ শিক্ষাটুকু কোরআন এমন সহজ করে দিয়েছে যে, সামান্য লেখাপড়া জানা লোক মোটামুটি পড়ে নিয়ে এবং লেখাপড়া না জানা লোক অন্যের নিকট শুনেও তা অনুধাবন করতে পারে। এ সম্পর্কে কোরআনের ঘোষণা ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۔

অর্থাৎ এবং অতি অবশ্যই কোরআনকে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতঃপর কেউ কি এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে ?

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআনে সাধারণ পাঠকগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই শব্দের ব্যাখ্যা, ব্যাকরণের জটিল বিশ্লেষণ প্রভৃতির অবতারণা করা হয়নি। শুধু তফসীরবিদ ইমামগণের বিচার-বিশ্লেষণ থেকে গ্রহণযোগ্য মতটুকুই উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রয়োজনের খাতিরে সে ধরনের বিশ্লেষণের অবতারণা করা হলেও জটিল আলোচনা বাদ দিয়ে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে সেটুকু পরিবেশন করা হয়েছে। একই কারণে এমন সব আলোচনা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় বা সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে অনুধাবন করা কষ্টকর হতে পারে।

(খ) নির্ভরযোগ্য তফসীর গ্রন্থসমূহ থেকে এমন সব তথ্য ও আলোচনাই শুধু উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেগুলো পাঠ করলে কোরআনের মাহাত্ম্য ও রাসূল (সা)-এর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য বাড়ে, কোরআনের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, আমল করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

(গ) প্রত্যেক মুসলমানই এ ব্যাপারে দৃঢ় ঈমান রাখেন যে, কোরআন শরীফ বর্তমানে যেমন সকল মানুষের জন্য সঠিক পথ প্রদর্শনকারী আল্লাহ্র কিতাব, তেমনি এটি কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত দিনের সকল মানুষের জন্য নির্ভুল পথের একমাত্র দিশারী হিসাবে নাযিল হয়েছে। দুনিয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের যত সমস্যা আসবে, সে সবেরও সঠিক সমাধান

কোরআনের মধ্যে রয়েছে। তবে সে সমাধান বের করার ব্যাপারে শর্ত হচ্ছে যে, রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষার আলোকে কোরআন ব্যাখ্যা ও পাঠ করতে হবে। এ কারণেই প্রতি যুগের আলিমগণ যুগ-সমস্যার আলোকে কোরআনের তফসীর রচনা করেছেন। তাঁদের যমানায় বিধর্মী পথভ্রষ্ট শ্রেণীর তরফ থেকে দীনের ব্যাপারে যেসব বিভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যার প্রয়াস হয়েছে, তাঁরা আল্লাহ্‌র কালাম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেসব বিভ্রান্তির সঠিক জবাব পেশ করেছেন। মধ্যযুগের তফসীর গ্রন্থগুলো সে একই কারণে মু'তাযেলা, জাহমিয়া, সাফওয়ানিয়্যাহ প্রমুখ ভ্রান্ত মতবাদীর যথার্থ জবাবে পরিপূর্ণ দেখা যায়।

পূর্ববর্তীগণের সেপথ অবলম্বন করেই আমিও আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে সৃষ্ট নতুন নতুন সমস্যা এবং এ যুগের ইহুদী-খৃস্টান প্রাচ্যবিদদের দ্বারা সৃষ্ট যেসব প্রশ্ন মুসলিমদের মনে নানা সংশয়-সন্দেহের সৃষ্টি করেছে, নতুন উত্থাপিত এসব প্রশ্নের জবাব দান করার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে আমি প্রথমে কোরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহ্‌র ইমামগণের বক্তব্য উত্থাপন করার চেষ্টা করেছি, সরাসরি জবাব পাওয়া না গেলেও কোন ইশারা বা নজীর রয়েছে কি না, তা খুঁজে দেখেছি। আল্লাহ্‌র শোকর যে, আমার সে অন্বেষণ ব্যর্থ হয়নি। সমসাময়িক উলামায়ে কিরামের সঙ্গে এসব ব্যাপারে মত বিনিময় করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও ত্রুটি করিনি। অবিশ্বাসী বা সন্দেহবাদীদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান প্রসঙ্গে খেয়াল রাখা হয়েছে। যেন জবাব যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য হয়। তবে সমকালীন কিছুসংখ্যক চিন্তাবিদের ন্যায় অন্যের সন্দেহ ভঞ্জনের খাতিরে দীনী-মাসায়েলের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন বা সে ধরনের কোন সামঞ্জস্য বিধানের অপচেষ্টাও কোথাও করা হয়নি। অবশ্য এসব কিছু আমি আমার জ্ঞান ও ধারণার মাধ্যমেই করতে চেষ্টা করেছি। যদি এতে কোন ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে তবে সেজন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। দোয়া করি, যেন আল্লাহ্ তা'আলা সন্দেহবাদীদের জন্য হেদায়েতের পথ খুলে দেন।

তফসীর লেখার ক্ষেত্রে উপরিক্ত পন্থাগুলো অবলম্বন করার ফলে এখন তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন যা দাঁড়াচ্ছে তা হলো ঃ

এক. এ তফসীরে আয়াতের তরজমা অংশে শায়খুল-হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসানের তরজমা, প্রকৃত প্রস্তাবে যা হযরত শাহ্ আবদুল কাদের-এর তরজমারই আধুনিক রূপ, সেটি হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে।

পরবর্তী ব্যাখ্যামূলক তরজমা হযরত থানবী (র)-এর বয়ানুল কোরআন থেকে গৃহীত। এর দ্বারা মা'আরেফুল কোরআনে দু'দুটি নির্ভরযোগ্য তরজমার সমাবেশ ঘটেছে।

দুই. তফসীরের সারসংক্ষেপ ঃ প্রকৃতপক্ষে যেটুকু হযরত থানবী (র) কৃত তফসীর বয়ানুল-কোরআন থেকে গৃহীত, ওটুকু যদি পৃথকভাবে একত্র করা হয়, তবে সেটাও সহজ-সরলভাবে কোরআনের মানে-মতলব বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি। এ ব্যাপারে একবার আমাকে খ্যাতনামা মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা বদরে আলম মিরেঠি মরহুম আল্লামা ফরীদ ওয়াজদীর একখানা সংক্ষিপ্ত তফসীর দেখিয়ে উর্দু ভাষায়ও এ ধরনের একখানা তফসীর প্রকাশ করার আরজু প্রকাশ করেছিলেন। আমার মনে হয়, তফসীরের সারসংক্ষেপ অংশটুকু মরহুম মাওলানা সাহেবের সে আরজু পূর্ণ করতে সহায়ক হবে।

তিন. 'মা'আরেফ ও মাসায়েল' অংশ (আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়) আমার সাধনার ফসল। আলহামদুল্লিাহ্ ! এটুকুও আমি নিজে রচনা না করে পূর্ববর্তী অনুসরণীয় ইমাম মুহাদ্দিসগণের চিন্তাধারাকে সাজিয়ে পরিবেশন করেছি। আজকালকার লেখকগণ নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাধারা পরিবেশন করে যেখানে গর্বিত, আমি সেখানে আল্লাহ্র শোকর আদায় করছি যে, আমি পূর্বসূরিগণের চিন্তা-গবেষণার ফসলটুকু নিংড়ে সে সবের সারনির্যাসই এ তফসীরে পরিবেশন করতে সমর্থ হয়েছি। আমার নিজের কোন মত এতে প্রবেশ করাতে চেষ্টা করিনি।

আল্লাহ্র তওফীকের জন্য শোকর। আকায়ে-নামদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম।[১]

বিনীত
মুহাম্মদ শফী
দারুল উলূম, করাচী
২৫ শা'বান, ১৩৯২ হি.

১ হযরত মুফতী সাহেব (র) লিখিত ভূমিকাটির শেষাংশ কিছুটা সংক্ষেপ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকুর অনুবাদ করা হয়েছে।—অনুবাদক

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

সূরা আল-ফাতিহা

এই সূরাটি মক্কী এবং এর আয়াত সংখ্যা সাত

ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য ঃ সূরা আল্-ফাতিহা কোরআনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূরা। প্রথমত এ সূরা দ্বারাই পবিত্র কোরআন আরম্ভ হয়েছে এবং এই সূরা দিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামায আরম্ভ হয়। অবতরণের দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এটিই প্রথম নাযিল হয়। সূরা 'ইক্‌রা', 'মুয্‌যাম্মিল' ও সূরা 'মুদ্দাস্‌সিরে'র ক'টি আয়াত অবশ্য সূরা আল-ফাতিহার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এ সূরার অবতরণই সর্বপ্রথম। যে সকল সাহাবা (রা) সূরা আল-ফাতিহা সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সে বক্তব্যের অর্থ বোধ হয় যে, পরিপূর্ণ সূরারূপে এর আগে আর কোন সূরা নাযিল হয়নি। এ জন্যই এই সূরার নাম 'ফাতিহাতুল-কিতাব' বা কোরআনের উপক্রমণিকা রাখা হয়েছে।

'সূরাতুল ফাতিহা' একদিক দিয়ে সমগ্র কোরআনের সারসংক্ষেপ। এ সূরায় সমগ্র কোরআনের সারমর্ম সংক্ষিপ্তাকারে বলে দেওয়া হয়েছে। কোরআনের অবশিষ্ট সূরাগুলো প্রকারান্তরে সূরাতুল ফাতিহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা। কারণ, সমগ্র কোরআন প্রধানত ঈমান এবং নেক আমলের আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত। আর এ দু'টি মূলনীতিই এ সূরায় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরে রূহুল মা'আনী ও রুহুল বয়ানে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাই এ সূরাকে সহীহ হাদীসে 'উম্মুল কোরআন' 'উম্মুল কিতাব', 'কোরআনে আযীম' বলেও অভিহিত করা হয়েছে। (কুরতুবী)

অথবা এ জন্য যে, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত বা অধ্যয়ন করবে তার জন্য এ মর্মে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেন প্রথমে পূর্বঘোষিত যাবতীয় ধ্যান-ধারণা অন্তর থেকে দূরীভূত করে একমাত্র সত্য ও সঠিক পথের সন্ধানের উদ্দেশ্যে এ কিতাব তেলাওয়াত আরম্ভ করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট এ প্রার্থনাও করে যে, তিনি যেন তাকে সিরাতুল-মুস্তাকীমের হেদায়েত দান করেন।

এ সূরার প্রথমেই রয়েছে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা। এর অর্থ হচ্ছে—এ প্রশংসার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দরবারে হেদায়েতের দরখাস্ত পেশ করা হলো। আর এ দরখাস্তের প্রত্যুত্তরই সমগ্র কোরআন, যা الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ্‌র নিকট সঠিক পথের যে সন্ধান চেয়েছে, আল্লাহ পাক তার প্রত্যুত্তরে الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ বলে ইশারা করে দিলেন যে, হে আদম সন্তানগণ, তোমরা যা চাও তা এ গ্রন্থেই রয়েছে।

হযরত রাসূলে করীম (সা) এরশাদ করেছেন যে, যাঁর হাতে আমার জীবন-মরণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি—সূরা আল-ফাতিহার দৃষ্টান্ত তওরাত, ইনজীল, যবুর প্রভৃতি অন্য কোন আসমানী কিতাবে তো নেই-ই, এমনকি পবিত্র কোরআনেও এর দ্বিতীয় নেই। ইমাম তিরমিযী আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন যে—সূরায়ে ফাতিহা প্রত্যেক রোগের ঔষধবিশেষ।

হাদীস শরীফে সূরা আল-ফাতিহাকে সূরায়ে শেফাও বলা হয়েছে। (কুরতুবী)

বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন, –সমগ্র কোরআনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সূরা হচ্ছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ–(কুরতুবী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

بِسْمِ اللّٰهِ কোরআনের একটি আয়াত ঃ সমস্ত মুসলমান এতে একমত যে, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। কোরআন শরীফের সূরা নাম্‌লের একটি আয়াত বা অংশ এবং এ ব্যাপারেও একমত যে, সূরা তওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার প্রথমে.....بِسْمِ اللّٰهِ। লেখা হয়। بِسْمِ اللّٰهِ সূরা আল-ফাতিহার অংশ না অন্যান্য সকল সূরারই অংশ, এতে ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন بِسْمِ اللّٰهِ। সূরা নাম্‌ল ব্যতীত অন্য কোন সূরার অংশ নয়। তবে এটি এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আয়াত যা প্রত্যেক সূরার প্রথমে লেখা এবং দুটি সূরার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য এটি অবতীর্ণ হয়েছে।

কোরআন তেলাওয়াত ও প্রত্যেক কাজ বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ আরম্ভ করার আদেশ ঃ জাহেলিয়াত যুগে লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের প্রত্যেক কাজ উপাস্য দেব-দেবীদের নামে শুরু করতো। এ প্রথা রহিত করার জন্য হযরত জিবরাঈল (আ) পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম যে আয়াত নিয়ে এসেছিলেন, তাতে আল্লাহ্‌র নামে কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যথা........ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ।

আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন যে, শুধু কোরআনই নয়, বরং অন্যান্য আসমানী কিতাবও বিসমিল্লাহ্ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছিল। কোন কোন আলিম বলেছেন যে, বিসমিল্লাহ্ পবিত্র কোরআন ও উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষত্ব। উল্লেখিত দু'টি মতের মীমাংসা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার নামে আরম্ভ করার আদেশ সকল আসমানী কিতাবের জন্যই বিদ্যমান ছিল। তবে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর শব্দগুলো কোরআনের বিশেষত্ব। যেমন, কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)-ও প্রথমে প্রত্যেক কাজ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ বলে আরম্ভ করতেন এবং কোন কিছু লেখাতে হলেও এ কথা প্রথমে লেখাতেন। কিন্তু بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। অবতীর্ণ হওয়ার পর এ বর্ণগুলোকেই গ্রহণ করা হলো এবং সর্বকালের জন্য বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে সব কাজ শুরু করার নিয়ম প্রবর্তিত হলো। (কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)

কোরআন শরীফের স্থানে স্থানে উপদেশ রয়েছে যে, প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ্ বলে আরম্ভ কর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, "যে কাজ বিসমিল্লাহ ব্যতীত আরম্ভ করা হয়, তাতে কোন বরকত থাকে না।"

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, ঘরের দরজা বন্ধ করতে বিসমিল্লাহ্ বলবে, বাতি নেভাতেও বিসমিল্লাহ্ বলবে, পাত্র আবৃত করতেও বিসমিল্লাহ্ বলবে। কোন কিছু খেতে, পানি পান করতে, ওযূ করতে, সওয়ারীতে আরোহণ করতে এবং তা থেকে অবতরণকালেও বিসমিল্লাহ্ বলার নির্দেশ কোরআন-হাদীসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। (কুরতুবী)

প্রত্যেক কাজে বিসমিল্লাহ্ বলার রহস্য ঃ ইসলাম প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করার নির্দেশ দিয়ে মানুষের গোটা জীবনের গতিই অন্য সকল কিছুর দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে একমাত্র আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। বারবার আল্লাহ্র নামে কাজ শুরু করার মাধ্যমে সে প্রতি মুহূর্তেই আনুগত্যের এ স্বীকারোক্তি নবায়ন করে যে, আমার অস্তিত্ব ও আমার যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহ্র ইচ্ছা ও সাহায্য ছাড়া হতে পারে না। এ নিয়তের ফলে তার ওঠাবসা, চলাফেরাসহ পার্থিব জীবনের সকল কাজকর্ম ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়।

কাজটা কতই না সহজ ! এতে সময়ের অপচয় হয় না, পরিশ্রমও হয় না, কিন্তু উপকারিতা একান্তই সুদূরপ্রসারী। এতে দুনিয়াদারীর প্রতিটি কাজ দীনের কাজে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলেই পানাহার করে, কিন্তু মুসলমান আহার গ্রহণের পূর্বে বিসমিল্লাহ্ বলে এ স্বীকারোক্তি জানায় যে, আহার্যবস্তু যমীনে উৎপন্ন হওয়া থেকে শুরু করে পরিপক্ব হওয়া পর্যন্ত তাতে কত পরিশ্রমই না নিয়োজিত হয়েছে। আকাশ-বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্রের কত অবদানেই না এক একটি শস্যদানার দেহ পুষ্টি লাভ করেছে। মানুষ, প্রকৃতি এবং উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত অন্যান্য জীব-জানোয়ারের যে অবদান খাদ্যের প্রতিটি কণায় বিদ্যমান, তা আমার শ্রম বা চেষ্টা দ্বারা সম্ভবপর ছিল না। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই অনুগ্রহ করে এগুলোকে বিবর্তনের সকল স্তর অতিক্রম করিয়ে উপাদেয় আহার্যরূপে আমাকে দান করেছেন।

মুসলমান-অমুসলমান সকলেই শোয়, ঘুমায়, আবার জেগে ওঠে। কিন্তু মু'মিন তার শোয়ার এবং জেগে ওঠার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে আল্লাহ্র সাথে তার যোগাযোগের সম্পর্ক নবায়ন করে। ফলে তার জাগতিক কাজকর্মও আল্লাহ্র যিকিরে রূপান্তরিত হয়ে বন্দেগীরূপে লিখিত হয়। একজন মু'মিন কোন যানবাহনে আরোহণকালে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, এ যানবাহনের সৃষ্টি এবং আমার ব্যবহারে এনে দেওয়া ছিল মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বে। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সুষ্ঠু এক পরিচালনা পদ্ধতির বদৌলতে কোথাকার কাঠ, কোথাকার লোহা, কোথাকার কারিগর, কোথাকার চালক সবকিছু সমবেত করে সবগুলোকে মিলিয়ে আমার খেদমতে নিয়োজিত করেছেন। সামান্য কয়টি পয়সা ব্যয় করে আল্লাহ্র এতবড় সৃষ্টি আমার নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারছি এবং সে পয়সা আমি নিজে কোন জায়গা হতে সঙ্গে নিয়ে আসিনি ; বরং তা সংগ্রহ করার সকল ব্যবস্থাও তিনিই করে দিয়েছেন। চিন্তা করুন, ইসলামের এ সামান্য শিক্ষা মানুষকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে। এজন্য এরূপ বলা যথার্থ যে, বিসমিল্লাহ্ এমন এক পরশপাথর যা শুধু তামাকে নয়, বরং মাটিকেও স্বর্ণে পরিণত করে।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ وَتَعْلِيْمَاتِهٖ ـ

মাসআলা ঃ কোরআন তেলাওয়াত শুরু করার আগে প্রথমে أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ এবং পরে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করা সুন্নত। তেলাওয়াতের মধ্যেও সূরা তওবা ব্যতীত সকল সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত।

বিসমিল্লাহ্র তফসীর

বিসমিল্লাহ্ বাক্যটি তিনটি শব্দ দ্বারা গঠিত। প্রথমত 'বা' বর্ণ, দ্বিতীয়ত 'ইসম' ও তৃতীয়ত 'আল্লাহ'। আরবী ভাষায় 'বা' বর্ণটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে তিনটি অর্থ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এবং এ তিনটির যে কোন একটি অর্থ এক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক—সংযোজন। অর্থাৎ এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে মিলানো বা সংযোগ ঘটানো অর্থে। দুই—এস্তেয়ানাত–অর্থাৎ কোন বস্তুর সাহায্য নেওয়া। তিন—কোন বস্তু থেকে বরকত হাসিল করা।

ইসম শব্দের ব্যাখ্যা অত্যন্ত ব্যাপক। মোটামুটিভাবে এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, 'ইসম' নামকে বলা হয়। 'আল্লাহ্' শব্দ সৃষ্টিকর্তার নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মহত্তর ও তাঁর যাবতীয় গুণের সম্মিলিত রূপ। কোন কোন আলিম একে ইসমে আ'যম বলেও অভিহিত করেছেন।

এ নামটি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। এজন্যই এ শব্দটির দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না। কেননা, আল্লাহ্ এক ; তাঁর কোন শরীক নেই। মোটকথা, আল্লাহ্ এমন এক সত্তার নাম, যে সত্তা পালনকর্তার সমস্ত গুণের এক অসাধারণ প্রকাশবাচক। তিনি অদ্বিতীয় ও নজীরবিহীন। এজন্য বিসমিল্লাহ্ শব্দের মধ্যে 'বা'-এর তিনটি অর্থের সামঞ্জস্য হচ্ছে আল্লাহ্র নামের সাথে, তাঁর নামের সাহায্যে এবং তাঁর নামের বরকতে।

কিন্তু তিন অবস্থাতেই যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর নামের সাথে তাঁর নামের সাহায্যে এবং তাঁর নামের বরকতে, যে কাজ করা উদ্দেশ্য তা উল্লেখ করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাক্যটি অসম্পূর্ণ থাকে। এজন্য 'ইলমে নাহবের' (আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র) নিয়মানুযায়ী স্থান-উপযোগী ক্রিয়া উহ্য ধরে নিতে হয়। যথা, 'আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি বা পড়ছি।' এ ক্রিয়াটিকে উহ্যই ধরতে হবে, যাতে 'আরম্ভ আল্লাহ্র নামে' কথাটি প্রকাশিত হয়। সে উহ্য বিষয়টিও আল্লাহ্র নামের পূর্বে হবে না। আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী শুধু 'বা' বর্ণটি আল্লাহ্র নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে মাসহাফে-উসমানীতে সাহাবাগণের সম্মিলিত অভিমত উদ্ধৃত করে মন্তব্য করা হয়েছে যে, 'বা' বর্ণটি 'আলিফ'-এর সঙ্গে মিলিয়ে এবং 'ইসম' শব্দটি পৃথকভাবে লেখা উচিত ছিল। এমতাবস্থায় শব্দের রূপ হতো بِاسْمِ اللهِ। কিন্তু মাসহাফে-উসমানীর লিখন-পদ্ধতিতে 'হামযা' বর্ণটি উহ্য রেখে 'বা'-কে 'সীন'-এর সাথে যুক্ত করে লিখে 'বা'-কে ইসমের অংশ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে আরম্ভটা 'আল্লাহ্র নামেই হয়'। একই কারণে অন্যত্র আলিফকে উহ্য রাখা হয় না। যথা اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ। এতে 'বা'-কে 'আলিফের' সাথে লেখা হয়েছে। মোটকথা, বিসমিল্লাহ্র বেলায় বিশেষ এক পদ্ধতি অনুসরণ করেই 'বা' বর্ণকে 'ইসম'-এর সঙ্গে মিলিত করে লেখার নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে। اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ রহমান ও রহীম উভয়ই আল্লাহ্র গুণবাচক নাম। রহমান অর্থ সাধারণ ও ব্যাপক রহমত এবং রাহীম অর্থ পরিপূর্ণ ও বিশেষ রহমত।

সাধারণ রহমতের অর্থ হচ্ছে যে, এ রহমত বা দয়া সমগ্র জাহানে যা সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা সৃষ্টি হবে, সে সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। পরিপূর্ণ রহমত অর্থ হচ্ছে যে, তা সম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ। আর এ জন্যই 'রহমান' শব্দ আল্লাহ্ তা'আলার 'যাতের' জন্য নির্দিষ্ট। কোন সৃষ্টিকে রহমান বলা চলে না। কারণ আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন সত্তা নেই, যার রহমত বা দয়া সমস্ত বিশ্ব-চরাচরে সমভাবে বিস্তৃত হতে পারে। এজন্য 'আল্লাহ্' শব্দের ন্যায় 'রহমান' শব্দেরও দ্বি-বচন বা বহুবচন হয় না। কেননা, এ শব্দটি একক সত্তার সাথে সংযুক্ত বা একক সত্তার জন্য নির্দিষ্ট। তাই এখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় কারো উপস্থিতির সম্ভাবনা নেই। (কুরতুবী)

'রহীম' শব্দের অর্থ 'রহমান' শব্দের অর্থ থেকে স্বতন্ত্র। কারণ, কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্য ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রদর্শন করা সম্ভব, সুতরাং সে দয়া বা রহমত এ শব্দে প্রযোজ্য হওয়া অসম্ভব নয়। এ জন্য 'রহীম' শব্দ মানুষের জন্যও বলা যেতে পারে। আল-কোরআনে রাসূল (সা)-এর জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে– بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ

মাসআলা ঃ আজকাল 'আবদুর রহমান', 'ফজলুর রহমান' প্রভৃতি নাম সংক্ষেপ করে শুধু 'রহমান' বলা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে 'রহমান' বলে ডাকা হয়। এরূপ সংক্ষেপ করা জায়েয নয় ; পাপের কাজ।

জ্ঞাতব্য ঃ বিসমিল্লাহ্‌তে আল্লাহ্ তা'আলার সুন্দর নাম ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর মধ্যে মাত্র দু'টি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দ দু'টিই 'রহমত' শব্দ হতে গঠিত হয়েছে, যা রহমতের ব্যাপকতার প্রতি ইশারা করে। এতে একথাও বোঝানো হয়েছে যে, এ বিশ্ব চরাচর, আকাশ, বাতাস, সৃষ্টিরাজি পয়দা করা, এ সবের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করাও আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীতে সংযুক্ত। কোন বস্তুকেই তিনি স্বীয় প্রয়োজনে বা অন্য কারো প্ররোচনায় বা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সৃষ্টি করেন নি। বরং তাঁর রহমত বা দয়ার তাকিদেই সৃষ্টি করে এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছেন।

'তাআব্বুজ' শব্দের অর্থ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করা। আল-কোরআনে এরশাদ হয়েছে—যখন কোরআন পাঠ কর, তখন শয়তানের প্রতারণা হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাও। দ্বিতীয়ত, কোরআন পাঠের প্রাক্কালে আ'উযুবিল্লাহ পাঠ করা ইজমায়ে-উম্মত দ্বারা সুন্নত বলে স্বীকৃত হয়েছে। এ পাঠ নামাযের মধ্যেই হোক বা নামাযের বাইরেই হোক। কোরআন তেলাওয়াত ব্যতীত অন্যান্য কাজে শুধু বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত, আ'উযুবিল্লাহ নয়। যখন কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করা হয়, তখন আ'উযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ উভয়টিই পাঠ করা সুন্নত। তেলাওয়াতকালে একটি সূরা শেষ করে অপর সূরা আরম্ভ করার পূর্বে শুধু সূরা তওবা ব্যতীত অন্য সব সূরা তেলাওয়াতের আগে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করতে হয়। তেলাওয়াত করার সময় মধ্যে সূরা-বারাআত এলে তখন বিসমিল্লাহ্ পড়া নিষেধ। কিন্তু প্রথম তেলাওয়াতই যদি সূরা বারাআত দ্বারা আরম্ভ হয়, তবে আ'উযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ্ উভয়টিই পাঠ করতে হবে। (আলমগিরী)

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম', কোরআনের সূরা নামল-এর একটি আয়াতের অংশ এবং দু'টি সূরার মাঝখানে একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। তাই অন্যান্য আয়াতের ন্যায় এ আয়াতটির সম্মান

করাও ওয়াজিব। ওযূ ছাড়া উহাকে স্পর্শ করা জায়েয নয়। অপবিত্র অবস্থায় যথা হায়েয-নেফাসের সময় (পবিত্র হওয়ার পূর্বে) তেলাওয়াতরূপে পাঠ করাও না-জায়েয। তবে কোন কাজকর্ম আরম্ভ করার পূর্বে (যথা–পানাহার) দোয়াস্বরূপ পাঠ করা সব সময়ই জায়েয।

মাসআলা ঃ নামাযের প্রথম রাক'আত আরম্ভ করার সময় আ'উযুবিল্লাহ্-এর পরে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত। তবে আস্তে পাঠ করবে, না সরবে পাঠ করবে, এতে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারী ইমামগণ নীরবে পাঠ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। নামাযের প্রথম রাক'আতের পর অন্যান্য রাক'আতে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত বলে সকলে একমত হয়েছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে প্রত্যেক রাক'আতের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়াকে ওয়াজিব বলা হয়েছে। (শরহে-মানিয়্যাহ)

মাসআলা ঃ নামাযে সূরা-ফাতিহা পাঠ করার পর অন্য সূরা পাঠ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ্ পাঠ না করা উচিত। নবী করীম (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে ইহা পাঠ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। 'শরহে মানিয়্যাতে' একে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শরহে মানিয়্যাত, দুররে-মুখতার, বুরহান প্রভৃতি কিতাবে এ অভিমতকেই গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন, যেসব নামাযে নীরবে ক্বেরাআত পড়া হয়, সেসব নামাযে বিসমিল্লাহ্ পড়া উত্তম। আবার কোন কোন বর্ণনাতে ইহা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। শামী কোন কোন ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদের মতামত বর্ণনা করে এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবে এতেও সকলেই একমত হয়েছেন যে, যদি কেউ তা পাঠ করে তবে তাতেও কোন দোষের কারণ নেই।

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ
نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ২. যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৩. যিনি বিচার-দিনের মালিক। ৪. আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। ৬. সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। ৭. তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা। (সৃষ্টির প্রতিটি প্রকারকেই এক একটি 'আলম' বা জগতরূপে গণ্য করা হয়। যথা–ফেরেশতা জগত, মানব-জগত, জ্বিন-জগত।)

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ যিনি বিচার ও প্রতিদান-দিবসের মালিক। (কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে।) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আমরা তোমারই ইবাদত করি আর তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আমাদিগকে সরল পথ দেখাও। صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ যাদের উপর তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট তাদের পথ নয়।

হেদায়েতের পথ ত্যাগ করার দু'টি পন্থা। এক এই যে, পথের পুরোপুরি খোঁজ-খবর নেয়নি—ضَآلِّيْنَ শব্দে তাই বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, পুরোপুরি খোঁজ-খবর নেওয়ার পর এবং তা সঠিক প্রমাণিত হওয়ার পরও উহাতে আমল করেনি। مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ দ্বারা ঐ সমস্ত লোককে বোঝানো হয়েছে। কেননা, জেনে-শুনে যারা কাজ করে না, তাদের আচরণ অসন্তুষ্টির কারণ হওয়াই স্বাভাবিক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরাতুল ফাতিহার বিষয়বস্তু ঃ সূরাতুল-ফাতিহার আয়াত সংখ্যা সাত। প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহর প্রশংসা এবং শেষের তিনটি আয়াতে মানুষের পক্ষ হতে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা ও দরখাস্তের বিষয়বস্তু, যা আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই দয়াপরবশ হয়ে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। মধ্যের একটি আয়াত প্রশংসা ও দোয়া-মিশ্রিত বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ।

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন—নামায (অর্থাৎ সূরাতুল-ফাতিহা) আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত ; অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাদের জন্য। আমার বান্দাগণ যা চায়, তা তাদেরকে দেওয়া হবে। অতঃপর রাসূল (সা) বলেছেন যে, যখন বান্দাগণ বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ তখন আল্লাহ্ বলেন যে, আমার বান্দাগণ আমার প্রশংসা করছে। আর যখন বলে اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন তিনি বলেন যে, তারা আমার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে। আর যখন বলে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন তিনি বলেন যে, আমার বান্দাগণ আমার গুণগান করছে। আর যখন বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তখন তিনি বলেন যে, এ আয়াতটি আমি এবং আমার বান্দাগণের মধ্যে সংযুক্ত। কেননা, এর এক অংশে আমার প্রশংসা এবং অপর অংশে বান্দাগণের দোয়া ও আরয হয়েছে। এ সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে, বান্দাগণ যা চাইবে তারা তা পাবে।

অতঃপর বান্দাগণ যখন বলে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (শেষ পর্যন্ত) তখন আল্লাহ্ বলেন, এসবই আমার বান্দাগণের জন্য এবং তারা যা চাইবে তা পাবে। (মাযহারী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। অর্থাৎ দুনিয়াতে যে কোন স্থানে যে কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, বাস্তবে তা আল্লাহ্রই প্রশংসা। কেননা, এ বিশ্ব চরাচরে অসংখ্য মনোরম দৃশ্যাবলী, অসংখ্য মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিরাজি আর সীমাহীন উপকারী বস্তুসমূহ সর্বদাই মানব মনকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে এবং তাঁর প্রশংসায় উদ্বুদ্ধ করতে

থাকে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, সকল বস্তুর অন্তরালেই এক অদৃশ্য সত্তার নিপুণ হাত সদা সক্রিয় রয়েছে।

যখন পৃথিবীর কোথাও কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে তা উক্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তার প্রতিই গিয়ে বর্তায়। যেমন কোন চিত্র, কোন ছবি বা নির্মিত বস্তুর প্রশংসা করা হলে প্রকৃতপক্ষে সে প্রশংসা প্রস্তুতকারকেরই করা হয়।

এ বাক্যটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামনে বাস্তবতার একটি নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের সামনে যা কিছু রয়েছে এ সব কিছুই একটি একক সত্তার সাথে জড়িত এবং সকল প্রশংসাই সে অনন্ত অসীম শক্তির। এ সব দেখে কারো অন্তরে যদি প্রশংসাবাণীর উদ্রেক হয় এবং মনে করে যে, তা অন্য কারো প্রাপ্য, তবে এ ধারণা জ্ঞান-বুদ্ধির সংকীর্ণতারই পরিচায়ক। সুতরাং নিঃসন্দেহে একথাই বলতে হয় যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه। যদিও প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে অতি সূক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা রহিত করা হলো। তাছাড়া এর দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে একত্ববাদের শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। আল-কোরআনের এ ক্ষুদ্র বাক্যটিকে একদিকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করা হয়েছে এবং অপরদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নিমগ্ন মানব মনকে এক অতিবাস্তবের দিকে আকৃষ্ট করত যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর পূজা-অর্চনাকে চিরতরে রহিত করা হয়েছে। এতদসঙ্গে অতি হেকমতের সাথে বা অকাট্যভাবে ঈমানের সর্বপ্রথম স্তম্ভ 'তওহীদ' বা একত্ববাদের পরিপূর্ণ নকশাও তুলে ধরা হয়েছে। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, বাক্যটিতে যে দাবি করা হয়েছে, সে দাবির স্বপক্ষে দলীলও দেওয়া হয়েছে। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এ ক্ষুদ্র বাক্যটির পরেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রথম গুণবাচক নাম 'রাব্বুল আলামীন'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে এর তফসীর লক্ষণীয়। আরবী ভাষায় رَبٌّ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পালনকর্তা। লালন-পালন বলতে বোঝায়, কোন বস্তুকে তার সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে সামনে অগ্রসর করে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেওয়া।

এ শব্দটি একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। সম্বন্ধপদ রূপে অন্যের জন্যেও ব্যবহার করা চলে, সাধারণভাবে নয়। কেননা, প্রত্যেকটি প্রাণী বা সৃষ্টিই প্রতিপালিত হওয়ার মুখাপেক্ষী, তাই সে অন্যের প্রকৃত প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে পারে না।

اَلْعٰلَمِيْنَ। শব্দটি عَالَم শব্দের বহুবচন। এতে পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত। যথা—আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, তারা-নক্ষত্ররাজি, বিজলী, বৃষ্টি, ফেরেশতাকুল, জ্বিন, যমীন এবং এতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে। জীবজন্তু, মানুষ, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-এর অর্থ হচ্ছে—আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির পালনকর্তা। তাছাড়া একথাও চিন্তার ঊর্ধ্বে নয় যে, আমরা যে দুনিয়াতে বসবাস করছি এর মাধ্যও কোটি কোটি সৃষ্ট বস্তু রয়েছে। এ সৃষ্টিগুলোর মধ্যে যা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং যা আমরা দেখি না সে সবগুলোই এক একটা আলম বা জগত।

তাছাড়া আরো কোটি কোটি সৃষ্টি রয়েছে, যা সৌরজগতের বাইরে, যা আমরা অবলোকন করতে পারি না। ইমাম রাযী তফসীরে-কবীরে লিখেছেন যে, এ সৌরজগতের বাইরে আরো সীমাহীন জগত রয়েছে। যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত এবং একথা সর্বজনবিদিত যে, সকল বস্তুই

আল্লাহ্র ক্ষমতার অধীন। সুতরাং তাঁর জন্য সৌরজগতের অনুরূপ আরো সীমাহীন কতকগুলো জগত সৃষ্টি করে রাখা অসম্ভব মোটেই নয়।

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদ্রী (রা) বলেছেন যে, চল্লিশ হাজার জগত রয়েছে। আর এ পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম ও উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত একটি জগত। বাকীগুলির প্রত্যেকটিও অনুরূপ। হযরত মাকাতিল (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, জগতের সংখ্যা ৮০ হাজার। (কুরতুবী) এতে সন্দেহ করা হয় যে, মহাশূন্যে বায়ু না থাকায় মানুষ বা কোন প্রাণীর বাস করার উপযোগী নয় বলে কোন প্রাণী সেখানে জীবিত থাকতে পারে না। ইমাম রাযী এর উত্তরে বলেছেন যে, এটা এমন কোন জরুরী ব্যাপার নয় যে, এই জগতের বাইরে মহাশূন্যে যে অন্যান্য জগত রয়েছে, সেসব জগতের অধিবাসীদের প্রকৃতি ও অভ্যাস এই জগতের অধিবাসীদের মতই হতে হবে, যে জন্য তারা মহাশূন্যে জীবিত থাকতে পারবে না। বরং এরকমই বা হবে না কেন যে, সেসব জগতের অধিবাসীদের অভ্যাস ও প্রকৃতি এই জগতের অধিবাসীদের অভ্যাস ও প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আজ থেকে প্রায় সাতশ' সত্তর বছর আগে যখন মহাশূন্য ভ্রমণের উপকরণও আবিষ্কৃত হয়নি, সে যুগেই মুসলিম দার্শনিক ইমাম রাযী এসব তথ্য লিখেছেন। আজকাল রকেট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যানের যুগে মহাশূন্য ভ্রমণকারীরা যা কিছু বলেন, তা ইমাম রাযীর বর্ণনার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

এ জগতের বাইরে মহাশূন্যের কোন সীমা-পরিসীমা মানুষের জানা নেই। অতএব, নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন যে, সীমাহীন মহাশূন্যে আর কত সৃষ্টি রয়েছে। এই দুনিয়ার নিকটতম গ্রহ-উপগ্রহ চন্দ্র ইত্যাদির বাসিন্দা সম্পর্কে বর্তমান যুগের বিজ্ঞ বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, তাও তো এই যে, এ সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহে যদি কোন প্রাণী-জগতের অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তবে তাদের স্বভাব-চরিত্র এ দুনিয়ার বাসিন্দাদের অনুরূপ হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বরং গ্রহণযোগ্য যুক্তি হচ্ছে এই যে, তাদের স্বভাব-চরিত্র, আদত-অভ্যাস, আহার্য ও প্রয়োজন এখানকার বাসিন্দাগণ হতে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন হবে। এ জন্য একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করার কোন কারণ থাকতে পারে না। ইমাম রাযীর এই উক্তির সমর্থনে, আমেরিকার মহাশূন্য ভ্রমণকারী জনৈক বিজ্ঞানী আকাশ ভ্রমণ হতে প্রত্যাবর্তন করে মহাশূন্য সম্পর্কে কিছুটা অনুমান ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, মহাশূন্যের সীমারেখা সম্পর্কে কোন কিছুই বলার উপায় নেই। মহাশূন্যের আয়তন ও সীমারেখা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তা অনুমান করাও কঠিন ব্যাপার।

আল-কোরআনের এ ছোট বাক্যটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিজগতের লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত সুদৃঢ় ও কত অচিন্ত্যনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন ! আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত এবং গ্রহ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণা পর্যন্ত এই ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত এবং একজন অতি প্রাজ্ঞ পরিচালকের অধীনে প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই নিজ নিজ কর্তব্যে নিয়োজিত। মানুষের সামান্য খাদ্য, যা সে তাঁর মুখে দেয় তাতে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এর উৎপাদনের জন্য আকাশ ও যমীনের সমস্ত শক্তি এবং কোটি কোটি মানুষ ও জীব-জন্তুর পরিশ্রম তাতে শামিল রয়েছে। সমগ্র জগতের শক্তি এই এক লোকমা খাদ্য প্রস্তুতে এমনিভাবে ব্যস্ত যে, মানুষ এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেই তা দ্বারা যেন

পরম জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। সে যেন অনুধাবন করতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও যমীনের সকল সৃষ্টিকে মানবের উপকারের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন। যার সেবায় এত কিছু নিয়োজিত, তার জন্ম অনর্থক নয়। বরং তারও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্যই রয়েছে।

আল-কোরআনের এ আয়াতটিতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও মানব জীবনের মকসুদ বা লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ ‏.

অর্থাৎ জ্বিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। অন্য কোন কাজের জন্য নয়।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-এর নিখুঁত প্রতিপালন নীতিই পূর্বের বাক্য اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ-এর দলীল বা প্রমাণ। সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালনের দায়িত্ব একই পবিত্র সত্তার ; তাই তারিফ-প্রশংসারও প্রকৃত প্রাপক তিনিই ; অন্য কেউ নয়। এজন্য প্রথম আয়াত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-এ তারীফ-প্রশংসার সাথে ঈমানের প্রথম স্তম্ভ আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব বা তওহীদের কথা অতি সূক্ষ্মভাবে এসে গেছে।

দ্বিতীয় আয়াতে তাঁর গুণ, দয়ার প্রসঙ্গ رَحْمٰن ও رَحِيْم শব্দদ্বয়ের দ্বারা বর্ণনা করেছেন। উভয় শব্দই "গুণের আধিক্যবোধক বিশেষ্য" যাতে আল্লাহ্র দয়ার অসাধারণত্ব ও পূর্ণতার কথা বোঝায়। এ স্থলে এ গুণের উল্লেখ সম্ভবত এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে সমগ্র সৃষ্টিজগতের লালন-পালন, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এতে তাঁর নিজস্ব কোন প্রয়োজন নেই বা অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েও নয় ; বরং তাঁর রহমত বা দয়ার তাকীদেই তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যদি সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্বও না থাকে, তাতেও তাঁর কোন লাভ-ক্ষতি নেই। আর যদি সমগ্র সৃষ্টি অবাধ্যও হয়ে যায় তবে তাতেও তাঁর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ‏.

مَالِكٌ শব্দ مَلْكٌ ধাতু হতে গঠিত। এর অর্থ কোন বস্তুর উপর এমন অধিকার থাকা, যাকে ব্যবহার, রদবদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সব কিছু করার সকল অধিকার থাকবে। دِيْنٌ অর্থ প্রতিদান দেয়া। مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ-এর শাব্দিক অর্থ—প্রতিদান-দিবসের মালিক বা অধিপতি। অর্থাৎ প্রতিদান-দিবসের অধিকার ও আধিপত্য কোন্ বস্তুর উপরে হবে, তার কোন বর্ণনা দেওয়া হয়নি। তফসীরে কাশ্শাফে বলা হয়েছে যে, এতে 'আম' বা অর্থের ব্যাপকতার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদান দিবসে সকল সৃষ্টিরাজি ও সকল বিষয়ই আল্লাহ তা'আলার অধিকারে থাকবে। (কাশ্শাফ)

প্রতিদান দিবসের স্বরূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা

প্রথমত, প্রতিদান দিবস কাকে বলে এবং এর স্বরূপ কি ? দ্বিতীয়ত, সমগ্র সৃষ্টিরাজির উপর প্রতিদান দিবসে যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার একক অধিকার থাকবে,অনুরূপভাবে আজও

সকল কিছুর উপর তাঁরই তো একক অধিকার রয়েছে ; সুতরাং প্রতিদান দিবসের বৈশিষ্ট্য কোথায় ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, 'প্রতিদান-দিবস' সে দিনকেই বলা হয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা ভাল-মন্দ সকল কাজ-কর্মের প্রতিদান দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। 'রোযে-জাযা' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে, দুনিয়া ভাল-মন্দ কাজ-কর্মের প্রকৃত ফলাফল পাওয়ার স্থান নয় ; বরং ইহা কর্মস্থল, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জায়গা। যথার্থ প্রতিদান বা পুরস্কার গ্রহণেরও স্থান এটা নয়। এতে এ কথাও বোঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে কারও অর্থ-সম্পদের আধিক্য ও সুখ-শান্তির ব্যাপকতা দেখে বলা যাবে না যে, এ লোক আল্লাহ্‌র দরবারে মকবুল হয়েছেন বা তিনি আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র। অপরপক্ষে কাকেও বিপদাপদে পতিত দেখেও বলা যাবে না যে, তিনি আল্লাহর অভিশপ্ত। যেমনি করে কর্মস্থলে বা কারখানার কোন কোন লোককে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যস্ত দেখে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে বিপদগ্রস্ত বলতে পারে না এবং সে নিজেও দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত বলে নিজেকে বিপদগ্রস্ত বলে ভাবে না ; বরং সে এ ব্যস্ততাকে জীবনের সাফল্য বলেই গণ্য করে এবং যদি কেউ অনুগ্রহ করে তাকে এ ব্যস্ততা থেকে রেহাই দিতে চায়, তবে তাকে সে সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর বলে মনে করে। সে তার এ ত্রিশ দিনের পরিশ্রমের অন্তরালে এমন এক আরাম দেখতে পায়, যা তার বেতনস্বরূপ সে লাভ করে।

এই জন্যই নবীগণ এ দুনিয়ার জীবনে সর্বাপেক্ষা বেশি বিপদাপদে পড়েছেন এবং তারপর ওলী-আউলিয়াগণ সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছেন। কিন্তু দেখা গেছে, বিপদের তীব্রতা যত কঠিনই হোক না কেন, দৃঢ়পদে তাঁরা তা সহ্য করেছেন। এমনকি আনন্দিত চিত্তেই তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন। মোটকথা, দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে সত্যবাদিতা ও সঠিকতা এবং বিপদাপদকে খারাপ কাজের নিদর্শন বলা যায় না।

অবশ্য কখনো কখনো কোন কোন কর্মের সামান্য ফলাফল দুনিয়াতেও প্রকাশ করা হয় বটে, তবে তা সে কাজের পূর্ণ বদলা হতে পারে না। এগুলো সাময়িকভাবে সতর্ক করার জন্য একটু নিদর্শন মাত্র। এ প্রসঙ্গে আল-কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۔

অর্থাৎ—এবং আমরা মানুষকে (পরকালের বড় শাস্তির) আগেই দুনিয়াতে কিছু শাস্তি দিয়ে থাকি, যেন তারা মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসে।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থাৎ–এরূপ শাস্তি হয়ে থাকে এবং পরকালের শাস্তি আরো বড়, যদি তা তারা বুঝে !

মোটকথা, দুনিয়ার আরাম-আয়েশ এবং বিপদাপদ কোন কোন সময় পরীক্ষা স্বরূপও হয়ে থাকে, আবার কোন কোন সময় সতর্কীকরণের জন্যও শাস্তিরূপে প্রবর্তিত হয়।

কিন্তু তা কর্মের পূর্ণ ফলাফল নয়, সামান্য নমুনা মাত্র। কেননা, এ সব কিছুই ক্ষণিকের এবং ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও শাস্তি হবে পরকালে। যেদিন সে শান্তি অথবা শাস্তি দেওয়া হবে, সেদিনের নামই প্রতিদান দিবস। যখন বোঝা গেল যে, ভাল ও মন্দ কাজের পরিপূর্ণ প্রতিদানের স্থান এ পৃথিবী নয়, তখন বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তির কথা হচ্ছে এই যে, ভাল ও

মন্দ যেন একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে না যায়, সে জন্য প্রত্যেক কাজের প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া উচিত। এজন্যই এ জগৎ ব্যতীত একটি ভিন্ন জগতের প্রয়োজন। যেখানে ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সকল কাজের প্রতিদান ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে দেওয়া হবে। কোরআনের ভাষায় তাকেই 'প্রতিদান দিবস'—কিয়ামত বা পরকাল বলা হয়।

সূরা আল-মু'মিনে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلاَ الْمُسِئُ ط قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ . اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُوْنَ .

অর্থাৎ–অন্ধ এবং দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন এক পর্যায়ের নয়, তেমনি যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করে, আর যারা মন্দ কাজ করে তারা পরস্পর সমান নয়। তোমরা অত্যন্ত কম বুঝ। কিয়ামত অবশ্যই হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না।

মালিক কে ?

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বাক্যটিতে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই একথা জানেন যে, সেই একক সত্তাই প্রকৃত মালিক, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং এর লালন-পালন ও বর্ধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং যাঁর মালিকানা পূর্ণরূপে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই সর্বাবস্থায় পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ—প্রকাশ্যে, গোপনে, জীবিতাবস্থায় ও মৃতাবস্থায় তিনিই একমাত্র মালিক এবং যার মালিকানার আরম্ভ নেই, শেষও নেই। এ মালিকানার সাথে মানুষের মালিকানার কোন তুলনা চলে না। কেননা, মানুষের মালিকানা আরম্ভ ও শেষের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ। এক সময় তা চলে না, কিছুদিন পরেই তা থাকবে না। অপরদিকে মানুষের মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য। বস্তুর বাহ্যিক দিকের ওপরই তা বর্তায়, গোপনীয় দিকের ওপর নয়। জীবিতের ওপর, মৃতের ওপর নয়। এজন্যই প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানা কেবলমাত্র প্রতিদান দিবসেই নয়, পৃথিবীতেও সমস্ত সৃষ্টজগতের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। তবে এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানা বিশেষভাবে 'প্রতিদান-দিবসের' এ কথা বলার তাৎপর্য কি ? আল-কোনআনের অন্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, যদিও দুনিয়াতেও প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্ তা'আলারই কিন্তু তিনি দয়াপরবশ হয়ে আংশিক বা ক্ষণস্থায়ী মালিকানা মানবজাতিকেও দান করেছেন এবং জাগতিক জীবনের আইনে এ মালিকানার প্রতি সম্মানও দেখানো হয়েছে। বিশ্বচরাচরে মানুষ ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর এবং আসবাবপত্রের ক্ষণস্থায়ী মালিক হয়েও এতে একেবারে ডুবে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ একথা ঘোষণা করে এ অহংকারী ও নির্বোধ মানব-সমাজকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমাদের এ মালিকানা, আধিপত্য ও সম্পর্ক মাত্র কয়েক দিনের এবং ক্ষণিকের। এমন দিন অতি সত্বরই আসছে, যে দিন কেউই জাহেরী মালিকও থাকবে না, কেউ কারো দাস বা কেউ কারো সেবা পাবার উপযোগীও থাকবে না। সমস্ত বস্তুর মালিকানা এক একক সত্তার হয়ে যাবে। এ আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা সূরা আল-মু'মিনের এ আয়াতে দেওয়া হয়েছে ঃ

يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْئٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ . اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ - اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ .

অর্থাৎ-"যেদিন সমস্ত মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবে, সেদিন তাদের কোন কথাই আল্লাহ্র নিকট গোপন থাকবে না। আজ কার রাজত্ব ? (উত্তরে) সে আল্লাহ্ তা'আলার যিনি একক ও পরাক্রান্ত। আজ প্রত্যেককে তার কর্মফল দান করা হবে। আজ কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা অতি তাড়াতাড়ি হিসাব নিতে পারেন।"

সূরা আল-ফাতিহার প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ্র প্রশংসা ও তা'রীফের বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর তফসীরে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে সাথে ঈমানের মৌলিক নীতি ও আল্লাহ্র একত্ববাদের বর্ণনাও সূক্ষ্মভাবে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতের তফসীরে আপনি অবগত হলেন যে, এর দু'টি শব্দে তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে সাথে ইসলামের বিপ্লবাত্মক মহত্তম আকীদা যথা কিয়ামত ও পরকালের বর্ণনা প্রমাণসহ উপস্থিত করা হয়েছে।

এখন চতুর্থ আয়াতের বর্ণনা ঃ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এ আয়াতের এক অংশে তা'রীফ ও প্রশংসা এবং অপর অংশে দোয়া ও দরখাস্ত। نَعْبُدُ — عِبَادَتْ শব্দ হতে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে ঃ কারো প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দরুন তাঁর নিকট নিজের আন্তরিক কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা। نَسْتَعِيْنَ — اِسْتِعَانَتْ হতে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে কারো সাহায্য প্রার্থনা করা। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 'আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।' মানবজীবন তিনটি অবস্থায় অতিবাহিত হয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। পূর্বের তিনটি আয়াতের মধ্যে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এবং এ দু'টি আয়াতে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অতীতে সে কেবল একমাত্র আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী ছিল, বর্তমানেও সে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী। অস্তিত্বহীন এক অবস্থা থেকে তিনি তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তাকে সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর আকার-আকৃতি এবং বিবেক ও বুদ্ধি দান করেছেন। বর্তমানে তার লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের নিয়মিত সুব্যবস্থা তিনিই করেছেন। অতঃপর مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ। এর মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতেও সে আল্লাহ তা'আলারই মুখাপেক্ষী। প্রতিদান দিবসে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য পাওয়া যাবে না।

এ তিনটি আয়াতের দ্বারা যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, মানুষ তার জীবনের তিনটি কালেই একান্তভাবে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী, তাই সাধারণ যুক্তির চাহিদাও এই যে, ইবাদতও তাঁরই করতে হবে। কেননা, ইবাদত যেহেতু অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে নিজের অফুরন্ত কাকুতি-মিনতি নিবেদন করার নাম, সুতরাং তা পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোন সত্তা নেই। ফল কথা এই যে, একজন বুদ্ধিমান ও বিবেকবান ব্যক্তি মনের গভীরতা থেকেই এ স্বতঃস্ফূর্ত

স্বীকৃতি উচ্চারণ করছে যে, আমরা তোমাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না। এ মৌলিক চাহিদাই إِيَّاكَ نَعْبُدُ।-তে বর্ণনা করা হয়েছে।

যখন স্থির হলো যে, অভাব পূরণকারী একক সত্তা আল্লাহ্ তা'আলা, সুতরাং নিজের সকল কাজে সাহায্যও তাঁর নিকটই চাওয়া দরকার। এ মৌলিক চাহিদারই বর্ণনা وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -এ করা হয়েছে। মোটকথা, এ চতুর্থ আয়াতে একদিকে আল্লাহ্ তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে একথারও স্বীকৃতি রয়েছে যে, ইবাদত ও শ্রদ্ধা পাওয়ার একমাত্র তিনিই যোগ্য। অপরদিকে তাঁর নিকট সাহায্য ও সহায়তার প্রার্থনা করা এবং তৃতীয়ত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। এতদসঙ্গে এও বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোন বান্দাই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও অভাব পূরণকারী মনে করবে না। অপর কারো নিকট প্রার্থনার হাত প্রসারিত করা যাবে না। অবশ্য কোন নবী বা কোন ওলীর বরাত দিয়ে প্রার্থনা করা এ আয়াতের মর্মবিরোধী নয়।

এ আয়াতে এ বিষয়ও চিন্তা করা কর্তব্য যে, "আমরা তোমারই নিকট সাহায্য চাই।" কিন্তু কোন্ কাজের সাহায্য চাই, তার কোন উল্লেখ নেই। জমহুর মুফাস্‌সিরীনের অভিমত এই যে, নির্দিষ্ট কোন ব্যাপারে সাহায্যের কথা উল্লেখ না করে 'আম বা সাধারণ সাহায্যের প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, আমি আমার ইবাদত এবং প্রত্যেক ধর্মীয় ও পার্থিব কাজে এবং অন্তরে পোষিত প্রতিটি আশা-আকাঙ্ক্ষায় কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

ইবাদত শুধু নামায-রোযারই নাম নয়। ইমাম গায্‌যালী (র) স্বীয় গ্রন্থ 'আরবাঈন'-এ দশ প্রকার ইবাদতের কথা লিখেছেন। যথা–নামায, যাকাত, রোযা, কোরআন তিলাওয়াত, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র স্মরণ, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা, প্রতিবেশী এবং সাথীদের প্রাপ্য পরিশোধ করা, মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া, রসূলের সুন্নত পালন করা।

একই কারণে ইবাদতে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও অংশীদার করা চলে না। এর অর্থ হচ্ছে, কারো প্রতি ভালবাসা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার সমতুল্য হবে না। কারো প্রতি ভয়, কারো প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁর প্রতি পোষিত আশা-আকাঙ্ক্ষার সমতুল্য হবে না। আবার কারো ওপর একান্ত ভরসা করা, কারো আনুগত্য ও খেদমত করা, কারো কাজকে আল্লাহর ইবাদতের সমতুল্য আবশ্যকীয় মনে করা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সামনে স্বীয় কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা এবং যে কাজে অন্তরের আবেগ-আকুতি প্রকাশ পায়, এমন কাজ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা যথা রুকূ বা সিজদা করা ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই বৈধ হবে না।

শেষ তিনটি আয়াতে মানুষের দোয়া ও আবেদনের বিষয়বস্তু এবং এক বিশেষ প্রার্থনা-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ . صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ .

অর্থাৎ–আমাদেরকে সরল পথ দেখাও ; সে সমস্ত মানুষের পথ, যারা তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে। যে পথে তোমার অভিশপ্ত বান্দাগণ চলেছে সে পথে নয়, এবং ঐ সমস্ত লোকের রাস্তাও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

এ তিনটি আয়াতে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন সরল পথের হেদায়েতের জন্য যে আবেদন এ আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এর আবেদনকারী যেমনিভাবে সাধারণ মানুষ, সাধারণ মু'মিনগণ, ঠিক অনুরূপভাবে আওলিয়া, গাউস-কুতুব এবং নবী-রসূলগণও। নিঃসন্দেহে যাঁরা হেদায়েতপ্রাপ্ত, বরং অন্যের হেদায়েতের উৎসস্বরূপ, তাঁদের পক্ষে পুনরায় সে হেদায়েতের জন্যই বারংবার প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য কি ? এ প্রশ্নের উত্তর 'হেদায়েত' শব্দের তাৎপর্য পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করার ওপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, যাতে আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর ছাড়াও 'হেদায়েত' শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা যেসব পরস্পর বিরোধিতা আঁচ করেন, তাদের সকল প্রশ্নেরও মীমাংসা হয়ে যায়।

ইমাম রাগেব ইস্ফাহানী 'মুফরাদাতুল-কোরআনে' হেদায়েত শব্দের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর সারমর্ম হচ্ছে, 'কাউকে গন্তব্যস্থানের দিকে অনুগ্রহের সাথে পথপ্রদর্শন করা।' তাই হেদায়েত করা প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ এবং এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। হেদায়েতের একটি স্তর হচ্ছে সাধারণ ও ব্যাপক। এতে সমগ্র সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত। জড় পদার্থ উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগৎ পর্যন্ত এর আওতাধীন। প্রসঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রাণহীন জড় পদার্থ বা ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগতের সঙ্গে হেদায়েতের সম্পর্ক কোথায় ?

কোরআনের শিক্ষায় স্পষ্টতই এ তথ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, এমনকি প্রতিটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী প্রাণ ও অনুভূতির অধিকারী। স্ব-স্ব পরিমণ্ডলে প্রতিটি বস্তুর বুদ্ধি-বিবেচনা রয়েছে। অবশ্য এ বুদ্ধি ও অনুভূতির তারতম্য রয়েছে। কোনটাতে তা স্পষ্ট এবং কোনটাতে নিতান্তই অনুল্লেখ্য। যে সমস্ত বস্তুতে তা অতি অল্পমাত্রায় বিদ্যমান সেগুলোকে প্রাণহীন বা অনুভূতিহীন বলা যায়। বুদ্ধি ও অনুভূতির ক্ষেত্রে এ তারতম্যের জন্যই সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষ ও জ্বিন জাতিকেই শরীয়তের হুকুম-আহকামের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কারণ, সৃষ্টির এ দু'টি স্তরের মধ্যেই বুদ্ধি ও অনুভূতি পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, একমাত্র মানুষ ও জ্বিন জাতি ছাড়া সৃষ্টির অন্য কোন কিছুর মধ্যে বুদ্ধি ও অনুভূতির অস্তিত্ব নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لاَّ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ٠

অর্থাৎ–এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহ্র প্রশংসার তস্বীহ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ্ বুঝতে পার না। (সূরা বনী-ইসরাঈল)

সূরা নূরে এরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَرَى اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰفّٰتٍ ط كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰوتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ٠

অর্থাৎ–তোমরা কি জান না যে, আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে, সকলেই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা ও গুণগান করে ? বিশেষত পাখিকুল যারা দু'পাখা বিস্তার করে শূন্যে উড়ে

বেড়ায়, তাদের সকলেই স্ব-স্ব দোয়া-তসবীহ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং আল্লাহ্ তা'আলাও ওদের তসবীহ সম্পর্কে খবর রাখেন।

একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়ের ওপরই তাঁর তা'রীফ ও প্রশংসা নির্ভরশীল। আর এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহর পরিচয় লাভ করাই সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞান। এটা বুদ্ধি-বিবেক ও অনুভূতি ব্যতীত সম্ভব নয়। এ আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুরই প্রাণ ও জীবন আছে এবং বুদ্ধি ও অনুভূতিও রয়েছে। তবে কোন কোনটির মধ্যে এর পরিমাণ এত অল্প যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তা অনুভব করা যায় না। তাই পরিভাষাগতভাবে ওগুলোকে প্রাণহীন ও বুদ্ধিহীন জড় পদার্থ বলা হয়। আর এ জন্যেই ওদেরকে শরয়ী আদেশের আওতাভুক্ত করা হয়নি। গোটা বস্তুজগত সম্পর্কিত এ মীমাংসা আল-কোরআনে সে যুগেই দেওয়া হয়েছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথাও আধুনিককালের কোন দার্শনিকও ছিল না, দর্শনবিদ্যার কোন পুস্তকও রচিত হয়নি। পরবর্তী যুগের দার্শনিকগণ এ তথ্যের যথার্থতা স্বীকার করেছেন এবং প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যেও এ মত পোষণ করার মত অনেক লোক ছিল। মোটকথা, আল্লাহ্র হেদায়েতের এ প্রথম স্তরে সমস্ত সৃষ্টিজগত যথা–জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণিজগত, মানবমণ্ডলী ও জ্বিন প্রভৃতি সকলেই অন্তর্ভুক্ত। এ সাধারণ হেদায়েতের উল্লেখই আল-কোরআনের এ আয়াতে اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى করা হয়েছে। অর্থাৎ– "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব দান করেছেন এবং সে অনুপাতে তাকে হেদায়েত দান করেছেন।"

এ বিষয়ে সূরা আ'লায় এরশাদ হয়েছে ঃ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ٠

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মহান পালনকর্তার গুণগান কর। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোকে সঠিক অবস্থা দান করেছেন। যিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং পথ দেখিয়েছেন।

অর্থাৎ—যিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য বিশেষ অভ্যাস এবং বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন এবং সে মেজাজ ও দায়িত্বের উপযোগী হেদায়েত দান করেছেন। এ ব্যাপারে হেদায়েতের পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই অতি নিপুণভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে। যে বস্তুকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে সেই কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব ও নৈপুণ্যের সাথে পালন করছে। যথা—মুখ হতে নির্গত শব্দ নাক বা চক্ষু কেউই শ্রবণ করতে পারে না, অথচ এ দু'টি মুখের নিকটতম অঙ্গ। পক্ষান্তরে এ দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু কানকে অর্পণ করেছেন, তাই একমাত্র কানই মুখের শব্দ শ্রবণ করে ও বুঝে। অনুরূপভাবে কান দ্বারা দেখা বা ঘ্রাণ লওয়ার কাজ করা চলে না। নাক দ্বারা শ্রবণ করা বা দেখার কাজও করা চলে না।

সূরা মরিয়মে এ বিষয়ে এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا

অর্থাৎ–আকাশ ও যমীনে এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহ্র বান্দারূপে আগমন করেনি।

হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তর এর তুলনায় অনেকটা সংকীর্ণ। অর্থাৎ সে সমস্ত বস্তুর সাথে জড়িত, পরিভাষায় যাদেরকে বিবেকবান বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়। অর্থাৎ মানুষ এবং জ্বিন জাতি। এ হেদায়েত নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌঁছেছে। কেউ এ হেদায়েতকে গ্রহণ করে মু'মিন হয়েছে আবার কেউ একে প্রত্যাখ্যান করে কাফির-বেদীনে পরিণত হয়েছে।

হেদায়েতের তৃতীয় স্তর আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তা শুধু মু'মিন ও মুত্তাকী বা ধর্মভীরুদের জন্য। এ হেদায়েত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন প্রকার মাধ্যম ব্যতীতই মানুষকে প্রদান করা হয়। এরই নাম তওফীক। অর্থাৎ এমন অবস্থা, পরিবেশ ও মনোভাব সৃষ্টি করে দেওয়া যে, তার ফলে কোরআনের হেদায়েতকে গ্রহণ করা এবং এর ওপর আমল করা সহজসাধ্য হয়ে যায় এবং এর বিরুদ্ধাচরণ কঠিন হয়ে পড়ে। এ তৃতীয় স্তরের পরিসীমা অতি ব্যাপক। এ স্তরই মানবের উন্নতির ক্ষেত্র। নেক কাজের সাথে এ হেদায়েতের বৃদ্ধি হতে থাকে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ বৃদ্ধির উল্লেখ রয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا .

অর্থাৎ–"যারা আমার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে আমি তাদেরকে আমার পথে আরো অধিকতর অগ্রসর হওয়ার পথ অবশ্যই দেখিয়ে থাকি।" এটি সেই কর্মক্ষেত্র যেখানে নবী-রাসূল এবং বড় বড় ওলী-আউলিয়া, কুতুবগণকেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আরো অধিকতর হেদায়েত ও তওফীকের জন্য চেষ্টায় রত থাকতে দেখা গেছে।

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, হেদায়েত এমন এক বস্তু যা সকলেই লাভ করেছে এবং এর আধিক্য লাভ করার জন্য বড় হতে বড় ব্যক্তির পক্ষেও কোন বাধা-নিষেধ নেই। এ জন্যই সূরা আল-ফাতিহায় গুরুত্বপূর্ণ দোয়ারূপে হেদায়েত প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা একজন সাধারণ মু'মিনের জন্যও উপযোগী, আবার একজন বড় হতে বড় রসূলের জন্যও উপযোগী। এজন্যই হযরত রসূলে আকরাম (সা)-এর শেষ জীবনে সূরা ফাত্হ্তে মক্কা বিজয়ের ফলাফল বর্ণনা করতে গিয়ে একথাও বলা হয়েছে যে, وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا অর্থাৎ মক্কা বিজয় এজন্যই আপনার দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে, যাতে সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত লাভ হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা) কেবল নিজেই হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন না ; বরং অন্যের জন্যও ছিলেন হেদায়েতের উৎস। এমতাবস্থায় তাঁর হেদায়েত লাভের একমাত্র অর্থ হতে পারে, এ সময় হেদায়েতের কোন উচ্চতর অবস্থা তিনি লাভ করেছেন।

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যা পবিত্র কোরআন বুঝবার ক্ষেত্রে যে সব ফায়দা প্রদান করবে সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ ঃ

এক. পবিত্র কোরআনের কোথাও কোথাও মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সবার জন্যই হেদায়েত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোথাও শুধুমাত্র মুত্তাকীদের জন্য বিশেষ অর্থে হেদায়েত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে করে অজ্ঞ লোকদের পক্ষে সন্দেহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু হেদায়েতের সাধারণ ও বিশেষ স্তরসমূহ জানার পর এ সন্দেহ

আপনা-আপনিতেই দূরীভূত হয়ে যাবে। বুঝতে হবে যে, কারো বেলায় ব্যাপক অর্থে এবং কারো বেলায় বিশেষ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

দুই. আল-কোরআনের স্থানে স্থানে এরশাদ হয়েছে যে, জালেম ও ফাসেকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়েত দান করেন না। অন্যত্র বারবার এরশাদ হয়েছে যে, তিনি সকলকেই হেদায়েত দান করেন। এর উত্তর ও হেদায়েতের স্তরসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে দেওয়া হয়েছে যে, হেদায়েতের ব্যাপক অর্থে সকলেই হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং বিশেষ অর্থে জালেম ও ফাসেকরা বাদ পড়েছে।

তিন. হেদায়েতের তিনটি স্তরের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় স্তর সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ পর্যায়ের হেদায়েত একান্তভাবে একমাত্র তাঁরই কাজ। এতে নবী-রসূলগণেরও কোন অধিকার নেই। নবী-রসূলগণের কাজ শুধু হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরে সীমিত। কোরআনের যেখানে যেখানে নবী-রসূলগণকে হেদায়েতকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে। আর যেখানে এরশাদ হয়েছে ঃ اِنَّكَ لَنْ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ। অর্থাৎ "আপনি যাকে চান তাকেই হেদায়েত করতে পারবেন না"–এতে হেদায়েতের তৃতীয় স্তরের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কাউকে তওফীক দান করা আপনার কাজ নয়।

মোটকথা, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ একটি ব্যাপক ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দোয়া, যা মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানবসমাজের কোন ব্যক্তিই এর আওতার বাইরে নেই। কেননা, সরল-সঠিক পথ ব্যতীত দীন-দুনিয়ার কোন কিছুতেই উন্নতি ও সাফল্য সম্ভব নয়। দুনিয়ার আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যেও সিরাতে-মুস্তাকীমের প্রার্থনা পরশপাথরের মত। কিন্তু মানুষ তা লক্ষ্য করে না। আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ "আমাদিগকে সরল পথ দেখিয়ে দিন।"

সরল পথ কোন্‌টি ? সোজা সরল রাস্তা সে পথকে বলে, যাতে কোন মোড় বা ঘোরপ্যাঁচ নেই। এর অর্থ হচ্ছে, ধর্মের সে রাস্তা যাতে 'ইফরাত' বা 'তফরীত'-এর অবকাশ নেই। ইফরাতের অর্থ সীমা অতিক্রম করা এবং তফরীত অর্থ মর্জিমত কাট-ছাঁট করে নেওয়া। এরশাদ হয়েছে ঃ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ–যে সকল লোক আপনার অনুগ্রহ লাভ করেছে তাদের রাস্তা। যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ করেছে, তাদের পরিচয় অন্য একটি আয়াতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ .

অর্থাৎ–যাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল সালেহীন। আল্লাহ্র দরবারে মকবুল উপরোক্ত লোকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর নবীগণের। অতঃপর নবীগণের উম্মতের মধ্যে যাঁরা সর্বাপেক্ষা বড় মরতবা ও মর্যাদার অধিকারী, তাঁরা হলেন সিদ্দীক। যাঁদের মধ্যে রূহানী কামালিয়াত ও পরিপূর্ণতা রয়েছে, সাধারণ ভাষায় তাঁদেরকে 'আউলিয়া' বলা হয়। আর যাঁরা দীনের প্রয়োজনে স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন, তাঁদেরকে বলা হয় শহীদ। আর সালেহীন হচ্ছেন—যাঁরা ওয়াজিব, মুস্তাহাব প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ও আমলকারী, সাধারণ পরিভাষায় এঁদেরকে দীনদার বলা হয়।

এ আয়াতের প্রথম অংশে হ্যাঁ-সূচক বাক্য ব্যবহার করে সরল পথের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরোক্ত চার স্তরের মানুষ যে পথে চলেছেন তা-ই সরল পথ। পরে শেষ আয়াতে না-সূচক বাক্য ব্যবহার করেও এর সমর্থন করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ .

অর্থাৎ–যারা আপনার অভিসম্পাতগ্রস্ত তাদের পথ নয় এবং তাদের পথও নয়, যারা পথহারা হয়েছে।

مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ বলতে ঐ সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা ধর্মের হুকুম-আহকামকে বুঝে-জানে, তবে স্বীয় অহমিকা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করেছে। অন্য শব্দে বলা যায়, যারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ মান্য করতে গাফলতি করেছে। যেমন, সাধারণভাবে ইহুদীদের নিয়ম ছিল, সামান্য স্বার্থের জন্য দীনের নিয়ম-নীতি বিসর্জন দিয়ে তারা নবী-রাসূলগণের অবমাননা পর্যন্ত করতে দ্বিধাবোধ করত না। ضَالِّيْن–তাদেরকে বলা হয়, যারা না বুঝে অজ্ঞতার দরুন ধর্মীয় ব্যাপারে ভুল পথের অনুসারী হয়েছে এবং ধর্মের সীমালঙ্ঘন করে অতিরঞ্জনের পথে অগ্রসর হয়েছে। যথা–নাসারাগণ। তারা নবীর শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদানের নামে বাড়াবাড়ি করেছে ; যেমন নবীদেরকে আল্লাহ্র পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। ইহুদীদের বেলায় এটা অন্যায় এজন্য যে, তারা আল্লাহ্র নবীদের কথা মানেনি ; এমন কি তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে।

আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে—আমরা সে পথ চাই না, যা নফসানী উদ্দেশ্যের অনুগত হয় এবং মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে ও ধর্মের মধ্যে সীমালঙ্ঘনের প্রতি প্ররোচিত করে। সে পথও চাই না, যে পথ অজ্ঞতা ও মূর্খতার দরুন ধর্মের সীমারেখা অতিক্রম করে। বরং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সোজা-সরল পথ চাই। যার মধ্যে না অতিরঞ্জন আছে, আর না কম-কছুরী আছে এবং যা নফসানী প্রভাব ও সংশয়ের উর্ধ্বে।

সূরা আল-ফাতিহার আয়াত সাতটির তফসীর শেষ হয়েছে। এখন সমগ্র সূরার সারমর্ম হচ্ছে এ দোয়া—'হে আল্লাহ্ ! আমাদিগকে সরল পথ দান করুন। কেননা, সরল পথের সন্ধান লাভ করাই সবচাইতে বড় জ্ঞান ও সর্বাপেক্ষা বড় কামিয়াবী। বস্তুত সরল পথের সন্ধানে ব্যর্থ হয়েই দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়েছে। অন্যথায় অ-মুসলমানদের মধ্যেও সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করার আগ্রহ-আকুতির অভাব নেই। এজন্যই কোরআন পাকে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় পদ্ধতিতেই সিরাতে-মুস্তাকীমের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ্র কিতাবের শিক্ষা এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদের অনুসরণের মধ্যেই সরল পথ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা রয়েছে ঃ এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। আর এ ব্যাপারে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে যায়। তা হচ্ছে, সিরাতে-মুস্তাকীম নির্ধারণ করার জন্য বস্তুত সিরাতে রাসূল, সিরাতে-কোরআন বলে দেওয়াই তো যথেষ্ট ছিল। উপরোক্ত দু'টি পথ চিহ্নিত করা যেমন সংক্ষিপ্ত ছিল, তেমনি ছিল সুস্পষ্ট। কেননা সমগ্র কোরআনই তো সিরাতে মুস্তাকীমের বিস্তারিত বর্ণনা। অপরদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সমগ্র শিক্ষা হচ্ছে কোরআনেরই বিস্তারিত বর্ণনা। অথচ আলোচ্য এ

ছোট্ট সূরাটির দু'টি আয়াতে সহজ এবং স্বচ্ছ দু'টি পন্থা বাদ দিয়ে প্রথম ইতিবাচক এবং পরে নেতিবাচক পদ্ধতিতে সিরাতে-মুস্তাকীম চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন—যদি সিরাতে মুস্তাকীম চাও, তবে এ সমস্ত লোককে তালাশ করে তাদের পথ অবলম্বন কর। কেননা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ দুনিয়াতে চিরকাল অবস্থান করবেন না। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রসূলেরও আগমন হবে না। তাই তাঁদের মধ্যে নবীগণ ছাড়াও সিদ্দীক, শহীদান ও সালেহীনকেও অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, কিয়ামত পর্যন্ত এঁদের অস্তিত্ব দুনিয়াতে থাকবে।

ফলকথা এই যে, সরল পথ অনুসন্ধানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কিছু সংখ্যক মানুষের সন্ধান দিয়েছেন ; কোন পুস্তকের হাওয়ালা দেননি। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) যখন সাহাবীগণকে জানিয়েছেন যে, আমার উম্মতও পূর্ববর্তী উম্মতগণের ন্যায় সত্তুরটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দলই সরল পথে থাকবে। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কোন্ দল ? প্রত্যুত্তরে তিনি যা বলেছিলেন, তাতেও তিনি কিছু লোকের সন্ধান দিয়েছেন। এরশাদ করেছেন ঃ ما انا عليه واصحابى অর্থাৎ আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে পথে রয়েছি সে পথই সত্য ও ন্যায়ের পথ। বিশেষ ধরনের এ বর্ণনা পদ্ধতিতে হয়তো সে দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-দীক্ষা কেবল কিতাব ও বর্ণনা দ্বারা সম্ভব হয় না, বরং দক্ষ ব্যক্তিগণের সাহচর্য ও সংশ্রবের মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে। বাস্তবপক্ষে মানুষের শিক্ষক এবং অভিভাবক মানুষই হতে পারে। কেবল কিতাব বা পুস্তক শিক্ষক ও অভিভাবক হতে পারে না।

এ এমনই এক বাস্তব সত্য যে, দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্মেও এর নিদর্শন বিদ্যমান। শুধু পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা কেউ না পারে কাপড় সেলাই করতে, না পারে আহার করতে। শুধু ডাক্তারী বইপত্র পাঠ করে কেউ ডাক্তার হতে পারে না। ইঞ্জিনিয়ারিং বইপত্র পাঠ করে কেউ ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারে না। অনুরূপভাবে শুধু কোরআন-হাদীস পাঠ করাই কোন মানুষের পরিপূর্ণ তা'লীম ও তরবিয়তের জন্য যথার্থ হতে পারে না। যে পর্যন্ত কোন বিজ্ঞ লোকের নিকট বাস্তবভাবে শিক্ষা গ্রহণ না করে, সে পর্যন্ত দীনের তা'লীম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কোরআন ও হাদীসের ব্যাপারে অনেকেই এ ভুল ধারণা পোষণ করে যে, কোরআনের অর্থ ও তফসীর পাঠ করে কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। এটা সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ ধারণা। কেননা, যদি কিতাব এ ব্যাপারে যথেষ্ট হতো তবে নবী ও রাসূল প্রেরণের প্রয়োজন হতো না। কিতাবের সাথে রাসূলকে শিক্ষকরূপে পাঠানো হয়েছে।

আর সরল পথ নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক স্বীয় মকবুল বান্দাদের তালিকা প্রদানও এর প্রমাণ যে, শুধু কিতাবের পাঠই পূর্ণ তা'লীম ও তরবিয়তের জন্য যথেষ্ট নয় ; বরং কোন কোন বিজ্ঞ লোকের নিকট এর শিক্ষালাভ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বোঝা গেল, মানুষের প্রকৃত মুক্তি এবং কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য দু'টি উপাদানের প্রয়োজন। প্রথম, আল্লাহ্‌র কিতাব যাতে মানবজীবনের সকল দিকের পথনির্দেশ রয়েছে এবং অপরটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা বা আল্লাহ-ওয়ালাগণ। তাঁদের কাছ থেকে ফায়দা হাসিল করার মাপকাঠি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের নিরিখে তাঁদেরকে পরীক্ষা করতে হবে। এ পরীক্ষায় যারা টিকবে না তারা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র নয় বলেই যারা সঠিক অর্থে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র স্থির হয়, তাঁদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাবের শিক্ষা লাভ করে তৎপ্রতি আমল করতে হবে।

মতানৈক্যের কারণ ঃ একশ্রেণীর লোক শুধু আল্লাহ্র কিতাবকে গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ্র পিয়পাত্রগণ থেকে দূরে সরে গিয়েছে ; তাঁদের তফসীর ও শিক্ষাকে কোন গুরুত্বই দেয়নি। আবার কিছু লোক আল্লাহ্র প্রিয়পাত্রগণকেই সত্যের মাপকাঠি স্থির করে আল্লাহ্র কিতাব থেকে দূরে সরে পড়েছে। বলা বাহুল্য, এই দুই পথের পরিণতিই গোমরাহী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরাতুল ফাতিহাতে প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও তা'রীফ রয়েছে। অতঃপর তাঁর ইবাদতের উল্লেখ রয়েছে। এতদসঙ্গে এ কথারও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকেও অভাব পূরণকারী মনে করি না। প্রকারান্তরে এটি আল্লাহ্র সাথে মানুষের একটা শপথ বিশেষ। অতঃপর রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা, যাতে মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়োজন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এতে কতিপয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাও সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

দোয়া করার পদ্ধতি ঃ এ সূরায় একটা বিশেষ ধরনের বর্ণনারীতির মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্র নিকট কোন দোয়া বা কোন আকুতি পেশ করতে হয়, তখন প্রথমে তাঁর তা'রীফ কর, তাঁর দেয়া সীমাহীন নিয়ামতের স্বীকৃতি দাও। অতঃপর একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কাউকেও দাতা ও অভাব পূরণকারী মনে করো না কিংবা অন্য কাউকেই ইবাদতের যোগ্য বলে স্বীকার করো না। অতঃপর স্বীয় উদ্দেশ্যের জন্য আরজী পেশ কর। এ নিয়মে যে দোয়া করা হয়, তা কবূল হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আশা করা যায়। দোয়া করতেও এমন ব্যাপক পদ্ধতি অবলম্বন কর, যাতে মানুষের সকল মকসুদ তার অন্তর্ভুক্ত থাকে। যথা, সরল পথ লাভ করা এবং দুনিয়ার যাবতীয় কাজে সরল-সঠিক পথ পাওয়া, যাতে কোথাও কোন ক্ষতি বা পদস্খলনের আশংকা না থাকে। মোটকথা, এ স্থলে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর তা'রীফ প্রশংসা করার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো মানবকুলকে শিক্ষা দেওয়া।

আল্লাহ্র তা'রীফ বা প্রশংসা করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব ঃ এ সূরার প্রথম বাক্যে আল্লাহ্র তা'রীফ বা প্রশংসা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তা'রীফ বা প্রশংসা সাধারণত কোন গুণের বা প্রতিদানের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে কোন গুণের বা প্রতিদানের উল্লেখ নেই।

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়ামত অগণিত। কোন মানুষ এর পরিমাপ করতে পারে না। কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا অর্থাৎ—যদি তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামতের গণনা করতে চাও, তবে তা পারবে না। মানুষ যদি সারা বিশ্ব হতে মুখ ফিরিয়ে শুধু নিজের অস্তিত্বের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তবে বুঝতে পারবে যে, তার শরীরই এমন একটি ক্ষুদ্র জগত, যাতে বৃহৎ জগতের সকল নিদর্শন বিদ্যমান। তার শরীর যমীন তুল্য। কেশরাজি উদ্ভিদ তুল্য। তার হাড়গুলো পাহাড়ের মত এবং শিরা-উপশিরা যাতে রক্ত চলাচল করে, সেগুলো নদী-নালা বা সমুদ্রের নমুনা। দু'টি বস্তুর সংমিশ্রণে মানুষের অস্তিত্ব। একটি শরীর ও অপরটি আত্মা। এ কথাও স্বীকৃত যে, মানবদেহে আত্মা সর্বাপেক্ষা উত্তম অংশ আর তার শরীর হচ্ছে আত্মার অনুগত এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের অধিকারী। এ নিকৃষ্ট অংশের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী চিকিৎসকগণ বলেছেন যে, মানবদেহে আল্লাহ তা'আলা

পাঁচ হাজার প্রকার উপাদান রেখেছেন। এতে তিন শতেরও অধিক জোড়া রয়েছে। প্রত্যেকটি জোড়া আল্লাহ্‌র কুদরতে এমন সুন্দর ও মজবুতভাবে দেওয়া হয়েছে যে, সর্বদা নড়াচড়া করা সত্ত্বেও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না এবং কোন প্রকার মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। সাধারণ মানুষের বয়স ষাট-সত্তর বছর হয়ে থাকে। এ দীর্ঘ সময় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সর্বদা নড়াচড়া করছে, অথচ এর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَا اَسْرَهُمْ

অর্থাৎ—"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমিই তাদের জোড়াগুলোকে মজবুত করেছি।" এ কুদরতী মজবুতির পরিণাম হয়েছে এই যে, সাধারণভাবে উহা অত্যন্ত নরম ও নড়বড়ে অথচ এ নড়বড়ে জোড়া সত্তুর বছর বা এর চাইতেও অধিক সময় পর্যন্ত কর্মরত থাকে। মানুষের অঙ্গগুলোর মধ্যে শুধু চক্ষুর কথাই ধরুন, এতে আল্লাহ তা'আলার অসাধারণ হেকমত প্রকাশিত হয়েছে, সারাজীবন সাধনা করেও এ রহস্যটুকু উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

এই চোখের এক পলকের কার্যক্রম লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে যে, এর এক মিনিটের কার্যক্রমে আল্লাহ তা'আলার কত নিয়ামত যে কাজ করছে, তা ভেবে অবাক হতে হয়। কেননা চক্ষু খুলে এর দ্বারা কত বস্তুকে সে দেখছে। এতে যেভাবে চক্ষুর ভেতরের শক্তি কাজ করছে, অনুরূপভাবে বহির্জগতের সৃষ্টিরাজিও এতে বিশেষ অংশ নিচ্ছে। সূর্যের কিরণ না থাকলে চোখের দৃষ্টিশক্তি কোন কাজ করতে পারে না। সূর্যের জন্য আকাশের প্রয়োজন হয়। মানুষের দেখার জন্য এবং চক্ষু দ্বারা কাজ করার জন্য আহার্য ও বায়ুর প্রয়োজন হয়। এতে বোঝা যায়, চোখের এক পলকের দৃষ্টির জন্য বিশ্বের সকল শক্তি ব্যবহৃত হয়। এ তো একবারের দৃষ্টি। এখন দিনে কতবার দেখে এবং জীবনে কতবার দেখে তা হিসাব করা মানুষের শক্তির উর্ধ্বে। এমনিভাবে কান, জিহবা, হাত ও পায়ের যত কাজ আছে তাতে সমগ্র জগতের শক্তি যুক্ত হয়ে কার্য সমাধা হয়। এ তো সে মহা দান যা প্রতিটি জীবিত মানুষ ভোগ করে। এতে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্রের কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে যা প্রতিটি প্রাণী ভোগ করেও উপকৃত হয়। আকাশ-যমীন এবং এ দু'টির মধ্যে সৃষ্ট সকল বস্তু যথা চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বায়ু প্রভৃতি প্রতিটি প্রাণীই উপভোগ করে।

এরপর আল্লাহ্‌র বিশেষ দান, যা মানুষের হেকমতের তাগিদে কম-বেশি দেওয়া হয়েছে, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, আরাম-আয়েশ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও একথা অত্যন্ত মৌলিক যে, সাধারণ নিয়ামত যা সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সমভাবে উপভোগ্য ; যথা–আকাশ, বাতাস, জমি এবং বিরাট এ প্রকৃতি, এ সমস্ত নিয়ামত বিশেষ নিয়ামতের (যথা ধন-সম্পদ) তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম। অথচ এসব নিয়ামত সকল মানুষের মধ্যে সমভাবে পরিব্যাপ্ত বলে, এত বড় নিয়ামতের প্রতি মানুষ দৃষ্টিপাত করে না। ভাবে, কি নিয়ামত! বরং আশপাশের সামান্য বস্তু যথা—আহার্য, পানীয়, বসবাসের নির্ধারিত স্থান, বাড়ি-ঘর প্রভৃতির প্রতিই তাদের দৃষ্টি সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে।

মোটকথা, সৃষ্টিকর্তা মানবজাতির জীবন-ধারণ এবং দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার সুবিধার্থে যে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন, তার অতি অল্পই এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পক্ষে দুনিয়ার জীবনে চোখ মেলেই মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই মহান দাতার

প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকা ছিল স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য যে, মানব-জীবনের সে চাহিদার প্রেক্ষিতে কোরআনের সর্বপ্রথম সূরার সর্বপ্রথম বাক্যে الحمد। ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই মহান সত্তার তা'রীফ বা প্রশংসাকে ইবাদতের শীর্ষস্থানে রাখা হয়েছে।

রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন নিয়ামত কোন বান্দাকে দান করার পর যখন সে الحمد لله। বলে তখন বুঝতে হবে, যা সে পেয়েছে, এই শব্দ তার চেয়ে অনেক উত্তম। (কুরতুবী)

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি বিশ্ব-চরাচরের সকল নিয়ামত লাভ করে এবং সেজন্য সে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে তবে বুঝতে হবে যে, সারা বিশ্বের নিয়ামতসমূহ অপেক্ষা তার الحمد। বলা অতি উত্তম। (কুরতুবী)

কোন কোন আলিমের মন্তব্য উদ্ধৃত করে কুরতুবী লিখেছেন যে, মুখে الحمد لله। বলা একটি নিয়ামত এবং এ নিয়ামত সারা বিশ্বের সকল নিয়ামত অপেক্ষা উত্তম। সহীহ্ হাদীসে আছে যে, الحمد لله। পরকালের তৌলদণ্ডের অর্ধেক পরিপূর্ণ করবে।

হযরত শকীক ইবনে ইবরাহীম الحمد।-এর ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কোন নিয়ামত দান করেন, তখন প্রথমে দাতাকে চেন এবং পরে তিনি যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক। আর তাঁর দেয়া শক্তি ও ক্ষমতা তোমাদের শরীরে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর অবাধ্যতার কাছেও যেও না।

দ্বিতীয় শব্দ لله। এর সাথে لام বর্ণটি যুক্ত। যাকে আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী খাস لام বলা হয়। যা কোন আদেশ বা গুণের বিশেষত্ব বোঝায়। এখানে অর্থ হচ্ছে যে, শুধু তা'রীফ বা প্রশংসাই মানবের কর্তব্য নয়। বরং এ তা'রীফ বা প্রশংসা তাঁর অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে তিনি ব্যতীত এ জগতে অন্য কেউ তা'রীফ বা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। এতদসঙ্গে এও তাঁর নিয়ামত যে, মানুষকে চরিত্র গঠন শিক্ষাদানের জন্য এ আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমার নিয়ামতসমূহ যে সকল মাধ্যম অতিক্রম করে আসে, সেগুলোরও শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর যে ব্যক্তি এহসানকারীর শোকর আদায় করে না, সে বাস্তবপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলারও শোকর করে না।

কোন মানুষের জন্যই নিজের প্রশংসা জায়েয নয় ঃ কোন মানুষের জন্য নিজের তা'রীফ বা প্রশংসা করা জায়েয নয়। কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى অর্থাৎ তোমরা আত্ম-প্রশংসা বা পবিত্রতার দাবি করো না, আল্লাহ্ই ভাল জানেন, কে মুত্তাকী। কেননা, মানুষের পক্ষে তা'রীফ বা প্রশংসার যোগ্য হওয়া তার তাকওয়া-পরহেযগারীর উপর নির্ভরশীল। কার পরহেযগারী কোন্ স্তরের তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। প্রশ্ন ওঠে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তো তাঁর প্রশংসা নিজেই করেছেন। উত্তর হচ্ছে এই, আল্লাহ্র প্রশংসা বা তা'রীফ কিভাবে করতে হবে সে পদ্ধতি উদ্ভাবন করার যোগ্যতা মানুষের নেই। পরন্তু আল্লাহ তা'আলার উপযোগী তা'রীফ বা প্রশংসা করাও মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে। রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন ঃ لا احصى ثناء عليك। আমি আপনার উপযোগী তা'রীফ বা প্রশংসা করতে পারি না। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর তা'রীফ বা প্রশংসা পদ্ধতি মানুষকে নিজের তরফ থেকে শিক্ষা দিয়েছেন।

'রব' আল্লাহ্‌র এক বিশেষ নাম, অন্য কাউকে এ নামে সম্বোধন জায়েয নয় ঃ কোন বস্তুর মালিক, পালনকর্তা এবং সর্ববিষয়ে সে বস্তুর পূর্ণতা বিধানের একচ্ছত্র অধিকারী কোন সত্তার প্রতিই কেবল 'রব' শব্দ প্রয়োগ করা যেতে পারে। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সমগ্র সৃষ্টিজগতের এরূপ মালিক ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। এ কারণেই এ শব্দ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নামের সাথেই ব্যবহৃত হতে পারে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে 'রব' বলা জায়েয নয়। সহীহ্ মুসলিম শরীফের হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে যে, কোন গোলাম বা কর্মচারী যেন তার মালিককে 'রব' শব্দ দ্বারা সম্বোধন না করে। অবশ্য বিশেষ কোন বস্তুর মালিকানা বোঝানোর অর্থে এ শব্দের প্রয়োগ চলতে পারে। যথা, রাব্বুল-বাইত,—বাড়ির মালিক ইত্যাদি। (কুরতুবী)

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ—এর অর্থ মুফাসসিরকুল-শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমরা তোমারই ইবাদত করি, তুমি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না। আর তোমারই সাহায্য চাই, তুমি ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য চাই না। (ইবনে জরীর, ইবনে আবি হাতেম)

সলফে-সালেহীনদের কেউ কেউ বলেছেন যে, সূরা আল-ফাতিহা সমগ্র কোরআনের সারমর্ম এবং اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ সমগ্র সূরা আল-ফাতিহার সারমর্ম। কেননা, এর প্রথম বাক্যে রয়েছে শিরক থেকে মুক্তির ঘোষণা এবং দ্বিতীয় বাক্যে তার পরিপূর্ণ শক্তি ও কুদরতের স্বীকৃতি। মানুষ দুর্বল, আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কোন কিছুই সে করতে পারে না। তাই সকল ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপর একান্তভাবে নির্ভর করা ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই। এ উপদেশ কোরআনের স্থানে স্থানে দেওয়া হয়েছে। যথা ঃ

— فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (هود)

— قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا (ملك)

— رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً (مزمل)

এ আয়াতগুলোর সারমর্ম হচ্ছে যে, মু'মিন স্বীয় আমল বা নিজের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না, আবার অন্য কারো সাহায্যের উপরও নয়। বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপরই তাকে পূর্ণ ভরসা করতে হবে। এতে আকায়েদের দু'টি মাসআলারও মীমাংসা হয়ে গেছে। যথা ঃ

এক. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত জায়েয নয়, তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ঃ ইতিপূর্বে ইবাদতের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কোন সত্তার অসীমতা, মহত্ত্ব এবং তাঁর প্রতি ভালবাসার ভিত্তিতে, তাঁর সামনে অশেষ কাকুতি-মিনতি পেশ করার নাম ইবাদত। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সাথে অনুরূপ আচরণ করাই শির্‌ক। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মূর্তিপূজার মত প্রতীকপূজা বা পাথরের মূর্তিকে খোদায়ী শক্তির আধার মনে করা বা কারো প্রতি সম্ভ্রম বা ভালবাসা এ পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া, যা আল্লাহ্‌র জন্য করা হয়, তাও শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত। কোরআনে ইহুদী ও নাসারাদের অনুসৃত শির্‌কের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ .

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাদের সাধু-সন্ন্যাসীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। আদী ইবনে হাতেম খৃস্টধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হবার পর এ আয়াত সম্বন্ধে রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমরা তো আমাদের পুরোহিতদের ইবাদত করিনি, কোরআন আমাদের প্রতি কিভাবে এ অপবাদ দিয়েছে ? প্রত্যুত্তরে রাসূল (সা) এরশাদ করেছিলেন ঃ "পুরোহিত আলিমগণ এমন অনেক বস্তুকে কি হারাম বলেনি, যেগুলোকে আল্লাহ্ হালাল করেছেন এবং এমন অনেক বস্তুকে হালাল বলেনি, যেগুলোকে আল্লাহ হারাম বলেছেন ? আদী ইবনে হাতেম স্বীকার করেছিলেন যে, তা অবশ্য করেছেন। তখন রাসূল (সা) বলেছিলেন যে, এ তো প্রকারান্তরে তাদের ইবাদতই হলো।"

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করা একমাত্র আল্লাহ্‌রই কাজ। যে ব্যক্তি এ কাজে অন্যকে অংশীদার করে, হালাল ও হারাম জানা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কথাকে অবশ্যকরণীয় মনে করে, তবে প্রকারান্তরে সে তার ইবাদতই করে এবং শিরকে পতিত হয়। সাধারণ মুসলমান যারা কোরআন-হাদীস সরাসরি বুঝতে পারে না, শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম নির্ধারণের যোগ্যতা রাখে না ; এজন্য কোন ইমাম, মুজতাহিদ, আলিম বা মুফতীর কথার উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে ; তাদের সাথে এ আয়াতের মর্মের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তারা কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে ; আল্লাহ্‌র নিয়ম-বিধানেরই অনুকরণ করে, আলিমগণের নিকট থেকে তারা আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্‌র ব্যাখ্যা গ্রহণ করে মাত্র। কোরআনই তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে ঃ

فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ .

অর্থাৎ—"যদি আল্লাহ্‌র আদেশ তোমাদের জানা না থাকে, তবে আলিমদের নিকট জেনে নাও।"

হালাল-হারাম নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে কাউকেই অংশীদার করা শির্‌ক। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করাও শির্‌ক। প্রয়োজন মেটানো বা বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কাছে দোয়া করাও শির্‌ক। কেননা, হাদীসে দোয়াকে ইবাদতরূপে গণ্য করা হয়েছে। কাজেই যে সকল কার্যকলাপে শির্‌কের নিদর্শন রয়েছে, সে সব কাজ করাও শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আদী ইবনে হাতেম বলেন—ইসলাম কবূল করার পর আমি আমার গলায় ক্রুশ পরিহিত অবস্থায় রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম। এটা দেখে হুযূর (সা) আদেশ করলেন, এ মূর্তিটা গলা হতে ফেলে দাও। আদী ইবনে হাতেম যদিও ক্রুশ সম্পর্কে তখন নাসারাদের ধারণা পোষণ করতেন না, এতদসত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে শির্‌কের নিদর্শন থেকে বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যকীয় বলে রাসূল (সা) তাঁকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আফসোসের বিষয় ! আজকাল হাজার হাজার মুসলমান খৃস্টানদের ধর্মীয় নিদর্শন ক্রুশ-এর বিকল্প নেকটাই সগৌরবে গলায় লাগিয়ে প্রকাশ্য শিরকীতে লিপ্ত হচ্ছে। এমনিভাবে কারো প্রতি রুকূ বা সিজদা করা, বায়তুল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর তওয়াফ করা শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত।

এসব থেকে বেঁচে থাকার স্বীকারোক্তি এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারই إِيَّاكَ نَعْبُدُ-তে করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মাসআলা ঃ কারো সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। কেননা, বৈষয়িক সাহায্য তো একজন অপরজনের কাছ থেকে সব সময়ই নিয়ে থাকে। এ ছাড়া দুনিয়ার কাজ-কারবার চলতেই পারে না যথা—প্রস্তুতকারক, দিন-মজুর, নির্মাতা, কর্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর কারিগরই অন্যের সাহায্যে নিয়োজিত, অন্যের খেদমতে সর্বদা ব্যস্ত এবং প্রত্যেকেই তাদের সাহায্যপ্রার্থী ও সাহায্য গ্রহণে বাধ্য। এরূপ সাহায্য নেওয়া কোন ধর্মমতেই বা কোন শরীয়তেই নিষেধ নয়। কারণ, এ সাহায্যের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থিত সাহায্য কোন অবস্থাতেই সম্পৃক্ত নয়, অনুরূপভাবে কোন নবী বা ওলীর বরাত দিয়েও আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা কোরআনের নির্দেশ ও হাদীসের বর্ণনায় বৈধ প্রমাণিত হয়েছে। এরূপ সাহায্য প্রার্থনাও আল্লাহ্র সম্পর্কযুক্ত সাহায্য প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত নয়, যা কোরআন ও হাদীসে শিরকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ্র নিকট বিশেষভাবে প্রার্থিত সাহায্য দু'প্রকার। এক—আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ফেরেশতা, কোন নবী, কোন ওলী বা কোন মানুষকে একক ক্ষমতাশালী বা একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে তাদের নিকট কিছু চাওয়া—ইহা প্রকাশ্য কুফরী। একে কাফের-মুশরিকরাও কুফরী বলে মনে করে। তারা নিজেদের দেবীদেরকেও আল্লাহ্র ন্যায় সর্বশক্তিমান একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে না।

দুই. সাহায্য প্রার্থনার যে পন্থা কাফেরগণ করে থাকে, কোরআন তাকে বাতিল ও শিরক বলে ঘোষণা করেছে। তা হচ্ছে কোন ফেরেশতা, নবী, ওলী বা দেবদেবী সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা যে, প্রকৃত শক্তি ও ইচ্ছার মালিক তো আল্লাহ্ তা'আলাই, তবে তিনি তাঁর কুদরতে সে ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির কিছু অংশ অমুককে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাকে ক্ষমতা দান করেছেন এবং সে ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোরআনের إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, এরূপ সাহায্য আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নিকট চাইতে পারি না।

সাহায্য-সহায়তা সম্পর্কিত এ ধারণা মু'মিন ও কাফের এবং ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। কোরআন একে হারাম ও শিরক ঘোষণা করেছে এবং কাফেরগণ একে সমর্থন করে এ অনুযায়ী আমল করছে। এ ব্যাপারে যেখানে সংশয়ের উদ্ভব হয় তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তাঁর কোন কোন ফেরেশতার উপর পার্থিব ব্যবস্থা পরিচালনার অনেক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন বলে বর্ণনা রয়েছে। এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয় যে, ফেরেশতাগণকে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্ নিজেই তা ক্ষমতা দিয়েছেন, তদনুরূপ নবীগণকেও এমন কিছু কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন যা অন্য মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে ; যথা ঃ মু'জিযা। অনুরূপ আওলিয়াগণকেও এমন কিছু কাজের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যা সাধারণ মানুষ করতে পারে না। যেমন কারামত। সুতরাং স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ধারণায় পতিত হওয়া বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার কিয়দংশ যদি তাঁদের মধ্যে না-ই দিতেন, তবে তাঁদের দ্বারা এমন সব কাজ কি করে হয়ে থাকে ? এতে নবী ও ওলীগণের প্রতি কর্মে স্বাধীন হওয়ার বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। বরং মু'জিযা এবং কারামত একমাত্র আল্লাহ্রই কাজ। এর প্রকাশ

নবী ও ওলীগণের মাধ্যমে করে থাকেন শুধু তাঁর হেকমত ও রহস্য বোঝাবার জন্য। নবী ও ওলীগণের পক্ষে সরাসরি এসব কাজ করার ক্ষমতা নেই। এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। যথা, এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى .

বদরের যুদ্ধে রাসূল (সা) শত্রু সৈন্যদের প্রতি একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং সে কঙ্কর সকল শত্রু সৈন্যের চোখে গিয়ে পড়েছিল। সে মু'জিযা সম্পর্কে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে,-"হে মুহাম্মদ (সা) ! এ কঙ্কর আপনি নিক্ষেপ করেন নি, বরং আল্লাহ্ তা'আলাই নিক্ষেপ করেছেন।" এতে বোঝা যায় যে, নবীগণের মাধ্যমে মু'জিযারূপে যেসব অস্বাভাবিক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল আল্লাহ্রই কাজ। অনুরূপ, হযরত নূহ (আ)-কে তাঁর জাতি বলেছিল যে, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে যে শাস্তি সম্পর্কে আমাদের ভীতি প্রদর্শন করছেন, তা এনে দেখান। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ মু'জিযারূপে আসমানী বালা নিয়ে আসা আমার ক্ষমতার উর্ধ্বে। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তবে আসবে, তখন তোমরা তা থেকে পালাতে পারবে না।

সূরা ইবরাহীমে নবী ও রাসূলগণের এক দলের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন ঃ

مَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ .

অর্থাৎ—"কোন মু'জিযা দেখানো আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হতে পারে না।" তাই কোন নবী বা ওলী কোন মু'জিযা বা কারামত যখন ইচ্ছা বা যা ইচ্ছা দেখাবেন, এমন ক্ষমতা তাদের কাউকেই দেওয়া হয়নি।

রাসূল ও নবীগণকে মুশরিকরা কত রকমের মু'জিযা দেখাতে বলেছে, কিন্তু যেগুলোতে আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়েছে সেগুলোই প্রকাশ পেয়েছে। আর যেগুলোতে আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়নি, সেগুলো প্রকাশ পায়নি। কোরআনের সর্বত্র এ সম্পর্কিত তথ্য বিদ্যমান।

একটি স্থূল উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজ হবে। যেমন, ঘরে বসে আমরা যে বাল্বের আলো ও বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস পাই, সে বাল্ব ও পাখা এই আলো ও হাওয়া প্রদানের ব্যাপারে নিজস্বভাবে কখনও ক্ষমতার অধিকারী নয়। প্রকৃতপক্ষে তার সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের সাথে এগুলোর যে সম্পর্ক স্থাপিত, আলো এবং বাতাস প্রদান একান্তভাবে সে সংযোগের উপর নির্ভরশীল। এক মুহূর্তের জন্যও যদি এ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় তবে না বাল্ব আপনাকে আলো দিতে পারবে, না পাখা বাতাস দিতে সক্ষম হবে। কেননা এ আলো বাল্বের নয় ; বরং বিদ্যুতের, যা বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র হতে বাল্ব ও পাখার মধ্যে পৌঁছে থাকে। নবী, রাসূল, আউলিয়া ও ফেরেশতাগণ প্রত্যেকেই প্রতিটি কাজের জন্য প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী। তাঁর ইচ্ছায়ই বাল্ব ও পাখার মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ন্যায় নবী ও আউলিয়াগণের মাধ্যমে মু'জিযা ও কারামতরূপে আল্লাহ্র ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়।

এই উদাহরণে এ কথাও বোঝা গেল যে, মু'জিযা ও কারামত প্রতিফলনে নবী-রাসূল ও ওলীগণের কোন একচ্ছত্র ক্ষমতা নেই। তবে তাঁরা যে একেবারেই ক্ষমতাহীন তাও নয়। যেমনিভাবে বাল্ব ও পাখা ব্যতীত আলো ও বাতাস পাওয়া অসম্ভব, তেমনিভাবে মু'জিযা ও কারামত প্রকাশের ব্যাপারে নবী ও ওলীগণের মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে,

সমস্ত ফিটিং সংযোজন ঠিক হওয়া সত্ত্বেও বাল্ব এবং পাখা ব্যতীত আলো-বাতাস পাওয়া অসম্ভব, কিন্তু মু'জিযা ও কারামতের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুই করতে পারেন। তবে সাধারণত তিনি নবী-রাসূল ও ওলীগণের মাধ্যম ব্যতীত তা করেন না। কারণ তাতে এগুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

তাই এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে এবং এতদসঙ্গে নবী-রাসূল ও ওলী-আউলিয়াগণের গুরুত্বের বিশেষভাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। এ বিশ্বাস এবং স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং তাঁর বিধানের অনুসরণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। যেভাবে কোন ব্যক্তি বাল্ব ও পাখার গুরুত্ব অনুধাবন না করে একে নষ্ট করে দিয়ে আলো-বাতাস পাওয়ার আশা করতে পারে না, তেমনি নবী-রাসূল ওলী-আউলিয়াগণের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আশা করা যায় না।

সাহায্য প্রার্থনা ও ওসীলা তালাশ করা এবং তা গ্রহণ করার প্রশ্নে নানা প্রকার প্রশ্ন ও সংশয়ের উৎপত্তি হতে দেখা যায়। আশা করা যায় যে, উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা সে সংশয় ও সন্দেহের নিরসন হবে।

নবী-রাসূল এবং ওলীগণকে ওসীলা বানানো সম্পূর্ণ জায়েয বা একেবারেই না-জায়েয বলা সঙ্গত নয়। বরং উপরের আলোচনার ভিত্তিতে এতটুকু বলা যায় যে, যদি কেউ তাঁদেরকে বাস্তব ক্ষমতাবান, স্বীয় শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং হাজত পূরণের অধিকারী মনে করে, তবে তা হারাম এবং শির্ক হবে। কিন্তু যদি তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আহরণের মাধ্যম জ্ঞান করে তাঁদের ওসীলা গ্রহণ করা হয়, তবে এটা সম্পূর্ণ বৈধ হবে। কিন্তু এ প্রশ্নে সাধারণত বাড়াবাড়ি করতে দেখা যায়।

সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়েতই দীন দুনিয়ার সাফল্যের চাবিকাঠি ঃ আলোচ্য তফসীরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে দোয়াকে সর্বক্ষণ সকল লোকের সকল কাজের জন্য নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকীমের হেদায়েতপ্রাপ্তির দোয়া। এমনিভাবে আখিরাতের মুক্তি যেমন সে সরল পথে রয়েছে যা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, অনুরূপভাবে দুনিয়ার যাবতীয় কাজের উন্নতি-অগ্রগতিও সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল পথের মধ্যে নিহিত। যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করলে উদ্দেশ্য সফল হয়, তাতে পূর্ণ সফলতাও অনিবার্যভাবেই হয়ে থাকে।

وَاللّٰهُ أَسْأَلُ الصَّوَابَ وَالسَّدَادَ وَبِيَدِهِ الْمَبْدَاءُ وَالْمَعَادُ .

যে সব কাজে মানুষ সফলতা লাভ করতে পারে না, তাতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, সে কাজের ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে।

সারকথা, সরল পথের হেদায়েত কেবল পরকাল বা দীনী জীবনের সাফল্যের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং দুনিয়ার সকল কাজের সফলতাও এরই উপর নির্ভরশীল। এজন্যই প্রত্যেক মু'মিনের এ দোয়া তসবীহস্বরূপ সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। তবে মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখতে ও দোয়া করতে হবে; শুধু শব্দের উচ্চারণ যথেষ্ট নয়।

وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِيْنُ .

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

সূরা আল-বাকারাহ্

নামকরণ ও আয়াত সংখ্যা ঃ এ সূরার নাম 'সূরা আল্-বাকারাহ'। হাদীসেও এ নামেরই উল্লেখ রয়েছে। যে বর্ণনায় এ সূরাকে 'সূরা আল্-বাকারাহ' বলতে নিষেধ করা হয়েছে সে বর্ণনা ঠিক নয়। (ইবনে-কাসীর)

এ সূরার আয়াত সংখ্যা ২৮৬, শব্দ সংখ্যা ৬২২১, বর্ণসংখ্যা ৫০,৫০০।

অবতরণকাল ঃ এ সূরাটি মদনী। অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর মদীনায় হিজরত করার পর অবতীর্ণ হয়। অবশ্য কয়েকটি আয়াত হজ্জের সময় মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তফসীরকারগণ ঐ আয়াতগুলোকেও মদনীই বলেছেন।

সূরা আল্-বাকারাহ কোরআনের সবচাইতে বড় সূরা। হিজরতের পর মদীনায় সর্বপ্রথম এ সূরারই অবতরণ শুরু হয় এবং পরে বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হতে থাকে। সুদ সম্পর্কিত আয়াতটি নবী করীম (সা)-এর শেষ বয়সে মক্কা বিজয়ের পর অবতীর্ণ হয়। وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ পবিত্র কোরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতগুলির একটি। দশম হিজরীর দশই যিলহজ্জ বিদায় হজ্জের সময় এটি মিনায় অবতীর্ণ হয়। এর ৮০/৯০ দিন পর নবী করীম (সা) ইন্তিকাল করেন এবং ওহী আসা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

সূরা বাকারাহর ফযীলত ঃ এ সূরা বহু আহ্কাম সম্বলিত সব চাইতে বড় সূরা। নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন যে, সূরা বাক্বারাহ পাঠ কর। কেননা, এর পাঠে বরকত লাভ হয় এবং পাঠ না করা অনুতাপ ও দুর্ভাগ্যের কারণ। যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে তার উপর কোন আহ্লে-বাতিল কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

ইমাম কুরতুবী এ প্রসঙ্গে হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর এক বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, উপরিউক্ত হাদীসে আহ্লে-বাতিল অর্থ যাদুকর। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে তার উপর কোন যাদুকরের যাদু প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। (কুরতুবী, মুসলিম, আবূ উমামা বাহেলী)

নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন, "যে ঘরে সূরা বাকারাহ পাঠ করা হয়, সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে।" (ইবনে কাসীর হাকেম থেকে বর্ণনা করেছেন)

নবী করীম (সা) এ সূরাকে سنام القران (সেনামুল-কোরআন) ও ذروة القران (যারওয়াতুল-কোরআন) বলে উল্লেখ করেছেন। সেনাম ও যারওয়াহ বস্তুর উৎকৃষ্টতম অংশকে

বলা হয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরায়ে-বাকারায় আয়াতুল কুরসী নামে যে আয়াতগুলো রয়েছে তা কোরআন শরীফের অন্য সকল আয়াত থেকে উত্তম। (ইবনে-কাসীর)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন যে, এ সূরায় এমন দশটি আয়াত রয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি সে আয়াতগুলো রাতে নিয়মিত পাঠ করে, তবে শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং সে রাতের মত সকল বালা-মুসীবত, রোগ-শোক ও দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনা থেকে নিরাপদে থাকবে। তিনি আরো বলেছেন, যদি বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের উপর এ দশটি আয়াত পাঠ করে দম করা হয়, তবে সে ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করবে। আয়াত দশটি হচ্ছে ঃ সূরার প্রথম চার আয়াত, মধ্যের তিনটি অর্থাৎ আয়াতুল-কুরসী ও তার পরের দু'টি আয়াত এবং শেষের তিনটি আয়াত।

আহ্কাম ও মাসায়েল ঃ বিষয়বস্তু ও মাসায়েলের দিক দিয়েও সূরা বাকারাহ সমগ্র কোরআনের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। ইবনে আরাবী (র) বলেছেন যে, তিনি তাঁর বুযুর্গানের নিকট শুনেছেন—এ সূরায় এক হাজার আদেশ, এক হাজার নিষেধ, এক হাজার হেকমত এবং এক হাজার সংবাদ ও কাহিনী রয়েছে। তাই হযরত উমর ফারুক (রা) এ সূরার তফসীর অধ্যয়নে বার বছর এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) আট বছর অতিবাহিত করেছিলেন। (কুরতুবী)

প্রকৃতপক্ষে সূরাতুল-ফাতিহা সমগ্র কোরআনের সারমর্ম বা সার-সংক্ষেপ। এর মৌলিক বিষয়বস্তু তিনটি। এক. আল্লাহ্ তা'আলার রবুবিয়ত। অর্থাৎ তিনিই যে, সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা এ তথ্যের বর্ণনা। দুই. আল্লাহ্ তা'আলাই ইবাদতের একমাত্র হকদার। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য না হওয়া। তিন. হেদায়েত বা পথ প্রদর্শনের প্রার্থনা। সূরা ফাতিহার শেষাংশে সিরাতুল-মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথের যে প্রার্থনা করা হয়েছে, সমগ্র কোরআন তারই প্রত্যুত্তর। যদি কেউ সরল ও সত্য পথের সন্ধান চায়, তবে সে পবিত্র কোরআনেই তা পেতে পারে।

সে জন্যই সূরাতুল-ফাতিহার পর সূরা বাকারাহ সন্নিবেশিত হয়েছে এবং ذٰلِكَ الْكِتٰبُ দ্বারা সূরা আরম্ভ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যে সিরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান করছ তা হচ্ছে এ কিতাব। অতঃপর এ সূরার প্রথমে ঈমানের মূলনীতিসমূহ, তওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের বর্ণনা সংক্ষিপ্তাকারে এবং সূরার শেষাংশে ঈমান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মধ্যভাগে জীবন যাপন পদ্ধতির বিভিন্ন দিকসমূহ যথা ইবাদত, আচার-ব্যবহার, মুয়াশেরাত, চরিত্র গঠন এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংশোধন এবং সংস্কার সম্পর্কিত মূলনীতি ছাড়াও অন্যান্য বহু ছোট-খাট বিষয়সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) আলিফ লা-ম-মী-ম। (২) এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য ; (৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে (৪) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর, যা কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে! আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। (৫) তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ কিতাব আল্লাহ্‌প্রদত্ত (এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। কোন অর্বাচীন যদি এ বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের অবতারণা করে তাতে কিছু যায়-আসে না। কেননা, কোন স্বতঃস্ফূর্ত সত্যের প্রতি কেউ সন্দেহের অবতারণা করলেও সে সত্য বিষয়ে কোন তারতম্য ঘটে না, বরং সত্য সত্যই থাকে।) যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, এ কিতাব তাদের জন্য পথপ্রদর্শক। (অর্থাৎ যেসব বিষয় জ্ঞান ও পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অনুভূতির উর্ধ্বে সে সব বিষয়কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যারা সত্য বলে গ্রহণ করে) এবং নামায কায়েম করে (নামায কায়েম করার অর্থ হচ্ছে যে, নামায সময়মত এর শর্ত

ও আরকান-আহ্‌কাম যথারীতি পালন করে আদায় করা) এবং আমি যা কিছু দান করেছি তা থেকে সৎপথে ব্যয় করে। আর ঐ সমস্ত লোক এমন যারা বিশ্বাস করে আপনার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং আপনার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে, (অর্থাৎ কোরআনের প্রতি তাদের যেরূপ ঈমান রয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহেও ঈমান রয়েছে। কোন বিষয় সত্য বলে জানার নাম ঈমান। আমল করা অন্য কথা। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করার পূর্বে যে সমস্ত আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করা ফরয এবং ঈমানের শর্ত। অর্থাৎ এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, ঐ সমস্ত কিতাব আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছিলেন এবং সেসব কিতাবও সহীহ্। স্বার্থান্বেষী লোকেরা ঐগুলোতে যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে, সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস নয়। কিন্তু আমল করতে হবে কোরআন অনুযায়ী ; পূর্ববর্তী কিতাবগুলো মনসুখ বা রহিত বলে গণ্য হবে। (সেগুলো অনুযায়ী আমল করা জায়েয হবে না।) এবং তারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এই সমস্ত লোক আল্লাহ্‌র দেয়া সত্যপথের উপর রয়েছে এবং এই সমস্ত লোকই পরিপূর্ণ মাত্রায় সফলকাম। (এ সমস্ত লোক পার্থিব জীবনে সত্যপথের মত বড় নিয়ামতপ্রাপ্ত এবং পরকালেও তারা সকল প্রকার কামিয়াবী লাভ করবে।)

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ ذٰلِكَ এ শব্দটি দূরবর্তী কোন বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। رَيْبٌ সন্দেহ। هُدًى হেদায়েত। مُتَّقِيْنَ যাদের মধ্যে ধর্মভীরুতা বা তাকওয়া ও পরহেযগারীর গুণাবলী বিদ্যমান, তাদেরকে মুত্তাকীন বলা হয়। تَقْوٰى শব্দের অর্থ বিরত থাকা। এ স্থলে এর অর্থ হবে ঃ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা। অদৃশ্য। غَيْب অর্থাৎ যে সমস্ত তথ্য মানুষের দৃষ্টির অগোচরে এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির উর্ধ্বে। يُقِيْمُوْنَ শব্দটি اقامت হতে গঠিত; অর্থ হচ্ছে, কোন বস্তুকে সোজা করা। নামায সোজা করার অর্থ হচ্ছে, একাগ্রচিত্তে আদায় করা। رَزَقْنٰهُمْ শব্দটি رزق হতে উদ্ভূত। অর্থ জীবিকা নির্বাহের উপকরণ দান করা। يُنْفِقُوْنَ শব্দটি انفاق হতে উদ্ভূত। অর্থ ব্যয় করা। اٰخِرَة-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শেষ বা পরে সংঘটিত হবে এমন সব বিষয়। এ স্থলে ইহকালের বিপরীত পরকাল। يُوْقِنُوْنَ শব্দটি ايقان হতে উদ্ভূত। ইয়াকীন অর্থ হচ্ছে--যাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ না থাকে। مُفْلِحُوْنَ শব্দটি افلاح শব্দ থেকে এবং তা فلاح শব্দ থেকে গঠিত। অর্থ পূর্ণ সফলতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হরূফে মুকাত্তা'আতের বিশদ আলোচনা ঃ অনেকগুলো সূরার প্রারম্ভে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন বর্ণ দ্বারা গঠিত এক-একটা বাক্য উল্লেখিত হয়েছে। যথা حم – الم – المص। এগুলোকে কোরআনের পরিভাষায় 'হরূফে মুকাত্তা'আত' বলা হয়। এ অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে সাকিন পড়া হয়। যথা ঃ الف – لام – ميم (আলিফ-লাম-মীম)।

কোন কোন তফসীরকারক এ হরফগুলোকে সংশ্লিষ্ট সূরার নাম বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহ্‌র নামের তত্ত্ব বিশেষ।

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী এবং ওলামার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত মত হচ্ছে যে, হরূফে মুকাত্তা'আতগুলো এমন রহস্যপূর্ণ যার মর্ম ও মাহাত্ম্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। অন্য কাউকে এ বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয়নি। হয়তো রাসূল (সা)-কে এগুলোর নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত করানো হয়েছিল, কিন্তু উম্মতের মধ্যে এর প্রচার ও প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি। ফলে এ শব্দসমূহের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সম্পর্কে নবী করীম (সা) থেকে কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। ইমাম কুরতুবী এ মতবাদ গ্রহণ করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে--আমের, শা'বী সুফিয়ান সওরী এবং একদল মুহাদ্দিস বলেছেন যে, প্রত্যেক আসমানী কিতাবের এক-একটি বিশেষ ভেদ বা নিগূঢ় তত্ত্ব রয়েছে। আর 'হরূফে মুকাত্তা'আত' পবিত্র কোরআনের সে নিগূঢ় তত্ত্ব ও ভেদ। যার অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষে কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া বা মন্তব্য করা সমীচীন নয়। এগুলোর মধ্যে আমাদের জন্য মহা উপকার নিহিত রয়েছে। এগুলোতে বিশ্বাস করা ও এগুলোর তেলাওয়াত করা বিশেষ সওয়াবের কাজ। এর তেলাওয়াত আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের জন্য গোপনীয় বরকত পৌঁছাতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী আরো লিখেছেন ঃ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান গনী (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে মসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবী এ সম্বন্ধে অভিমত পোষণ করেন যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার রহস্যজনিত বিষয় এবং তাঁর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। এ বিশ্বাস রেখে এগুলোর তেলাওয়াত করতে হবে ; কিন্তু এগুলোর রহস্য উদ্ধারের ব্যাপারে এবং তত্ত্ব সংগ্রহে আমাদের ব্যস্ত হওয়া উচিত হবে না।

ইবনে-কাসীরও কুরতুবীর বরাত দিয়ে এ মন্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কোন কোন আলিম এ শব্দগুলোর যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, সেগুলোকে ভুল প্রতিপন্ন করাও উচিত হবে না। কেননা, তাঁরা উপমাস্থলে এবং এগুলোকে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যেই এসব অর্থ বর্ণনা করেছেন।

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ সাধারণত ذٰلِكَ কোন দূরবর্তী বস্তুকে ইশারা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। الكتب দ্বারা কোরআন মজীদকে বোঝানো হয়েছে। ريب অর্থ সন্দেহ-সংশয়। আয়াতের অর্থ হচ্ছে--ইহা এমন এক কিতাব যাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। ইহা বাহ্যত দূরবর্তী ইশারার স্থল নয়। কারণ, এ ইশারা কোরআন শরীফের প্রতিই করা হয়েছে, যা মানুষের সামনেই রয়েছে। কিন্তু দূরবর্তী ইশারার শব্দ ব্যবহার করে একথাই বোঝানো হয়েছে যে, সূরাতুল-ফাতিহাতে যে সিরাতুল-মুস্তাকীমের প্রার্থনা করা হয়েছিল, সমগ্র কোরআন শরীফ সে প্রার্থনারই প্রত্যুত্তর। ইহা সিরাতুল-মুস্তাকীমের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও বটে। অর্থ হচ্ছে--আমি তোমাদের প্রার্থনা শুনেছি এবং হেদায়েতের উজ্জ্বল সূর্যসদৃশ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছি। যে ব্যক্তি হেদায়েত লাভে ইচ্ছুক সে যেন এ কিতাব অধ্যয়ন ও অনুধাবন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে।

এতদসঙ্গে এ কথাও বলে দেওয়া হচ্ছে যে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কোন কালামে বা বক্তব্যে সন্দেহ ও সংশয় দু'কারণে হতে পারে। কারো বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতার দরুন সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে, যার উল্লেখ কয়েক আয়াত পরেই খোদ কোরআন শরীফে রয়েছে। যেমন, اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ - যদি তোমরা এতে সন্দেহ পোষণ কর। (অতএব, বুদ্ধির স্বল্পতাহেতু

কারো মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এরূপ বলা ন্যায়সঙ্গত যে, এ কিতাবে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই)।

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে—তাদের জন্য হেদায়েত। অর্থাৎ যে বিশেষ হেদায়েত পরকালের মুক্তির উপায়, তা কেবল মুত্তাকীদেরই প্রাপ্য। অবশ্য কোরআনের হেদায়েত মানবজাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমস্ত বিশ্বচরাচরের জন্য ব্যাপক। সূরাতুল-ফাতিহার তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হেদায়েতের তিনটি স্তর রয়েছে। এক. সমগ্র মানবজাতি, প্রাণিজগৎ তথা সমগ্র সৃষ্টির জন্যই ব্যাপৃত। দুই. মুসলমানদের জন্য খাস। তিন. যারা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নৈকট্য লাভ করেছে, তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত; তথাপি হেদায়েতের স্তরের কোন সীমারেখা নেই।

কোরআনের বিভিন্ন স্থানের কোথাও 'আম' বা সাধারণ এবং কোথাও বিশেষ হেদায়েতের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এখানে বিশেষ বা সুনির্দিষ্ট হেদায়েতের কথা বলা হয়েছে। এজন্যই হেদায়েতের সঙ্গে মুত্তাকীগণকে বিশেষভাবে যুক্ত করা হয়েছে বলেই এরূপ সংশয় প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। হেদায়েতের বেশি প্রয়োজন তো ঐ সমস্ত লোকেরই ছিল, যারা মুত্তাকী নয়। কেননা, ইতিমধ্যে হেদায়েতের স্তর বিন্যাস করে এসব সংশয়ের অবসান করে দেওয়া হয়েছে। তাই এখন আর একথা বলা ঠিক নয় যে, কোরআন শুধু মুত্তাকীদের জন্যই হেদায়েত বা পথপ্রদর্শক, অন্যের জন্য নয়।

মুত্তাকীগণের গুণাবলী ঃ পরবর্তী দু'টি আয়াতে মুত্তাকীগণের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত, তাদের পথই হচ্ছে সিরাতুল-মুস্তাকীম। যারা সরল-সঠিক পুণ্যপন্থা লাভ করতে চায়, তাদের উচিত ঐ দলে শরীক হয়ে তাদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং ঐ সকল লোকের স্বভাব-চরিত্র, আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে স্বীয় জীবনের পাথেয়রূপে গ্রহণ করা। আর এজন্যই মুত্তাকীগণের বিশেষ গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গে এরশাদ হচ্ছে ঃ

أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

অর্থাৎ 'তারাই আল্লাহ্প্রদত্ত সৎপথপ্রাপ্ত এবং তারাই পূর্ণ সফলকাম।' পূর্বোক্ত দু'টি আয়াত দ্বারা মুত্তাকীদের গুণাবলীর বর্ণনার মধ্যে ঈমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এর মূলনীতিগুলো এবং তৎসঙ্গে সৎকর্মের মূলনীতিগুলোও স্থান পেয়েছে। তাই ঐ সমস্ত গুণের বিশ্লেষণ পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ .

অর্থাৎ আল্লাহ্কে যারা ভয় করে, তারা এমন লোক যে, অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং স্বীয় জীবিকা থেকে সৎপথে ব্যয় করে।

আলোচ্য আয়াতে মুত্তাকীদের তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করা, নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং স্বীয় জীবিকা হতে সৎপথে ব্যয় করা। উপরিউক্ত আলোচনার

মধ্যে বেশ কতকগুলো জরুরী বিষয় সংযুক্ত হয়েছে। সেগুলোর কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

প্রথম বিষয় ঃ ঈমানের সংজ্ঞা ঃ ঈমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পবিত্র কোরআনে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ ঈমান এবং গায়েব। শব্দ দু'টির অর্থ যথাযথভাবে অনুধাবন করলেই ঈমানের পুরোপুরি তাৎপর্য ও সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে।

'ঈমান' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কারো কথাকে তার বিশ্বস্ততার নিরিখে মনে-প্রাণে মেনে নেওয়া। এজন্যই অনুভূতিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান কোন বস্তুতে কারো কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি এক টুকরা সাদা কাপড়কে সাদা এবং এক টুকরা কালো কাপড়কে কালো বলে এবং আর এক ব্যক্তি তার কথা সত্য বলে মেনে নেয়, তাহলে একে ঈমান বলা যায় না। এতে বক্তার কোন প্রভাব বা দখল নেই। অপরদিকে রাসূল (সা)-এর কোন সংবাদ কেবল রাসূলের উপর বিশ্বাসবশত মেনে নেওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলে। غيب-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এমন সব বস্তু, যা বাহ্যিকভাবে মানবকুলের জ্ঞানের উর্ধ্বে এবং যা মানুষ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারে না, চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না, কান দ্বারা শুনতে পায় না, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ নিতে পারে না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না, হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারে না—ফলে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভও করতে পারে না।

কোরআন শরীফে غيب শব্দ দ্বারা সে সমস্ত বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে যার সংবাদ রাসূল (সা) দিয়েছেন এবং মানুষ নিজের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যার জ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম।

غَيْب শব্দ দ্বারা ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্তা, সিফাত বা গুণাবলী এবং তকদীর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, বেহেশত, দোযখের অবস্থা, কিয়ামত এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশতাকুল, সমস্ত আসমানী কিতাব, পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসূলগণের বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত যা সূরা বাকারাহর শেষে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ। আয়াতে দেওয়া হয়েছে। এখানে ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং শেষ আয়াতে ঈমানের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন ঈমান বিল-গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে হেদায়েত এবং শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, তা আন্তরিকভাবে মেনে নেওয়া। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তা রাসূল (সা)-এর শিক্ষা হিসেবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে হবে। আহলে-ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ঈমানের এ সংজ্ঞাই দিয়েছেন। 'আকায়েদ-তাহাবী' ও 'আকায়েদে-নসফী'-তে এ সংজ্ঞা মেনে নেওয়াকেই ঈমান বলে অভিহিত করা হয়েছে। এতে এ কথাও বোঝা যায় যে, জানার নাম ঈমান নয়। কেননা, খোদ ইবলীস এবং অনেক কাফেরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-সাল্লামের নবুওত যে সত্য তা আন্তরিকভাবে জানত, কিন্তু না-মানার কারণে তারা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ ইকামতে-সালাত ঃ ইকামত বা প্রতিষ্ঠা অর্থ শুধু নামায আদায় করা নয়, বরং নামাযের সকল দিক দিয়ে ঠিক করাকে প্রতিষ্ঠা করা বলা হয়। 'ইকামত' অর্থ নামাযের

সূচী-পত্র

সকল ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, এতে সব সময় সুদৃঢ় থাকা এবং এর ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা সবই বোঝায়। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল প্রভৃতি সকল নামাযের জন্য একই শর্ত। এক কথায় নামাযে অভ্যস্ত হওয়া ও তা শরীয়তের নিয়ম মত আদায় করা এবং এর সকল নিয়ম-পদ্ধতি যথার্থভাবে পালন করাই ইকামতে-সালাত।

তৃতীয় বিষয় ঃ আল্লাহ্র পথে ব্যয় ঃ আল্লাহ্র পথে ব্যয় অর্থে এখানে ফরয যাকাত, ওয়াজিব সদকা এবং নফল দান-খয়রাত প্রভৃতি, যা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা হয় সে সব কিছুই বোঝানো হয়েছে। কোরআনে সাধারণত اِنْفَاق শব্দ নফল দান-খয়রাতের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে ফরয যাকাত উদ্দেশ্য সেসব স্থানে زَكٰوةٌ শব্দই আনা হয়েছে।

مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ-এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র রাস্তায় তথা সৎপথে অর্থ ব্যয় করার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক সৎ মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে জাগ্রত করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। একজন সুস্থ বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তা করবে যে, আমাদের নিকট যা কিছু রয়েছে, তা সবই তো আল্লাহ্র দান ও আমানত। যদি আমরা সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করি, তবেই মাত্র এ নিয়ামতের হক আদায় হবে। পরন্তু এটা আমাদের পক্ষ থেকে কোন এহসান হবে না।

তবে এ আয়াতে مِمَّا শব্দ যোগ করে একথা বোঝানো হয়েছে যে, যে ধন-সম্পদ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা সবই ব্যয় করতে হবে এমন নয়; বরং কিয়দংশ ব্যয় করার কথাই বলা হয়েছে।

মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে অদৃশ্যে বিশ্বাস, এরপর নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমানের গুরুত্ব সকলের জানা যে, ঈমানই প্রকৃত ভিত্তি এবং সকল 'আমল কবূল হওয়া ঈমানের উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু যখনই ঈমানের সাথে 'আমলের কথা বলা হয়, তখন সেগুলোর তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হতে থাকে। কিন্তু এস্থলে শুধু নামায এবং অর্থ ব্যয় পর্যন্ত 'আমলকে সীমাবদ্ধ রাখার কারণ কি ? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, যত রকমের 'আমল রয়েছে তা ফরযই হোক অথবা ওয়াজিব, সবই হয় মানুষের দেহের সাথে অথবা ধন-দৌলতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইবাদতে-বদনী বা দৈহিক ইবাদতের মধ্যে নামায সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাই এস্থলে নামাযের বর্ণনার মধ্যে এবং যেহেতু আর্থিক ইবাদত সবই اِنْفَاق শব্দের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এ উভয় প্রকার ইবাদতের বর্ণনার মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় ইবাদতের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পূর্ণ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ তারাই মুত্তাকী যাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ এবং 'আমলও পূর্ণাঙ্গ'। ঈমান এবং 'আমল এ দু'য়ের সমন্বয়েই ইসলাম। এ আয়াতে ঈমানের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেওয়ার সাথে সাথে ইসলামের বিষয়বস্তুর প্রতিও ইশারা করা হয়েছে। তাই ঈমান ও ইসলামের পার্থক্যের আলোচনাও এস্থলে করতে হয়।

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য ঃ অভিধানে কোন বস্তুতে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ঈমান এবং কারো অনুগত ও তাঁবেদার হওয়াকে ইসলাম বলে। ঈমানের স্থান অন্তর, ইসলামের স্থানও অন্তরই এবং তৎসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিন্তু শরীয়তে ঈমান ব্যতীত ইসলাম এবং ইসলাম ব্যতীত ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিশ্বাসের মৌলিক স্বীকৃতির সাথে সাথে কর্মের দ্বারা আনুগত্য ও তাঁবেদারী প্রকাশ করা না হয়।

মোটকথা, আভিধানিক অর্থে ঈমান ও ইসলাম স্বতন্ত্র অর্থবোধক বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। অর্থগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন-হাদীসে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু শরীয়ত ঈমানবিহীন ইসলাম এবং ইসলামবিহীন ঈমান অনুমোদন করে না।

প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি অন্তরের বিশ্বাস না থাকে, তবে কোরআনের ভাষায় একে 'নেফাক' বলে। নেফাককে কুফর হতেও বড় অন্যায় সাব্যস্ত করা হয়েছে।

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

অর্থাৎ 'মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর।' অনুরূপভাবে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে যদি মৌখিক স্বীকৃতি এবং আনুগত্য না থাকে, কোরআনের ভাষায় একেও কুফরী বলা হয়। যথা-

يَعْرِفُوْنَهُمْ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ .

অর্থাৎ কাফেরগণ রাসূল (সা) এবং তাঁর নবূওতের যথার্থতা সম্পর্কে এমন সুস্পষ্টভাবে জানে, যেমন জানে তাদের নিজ নিজ সন্তানদেরকে।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا .

অর্থাৎ তারা আমার নিদর্শন বা আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। অথচ তাদের অন্তরে এর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তাদের এ আচরণ কেবল অন্যায় ও অহংকারপ্রসূত।

আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) এ বিষয়টি নিম্নরূপভাবে ব্যাখ্যা করতেন ঃ "ঈমান ও ইসলামের ক্ষেত্র এক, কিন্তু আরম্ভ ও শেষের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান অর্থাৎ ঈমান যেমন অন্তর থেকে আরম্ভ হয় এবং প্রকাশ 'আমলে পৌঁছে পূর্ণতা লাভ করে,,তদ্রূপ ইসলামও প্রকাশ্য 'আমল থেকে আরম্ভ হয় এবং অন্তরে পৌঁছে পূর্ণতা লাভ করে। অন্তরের বিশ্বাস প্রকাশ্য 'আমল পর্যন্ত না পৌঁছালে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। অনুরূপভাবে প্রকাশ্য আনুগত্য ও তাঁবেদারী আন্তরিক বিশ্বাসে না পৌঁছালে সে ইসলাম গ্রহণযোগ্য হয় না।" ইমাম গাযালী এবং ইমাম সুবকীও এ মত পোষণ করেছেন। ইমাম ইবনে হুমাম 'মুসামেরা' নামক গ্রন্থে এ অভিমতকে সকল আহ্লে হক-এর অভিমত বলে উল্লেখ করেছেন।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ .

অর্থাৎ মুত্তাকীগণ এমন লোক যারা আপনার নিকট প্রেরিত গ্রন্থে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপনার পূববর্তী রাসূলগণের প্রতি প্রেরিত গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে আর পরকালের প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

এ আয়াতে মুত্তাকীদের এমন আরো কতিপয় গুণের বর্ণনা রয়েছে, যাতে ঈমান বিল্ গায়েব এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসের প্রসঙ্গটা আরো একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের তফসীরে

বলেছেন যে, রাসূল (সা)-এর যমানায় মু'মিন ও মুত্তাকী শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিলেন; একশ্রেণী হলো তাঁরা, যাঁরা প্রথমে মুশরিক ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন ; অন্য শ্রেণী হলো তাঁরা, যাঁরা প্রথমে আহ্‌লে কিতাব ইহুদী-নাসারা ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এখানে পূর্ববর্তী আয়াতে প্রথম শ্রেণীর বর্ণনা ছিল। আর এ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাই এ আয়াত কোরআনের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস করার কথাও বলা হয়েছে। হাদীসের বর্ণনানুযায়ী এ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা যাঁরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোন না কোন আসমানী কিতাবের অনুসারী ছিলেন, তাঁরা দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী ছিলেন। প্রথমত কোরআনের প্রতি ঈমান এবং 'আমলের জন্য, দ্বিতীয়ত পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার জন্য। তবে পার্থক্য এই যে, সেগুলো সম্পর্কে বিশ্বাসের বিষয় হবে এই যে, কোরআনের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলো সত্য ও হক এবং সে যুগে এর উপর আমল করা ওয়াজিব ছিল। আর এ যুগে কোরআন অবতীর্ণ হবার পর যেহেতু অন্যান্য আসমানী কিতাবের হুকুম-আহ্‌কাম এবং পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহ মনসূখ হয়েছে, তাই এখন আমল একমাত্র কোরআনের আদেশানুযায়ীই হবে।

খতমে নবূওত সম্পর্কিত মাসআলার একটি দলীল ঃ এ আয়াতের বর্ণনা রীতিতে একটা মৌলিক বিষয়ের মীমাংসাও প্রসঙ্গক্রমে বলে দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই শেষ নবী এবং তাঁর নিকট প্রেরিত ওহীই শেষ ওহী। কেননা, কোরআনের পরে যদি আরো কোন আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকত, তবে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর প্রতি যেভাবে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার কথাও একইভাবে বলা হতো; বরং এর প্রয়োজনই ছিল বেশি। কেননা, তাওরাত,ইনজীলসহ বিভিন্ন আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান তো পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল এবং এগুলো সম্পর্কে কমবেশি সবাই অবগতও ছিল। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরেও যদি ওহী ও নবূওতের কিতাবসমূহ এবং নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টির ন্যায় পরবর্তী কিতাব ও নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টিরও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন হতো, যাতে পরবর্তী লোকেরা এ সম্পর্কে বিভ্রান্তির কবল থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

কিন্তু কোরআনের যেসব জায়গায় ঈমানের উল্লেখ রয়েছে, সেখানেই পূর্ববর্তী নবীগণের এবং তাঁদের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমূহেরও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কোথাও পরবর্তী কোন কিতাবের উল্লেখ নেই। কোরআন মজীদে এ বিষয়ে অনূণ্য পঞ্চাশটি স্থানে উল্লেখ রয়েছে। সর্বত্রই হযরত (সা)-এর পূর্ববর্তী নবী ও ওহীর কথা বলা হলেও কোন একটি আয়াতে পরবর্তী কোন ওহীর উল্লেখ তো দূরের কথা, কোন ইশারা-ইঙ্গিতও দেখতে পাওয়া যায় না।

যথা ঃ (সূরা নমল-) (১) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

(সূরা মু'মিন-) (২) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ

(সূরা রূম-) (৩) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً

(সূরা নিসা-) (৪) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ

(৫) وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ (সূরা যুমার)-

(৬) كَذٰلِكَ يُوْحِىْ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ (সূরা বাকারাহ্)-

(৭) كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ (সূরা বাকারাহ্) -

(৮) سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا (সূরা বনী-ইস্রাঈল) -

এ আয়াতগুলোতে এবং অনুরূপ আরো অন্যান্য আয়াতে যেখানেই নবী-রাসূল, ওহী ও কিতাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সর্বত্রই مِنْ قَبْلِكَ এবং مِنْ قَبْلُ শব্দ যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও مِنْ بَعْدِ শব্দের ইশারা পর্যন্ত নেই। যদি কোরআনের অন্য আয়াতে খতমে-নবূওত এবং ওহীর ধারাবাহিকতা পরিসমাপ্তির উল্লেখ নাও থাকত, তবুও পবিত্র কোরআনের এ বর্ণনাভঙ্গিই বিষয়টির সুষ্ঠু মীমাংসার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

আখেরাতের প্রতি ঈমান ঃ এ আয়াতে মুত্তাকীগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে। এখানে আখেরাত বলতে পরকালের সে আবাসস্থলের কথা বোঝানো হয়েছে, যাকে কোরআন পাকে 'দারুল-ক্বারার', 'দারুল-হায়াওয়ান' এবং 'ওকবা' নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র কোরআন তার আলোচনা ও তার ভয়াবহতার বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

আখেরাতের প্রতি ঈমান একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাস ঃ আখেরাতের প্রতি ঈমান প্রসঙ্গটি বিল-গায়েব-এর আলোচনায় কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। পুনরায় এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে এ জন্য যে, যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা জরুরী সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ঈমান অনুযায়ী আমল করার প্রকৃত প্রেরণা এখান থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ইসলামী আকায়েদগুলোর মধ্যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা একটা বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা দুনিয়ার কায়া পরিবর্তন করে দিয়েছে। এ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েই ওহীর অনুসারিগণ প্রথমে নৈতিকতা ও কর্মে এবং পরবর্তীতে ব্যক্তিগত, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত দুনিয়ার অন্য সকল জাতির মোকাবিলায় একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসনে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছে। পরন্তু তওহীদ ও রেসালতের ন্যায় এ আকীদাও সমস্ত নবী-রাসূলের শিক্ষা ও সর্বপ্রকার ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই সর্বসম্মত বিশ্বাসরূপে চলে আসছে। যেসব লোক দুনিয়ার জীবন এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গণ্য করে, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যেসব তিক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সে তিক্ততাকেই সর্বাপেক্ষা কষ্ট বলে মনে করে, আখেরাতের জীবন, সেখানকার হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও পুরস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে যাদের আস্থা নেই, তারা যখন সত্য-মিথ্যা কিংবা হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করাকে তাদের জীবনের সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে বাধা রূপে দেখতে পায়, তখন সামান্য একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে সকল মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করে না। এমতাবস্থায় এ সমস্ত লোককে যে কোন দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার মত আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যা কিছু অন্যায়, অসুন্দর বা সামাজিক জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর, সে সব অনাচার কার্যকরভাবে উৎখাত করার কোন শক্তি সে আইনেরও নেই—এ কথা পরীক্ষিত সত্য। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কোন দুরাচারের চরিত্র শুদ্ধি ঘটানোও সম্ভবপর হয় না। অপরাধ যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, আইনের

শাস্তি সাধারণত তাদের ধাঁত-সওয়া হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আর তাদের মধ্যে শাস্তিকে ভয় করার মত অনুভূতিও থাকে না। অপরপক্ষে, আইনের শাস্তিকে যারা ভয় করে, তাদের সে ভয়ের আওতাও শুধু ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে, যতটুকুতে ধরা পড়ার ভয় বিদ্যমান। কিন্তু গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে যেখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে না, সেরূপ পরিবেশে এ সমস্ত লোকের পক্ষেও যে কোন গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়ার পথে কোন বাধাই থাকে না

প্রকারান্তরে আখেরাতের প্রতি ঈমানই এমন এক কার্যকর নিয়ন্ত্রণবিধি, যা মানুষকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বত্রই যে কোন গর্হিত আচরণ থেকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে বিরত রাখে। তার অন্তরে এমন এক প্রত্যয়ের অম্লান শিখা অবিরাম সমুজ্জ্বল করে দেয় যে, আমি প্রকাশ্যেই থাকি আর গভীর নির্জনেই থাকি, রাজপথে থাকি কিংবা কোন বদ্ধ ঘরে লুকিয়েই থাকি, মুখে বা ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ করি আর নাই করি—আমার সকল আচরণ, আমার সকল অভিব্যক্তি, এমনকি অন্তরে লুক্কায়িত প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত বিরাজমান এক মহাসত্তার সম্মুখে রয়েছে। তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টির সম্মুখে কোন কিছুই আড়াল করার সাধ্য আমার নেই। আমার সত্তার সঙ্গে মিলে রয়েছে এমন সব প্রহরী, যাঁরা আমার প্রতিটি আচরণ এবং অভিব্যক্তি প্রতিমুহূর্তেই লিপিবদ্ধ করছেন।

উপরিউক্ত বিশ্বাসের মাধ্যমেই প্রাথমিক যুগে এমন মহত্তম চরিত্রের অগণিত লোক সৃষ্টি হয়েছিলেন, যাঁদের চেহারা, যাদের চাল-চলন এবং আচার-আচরণ দেখেই লোক ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ত।

এখন লক্ষণীয় আর একটি বিষয় হচ্ছে, আয়াতের শেষে يُؤْمِنُوْنَ শব্দ ব্যবহার না করে يُوْقِنُوْنَ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, বিশ্বাসের বিপরীতে অবিশ্বাস এবং ইয়াকীনের বিপরীতে-সন্দেহ-সংশয়। এ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হলেই শুধু উদ্দেশ্য সফল হয় না; বরং এমন দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে, যে প্রত্যয় স্বচক্ষে দেখা কোন বস্তু সম্পর্কে হয়ে থাকে।

মুত্তাকীদের এই গুণ পরকালে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত এবং হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান—সব কিছুরই একটি পরিপূর্ণ নকশা তার সামনে দৃশ্যমান করে রাখবে। যে ব্যক্তি অন্যের হক নষ্ট করার জন্য মিথ্যা মামলা করে বা মিথ্যা সাক্ষী দেয়, আল্লাহর আদেশের বিপরীত পথে হারাম ধন-দৌলত উপার্জন করে এবং দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য সফল করার জন্য শরীয়ত বিরোধী কাজ করে, সে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাসী হয়ে প্রকাশ্যে ঈমানের কথা যদি স্বীকার করে এবং শরীয়তের বিচারে তাকে মু'মিনও বলা হয় কিন্তু কোরআন যে ইয়াকীনের কথা ঘোষণা করেছে, এমন লোকের মধ্যে সে ইয়াকীন থাকতে পারে না। আর সে কোরআনী ইয়াকীনই মানবজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিতে পারে আর এর পরিণামেই মুত্তাকীগণকে হেদায়েত এবং সফলতার সেই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, যা সূরা-বাক্বারাহর পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۔

অর্থাৎ—তারাই সরল-সঠিক পথের পথিক, যা তাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে দান করা হয়েছে আর তারাই সম্পূর্ণ সফলকাম হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٦ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝٧

(৬) নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছু আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না। (৭) আল্লাহ্ তাদের অন্তঃকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে, তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন, তাতে কিছু যায় আসে না; তারা ঈমান আনবে না। (এ কথা সমস্ত কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অবগত যে, তাদের মৃত্যু কুফরীর মধ্যেই ঘটবে। এখানে সাধারণ অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলা হয়নি। কেননা, সাধারণ অবিশ্বাসীদের মধ্যে অনেক লোক পরে মুসলমান হয়েছেন) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তঃকরণ বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের কানসমূহ ও তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বাপর সম্পর্ক ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু সূরা বাকারাহ্র প্রথম পাঁচটি আয়াত কোরআনকে হেদায়েত বা পথপ্রদর্শনের গ্রন্থরূপে ঘোষণা করে সকল সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার পর সে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এ গ্রন্থের হেদায়েতে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত ও লাভবান হয়েছে এবং যাদেরকে কোরআনের পরিভাষায় মু'মিন ও মুত্তাকী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। সে সমস্ত লোকের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং পরিচয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পনেরটি আয়াতে সে সমস্ত লোকের কথা আলোচিত হয়েছে, যারা এ হেদায়েতকে গ্রহণ করেনি, বরং অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

তারা দু'টি দলে বিভক্ত। একদল প্রকাশ্যে কোরআনকে অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণের পথ অবলম্বন করেছে। কোরআন তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। অপর দল হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি, যারা হীন পার্থিব উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য অন্তরের ভাবধারা ও বিশ্বাসের কথাটি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে সাহস পায়নি, বরং প্রতারণার পথ অবলম্বন করেছে; মুসলমানদের

তারা বলে, আমরা মুসলমান, কোরআনের হেদায়েত মানি এবং আমরা তোমাদের সাথে আছি। অথচ তাদের অন্তরে লুক্কায়িত থাকে কুফর ও অস্বীকৃতি। আবার কাফেরদের নিকট গিয়ে বলে, আমরা তোমাদের দলভুক্ত, তোমাদের সাথেই রয়েছি। মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য এবং তাদের গোপন কথা জানার জন্য তাদের সাথে মেলামেশা করি। কোরআন তাদেরকে 'মুনাফিক' বলে আখ্যায়িত করেছে। এ পনেরটি আয়াত যারা কোরআনকে অমান্য করে তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লিখিত দু'টি আয়াতে প্রকাশ্যে যারা অস্বীকার করে তাদের কথা ও স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। আর পরবর্তী তেরটি আয়াতেই মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এতে তাদের স্বরূপ, নিদর্শন, অবস্থা ও পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

এ আয়াতগুলোর বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করলে বোঝা যায় যে, কোরআন সূরা বাক্বারাহর প্রথম বিশটি আয়াতে একদিকে হেদায়েতের উৎসের সন্ধান দিয়ে বলেছে যে, এ উৎস হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব এই কোরআন; অপরদিকে বিশ্ববাসীকে এ হেদায়েত গ্রহণ করা ও না করার নিরিখে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। যারা গ্রহণ করেছে, তাদেরকে মু'মিন-মুত্তাকী বলেছে, আর যারা অগ্রাহ্য করেছে তাদেরকে কাফের ও মুনাফিক বলে আখ্যা দিয়েছে।

প্রথমে রয়েছে সে দলের কথা, যাদের পথ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এ চাওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় দল যাদের পথ হতে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ-এ পানাহ চাওয়া হয়েছে। কোরআনের এ শিক্ষা হতে একটি মৌলিক জ্ঞাতব্য বিষয় এও প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ববাসীকে এমনভাবে দু'টি ভাগ করা যায়, যা হবে আদর্শভিত্তিক। বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা ও বর্ণ এবং ভৌগোলিক বিভক্তি এমন কোন ভেদরেখা নয়, যার ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভক্ত করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে সূরা তাগাবুন-এ পরিষ্কার মীমাংসা দেওয়া হয়েছে ঃ

خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۔

অর্থ—আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মু'মিন এবং কিছুসংখ্যক কাফের হয়েছে।

আলোচ্য দু'টি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেসব কাফের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যারা তাদের কুফরীর দরুন বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতার পথ বেছে নিয়েছে। আর যারা এ বিরুদ্ধাচরণে বশীভূত, তারা কোন সত্য কথা শুনতে এবং কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে প্রস্তুত ছিল না। এ সমস্ত লোকের জন্য আল্লাহর বিধান হচ্ছে যে, তাদেরকে দুনিয়াতেই একটি নগদ শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তঃকরণে সীলমোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে। তাদের চোখ-কান থেকে হক বা সত্য গ্রহণের যোগ্যতা রহিত করে দেওয়া হয়েছে। তাদের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, সত্যকে বুঝবার মত বুদ্ধি, দেখবার মত দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণ করার মত কান আর তাদের অবশিষ্ট নেই। শেষ আয়াতে এ সমস্ত লোকের জন্য কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

কাফেরের সংজ্ঞা ঃ كـفـر-এর শাব্দিক অর্থ গোপন করা। না-শোকরীকেও কুফরী বলা হয়। কেননা, এতে এহসানকারীর এহসানকে গোপন করা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় কুফর বলতে বোঝায়—যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয, এর যে কোনটিকে অস্বীকার করা।

যথা—ঈমানের সারকথা হচ্ছে যে, রাসূল (সা) আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে ওহীপ্রাপ্ত হয়ে উম্মতকে যে শিক্ষাদান করেছেন এবং যেগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলোকে আন্তরিকভাবে স্বীকার করা এবং হক বলে জানা। কোন ব্যক্তি যদি এ শিক্ষামালার কোন একটি হক বলে না মানে, তা হলে তাকে কাফের বলা যেতে পারে।

'এনযার' শব্দের অর্থ ঃ 'এনযার' শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সংবাদ দেওয়া, যাতে ভয়ের সঞ্চার হয়। بشار। এমন সংবাদকে বলা হয়, যা শ্রবণে আনন্দ লাভ হয়। সাধারণ অর্থে 'এনযার' বলতে ভয় প্রদর্শন করা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু ভয় প্রদর্শনকে 'এনযার' বলা হয় না; বরং শব্দটি দ্বারা এমন ভয় প্রদর্শন বোঝায়, যা দয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যেভাবে মা সন্তানকে আগুন, সাপ, বিচ্ছু এবং হিংস্র জীবজন্তু হতে ভয় দেখিয়ে থাকেন। "নাযীর" বা ভয়-প্রদর্শনকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যাঁরা অনুগ্রহ করে মানবজাতির যথার্থ ভয়ের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। এজন্যই নবী-রাসূলগণকে খাসভাবে 'নাযীর' বলা হয়। কেননা, তাঁরা দয়া ও সতর্কতার ভিত্তিতে অবশ্যম্ভাবী বিপদ হতে ভয় প্রদর্শন করার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। নবীগণের জন্য 'নাযীর' শব্দ ব্যবহার করে একদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, যাঁরা তবলীগের দায়িত্ব পালন করবেন' তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে—সাধারণ মানুষের প্রতি যথার্থ মমতা ও সমবেদনা সহকারে তাদের সামনে কথা বলা।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত জেদী অহংকারী লোক, যারা সত্যকে জেনে-শুনেও কুফরী ও অস্বীকৃতির উপর দৃঢ় অনড় হয়ে আছে অথবা অহংকারের বশবর্তী হয়ে কোন সত্য কথা শ্রবণ করতে কিংবা সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দেখতে প্রস্তুত নয় তাদের পথে এনে ঈমানের আলোকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) যে বিরামহীন চেষ্টা করেছেন তা ফলপ্রসূ হওয়ার নয়। এদের ব্যাপারে চেষ্টা করা না করা একই কথা। এর কারণস্বরূপ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তর এবং চোখ-কানে সীলমোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে। আর তাদের চোখে পর্দা বা আবরণ পড়ে রয়েছে। চিন্তা করা ও অনুধাবন করার মত যেসব রাস্তা বা পথ রয়েছে তা সবই তাদের জন্য রুদ্ধ। তাই তাদের সংশোধনের আশা করাও বৃথা। কোন কিছুতেই সীলমোহর এজন্যই ব্যবহার করা হয় যাতে তার মধ্যে বাইরের কোন বস্তু প্রবেশ করতে না পারে। তাদের অন্তর এবং কানে মোহর মেরে দেওয়ার উদ্দেশ্যও তাই যে, তাদের মধ্যে হক বা সত্য গ্রহণের কোন সম্ভাবনা নেই। তাদের এ অবস্থাকেই অন্তর ও কানে সীলমোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর চক্ষু সম্পর্কে সীলমোহরের পরিবর্তে পর্দা বা আবরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, অন্তরে প্রবেশের মত কোন বিষয় বা কোন চিন্তা ও অনুভূতি কোন একদিক হতে আসে না; বরং সব দিক হতে আসে। অনুরূপভাবে কানে পৌঁছাবার শব্দও চতুর্দিক হতে আসতে পারে, তা একমাত্র সীলমোহর করা হলেই রহিত হতে পারে। কিন্তু চোখের ব্যাপার স্বতন্ত্র। চোখের দৃষ্টি শুধু সামনের দিকে, তাই যখন সামনে পর্দা পড়ে, তখন দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যায়।

পাপের শাস্তি জাগতিক সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া ঃ এ দু'টি আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল, কুফর ও অন্যান্য সব পাপের আসল শাস্তি তো পরকালে হবেই; তবে কোন কোন পাপের আংশিক শাস্তি দুনিয়াতেও হয়ে থাকে। দুনিয়ার এ শাস্তি ক্ষেত্র বিশেষে নিজের অবস্থা সংশোধন করার সামর্থ্যকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। শুভবুদ্ধি লোপ পায়। মানুষ আখেরাতের হিসাব-নিকাশ

সম্পর্কে গাফেল হয়ে গোমরাহীর পথে এমন দ্রুততার সাথে অগ্রসর হতে থাকে ; যাতে অন্যায়ের অনুভূতি পর্যন্ত তাদের অন্তর হতে দূরে চলে যায়, এ সম্পর্কে কোন বুযুর্গ মন্তব্য করেছেন ঃ

اِنَّ مِنْ جَزَاءِ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةً بَعْدَهَا وَاِنَّ مِنْ جَزَاءِ الْحَسَنَةِ حَسَنَةً بَعْدَهَا .

অর্থাৎ—পাপের শাস্তি এরূপও হয়ে থাকে যে, একটি পাপ অপর একটি পাপকে আকর্ষণ করে, অনুরূপভাবে একটি নেকীর বদলায় অপর একটি নেকী আকৃষ্ট হয়। হাদীসে আছে, মানুষ যখন কোন একটি গোনাহের কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ লাগে। সাদা কাপড়ে হঠাৎ কালো দাগ লাগার পর যেমন তা খারাপ লাগে, তেমনি প্রথমাবস্থায় অন্তরে পাপের দাগও অস্বস্তির সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি তওবা না করে, আরো পাপ করতে থাকে, তবে পর পর দাগ পড়তে পড়তে অন্তঃকরণ দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার অন্তর থেকে ভাল-মন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট এ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থাকে কোরআনে رَيْنٌ বা رَانَ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

তিরমিযী শরীফে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর (সা) এরশাদ করেছেন--মানুষ যখন কোন পাপ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে এবং সে যখন তওবা করে, তখন তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

উপদেশ দান করা সর্বাবস্থায় উপকারী ঃ এ আয়াতে সনাতন কাফেরদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নসীহত করা না করা সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সাথে عليهم-এর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ সমতা কাফেরদের জন্য, রাসূলের জন্য নয়। তবে তাদেরকে জানানোর এবং সংশোধন করার চেষ্টা করার সওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। তাই সমগ্র কোরআনের কোন আয়াতেই এসব লোককে ঈমান ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া নিষেধ করা হয়নি। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কাজে নিয়োজিত তা ফলপ্রসূ হোক বা না হোক সে এ কাজের সওয়াব পাবেই।

একটি সন্দেহের নিরসন ঃ এ আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ ভাষা সূরায়ে মুতাফ্‌ফিফীনের এক আয়াতেও উল্লেখিত হয়েছে। যথা ঃ

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

অর্থাৎ 'কখনও এমন নয় ; বরং তাদের অন্তরে তাদের কর্মের মরিচা গাঢ় হয়ে গেছে।' তাতে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের মন্দ কাজ ও অহংকারই তাদের অন্তরে মরিচার আকার ধারণ করেছে। এ মরিচাকে আলোচ্য আয়াতে 'সীলমোহর' বা 'আবরণ' শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এরূপ সংশয় সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, যখন আল্লাহ্ই তাদের অন্তরে সীলমোহর এঁটে দিয়েছেন এবং গ্রহণ-ক্ষমতাকে রহিত করেছেন, তখন তারা কুফরী করতে বাধ্য। কাজেই তাদের শাস্তি হবে কেন? এর জওয়াব হচ্ছে যে, তারা নিজেরাই অহংকার ও

বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই এজন্য তারাই দায়ী। যেহেতু বান্দাদের সকল কাজের সৃষ্টি আল্লাহ্ই করেছেন, তাই তিনি এস্থলে সীলমোহরের কথা বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই যখন সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে রহিত করতে উদ্যত হয়েছে, তখন আমি আমার কর্ম-পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের এ খারাপ যোগ্যতার পরিবেশ তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছি।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨﴾

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩﴾ ط

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ ۙ بِمَا كَانُوْا

يَكْذِبُوْنَ ﴿١٠﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ

مُصْلِحُوْنَ ﴿١١﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَاِذَا

قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۚ اَلَآ

اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ

مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٤﴾ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٥﴾

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۠ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا

مُهْتَدِيْنَ ﴿١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ

اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا

يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ

اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ۗ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ۗ

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾ ع

(৮) আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। (৯) তারা আল্লাহ্ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। (১০) তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত আর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুত তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন। (১১) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। (১২) মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী--কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। (১৩) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বুঝে না। (১৪) আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি--আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। (১৫) বরং আল্লাহ্ই তাদের সাথে উপহাস করেন আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। (১৬) তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়তের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে। বস্তুত তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি এবং তারা হেদায়েতও লাভ করতে পারেনি। (১৭) তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে লোক কোথাও আগুন জ্বালালো এবং তার চারদিককার সবকিছুকে যখন আগুন স্পষ্ট করে তুলল, ঠিক এমনি সময় আল্লাহ্ তার চারদিকের আলোকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। ফলে, সে কিছুই দেখতে পায় না। (১৮) তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। (১৯) আর তাদের উদাহরণ সেসব লোকের মত যারা দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ো রাতে পথ চলে, যাতে থাকে আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক। মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। অথচ সমস্ত কাফেরই আল্লাহ্ কর্তৃক পরিবেষ্টিত। (২০) বিদ্যুতালোকে যখন সামান্য আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর মানবকুলের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে ঈমান এনেছি ; অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ্ এবং ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দেয়। অথচ তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না এবং তারা অনুভব করতে পারে না যে, এ ধোঁকার পরিণাম তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিপূর্ণ ;

আর আল্লাহ্‌ তাদের এ ব্যাধি আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। (তাদের দুষ্কর্ম, অবিশ্বাস এবং ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি দেখে হিংসার আগুনে জ্বলা এবং তাদের কুফর প্রকাশ হওয়াতে সর্বদা তাদের দুশ্চিন্তা ও নাভিশ্বাস সবই অন্তর্ভুক্ত।) আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। কারণ, তারা মিথ্যা কথা বলে। (অর্থাৎ ঈমানের মিথ্যা দাবি করে!) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে ঝগড়া ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। তাদের দু'মুখো নীতির দরুন যখন ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হতে থাকে এবং শুভাকাঙ্ক্ষী যখন বলেন যে, এ জাতীয় কাজ-কর্মে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়, তা ত্যাগ কর, তখন তারা নিজেদেরকে মীমাংসাকারী বলে দাবি করে (অর্থাৎ তাদের দ্বারা সৃষ্ট বিবাদকেই মীমাংসা মনে করে)। স্মরণ রেখ, তারাই ফাসাদী, কিন্তু তারা তা অনুভব করে না। (এ তো তাদের অজ্ঞতা ও অহমিকার পরিণাম যে, নিজের দোষকে তারা গুণ মনে করে এবং সৎ ও ভাল কাজ যথা অন্যের ঈমানকে দোষ মনে করে।) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, অন্যান্য মানুষের মত তোমরাও ঈমান আন, তখন তারা বলে যে, বোকাদের মত আমরাও কি ঈমান আনব? স্মরণ রেখ, তারাই বাস্তবপক্ষে বোকা কিন্তু তারা তা বুঝে না। (এ সব মুনাফিক প্রকাশ্যে সরলপ্রাণ মুসলমানদের সাথে এভাবে কথাবার্তা বলত, যাতে তাদের সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ করা না যায় এবং নিজেদের অন্তরে অবিশ্বাসকে গোপন রাখত।) আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশত তখন বলত, আমরা তো ঈমান এনেছি। আবার যখন মুনাফিক সরদারদের সাথে মিশত, তখন বলত আমরা তোমাদের সাথেই আছি। তাদের (মুসলমানদের) সাথে উপহাস ও তাদেরকে বিদ্রূপ করার জন্য মেলামেশা করি! (বিদ্রূপচ্ছলে আমরা তাদেরকে বলি, আমরাও ঈমান এনেছি।) বরং আল্লাহ্‌ই তা'আলাই তাদের সাথে বিদ্রূপ করেন, আর তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন, যেন তারা তাদের অহংকার ও কু-মতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। (আল্লাহ্‌র বিদ্রূপের নমুনাই হচ্ছে যে, তাদেরকে সময় দিয়েছেন যাতে তারা কুফর ও অবাধ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করে ; আর চরম অন্যায়ে লিপ্ত হয়, তখন, হঠাৎ একবারে তাদের মূল উৎপাটন করবেন। তাদের বিদ্রূপের প্রত্যুত্তরেই আল্লাহ্‌র এ কাজ, তাই একে বিদ্রূপ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।) তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহীকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি, আর তারা হেদায়েতও লাভ করেনি। (অর্থাৎ তাদের ব্যবসার যোগ্যতাও নেই, তাই হেদায়েতের মত মূল্যবান বস্তুর পরিবর্তে গোমরাহীকে গ্রহণ করেছে।) তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি অগ্নি-প্রজ্বলিত করে, যখন তার চারদিক আলোকিত হয় এমন সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা তার কাছ থেকে আলো উঠিয়ে নিয়ে তাকে অন্ধকারে ছেড়ে দেন, যাতে সে কিছুই দেখতে না পায়। (সে ব্যক্তি এবং তার সাথিগণ যেভাবে আলোর পরে অন্ধকারে রয়ে গেল ; মুনাফিকরাও অনুরূপভাবে হক ও সত্য প্রকাশ হবার পরও গোমরাহীর অন্ধকারে নিমগ্ন হয়ে রইল। আর অন্ধকারে প্রথমোক্ত ব্যক্তির হাত, পা, কান, চক্ষু সবই অকর্মণ্য হয়ে গেল, অনুরূপভাবে গোমরাহীর অন্ধকারে শেষোক্ত ব্যক্তিদের (মুনাফিকদের) অবস্থাও তা-ই হলো।

তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। সুতরাং তারা এখন আর ফিরবে না। (অর্থাৎ তাদের অনুভূতিতে সত্য ও হক বুঝবার মত যোগ্যতা রইল না। যে সমস্ত মুনাফিক মনখোলাভাবে কুফরীতে নিমগ্ন, ঈমানের কল্পনাও কোনদিন করেনি, তাদের এ অবস্থা। মুনাফিকদের আর একটি দল, যারা ইসলামের সত্যতা দেখে এ দিকে ধাবিত হয় কিন্তু পরে স্বার্থপরতার চাপে মত পরিবর্তন করে নেয়, পরবর্তী আয়াতে তাদেরই বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।) আর তাদের উদাহরণ ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের মত, যারা দুর্যোগপূর্ণ বৃষ্টির রাতে পথ চলে, যাতে অন্ধকার ও বিজলীর গর্জন হতে রক্ষা পেতে চায়। অথচ সমস্ত কাফের আল্লাহ্‌রই ক্ষমতার আওতাভুক্ত। বিদ্যুতের অবস্থা যে, মনে হয় তাদের দৃষ্টিশক্তি এখনই হরণ করবে। যখন একটু আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে। আবার তখন অন্ধকার বিরাজ করে, যখন দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তাদের শ্রবণশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্ সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান (যেভাবে এ সমস্ত লোক কখনও তুফানের দরুন, কখনও ঠাণ্ডা বায়ুর দরুন আবার কখনও বৃষ্টির দরুন পথচলা বন্ধ করে, আবার একটু সুযোগ পেলেই সামনে অগ্রসর হয়, সন্দিহান মুনাফিকদের অবস্থাও তদ্রূপ।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ সূরা আল-বাকারার প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন এমন এক কিতাব, যা সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে। অতঃপর বিশটি আয়াতের মধ্যে কোরআনকে যারা মান্য করে, আর মানে না, তাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পাঁচ আয়াতে মান্যকারীদের কথা, 'মুত্তাকীন' শিরোনামে এবং অন্য দু'আয়াতে সে সমস্ত অমান্যকারীর কথা, যারা প্রকাশ্যে অমান্য করে এবং বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী তেরটি আয়াতে সে সমস্ত মুনাফিকের কথা বলা হয়েছে, যারা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে মু'মিন বলে প্রকাশ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়। কোরআন তাদেরকে মুনাফিক বলে আখ্যা দিয়েছে।

উপরিউক্ত আয়াতের মধ্যে দু'টি আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক আছে, যারা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয় ; বরং তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও মু'মিনদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকেও ধোঁকা দিচ্ছে না।

এতে তাদের ঈমানের দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, তাদের এ দাবিও ধোঁকা। একথা বাস্তব সত্য যে, আল্লাহ্‌কে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না এবং তারাও একথা হয়তো ভাবে না যে, তারা আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দিতে পারবে, বরং রাসূল (সা) এবং মুসলমানদের সাথে ধোঁকাবাজি করার দরুনই বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে ধোঁকাবাজি করছে। (কুরতুবী)

এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক প্রকৃত প্রস্তাবে আত্ম-প্রবঞ্চনায় লিপ্ত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত ধোঁকা ও ফেরেবের ঊর্ধ্বে। অনুরূপ তাঁর রসূল এবং মু'মিনগণও ওহীর বদৌলতে ছিলেন সমস্ত ধোঁকা ও ফেরেব থেকে নিরাপদ। কারো পক্ষে তাঁদের কোন ক্ষতি করা ছিল অস্বাভাবিক। পরন্তু তাদের এ ধোঁকার ক্ষতিকর পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের উপর পতিত হতো। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

রোগ সে অবস্থাকেই বলা হয়, যে অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে চলে যায় এবং তাদের কাজ-কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। শেষ পরিণাম ধ্বংস ও মৃত্যু। হযরত জুনায়দ বাগদাদী (র) বলেন, যেভাবে অসতর্কতার দরুন মানুষের শরীরে রোগের সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে প্রবৃত্তির প্ররোচনার অনুকরণের দ্বারা মানুষের অন্তরেও রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এ আয়াতে তাদের অন্তর্নিহিত কুফরকে রোগ বলা হয়েছে, যা আত্মিক ও শারীরিক উভয় বিবেচনায়ই বড় রোগ। রূহানী ব্যাধি তো প্রকাশ্য ; কেননা, প্রথমত এ থেকে স্বীয় স্রষ্টা-পালনকর্তার না-শোকরি ও অবাধ্যতা সৃষ্টি হয়। যাকে কুফর বলা হয়, তা মানবাত্মার জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাধি। এতদসঙ্গে মানব সভ্যতার জন্যও অত্যন্ত ঘৃণ্য দোষ। দ্বিতীয়ত, দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সত্যকে গোপন করা এবং স্বীয় অন্তরের কথাকে প্রকাশ করার হিম্মত না করা--এ দ্বিতীয় ব্যাপারটিও অন্তরের বড় রোগ। মুনাফিকদের শারীরিক রোগ এজন্য যে, তারা সর্বদাই এ ভয়ের মধ্যে থাকে যে, না জানি কখন কোথায় তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। দিবারাত্র এ চিন্তায় ব্যস্ত থাকাও একটা মানসিক তথা শারীরিক ব্যাধিই বটে! তাছাড়া এর পরিণাম অনিবার্যভাবেই ঝগড়া ও শত্রুতা। কেননা, মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে তারা সব সময়ই হিংসার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে কিন্তু সে হতভাগা নিজের অন্তরের কথাটুকুও প্রকাশ করতে পারে না। ফলে সে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে।

"আল্লাহ্ তাদের রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।" এর অর্থ এই যে, তারা ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি দেখে জ্বলে-পুড়ে দিন দিন ছাই হতে থাকে। আল্লাহ্ তো দিন দিন তার দীনের উন্নতি দিয়েই যাচ্ছেন। ফলে তারা দিন দিন শুধু হিংসার আগুনে দগ্ধীভূত হয়ে যাচ্ছে।

চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে মুনাফিকদের সে ভুলের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা ফেতনা-ফাসাদকে মীমাংসা এবং নিজেদেরকে মীমাংসাকারী মনে করে। কোরআন পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, ফাসাদ ও মীমাংসা মৌখিক দাবির উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যথায় কোন চোর বা ডাকাতও নিজেকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলতে রাজী নয়। এ ব্যাপারটি একান্তভাবে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির আচরণের উপর নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আচরণ যদি ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়, তবে এসব কাজ যারা করে তাদেরকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুফ্সিদই বলতে হবে। চাই একাজে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্য হোক বা না-ই হোক।

ষষ্ঠ আয়াতে মুনাফিকদের সামনে সত্যিকার ঈমানের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে-- اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ অর্থাৎ—অন্যান্য লোক যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও অনুরূপভাবে ঈমান আন। এ স্থলে 'নাস' শব্দের দ্বারা সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে। মুফাসসিরগণ এতে একমত। কেননা কোরআন অবতরণের যুগে তাঁরাই ঈমান এনেছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সাহাবীগণের ঈমানের অনুরূপ ঈমানই গ্রহণযোগ্য; যে বিষয়ে তাঁরা যেভাবে ঈমান এনেছিলেন অনুরূপ ঈমান যদি অন্যেরা আনে তবেই তাকে ঈমান বলা হয়। অন্যথায় তাকে ঈমান বলা চলে না। এতে বোঝা গেল যে, সাহাবীগণের ঈমানই ঈমানের কষ্টিপাথর। যার নিরিখে অবশিষ্ট সকল উম্মতের ঈমান পরীক্ষা করা হয়। এ কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় যে ঈমান সঠিক প্রমাণিত না হয়, তাকে ঈমান বলা যায় না এবং অনুরূপ ঈমানদারকে মু'মিন বলা

চলে না। এর বিপরীত যত ভাল কাজই হোক না কেন আর যত নেক-নিয়তেই করা হোক না কেন, আল্লাহ্র নিকট তা ঈমানরূপে স্বীকৃতি পায় না। সে যুগের মুনাফিকগণ সাহাবীগণকে বোকা বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুত এ ধরনের গোমরাহী সর্বযুগেই চলে আসছে। যারা গোমরাহদেরকে পথ দেখায়, তাদের ভাগ্যে সাধারণত বোকা, অশিক্ষিত প্রভৃতি আখ্যাই জুটে থাকে। কিন্তু কোরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এসব লোক নিজেরাই বোকা। কেননা, এমন উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী থাকা সত্ত্বেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হয়নি।

সপ্তম আয়াতে মুনাফিকদের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে; তারা যখন মুসলমানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে আমরা মুসলমান হয়েছি; ঈমান এনেছি। আর যখন তাদের দলের কাফেরদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি, মুসলমানদের সাথে একটু রহস্য এবং তাদের বোকা বানাবার জন্য মিশেছি।

অষ্টম আয়াতে তাদের এ বোকামির উত্তর দেওয়া হয়েছে। তারা মনে করে, আমরা মুসলমানদেরকে বোকা বানাচ্ছি। অথচ বাস্তবপক্ষে তারা নিজেরাই বোকা সাজছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে একটু ঢিল দিয়ে উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছেন। প্রকাশ্যে তাদের কোন শাস্তি না হওয়াতে তারা আরো গাফলতিতে পতিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপহাস ও ঠাট্টার প্রত্যুত্তরে তাদের প্রতি এরূপ আচরণ করেছেন বলেই একে উপহাস বা বিদ্রূপ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

নবম আয়াতে মুনাফিকদের সে অবস্থার বর্ণনা রয়েছে যে, তারা ইসলামকে নিকট হতে দেখেছে এবং তার স্বাদও পেয়েছে, আর কুফরীতে তো পূর্ব থেকেই লিপ্ত ছিল। অতঃপর ইসলাম ও কুফর উভয়কে দেখে বুঝেও তাদের দুনিয়ার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইসলামের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করেছে। তাদের এ কাজকে কোরআনে তেজারতের সাথে তুলনা দিয়ে জানানো হয়েছে যে, তাদের তেজারতের যোগ্যতাই নেই। তারা উত্তম ও মূল্যবান বস্তু ঈমানের পরিবর্তে নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন বস্তু কুফরকে ক্রয় করেছে।

শেষ চার আয়াতে দু'টি উদাহরণ দিয়ে মুনাফিকদের কার্যকলাপকে ঘৃণ্য আচরণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুনাফিকদের দু'শ্রেণীর লোকের পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে পৃথক দু'টি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

মুনাফিকদের একশ্রেণীর লোক হচ্ছে তারা, যারা কুফরীতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন ছিল। কিন্তু মুসলমানদের নিকট থেকে জাগতিক স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যে মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করত। ঈমান ও ইসলামের সাথে তাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হচ্ছে তারা, যারা ইসলামের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে, কখনো প্রকৃত মু'মিন হতে ইচ্ছা করত, কিন্তু দুনিয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে এ ইচ্ছা হতে বিরত রাখত। এভাবে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দিনাতিপাত করত।

আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র নাগালের ঊর্ধ্বে নয়। সব সময়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাক তাদের ধ্বংসও করতে

পারেন। এমনকি তাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিকে পর্যন্ত রহিত করে দিতে পারেন। এই তেরটি আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থার পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে অনেক আহকাম ও মাসআলা এবং গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত বা উপদেশ রয়েছে। যথা-

কুফর ও নেফাক সে যুগেই ছিল, না এখনও আছে ঃ আলোচ্য আয়াতগুলোতে আমরা জানতে পারি যে, মুনাফিকদের কপটতা নির্ধারণ করা এবং তাদেরকে মুনাফিক বলে চিহ্নিত করার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মুসলমান নয়; বরং মুনাফিক। দ্বিতীয়ত, এই যে, তাদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপে ইসলাম ও ঈমানবিরোধী কোন কাজ প্রকাশ পাওয়া। হুযূর (সা)-এর তিরোধানের পর ওহী বন্ধ হওয়ার প্রথম পদ্ধতিতে মুনাফিকদের শনাক্ত করার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিটি এখনও রয়েছে। যে ব্যক্তি কথাবার্তায় ঈমান ও ইসলামের দাবিদার হয়, কিন্তু কার্যকলাপে হয় তার বিপরীত, তাকে মুনাফিক বলা হবে। এ সমস্ত মুনাফিককে কোরআনের ভাষায় 'মুলহিদ'ও বলা হয়। যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا .

হাদীস শরীফে এসব লোককে 'যিন্দীক'ও বলা হয়েছে। যেহেতু এসব লোকের কুফরী দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তাই এরা অন্যান্য কাফেরের ন্যায় একই হুকুমের আওতাভুক্ত। এদের জন্য স্বতন্ত্র কোন হুকুম নেই। এ জন্যই এক শ্রেণীর লোক এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, রাসূল (সা)-এর তিরোধানের পর মুনাফিকদের ব্যাপার শেষ হয়েছে। সুতরাং এখন যারা মুসলমান নয়, তারা সরাসরি কাফের বলেই পরিচিত হবে।

বুখারী শরীফের শরাহ্ 'উমদা'তে হযরত ইমাম মালেক (র) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল (সা)-এর পরেও মুনাফিকদের পরিচয় করা যেতে পারে। পরিচয় হলে তাদেরকে মুনাফিক বলা হবে।

ঈমান ও কুফরের তাৎপর্য ঃ আলোচ্য আয়াতে চিন্তা করলে ঈমান ও ইসলামের পূর্ণ তাৎপর্যটি পরিষ্কার হয়ে যায়। অপরদিকে কুফরের হাকীকতও প্রকাশ হয়। কেননা, এ আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের ঈমানের দাবি اٰمَنَّا بِاللّٰهِ এবং কোরআনের পক্ষ হতে এই দাবীকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করা وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ বাক্যের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে আরো কিছু বিশেষ চিন্তা-ভাবনার অপেক্ষা রাখে ঃ

প্রথমত, যে সমস্ত মুনাফিকের বর্ণনা কোরআনে দেওয়া হয়েছে, সাধারণত তারা ছিল ইহুদী। আল্লাহ্ তা'আলা এবং রোজ কিয়ামতে বিশ্বাস করা তাদের ধর্মমতেও প্রমাণিত ছিল। তাদেরকে রাসূল (সা)-এর রিসালাত ও নবূওতের প্রতি ঈমান আনার কথা এখানে বলা হয়নি। বরং মাত্র দু'টি বিষয়ে ঈমান আনয়নের কথা বলা হয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি। এতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা চলে না। তা সত্ত্বেও কোরআন কর্তৃক তাদেরকে মিথ্যাবাদী এবং তাদের ঈমানকে অস্বীকার করার কারণ কি ? আসল কথা হচ্ছে যে, কোন-না-কোন প্রকারে নিজ নিজ ধারণা ও ইচ্ছামাফিক আল্লাহ্ এবং পরকাল স্বীকার করাকে ঈমান বলা যায় না। কেননা, মুশরিকরাও তো কোন-না-কোন দিক দিয়ে আল্লাহকে মেনে নেয়

এবং কোন একটি নিয়ামক সত্তাকে সবচাইতে বড় একক ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করে। আর ভারতের মুশরিকগণ 'পরলোক' নাম দিয়ে আখেরাতের একটি ধারণাও পোষণ করে থাকে। কিন্তু কোরআনের দৃষ্টিতে একেও ঈমান বলা যায় না। বরং একমাত্র সেই ঈমানই গ্রহণযোগ্য,আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর নিজের বর্ণিত সকল গুণসহ যে ঈমান আনা হয় এবং পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণিত অবস্থা ও গুণাগুণের সাথে যে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়।

জানা কথা যে, ইহুদীগণ কোরআনে উল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী আল্লাহ বা আখেরাত, কোনটির প্রতিই ঈমান আনেনি। একদিকে তারা হযরত উযায়র (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র মনে করে, অপরদিকে আখেরাত সম্পর্কে তাদের ধারণা হচ্ছে যে, নবী ও রাসূলগণের সন্তানগণ যা কিছুই করুক না কেন, যেহেতু তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র, পরকালে তাঁদের কিছু হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি হলে তা হবে অতি নগণ্য। অতএব, তারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি যে ঈমানের কথা বলে থাকে, কোরআনের ভাষায় তাকে ঈমান বলা যায় না।

কুফর ও ঈমানের সংজ্ঞা ঃ কোরআনের ভাষায় ঈমানের তাৎপর্য বলতে গিয়ে সূরা বাকারাহ্‌র ত্রয়োদশতম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ যাতে বোঝা যাচ্ছে যে, ঈমানের যথার্থতা যাচাই করার মাপকাঠি হচ্ছে সাহাবীগণের ঈমান। এ পরীক্ষায় যা সঠিক বলে প্রমাণিত না হবে, তা আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট ঈমান বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না।

যদি কোন ব্যক্তি কোরআনের বিষয়কে কোরআনের বর্ণনার বিপরীত পথ অবলম্বন করে বলে যে, আমি তো এ আকীদাকে মানি, তবে তা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। যথা ঃ আজকাল কাদিয়ানীরা বলে বেড়ায় যে, আমরা তো খতমে-নবুওতে বিশ্বাস করি। অথচ এ বিশ্বাসে তারা রাসূল (সা)-এর বর্ণনা ও সাহাবীগণের ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে। আর এ পর্দার অন্তরালে মির্জা গোলাম আহ্‌মদের নবুয়ত প্রতিষ্ঠার পথ বের করেছে। তাই কোরআনের বর্ণনায় এদেরকেও وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ-এর আওতাভুক্ত করা হয়।

শেষ কথা, যদি কোন ব্যক্তি সাহাবীদের ঈমানের পরিপন্থী কোন বিশ্বাসের কোন নতুন পথ ও মত তৈরি করে সে মতের অনুসারী হয় এবং নিজেকে মু'মিন বলে দাবি করে, মুসলমানদের নামায-রোযা ইত্যাদিতে শরীকও হয়, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের প্রদর্শিত পথে ঈমান আনয়ন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের ভাষায় তাদেরকে মু'মিন বলা হবে না।

একটি সন্দেহের নিরসন ঃ হাদীস ও ফেকাহ্‌শাস্ত্রের একটা সুপরিচিত সিদ্ধান্ত এই যে, আহলে-কেবলাকে কাফের বলা যাবে না। এর উত্তরও এ আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে যে, আহলে-কেবলা তাদেরকেই বলা হবে, যারা দীনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ের স্বীকৃতি জানায়; কোন একটি বিষয়েও অবিশ্বাস পোষণ করে না বা অস্বীকৃতি জানায় না। পরন্তু শুধু কেবলামুখী হয়ে নামায পড়লেই কেউ ঈমানদার হতে পারে না। কারণ, তারা সাহাবীগণের ন্যায় দীনের যাবতীয় জরুরীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

মিথ্যা একটি জঘন্য অপরাধ ঃ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ এ আয়াতে মুনাফিকদের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তারা প্রথম স্তরের কাফের হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের জানামতে মিথ্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইত। তাই তারা ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ এবং রোজ কিয়ামতের

কথা বলেই ক্ষান্ত হতো, রাসূলের প্রতি ঈমানের প্রসঙ্গে দৃঢ়তার সাথে পাশ কাটিয়ে যেতো। কেননা, এতে করে তাদের পক্ষে সরাসরি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার ভয় ছিল। এতে বোঝা যায় যে, মিথ্যা এমন একটি জঘন্য ও নিকৃষ্ট অপরাধ, যা কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোকই পছন্দ করে না—সে কাফের-ফাসেকই হোক না কেন।

নবী এবং ওলীগণের সাথে দুর্ব্যবহার করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌র সাথে দুর্ব্যবহারেরই শামিল ঃ উপরিউক্ত আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে একথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, يُخَادِعُونَ اللّٰهَ অর্থাৎ এরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। অথচ এ মুনাফিকদের মধ্যে হয়তো একজনও এমন ছিল না, যে আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার মনোভাব পোষণ করত। বরং তারা রাসূল (সা) এবং মু'মিনগণকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সমস্ত ঘৃণ্য কাজ করেছে।

আলোচ্য আয়াতে তাদের এ আচরণকে আল্লাহ্‌কেই ধোঁকা দেওয়া বলে উল্লিখিত হয়েছে এবং প্রকারান্তরে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌র রাসূল বা কোন ওলীর সাথে দুর্ব্যবহার করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা আল্লাহ্‌র সাথেই খারাপ আচরণ করে। প্রসঙ্গত আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে বে-আদবী করায় আল্লাহ্‌র সাথেই বে-আদবী করা হয়, একথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) এবং তাঁর অনুসারিগণের বিপুল মর্যাদার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে।

মিথ্যা বলার পাপ ঃ আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের কঠোর শাস্তির কারণ— بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ-অর্থাৎ তাদের মিথ্যাচারকে স্থির করা হয়েছে। অথচ তাদের কুফর ও নিফাকের অন্যায়ই ছিল সবচেয়ে বড়। দ্বিতীয় বড় অন্যায় হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা। একদসত্ত্বেও কঠোর শাস্তির কারণ তাদের মিথ্যাচারকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে একথাই বোঝা যায় যে, মিথ্যা বলার অভ্যাসই তাদের প্রকৃত অন্যায়। এ বদ অভ্যাসই তাদেরকে কুফর ও নিফাক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। এ জন্যই অন্যায়ের পর্যায়ে যদিও কুফর ও নিফাকই সর্বাপেক্ষা বড়, কিন্তু এসবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা। তাই কোরআন মিথ্যা বলাকে মূর্তিপূজার সাথে যুক্ত করে এরশাদ করেছে ঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۔

অর্থাৎ-মূর্তিপূজার অপবিত্রতা ও মিথ্যা বলা হতে বিরত থাক।

সংশোধন ও ফাসাদের সংজ্ঞা এবং সংশোধনকারী ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীর পরিচয় ঃ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে—যখন এসব মুনাফিককে বলা হয় যে, কপটতার মাধ্যমে জগত ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করো না, তখন তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলে বেড়ায় اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ এখানে اِنَّمَا। শব্দটি প্রাসঙ্গিক শব্দের অর্থে সার্বিকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই বাক্যের অর্থ হচ্ছে ঃ আমরা তো আপোস-মীমাংসা বা কল্যাণ সাধনকারী। আমাদের কোন কাজের সম্পর্ক ফেতনা-ফাসাদের সাথে নেই। কিন্তু কোরআন এ দাবির উত্তরে বলেছে ঃ

اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۔

অর্থাৎ—স্মরণ রোখো, তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী। কিন্তু তা অনুভব করতে পারে না।

এতে দু'টি বিষয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। প্রথমত, মুনাফিকদের কার্যকলাপ প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ বিস্তারের কারণ। দ্বিতীয়ত, মুনাফিকরা ফেতনা-ফাসাদ বিস্তারের নিয়ত বা

উদ্দেশ্যে এসব কাজ করত না, বরং তারা জানতও না যে, তাদের এ কাজ ফেতনা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَلٰكِنْ لاَّ يَشْعُرُوْنَ দ্বারা এ অর্থই বোঝা যাচ্ছে। কারণ, পৃথিবীতে এমন কতগুলো কাজ আছে যেগুলো দ্বারা শান্তি ভঙ্গ হয়, ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়—এ সহজ বোধ সকলেরই রয়েছে। যথা—হত্যা, লুণ্ঠন, চুরি-ডাকাতি, ধোঁকা ও শঠতা প্রভৃতি। এগুলো বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই ফেতনা মনে করে এবং প্রত্যেক ভদ্র ও শান্তিকামী লোক প্রকারান্তরে এসব হতে দূরে থাকে। এমনও কিছু কাজ রয়েছে, যেগুলো আপাত দৃষ্টিতে ফেতনা-ফাসাদের কারণ মনে না হলেও সেগুলোর প্রতিক্রিয়া মানব-চরিত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং চরিত্রকে চরম অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। ফলে জগতে ফেতনা-ফাসাদের দ্বার অবারিত হয়ে যায়। এ মুনাফিকদের অবস্থাও তাই। তারা চুরি ডাকাতি, ব্যভিচার প্রভৃতি হতে বিরত থাকত আর সে জন্যই অত্যন্ত জোরগলায় বলে বেড়াতো যে, আমরা ফাসাদ সৃষ্টিকারী তো নই-ই, বরং আমরা শান্তি ও কল্যাণকামী। কিন্তু নিফাক বা হিংসা-বিদ্বেষপ্রসূত চক্রান্ত প্রভৃতির ফলে মানুষ চারিত্রিক অধঃপতনের এত নিম্নস্তরের চলে যায় এবং এমন সব কাজে লিপ্ত হয়,যা কোন সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। মানুষ যখন মানবচরিত্র হারিয়ে ফেলে তখন জীবনের পদে পদে শুধু ফেতনা-ফাসাদই আসতে থাকে। আর সে ফেতনা এত মারাত্মক যে, তা হিংস্র জন্তু বা চোর-ডাকাতও করতে পারে না। অবশ্য তাদের এ কার্যে রাষ্ট্রীয় আইন বাধা দিতে পারে। কিন্তু আইন তো মানুষের রচিত। যখন মানুষই মনুষ্যত্বের গণ্ডি থেকে দূরে সরে পড়ে, তখন আইনের নীতিমালা পদে পদে লঙ্ঘিত হয়। আজকের তথাকথিত সভ্য সমাজের প্রতিটি মানুষ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাপারেই তা প্রত্যক্ষ করেছেন। আধুনিক বিশ্বে তাহযীব-তমদ্দুন উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছে, শিক্ষা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি শব্দ দু'টো আজ মানুষের মুখে মুখে, আইন প্রণয়নকারী সংস্থার দৃষ্টি আজ অত্যন্ত সচেতন। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; ব্যবস্থাপনা ও শাসন পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগও এ কাজে সদা ব্যস্ত আছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ফেতনা-ফাসাদ, অন্যায়-অনাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, আইন নিজে কোন যন্ত্র নয়; এর পরিচালনা মানুষের হাতেই ন্যস্ত। যখন মানুষ মানবীয় গুণাবলী হারিয়ে ফেলে, তখন এ ফেতনার প্রতিকার না আইনের দ্বারা হতে পারে, না সরকার করতে পারে, না প্রতিকারের অন্য কোন পন্থা দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্য রাসূল (সা) তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টায় মানুষকে সত্যিকারের মানুষরূপে গঠন করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মানুষ যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বের গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবে ফেতনা-ফাসাদ বন্ধ করার জন্য পৃথকভাবে আইন প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা বড় একটা থাকে না। তখন আর পুলিশেরও এত বেশি প্রয়োজন হবে না, এত বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানেরও দরকার হবে না। যখনই দুনিয়ার কোন অংশে তাঁর শিক্ষা ও উপদেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে, তখন দুনিয়ার সে অংশের মানুষ প্রকৃত শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান দেখেছেন। এ দৃশ্য অন্য কোথাও দেখা যায়নি, বিশেষত এ শিক্ষা বর্জনকারীদের মধ্যে তো নয়ই।

নবী করীম (সা)-এর উপদেশ আমল করার মূল কথাই হচ্ছে, আল্লাহ্‌র ভয় এবং পরকালের হিসাব-নিকাশের চিন্তা। এ ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই মানুষকে অন্যায় হতে বিরত রাখার বাস্তব শিক্ষা দান করতে পারে না।

সমকালীন পৃথিবীতে যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে, তারা এসব অন্যায় ও অপরাধ রোধ করার জন্য নতুন নতুন পন্থা বের করেন বটে, কিন্তু মানুষের চরিত্র শুদ্ধির মূল উৎস, অন্তরে আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি করার ব্যাপারে তারা যে শুধু গাফেল তা-ই নয়; বরং মানুষের হৃদয়-মন থেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র প্রতি ঈমান চিরতরে উৎখাত করার ফিকিরে ব্যস্ত। এর পরিণাম হচ্ছে এই যে, দিন দিন অন্যায় ও অপরাধ শুধু বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

প্রকাশ্যভাবে ফাসাদ সৃষ্টিকারী চোর-ডাকাতের প্রতিকার করা তো সহজ, কিন্তু যারা মানবতা হারিয়ে ফেলেছে, তাদের ফাসাদ কল্যাণের ছদ্মাবরণে প্রসার লাভ করছে। তারা এজন্য মনোমুগ্ধকর এবং শঠতাপূর্ণ পরিকল্পনাও তৈরি করে। আর স্ব স্ব জাতীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য কল্যাণের আবরণে إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ-এর ধুয়া তোলে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে অন্যায় অপরাধ ফিতনা-ফাসাদ বন্ধ করার কথা বলেছেন, সেখানে এরশাদ করেছেন ঃ

وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ .

অর্থাৎ "কে কল্যাণকারী আর কে ফাসাদকারী তা আল্লাহই জানেন।" তাছাড়া প্রত্যেক কাজের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও পরিণামও তিনি জানেন যে, এতে মীমাংসা হবে, না ফাসাদ হবে। এজন্য আপোষ-মীমাংসার জন্য শুধু নিয়ত করাই যথেষ্ট নয়; বরং কর্ম-পদ্ধতি ও শরীয়ত অনুযায়ী ঠিক হতে হবে। অনেক সময় কোন কোন কাজ কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যই করা হয়, কিন্তু তার পরিণাম দাঁড়ায় ফেতনা-ফাসাদ এবং মারাত্মক অকল্যাণ।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

---

(২১) হে মানব সমাজ ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে। (২২) যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহ্র সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুত এসব তোমরা জান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। এর দ্বারা হয়ত তোমরা দোযখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাবে। (খোদায়ী ফরমানের ভাষায় 'হয়ত' শব্দ আশ্বাস বা অঙ্গীকারার্থে ব্যবহৃত হয়) যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য জমিকে বিছানারূপে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশকে ছাদরূপে তৈরি করেছেন; আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তদ্দ্বারা তোমাদের জন্য খাদ্যরূপে ফলমূল সৃষ্টি করেছেন। অতএব, অন্য কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করো না। তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করো না।

বস্তুত, তোমরা জান (যে, প্রকৃতিতে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়ে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং তাতে যমীন যে ফসল উৎপাদন করে, তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনার যোগ্য কিভাবে মনে করা যেতে পারে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ সূরা ফাতিহার اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-এ যে দোয়া ও দরখাস্ত করা হয়েছে, তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে সূরা আল-বাক্বারাহর দ্বিতীয় আয়াতে। এর অর্থ, যে সরল পথ তোমরা চাও, তা-ই এ কোরআনে রয়েছে। কোরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সিরাতে-মুস্তাকীমেরই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর কোরআনের হেদায়েত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানকারী মানব-সমাজকে তিনটি দলে বিভক্ত করে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম তিন আয়াতে সেসব মু'মিন-মুত্তাকীদের কথা উল্লেখিত হয়েছে, যাঁরা কোরআনের হেদায়েতকে জীবন-সাধনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছেন। পরবর্তী দু'টি আয়াতে আলোচিত হয়েছে সে দলের কথা, যারা এ হেদায়েতকে প্রকাশ্যে অস্বীকার এবং বিরুদ্ধাচরণ করেছে। পরবর্তী তেরটি আয়াতে সে মারাত্মক দলের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে, যারা প্রকাশ্যে না হলেও কার্যত এ হেদায়েতের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যারা দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য স্বীয় কুফর ও ইসলাম-বিরোধী ভাবধারাকে গোপন রেখে এবং মুসলমানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের দলে মিশেছে এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে।

এমনিভাবে সূরা বাক্বারাহর প্রথম বিশটি আয়াতেও এ হেদায়েতকে গ্রহণ করা ও বর্জন করার ব্যাপারে মানবজাতিকে তিনটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে। এতে এ কথার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে যে, বিশ্ব-মানবকে বংশ, বর্ণ, ভাষা ও সম্প্রদায়ের নিরিখে বিভক্ত করা চলে না। বরং এর সঠিক বিভক্তি একমাত্র ধর্মের ভিত্তিতেই করা যেতে পারে। আল্লাহ্ ও তাঁর হেদায়েত গ্রহণকারীকে এক জাতি, পক্ষান্তরে অমান্যকারীদেরকে অন্য জাতি হিসাবে ভাগ করা হয়। এ দু'টি ভাগকেই সূরা-হাশরে হিযবুল্লাহ্ ও হিযবুশ্ শয়তান—এ দু'টি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মোটকথা, সূরা আল-বাক্বারাহর প্রথম বিশটি আয়াতে আল্লাহ্‌র হেদায়েতকে মানা না-মানার ভিত্তিতে মানবজাতিকে তিনটি দলে বিভক্ত করে প্রত্যেকের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

অতঃপর একুশ ও বাইশতম আয়াতে তিনটি দলকেই সমগ্র কোরআনের মৌল শিক্ষার প্রতি আহবান করা হয়েছে। এতে সৃষ্টিজগতের সবকিছুর আরাধনা থেকে বিরত থেকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি এমন পদ্ধতিতে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, যাতে সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও একটু চিন্তা করলেই তওহীদের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয়।

প্রথম আয়াত ঃ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ দ্বারা আহবানের সূচনা হয়েছে। نَاسٌ (নাস) আরবী ভাষায় সাধারণভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে পূর্বে আলোচিত মানব সমাজের তিন শ্রেণীই এ আহবানের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে,

اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ইবাদত শব্দের অর্থ নিজের অন্তরে মাহাত্ম্য ও ভীতি জাগ্রত রেখে সকল শক্তি আনুগত্য ও তাঁবেদারীতে নিয়োজিত করা এবং সকল অবাধ্যতা ও নাফরমানী থেকে দূরে থাকা। (রূহুল বয়ান, খ. ১. পৃ. ৭৪,) 'রব' শব্দের অর্থ পালনকর্তা। ইতিপূর্বে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তদনুসারে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়—স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত কর।

এ ক্ষেত্রে 'রব' শব্দের পরিবর্তে 'আল্লাহ' বা তাঁর গুণবাচক নামসমূহের মধ্য থেকে অন্য যে কোন একটা ব্যবহার করা যেতে পারতেন, কিন্তু তা না করে 'রব' শব্দ ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে, এখানে দাবীর সাথে দলীলও পেশ করা হয়েছে। কেননা, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সে সত্তাই হতে পারে, যে সত্তা তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যিনি বিশেষ এক পালননীতির মাধ্যমে সকল গুণে গুণান্বিত করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করেছেন এবং দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার স্বাভাবিক সকল ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন।

মানুষ যত মূর্খই হোক এবং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি যতই হারিয়ে থাকুক না কেন, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, লালন-পালনের সকল দায়িত্ব নেওয়া আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর মানুষকে এ অগণিত নেয়ামত না পাথর নির্মিত কোন মূর্তি দান করেছে, না অন্য কোন শক্তি। আর তারা করবেই বা কিরূপে। তারা তো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বা বেঁচে থাকার জন্য নিজেরাই সে মহাশক্তি ও সত্তার মুখাপেক্ষী। যে নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী সে অন্যের অভাব কি করে দূর করবে ? যদি কেউ বাহ্যিক অর্থে কারো প্রতিপালন করেও, তবে তাও প্রকৃত প্রস্তাবে সে সত্তার ব্যবস্থাপনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।

এর সারমর্ম এই যে, যে সত্তার ইবাদতের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা ইবাদতের উপযুক্ত নয়।

এ বাক্যে মানুষের তিনটি দলই অন্তর্ভুক্ত। তবে উল্লেখিত তিন দলের প্রত্যেকের বেলায় এ বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হবে। কাজেই যখন কাফিরদেরকে বলা হয় যে, তোমরা স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত কর, তখন এর অর্থ হয়, সকল সৃষ্টবস্তুর পূজা-অর্চনা ত্যাগ করে তওহীদ বা একত্ববাদ গ্রহণ কর। মুনাফিকদের বেলায় এ বাক্যের অর্থ হবে—কপটতা ত্যাগ করে আন্তরিকতা ও সরলতা গ্রহণ কর। মুসলমান পাপীদের বেলায় অর্থ হবে—পাপ পরিহার করে পরিপূর্ণ আনুগত্য অবলম্বন কর। আর মু'মিন-মুত্তাকীদের বেলায় এর অর্থ হবে—ইবাদত ও আনুগত্যে দৃঢ় থাক এবং এতে উন্নতির চেষ্টা কর।"- (রূহুল-বয়ান)

অতঃপর 'রব' বা পালনকর্তার কয়েকটি বিশেষ গুণের কথা বর্ণনা করে এ বিষয়টি আরো একটু স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِیْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

অর্থাৎ—তোমাদের সে পালনকর্তা—যিনি তোমাদেরকে এবং তোমার পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এতে 'রব'-এর অস্তিত্ব আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্তাতে থাকার কোন ধারণাও কেউ করতে পারে না। তা হচ্ছে, অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা। তাছাড়া মাতৃগর্ভের অন্ধকার ও সঙ্কীর্ণ পরিবেশে এত সুন্দর ও এত পবিত্র মানুষ তৈরী করা, যার পবিত্রতা দেখে ফেরেশতাদেরও ঈর্ষা হয়। তা সে একক সত্তা ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা হতে পারে না; যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন; বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।

এ স্থলে خَلَقَكُمْ-এর সাথে اَلَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ যুক্ত করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদেরকে ও তোমাদের বাপ-দাদা, অর্থাৎ গোটা মানবজাতির স্রষ্টা সেই 'রব'। অতঃপর مِنْ قَبْلِكُمْ বলেছেন, কিন্তু مِنْ بَعْدِكُمْ না বলে এ দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, উম্মতে-মুহাম্মাদীর পর আর কোন উম্মত বা মিল্লাত হবে না। কেননা, খতমে-নবুওতের পর আর কোন নবী রাসূলের আগমন হবে না এবং কোন নতুন উম্মতও হবে না। অতঃপর এ আয়াতের শেষ বাক্য لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ অর্থাৎ দুনিয়াতে গোমরাহী এবং আখেরাতে শাস্তি থেকে মুক্তির পথ তোমাদের জন্য একমাত্র এই যে, তওহীদকে গ্রহণ কর এবং শিরক থেকে বিরত থাক। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে 'রব'-এর দ্বিতীয় গুণ বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ .

অর্থাৎ-"সে সত্তাই তোমাদের পালনকর্তা, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদরূপে সৃষ্টি করেছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তদ্দ্বারা ফলমূল আহার্যরূপে সৃষ্টি করেছেন।" পূর্বের আয়াতে ঐ সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ ছিল, যেগুলো মানুষের সত্তার সাথে মিশে রয়েছে। অতঃপর এ আয়াতে সে সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষের চারদিকের বস্তুসমূহের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ প্রথম আয়াতে মানবসৃষ্টি এবং দ্বিতীয় আয়াতে প্রকৃতির ভাণ্ডারে ছড়িয়ে থাকা নেয়ামতসমূহের বর্ণনা করে সৃষ্টিকর্তার যাবতীয় নেয়ামতকেই এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। নেয়ামতের মধ্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন যাবতীয় ফসলের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যমীনকে পানির মত এমন নরম করা হয়নি, যাতে স্থির হয়ে এর উপর দাঁড়ানো যাবে না ; আবার লৌহ বা পাথরের মত এত শক্তও করা হয়নি যে, প্রয়োজনে সহজে ব্যবহার করা যাবে না। বরং নরম ও শক্ত--এ দুয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে মানুষ সহজে ভূমি কর্ষণ করে তা থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারে।

فِرَاشٌ শব্দের দ্বারা একথা বোঝায় না যে, পৃথিবীর আকৃতি গোল নয়। বরং ভূখণ্ডে গোল হওয়া সত্ত্বেও দেখতে বিছানার মত বিস্তৃত দেখায়।

কোরআন বিভিন্ন বস্তুর বর্ণনাদান উপলক্ষে এমন এক বর্ণনাভঙ্গি গ্রহণ করেছে যাতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও সরল-বিচক্ষণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকই তা অতি সহজে বুঝতে পারে। দ্বিতীয় নেয়ামত হচ্ছে আকাশকে অতি মনোরম শোভায় শোভিত করে একটি ছাদের

ন্যায় উপরে বিস্তৃত করে রাখা। তৃতীয় নেয়ামত হচ্ছে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ। 'আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন' বাক্যের দ্বারা এরূপ বুঝবার কারণ নেই যে, মেঘমালার মাধ্যম ব্যতীতই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হচ্ছে। বরং সাধারণ পরিভাষায় উপর থেকে আগত যাবতীয় বস্তুকেই যেহেতু 'আকাশ থেকে অবতীর্ণ' বলে উল্লেখ করা হয়, সে জন্যই এরূপ বলা হয়েছে।

অধিকন্তু কোরআনের বহু স্থানে মেঘ থেকে পানি বর্ষণের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন ঃ

أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ .

অর্থাৎ—শ্বেত-শুভ্র মেঘমালা থেকে বৃষ্টির পানি কি তোমরা বর্ষণ করেছ, না আমি বর্ষণকারী? আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا .

অর্থাৎ--আমি পরিপূর্ণ মেঘ থেকে প্রবাহিত পানি বর্ষণ করছি।

চতুর্থ নেয়ামত হচ্ছে, পানি বর্ষণ করে ফলমূল উৎপন্ন করা এবং সেগুলোকে মানুষের আহার্যে পরিণত করা।

আল্লাহ্র উপরিউক্ত চারটি গুণের মধ্যে প্রথম তিনটি এমন, যেগুলোতে মানুষের চেষ্টা ও কর্ম তো দূরের কথা, তার উপস্থিতিরও দখল নেই। যে সময় যমীন ও আসমান সৃষ্টি হয়েছিল এবং সৃষ্টিকর্তা তাঁর কাজ করছিলেন, সে যুগে তো মানুষের অস্তিত্বও ছিল না। এ সম্পর্কে কোন নির্বোধও এমন কল্পনা বা সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, এ বিশাল জগত আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মানুষ, মূর্তি বা দেবতা অথবা অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে।

তবে যমীন থেকে ফল-ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের চেষ্টা-তদবীর সম্পর্কে আপাত দৃষ্টিতে এমন ধারণা জন্মাতে পারে যে, মাটিকে নরম করে বা তাতে হালচাষ করে, বীজ বুনে ফসল উৎপাদনের জন্য তৈরি করা হয়তো মানুষের শ্রমেই সম্ভব হয়ে থাকে।

কিন্তু কোরআনের অন্য এক আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, বৃক্ষ সৃষ্টি ও তাতে ফলমূল উৎপাদনে মানুষের চেষ্টা-তদবীরের আদৌ কোন ভূমিকা নেই। ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের যে পরিশ্রম স্বীকার করে, তা প্রকৃতপক্ষে অঙ্কুর উদ্‌গমের পর্যায় থেকে শুরু করে ফসল পাকার সময় পর্যন্ত যেসব বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়, শুধু সেগুলো অপসারণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

চিন্তা করুন--জমি চাষ করা, গর্ত খনন করা, আগাছা দূর করা, সার প্রয়োগের মাধ্যমে জমিকে নরম করা প্রভৃতি কৃষকের প্রাথমিক কাজগুলো তো শুধু বীজ ও অঙ্কুর উদ্‌গমের পথে যাতে করে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়, সেজন্যই করা হয়ে থাকে। কিন্তু বীজ থেকে অঙ্কুর বের করে আনা এবং এগুলোকে ফলমূল ও পত্র-পল্লবে সজ্জিত করায় কৃষকের পরিশ্রমের কোন দখল বা ভূমিকা আছে কি ?

অনুরূপ ভাবে কৃষকের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে জমিতে বীজ বপন, এর রক্ষণাবেক্ষণ, চারা-গাছকে শীত-তাপ ও জীব-জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তার অর্থ, আল্লাহ্র কুদরতে সৃষ্ট গাছকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা এবং চারা বেড়ে ওঠার পথে বাধা দূরীকরণ পর্যন্তই কৃষকের

কাজ। বলা যেতে পারে যে, পানি সেচের মাধ্যমে বীজ, অঙ্কুর ও বৃক্ষের খাদ্য সরবরাহ করা কৃষকের কাজ বটে, কিন্তু পানি তো তাদের সৃষ্ট নয়। কৃষকের অবদান শুধু এতটুকুই যে, আল্লাহ্র সৃষ্ট পানিকে আল্লাহ্রই আর এক সৃষ্টি ফসলের গোড়ায় একটি উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োগ করবে।

এ আলোচনায় দেখা যাচ্ছে--ফসলের গাছ সৃষ্টি, এর প্রবৃদ্ধি ও ফল-ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে আগাগোড়া মানুষের যে চেষ্টা-তদবীর নিয়োজিত হয়, সেসব একান্তভাবেই উৎপাদনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো দূর করা বা একে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। কিছু বৃক্ষ সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি, তাকে ফলে-ফুলে পত্র-পল্লবে সজ্জিত করার ব্যাপারে আল্লাহ্র কুদরত ছাড়া অন্য কারো কোন কর্তৃত্ব নেই। আল-কোরআন এ সম্পর্কে এরশাদ করেছে ঃ

اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ۔

অর্থাৎ—"বল তো, তোমরা যা বপন কর, সেগুলো কি তোমরা উৎপাদন কর, না আমি উৎপাদন করি ?"

কোরআনের এ প্রশ্নের উত্তরে মানুষ এক বাক্যে একথাই বলতে বাধ্য হয় যে, এ সবের উৎপাদনকারী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, অন্য কেউ নয়।

এ আলোচনায় বোঝা যাচ্ছে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা এবং বৃষ্টি বিদ্যুৎ বর্ষণ করার যে নিয়মিত বিধান আছে তাতে মানুষের চেষ্টা-তদবীরের কোন দখল নেই। অনুরূপভাবে বীজ থেকে ফসল ও বৃক্ষ উৎপন্ন করা, একে ফলে-ফুলে, পত্র-পল্লবে সজ্জিত-রক্ষিত করায় এবং তদ্দ্বারা মানুষের আহার্য প্রস্তুত করায় মানুষের শ্রম নামেমাত্রই ব্যবহার হয়ে থাকে। বস্তুতপক্ষে এসব কাজ আল্লাহ্রই কুদরত ও হেকমতের ফলশ্রুতি।

মোটকথা, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার এমন চারটি গুণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। এ দু'টি আয়াত দ্বারাও বোঝা যায় যে, মানুষকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনা এবং বেঁচে থাকার জন্য আসমান, যমীন, ফল-ফসল ইত্যাদি দ্বারা রিযিক তৈরি করা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাজ নয়। এজন্য সামান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিও একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ইবাদত ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্যও একমাত্র তিনিই। কিন্তু এ সত্ত্বেও যদি মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও সামনে মাথা নত করে, তবে তার চাইতে বড় অন্যায় আর কি হতে পারে ?

نعمتت را خورده عصیاں میکنم * نعمت ازتو من بغیرے می تنم

অর্থাৎ—"তোমার নেয়ামত খেয়েই পাপ করি। তোমরা নেয়ামত আমি ছাড়া আর কে খায়?" আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সমস্ত সৃষ্টির সেরা বা সরদার বানিয়েছেন এবং এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেন যাবতীয় সৃষ্টি তাদের খেদমত করবে, আর তারা শুধু বিশ্বপালকের এবাদত ও খেদমত করবে। কিন্তু আত্মভোলা মানুষ স্বয়ং আল্লাহ্কে ভুলে গেছে ; ফলে তাদের শত শত দেবতার গোলামিতে আত্মনিয়োগ করতে হচ্ছে।

ایک در چھوڑ کے ہم ہوگئے لا کھوں کے غلام

ہم نے ازادی عرفی کانہ سوچا انجام

অর্থাৎ—এক দরজা ছেড়ে দিয়ে আমরা লক্ষ লক্ষ বস্তুর গোলামে পরিণত হয়েছি। যত্রতত্র বিচরণের এই যে স্বাধীনতা, এর পরিণাম চিন্তা করিনি।

মানুষকে অন্যের গোলামি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের শেষাংশে এরশাদ করেছেন ঃ

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

অর্থাৎ কাউকে আল্লাহ্র সমতুল্য ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না, আর তোমরা তো জানই। অর্থাৎ, যখন তোমরা জান যে, তোমাদের জন্ম, তোমাদের লালন-পালন ও বর্ধন, জ্ঞান-বুদ্ধি দান এবং বসবাসের জন্য জমি, অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ, পানি দ্বারা ফল-ফসল উৎপাদন, তা দিয়ে আহার্য তৈরি প্রভৃতি যখনই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাজও নয়, অন্য কেউ তা করতেও পারে না, তখন ইবাদত-বন্দেগীর যোগ্য তিনি ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও তাঁর সাথে অন্যকে অংশীদার করা নিতান্ত অন্যায়।

সারকথা, এ দু'টি আয়াতে তওহীদের সে দাওয়াতই দেওয়া হয়েছে, যে দাওয়াত প্রচারের জন্য সমস্ত আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর সমস্ত নবী ও রসূলকে প্রেরণ করা হয়েছে। পরন্তু এক আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী করার নামই তওহীদ।

এটা সেই যুগান্তকারী পরিকল্পনা, যা মানুষের যাবতীয় কাজে, যথা 'আমল-আখলাক' আচার-ব্যবহার সবকিছুর উপরই অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কেননা, যখন কোন মানুষ বিশ্বাস করে যে, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক, সকল পরিচালনা এবং সকল বস্তুর উপর একক ক্ষমতার অধিকারী একটি মাত্র সত্তা, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কারো নড়াচড়া করারও ক্ষমতা নেই, কেউ কারো উপকার বা অপকার করতে পারে না, তখন বিপদে-আপদে, সুখ-দুঃখে, অভাব-অনটনে সর্বাবস্থায় সে মহাসত্তার প্রতি তার সকল মনোযোগ ও আকর্ষণ নিয়োজিত হবে, ফলে তার সে যোগ্যতা অর্জিত হবে যাতে সে বাহ্যিক বস্তুর হাকীকত চিনতে পারবে এবং অনুভব করতে পারবে যে, এ সবকিছুর পেছনেই এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে।

বিজলী বা বাষ্পের উপাসক পাশ্চাত্যের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যদি এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারত, তবে তারা বুঝত যে, এ বিজলী ও বাষ্পের ঊর্ধ্বে আরও কোন শক্তি রয়েছে এবং প্রকৃত শক্তি বিজলীতেও নেই, বাষ্পেও নেই ; বরং যিনি এ বিদ্যুৎ ও বাষ্প সৃষ্টি করেছেন, সে মহাসত্তাই সমস্ত শক্তির উৎস। অবশ্য একথা বোঝার জন্য গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন। আর যারা এ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারেনি, তারা এ দুনিয়াতে যত বড় দার্শনিক ও জ্ঞানীই হোক, সেই সরল লোকটিরই মত যে রেল স্টেশনে এসে গার্ডের হাতে লাল ও সবুজ নিশান দেখতে পেলো। সবুজ নিশান দেখালে গাড়ি চলতে থাকে, আর লাল নিশান দেখালে থামে। তা দেখে সে চিন্তা করে বুঝে নিল যে, এ নিশানগুলিই এতবড় দ্রুতগামী গাড়ী চালানো ও থামানোর মালিক এবং প্রকৃত শক্তির উৎস। এই লোকটির বুদ্ধি দেখে মানুষ তাকে উপহাস করে। কারণ সে এটা বুঝে না যে, নিশান হলো একটি নিদর্শন মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজ

হচ্ছে চালকের, যে লোকটি ইঞ্জিনের গোড়ায় বসে আছে। আসলে এ কাজটি চালকেরও নয়। বরং এটি ইঞ্জিনের সকল কল-কব্জার সম্মিলিত কাজ। আরও গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়--এ কাজটি চালকেরও নয় ; ইঞ্জিনেরও নয় ; বরং ইঞ্জিনের ভেতরে যে উত্তাপের উৎপত্তি হয়, সেই উত্তাপের। এমনিভাবে একজন তাওহীদ-বিশ্বাসী লোক বস্তুবাদী তথাকথিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের প্রতি এই বলে উপহাস করে যে, প্রকৃত হাকীকত তোমরাও বুঝ না ; চিন্তার স্থান আরও দূরে। দৃষ্টিশক্তি আরও প্রখর কর, আরও গভীরভাবে লক্ষ্য কর, তখন বুঝতে পারবে, বাষ্প বা এ আগুন এবং এ পানিও কিছুই নয়। এ শক্তি সে সত্তার, যিনি আগুন-পানি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ইচ্ছা ও আদেশে এগুলো নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছে মাত্র।

خاک وباد وآب وآتش بنده اند

بامن وتو مرده با حق زنده اند

অর্থাৎ—মাটি, বায়ু, পানি ও আগুন যা মানুষের মাঝে রয়েছে, তা আমার-তোমার কাছে মৃত, কিন্তু আল্লাহ্র কাছে সজীব।

আমল নাজাত ও বেহেশত পাওয়ার নিশ্চিত উপায় নয় ঃ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ বাক্যটিতে لَعَلَّ শব্দ 'আশা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি এমন ক্ষেত্রে বলা হয়, যেখানে কোন কাজ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ঈমান তাওহীদের পরিণাম নাজাত সম্বন্ধে আল্লাহ্র ওয়াদা নিশ্চিত, কিন্তু সে বস্তুকে উম্মিদ বা আশারূপে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, মানুষের কোন কাজই মুক্তি ও বেহেশতের মূল্য বা বিনিময় হতে পারে না। বরং একমাত্র আল্লাহ্র মেহেরবানীতেই মুক্তি সম্ভব। ঈমান আনা ও আমল করার তৌফীক হওয়া আল্লাহ্র মেহেরবানীর নমুনা, কারণ নয়।

তাওহীদের বিশ্বাসই দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার জামিন ঃ ইসলামের মৌলিক আকীদা তাওহীদে বিশ্বাস শুধু একটি ধারণা বা মতবাদ মাত্রই নয় ; বরং মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষরূপে গঠন করার একমাত্র উপায়ও বটে। যা মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়, সকল সংকটে আশ্রয় দান করে এবং তার সকল দুঃখ-দুর্বিপাকের মর্মসাথী। কেননা, তাওহীদে বিশ্বাসের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, সৃষ্ট সকল বস্তুর পরিবর্তন-পরিবর্ধন একমাত্র একক সত্তার ইচ্ছাশক্তির অনুগত এবং তাঁর কুদ্রতের প্রকাশ মাত্র।

هر تغیر هے غیب کی آواز * هر تجدد میں هیں هزاروں راز

অর্থাৎ—প্রতিটি পরিবর্তনের মাঝে রয়েছে অদৃশ্যের সাড়া এবং প্রতিটি নতুনে রয়েছে অসংখ্য রহস্য।

স্বাভাবিকভাবেই এরূপ বিশ্বাস এবং প্রত্যয় যদি কারো অন্তরে সত্যিকার অর্থেই বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি যদি তাওহীদের উপর যথার্থ দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল হতে পারে, তবে তার জন্য এ বিশ্বজগতই বেহেশতে রূপান্তরিত হয়। যেসব কারণে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক হানাহানির সৃষ্টি হয়, সেসবের মূলই উৎপাটিত হয়ে যাবে, তার সামনে তখন এ শিক্ষাই শুধু প্রকাশমান থাকবে যে ঃ

از خداداں خلاف دشمن ودوست * که دل هردو در تصرف اوست

অর্থাৎ—শত্রুমিত্রের বিরুদ্ধাচরণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে, কেননা উভয়ের অন্তরের পরিবর্তন তাঁরই হাতে সাধিত হয়। এ আকীদায় বিশ্বাসীরা সারাবিশ্ব হতে বেপরোয়া ও সকল ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে জীবন যাপন করে। তার অবস্থা হয় নিম্নোক্ত কবিতাটির মত-

موحد چه بر پائے ریزی زرش * چه فولاد هندی نهی بر سرش

امید وهراسش نباشد زکس * همیں است بنیاد توحید وبس

কলেমা لا اله الا الله যাকে কালেমা-এ-তাওহীদ বলা হয়, উদ্ধৃত কবিতাটির অর্থ এবং মর্মও তাই। কিন্তু তাওহীদের এ মন্ত্রে মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং সঠিক অন্তরে এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং সার্বক্ষণিকভাবে এ বিশ্বাসের প্রেরণা অন্তরে জাগ্রত রাখাও আবশ্যক। কেননা, এক আল্লাহ্‌র সার্বক্ষণিক উপস্থিতি দৃষ্টির সম্মুখে জাগ্রত থাকাকেই তাওহীদ বলে; মৌখিক স্বীকৃতিকে নয়। لا اله الا الله পাঠ করার মত কোটি কোটি লোক এ যমানায় রয়েছে। এদের সংখ্যা এত বেশি যে, ইতিপূর্বে কখনও এত ছিল না। কিন্তু সাধারণ বিচারেই এ বিপুল জনসংখ্যাকে মৌখিক স্বীকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়। অন্তর তাওহীদের বিপ্লবী রঙে রঞ্জিত বড় একটা দেখা যায় না নতুবা অবস্থাও পূর্বেকার বুযুর্গের মতই হতো। বৃহৎ হতে বৃহত্তর কোন শক্তিও তাদেরকে অবনত করতে পারত না। কোন জাতির অগণিত লোকসংখ্যা তাদের উপর কোন প্রভাবও বিস্তার করতে পারত না। যে কোন জাতির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিংবা পার্থিব সম্পদ তাদের অন্তরকে আল্লাহ্-বিরোধী কোন কাজে আকৃষ্ট করতেও সমর্থ হতো না। আল্লাহ্‌র নবী একা দাঁড়িয়ে সমগ্র বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা আমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। আমার নীতিতে কোন পরিবর্তন আনার সাধ্য কারো নেই। আমার কোন ক্ষতি করার সামর্থ্যও হবে না কারো।

নবী করীম (সা)-এর পর সাহাবী ও তাবেয়ীগণ অল্প দিনের মধ্যে সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছেন। তাঁদের শক্তি প্রকৃত তাওহীদের মধ্যেই নিহিত ছিল। আমি-আপনি এবং সারা বিশ্বের মুসলমানকে আল্লাহ্ যেন এ সম্পদ দান করেন।

কোরআনের অকাট্যতায় রিসালতের প্রমাণ ঃ

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ

وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

(২৩) এতদ্সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীকেও সঙ্গে নাও—এক আল্লাহ্কে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (২৪) আর যদি তা না পার—অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না—তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। তা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আমার (এ বিশেষ) বান্দার প্রতি (যে গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছি, তাতে যদি তোমাদের কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তবে এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে এসো। (কেননা তোমরাও আরবী ভাষা জান, আর এ ভাষার গদ্য-পদ্য সকল রীতিও তোমাদের জানা, তোমরা গদ্য ও কবিতা রচনায় অভ্যস্ত। অথচ মুহাম্মদ (সা) এ বিষয়ে অভ্যস্ত নন। এতদসত্ত্বেও তোমরা যখন কোরআনের কোন একটি সূরার সমপর্যায়ের কোন সূরা রচনা করতে পারলে না, তখন ন্যায়নীতির ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, কোরআনরূপী এ মু'জিযা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ এবং ইনি আল্লাহ্রই পয়গাম্বর)। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীকেও সঙ্গে নাও এক আল্লাহ্কে ছেড়ে (যাদেরকে তোমরা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করে রেখেছ,) যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু যদি তোমরা না পার, আর কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না, তবে দোযখের আগুন, যে আগুনের জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, তা হতে বাঁচতে চেষ্টা কর, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে (কৃতঘ্ন) কাফেরদের জন্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ও বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ ঃ এ দু'টি সূরা আল-বাক্বারাহর তেইশ ও চব্বিশতম আয়াত। এর পূববর্তী দু'টি আয়াতে তাওহীদ প্রমাণ করা হয়েছে। এ দু'টি আয়াতে রিসালতে-মুহাম্মদীর প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে। আল-কোরআন যে হেদায়েত নিয়ে আগমন করেছে, তার দু'টি স্তম্ভের একটি তাওহীদ ও অন্যটি রিসালাত। প্রথম দু'আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার কয়েকটি বিশেষ কাজের উল্লেখ করে তাওহীদ প্রমাণ করা হয়েছে। এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ্র কালাম পেশ করে হুযূর (সা)-এর রিসালাত প্রমাণ করা হচ্ছে। উভয় বিষয়ের প্রমাণ পদ্ধতি একই। প্রথম দু'টি আয়াতে এমন কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা হয়েছে, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ আদৌ করতে পারে না। যথা, যমীন ও আসমান সৃষ্টি করা, আকাশ হতে পানি বর্ষণ করা, পানি দ্বারা ফল-ফসল উৎপাদন করা ইত্যাদি। এ দলীলের সারকথা এই যে, যখন এসব কাজ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তাই ইবাদতও তাঁকে ছাড়া অন্য কেউ পেতে পারে না।

এ দু'টি আয়াতে এমন এক কালাম পেশ করা হচ্ছে, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো হতে পারে না। ব্যক্তিগত মেধা কিংবা দলগত উদ্যোগের দ্বারাও এ কালামের অনুরূপ রচনা পেশ

করা সম্ভব নয়। সমগ্র মানবজাতির এ অপারকতার আলোকেই এ সত্য সপ্রমাণিত যে, এ কালাম আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নয়। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে উদ্দেশ্য করে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা এ কালামকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মানুষের কালাম বলে মনে কর, তবে যেহেতু তোমরাও মানুষ, তোমাদেরও অনুরূপ কালাম রচনা করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকা উচিত। কাজেই সমগ্র কোরআন নয়, বরং এর ক্ষুদ্রতম একটি সূরাই রচনা করে দেখাও। এতে তোমাদিগকে আরও সুযোগ দেওয়া যাবে যে, একা না পারলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ মিলে, যারা তোমাদের সাহায্য-সহায়তা করতে পারে এমন সব লোক নিয়েই ছোট একটি সূরা রচনা করে দেখাও।

এজন্য তোমরা বিশ্ব-সম্মেলন ডাক, চেষ্টা কর। কিন্তু না, তা পারবে না। অতঃপর অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের সে ক্ষমতা ও যোগ্যতাই নেই। তারপর বলা হয়েছে, যখন কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করেও পারবে না, তখন দোযখের আগুন ও শাস্তিকে ভয় কর। কেননা এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা মানব-রচিত কালাম নয়, বরং এমন অসীম শক্তিশালী সত্তার কালাম যা মানুষের ধরাছোঁয়া ও নাগালের উর্ধ্বে। যাঁর শক্তি সকলের উর্ধ্বে এমন এক মহা সত্তা ও শক্তির কালাম। সুতরাং তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরত থেকে দোযখের কঠোর শাস্তি হতে আত্মরক্ষা কর।

মোটকথা, এ দু'টি আয়াতে কোরআনুল-করীমকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বাপেক্ষা বড় মু'জিযা হিসাবে অভিহিত করে তাঁর রিসালাত ও সত্যবাদিতার দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। রাসূল (সা)-এর মু'জিযার তো কোন শেষ নেই এবং প্রতিটিই অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু তা সত্ত্বেও এস্থলে তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যার মু'জিযা অর্থাৎ কোরআনের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রেখে ইশারা করা হয়েছে যে, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা হচ্ছে কোরআন এবং এ মু'জিযা অন্যান্য নবী-রাসূলের সাধারণ মু'জিযা হতে স্বতন্ত্র। কেননা আলাহ্ তা'আলা তাঁর অপার কুদরতে রাসূল প্রেরণের সাথে সাথে কিছু মু'জিযাও প্রকাশ করেন। আর এসব মু'জিযা যে সমস্ত রাসূলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো তাঁদের জীবৎকাল পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কোরআনই এমন এক বিচিত্র মু'জিযা যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ .

رَيْبٌ শব্দের অর্থ সন্দেহ, সংশয়। কিন্তু ইমাম রাগিব ইসফাহানীর মতে رَيْبٌ এমন সন্দেহ ও ধারণাকে বলা হয়, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সামান্য একটু চিন্তা করলেই সে সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। এজন্য কোরআনে অমুসলিম জ্ঞানী সমাজের পক্ষেও ريب-এ পতিত হওয়া স্বাভাবিক নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে; যথা, এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ .

একই কারণে কোরআনের প্রথম সূরা আল-বাক্বারাহ্য় কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে, لَا رَيْبَ فِيْهِ "এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।" আলোচ্য এ আয়াতে وَاِنْ

كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ অর্থাৎ 'যদি তোমাদের কোন সন্দেহ হয়' বাক্যটির অর্থ হচ্ছে যে, যদিও সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ এবং অলৌকিক প্রমাণাদি সমৃদ্ধ কোরআনে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশই থাকতে পারে না, তবু শোন! فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ সূরা শব্দের অর্থ সীমিত টুকরা। আর কোরআনের সূরা কোরআনের সেই অংশকে বলা হয়, যা ওহীর নির্দেশ দ্বারাই অন্য অংশ হতে পৃথক করা হয়েছে।

সমগ্র কোরআনে ছোট-বড় মোট একশ' চৌদ্দটি সূরা রয়েছে। আর এ স্থলে سُوْرَةٌ শব্দটিকে 'আলিফ-লাম' বর্জিতভাবে ব্যবহার করে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের অন্তরে যদি কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হয়ে থাকে অথবা যদি এরূপ মনে কর যে, এটি নবী করীম (সা) নিজে কিংবা অন্য কোন মানুষ রচনা করেছেন, তবে এর মীমাংসা অতি সহজে এভাবে হতে পারে যে, তোমরাও কোরআনের ক্ষুদ্রতম যে কোন সূরার মত একটি সূরা রচনা কর। তাতে যদি কৃতকার্য হতে পার, তবে তোমাদের দাবি সত্য বলে প্রমাণিত হবে এবং তোমরা একথা বলতে পারবে যে, কোরআন মানব রচিত একটি পুস্তক ব্যতীত অন্য কিছু নয়। পক্ষান্তরে যদি তা না পার, তবে মনে করতে হবে যে, এটি সত্যিই মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে, আল্লাহ্‌র রচিত কালাম।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আমরা পারিনি বলে অন্য কোন লোক বা দল তা করতে পারবে না, একথা তো বলা চলে না। এজন্য এরশাদ হয়েছে ঃ

وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ .

شُهَدَاءُ - شَاهِدٌ শব্দের বহুবচন, অর্থ—উপস্থিত। সকল সাক্ষীকে শাহেদ এজন্যই বলা হয় যে, তাদেরকেও আদালতে বিচারকের সামনে উপস্থিত হতে হয়। এখানে ব্যাপক অর্থে বলা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বের যার যার কাছ থেকে তোমরা এ কাজে সাহায্য পাওয়া সম্ভব বলে মনে কর, তাদেরও সাহায্য গ্রহণ কর। অথবা এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের দেবতা, যাদের সম্পর্কে তাদের ধারণা রয়েছে যে, শেষ বিচারের দিনে এ সব দেবতা তাদের পক্ষে সাক্ষী দেবে।

দ্বিতীয় আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তা করতে না পার, তবে জাহান্নামের সে আগুন থেকে বাঁচতে চেষ্টা কর, যে আগুনের জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। সে আগুন তোমাদের মত অস্বীকারকারী ও অবিশ্বাসীদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। তাদের প্রচেষ্টার ফলাফল কি হবে তাও তিনি وَلَنْ تَفْعَلُوْا বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে যতই প্রচেষ্টা চালাও না কেন তোমরা অনুরূপ আয়াত রচনা করতে পারবে না। কারণ, তা তোমাদের ক্ষমতার উর্ধ্বে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যে জাতি ইসলাম ও কোরআনের বিরুদ্ধাচরণে এবং এর মূল উৎপাটন করার জন্যে জানামাল, ইজ্জত প্রভৃতি সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদেরকে এত সহজ একটা পথ দেখানো হলো এবং এমন সুলভ সুযোগ দেওয়া হলো যে, তোমরা কোরআনের যে কোন ছোট সূরার মত একটি সূরা রচনা কর ; তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। তাদেরকে এ কাজে

উদ্বুদ্ধ করার জন্য আরও বলা হয়েছে যে, তোমরা আদৌ তা করতে পারবে না। এমন একটা চ্যালেঞ্জের পরও সে জাতির মধ্যে এমন একটা লোকও কেন এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে এলো না? তাদের সে অপারকতাই কি কোরআন যে আল্লাহ্‌র কালাম তার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট নয় ? এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, কোরআন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন এক জ্বলন্ত মু'জিযা যে, এর সামনে সকল বিরোধী শক্তি মস্তক অবনত করতে বাধ্য হয়েছে।

কোরআন একটি গতিশীল ও কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী মু'জিযা ঃ অন্য সমস্ত নবী ও রাসূলের মু'জিযাসমূহ তাঁদের জীবন পর্যন্তই মু'জিযা ছিল। কিন্তু কোরআনের মু'জিযা হুযূর (সা)-এর তিরোধানের পরও পূর্বের মত মু'জিযাসুলভ বৈশিষ্ট্যসহই বিদ্যমান রয়েছে। আজ পর্যন্ত একজন সাধারণ মুসলমানও দুনিয়ার যে কোন জ্ঞানী-গুণীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, কোরআনের সমতুল্য কোন আয়াত ইতিপূর্বেও কেউ তৈরি করতে পারেনি, এখনও কেউ পারবে না--আর যদি সাহস থাকে তবে তৈরি করে দেখাও। তফসীরে-জালালাইন প্রণেতা শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) স্বীয় 'খাসায়েসে কুবরা' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'টি মু'জিযা হাদীসের উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করেছেন। তার একটি কোরআন এবং অপরটি হচ্ছে এই যে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হুযূর! হজ্জের সময় তিনটি প্রতীককে লক্ষ লক্ষ হাজী তিনদিন পর্যন্ত প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করে। এ সব পাথর টুকরা তো কেউ অন্যত্র উঠিয়েও নিয়ে যায় না, এতে তো এ স্থানে প্রতি বছর পাথরের এমন স্তূপ হওয়ার কথা, যাতে প্রতীকগুলো নিমজ্জিত হয়ে যায়। একবার নিক্ষিপ্ত পাথর দ্বিতীয়বার নিক্ষেপ করাও নিষেধ। তাই হাজীগণ মুযদালিফা থেকে যে পাথর নিয়ে আসেন, এতে তো দু-এক বছরে পাহাড় হওয়ার কথা, কিন্তু তা তো হয় না? হুযূর (সা) জবাব দিলেন ঃ এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন যেন যে সব হাজীর হজ্জ কবূল হয়, তাদের নিক্ষিপ্ত প্রস্তর টুকরাগুলো উঠিয়ে নিয়ে যায়, আর যে সমস্ত হতভাগার হজ্জ কবূল হয় না, তাদের কংকরগুলো এখানেই থেকে যায়। এ জন্যই এখানে কংকরের সংখ্যা কমই দেখা যায়। তা না হলে এখানে পাথরের পাহাড় হয়ে যেতো। (সুনানে বায়হাকীতে এ বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে)।

এটি এমন একটি হাদীস যদ্দারা প্রতিবছর রাসূল (সা)-এর সত্যতা প্রতীয়মান হয় এবং এমন একটি বাস্তব সত্য যে, প্রতি বছর হজ্জের মওসুমে হাজার হাজার হাজী একত্রিত হয় এবং প্রত্যেক হাজী প্রতিদিন তিনটি ফলক লক্ষ্য করে সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করে। কোন কোন অতি উৎসাহী লোক বড় বড় পাথর পর্যন্ত নিক্ষেপ করে থাকে এবং একথাও সত্য যে, এসব পাথরকণা পরিষ্কার করার জন্য না সরকার কোন ব্যবস্থা করে, না কোন বেসরকারী দল নিযুক্ত থাকে। প্রাচীনকাল থেকেই এ প্রথা চলে আসছে যে, সেখান থেকে কেউ কংকর পরিষ্কার করে না। তাই পরের বছর দ্বিগুণ, তৃতীয় বছর ত্রিগুণ জমা হবে। এতে এ এলাকা প্রতীক চিহ্নিটিসহ পাথরে ঢাকা পড়বে, এমনকি দিনে দিনে এখানে একটা কৃত্রিম পাহাড় সৃষ্টি হয়ে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু বাস্তবে তো তা হয় না! এ আশ্চর্যজনক বাস্তব বিষয়টি যুগে যুগে রাসূল (সা)-কে বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট।

অনুরূপভাবে কোরআনের রচনাশৈলী, যার নমুনা আর কোনকালেই কোন জাতি পেশ করতে পারেনি, সেটাও একটি গতিশীল দীর্ঘস্থায়ী মু'জিযা। হুযূরের যুগে যেমন এর নযীর পেশ করা যায়নি, অনুরূপভাবে আজও তা কেউ পেশ করতে পারেনি ; ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না।

অনন্য কোরআন ঃ উপরোক্ত সাধারণ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়টিও পরিষ্কার হওয়ার প্রয়োজন যে, কিসের ভিত্তিতে কোরআনকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বাপেক্ষা বড় মু'জিযা বলা হয় ? আর কি কারণে কোরআন শরীফ সর্বযুগে অনন্য ও অপরাজেয় এবং সারা বিশ্ববাসী কেন এর নযীর পেশ করতে অপারক হলো ?

দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের এ দাবি যে, চৌদ্দশ' বছরের এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোরআনের এ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও কেউ কোরআনের বা এর একটি সূরার অনুরূপ কোন রচনাও পেশ করতে পারেনি, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবির যথার্থতা কতটুকু—এ দু'টি বিষয়ই দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ।

কোরআনের মু'জিযা হওয়ার অন্যান্য কারণ ঃ প্রথম কথা হচ্ছে যে, কোরআনকে মু'জিযা বলে অভিহিত করা হলো কেন, আর কি কি কারণে সারা বিশ্ব এর নযীর পেশ করতে অপারক হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই আলেমগণ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর প্রত্যেক মুফাসসিরই স্ব-স্ব বর্ণনাভঙ্গিতে এর বিবরণ দিয়েছেন। আমি অতি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করছি।

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, এ আশ্চর্য এবং সর্ববিধ জ্ঞানের আধার, মহান গ্রন্থটি কোন্ পরিবেশে এবং কার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আরো লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, সে যুগের সমাজ পরিবেশে কি এমন কিছু জ্ঞানের উপকরণ বিদ্যমান ছিল, যার দ্বারা এমন পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ রচিত হতে পারে, যাতে সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় উপকরণ সন্নিবেশিত করা স্বাভাবিক হতে পারে? সমগ্র মানব সমাজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সকল দিক সম্বলিত নির্ভুল পথনির্দেশ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার মত কোন সূত্রের সন্ধান কি সে যুগের জ্ঞান-ভাণ্ডারে বিদ্যমান ছিল, যদ্দ্বারা মানুষের দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিকেরই সুষ্ঠু বিকাশের বিধানাবলী থেকে শুরু করে পারিবারিক নিয়ম-শৃঙ্খলা, সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তথা দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম ও সর্বযুগে সমভাবে প্রযোজ্য আইন-কানুন বিদ্যমান থাকতে পারে ? যে ভূখণ্ডে এবং যে মহান ব্যক্তির প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে এর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা জানতে গেলে সাক্ষাৎ ঘটবে এমন একটা উষর শুষ্ক মরুময় এলাকার সাথে, যা ছিল 'বাত্হা' বা মক্কা নামে পরিচিত। এই এলাকার ভূমি কৃষিকাজের উপযোগী ছিল না। এখানে কোন কারিগরি শিল্প ছিল না। আবহাওয়াও এমন স্বাস্থ্যকর ছিল না, যা কোন বিদেশী পর্যটককে আকৃষ্ট করতে পারে। রাস্তাঘাটও এমন ছিল না, যেখানে সহজে যাতায়াত করা যায়। সেটি ছিল অবশিষ্ট দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন, এমন একটি মরুময় উপদ্বীপ, যেখানে শুষ্ক পাহাড়-পর্বত এবং ধু-ধু বালুকাময় প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ত না। কোন জনবসতি বা বৃক্ষলতার অস্তিত্বও বড় একটা দেখা যেতো না।

এ বিরাট ভূ-ভাগটির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য শহরেরও অস্তিত্ব ছিল না। মাঝে-মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম এবং তার মধ্যে উট-ছাগল প্রতিপালন করে জীবনধারণকারী কিছু মানুষ বসবাস করত। ছোট ছোট গ্রামগুলো তো দূরের কথা, নামেমাত্র যে কয়টি শহর ছিল, সেগুলোতেও লেখাপড়ার কোন চর্চাই ছিল না। না ছিল কোন স্কুল-কলেজ, না ছিল কোন বিশ্ববিদ্যালয়। শুধুমাত্র ঐতিহ্যগতভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এমন একটা সুসমৃদ্ধ ভাষাসম্পদ দান করেছিলেন, যে ভাষা গদ্য ও পদ্য বাক-রীতিতে ছিল অনন্য। আকাশের মেঘ-গর্জনের মতো সে ভাষার মাধুরী অপূর্ব সাহিত্যরসে সিক্ত হয়ে তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসত। অপূর্ব রসময় কাব্যসত্তার বৃষ্টিধারার মত আবৃত হতো পথে-প্রান্তরে। এ সম্পদ ছিল এমনি এক আশ্চর্য বিস্ময়, আজ পর্যন্তও যার রসাস্বাদন করতে গিয়ে যে কোন সাহিত্য প্রতিভা হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু এটি ছিল তাদের স্বভাবজাত এক সাধারণ উত্তরাধিকার। কোন মক্তব-মাদরাসার মাধ্যমে এ ভাষাজ্ঞান অর্জন করার রীতি ছিল না। অধিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের কোন আগ্রহও পরিলক্ষিত হতো না। যারা শহরে বাস করত, তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। পণ্যসামগ্রী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আমদানী-রপ্তানীই ছিল তাদের একমাত্র পেশা।

সে দেশেই সর্বপ্রাচীন শহর মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সে মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব, যাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র পবিত্রতম কিতাব কোরআন নাযিল করা হয়। প্রসঙ্গত সেই মহামানবের অবস্থা সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা যাক।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তিনি পিতৃহারা হন, জন্মগ্রহণ করেন অসহায় এতীম হয়ে। মাত্র সাত বছর বয়সেই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। মাতার স্নেহ-মমতার কোলে লালিত-পালিত হওয়ার সুযোগ তিনি পাননি। পিতৃ-পিতামহগণ ছিলেন এমন দরাজ দিল যার ফলে পারিবারিক সূত্র থেকে উত্তরাধিকাররূপে সামান্য সম্পদও তাঁর ভাগ্যে জোটেনি, যার দ্বারা এ অসহায় এতীমের যোগ্য লালন-পালন হতে পারত। পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় নিতান্ত কঠোর দারিদ্র্যের মাঝে লালিত-পালিত হন। যদি তখনকার মক্কায় লেখাপড়ার চর্চা থাকতও তবুও এ কঠোর দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে লেখাপড়া করার কোন সুযোগ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর হতো না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তদানীন্তন আরবে লেখাপড়ার কোন চর্চাই ছিল না, যে জন্য আরব জাতিকে 'উম্মী' জাতি বলা হতো। কোরআন পাকেও এ জাতিকে উম্মী জাতি নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সে মহান ব্যক্তি বাল্যকাল অবধি যে কোন ধরনের লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন রয়ে যান। সে দেশে তখন এমন কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরও অস্তিত্ব ছিল না, যাঁর সাহচর্যে থেকে এমন কোন জ্ঞানসূত্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হতো, যে জ্ঞান কোরআন পাকে পরিবেশন করা হয়েছে। যেহেতু একটা অনন্যসাধারণ মু'জিযা প্রদর্শনই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য, তাই মামুলী অক্ষরজ্ঞান যা দুনিয়ার যে কোন এলাকার লোকই কোন-না-কোন উপায়ে আয়ত্ত করতে পারে তাও আয়ত্ত করার কোন সুযোগ তাঁর জীবনে হয়ে ওঠেনি। অদৃশ্য শক্তির বিশেষ ব্যবস্থাতেই তিনি এমন নিরক্ষর রয়ে গেলেন যে, নিজের নামটুকু পর্যন্ত দস্তখত করতেও তিনি শেখেন নি।

তদানীন্তন আরবের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় ছিল কাব্যচর্চা। স্থানে স্থানে কবিদের জলসা-মজলিস বসত। এসব মজলিসে অংশগ্রহণকারী চারণ ও স্বভাব-কবিগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা হতো। প্রত্যেকে অন্যের তুলনায় উত্তম কাব্য রচনা করে প্রাধান্য অর্জন করার চেষ্টা করত। কিন্তু তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন রুচিবান করেছিলেন যে, কোনদিন তিনি এ ধরনের কবি জলসায় শরীক হননি। জীবনে কখনও এক ছত্র কবিতা রচনা করারও চেষ্টা করেন নি।

উম্মী হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রতা-নম্রতা, চারিত্রিক মাধুর্য ও অত্যন্ত প্রখর ধীশক্তি এবং সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর অসাধারণ গুণ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো, ফলে আরবের ক্ষমতাদর্পী বড়লোকগুলোও তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত ; সমগ্র মক্কা নগরীতে তাঁকে 'আল-আমীন' বলে অভিহিত করা হতো।

এই নিরক্ষর ব্যক্তিটি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মক্কা নগরীতে অবস্থান করেছেন। ভিন্ন কোন দেশে ভ্রমণেও যাননি। যদি এমন ভ্রমণও করতেন তবুও ধরে নেওয়া যেত যে, তিনি সেসব সফরে অভিজ্ঞতা ও বিদ্যার্জন করেছেন। মাত্র সিরিয়ায় দু'টি বাণিজ্যিক সফর করেছেন, যাতে তাঁর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত মক্কায় এমনভাবে জীবনযাপন করেছেন যে, কোন পুস্তক বা লেখনী স্পর্শ করেছেন বলেও জানা যায় না, কোন মক্তবেও যাননি, কোন কবিতা বা ছড়াও রচনা করেন নি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মুখ থেকেই সেই বাণী নিঃসৃত হতে লাগল, যাকে কোরআন বলা হয়। যা শাব্দিক ও অর্থের গুণগত দিক দিয়ে মানুষকে স্তম্ভিত করত। সুস্থ বিবেকবান লোকদের জন্য কোরআনের এ গুণগত মানই মু'জিযা হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাতেই তো শেষ নয়! বরং এ কোরআন সারা বিশ্ববাসীকে বারংবার চ্যালেঞ্জ সহকারে আহবান করেছে যে, যদি একে আল্লাহ্র কালাম বলে বিশ্বাস করতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে এর নযীর পেশ করে দেখাও।

একদিকে কোরআনের আহ্বান অপরদিকে সমগ্র বিশ্বের বিরোধী শক্তি যা ইসলাম ও ইসলামের নবীকে ধ্বংস করার জন্য স্বীয় জানমাল, শক্তি-সামর্থ্য ও মান-ইজ্জত তথা সবকিছু নিয়োজিত করে দিনরাত চেষ্টা করছিল। কিন্তু এ সামান্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে কেউ সাহস করেনি। ধরে নেওয়া যাক, এ গ্রন্থ যদি অদ্বিতীয় ও অনন্যসাধারণ নাও হতো, তবু একজন উম্মী লোকের মুখে এর প্রকাশই কোরআনকে অপরাজেয় বলে বিবেচনা করতে যে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকই বাধ্য হতো। কেননা, একজন উম্মী লোকের পক্ষে এমন একটা গ্রন্থ রচনা করতে পারা কোন সাধারণ ঘটনা বলে চিন্তা করা যায় না।

দ্বিতীয় কারণ ঃ পবিত্র কোরআন ও কোরআনের নির্দেশাবলী সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু এর প্রথম সম্বোধন ছিল প্রত্যক্ষভাবে আরব জনগণের প্রতি। যাদের অন্য কোন জ্ঞান না থাকলেও ভাষাশৈলীর উপর ছিল অসাধারণ দক্ষতা। এদিক দিয়ে আরবরা সারা বিশ্বে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। কোরআন তাদেরকে লক্ষ্য করেই চ্যালেঞ্জ করেছে যে, "কোরআন যে আল্লাহ্র কালাম তাতে যদি তোমরা সন্দিহান হয়ে থাক, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সাধারণ সূরা রচনা করে দেখাও। যদি আল-কোরআনের এ

চ্যালেঞ্জ শুধু এর অন্তর্গত গুণ, নীতি, শিক্ষাগত তথ্য এবং নিগূঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হতো, তবে হয়তো এ উম্মী জাতির পক্ষে কোন অজুহাত পেশ করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারত, কিন্তু ব্যাপার তা নয়, বরং রচনাশৈলীর আঙ্গিক সম্পর্কেও এতে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য অন্যান্য জাতির চাইতে আরববাসীরাই ছিল বেশি উপযুক্ত। যদি এ কালাম মানব ক্ষমতার উর্ধ্বে কোন অলৌকিক শক্তির রচনা না হতো, তবে অসাধারণ ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন আরবদের পক্ষে এর মোকাবিলা কোনমতেই অসম্ভবই হতো না, বরং এর চাইতেও উন্নতমানের কালাম তৈরি করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল। দু'-একজনের পক্ষে তা সম্ভব না হলে, কোরআন তাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমনটি রচনা করারও সুযোগ দিয়েছিল। এমন সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও সমগ্র আরববাসী একেবারে নিশ্চুপ রয়ে গেল; কয়েকটি বাক্যও তৈরি করতে পারল না!

আরবের নেতৃস্থানীয় লোকগুলো কোরআন ও ইসলামকে সম্পূর্ণ উৎখাত এবং রাসূল (সা)-কে পরাজিত করার জন্য যেভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, তা শিক্ষিত লোকমাত্রই অবগত। প্রাথমিক অবস্থায় হযরত রাসূলে করীম (সা) এবং তাঁর স্বল্প-সংখ্যক অনুসারীকে নানা উৎপীড়নের মাধ্যমে ইসলাম থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়ে তারা তোষামোদের পথ ধরল। আরবের বড় সরদার ওত্‌বা ইবনে রাবীয়া সকলের প্রতিনিধিরূপে হুযূর (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, "আপনি ইসলাম প্রচার থেকে বিরত থাকুন। আপনাকে সমগ্র আরবের ধন-সম্পদ, রাজত্ব এবং সুন্দরী মেয়ে দান করা হবে।" তিনি এর উত্তরে কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। এ প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। হিজরতের পূর্বে ও পরে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। কিন্তু কেউই কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অগ্রসর হলো না; তারা কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা এমনকি কয়েকটি ছত্রও তৈরি করতে পারল না। ভাষাশৈলী ও পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে কোরআনের মোকাবিলা করার ব্যাপারে আরবদের এহেন নীরবতাই প্রমাণ করে যে, কোরআন মানবরচিত গ্রন্থ নয়; বরং তা আল্লাহরই রচিত কালাম। মানুষ তো দূরের কথা, সমগ্র সৃষ্টিজগত মিলেও এ কালামের মোকাবিলা করতে পারে না।

আরববাসীরা যে এ ব্যাপারে শুধু নির্বাকই রয়েছে তাই নয়, তাদের একান্ত আলোচনায় এরূপ মন্তব্য করতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি যে, এ কিতাব কোন মানুষের রচনা হতে পারে না। আরবদের মধ্যে যাদের কিছুটা সুস্থ-বিবেক ছিল তারা শুধু মুখেই একথা প্রকাশ করেনি, এরূপ স্বীকৃতির সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকেই ইসলাম গ্রহণও করেছে। আবার কেউ কেউ পৈতৃক ধর্মের প্রতি অন্ধ আবেগের কারণে অথবা বনী-আব্‌দে মনাফের প্রতি বিদ্বেষবশত কোরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম বলে স্বীকার করেও ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে।

কুরাইশদের ইতিহাসই সে সমস্ত ঘটনার সাক্ষী। তারই মধ্য থেকে এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে অতি সহজে বোঝা যাবে যে, সমগ্র আরববাসী কোরআনকে অদ্বিতীয় ও নযীরবিহীন কালাম বলে স্বীকার করেছে এবং এর নযীর পেশ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়ার ঝুঁকি নিতে সচেতনভাবে বিরত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং কোরআন নাযিলের কথা মক্কার গণ্ডি ছাড়িয়ে হেজাযের অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার পর বিরুদ্ধবাদীদের অন্তরে এরূপ সংশয়ের সৃষ্টি হলো যে, আসন্ন হজ্জের মওসুমে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজীগণ মক্কায় আগমন করবে। তারা রাসূল (সা)-এর কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারবে না। এমতাবস্থায় এরূপ সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করার পন্থা নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরায়েশরা একটা বিশেষ পরামর্শ সভার আয়োজন করল। এ বৈঠকে আরবের বিশিষ্ট সরদারগণও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ওলীদ ইবনে মুগীরা বয়সে ও বিচক্ষণতায় ছিলেন সবার মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। সবাই তাঁর নিকট এ সমস্যার কথা উত্থাপন করল। তারা বলল, এখন চতুর্দিক থেকে মানুষ আসবে এবং মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে। তাদের সেসব প্রশ্নের জবাবে আমরা কি বলব ? আপনি আমাদেরকে এমন একটি উত্তর বলে দিন, যেন আমরা সবাই একই কথা বলতে পারি। ওলীদ বললেন, তোমরাই বল, কি বলা যায়। তারা উত্তর দিল যে, আমরা তাঁকে পাগল বলে পরিচয় দিয়ে বলব, তাঁর কথাবার্তা পাগলামিতে পরিপূর্ণ। ওলীদ তাদেরকে এরূপ বলতে বারণ করে বলে দিলেন, ওরা মানুষ মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে গিয়ে তাঁর পরিচয় পেয়ে তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবে।

অপর একদল প্রস্তাব করলো, আমরা তাঁকে কবি বলে পরিচয় দেব। তিনি তাও বলতে নিষেধ করলেন। কেননা, আরবের প্রায় সবাই ছিল কবিতায় পারদর্শী। তাই তারা মুহাম্মদের কথা শুনে ভালভাবেই বুঝতে পারবে যে, বিষয়টি সত্য নয়, তিনি কবি নন। ফলে তারা সবাই তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবে। কেউ কেউ মন্তব্য করলো, তবে আমরা তাকে যাদুকর বলে পরিচয় দিয়ে বলবো যে, সে শয়তান ও জ্বিনদের কাছ থেকে শুনে গায়েবের সংবাদ বলে বেড়ায়।

ওলীদ বললেন, একথাও সাধারণ লোককে বিশ্বাস করানো যাবে না; বরং শেষ পর্যন্ত লোকেরা তোমাদেরকেই মিথ্যাবাদী মনে করবে। কেননা, তারা যখন তাঁর কথা-বার্তা ও কালাম শুনবে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে, এসব কথা কোন যাদুকরের নয়। শেষ পর্যন্ত কোরআন সম্পর্কে ওলীদ ইবনে মুগীরা নিজের মতামত বর্ণনা করেছিলেন ঃ আল্লাহর কসম! কবিতার ক্ষেত্রে আমার চাইতে বেশি অভিজ্ঞতা তোমাদের কারো নাই। সত্যি বলতে কি, এ কালামে অবর্ণনীয় একটা আকর্ষণ রয়েছে। এতে এমন এক সৌন্দর্য বিদ্যমান, যা আমি কোন কাব্য বা অসাধারণ কোন পণ্ডিতের বাক্যে কখনও পাইনি।

তখন তারা জিজ্ঞেস করলো, তবে আপনি বলুন, আমরা কি বলবো ? ওলীদ বললেন, আমি চিন্তা করে বলব। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তিনি উত্তর দিলেন, যদি তোমাদের কিছু বলতেই হয়, তবে তাঁকে যাদুকর বলতে পার। লোকদেরকে বলো যে, এ লোক যাদুবলে পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন। সমবেত লোকেরা তখনকার মত এ কথায় একমত ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। তখন থেকেই তারা আগন্তুকদের নিকট একথা বলতে আরম্ভ করলো, কিন্তু আল্লাহর জ্বালানো প্রদীপ কারো ফুঁৎকারে নির্বাপিত হবার নয়। আরবের বিভিন্ন

অঞ্চল থেকে সাধারণ লোকদের অনেকেই কোরআনের অমিয় বাণী শুনে মুসলমান হয়ে গেল। ফলে মক্কার বাইরেও ইসলামের বিস্তার সূচিত হলো। (খাসায়েসে-কুব্‌রা)

এমনিভাবে বিশিষ্ট কুরাইশ সরদার নযর ইবনে হারেস তার স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,- আজ তোমরা এমন এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। মুহাম্মদ (সা) তোমাদেরই মধ্যে যৌবন অতিবাহিত করেছেন, তোমরা তাঁর চরিত্র মাধুর্যে বিমুগ্ধ ছিলে, তাঁকে তোমরা সবার চাইতে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করতে, আমানতদার বলে অভিহিত করতে। কিন্তু যখন তাঁর মাথার চুল সাদা হতে আরম্ভ করেছে, আর তিনি আল্লাহ্‌র কালাম তোমাদেরকে শোনাতে শুরু করেছেন, তখন তোমরা তাঁকে যাদুকর বলে অভিহিত করছ। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি যাদুকর নন। আমি বহু যাদুকর দেখেছি, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (সা) কোন অবস্থাতেই তাদের মত নন। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। আরও জেনে রেখ! আমি অনেক যাদুকরের কথাবার্তা শনেছি, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা যাদুকরের কথাবার্তার সাথে কোন বিচারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তোমরা তাঁকে কবি বল, অথচ আমি অনেক কবি দেখেছি, এ বিদ্যা আয়ত্ত করেছি, অনেক বড় বড় কবির কবিতা শুনেছি, অনেক কবিতা আমার মুখস্থও আছে, কিন্তু তাঁর কালামের সাথে কবিদের কবিতার কোন সাদৃশ্য আমি খুঁজে পাইনি। কখনও কখনও তোমরা তাঁকে পাগল বল, তিনি পাগলও নন। আমি অনেক পাগল দেখেছি, তাদের পাগলামিপূর্ণ কথাবার্তাও শুনেছি, কিন্তু তাঁর মধ্যে তাদের মত কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না। হে আমার জাতি! তোমরা ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এ ব্যাপারে চিন্তা কর, সহজে এড়িয়ে যাওয়ার মত ব্যক্তিত্ব তিনি নন।

হযরত আবূ যর (রা) বলেছেন, আমার ভাই উনাইস একবার মক্কায় গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন যে, মক্কায় এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র রসূল বলে দাবি করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেখানকার মানুষ এ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে? তিনি উত্তর দিলেন, তাঁকে কেউ কবি, কেউ পাগল, কেউবা যাদুকর বলে। আমার ভাই উনাইস একজন বিশিষ্ট কবি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি যতটুকু লক্ষ্য করেছি, মানুষের এসব কথা ভুল ও মিথ্যা। তাঁর কালাম কবিতাও নয়, যাদুও নয়, আমার ধারণায় সে কালাম সত্য।

আবূ যর (রা) বলেন যে, ভাইয়ের কথা শুনে আমি মক্কায় চলে এলাম। মসজিদে হারামে অবস্থান করলাম এবং ত্রিশ দিন শুধু অপেক্ষা করেই অতিবাহিত করলাম। এ সময় যমযম কূপের পানি ছাড়া আমি অন্য কিছুই খাইনি। কিন্তু এতে আমার ক্ষুধার কষ্ট অনুভব হয়নি! দুর্বলতাও উপলব্ধি করিনি! শেষ পর্যন্ত কা'বা প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এসে লোকদের বললাম—আমি রোম ও পারস্যের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী লোকদের অনেক কথা শুনেছি, অনেক যাদুকর দেখেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর বাণীর মত কোন বাণী আজও পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। কাজেই সবাই আমার কথা শোন এবং তাঁর অনুসরণ কর। আবূ যরের এ প্রচারে উদ্বুদ্ধ হয়েই মক্কা বিজয়ের বছর তাঁর কওমের প্রায় এক হাজার লোক মক্কায় গমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম ও হযরতের সবচাইতে বড় বড় শত্রু আবূ জাহ্ল এবং আখনাস ইবনে সোরাইকও লোকচক্ষুর অগোচরে কোরআন শুনত, কোরআনের অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গি এবং অনন্য রচনারীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতো। কিন্তু গোত্রের লোকেরা যখন তাদেরকে বলত যে, তোমরা যখন এ কালামের গুণ সম্পর্কে এতই অবগত এবং একে অদ্বিতীয় কালামরূপে বিশ্বাস কর, তখন কেন তা গ্রহণ করছ না ? প্রত্যুত্তরে আবূ জাহ্ল বলতো তোমরা জান যে, বনি আবদে-মনাফ এবং আমাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই বিরামহীন শত্রুতা চলে আসছে, তারা যখন কোন কাজে অগ্রসর হতে চায়, তখন আমরা তার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বাধা দিই। উভয় গোত্রই সমপর্যায়ের। এমতাবস্থায় তারা যখন বলছে যে, আমাদের মধ্যে এমন এক নবীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁর কাছে আল্লাহ্র বাণী আসে, তখন আমরা কিভাবে তাদের মোকাবিলা করবো, তা-ই আমার চিন্তা। আমি কখনও তাদের একথা মেনে নিতে পারি না।

মোটকথা, কোরআনের এ দাবি ও চ্যালেঞ্জ সারা আরববাসী যে পরাজয় বরণ করেই ক্ষান্ত হয়েছে তাই নয়; বরং একে অদ্বিতীয় ও অনন্য বলে প্রকাশ্যভাবে স্বীকারও করেছে। যদি কোরআন মানব রচিত কালাম হতো, তবে সমগ্র আরববাসী তথা সমগ্র বিশ্ববাসী অনুরূপ কোন না কোন একটি ছোট সূরা রচনা করতে অপারক হতো না এবং এ কিতাবের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকারও করতো না। কোরআনে ও কোরআনের বাহক পয়গম্বরের বিরুদ্ধে জানমাল, ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত সবকিছু ব্যয় করার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল কিন্তু কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দু'টি শব্দও রচনা করতে কেউ সাহসী হয়নি।

এর কারণ এই যে, সমস্ত মানুষ তাদের মূর্খতাজনিত কার্যকলাপ ও আমল সত্ত্বেও কিছুটা বিবেকসম্পন্ন ছিল, মিথ্যার প্রতি তাদের একটা সহজাত ঘৃণাবোধ ছিল। কোরআন শুনে তারা যখন বুঝতে পারলো যে, এমন কালাম রচনা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, তখন তারা কেবল একগুঁয়েমির মাধ্যমে কোন বাক্য রচনা করে তা জনসমক্ষে তুলে ধরা নিজেদের জন্য লজ্জার ব্যাপার বলে মনে করতো। কেননা, তারা জানতো যে, আমরা যদিও কোন বাক্য পেশ করি, সমগ্র আরবের শুদ্ধভাষী লোকেরা তুলনামূলক পরীক্ষায় আমাদেরকে অকৃতকার্যই ঘোষণা করবে এবং এজন্য অনর্থক লজ্জিত হতে হবে। এজন্য সমগ্র জাতি চুপ করেছিল। আর যারা কিছুটা ন্যায়পথে চিন্তা করেছে, তারা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নিতেও কুণ্ঠিত হয়নি যে, এটা আল্লাহ্র কালাম।

এসব ঘটনার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, আরবের একজন সরদার আস'আদ ইবনে যেরারা হযরতের চাচা আব্বাস (রা)-এর কাছে স্বীকার করেছেন যে, তোমরা অনর্থক মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের ক্ষতি করছ এবং পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ করছ। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং তিনি যে কালাম পেশ করেছেন তা আল্লাহ্র কালাম, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

বনী সোলায়েম গোত্রের কায়স বিন নাসীবা নামক এক লোক রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কোরআন শুনে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। হুযূর (সা) তার জবাব দেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে স্বীয় গোত্রে ফিরে গিয়ে বললেন যে, আমি রোম ও পারস্যের অনেক

বিজ্ঞ পণ্ডিতের কালাম শুনেছি, অনেক যাদুকরের কথাবার্তাও শুনেছি, তাতে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর কালামের অনুরূপ কালাম আজ পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। তোমরা আমার কথা শোন এবং তাঁর অনুসরণ কর। এসব স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি এমন লোকদের নয়, যারা হুযূর (সা)-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। বরং যারা সর্বদা সবদিক দিয়ে রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণে ব্যস্ত ছিল তাদেরই এ স্বীকারোক্তি। কিন্তু তারা নিজেদের একগুঁয়েমির দরুন মানুষের নিকট তা প্রকাশ করতো না।

আল্লামা সুয়ূতী (র) বায়হাকীর উদ্ধৃতি দিয়ে 'খাসায়েসে-কুবরা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, একবার আবূ জাহ্ল, আবূ সুফিয়ান ও আখনাস ইবনে সোরাইক রাতের অন্ধকারে গোপনে আল্লাহ্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যবানে কোরআন শোনার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে আসে এবং আল্লাহ্র রাসূল (সা) যেখানে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, একে একে সবাই সে বাড়ির আশেপাশে সমবেত হয়ে আত্মগোপন করে তেলাওয়াত শুনতে থাকে। এতে তারা এমন অভিভূত হয়ে পড়ে যে, এ অবস্থাতেই রাত শেষ হয়ে যায়। ভোরে বাড়ি ফেরার পথে দৈবাৎ রাস্তায় পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় এবং সবাই সবার ব্যাপারে অবগত হয়ে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে যে, তুমি খুবই অন্যায় করেছ। ভবিষ্যতে আর যেন কেউ এমন কাজ করে না। কেননা, আরবের সাধারণ লোক এ ব্যাপারে জানতে পারলে সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। পরস্পর এমন কথা বলাবলি করে সবাই নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গেল। পরের রাতে পুনরায় তাদের কোরআন শোনার আগ্রহ জাগে এবং গোপনে প্রত্যেকেই এসে একই স্থানে সমবেত হয়। রাতশেষে প্রত্যাবর্তনকালে সাক্ষাৎ হলে আবার একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে। তারপর থেকে তা বন্ধ করতে সবাই একমত প্রকাশ করে। কিন্তু তৃতীয় রাতেও তারা কোরআন শোনার আগ্রহে পূর্বের মতই চলে যায়। রাতশেষে পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ হয়। এবার তাঁরা সবাই বলে যে, চল এবার আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, আর কখনো এ কাজ করবো না। এভাবেই তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ফিরে আসে। পরদিন সকালে আখনাস ইবনে সোরাইক লাঠি হাতে নিয়ে প্রথমে আবূ সুফিয়ানের কাছে গিয়ে বলে যে, বল, মুহাম্মদ (সা)-এর কালাম সম্পর্কে তোমরা কি অভিমত ? আবূ সুফিয়ান কিছুক্ষণ আমতা-আমতা করে শেষ পর্যন্ত কোরআনের সত্যতা স্বীকার করে নেয়। অতঃপর আখনাস আবূ জাহ্লের বাড়ি গিয়ে তাকেও অনুরূপ প্রশ্ন করে। আবূ জাহল উত্তর দিল, পরিষ্কার কথা হচ্ছে এই যে, পূর্ব থেকেই আবদে-মনাফ গোত্রের সাথে আমাদের গোত্রের শত্রুতা চলে আসছে। তারা কোন ব্যাপারে অগ্রসর হলে আমরা তাতে বাধা দিই। তারা বদান্যতার ক্ষেত্রে জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিল। আমরা তাদের চাইতে অধিক দান-খয়রাত করে এর মোকাবিলা করেছি। তারা সমগ্র জাতির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছিল, এ ক্ষেত্রেও আমরা তাদের পেছনে থাকিনি। সমগ্র আরববাসী জানে, আমাদের এ দু'টি গোত্র সমমর্যাদাসম্পন্ন। এমতাবস্থায় তাদের গোত্র থেকে এ ঘোষণা করা হলো যে, আমাদের বংশে একজন নবী জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছে আল্লাহ্র কালাম আসে। সুতরাং আমাদের পক্ষে এখন চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এর মোকাবিলা আমরা কিভাবে করবো। এজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কোনদিনও আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবো না।

এই হচ্ছে কোরআনের প্রকাশ্য মু'জিযা, যা শত্রুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। (খাসায়েসে-কুব্‌রা)

তৃতীয় কারণ ঃ তৃতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআন কিছু গায়েবী সংবাদ এবং ভবিষ্যতে ঘটবে এমন অনেক ঘটনার সংবাদ দিয়েছে, যা হুবহু সংঘটিত হয়েছে। যথা—কোরআন ঘোষণা করেছে যে, রোম ও পারস্যের যুদ্ধে প্রথমত পারস্যবাসী জয়লাভ করবে এবং দশ বছর যেতে না যেতেই পুনরায় রোম পারস্যকে পরাজিত করবে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মক্কার সরদারগণ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে এ ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা সম্পর্কে বাজি ধরল। শেষ পর্যন্ত কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রোম জয়লাভ করলো এবং বাজির শর্তানুযায়ী যে মাল দেওয়ার কথা ছিল, তা তাদের দিতে হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবশ্য এ মাল গ্রহণও করেন নি। কেননা, এরূপ বাজি ধরা শরীয়ত অনুমোদন করে না। এমন আরো অনেক ঘটনা কোরআনে উল্লেখিত রয়েছে, যা গায়েবের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নিকট অতীতে হুবহু ঘটেছেও।

চতুর্থ কারণ ঃ চতুর্থ কারণ এই যে, কোরআন শরীফে পূর্ববর্তী উম্মত, সেকালের শরীয়ত ও তাদের ইতিহাসে এমন পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে যুগের ইহুদী-খৃস্টানদের আলেমগণ, যাদেরকে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের বিজ্ঞ লোক মনে করা হতো, তারাও এতটা অবগত ছিল না। রাসূল (সা)-এর কোন প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না। কোন শিক্ষিত লোকের সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেন নি। কোন কিতাব কোনদিন স্পর্শও করেন নি। এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার প্রথম থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর ঐতিহাসিক অবস্থা এবং তাদের সম্পর্কে অতি নিখুঁতভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা আল্লাহ্‌র কালাম ছাড়া কিছুতেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই যে তাঁকে এ সংবাদ দিয়েছেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পঞ্চম কারণ ঃ পঞ্চম কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের অন্তর্নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কিত যেসব সংবাদ দেওয়া হয়েছে পরে সংশ্লিষ্ট লোকদের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এসব কথাই সত্য। একাজও আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ, তা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এরশাদ হয়েছে ঃ

اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا .

অর্থাৎ-"যখন তোমাদের দু'দল মনে মনে ইচ্ছা করল যে, পশ্চাদপসরণ করবে" আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَقُوْلُوْنَ فِىْ اَنْفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ .

অর্থাৎ-তারা মনে মনে বলে যে, আমাদের অস্বীকৃতির দরুন আল্লাহ্ কেন আমাদেরকে শাস্তি দিবেন না। এসব এমন কথা যা সংশ্লিষ্ট লোকেরা কারো কাছে প্রকাশ করেনি, বরং কোরআন তা প্রকাশ করে দিয়েছে।

ষষ্ঠ কারণ ঃ ষষ্ঠ কারণ হচ্ছে যে, কোরআনে এমন সব আয়াত রয়েছে যাতে কোন সম্প্রদায় বা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তাদের দ্বারা অমুক কাজ হবে না; তারা তা করতে পারবে না। ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা বলেই মনে করে, তবে তারা নিশ্চয়ই তাঁর নিকট যেতে পছন্দ করবে; সুতরাং

এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে মৃত্যু কামনা করা অপছন্দনীয় হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে ঃ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا -তারা কখনও তা চাইবে না।

মৃত্যু কামনা করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য, যারা কোরআনকে মিথ্যা বলে অভিহিত করতো। কোরআনের এরশাদ মোতাবেক তাদের মৃত্যু কামনা করার ব্যাপারে ভয় পাওয়ার কোন কারণ ছিল না। ইহুদীদের পক্ষে মৃত্যু কামনার (মোবাহালা) এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মুসলমানদেরকে পরাজিত করার অত্যন্ত সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কোরআনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গেই তাতে সম্মত হওয়া তাদের পক্ষে উচিত ছিল। কিন্তু ইহুদী ও মুশরিকরা মুখে কোরআনকে যতই মিথ্যা বলুক না কেন, তাদের মন জানতো যে, কোরআন সত্য, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মৃত্যু কামনার চ্যালেঞ্জে সাড়া দিলে সত্য-সত্যই তা ঘটবে। এজন্যই তারা কোরআনের এ প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি এবং একটি বারের জন্যও মুখ দিয়ে মৃত্যুর কথা বলেনি।

সপ্তম কারণ ঃ কোরআন শরীফ শ্রবণ করলে মু'মিন, কাফের, সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সবার উপর দু'ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন, হযরত জুবাইর ইবনে মোতইম (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন হুযূর (সা)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পড়তে শোনেন। হুযূর (সা) যখন শেষ আয়াতে পৌঁছলেন, তখন হযরত জুবাইর (রা) বলেন যে, মনে হলো, যেন আমার অন্তর উড়ে যাচ্ছে। তাঁর কোরআন পাঠ শোনার এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। তিনি বলেন, সেদিনই কোরআন আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ.

অর্থাৎ–তারা কি নিজেরাই সৃষ্ট হয়েছে, না তারাই আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছে ? কোন কিছুতেই ওরা ইয়াকীন করছে না। তাদের নিকট কি তোমার পালনকর্তার ভাণ্ডারসমূহ গচ্ছিত রয়েছে, না তারাই রক্ষক ?

অষ্টম কারণ ঃ অষ্টম কারণ হচ্ছে, কোরআনকে বারংবার পাঠ করলেও মনে বিরক্তি আসে না। বরং যতই বেশি পাঠ করা হয়, ততই তাতে আগ্রহ বাড়তে থাকে। দুনিয়ার যত ভাল ও আকর্ষণীয় পুস্তক হোক না কেন, বড়জোর দু-চার বার পাঠ করার পর তা আর পড়তে মন চায় না, অন্যে পাঠ করলেও তা শুনতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু কোরআনের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, যত বেশি পাঠ করা হয়, ততই মনের আগ্রহ আরো বাড়তে থাকে। অন্যের পাঠ শুনতেও মনে আগ্রহ জন্মে। কোরআন আল্লাহ্র কালাম বলেই এরূপ হয়ে থাকে।

নবম কারণ ঃ নবম কারণ হচ্ছে, কোরআন ঘোষণা করেছে যে, কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হয়ে তা সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা এ ওয়াদা এভাবে পূরণ করেছেন যে, প্রত্যেক যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিলেন এবং রয়েছেন, যারা কোরআনকে এমনভাবে স্বীয় স্মৃতিপটে ধারণ করেছেন যে, এর প্রতিটি যের-যবর অবিকৃত রয়েছে। নাযিলের সময় থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর অতিবাহিত হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এ কিতাবে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়নি। প্রতি যুগেই স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কোরআনের হাফেজ

ছিলেন ও রয়েছেন। বড় বড় আলেমও যদি একটি যের-যবর বেশ-কম করেন, তবে ছোট বাচ্চারাও তাঁর ভুল ধরে ফেলে। পৃথিবীর কোন ধর্মীয় কিতাবের এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা সে ধর্মের লোকেরা এক-দশমাংশও পেশ করতে পারবে না। আর কোরআনের মত নির্ভুল দৃষ্টান্ত বা নযীর স্থাপন করা তো অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে এটা স্থির করাও মুশকিল যে, এ কিতাব কোন্ ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাতে কয়টি অধ্যায় ছিল।

গ্রন্থাকারে প্রতি যুগে কোরআনের যত প্রচার ও প্রকাশ হয়েছে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে তা হয়নি। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রতি যুগেই মুসলমানদের সংখ্যা কাফের-মুশরিকদের তুলনায় কম ছিল এবং প্রচার মাধ্যমও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের তুলনায় কম ছিল। এতদসত্ত্বেও কোরআনের প্রচার ও প্রকাশের তুলনায় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের প্রচার ও প্রকাশনা সম্ভব হয়নি। তারপরেও কোরআনের সংরক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা শুধু গ্রন্থ ও পুস্তকেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, যা জ্বলে গেলে বা অন্য কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে আর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা থাকে না। তাই স্বীয় বান্দাগণের স্মৃতিপটেও সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। খোদা-নাখাস্তা সমগ্র বিশ্বের কোরআনও যদি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তবু এ গ্রন্থ পূর্বের ন্যায়ই সংরক্ষিত থাকবে। কয়েকজন হাফেজ একত্রে বসে কয়েক ঘন্টায় তা লিখে দিতে পারবেন। এ অদ্ভুত সংরক্ষণও আল-কোরআনেরই বিশেষত্ব এবং এ যে আল্লাহ্রই কালাম তার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ। যেভাবে আল্লাহ্র সত্তা সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে, তাতে কোন সৃষ্টির হস্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা নেই, অনুরূপভাবে তাঁর কালাম সকল সৃষ্টির রদ-বদলের ঊর্ধ্বে এবং সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে। কোরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা বিগত চৌদ্দশ' বছরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ প্রকাশ্য মু'জিযার পর কোরআন আল্লাহ্র কালাম হওয়াতে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় থাকতে পারে না।

দশম কারণ ঃ কোরআনে এল্ম ও জ্ঞানের যে সাগর পুঞ্জীভূত করা হয়েছে, অন্য কোন কিতাবে আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। ভবিষ্যতেও তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত শব্দসম্ভারের মধ্যে এত জ্ঞান ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে যে, তাতে সমগ্র সৃষ্টির সর্বকালের প্রয়োজন এবং মানবজীবনের প্রত্যেক দিক সম্পূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। আর বিশ্ব পরিচালনার সুন্দরতম নিয়ম এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নির্ভুল বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া মাথার উপরে ও নিচে যত সম্পদ রয়েছে সে সবের প্রসঙ্গ ছাড়াও জীব-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান এমনকি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সকল দিকের পথনির্দেশ সম্বলিত এমন সমাহার বিশ্বের অন্য কোন আসমানী কিতাবে দেখা যায় না।

শুধু আপাতদৃষ্টিতে পথনির্দেশই নয়, এর নমুনা পাওয়া এবং সে সব নির্দেশ একটা জাতির বাস্তব জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়ে তাদের জীবনধারা এমনকি ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস এবং রুচিরও এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন দুনিয়ার অন্য কোন গ্রন্থের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে এমন নযীর আর একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা নিরক্ষর উম্মী জাতিকে জ্ঞানে, রুচিতে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে এত অল্পকালের মধ্যে এমন পরিবর্তন করে দেওয়ার নযীরও আর দ্বিতীয়টি নেই।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে কোরআনের সেই বিস্ময় সৃষ্টিকারী প্রভাব, যাতে কোরআনকে আল্লাহ্র কালাম বলে প্রতিটি মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বিদ্বেষের কালিমায় সম্পূর্ণ কলুষিত হয়ে যায়নি, এমন লোকই কোরআনের এ অনন্যসাধারণ মু'জিযা সম্পর্কে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করতে কার্পণ্য করেনি। যারা কোরআনকে জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণ করেনি এমন অনেক অমুসলিম লোকও কোরআনের এ নযীরবিহীন মু'জিযার কথা স্বীকার করেছেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত মনীষী ডঃ মারড্রেসকে ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে কোরআনের বাষট্টিটি সূরা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর স্বীকারোক্তিও এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "নিশ্চয়ই কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি সৃষ্টিকর্তার বর্ণনা-ভঙ্গিরই স্বাক্ষর। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোরআনে যেসব তথ্য বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্র বাণী ব্যতীত অন্য কোন বাণীতে তা থাকতে পারে না।"

এতে সন্দেহ পোষণকারীরাও যখন এর অনন্যসাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করে, তখন তারাও এ কিতাবের সত্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। বিশ্বের সর্বত্র শতাধিক কোটি মুসলমান ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কোরআনের বিশেষ প্রভাব দেখে খ্রিস্টান মিশনগুলোতে কর্মরত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, যেসব মুসলমান কোরআন বুঝে পড়ার সুযোগ লাভ করেছে, তাদের মধ্যে একটি লোকও ধর্মত্যাগী-মুরতাদ হয়নি।

যে যুগে মুসলমান কোরআনের সাথে অপরিচিত, এর শিক্ষা থেকে দূরে এবং এর তেলাওয়াত থেকে সম্পূর্ণভাবে গাফেল ছিল মুসলমানদের ওপর কোরআনের প্রভাবের কথা তারা সে যুগে স্বীকার করেছে। আফসোস, এ ভদ্রলোক যদি সে যুগটি দেখতেন, যাতে মুসলমানগণ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে কোরআনের নির্দেশের প্রতি আমল করেছেন এবং মুখে মুখে কোরআন তিলাওয়াত করেছেন।

অনুরূপভাবে অন্য একজন প্রসিদ্ধ লেখকও একই ধরনের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। মিঃ উইলিয়াম ম্যুর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'লাইফ অব মুহাম্মদ'-এ পরিষ্কারভাবে তা স্বীকার করেছেন। আর ডক্টর শিবলী শামীল এ সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধই রচনা করেছেন।

তাতে কোরআন আল্লাহ্র কালাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবন্ত মু'জিযা হওয়া সম্পর্কে দশটি কারণ পেশ করা হয়েছে। সবশেষে আলোকপাত করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন জন্মগত ইয়াতীম। সারা জীবনে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারেন নি। কোন বই-পুস্তক ও কাগজ-কলম তিনি হাতে নেন নি। এমনকি নিজের নামটুকু পর্যন্ত লিখতে পারতেন না। তাঁর স্বভাব এত শান্তিপ্রিয় ছিল যে, খেলাধুলা, রং-তামাশা, ঝগড়া-বিবাদে কোন দিনও যেতেন না। কবিতা বা কোন সাহিত্য সভায়ও তিনি যোগ দেন নি। কোন সভা-সমিতিতে কোন ভাষণও দেন নি। এমতাবস্থায় চল্লিশ বছর বয়সে যখন তিনি বয়সের শেষার্ধে উপনীত, যে সময় শিক্ষা লাভ করার বয়স শেষ হয়ে যায়, সে সময় তাঁর মুখ থেকে এমন সব কথা প্রকাশ পেতে থাকে যা অনন্য জ্ঞান-গরিমা এবং অসাধারণ ভাষা-শৈলীতে পরিপূর্ণ। যা কোন যুগপ্রবর্তক, কোন জ্ঞানী কিংবা অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভাসম্পন্ন লোকের পক্ষেও সম্ভব নয়। এসব কালাম দ্বারা তিনি আরবের বিশুদ্ধভাষী পণ্ডিতবর্গকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যে, এটা আল্লাহ্র কালাম নয়, তবে এর

একটি ছোট সূরার মত একটি সূরা রচনা করে দেখাও। কিন্তু তাঁর এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ব্যাপারে আরব সমাজ বাস্তবিকপক্ষেই অপারগ ছিল।

সমগ্র জাতির যারা তাঁকে আল্-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল এবং তাঁকে সম্মান করতো, এ কালামের প্রচারে অবতীর্ণ হবার পর সে সমস্ত লোকই তাঁর বিরোধী হয়ে যায়। এ কালামের প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্য ধন-দৌলত, রাজত্ব এবং জাগতিক জীবনের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করারও ওয়াদা দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি এর কোন একটিও গ্রহণ করেন নি। সমগ্র জাতি তাকে এবং তাঁর সাহাবীগণকে অত্যাচার-উৎপীড়ন করতে উদ্যত হয়, আর তিনি তা অম্লান বদনে সহ্য করে নেন, কিন্তু এ কালামের তবলীগ ছাড়েন নি। জাতি তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে, অবশেষে তাঁকে দেশ ত্যাগ করে মদীনায় চলে যেতে হয়েছে। কিন্তু তারা তাঁকে সেখানেও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। সমগ্র আরববাসী মুশরিক ও আহ্লে-কিতাব তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে মদীনার উপর আক্রমণ করেছে। তাঁর শত্রুরা সব কিছুই করেছে, কিন্তু কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কোরআনের অনুরূপ ছোট একটি সূরা রচনা করে দেখানোর চেষ্টা করেনি। বরং যে পবিত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি এ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনিও এর নযীর নিজের পক্ষ থেকে পেশ করতে পারেন নি। তাঁর সমস্ত হাদীসই কোরআন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এরশাদ হয়েছে –

قَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَا اَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِيْ .

অর্থাৎ–যারা পরকালে আমার সাক্ষাৎ লাভের ব্যাপারে আগ্রহী নয়, তারা বলে–এরূপ অন্য আর একটি কোরআন রচনা করুন অথবা এর পরিবর্তন করুন। আপনি বলুন, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

একদিকে কোরআনের এ প্রকাশ্য মু'জিযা, যা এর আল্লাহ্র কালাম হওয়াই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, অপরদিকে এর বিষয়বস্তু, তথ্যাদি ও রহস্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে আরো আশ্চর্য হতে হয়।

কোরআন অবতরণের প্রথম যুগ তো এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, প্রকাশ্যে এ সব বাক্য পেশ করাও সম্ভব হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা) গোপনে মানুষকে এর প্রতি আহবান জানাতে থাকেন। অতঃপর সীমাহীন গঞ্জনা ও বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেও কিছুটা প্রকাশ্য প্রচার আরম্ভ করেন। তখন কোরআনের নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি।

মদীনায় হিজরত করার পর মাত্র দশটি বছর তিনি সময় পান; যাকে মুসলমানদের জন্য স্বাধীন যুগ বলা চলে। এর ফলে কোরআনের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা এবং আইন-কানুন প্রয়োগ করার চেষ্টা ও গঠনমূলক কিছু কাজ করার সুযোগ উপস্থিত হয়।

কিন্তু এ দশ বছরের ইতিহাস লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, প্রথম ছয় বছর শত্রুদের বিরামহীন হামলা, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র এবং মদীনার ইহুদীদের চক্রান্ত প্রভৃতির মধ্যে যতটুকু সুযোগ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কোরআনের নির্দেশে এমন একটা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, যা আজও দুনিয়ায় কোন মুক্তিকামী মানব সমাজের জন্য সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য আদর্শ হয়ে আছে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ এ ছয় বছরে সংঘটিত হয়েছে। বদর, ওহুদ, আহযাব ইত্যাদি যুদ্ধ সবই এ ছয় বছরের মধ্যে সংঘটিত হয়। হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে দশ বছরের জন্য হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি লেখা হয়। আর মাত্র এক বছর আরবের কুরাইশগণ এ চুক্তির শর্তাদি পালন করে। এক বছর পরই তারা এ সন্ধিও ভঙ্গ করে ফেলে এবং পুনরায় যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ করে।

প্রকৃতপক্ষে কোরআনকে বাস্তবায়ন করার পরিপূর্ণ সুযোগ রাসূল (সা) মাত্র দু'-এক বছরই পেয়েছিলেন। এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আশপাশের বড় বড় রাজা-বাদশাহের নিকট পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে কোরআনের দাওয়াত দেন এবং কোরআনী জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। আর হুযূর (সা) তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত এ স্বাধীনতার সুযোগ পান মাত্র চার বছর। এর মধ্যে মক্কা বিজয়ের জিহাদ উপস্থিত হয় এবং মক্কা জয় হয়।

এখন চার বছরের স্বল্প সময়কে সামনে রেখে কোরআনের প্রয়োগ ও প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে, সে সময় সমগ্র আরব উপদ্বীপের সর্বত্র কোরআনী আইন-কানুনের শাসন পরিচালিত হয়েছিল। একদিকে রোম এবং অপরদিকে ইরানের সীমান্ত পর্যন্ত এ কোরআনী শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উম্মী নিরক্ষর ছিলেন। তাঁর জাতি ছিল এমনই এক জনগোষ্ঠী, যারা কোনদিন কোন কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কিংবা কোন রাজা-বাদশাহ্র শাসন মেনে চলেনি। তাছাড়া সমগ্র দুনিয়া ছিল বিরুদ্ধাচরণে কৃতসংকল্প। আরবের মুশরিক এবং ইহুদী-নাসারাগণ তাঁর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এসব কথা বাদ দিয়ে ধরা যাক যে, যদি কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ নাও হতো, যদি সমস্ত লোক বিনা বাক্যব্যয়ে কোরআন ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষাকে সর্বান্তকরণে মেনে নিতো, তবুও একটা নতুন দর্শন, নতুন জীবন বিধান, আইন-কানূন, নিয়ম-পদ্ধতি প্রথমে সংকলন করা, এর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকেফহাল করা এবং তৎপর সে নিয়ম-নীতির আলোকে একটি আদর্শনিষ্ঠ নতুন জাতির গোড়াপত্তন করা আর সে জাতিকে একটা পরিপূর্ণ আদর্শবাদী জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করার জন্য কত সময়, জনবল, অর্থ ও আনুষঙ্গিক উপাদানাদির প্রয়োজন হতো। সেরূপ সুযোগ-সুবিধা কিংবা উপায়-উপকরণ কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে-কিরামের আয়ত্তাধীন ছিল ? সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল এবং আইনের শাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ একটা জাতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ একটা সভ্য জনসমাজে রূপান্তরিত করা এবং পরিপূর্ণভাবে সে বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে সুসংহত করার মত কোনরূপ জাগতিক উপকরণের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাতে নযীরবিহীন সাফল্য একথাই প্রমাণ করে যে, একমাত্র আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহের দ্বারাই এমনটি সম্ভবপর হয়েছিল। আল্লাহ্র তরফ থেকে অবতীর্ণ বিধান কোরআনের এই দাওয়াত আল্লাহ্রই বিশেষ কুদরতে এমন অবিশ্বাস্যভাবে আরব সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল।

কোরআনের অনন্যসাধারণ মু'জিযা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষায় এ বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

সর্বপ্রথম হিজরী তৃতীয় শতকে আল্লামা জাহিয এ বিষয়ের উপর 'নযমুল কোরআন' নামে একটি বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর হিজরী চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে আবদুল্লাহ্

ওয়াসেতী 'এ'জাযুল-কোরআন' নামে আর একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। একই শতাব্দীতে ইবনে ঈসা রাব্বানী 'এ'জাযুল-কোরআন' নামে আর একটা ছোট পুস্তিকা রচনা করেন। কাজী আবূ বকর বাকিল্লানী হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শুরুর দিকে 'এ'জাযুল-কোরআন' নামে একটি বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করেন।

এতদ্ব্যতীত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) 'আল-এতকান' এবং 'খাসায়েসে-কুবরা' নামে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী তফসীরে কবীরে এবং কাযী আয়ায 'শেফা' নামক গ্রন্থে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

আধুনিককালে মুস্তফা সাদেক রাফেয়ীর 'এ'জাযুল-কোরআন' এবং আল্লামা রশীদ রেযা মিসরীর 'আল্‌ওয়াহ্‌য়্যাল মুহাম্মদী' এ বিষয়ের ওপর রচিত অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রচিত 'এ'জাযুল কোরআন' নামক পুস্তিকাটিও এ বিষয়ে একটা অনবদ্য সংযোজন।

এটাও কোরআনের আর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, এর এক একটি বিষয় সম্পর্কে তফসীর গ্রন্থ ছাড়াও এত বেশি কিতাব রচিত হয়েছে, যার নযীর অন্য কোন কিতাবের বেলায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

মোটকথা, কোরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথাযোগ্য বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব না হলেও সংক্ষিপ্তভাবে যতটুকু বলা হলো, এতেই সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, কোরআন আল্লাহ্‌রই কালাম এবং রাসূল মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা।

কিছু সন্দেহ ও তার জবাব ঃ কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন, এমনও তো হতে পারে যে, কোরআনের মোকাবিলায় সে যুগে কিছু কিছু গ্রন্থ কিংবা অনুরূপ কোন গ্রন্থের অংশবিশেষ রচিত হয়েছিল, কিন্তু কালের ব্যবধানে সেগুলো আর শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকতে পারেনি ? কিন্তু, যদি সামান্য ন্যায়-নীতির প্রতি আস্থা রেখেও চিন্তা করা যায়, তবে এ ধরনের কোন সন্দেহেরও অবকাশ থাকে না। কেননা, সকলেই জানেন যে, কোরআন যখন নাযিল হয়, তখন কোরআনকে মান্য করার মত লোকের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। অপরদিকে যারা কোরআনকে স্বীকার করতো না, অধিকন্তু সর্বশক্তি নিয়োগ করে এর বিরুদ্ধাচরণ করাই তাদের সর্বাপেক্ষা বড় জাতীয় এবং ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করতো, তাদের সংখ্যার কোন অভাব ছিল না। এতদ্ব্যতীত সূচনাকাল থেকেই কোরআনের অনুসারিগণের হাতে প্রচারমাধ্যম এবং মুদ্রণ-প্রকাশনার সুযোগ-সুবিধা ছিল নিতান্তই কম। এ অবস্থায়ও যখন কোরআনের চ্যালেঞ্জের কথা উচ্চারিত হতে থাকলো, তখন কোরআনের দুশমনরা এ আওয়াজকে বাধা দেওয়ার জন্য বিরুদ্ধবাদী সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, রক্ত দিয়েছে, জান-মালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এমতাবস্থায় কোরআনের চ্যালেঞ্জের জবাবে যদি কেউ কোন গ্রন্থ বা তার সূরার অনুরূপ কোন রচনা পেশ করতে সমর্থ হতো, তবে বিরুদ্ধবাদীরা যে কতটুকু আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে তা গ্রহণ করতো এবং সর্বতোভাবে তা প্রচার করতে সচেষ্ট হতো, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, অনুরূপ কোন গ্রন্থের সন্ধান আজ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায়নি। অধিকন্তু কোন যুগে যদি কোরআনের অনন্য মর্যাদাকে খাটো করে এর মোকাবিলায় কোন রচনা পেশ করা

হতো, তবে সে গ্রন্থ রচনার অসারতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে মুসলিম আলিমগণও অনেক জবাবী কিতাব অবশ্যই রচনা করতেন। কিন্তু এ শ্রেণীর কোন কিতাবের সন্ধানও কোথাও পাওয়া যায়নি।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইয়ামান-এর মুসায়লামাতুল-কায্যাবের ঘটনা ইতিহাসে উল্লিখিত রয়েছে। তাতে জানা যায়, কোরআনের মোকাবিলা করার ব্যর্থ চেষ্টায় অবতীর্ণ হয়ে গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণে সে কিছু বাক্য অবশ্য রচনা করেছিল। কিন্তু সেগুলোর পরিণতি কি হয়েছিল, তা কারো অজানা নয়। তার কওমের লোকেরাই সেগুলো তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরেছিল। অধিকন্তু তার রচিত সেই বাক্যগুলো ছিল এতই অশ্লীল, যা কোন রুচিবান মানুষের সামনে উদ্ধৃতও করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসায়লামাহ্ কায্যাব রচিত সেসব বাক্য বিভিন্ন কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে। আজো পর্যন্ত তার প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সেগুলো উদ্ধৃত করা হয়। সুতরাং যদি কোরআনের মোকাবিলায় মহৎ কোন রচনার অস্তিত্ব থাকতো, তবে তাও নিশ্চয়ই ইতিহাসে কিংবা আরবী সাহিত্যের ধারা-বর্ণনায় সংরক্ষিত হতো। অন্তত কোরআন বিরোধীদের প্রচেষ্টায় সেসব কালামের প্রচার ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবশ্যই হতো।

যেসব লোক কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকতো, তাদের অনেক সন্দেহ-সংশয়ের কথা খোদ কোরআনেই উল্লিখিত হয়েছে এবং সাথে সাথে জবাবও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমন একটা ঘটনারও সন্ধান পাওয়া যায় না, যাতে কোন কালাম কোরআনের মোকাবিলায় কেউ পেশ করেছে।

রোম দেশীয় একজন ক্রীতদাস মদীনায় কামারের কাজ করতো। তওরাত এবং ইনজীল সম্পর্কে তার কিছু কিছু জ্ঞান ছিল। সে মাঝে মাঝে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দরবারে যাতায়াত করতো। এ সূত্র ধরেই বিরুদ্ধবাদীরা প্রচার করে দিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এ গোলামের মুখে তওরাত-ইনজীলের কথা শুনে নিয়ে তাই কোরআনের নামে প্রচার করেছেন। খোদ কোরআন শরীফেই এ অপপ্রচারের কথা উল্লেখ করে জবাব দেওয়া হয়েছে–"যে ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে তোমরা এমন অমূলক প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়েছ, সে তো একজন অনারব; সে ব্যক্তির পক্ষে কি কোরআনের অনুরূপ ভাষাশৈলী আয়ত্ত করা এবং প্রকাশ করা সম্ভব?" সূরায়ে নাহ্লের ১০৩ আয়াত দ্রষ্টব্য।

لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ .

অর্থাৎ – ইসলামের দুশমনেরা যা বলে তাদের সে বক্তব্য আমাদের জানা আছে–"এ কোরআন আপনাকে এক ব্যক্তি শিখিয়ে দেয়, অথচ যে লোকের প্রতি এ বিষয়টিকে জড়িত করে, সে হচ্ছে অনারব–আজমী। আর কোরআন হলো একটা একান্ত অলঙ্কারপূর্ণ ও বিশুদ্ধ আরবী ভাষার কালাম।"

অনেকে কোরআন সম্পর্কে বলেছে– لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا অর্থাৎ –আমরাও ইচ্ছা করলে কোরআনের অনুরূপ কালাম বলতে পারতাম।

কিন্তু তাদের কাছে জিজ্ঞাসা যে, তাহলে ইচ্ছাটা করই না কেন? কোরআনের মোকাবিলায় গোটা শক্তি তো নিয়োগ করলেই—জানমাল পর্যন্ত বিসর্জন দিলে। যদি কোরআনের মত কোন কালাম লেখার বা বলার সামর্থ্য তোমাদের থাকে, তাহলে কোরআনের চ্যালেঞ্জের উত্তরে এর মত একটা কালাম তৈরি করে বিজয়ের শিরোপাটা নিয়েই নাও না কেন?

সারকথা, কোরআনের এ দাবির বিরোধীরা যে একান্ত ভদ্রজনোচিত নীরবতা অবলম্বন করেছেন তাই নয়, বরং তার মোকাবিলায় যা কিছু তাদের মুখ থেকে বেরিয়েছে তাই বলেছে। কিন্তু তথাপি একথা কেউ বলেনি যে, আমাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি কোরআনের মত অমুক কালামটি রচনা করেছে–কাজেই কোরআনের এ স্বাতন্ত্র্যের দাবিটি (নাউযুবিল্লাহ্) ভুল।

'হুযূর আকরাম (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে সামান্য কয়েক দিনের জন্য শাম দেশে তশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন পথে পাদ্রী বুহায়রার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। বুহায়রা ছিলেন তাওরাতের বিজ্ঞ পণ্ডিত। কোন কোন বিদ্বেষবাদীর এমন দুর্মতিও হয়েছে যে, তাদের মতে তিনি নাকি তারই কাছে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাদের কাছে জিজ্ঞাসা যে, একদিনে এবং একবারের সাক্ষাতে তার কাছ থেকে এ সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান, ভাষার অলঙ্কার-শৈলী, অকাট্যতা, চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, বৈষয়িক ব্যবস্থাপনা এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেমন করে শিখে নিতে পারলেন ?

ইদানীংকালে কোন কোন লোক প্রশ্ন তুলেছে যে, কোন কালামের অনুরূপ কালাম তৈরি করতে না পারাটাই তার আল্লাহ্‌র কালাম বা মু'জিযা হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। এমনও তো হতে পারে যে, কোন বিজ্ঞ অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ গদ্য কিংবা পদ্য লিখবেন, যার অনুরূপ রচনা অপর কারো পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব নয় ?

সা'দী শীরাযীর 'গুলেস্তাঁ', ফয়যীর 'নোক্‌তাবিহীন তফসীর' প্রভৃতিকে অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলা হয়। তাই বলে এগুলো কি কোন মু'জিযা ?

কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, সা'দী এবং ফয়যীর কাছে জ্ঞানার্জন ও রচনার কত বিপুল উপকরণ উপস্থিত ছিল, কত সময় ধরে তাঁরা জ্ঞানার্জন করেছিলেন। বছরের পর বছর তাঁরা মাদ্রাসা বা শিক্ষায়তনে পড়ে রয়েছেন, রাতের পর রাত জেগেছেন, যুগের পর যুগ পরিশ্রম করেছেন, বড় বড় আলিম-উলামার দরবারে হাঁটু গেড়ে বসে কাটিয়েছেন। বছরের পর বছর পরিশ্রম আর মাথাকুটার পর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, ফয়যী ফারসী ভাষায় এবং মিল্টন ইংরেজী ভাষায় কিংবা হোমার গ্রীক ভাষায় অথবা কালীদাস সংস্কৃতে এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে, তাদের রচনা অন্যদের রচনা অপেক্ষা বহু উন্নত, তথাপি তা আশ্চর্যের বিষয় মোটেই নয়।

মু'জিযার সংজ্ঞা হলো এই যে, তার প্রচলিত নিয়ম-রীতি ও উপায়-উপকরণের মাধ্যম ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করবে। কিন্তু উল্লিখিত মনীষীবৃন্দের যথারীতি জ্ঞানার্জন, উস্তাদ-শিক্ষকদের সাথে সুদীর্ঘকালের সম্পর্ক, বিস্তৃত অধ্যয়ন, দীর্ঘকালের অনুশীলন কি তাদের জ্ঞানের পরিপক্কতা কিংবা অভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট উপকরণ ছিল না ? তাদের কালাম যদি অন্যদের তুলনায় অনন্য হয়ে থাকে, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে ? অবশ্যই যে লোক কোন দিন কাগজ-কলম, বই-পুস্তক স্পর্শ করেও দেখেন নি, কোন মক্তব-মাদ্রাসার ধারে-কাছেও যান নি, তিনি যদি পৃথিবীর সামনে এমন কোন কালাম তুলে ধরেন, হাজারো সা'দী আর লাখো ফয়েযী যাতে আত্মবিসর্জন দেওয়াকে গর্ব বলে মনে করে এবং নিজেদের জ্ঞান-গরিমাকে তারই অবদান বলে মেনে নেয়, তবে বিস্ময়ের বিষয় সেটাই। তাছাড়া সা'দী কিংবা ফয়েযীর কালামের মত কালাম উপস্থাপন করার প্রয়োজন বা কি থাকতে পারে ? তাঁরা কি নবুয়তের দাবি করেছেন ? তাঁরা কি নিজেদের কালামের বৈশিষ্ট্যকে নিজেদের মু'জিযা বলে দাবি করেছেন ? কিংবা গোটা বিশ্বকে

কি তারা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে, আমাদের কালামের সমতুল্য কোন কালাম উপস্থাপন করা কারো পক্ষে সম্ভব হতে পারে না, যার ফলে মানুষ সেগুলোর মোকাবিলা কিংবা সামঞ্জস্যপূর্ণ কালাম উপস্থাপনে বাধ্য ছিল ?

তদুপরি কোরআনের ভাষা ও অলঙ্কার; বাকশৈলী আর বিন্যাস ও গ্রন্থনাই যে অনন্য তাই নয়, বরং মানুষের মন-মস্তিষ্কে এর যে প্রভাব তা আরও বিস্ময়কর নযীরবিহীন। যার ফলে সমকালীন জাতি ও সম্প্রদায়গুলোর মন-মস্তিষ্কই বদলে গেছে। মানব চরিত্রের মূল কাঠামোই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আরবের অমার্জিত-বেদুঈনরা তারই দৌলতে চরিত্র ও নৈতিকতা এবং জ্ঞান-অভিজ্ঞতায় বিদগ্ধ হয়ে উঠেছিল।

তার এই বিস্ময়কর বৈপ্লবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বীকৃতি শুধু মুসলিমরাই দেননি, বরং বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য অমুসলিম মনীষীও দিয়েছেন। এ সম্পর্কিত ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের নিবন্ধসমূহ একত্র করলে একটা বিরাট গ্রন্থ সংকলিত হতে পারে। আর হাকীমুল-উম্মত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এ প্রসঙ্গে 'শাহাদাতুল আক্ওয়াম আলা সিদ্কিল ইসলাম' নামে একখানি গ্রন্থও রচনা করেছেন। এখানে তারই কয়টি উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া হচ্ছে ঃ

ডঃ গোস্তাগুলি তাঁর 'আরব সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের স্বীকৃতি নিম্নরূপ বক্তব্যের মাধ্যামে দিয়েছেন ঃ

"ইসলামের সে পয়গম্বর নবীয়ে-উম্মীরও একটি উপাখ্যান রয়েছে যার আহবান গোটা একটি মূর্খ জাতিকে, যারা তখন পর্যন্তও কোন রাষ্ট্রের আওতায় আসেনি, জয় করে নিয়েছিল এবং এমন এক পর্যায়ে তাদের উঠিয়ে দিয়েছিল, যাতে তারাই বিশ্বের বিরাট বিরাট সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দেয়। এখনও সেই নবীয়ে উম্মীই আপন সমাধির ভেতর থেকে লাখো আদম-সন্তানকে ইসলামের বাণীতে বদ্ধমূল করে রেখেছেন।"

মিঃ গুডওয়েল যিনি নিজ ভাষায় কোরআনের অনুবাদও করেছেন, লিখেছেন ঃ

"আমরা যতই এ গ্রন্থকে (অর্থাৎ কোরআনকে) উল্টে-পাল্টে দেখি, প্রথম অধ্যয়নে তার প্রতি যে অনীহা থাকে, সেগুলোর উপর নব নব প্রক্রিয়ার প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সহসাই সেগুলো আমাদের বিস্মিত করে, আকৃষ্ট করে নেয় এবং আমাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা আদায় করে ছাড়ে। এর বর্ণনাভঙ্গি, এর বক্তব্য ও উদ্দেশ্যের তুলনায় অনেক স্বচ্ছ, মার্জিত, মহৎ ও দীপ্তিপূর্ণ। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে এর বক্তব্য সুউচ্চ শীর্ষে দিয়ে আরোহণ করে। সারকথা, এ গ্রন্থ সর্বযুগে নিজের শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে।" (শাহাদাতুল-আকওয়াম, পৃ. ১৩)

মিসরের প্রখ্যাত লেখক আহমদ ফাতহী বেক্ যাগলুল ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ কাউন্ট হেজভীর গ্রন্থ 'দি ইসলাম'-এর অনুবাদ আরবী ভাষায় প্রকাশ করেন। মূল গ্রন্থটি ছিল ফরাসী ভাষায়। এতে মিঃ কাউন্ট কোরআন সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ ধরনের কালাম এমন একজন লোকের মুখ দিয়ে কেমন করে বেরুতে পারে, যিনি ছিলেন একান্তই নিরক্ষর। সমগ্র প্রাচ্য স্বীকার করে নিয়েছে যে, গোটা মানবজাতি শব্দগত ও মর্মগত উভয় দিক দিয়েই এর সামঞ্জস্য উপস্থাপনে সম্পূর্ণ অক্ষম। এটা সে কালাম, যার রচনাশৈলী উমর ইবনে খাত্তাবকে অভিভূত করে দিয়েছিল, যাতে তিনি আল্লাহ্র অস্তিত্বকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটা সেই বাণী যখন ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর

জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে এতে বর্ণিত বাক্যগুলো হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব আবিসিনিয়ার সম্রাটের দরবারে আবৃত্তি করেন, তখন তাঁর চোখগুলো একান্ত অজান্তেই অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁর দরবারে উপস্থিত বিশপও এই বলে চিৎকার করে ওঠেন, 'এ বাণী সেই উৎসমূল থেকেই নিঃসৃত, যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল ঈসা (আ)-এর বাণীসমূহ।" (শাহাদাতুল আকওয়াম, পৃ. ১৪)

এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিকার ১৬তম খণ্ডের ৫৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে ঃ "কোরআনের বিভিন্ন অংশের মর্ম অপর অংশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অনেক আয়াত ধর্মীয় ও নৈতিক ধারণাসম্বলিত, অলৌকিক নিদর্শনাবলী, ইতিহাস, নবীদের প্রতি আগত আল্লাহ্র বাণী প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহ্র মহত্ত্ব, অনুগ্রহ ও সত্যতার স্মারক হিসেবে পেশ করা হয়েছে। বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহকে এক ও সর্বশক্তিমান বলে প্রকাশ করা হয়েছে। পৌত্তলিকতা ও ব্যক্তি উপাসনাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে না-জায়েয বা অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোরআন সম্পর্কে একথা একান্তই যথার্থ যে, তা সমগ্র বিশ্বে বর্তমান গ্রন্থরাজির মধ্যে সর্বাধিক পঠিত হয়।"

ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ গীবন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রোম সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন'-এর ৫ম খণ্ড, ৫০তম পরিচ্ছেদে লেখেন ঃ

"আটলান্টিক মহাসাগর থেকে শুরু করে গঙ্গা অববাহিকা পর্যন্ত এলাকায় একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, কোরআন সংসদ বা পার্লামেন্টের প্রাণ ও মৌলিক বিধান। তাছাড়া শুধু ধর্মীয় নীতিমালাই নয় বরং সে সমস্ত শাস্তিমূলক বিধান ও সাধারণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তারই উপর নির্ভর করা হয়, যার সাথে মানব জীবন একান্তভাবে জড়িত এবং যা মানুষের প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। প্রকৃতপক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়ত সর্বক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এ শরীয়ত এমন সুবিবেচিত রীতি-নীতি এবং এমনই সাংবিধানিক ধারায় বিন্যস্ত যে, সমগ্র বিশ্বে তার কোন তুলনা পাওয়া যাবে না।"

এখানে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্দের বক্তব্য ও স্বীকৃতিসমূহের সমালোচনা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়াই উদ্দেশ্য, যাতে প্রমাণিত হয় যে, ভাষার অলঙ্কার এবং বাকশৈলীর দিক দিয়ে উদ্দেশ্য ও বক্তব্য হিসাবে অথবা জ্ঞান ও অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোরআনের অনন্যতা ও অনুপমতার স্বীকৃতি শুধু মুসলমানরাই নয়, বরং সর্বযুগের অমুসলমান লেখকরাও দিয়েছেন।

কোরআন সমগ্র বিশ্বকে নিজের মত কোন কালাম উপস্থাপন করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিল, কিন্তু তা কারও পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আজও মুসলমানরা সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারে যে, গোটা বিশ্বের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা দেখিয়ে দিন, যাতে একজন মহা-দার্শনিকের উদ্ভব হয়েছে এবং তিনি সমগ্র বিশ্বের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা এবং প্রচলিত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে কোন নতুন ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছেন আর তাঁর সম্প্রদায়ও ছিল তেমনি গেঁয়ো-অর্বাচীন, অথচ তিনি এত অল্প সময়ে তাঁর শিক্ষাকে এ হেন ব্যাপকতা দান করতে পেরেছেন এবং তার কার্যকারিতাকেও এতটা বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়েছেন যে, তার কোন উদাহরণ আজকের 'সুদৃঢ়' ও 'সুসংহত' ব্যবস্থাসমূহে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

পৃথিবীর তৎকালীন ইতিহাসে যদি তার কোন নযীর না-ও থেকে থাকে, কিন্তু সমকালের আলোকোজ্জ্বল, উন্নত ও প্রগতিসম্পন্ন জগতেরই না হয় কেউ তেমনটি উপস্থাপন করে দেখাক; একা সম্ভব না হলে স্বীয় জাতি, সম্প্রদায়, তথা সমগ্র বিশ্ব-সম্প্রদায়কে নিয়ে হলেও এমন একটি উদাহরণ পেশ করুন।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۔

অর্থাৎ "তোমরা যদি তার উদাহরণ পেশ করতে না পার, আর তোমরা তা কস্মিনকালেও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। যা তৈরি করা হয়েছে অস্বীকারকারী কাফিরদের জন্য।"

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾

---

(২৫) আর হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিণী রমণীকুল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আপনি সেসব লোককে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ সম্পাদন করেছে, এ সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নিঃসন্দেহে এমন বেহেশ্‌ত রয়েছে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে যতবারই তাদেরকে কোন ফলজাত খাবার প্রদান করা হবে, ততবারই তারা এগুলো পূর্বপ্রাপ্ত ফলের অনুরূপ বলে মন্তব্য করবে। বস্তুত প্রতিবারেই তাদেরকে একই ধরনের ফল দেওয়া হবে এবং বেহেশতে তাদের স্ত্রীগণ সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ও পূত-পবিত্র হবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল বসবাস করতে থাকবে। প্রতিবার একই ধরনের ফলপ্রাপ্তি পরিপূর্ণ স্বাদ ও তৃপ্তি লাভে সহায়ক। (প্রতিবার অভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট ফল

দেখে তারা মনে করবে, এতো প্রথমবারে প্রাপ্ত ফল ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কিন্তু স্বাদে ও গন্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের হবে বলে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও তৃপ্তিবর্ধক বলে প্রতিপন্ন হবে।)

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ছিল কোরআন করীমের প্রতি অবিশ্বাসীদের শাস্তির বর্ণনা। আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাকের অনুসরণকারীদের জন্য বেহেশতে সংরক্ষিত বিস্ময়কর ও অভিনব ফলমূল ও অনিন্দ্যসুন্দরী স্বর্গীয় অপ্সরীদের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জান্নাতবাসীদেরকে একই আকৃতিবিশিষ্ট বিভিন্ন ফলমূল পরিবেশনের উদ্দেশ্য হবে পরিতৃপ্তি ও আনন্দ সঞ্চার। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে ফলসমূহ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ বেহেশতের ফলাদি আকৃতিগতভাবে ইহজগতে প্রাপ্ত ফলের অনুরূপই হবে। সেগুলো যখন জান্নাতবাসীদের মাঝে পরিবেশন করা হবে, তখন তারা বলে উঠবে, অনুরূপ ফল তো আমরা দুনিয়াতেও পেতাম। কিন্তু স্বাদ ও গন্ধ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। দুনিয়ার ফলের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলবে না, শুধু নামের মিল থাকবে।

জান্নাতে পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্ত্রী লাভের অর্থ, তারা হবে পার্থিব যাবতীয় বাহ্যিক ও গঠনগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও চরিত্রগত কলুষতা থেকে সম্পূর্ণমুক্ত এবং প্রস্রাব-পায়খানা, রজঃস্রাব, প্রসবোত্তর স্রাব প্রভৃতি যাবতীয় ঘৃণ্য বস্তু থেকে একেবারে ঊর্ধ্বে। অনুরূপভাবে নীতিভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা, অবাধ্যতা, প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও কদর্যতার লেশমাত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

পরিবেশে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণসমূহকে যেন দুনিয়ার পতনশীল ও ক্ষীয়মান উপকরণসমূহের ন্যায় মনে না করা হয়, যাতে যে কোন মুহূর্তে বিলুপ্তি ও ধ্বংসপ্রাপ্তির আশঙ্কা থাকে এবং জান্নাতবাসীরা অনন্তকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এই অফুরন্ত উপকরণসমূহ ভোগ করত বিমল আনন্দস্ফূর্তি ও চরম তৃপ্তি লাভ করতে থাকবেন।

আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদের জান্নাতের সুসংবাদ লাভের জন্য ঈমানের সাথে সাথে সৎকাজেরও শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাই সৎকর্মহীন ঈমান মানুষকে এ সুসংবাদের অধিকারী করতে পারে না। যদিও কেবল ঈমানই স্থায়ী দোযখবাস হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারে। সুতরাং মু'মিন যত পাপীই হোক, কোন না কোন সময় দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু সৎকাজ ভিন্ন কেউ দোযখের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভের অধিকারী হতে পারবে না। (রূহুল-বয়ান)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ

اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ

إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ أَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْأَرْضِ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾

(২৬) আল্লাহ্ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদূর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। বস্তুত যারা মু'মিন তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক। আর যারা কাফির তারা বলে, এরূপ উপমা উপস্থাপনে আল্লাহ্র মতলবই বা কি ছিল। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা অনেককে বিপথগামী করেন। আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। তিনি অনুরূপ উপমা দ্বারা অসৎ ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন কাকেও বিপথগামী করেন না। (২৭) (বিপথগামী ওরাই) যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কোরআন পাক যে আল্লাহ্র বাণী সে সম্পর্কে এ আপত্তি উত্থাপন করে কোন কোন বিরুদ্ধবাদী বলেছিল যে, এতে বিভিন্ন উপমা প্রদান প্রসঙ্গে মশা-মাছি প্রভৃতি তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। যদি এটি সত্য সত্যই আল্লাহ্র বাণী হতো, তবে এতে এরূপ নিকৃষ্ট বস্তুর উল্লেখ থাকত না। (এর উত্তরে বলা হয়েছে যে,) হ্যাঁ! যথার্থই আল্লাহ্ পাক মশা বা ততোধিক নগণ্য বস্তুর দ্বারাও উপমা প্রদান করতে লজ্জাবোধ করেন না। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে (যাই হোক না কেন) তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত উপমাগুলো অত্যন্ত স্থানোপযোগী ও সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। বাকি কাফিরদের কথা—বস্তুত সর্বাবস্থায়ই তারা বলতে থাকবে যে, এরূপ তুচ্ছ উপমা দ্বারা আল্লাহ্ পাক কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চান? এরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ্ পাক অনেককে পথভ্রষ্ট করেন। আবার এরই মাধ্যমে অনেককে হেদায়েত প্রদান করেন। এতদ্বারা নিছক অবাধ্যজন ব্যতীত অন্য কাকেও পথচ্যুত করেন না। যারা আল্লাহ্ পাকের সাথে দৃঢ়ভাবে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে (অর্থাৎ আযল দিবসের অঙ্গীকার, যার মাধ্যমে প্রত্যেকের আত্মাই আল্লাহ্ পাককে স্বীয় রব বা পালনকর্তা বলে স্বীকার করে নিয়েছিল) এবং আল্লাহ্ পাক যেসব সম্পর্ক অটুট রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো ছিন্ন করে (শরীয়ত অনুমোদিত সম্পর্কই এর অন্তর্ভুক্ত। চাই তা আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কই হোক; অথবা আত্মীয়-স্বজন বা সমগ্র মুসলমান অথবা বিশ্বমানবের মধ্যে অবস্থিত পারস্পরিক সম্পর্কই হোক) এবং ভূপৃষ্ঠে কলহ সৃষ্টি করে। (কুফর, আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্বে

অবিশ্বাস পোষণ ও অংশীদার নিরূপণ অশান্তি তো বটেই, তা ছাড়া তা কুফরেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। অত্যাচার, অবিচারও এ অশান্তির অন্তর্ভুক্ত।) ফলত এরাই পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত। (ইহলৌকিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং পারলৌকিক সুখ ভোগের উপকরণ—সবই এদের নাগালের বাইরে। কারণ, হিংসুকের পার্থিব জীবন সর্বদা নানাবিধ তিক্ততা ও প্রতিকূলতায় পরিপূর্ণ থাকে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কয়েক আয়াত পূর্বে দাবি করা হয়েছে যে, কোরআন করীমে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। এ যে আল্লাহ্‌র বাণী এ সম্পর্কে কেউ যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করে, তবে তাকে কোরআনের ক্ষুদ্রতম সূরার অনুরূপ একটি সূরা প্রণয়ন করে পেশ করতে আহবান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে কোরআন অবিশ্বাসীদের এক অমূলক সন্দেহ বর্ণনাপূর্বক তা অপনোদন করা হয়েছে। সন্দেহটি এই যে, কোরআন শরীফে মশা-মাছির ন্যায় তুচ্ছ বস্তুর আলোচনাও স্থান লাভ করেছে। বস্তুত এটা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর পবিত্র কালামের মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ গ্রন্থ প্রকৃতই যদি আল্লাহ্‌র বাণী হতো, তবে এরূপ নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ বস্তুর আলোচনা স্থান পেত না। কারণ, কোন মহান সত্তা এ ধরনের নগণ্য বস্তুর আলোচনা করতে লজ্জা ও অপমান বোধ করেন।

প্রত্যুত্তরে বলা হয়েছে যে, কোন তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উপমা অনুরূপ নগণ্য বস্তুর মাধ্যমে দেয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও বিবেকসম্মত। এতদুদ্দেশ্যে কোন ঘৃণ্য ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ সম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদাবোধের মোটেও পরিপন্থী নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ পাক এ ধরনের বস্তুসমূহের উল্লেখে মোটেও লজ্জাবোধ করেন না। সাথে সাথে এও ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, এ ধরনের নির্বুদ্ধিতামূলক সন্দেহের উদ্রেক শুধু তাদের মনেই হতে পারে, যাদের মন-মস্তিষ্ক অবিরাম আল্লাহদ্রোহিতার ফলে সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধি-বিবেচনা ও অনুধাবনশক্তি বিবর্জিত হয়ে পড়েছে। মু'মিনদের মন-মস্তিষ্কে এ ধরনের অবাস্তব সন্দেহের উদ্রেক কখনো হতে পারে না।

অতঃপর এর অন্য এক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, অনুরূপ উপমার মাধ্যমে মানুষের এক পরীক্ষাও হয়ে যায়—এসব দৃষ্টান্ত দূরদর্শী চিন্তাশীলদের জন্য যোগায় হেদায়েতের উপকরণ। আর চিন্তাশক্তি বিবর্জিত দুর্বিনীতদের পক্ষে অধিকতর পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিশেষে এ কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মহান কোরআনে বর্ণিত এসব উপমার দ্বারা এমন উদ্ধত ও অবাধ্যজনই বিপথগামী হয়, যারা আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং যেসব সম্পর্ক আল্লাহ্ পাক অক্ষুণ্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা তা ছিন্ন করে। যার পরিণামস্বরূপ ধরার বুকে অশান্তি বিস্তার লাভ করে।

بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا—এর অর্থ মশা বা ততোধিক। এখানে অধিক বলে নিকৃষ্টতায় অধিক বুঝানো হয়েছে।

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا কোরআন পাক এবং এতে বর্ণিত উপমাসমূহের মাধ্যমে মানবকুলের হেদায়েতপ্রাপ্তি তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু অনেককে বিপথগামী করার অর্থ কোরআন একদিকে যেমন তার প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারী ও তার অনুসারীদের জন্য হেদায়েতের মাধ্যম, অপরদিকে তার বিরুদ্ধাচারী ও অবিশ্বাসীদের জন্য পথচ্যুতির কারণও বটে।

وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ — فِسْقٌ-এর শাব্দিক অর্থ বের হয়ে যাওয়া।

শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়াকে فِسْقٌ বলা হয়। আর আল্লাহ্র আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া মহান স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাস পোষণের কারণেও হতে পারে, আচার-আচরণ ও কর্মগত অবাধ্যতার কারণেও হতে পারে। এজন্য فَاسِقٌ শব্দটি كَافِر এর স্থলেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোরআনের অধিকাংশ জায়গায় فَاسِقِيْنَ শব্দ كَافِرِيْنَ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। পাপী মু'মিনদেরকেও فاسق (ফাসিক) বলে সম্বোধন করা হয়। ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় সাধারণত ফাসিক فاسق শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাঁদের পরিভাষায় ফাসিককে (فاسق) কাফির (كافر)-এর সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর তা থেকে তওবা করে না, বা অবিরাম সগীরা গুনাহে লিপ্ত থাকার ফলে সেটি তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, সে ব্যক্তি ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় ফাসিক বলে পরিগণিত। আর যে ব্যক্তি এ ধরনের পাপ ও গর্হিত কাজ ঔদ্ধত্য সহকারে প্রকাশ্যভাবে করতে থাকে, সে ফাজির (فاجر) বলে আখ্যায়িত।

সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ালো এই যে, কোরআন পাকে বর্ণিত এসব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অনেকেই সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়, আবার অনেকের ভাগ্যে জোটে পথচ্যুতি। বিপথগামী শুধু সেসব লোকই হয়, যারা আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের আওতা অতিক্রম করে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে সামান্যতম আল্লাহ্ভীতিও রয়েছে, তারা তা থেকে হেদায়েতই লাভ করে থাকেন।

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ .

কোন বিষয়ে দু'ব্যক্তির পারস্পরিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে আহ্দ্ (عهد) বলা হয়। এ চুক্তি বা অঙ্গীকারকে যখন শপথের মাধ্যমে অধিকতর দৃঢ় করা হয়, তখন তাকে বলা হয় মীসাক (ميثاق)।

এ আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ এবং কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসীদের করুণ পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কোরআনের বর্ণিত উপমাসমূহের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে মুনাফিকরা যে আপত্তি উত্থাপন করেছে, তার ফলে যারা আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও তাঁর নির্দেশ অনুসরণে পরাঙ্মুখ কেবল তারাই দ্বিবিধ কারণে বিপথগামী হবে।

প্রথম কারণ—এ বিরুদ্ধাচারিগণ সৃষ্টির আদিলগ্নে আল্লাহ্ পাকের সাথে সমগ্র মানব কর্তৃক কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। মানব জাতি এ জগতে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে মহান স্রষ্টা তাদের আত্মাগুলোকে একত্র করে সবার সামনে প্রশ্ন রেখেছিলেন যে, "আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই ?" প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সবাই সমস্বরে স্বীকার করেছিল, "হ্যাঁ—মহান আল্লাহ্ই আমাদের পালনকর্তা।"— আমরা যেন তাঁর আনুগত্যের সীমা একবিন্দুও লঙ্ঘন না করি, এই ছিল এ অঙ্গীকারের অবশ্যম্ভাবী দাবি।

মানব জাতিকে তাদের এ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তার বাস্তবায়ন পদ্ধতির সবিস্তার বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে যুগে যুগে পবিত্র আসমানী গ্রন্থসহ মহান নবী ও রাসূলগণের আবির্ভাব ঘটেছে। যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে

ফেলেছে, সে যে কোন পয়গম্বর বা আসমানী গ্রন্থের দ্বারা উপকৃত হবে, এ আশা কিভাবে করা যায় ?

দ্বিতীয় কারণ–তারা সেসব সম্পর্কই ছিন্ন করেছে, যেগুলো আল্লাহ্ পাক অটুট রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, নানাবিধ কাজ-কর্মের অংশীদার, গোটা মুসলিম জাতি বা বিশ্বমানবের সঙ্গে মানুষের যত প্রকার সম্পর্কের কথা বলেছেন, সেসবই আলোচ্য সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। এসব সম্পর্ক যথার্থভাবে বজায় রাখার নামই ইসলাম। এক্ষেত্রে সামান্যতম অমনোযোগিতা ও অসাবধানতার দরুন বিশ্বময় অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য বাক্যের শেষাংশে বলা হয়েছে وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْأَرْضِ অর্থাৎ, "এরা ধরার বুকে অশান্তি ঘটায়।" সবশেষে এদের করুণ পরিণতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "এরাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।"

উপমার ক্ষেত্রে কোন তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ দূষণীয় নয় ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْىٖ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কোন নিকৃষ্ট, নগণ্য ও ঘৃণ্য বস্তুর উল্লেখ কোন ত্রুটি বা অপরাধ নয়–কিংবা বক্তার মহান মর্যাদার পরিপন্থীও নয়। কোরআন, হাদীস এবং প্রথম যুগের উলামায়ে কিরাম ও প্রখ্যাত ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের বাণী ও রচনাবলীতে এ ধরনের বহু উপমার সন্ধান মেলে, যা সাধারণভাবে একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে হয়। কোরআন-হাদীস এসব তথাকথিত লজ্জা ও সম্ভ্রমের তোয়াক্কা না করে প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এরূপ উপমা বর্জন মোটেও বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেনি।

يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে–) এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বা চুক্তি লঙ্ঘন করা জঘন্য অপরাধ। এর পরিণতিতে সে যাবতীয় পুণ্য থেকে বঞ্চিতও হয়ে যেতে পারে।

সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট শরীয়তী বিধান মেনে চলা ওয়াজিব এবং তা লঙ্ঘন করা মারাত্মক অপরাধ ঃ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ (এবং আল্লাহ্ পাক যে সব সম্পর্ক অটুট রাখতে বলেছেন, তারা তা ছিন্ন করে।) এতে বোঝা যায়, যে সব সম্পর্ক শরীয়ত অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছে, তা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক এবং তা ছিন্ন করা সম্পূর্ণ হারাম। গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, একজন মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র এবং অন্যান্য মানুষ তথা সমগ্র সৃষ্টিকুলের অধিকার ও প্রাপ্য আদায় করার নির্ধারিত পদ্ধতি ও তৎসংশ্লিষ্ট সীমা ও বাঁধনের সমষ্টির নামই দীন বা ধর্ম। বিশ্বের শান্তি ও অশান্তি এসব সম্পর্ক যথাযথভাবে বজায় রাখা বা না রাখার ওপরই নির্ভরশীল। এজন্যই وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْأَرْضِ (তারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তির সৃষ্টি করে) বাক্যাংশের মাধ্যমে উল্লিখিত সম্পর্ক ক্ষুণ্ন করাকেই বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার একমাত্র কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত এ হলো যাবতীয় অশান্তি ও কলহের মূল কারণ।

اُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ –(তারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতিগ্রস্ত।) এ বাক্যের মাধ্যমে যারা উল্লিখিত নির্দেশাবলী অমান্য করবে তাদেরকে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকালের ক্ষতিই প্রকৃত ক্ষতি। সে তুলনায় পার্থিব ক্ষতি উল্লেখযোগ্য কোন বিষয়ই নয়।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

(২৮) কেমন করে তোমরা আল্লাহ্র ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন আবার মৃত্যুদান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। অতঃপর তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে। (২৯) তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য—যা কিছু যমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুত তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ্ সববিষয়ে অবহিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আচ্ছা!) তোমরা কেমন করে আল্লাহ্র প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার, (অর্থাৎ—তাঁর দয়া ও অনুগ্রহরাজির কথা ভুলে অন্যকে পূজ্য বলে মেনে নাও,) অথচ (একমাত্র তিনিই যে উপাসনা ও আরাধনার অধিকারী এ সম্পর্কে অজস্র জাজ্বল্যমান ও অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। যথা—বীর্যে প্রাণ সঞ্চারের পূর্বে) তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে প্রাণ দান করলেন। পরে তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর (কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। অবশেষে (হিসাব-নিকাশের জন্য হাশর প্রান্তরে) তাঁরই সম্মুখে তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। সে মহান সত্তাই ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সে সব তোমাদের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করেছেন। (এ কল্যাণ ব্যাপক। পানাহার সম্পর্কেও হতে পারে বা বেশভূষা সম্পর্কেও হতে পারে, অথবা বিয়ে-শাদী অথবা আত্মার পরিপুষ্টি ও সজীবতা সঞ্চার সম্পর্কেও হতে পারে। এর দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, মানুষের উপকারে আসতে পারে না, জগতে এমন কোন বস্তুই নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক বস্তুর সব ধরনের ব্যবহারই ঠিক ও ধর্মসম্মত। মারাত্মক কোন বিষও মানুষের কোন উপকারে আসে না, এমন নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে তা খেয়ে ফেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।) অতঃপর তিনি আসমানের (সৃষ্টি ও পরিপূর্ণতা বিধানের) প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং (নিখুঁত ও সুবিন্যস্তভাবে) সাত (স্তরে) আসমান তৈরি করেন। আর তিনি তো সব বিষয়েই অবহিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, একত্ব এবং হুযূরের রিসালাত সম্পর্কে প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি এবং সত্যবিমুখ বিরুদ্ধবাদীদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহসমূহ বর্ণনার পর বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র অগণিত দয়া ও সুখ-সম্পদে পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যতা প্রদর্শনে কিভাবে লিপ্ত থাকতে পারে! এতে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এসব প্রমাণাদি সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে চিন্তা করার জন্য প্রয়োজনীয় কষ্টটুকু স্বীকার করতে তারা যদি প্রস্তুত না থাকে, তবে অন্তত দাতার দানের স্বীকৃতি এবং তার প্রতি যথাযোগ্য ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা তো প্রত্যেক সভ্য ও রুচিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের স্বাভাবিক ও অবশ্যকর্তব্য।

প্রথম আয়াতে সেসব বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহাদির বর্ণনা রয়েছে, যা মানুষের মূল সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যা প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরে উপস্থিত। যথা প্রথমাবস্থায় সে ছিল নিষ্প্রাণ অনুকণা, পরে তাতে আল্লাহ্ পাক প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে সেসব সাধারণ অনুগ্রহের বিবরণ রয়েছে, যদ্দ্বারা সমগ্র মানবজাতি ও গোটা সৃষ্টি যথাযথভাবে উপকৃত হয় এবং যা মানুষের বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার জন্য একান্ত আবশ্যক। এসবের মধ্যে প্রথমে ভূমি ও তার উৎপন্ন ফসলের আলোচনা রয়েছে, যার সাথে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। অতঃপর যে আসমানসমূহের সাথে ভূমির সঞ্জীবতা ও উৎপাদন ক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেগুলোর আলোচনা করা হয়েছে।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ (তোমরা আল্লাহ্র অস্তিত্বকে কেমন করে অস্বীকার করতে পার?) [illegible]রা যদিও সরাসরি আল্লাহ্র অস্তিত্বে অবিশ্বাসী নয়, কিন্তু আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি অবিশ্বাস পোষণকে পরোক্ষভাবে আল্লাহ্র প্রতিই অবিশ্বাস বলে মনে করে তাদেরকে এরূপ সম্বোধন করা হয়েছে।

كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ এখানে اَمْوَاتٌ শব্দটি مَيِّتٌ এর বহুবচন। মৃত ও নিষ্প্রাণ বস্তুকে مَيِّتٌ বলা হয়—আয়াতের মর্ম এই যে, মানুষ তার সৃষ্টির মূল উৎস সম্পর্কে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সৃষ্টির সূচনা ঐ নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহ থেকেই হয়েছে, যা আংশিকভাবে জড়বস্তুর আকৃতিতে, আংশিকভাবে প্রবহমান বস্তুর আকৃতিতে এবং আংশিকভাবে খাদ্যের আকৃতিতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। মহান আল্লাহ্ সেসব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহকে বিভিন্ন স্থান থেকে একত্র করেছেন। অবশেষে সেগুলোতে প্রাণ সংযোগ করে জীবন্ত মানুষে রূপান্তর করেছেন। এ হলো মানব সৃষ্টির সূচনাপর্বের কথা।

ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ (অনন্তর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন আবার পুনরুজ্জীবিত করবেন।) অর্থাৎ—যিনি তোমাদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অণুকণাগুলো সমন্বিত করে তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, তিনিই এ মরজগতে তোমাদের আয়ুর নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে তোমাদের জীবনশিখা নিভিয়ে দেবেন এবং এক নির্ধারিত সময়ের পর কিয়ামতের দিন তোমাদের শরীরের নিষ্প্রাণ বিক্ষিপ্ত কণাগুলোকে আবার সমন্বিত করে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

প্রথম মৃত্যু হলো তোমাদের সৃষ্টিধারায় সূচনাপর্বের; নিষ্প্রাণ ও জড় অবস্থা যা থেকে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হলো মরজগতে মানুষের আয়ু শেষ হয়ে যাওয়াকালীন মৃত্যু। বস্তুত তৃতীয়বার জীবন লাভ হবে কিয়ামতের দিন।

প্রথম মৃত্যু ও প্রথমবার জীবন লাভের মাঝে যেহেতু কোন দূরত্ব ছিল না, সেজন্য ف বর্ণ যোগ করে فَاَحْيَاكُمْ বলা হয়েছে। আর ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর মাঝে অনুরূপভাবে এ মৃত্যু ও কিয়ামত দিবসের পুনরুজ্জীবনের মাঝে যেহেতু বেশ দূরত্ব রয়েছে, সুতরাং সেখানে ছুম্মা (ثم) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে–যার অর্থ সুদূর ভবিষ্যত। ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (অতঃপর তোমাদেরকে সে মহান সত্তার সমীপে ফিরিয়ে নেয়া হবে।) এর অর্থ হলো হিসাব নিকাশ ও কিয়ামতের সময়।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর সেসব দয়া ও অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন, মানুষের নিজস্ব সত্তার সাথে যার সম্পর্ক এবং যা যাবতীয় করুণা ও দয়ার মূল ভিত্তি। আর তা হলো মানুষের জীবন। ইহকালে ও পরকালে, ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে আল্লাহ্ পাকের যেসব দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে, তা সবকিছুই এ জীবনের উপর নির্ভরশীল। জীবন না থাকলে আল্লাহ্র কোন অনুগ্রহের দ্বারাই উপকৃত হওয়া যায় না। কাজেই জীবন যে আল্লাহ্ পাকের দয়া তা একান্ত সহজবোধ্য ব্যাপার। কিন্তু এ আয়াতে মৃত্যুকেও আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কারণ, এই পার্থিব মৃত্যু সে অনন্ত জীবনেরই প্রবেশদ্বার, যার পরে আর মৃত্যু নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যুও আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহবিশেষ।

মাসআলা ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি রসূলে পাক (সা)-এর রিসালতের প্রতি এবং কোরআন যে আল্লাহ্র বাণী সে সম্পর্কে অবিশ্বাসী, সে দৃশ্যত আল্লাহ্র অস্তিত্বে ও মহত্ত্বে অবিশ্বাসী না হলেও আল্লাহ্ পাকের দরবারে সে আবিশ্বাসীদেরই তালিকাভুক্ত।

মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের মধ্যবর্তী সময় ঃ আলোচ্য আয়াতে ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর পরবর্তী এমন এক জীবনের বর্ণনা রয়েছে, যার সূচনা হবে কিয়ামতের দিন থেকে। কিন্তু যে কবরদেশের প্রশ্নোত্তর এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াত এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত—এখানে তার কোন উল্লেখ নেই। মানুষ ইহকালে যে জীবন লাভ করে এবং পরকালে যে জীবন লাভ করবে, কবরের জীবন অনুরূপ কোন জীবন নয়, বরং তা কল্পনাময় স্বাপ্নিক জীবনের মতই এক মধ্যবর্তী অবস্থা। একে ইহলৌকিক জীবনের পরিসমাপ্তি এবং পারলৌকিক জীবনের প্রারম্ভও বলা যেতে পারে। সুতরাং এটি এমন কোন স্বতন্ত্র জীবন নয়, পৃথকভাবে যার আলোচনা করার প্রয়োজন থাকতে পারে।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا (তিনিই সেই মহান আল্লাহ্ যিনি তোমাদের উপকারার্থ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন।) এখানে এমন এক সাধারণ ও ব্যাপক অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমগ্র প্রাণিজগত সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত। এ জগতে মানুষ যত অনুগ্রহই লাভ করেছে বা করতে পারে সংক্ষেপে তা এই একটি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, মানুষের আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ওষুধ-পত্র, বসবাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ এ মাটি থেকেই উৎপন্ন ও সংগৃহীত হয়ে থাকে।

জগতের প্রত্যেক বস্তুই মানবের উপকারার্থ সৃষ্ট—কোন বস্তুই অনর্থক বা অহেতুক নয় ঃ **বিশ্বের সব কিছুই** যে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, আলোচ্য আয়াতে এ তথ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করে না—চাই সে উপকার ইহলৌকিক হোক বা পরকাল সম্পর্কিত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত হোক। অনেক জিনিস সরাসরি মানুষের আহার ও ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে সেগুলোর উপকার সহজেই অনুধাবনযোগ্য। আবার এমনও অগণিত বস্তু রয়েছে, যার অবদান উপকারিতা মানুষ অলক্ষ্যে ভোগ করে যাচ্ছে, অথচ তা অনুভব করতে পারছে না। এমনকি বিষাক্ত দ্রব্যাদি, বিষধর জীবজন্তু প্রভৃতি যেসব বস্তু দৃশ্যত মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়, গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, সেগুলোও কোন-না কোন দিক দিয়ে মানুষের জন্য কল্যাণকরও বটে। যেসব জন্তু একদিকে মানুষের জন্য হারাম, অপরদিকে তদ্দ্বারা তারা উপকৃতও হয়ে চলেছে।

প্রখ্যাত সাধক আরিফ বিল্লাহ্ ইবনে 'আতা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এরশাদ করেন যে, আল্লাহ্ পাক সারা বিশ্বকে এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন যেন জগতের যাবতীয় বস্তু তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে; আর তোমরা যেন সর্বতোভাবে আল্লাহ্র আরাধনায় নিয়োজিত থাক। তবেই সে সব বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা তা নিঃসন্দেহে লাভ করবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হবে সে সব বস্তুর অন্বেষণে ও সাধন চিন্তায় নিয়োজিত থেকে সে মহান সত্তাকে ভুলে না বসা, যিনি এগুলোর একক স্রষ্টা।

বস্তুজগতে দ্রব্যাদির ব্যবহার মূলগতভাবে বৈধ, না নিষিদ্ধ ঃ কোন কোন মনীষী এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, শরীয়ত যেসব বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে, সেগুলো ছাড়া মানুষের জন্য যাবতীয় দ্রব্যের ব্যবহার মূলগতভাবে বৈধ ও শরীয়ত-সিদ্ধ। কেননা, এ উদ্দেশ্যেই সেগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং কোন বস্তুর ব্যবহার কোরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে হারাম বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা হালাল বলেই বিবেচিত হবে।

অপরপক্ষে কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে বস্তুজগতের সৃষ্টি যে মানুষের উপকারার্থ হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় না যে, সেগুলোর ব্যবহারও তাদের জন্য হালাল (বৈধ)। জগতের যাবতীয় বস্তু মূলগতভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ। সুতরাং কোরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে কোন বস্তুর ব্যবহার বৈধ বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা নিষিদ্ধ বা হারাম বলেই বিবেচিত হবে।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ এ সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশে বিরত থাকেন। আল্লামা ইবনে হাইয়্যান (র) তফসীরে বাহ্রে মুহীতে বর্ণনা করেছেন যে, উল্লিখিত কোন মতের পক্ষেই এ আয়াত প্রমাণ হিসাবে পেশ করা চলে না। কারণ, خَلَقَ لَكُمْ বাক্যে (لام) 'লাম' বর্ণটি 'কারণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ,—এসব বস্তু তোমাদের কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতকে কোন বিষয়ের সিদ্ধতা (جائز) বা নিষিদ্ধতার (حرام) দলীলরূপে দাঁড় করানো যায় না। বরং কোরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে যেসব বিষয় সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে হালাল ও হারামের নির্দেশাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোরই অনুসরণ করা আবশ্যক।

উল্লিখিত আয়াতে ثُمَّ শব্দের দ্বারা পূর্বে পৃথিবী ও পরে আকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এটাই সঠিক। সূরা আন্নাযি'আতে বর্ণিত وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا-(অতঃপর তিনি ভূমণ্ডল বিস্তীর্ণ করেছেন) আয়াত থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি আকাশের পরে হয়েছে বলে বোঝা যায় না। বরং এর অর্থ ভূমণ্ডলের বিন্যাস ও পরিপূর্ণতা সাধন এবং তা থেকে নানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন সংক্রান্ত বিস্তারিত কাজ নভোমণ্ডল সৃষ্টির পরেই সম্পন্ন হয়েছে। অবশ্য মূল পৃথিবীর সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির পূর্বেই সাধিত হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতে আকাশের সংখ্যা সাত বলে প্রমাণিত। এতে বোঝা যায় যে, জ্যোতির্বিদগণের মতানুসারে আকাশের সংখ্যা ৯ হওয়ার তথ্য সম্পূর্ণ ভুল, অমূলক ও নিছক কল্পনাপ্রসূত।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ

فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ

لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ

عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾

قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ

إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾

---

(৩০) আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদের বললেন ঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতারা বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে, যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে ? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। (৩১) আর আল্লাহ্ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। (৩২) তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি আমাদের যা শিখিয়েছ (সে সব ছাড়া)। নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। (৩৩) তিনি বললেন, হে আদম! ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তারপর যখন

তিনি বলে দিলেন সে সবের নাম, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি এবং সে সব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাদেরকে (প্রস্তাবিত বিষয়ে তাদের অভিমত ব্যক্ত করতে বললেন যাতে বিশেষ তাৎপর্য ও মঙ্গল নিহিত ছিল, নতুবা পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থেকে তো আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ পবিত্র। মোটকথা, আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদেরকে) বললেন, অবশ্যই পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করব (অর্থাৎ, সে আমার এমন প্রতিনিধি হবে, যার উপর আমি শরীয়তের বিধিবিধান প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করব)। ফেরেশতারা বলতে লাগলেন, আপনি কি এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা পৃথিবীতে শুধু কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে ? পরন্তু আমরা নিরন্তর আপনার প্রশংসাস্তুতি ও পবিত্রতা বর্ণনা করে যাচ্ছি। (ফেরেশতাদের এ উক্তি প্রতিবাদছলে বা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং তাঁরা যে কোন উপায়ে একথা অবগত হয়েছিলেন যে, প্রস্তাবিত নব সৃষ্ট জাতি মাটির উপকরণে তৈরি হবে এবং তাদের মধ্যে সৎ-অসৎ উভয় শ্রেণীই থাকবে।

সুতরাং কেউ কেউ প্রতিনিধিত্বের মহান দায়িত্ব পালনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেবে। তাই তাঁরা বিনীতভাবে নিবেদন করলেন, আমরা তো সবাই যে কোন দায়িত্ব পালনে সদাপ্রস্তুত। বস্তুত ফেরেশতাকুলে পাপী বলতে কেউ নেই। অনন্তর নতুন কর্মচারী বাড়ানোর অথবা নতুন জাতি সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন—বিশেষত যেখানে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, প্রস্তাবিত এ নব জাতি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে আপনার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে ? আমরা তো যে কোন খিদমতের জন্য প্রস্তুত এবং আমাদের খিদমত পুরোপুরি আপনার মত ও মর্জি মোতাবেক হবে।) আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন, তোমরা যা জান না আমি তা জানি। তিনি আদমকে (সৃষ্টি করার পর তাঁকে) যাবতীয় বস্তুর নামের জ্ঞান দান করেন। (অর্থাৎ সব বস্তুর নাম, বৈশিষ্ট্যাবলী ও লক্ষণাদি সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান আদম [আ]-কে দান করলেন।) অতঃপর সেসব বস্তু ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বললেন, তবে তোমরা আমাকে এসব বস্তুর নাম (যাবতীয় নিদর্শনাদি ও গুণাবলীসহ) বলে দাও দেখি! যদি তোমরা (তোমাদের এ বক্তব্য যে, তোমরাই বিশ্ব-প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে) সত্য হয়ে থাক। ফেরেশতাগণ নিবেদন করলেন, আপনি অতি পবিত্র। (অর্থাৎ—এ অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত যে, আপনি আদম [আ]-এর সামনে জ্ঞানরহস্য সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করে দিয়েছেন, অথচ আমাদের সামনে তা গোপন রেখেছেন। কেননা, কোরআনের কোন আয়াত বা হাদীস সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, হযরত আদম [আ]-কে ফেরেশতাদের থেকে আলাদা করে উল্লিখিত বস্তুসামগ্রীর নাম ও গুণ বৈশিষ্ট্যের কোন শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, সবার সামনে একই রকমের শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু হযরত আদম [আ]-এর মধ্যে মজ্জাগতভাবে সে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা ছিল বলে তিনি তা আয়ত্ত করে নেন। অপরপক্ষে ফেরেশতাদের সে যোগ্যতা না থাকার দরুন তাঁরা তা গ্রহণ করতে সমর্থ হননি।) আপনার প্রদত্ত জ্ঞান ব্যতীত আমাদের অন্য কোন জ্ঞান নেই। আপনি মহাজ্ঞানী ও সর্বাধিক হেকমতের অধিকারী। (তাই

তিনি যার জন্য যতটুকু জ্ঞানবুদ্ধি কল্যাণকর বলে মনে করেছেন, তাকে ততটুকুই দিয়েছেন। প্রতিনিধির উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ফেরেশতাগণ যে অক্ষম, আলোচ্য আয়াতে তাঁদের একথার স্বীকৃতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। হযরত আদম [আ] যে যথার্থই এ বিশেষ জ্ঞান লাভের যোগ্য, পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাগণের সামনে সুস্পষ্টভাবে তা প্রকাশ করেছেন।) ইরশাদ করেন ঃ হে আদম! তুমি তাদেরকে এসব বস্তুর নাম (সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যাদিসহ) বলে দাও। (যখন হযরত আদম [আ] এ সব কিছু ফেরেশতাদের সামনে সবিস্তারে বলে দিলেন, তখন তাঁরা বুঝে নিলেন যে, হযরত আদম [আ] এ বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন করেছেন।) অতঃপর (যখন হযরত আদম [আ] তাঁদেরকে এসব বস্তুর নাম বলে দিলেন,) তখন আল্লাহ্ পাক বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয়ই আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য (বস্তুর রহস্য সম্পর্কে) অবগত এবং তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর বা অন্তরে গোপন রাখ তাও আমার জানা ?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ ও সাধারণ অনুগ্রহরাজির বর্ণনা দিয়ে মানবকে অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ আয়াত থেকে রুকূর শেষ পর্যন্ত দশটি আয়াতে এ সূত্র ধরেই হযরত আদম (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, অনুগ্রহ দু'ধরনের ঃ

(১) প্রকাশ্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যথা—পানাহার, অর্থ-কড়ি, ঘর-বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতি। (২) আভ্যন্তরীণ বা অতীন্দ্রিয়। যথা—মান-মর্যাদা, যশ-খ্যাতি, জ্ঞান-বুদ্ধি, আনন্দ-স্ফূর্তি প্রভৃতি। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ছিল বাহ্যিক ও প্রকাশ্য অনুগ্রহাদির বিবরণ। আলোচ্য এগারটি আয়াতে আভ্যন্তরীণ অনুগ্রহসমূহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ পাক বলেন, আমি তোমাদের আদি পিতা হযরত আদমকে জ্ঞান ও বিদ্যাবলে ধনী করেছি এবং ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করিয়ে বিশেষ গৌরব ও অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছি। আর তোমাদেরকে তাঁরই বংশধর হওয়ার গৌরব দান করেছি।

এ আয়াতের সার-সংক্ষেপ এই—মহান পরওয়ারদিগার আল্লাহ্ পাক যখন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বে তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করেন, তখন এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য তাঁর এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, তাঁরা যেন এ ব্যাপারে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন। কাজেই ফেরেশতাগণ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, মানব জাতির মাঝে এমনও অনেক লোক হবে, যারা শুধু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে। সুতরাং এদের উপর খেলাফত ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব অপর্ণের হেতু তাদের পুরোপুরি বোধগম্য নয়। এ দায়িত্ব পালনের জন্য ফেরেশতাগণই যোগ্যতম বলে মনে হয়। কেননা, পুণ্য ও সততা তাঁদের প্রকৃতিগত গুণ। তাঁদের দ্বারা পাপ ও অকল্যাণ সাধন আদৌ সম্ভব নয়—তাঁরা সদা অনুগত। এ জগতের শাসনকার্য পরিচালনা ও শৃঙ্খলা বিধানের কাজও হয়তো তারাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। তাঁদের এ ধারণা যে ভুল ও অমূলক তা আল্লাহ্ পাক শাসকোচিত ভঙ্গীতে বর্ণনা করে বলেন যে, বিশ্ব খেলাফতের প্রকৃতি ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমরা মোটেও ওয়াকেফহাল নও। তা কেবল আমিই পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত।

অতঃপর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অনুপম মর্যাদার বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় উত্তরটি দেয়া হয়েছে। ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বিশ্ব খেলাফতের জন্য ভূপৃষ্ঠের অন্তর্গত সৃষ্ট বস্তুসমূহের নাম, গুণাগুণ, বিস্তারিত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষণাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। বস্তুত ফেরেশতাগণের এ যোগ্যতা ও গুণাবলী নেই।

আদম সৃষ্টি প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সাথে আলোচনার তাৎপর্য ঃ একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ফেরেশতাদের সমাবেশে আল্লাহ্ পাকের এ ঘটনা প্রকাশ করার তাৎপর্য কি এবং এতে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল ? তাঁদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ, না তাদেরকে এ সম্পর্কে নিছক অবহিত করা ? না ফেরেশতাদের ভাষায় এ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করানো ?

একথা সুস্পষ্ট যে, কোন বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা তখনই দেখা দেয়, যখন সমস্যার সমস্ত দিক কারো কাছে অস্পষ্ট থাকে, নিজস্ব অভিজ্ঞান ও জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা না থাকে। আর তখনই কেবল অন্যান্য জ্ঞানী-গুণীর সাথে পরামর্শ করা হয়। অথবা পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সেখানেও হতে পারে, যেখানে অন্যান্য ব্যক্তি সমঅধিকার সম্পন্ন হয়। তাই তাদের অভিমত জ্ঞাত হওয়ার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করা হয়। যেমনটি বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সাধারণ পরিষদসমূহে প্রচলিত। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এ দু'টোর কোনটাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মহান আল্লাহ্ গোটা বস্তুজগতের স্রষ্টা এবং প্রতিটি বিন্দুবিসর্গ সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সামনে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সবকিছুই সমান। তাই তাঁর পক্ষে কারো সাথে পরামর্শ করার কি প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে ?

অনুরূপভাবে এখানে এমনও নয় যে, সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত—যেখানে প্রত্যেক সদস্য সমঅধিকার সম্পন্ন বলে প্রত্যেকের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ পাকই সবকিছুর স্রষ্টা এবং মালিক। ফেরেশতা ও মানব-দানব সবই তাঁর সৃষ্টি এবং সবই তাঁর অধীনস্থ ও আয়ত্তাধীন। তাঁর কোন কাজ বা পদক্ষেপ সম্পর্কে কারো কোন প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই যে, এ কাজ কেন করা হলো বা কেন করা হলো না। لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ আল্লাহ্ পাকের কাজ সম্পর্কে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই, কিন্তু অন্য সবাইকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

সার কথা, প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে পরামর্শ গ্রহণ উদ্দেশ্যও নয় এবং এর কোন আবশ্যকতাও নেই। কিন্তু রূপ দেয়া হয়েছে পরামর্শ গ্রহণের যাতে মানুষ পরামর্শরীতি এবং তার প্রয়োজনীয়তার শিক্ষা লাভ করতে পারে। যেমন, কোরআন পাকে রসূলে করীম (সা)-কে বিভিন্ন কাজে ও ক্ষেত্রে সাহাবায়ে-কিরামের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অথচ তিনি ছিলেন ওহীর বাহক। তাঁর সব কাজকর্ম এবং তাঁর প্রতিটি অধ্যায় ও দিক ওহীর মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করে দেওয়া হতো। কিন্তু তাঁর মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ রীতি প্রচলন করা এবং উম্মতকে তা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকেও পরামর্শ গ্রহণের তাকীদ দেওয়া হয়েছে।

কোরআনের ভাষার ইঙ্গিতে বোঝা যায়, আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পূর্বে ফেরেশতাদের ধারণা ছিল, আল্লাহ্ পাক তাদের চাইতে জ্ঞানী ও উত্তম কোন জাতি সৃষ্টি করবেন না।

তফসীরে ইবনে জরীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে। বলা হয়েছে যে, আদম সৃষ্টির পূর্বে ফেরেশতাগণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন যে, لن يخلق الله خلقا اكرم عليه منا ولا اعلم (আল্লাহ্ পাক আমাদের চাইতে অধিক মর্যাদাশীল ও জ্ঞানী কোন জাতি সৃষ্টি করবেন না।) কেবল আল্লাহ্ পাকের জ্ঞানই ছিল যে, এমন এক সৃষ্টি করতে হবে, যা সমগ্র সৃষ্টিজগতে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন হবে এবং যাকে তাঁর প্রতিনিধিত্বের গৌরবে ভূষিত করা হবে।

এজন্য ফেরেশতাদের আসরে পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাকের প্রতিনিধিরূপে হযরত আদমের সৃষ্টির ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছিল, যাতে তারা এ সম্পর্কে তাদের অভিমত ব্যক্ত করতে পারে।

সুতরাং ফেরেশতাগণ নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুসারে বিনীতভাবে তাঁদের অভিমত প্রকাশ করে নিবেদন করলেন—মহাপ্রভু, আপনি মর্ত্যলোকে যে জাতিকে আপনার প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন, তার মাঝে দ্বন্দ্বকলহ সৃষ্টি, অকল্যাণ ও অহিত সাধনের উপকরণও তো বিদ্যমান। সে নিজেই যখন রক্তপাত ঘটাবে, তখন সে অপরকে কিভাবে সংশোধন করবে এবং বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলাই বা কিভাবে বিধান করতে পারবে ? পক্ষান্তরে আপনার ফেরেশতাকুলে দ্বন্দ্ব-কলহ ও অশান্তি সৃষ্টির কোন উপকরণ নেই। তারা যাবতীয় পাপ-পংকিলতা বিমুক্ত এবং সর্বক্ষণ আপনার গুণগান ও উপাসনা-আরাধনায় নিয়োজিত। দৃশ্যত তারাই এ খিদমত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবে।

মোটকথা, এর দ্বারা আল্লাহ্ পাকের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোন আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি। কেননা, ফেরেশতাগণ এমন মন-মানসিকতা ও অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। একথা জানাই তাদের উদ্দেশ্য যে, কোন্ হিকমত ও তাৎপর্যের ভিত্তিতে এবং কি কল্যাণ চিন্তায় এমন এক নিষ্কলুষ পূত-পবিত্র একান্ত অনুগত সম্প্রদায় বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অপর এক পংকিল জাতি সৃষ্টি করে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে একাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে ?

এর উত্তর দান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রথমত সংক্ষিপ্তভাবে বলেন ঃ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (তোমরা যা জান না আমি তা জানি।) অর্থাৎ তোমরা খেলাফতে ইলাহীর নিগূঢ় তত্ত্ব এবং তার আনুষঙ্গিক প্রয়োজনাদি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নও। তাই তোমরা মনে কর যে, কেবল এক নিষ্পাপ জাতিই সুষ্ঠুভাবে এ দায়িত্ব পালন ও এ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। এর পুরো তত্ত্ব ও অন্তর্নিহিত রহস্য শুধু আমিই অবগত।

অতঃপর ফেরেশতাগণকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সৃষ্ট জগতের সমগ্র বস্তু-সামগ্রীর নাম, এদের গুণাগুণ ও লক্ষণাদি সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের যোগ্যতা কেবল আদম সন্তানকেই দান করা হয়েছে। ফেরেশতার স্বভাব-প্রকৃতি মোটেও এর উপযোগী নয়। এসব কিছু আদম (আ)-কে শিখিয়ে ও বলে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, বিশ্বের উপকারী ও ক্ষতিকর দ্রব্যসামগ্রী এবং তার লক্ষণাদি ও বৈশিষ্ট্যাবলী, প্রত্যেক প্রাণী সম্প্রদায়ের স্বভাব-প্রকৃতি ও লক্ষণাবলী—এ সবের জ্ঞান লাভের যোগ্যতা ফেরেশতাকুলের নেই। ফেরেশতারা কি বুঝবেন যে, ক্ষুধা কি জিনিস, পিপাসার যন্ত্রণা কেমন, মানসিক উত্তেজনা ও প্রেরণার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কি, কোন্ বস্তুতে মাদকতার উৎপত্তি

কেমন করে হয়, কোন্ ধরনের এবং কোন্ রাশির শরীরে সাপ ও বিচ্ছুর বিষের প্রতিক্রিয়া কি রকম হয় ?

মোটকথা, সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও লক্ষণাদির জ্ঞান ফেরেশতাদের স্বভাব-প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ শিক্ষা ও জ্ঞান শুধু আদমকেই দেয়া সম্ভব ছিল এবং তাঁকেই তা দেয়া হলো। কোরআন পাকের কোথাও সরাসরিভাবে বা আকার-ইঙ্গিতে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, হযরত আদম (আ)-কে ফেরেশতাদের থেকে পৃথক করে কোন নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে এ শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। সুতরাং এমন হতে পারে যে, শিক্ষাদান এবং তা গ্রহণের সুযোগ সবার জন্যে সমানভাবেই বিদ্যমান ছিল। এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা হযরত আদম (আ)-এর ছিল বলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তিনি এ শিক্ষা লাভ করে নেন। ফেরেশতাদের প্রকৃতিতে তা ছিল না বলে তাঁরা তা লাভ করতে সক্ষম হননি। এজন্যই এখানে শিক্ষাদানকে শুধু আদম (আ)-এর সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হয়েছে ঃ وَعَلَّمَ اٰدَمَ (এবং আল্লাহ্ পাক হযরত আদমকে শিক্ষা প্রদান করেন) অবশ্য শিক্ষাদান ব্যবস্থা আদম (আ) ও ফেরেশতা উভয়ের জন্য সমভাবেই ছিল এবং উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবার এমনও হতে পারে যে, বাহ্যিকভাবে শিক্ষাদানের কোন আয়োজনই করা হয়নি। বরং আদম (আ)-কে সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায়ে এসব দ্রব্য-সামগ্রীর জ্ঞান স্বভাবগতভাবেই নিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেমন, সদ্যোজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই মায়ের দুধ পান করতে এবং হাঁসের ছানা সাঁতার কাটতে জানে। এ ব্যাপারে কোন বাহ্যিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন হতে পারে—আল্লাহ্ তো সব কিছুই করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি ফেরেশতাদের প্রকৃতি ও স্বভাব পাল্টিয়ে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার উন্মেষ ঘটিয়ে তাদেরকেও এসব কিছু শিখিয়ে নিতে পারতেন। তবে তা করলেন না কেন ? উত্তর এই যে, যদি ফেরেশতাদের স্বভাব-প্রকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হতো তবে ফেরেশতা আর ফেরেশতাই থাকতেন না, মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যেতেন। সুতরাং এ প্রশ্নের অর্থ পরোক্ষভাবে এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদেরকে মানুষে রূপান্তর করছিলেন না কেন ?

সারকথা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্ট জগতের যাবতীয় বস্তু-সামগ্রীর নাম এবং সেগুলোর গুণাগুণ ও লক্ষণাদির বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়েছিল, যা ফেরেশতাদের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। অতঃপর সেসব বস্তু-সামগ্রী ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বলা হলো, তোমাদের চাইতে অধিক জ্ঞানী ও উত্তম কোন জাতি সৃষ্টি হবে না বলে এবং বিশ্ব-খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য মানব জাতির চাইতে তোমরাই যোগ্যতর বলে তোমাদের যে ধারণা এতে তোমরা যদি সত্যবাদী ও সঠিক হয়ে থাক, তবে সৃষ্ট জগতের যেসব বিষয়ের ওপর বিশ্ব-খলীফার শাসনকার্য পরিচালনা করতে হবে, যাবতীয় গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলীসহ এগুলোর নাম বলে দাও দেখি।

এখানে এ তথ্য উদ্ঘাটিত হলো যে, শাসকের জন্য শাসিতের স্বভাব-প্রকৃতি গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় তিনি তাদের ওপর ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন না। যে ব্যক্তি জানে না যে, ক্ষুধার কারণে কিভাবে কতটুকু কষ্ট ও যন্ত্রণা হয়, তার আদালতে যদি কাউকে অভুক্ত

রাখা সম্পর্কে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তবে সে এর কি মীমাংসা করবে এবং কিভাবে করবে ?

মোটকথা, এ ঘটনার দ্বারা আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদের পূর্বেকার অমূলক ধারণার অপনোদন করে একথা প্রকাশ করে দিলেন যে, বিশ্ব-খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য নিষ্পাপ হওয়াই যোগ্যতার একমাত্র মানদণ্ড নয়, বরং দেখতে হবে, সে বস্তু জগত সম্পর্কে ওয়াকেফহাল কিনা এবং সেগুলোর ব্যবহার-বিধি ও ফলশ্রুতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখে কিনা। যদি তোমাদের এ ধারণা সঠিক হয়ে থাকে যে, তোমরা (ফেরেশতাগণ) এ খেদমতের জন্য যোগ্যতর তবে যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ এসব বস্তুর নাম বলে দাও।

যেহেতু ফেরেশতাদের মতামত প্রকাশ কোন প্রতিবাদছলে বা অহংকার প্রদর্শনার্থ অথবা তাদের যোগ্যতার দাবি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং তাদের অভিমতের অভিব্যক্তি ছিল একান্ত অনুগত কর্মচারীর ন্যায় এবং বিনীতভাবে নিজস্ব খেদমত পেশ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তাই তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন—'মহান প্রভু, আপনি অতি পবিত্র। আপনি যতটুকু জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন, তার অতিরিক্ত কিছুই আমাদের জানা নেই।' যার মর্মার্থ হলো, নিজেদের পূর্ববর্তী ধারণা পরিত্যাগ করে একথা স্বীকার করে নেয়া যে, তাদের চাইতে অধিক প্রজ্ঞাবান উত্তম জাতিও রয়েছে এবং খেলাফতের জন্য তারাই যোগ্যতম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—পৃথিবীতে পদার্পণ করে মানব জাতি যে পরস্পর রক্তারক্তি করবে এবং বিশৃঙ্খলা ঘটাবে ফেরেশতাগণ এ তথ্য কোথা থেকে, কিভাবে সংগ্রহ করলেন ? তাদের কি অদৃশ্য জ্ঞান ছিল ? না নিছক অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন ? অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এর উত্তর এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই তাদেরকে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা এবং তার ভাবীকালের সম্ভাব্য কার্যকলাপ, আচার-ব্যবহার ও গতিবিধির স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছিলেন। যেমন, কোন কোন হাদীসে পাওয়া যায়, যখন আল্লাহ্ পাক বিশ্ব-খেলাফতের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে আদম সৃষ্টির বিবরণ ফেরেশতাদের সামনে প্রদান করলেন, তখন ফেরেশতাগণ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ পাকের নিকট ভাবী খলীফার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করায় স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই তাদেরকে সবকিছু সবিস্তারে বলে দেন। ফেরেশতাগণ সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন, অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তারক্তি করাই যে জাতির বৈশিষ্ট্য, তাকে কোন্ যুক্তি ও তাৎপর্যের ভিত্তিতে বিশ্ব-খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত করা হলো ?

এর একটি উত্তরে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হযরত আদমের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। আর বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত ঘটাবে বলে তাঁর খেলাফতের যোগ্যতা প্রসঙ্গে যে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল, সংক্ষিপ্তাকারে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (তোমরা যা জান না নিশ্চয়ই আমি তা জানি।) আয়াতের মাধ্যমে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বিষয়কে তোমরা খিলাফতের যোগ্যতার পরিপন্থী বলে মনে করছ, প্রকৃত প্রস্তাবে সেটাই তার যোগ্যতার মূল উৎস ও প্রধান কারণ। কেননা, অশান্তি দূরীভূত করার উদ্দেশ্যেই বিশ্ব-খেলাফত প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। যেখানে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা থাকবে না, সেখানে প্রতিনিধি পাঠানোর কি প্রয়োজন ? মোটকথা, আল্লাহ্ পাক নিজের ইচ্ছানুসারে

একদিকে যেমন নিষ্পাপ-নিষ্কলুষ ফেরেশতা জাতি সৃষ্টি করেছেন, যাদের দ্বারা কোন পাপই সংঘটিত হতে পারে না, অপরদিকে তেমনি শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন, যাদের কোন পুণ্য ও কল্যাণকর কার্য সাধনের যোগ্যতাই নেই। অনুরূপভাবে এমন এক জাতি সৃষ্টি করাও আল্লাহ্ পাকের অভিপ্রায় ছিল, যার মধ্যে পাপ ও পুণ্য উভয়ের সমাবেশ ঘটবে এবং যার মাঝে মঙ্গল-অমঙ্গল উভয় প্রেরণাই বিদ্যমান থাকবে এবং মহান প্রভুর নৈকট্য লাভ ও সন্তুষ্টি বিধানের গৌরবে ভূষিত হবে।

ভাষার স্রষ্টা আল্লাহ্ পাক স্বয়ং ঃ আদম (আ)-এর এ বর্ণনায় বস্তু-সামগ্রীর নাম শিক্ষা দানের ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভাষা শব্দাবলীর মূল প্রণেতা ও স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ্ পাক। অতঃপর সৃষ্টির নানা রকম ব্যবহারের ফলে তা বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে এবং বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব হয়েছে। ইমাম আশ্‌আরী (র) এ আয়াতেই প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকই ভাষার প্রণেতা।

ফেরেশতাদের ওপর আদমের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ এ ঘটনার ক্ষেত্রে কোরআনে হাকীমে ব্যবহৃত এসব বিশুদ্ধ তাৎপর্যপূর্ণ শব্দসমষ্টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যখন ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে; এসব বস্তু-সামগ্রীর নাম বলে দাও, তখন أَنْبِئُونِي শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আমাকে বলে দাও। আবার যখন হযরত আদম (আ)-কে একই বিষয় সম্পর্কে সম্বোধন করা হয়েছে, তখন أَنْبِئْهُمْ (হে আদম তাদেরকে বলে দাও।) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আদম (আ)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ফেরেশতাদেরকে এসব বস্তুর নাম বলে দাও। প্রকাশভঙ্গীর এ পার্থক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এখানে হযরত আদম (আ)-কে শিক্ষকের এবং ফেরেশতাদেরকে শিক্ষার্থীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। যেখানে হযরত আদম (আ)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে বিশেষ ভঙ্গীতে প্রকাশ করা হয়েছে।

এ ঘটনা থেকে এ কথাও বোঝা গেল যে, ফেরেশতাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রেও হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। কেননা, যেসব বস্তুর জ্ঞান তাদের ছিল না, আদম (আ)-এর মাধ্যমে তাদেরকে কোন না কোন পর্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে সেসব বস্তুর জ্ঞানদান করা হয়েছে।

পৃথিবীর খেলাফত ঃ এ সব আয়াতের দ্বারা জানা গেল যে, রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা এবং সেখানে আল্লাহ্ পাকের বিধি-বিধান প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তাঁর পক্ষ থেকে কাউকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় বিধানের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। তা হলো এই যে, গোটা বস্তুজগত ও নিখিল বিশ্বের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই জন্য। কোরআন মজীদের বহু আয়াত একথা প্রমাণ করে। যেমন– إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ। (বিধান দানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ পাক।) لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ (নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্তৃত্ব তাঁরই।) أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (জেনে রেখো, তিনিই সৃষ্টিকর্তা ও বিধান দাতা।) প্রভৃতি আয়াত। পৃথিবীর শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে যুগে যুগে প্রতিনিধিবৃন্দের আগমন ঘটেছে। তাঁরা আল্লাহ্ পাকের অনুমতিক্রমে পৃথিবীর শাসনকার্য পরিচালনা এবং মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা ও দায়িত্বভার গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র বিধান প্রবর্তন করেছেন। খলীফার এ নিযুক্তি সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের

পক্ষ থেকে হয়। এক্ষেত্রে কারো চেষ্টা-তদ্‌বীর ও শ্রম-সাধনার কোন দখল নেই। এজন্যই গোটা উম্মতের সর্বসম্মত আকীদা বা বিশ্বাস রয়েছে যে, নবুয়ত লাভ চেষ্টা-তদ্‌বীরলব্ধ কোন বিষয় নয়, বরং আল্লাহ্ পাকই নিজস্ব ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুসারে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে এ কাজের জন্য বেছে নিয়ে তাঁদেরকে নবী-রসূল বা খলীফা নিযুক্ত করে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। কোরআনে হাকীমের বিভিন্ন জায়গায় এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে ঃ اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ (আল্লাহ্ পাক ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে আপন রাসূল বেছে নেন।) اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ (কাকে রিসালতের মর্যাদায় ভূষিত করবেন, আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন।)

এসব খলীফা সরাসরি আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে যাবতীয় নির্দেশ ও বিধানমালা প্রাপ্ত হয়ে বিশ্বে তা প্রবর্তন করেন। আল্লাহ্‌র খেলাফতের এ ধারা আদম (আ) থেকে আরম্ভ করে আখেরী নবী হুযূরে পাক (সা) পর্যন্ত একই পদ্ধতিতে চলে এসেছে। নবীকুল শিরমণি হুযূরে পাক (সা) বিশেষ গুণাবলী ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসহ সর্বশেষ খলীফারূপে দুনিয়ার বুকে তশরীফ আনেন। তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, পূর্ববর্তী নবীগণ বিশেষ সম্প্রদায় বা অঞ্চল বিশেষের জন্য প্রেরিত হতেন। তাঁদের খেলাফতের পরিধি ও শাসনক্ষমতা সেসব নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ও অঞ্চলসমূহের মধ্যেই গণ্ডিভূত থাকত। হযরত ইবরাহীম (আ) এক সম্প্রদায়ের প্রতি, হযরত লূত (আ) অপর এক সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। হযরত মূসা ও ঈসা (আ) ও এঁদের মধ্যবর্তী নবীগণ বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হন।

বিশ্বের সর্বশেষ খলীফা হুযূরে পাক (সা) ও তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ নবী করীম (সা) গোটা বিশ্ব ও মানব-দানব, তথা গোটা সৃষ্ট জগতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর ক্ষমতা ও অধিকার সারা বিশ্বের উভয় জাতির উপর পরিব্যাপ্ত ছিল। কোরআন পাক নিম্নোক্ত আয়াতে তাঁর নবুয়তকে বিশ্বব্যাপী বলে ঘোষণা করেছেন ঃ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ .

(আপনি ঘোষণা করে দিন, হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহ্ পাকের রসূল। আর আল্লাহ্ পাক হলেন সেই মহান সত্তা, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল যাঁর কর্তৃত্বাধীন।)

সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হুযূর (সা) ইরশাদ করেছেন, ছ'টি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাক আমাকে অন্য নবীগণের ওপর বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

১. আমাকে সমগ্র বিশ্বের নবী ও রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন।

২. পূর্ববর্তী নবীগণের খেলাফত যেমন বিশেষ সম্প্রদায় ও অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তেমনি ছিল এক নির্দিষ্ট যুগের জন্য। পরবর্তী নবী বা রসূলের আবির্ভাবের সাথে সাথে পূর্ববর্তী নবীর খেলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটত এবং পরবর্তী নবীর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হতো। আমাদের রাসূল (সা)-কে আল্লাহ্ পাক খাতামুল-আম্বিয়ারূপে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর খেলাফত কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।

৩. পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁদের প্রবর্তিত শরীয়ত ও বিধানমালা কিছুকাল পর্যন্ত সংরক্ষিত ও কার্যকরী থাকত। ধীরে ধীরে নানাবিধ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে তা প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে উপনীত হতো। ফলে সে সময়ে অন্য রাসূল বা নবী প্রেরণ করা হতো।

আমাদের রসূলের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর প্রবর্তিত বিধান ও শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত ও অপরিবর্তিত থাকবে। তাঁর ওপর অবতারিত কোরআন মজীদের (শব্দ ও অর্থ) সব কিছু হেফাজত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ পাক গ্রহণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ ٠

(নিশ্চয় আমিই কোরআন নাযিল করেছি এবং নিঃসন্দেহে আমি তার রক্ষণাবেক্ষণকারী।)

অনুরূপভাবে হুযূর পাক (সা)-এর শিক্ষা-দীক্ষা ও বাণীমালার সমষ্টি হাদীসশাস্ত্রের সংরক্ষণের জন্যও আল্লাহ্ পাক এক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি উম্মতের মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল বর্তমান রাখবেন, যারা তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও বাণীমালাকে প্রাণের চাইতে অধিক প্রিয় বলে মনে করবে। তারা তাঁর পরিত্যক্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার, আদর্শ ও শরীয়তী নির্দেশাবলী সঠিকভাবে মানুষের দ্বারে পৌঁছাতে থাকবে। কোন শক্তি বা ব্যক্তি এদলকে বিনষ্ট ও স্তব্ধ করতে পারবে না। তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ অদৃশ্য মদদ থাকবে।

সারকথা, পূর্ববর্তী নবীগণের গ্রন্থসমূহ ক্রমাগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং বিভিন্নভাবে অহেতুক হস্তক্ষেপের ফলে পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেত অথবা ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ অবস্থায় টিকে থাকত। কিন্তু হুযূর (সা)-এর ওপর নাযিলকৃত কোরআন এবং তাঁর বাণীর সমষ্টি হাদীস সব কিছুই সম্পূর্ণ ও যথাযথভাবে অবিকৃত ও অক্ষত অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। এজন্যই এ বিশ্বে তাঁর পরবর্তী সময়ে কিয়ামত পর্যন্ত না কোন নবী রাসূলের প্রয়োজন আছে, না আল্লাহ্ পাকের প্রতিনিধি আগমনের অবকাশ আছে।

পূর্ববর্তী নবীগণের খিলাফত একটি নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ সময়কাল পর্যন্ত বহাল থাকত। প্রত্যেক নবী-রাসূলের অন্তর্ধানের পর পরবর্তী নবী (খলীফা) আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হতেন এবং খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন।

কিন্তু হুযূর (সা)-এর খিলাফতকাল কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত মূলত তিনিই বিশ্বে আল্লাহ্র খলীফা বা প্রতিনিধি। তাঁর তিরোধানের পর যে ব্যক্তি প্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত হবেন, তিনি রাসূলের খলীফা বা প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হবেন। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে—হুযূর (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

كَانَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَاَنَّهُ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ ٠

(অর্থাৎ বনী-ইসরাঈলের নবীগণই রাজত্ব ও শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এক নবীর তিরোধানের পর অপর নবীর আগমন হতো। আর জেনে রেখো, আমার পরে কোন নবী-রসূল আসবে না। অবশ্য খলীফাগণের আবির্ভাব ঘটবে এবং তাদের সংখ্যা হবে অনেক।)

(৫) তাঁর পরে আল্লাহ্ পাক তাঁর উম্মত সমষ্টিকে এমন মর্যাদা দান করবেন, যা পূর্ববর্তী নবীগণকে দেওয়া হতো অর্থাৎ সমস্ত উম্মতকে নিষ্পাপ নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, তাঁর উম্মত কখনো বিপথ ও ভ্রান্ত নীতির উপর একত্রিত হবে না। গোটা উম্মত যে বিষয়ের উপর ঐকমত্য পোষণ করবে, তা আল্লাহ্র বিধান ও সিদ্ধান্তেরই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হবে। এজন্যও আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্র পর মুসলিম উম্মতের সম্মিলিত মতকে শরীয়তে দলীলের তৃতীয় ভিত্তি বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَنْ يَّجْتَمِعَ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ (আমার উম্মত কখনও ভ্রান্ত নীতির ওপর একত্রিত হবে না।) এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ সে হাদীসেও পাওয়া যায়, যাতে ইরশাদ হয়েছে ঃ আমার উম্মতের মধ্যে একদল সর্বদা সত্যের ওপর অটল থাকবে। দুনিয়ার যত পটপরিবর্তনই হোক, সত্য যতই নিষ্প্রভ ও দুর্বল হয়ে পড়ুক, কিন্তু আল্লাহ্র পথে সর্বতোভাবে নিবেদিত উম্মতের একদল সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পোষকতা করতেই থাকবে। এতে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সমগ্র উম্মত কখনো অসত্য ও ভ্রান্তির ওপর একত্রিত হবে না। আর যখন উম্মতের সমষ্টিকে নিষ্পাপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তখন রাসূলের খলীফা নির্বাচনের ক্ষমতাও সমষ্টিগতভাবে উম্মতের ওপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। হুযূরে পাক (সা)-এর পরবর্তীকালে বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব, রাষ্ট্রপরিচলনা ও আইন-শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্বে সমাসীন করার জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। উম্মত যাকে খিলাফতের জন্য নির্বাচিত করবে, তিনি রাসূলের খলীফা হিসেবে দেশের আইন-শৃংখলা বিধানের জন্য এককভাবে দায়ী থাকবেন। আর সমগ্র বিশ্বের খলীফা মাত্র একজনই হতে পারেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ যুগ পর্যন্ত খিলাফতের এ ধারা সঠিক নিয়মে অভ্রান্ত নীতির ওপর চলে আসছিল। এ কারণেই তাঁদের সিদ্ধান্তসমূহ কেবল ধর্মীয় ও সাময়িক সিদ্ধান্তের মর্যাদাই রাখে না, বরং তা এক সুদৃঢ় ও অভ্রান্ত সনদ এবং উম্মতের জন্য এক মৌলিক বিধান হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ সম্পর্কে হুযূর (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ (তোমরা আমার ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন যাপন পদ্ধতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ কর।)

খেলাফতে রাশেদার পরবর্তী অবস্থা ঃ খোলাফায়ে রাশেদীনের (ন্যায়নিষ্ঠ খলীফা চতুষ্টয়) পরবর্তীকালে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা ও দুর্বলতার সুযোগে উম্মতের মধ্যে অনৈক্য ও মতভেদের সূচনা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন আমীর তথা গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। তাঁদের মধ্যে কেউই খলীফার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না। তাঁদেরকে বড়জোর কোন অঞ্চল ও সম্প্রদায়বিশেষের আমীর (শাসক) বলা যেতে পারে। এরূপভাবে যখন কোন এক ব্যক্তির নেতৃত্বে মুসলিম জগতের ঐক্য ও সংহতি অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল এবং প্রতিটি দেশ ও সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক আমীর নিযুক্তির প্রথা প্রচলিত হলো, তখন মুসলমানগণ ইসলামী নীতি অনুসারে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের সমর্থনপুষ্ট ও সম্মতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করতে আরম্ভ করেন, যার সমর্থনে কোরআনের আয়াত وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ (পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।) পেশ করা যেতে পারে।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী শূরা (পরামর্শ) নীতির পার্থক্য ঃ বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আইন-পরিষদগুলো এই কর্মপদ্ধতিরই এক নমুনা। পার্থক্য শুধু এই যে, গণতান্ত্রিক দেশের আইন-পরিষদগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে থাকে। নিছক নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে ভাল-মন্দ, কল্যাণজনক বিধান প্রণয়নের ক্ষমতাই এর রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন পরিষদ (মজলিসে শূরা), তার সদস্যমণ্ডলী এবং নির্বাচিত আমীর সবাই সে মৌলিক আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন, যা তাঁরা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে রসূলের মাধ্যমে লাভ করেছেন। এ পরিষদ বা মজলিসে শূরার সদস্যপদ লাভের জন্য কিছু শর্তাবলী রয়েছে এবং এ পরিষদ যাকে নির্বাচিত করবে, তার জন্যও কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাদের আইন প্রণয়নের কাজও কোরআন ও সুন্নাহ্ বর্ণিত নীতিমালা আওতাধীনে সম্পন্ন করতে হবে। এর পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তাদের নেই।

সারকথা, আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে যে ইরশাদ করেছেন, "আমি বিশ্বের বুকে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করব"—এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের কতকগুলো মৌলিক ধারার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সেগুলো এই ঃ

(১) নিখিল বিশ্বের সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ্।

(২) পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বিধান ও নির্দেশাবলী প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের জন্য তাঁর রাসূলই হবেন তাঁর প্রতিনিধি বা খলীফা। আনুষঙ্গিকভাবে একথাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্‌র খেলাফতের ধারা যখন হুযূরে পাক (সা)-এর পরেই সমাপ্ত হয়ে গেছে, সুতরাং হুযূরের ওফাতের পর বর্তমান খলীফাই রাসূলের খেলাফতের ধারার স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং তিনি গোটা মিল্লাতের ভোট ও মতামতের মাধ্যমেই মনোনীত হবেন।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَ اسْتَكْبَرَ ٘ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

---

(৩৪) এবং যখন আমি হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি যখন সমস্ত ফেরেশতাকে (এবং জিন্ জাতিকে) নির্দেশ করলাম, যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (র)-এর কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। মোটকথা, এদের সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হলো ঃ আদম (আ)-এর সামনে সিজদায় পতিত হও। তখন ইবলীস ব্যতীত

সবাই সিজদায় পতিত হলো। আর সে নির্দেশ পালন করল না এবং অহংকারে গর্বিত হয়ে গেল। (ফলে) সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী ঘটনানুসারে ফেরেশতাদের চাইতে হযরত আদম (আ) অধিক মর্যাদার অধিকারী বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে। বিভিন্ন দলীলাদির দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, খেলাফতের যোগ্যতা লাভের জন্য যেসব জ্ঞানের প্রয়োজন, তা সবই আদম (আ)-এর রয়েছে। তবে এর কোন কোন জ্ঞান ফেরেশতাদেরও রয়েছে। কিন্তু জিন জাতি সেসব জ্ঞানের অত্যন্ত নগণ্য অংশই লাভ করেছে। এ সম্পর্কে উপরে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু হযরত আদম (আ)-এর মাঝে ফেরেশতা ও জিন উভয় সম্প্রদায়ের যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে, সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ পদমর্যাদা একেবারে সুস্পষ্ট। এখন আল্লাহ্ পাক এ বিষয়টি কার্যকরভাবে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলেন যে, ফেরেশতা ও জিনদের দ্বারা হযরত আদম (আ)-এর প্রতি এমন বিশেষ ধরনের সম্মান প্রদর্শন করানো হোক, যদ্দ্বারা কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি তাদের উভয়ের চাইতে উত্তম ও পূর্ণতর। এজন্য যে সম্মান প্রদর্শনমূলক কাজের প্রস্তাব করা হয়েছে, তারই বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ্ পাক বলেন, আমি ফেরেশতাদেরকে হুকুম করলাম ঃ তোমরা আদমকে সিজদা কর। সমস্ত ফেরেশতা সিজদায় পতিত হলো, কিন্তু ইবলীস সিজদা করতে অস্বীকার করল এবং অহংকারে স্ফীত হয়ে উঠল।

সিজদার নির্দেশ কি জিনদের প্রতিও ছিল ? ঃ এ আয়াতে বাহ্যত যে কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা এই যে, আদম (আ)-কে সিজদা করার হুকুম ফেরেশতাদেরকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন একথা বলা হলো যে, ইবলীস ব্যতীত সব ফেরেশতাই সিজদা করলেন, তখন তাতে প্রমাণিত হলো যে, সিজদার নির্দেশ সকল বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টির প্রতিই ছিল। ফেরেশতা ও জিন জাতি সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নির্দেশ প্রদান করতে গিয়ে শুধু ফেরেশতাদের উল্লেখ এজন্য করা হলো যে, তারাই ছিল সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন তাদেরকে হযরত আদম (আ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হলো, তাতে জিন জাতি অতি উত্তমরূপে এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত বলে জানা গেল।

সম্মান প্রদর্শনার্থ সিজদা করা পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য বৈধ থাকলেও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে ঃ এ আয়াতে হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করতে ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতামাতা ও ভাইরা মিসর পৌঁছার পর হযরত ইউসুফকে সিজদা করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। এটা সুস্পষ্ট যে, সিজদা ইবাদতের উদ্দেশ্যে হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের উপাসনা শিরক ও কুফরী। কোন কালে কোন শরীয়তে এরূপ কাজের বৈধতার কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। সুতরাং এর অর্থ এছাড়া অন্য কোন কিছুই হতে পারে না, প্রাচীনকালের সিজদা আমাদের কালের সালাম, মুসাফাহা, মুআনাকা, হাতে চুমো খাওয়া এবং সম্মান প্রদর্শনার্থ দাঁড়িয়ে যাওয়ার সমার্থক ও সমতুল্য ছিল। ইমাম জাস্সাস আহ্কামুল কোরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়তে বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সিজদা করা বৈধ ছিল। শরীয়তে

মুহাম্মদীতে তা রহিত হয়ে গেছে। বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি হিসাবে এখন শুধু সালাম ও মুসাফাহার অনুমতি রয়েছে। রুকূ-সিজদা ও নামাযের মত করে হাত বেঁধে দাঁড়ানোকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এর বিশ্লেষণ এই যে, শিরক্, কুফর ও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা কোন শরীয়তেই বৈধ ছিল না। কিন্তু কিছু কাজ এমনও রয়েছে যা মূলত শিরক বা কুফর নয়। কিন্তু মানুষের অজ্ঞানতা ও অসাবধানতার দরুন সে সমস্ত কার্য শিরক ও কুফরের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এসব কার্য পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়তে আদৌ নিষিদ্ধ ছিল না, বরং সেগুলোকে শিরকরূপে প্রতিপন্ন করা থেকে মানুষকে বিরত রাখা হতো মাত্র। যেমন, প্রাণীদের ছবি আঁকা ও ব্যবহার করা মূলত কুফর বা শিরক নয়। এজন্য পূর্ববর্তী শরীয়তে তা বৈধ ছিল। যেমন, হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ (এবং জিনেরা তার জন্য বড় বড় মিহরাব তৈরি করত এবং ছবি অংকন করত।)

অনুরূপভাবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে বৈধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষের অজ্ঞানতার ফলে এ সব বিষয়ই শিরক ও পৌত্তলিকতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পথেই নবীগণের দীন ও শরীয়তে বিকৃতি ও মূলচ্যুতি ঘটেছে। পরবর্তী নবী ও শরীয়ত এসে তা একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। শরীয়তে মুহাম্মদী যেহেতু অবিনশ্বর ও চিরন্তন শরীয়ত—রাসূলে করীম (সা)-এর মাধ্যমে যেহেতু নবুয়ত ও রিসালতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তাঁর শরীয়তই যেহেতু সর্বশেষ শরীয়ত, সেহেতু একে বিকৃতি ও মূলচ্যুতি থেকে বাঁচাবার জন্য এমন প্রতিটি ছিদ্রপথই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে শিরক ও পৌত্তলিকতা প্রবেশ করতে না পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সেসব বিষয়ই এ শরীয়তে হারাম করে দেওয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কোন যুগে শিরক ও প্রতিমা পূজার উৎস বা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছবি ও চিত্রাঙ্কন এবং তার ব্যবহারও এজন্যই হারাম করা হয়েছে। সম্মান প্রদর্শনমূলক সিজদা একই কারণে হারাম হয়েছে। আর এমন সব সময়ে নামায পড়াও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যেসব সময়ে মুশরিক ও কাফিরগণ নিজেদের তথাকথিত উপাস্যদের পূজা ও উপাসনা করত। কারণ এ বাহ্যিক সাদৃশ্য পরিণামে যেন শিরকের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে, হুযূর (সা) মানবদেরকে নির্দেশ দেন, তারা যেন নিজেদের গোলামকে 'আবদ' অর্থাৎ দাস বলে না ডাকে এবং গোলামদের প্রতি নির্দেশ দেন, যেন তারা মনিবদেরকে 'রব' বা প্রভু বলে না ডাকে। অথচ শাব্দিক অর্থে 'আবদ' অর্থ গোলাম এবং 'রব' অর্থ লালন-পালনকারী। এ ধরনের শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ না হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু নিছক এ কারণে যে, এসব শব্দ শিরকের ধারণা সৃষ্টি করতে পারে এবং পরবর্তীকালে এসব শব্দের কারণেই মনিবদেরকে পূজা করার পথ খুলে যেতে পারে; কাজেই এসব শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ ও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সারকথা আদম (আ)–এর প্রতি ফেরেশতা ও জিনদের সিজদা এবং ইউসুফ (আ)-এর প্রতি তাঁর পিতা-মাতা ও ভাইদের সিজদা—যার বর্ণনা কোরআন পাকে রয়েছে, সম্মান প্রদর্শনমূলক সিজদা ছিল—যা তাদের শরীয়তে সালাম,

মুসাফাহা এবং হাতে চুমো খাওয়ার পর্যায়ভুক্ত ও বৈধ ছিল। শরীয়তে মুহাম্মদীকে পরিপূর্ণভাবে শির্‌কমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে এ শরীয়তে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অপর কাউকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা বা রুকূ করাকেও অবৈধ ও হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

কতক উলামা বলেছেন, ইবাদতের মূল যে নামায তাতে চার রকমের কাজ রয়েছে। যথা—দাঁড়ানো, বসা, রুকূ ও সিজদা করা। তন্মধ্যে প্রথম দু'টি মানুষ অভ্যাসগতভাবে নিজস্ব প্রয়োজনেও করে এবং নামাযের মধ্যে ইবাদত হিসাবেও করে। কিন্তু রুকূ-সিজদা এমন কাজ যা মানুষ কখনো অভ্যাসগতভাবে করে না, বরং তা শুধু ইবাদতের জন্যই নির্দিষ্ট। এ জন্য এ দু'টোকে শরীয়তে মুহাম্মদীতে ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত করে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে তা করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, সিজদায়ে তা'জিমী বা সম্মানসূচক সিজদার বৈধতার প্রমাণ তো কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াতসমূহে পাওয়া যায়, কিন্তু তা রহিত হওয়ার দলীল কি?

উত্তর এই যে, রাসূলে করীম (সা)-এর অনেক 'মোতাওয়াতের' ও মশহুর হাদীস দ্বারা সিজদায়ে তা'জিমী হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে। হুযূর (সা) এরশাদ করেছেন, যদি আমি আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো প্রতি সিজদায়ে-তা'জিমী করা জায়েয মনে করতাম, তবে স্বামীকে সিজদা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম। কিন্তু এই শরীয়তে সিজদায়ে তা'জিমী সম্পূর্ণ হারাম বলে কাউকে সিজদা করা কারো পক্ষে জায়েয নয়।

এই হাদীস বিশজন সাহাবীর রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "তাদরীবুর রাবী"-তে বর্ণনা করা হয়েছে, যে রেওয়ায়েত দশজন সাহাবী নকল করে থাকেন, সেটি হাদীসে মোতাওয়াতেরার পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় যা (হাদীসে মোতাওয়াতের) কোরআন পাকের ন্যায়ই অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য।

মাস'আলা ঃ ইবলীসের কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া কোন কর্মগত নাফরমানীর কারণে ছিল না। কেননা, কোন ফরয কার্যগতভাবে পরিত্যাগ করা শরীয়তের বিধানানুযায়ী পাপ হলেও কুফরী নয়। ইবলীসের কাফির হয়ে যাওয়ার মূল কারণ ছিল আল্লাহ্ পাকের হুকুমের বিরোধিতা ও মোকাবিলা করা। অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্) যার প্রতি সিজদা করতে আমাকে হুকুম করেছেন, সে আমার সিজদা লাভের যোগ্যই নয়, এমন হঠকারিতা নিঃসন্দেহে কুফরী।

মাস'আলা ঃ এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে, ইবলীস তার অসাধারণ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-গরিমার দৌলতে ফেরেশতাদের শিরোমণি ও উস্তাদ বলে আখ্যায়িত হয়েছিল। তার দ্বারা এ ধরনের দৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ কিভাবে সম্ভব হলো? কোন কোন উলামা বলেছেন যে, তার গর্ব অহংকারের দরুন আল্লাহ্ পাক নিজ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও জ্ঞানবুদ্ধির মহাসম্পদ প্রত্যাহার করে নেন। ফলে সে এ ধরনের অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতাজনিত কাজ করে বসে। কেউ কেউ বলেছেন যে, ইবলীস খ্যাতির মোহ ও আত্মম্ভরিতার কারণে সত্যোপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও এই দুর্ভোগ ও অভিশাপে জড়িয়ে পড়েছিল। তফসীরে রুহুল মা'আনী-তে এ প্রসঙ্গে একটি কবিতা উদ্ধৃত করা হয়েছে, যার সারসংক্ষেপ এই যে, "কোন কোন সময় কোন পাপের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্ পাকের

সাহায্য-সহানুভূতি মানুষের সাথে ছেড়ে দেয়। তখন তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ও প্রত্যেকটি কাজ তাকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দেয়।"

উক্ত তফসীর দ্বারা একথাও প্রমাণ করা হয়েছে যে, মানুষের সে ঈমানই নির্ভরযোগ্য ও ফলদায়ক, যা শেষ জীবন ও পরকালের প্রথম ঘাঁটি (কবর) পর্যন্ত সাথে থাকে। সুতরাং উপস্থিত ঈমান, আমল, জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ওপর আনন্দিত ও গর্বিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا

وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ

عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

---

(৩৫) এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। (৩৬) অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি (হযরত) আদম (আ)-কে তাঁর স্ত্রীসহ বেহেশতে বসবাস করতে নির্দেশ দিলাম। (যে স্ত্রীকে আল্লাহ্ পাক স্বীয় কুদরতে হযরত আদমের পাঁজর থেকে নেওয়া কোন উপকরণ দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন।) অনন্তর তোমরা এখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে থাক, কিন্তু ও গাছের নিকটেও যেও না। অন্যথায় তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যারা নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে। (সেটা কি গাছ ছিল, আল্লাহ্ পাকই জানেন। যাক তা থেকে বারণ করা হয়েছিল। আর প্রভুর এ ক্ষমতা থাকে যে, নিজ বাড়ির যে সব জিনিস অনুগত দাসকে ভোগ করতে দিতে চান ভোগ করতে দেন এবং যা না চান তা থেকে বারণ করেন।) অতঃপর সে গাছের কারণে শয়তান আদম ও হাওয়াকে পদস্খলিত করে দিল এবং তাঁরা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন তা থেকে তাদেরকে পৃথক করে দিল। অনন্তর আমি তাদেরকে নীচে নেমে যেতে বললাম ঃ তোমাদের মধ্যে পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে। তোমাদের এক

নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করতে হবে এবং কাজকর্ম চালাতে হবে। (অর্থাৎ সেখানেও স্থায়িভাবে থাকতে পারবে না। কিছুকাল পর সে অবস্থান ছাড়তে হবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এটা আদম (আ)-এর ঘটনার সমাপ্তিপর্ব। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশ্ব খেলাফতের যোগ্যতা যখন স্পষ্ট করে বলে দেয়া হলো এবং ফেরেশতাগণও তা মেনে নিলেন আর ইবলীস যখন আত্মম্ভরিতা ও হঠকারিতার দরুন কাফির হয়ে বেরিয়ে গেল, তখন হযরত আদম (আ) এবং তাঁর সহধর্মিণী হাওয়া (আ) এ নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন যে, তোমরা জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং সেখানকার নিয়ামত পরিতৃপ্তিসহ ভোগ করতে থাক। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট গাছ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, এর কাছেও যেও না। অর্থাৎ সেটির ভোগ পূর্ণভাবে পরিহার করবে। শয়তান আদম (আ)-এর কারণে ধিক্কৃত ও অভিশপ্ত হয়েছিল। যে কোন প্রকারে সুযোগ পেয়ে এবং এ গাছের উপকারাদি বর্ণনা করে তাঁদের উভয়কে সে গাছের ফল খেতে প্ররোচিত করল। নিজেদের বিচ্যুতির দরুন তাঁদেরকেও পৃথিবীতে নেমে যেতে নির্দেশ দেয়া হলো। তাঁদেরকে বলে দেয়া হলো যে, পৃথিবীতে বসবাস জান্নাতের মত নির্ঝঞ্ঝাট ও শান্তিপূর্ণ হবে না, বরং সেখানে মতানৈক্য ও শত্রুতার উন্মেষ ঘটবে। ফলে বেঁচে থাকার স্বাদ পূর্ণভাবে লাভ করতে পারবে না।

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (এবং আমি আদম (আ)-কে সস্ত্রীক জান্নাতে অবস্থান করতে নির্দেশ দিলাম।) এটা আদম সৃষ্টি ও ফেরেশতাদের সিজদার পরবর্তী ঘটনা। কোন কোন বিশেষজ্ঞ এ নির্দেশ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আদম সৃষ্টি ও সিজদার ঘটনা জান্নাতের বাইরে অন্য কোথাও ঘটেছিল। এর পরে তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছে। কিন্তু এ অর্থও সুনিশ্চিত নয়। বরং এমনও হতে পারে যে, সৃষ্টি ও সিজদা উভয় ঘটনা বেহেশতেই ঘটেছিল, কিন্তু তাঁদের বাসস্থান কোথায় হবে সে সম্পর্কে তাদেরকে কোন সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। তাঁদের বাসস্থান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ঘটনার পর শোনানো হলো।

وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا — رَغَدًا আরবী অভিধান অনুযায়ী নিয়ামত ও আহার্যবস্তু বলতে সেই সব নিয়ামত ও আহার্যবস্তুকে বলা হয়, যা লাভ করতে কোন শ্রমসাধনার প্রয়োজন হয় না এবং এত পর্যাপ্ত ও ব্যাপক পরিমাণে লাভ হয় যে, তাতে হ্রাসপ্রাপ্তি বা নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার কোন আশংকাই থাকে না। অর্থাৎ–আদম ও হাওয়া (আ)-কে বলা হলো যে, তোমরা জান্নাতের ফলমূল পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করতে থাক। ওগুলো লাভ করতে হবে না এবং তা হ্রাস পাবে কিংবা শেষ হয়ে যাবে, এমন কোন চিন্তাও করতে হবে না।

وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ—কোন বিশেষ গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছিল যে, এর নিকটে যেও না। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, সে গাছের ফল না খাওয়া। কিন্তু তাকীদের জন্য বলা হয়েছে, কাছেও যেও না। সেটি কি গাছ ছিল, কোরআন করীমে তা উল্লেখ করা হয়নি। কোন নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারাও তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। কোন কোন মুফাস্‌সির সেটিকে গমের গাছ বলেছেন, আবার কেউ কেউ আঙুর গাছ বলেছেন। অনেকে বলেছেন, আঞ্জীরের গাছ। কিন্তু কোরআন ও হাদীসে যা অনির্দিষ্ট রেখে দেয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট করার কোন প্রয়োজন পড়ে না।

فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ—যদি এই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাও, তবে তোমরা উভয়েই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

فَازَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا — زلة শব্দের অর্থ বিচ্যুতি বা পদস্খলন। অর্থাৎ শয়তান আদম ও হাওয়াকে পদস্খলিত করেছিল বা তাঁদের বিচ্যুতি ঘটিয়েছিল। কোরআনের এ সব শব্দে পরিষ্কার এ কথা বোঝা যায় যে, আদম ও হাওয়া কর্তৃক আল্লাহ্ পাকের হুকুম লঙ্ঘন সাধারণ পাপীদের মত ছিল না বরং শয়তানের প্রতারণায় প্রতারিত হয়েই তাঁরা এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। পরিণামে যে গাছের ফল নিষিদ্ধ ছিল, তা খেয়ে বসলেন।

এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, যখন সিজদা না করার কারণে শয়তানকে অভিশপ্ত করে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হলো তখন আদম (আ)-কে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে কিভাবে সে বেহেশ্তে পৌঁছলো ? এর সুস্পষ্ট জওয়াব এই যে, শয়তানের প্রতারণার এবং বেহেশতে পৌঁছার অনেক রূপ হতে পারে। হয়ত সাক্ষাৎ ব্যতীতই তাঁদের অন্তঃকরণে প্রবঞ্চনা ঢেলে দিয়েছিল, কিংবা এমনও হতে পারে যে, শয়তান জিন জাতিভুক্ত বলে আল্লাহ্ পাক তাকে এমন সব কাজের ক্ষমতা দান করেছেন, যা সাধারণত মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাদের বিভিন্ন আকৃতি ধারণের ক্ষমতা রয়েছে। হতে পারে, দানবীয় ক্ষমতাবলে বা সম্মোহনী শক্তির মাধ্যমে আদম ও হাওয়ার মনকে প্রভাবান্বিত ও প্রতিক্রিয়াগ্রস্ত করে ফেলেছিল। আবার এমনও হতে পারে যে, অন্য কোন রূপে—যেমন, সাপ প্রভৃতির আকৃতি ধারণ করে শয়তান জান্নাতে প্রবেশ করেছিল। সম্ভবত এ কারণেই তার শত্রুতার প্রতি হযরত আদম (আ)-এর কোন লক্ষ্যই ছিল না। কোরআন মজীদের আয়াত وَقَاسَمَهُمَا اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ (শয়তান তাঁদেরকে কসম করে বলল যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কল্যাণকামী ও সদুপদেশদানকারী।) এ আয়াত দ্বারাও একথাই বোঝা যায় যে, শয়তান শুধু প্রবঞ্চনা ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং আদম ও হাওয়াকে মৌখিক কথার মাধ্যমে এবং কসম দিয়ে দিয়েও প্রভাবিত করেছে।

فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ –অর্থাৎ—শয়তান এই প্রবঞ্চনা ও পদস্খলনের দ্বারা আদম ও হাওয়া (আ)-কে সেসব নিয়ামতাদি থেকে পৃথক করে দিল, যেগুলোর মাঝে তাঁরা অতি স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করছিলেন। এই বের করা যদিও আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী হয়েছিল, কিন্তু এর কারণ যেহেতু ছিল শয়তান, সুতরাং বের করাকে শয়তানের সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ –অর্থাৎ 'আমি তাদেরকে হুকুম করলাম তোমরা নীচে নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু থাকবে।' এ নির্দেশে হযরত আদম ও হাওয়াকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর সে সময় পর্যন্ত যদি শয়তানকে আসমান থেকে বের করে না দেয়া হয়ে থাকে, তবে সেও এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক্ষেত্রে পারস্পরিক শত্রুতার অর্থ এই যে, শয়তানের সাথে তোমাদের শত্রুতা দুনিয়াতেও সমভাবেই বলবৎ থাকবে। আর যদি এ ঘটনার পূর্বেই শয়তান বিতাড়িত হয়ে থাকে, তবে বাক্যের সম্বোধন আদম ও হাওয়া (আ) এবং তাঁদের বংশধরদের প্রতি হবে। যার অর্থ হবে এই যে, তাঁদের এক শাস্তি তো এই হলো যে, তাঁদেরকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হলো। এরই সাথে দ্বিতীয় শাস্তি

এই যে, তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা থাকবে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা বিরাজ করলে পিতা-মাতার বেঁচে থাকার আকর্ষণ বিদায় নেয় এবং জীবনের মাধুর্য লোপ পায়। তাই এটাও এক প্রকারের আভ্যন্তরীণ ও মনস্তাত্ত্বিক শাস্তি। وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ অর্থাৎ–আদম ও হাওয়ার প্রতি ইরশাদ হয়েছে, তোমাদেরকে পৃথিবীতে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করতে হবে এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত কাজ-কর্ম সম্পন্ন করতে হবে। কিছুকাল পর এ অবস্থানও ছেড়ে যেতে হবে।

উল্লিখিত আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট মাস'আলা ও শরীয়তের বিধান

اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক।) এ আয়াতে হযরত আদম ও হাওয়া (আ) উভয়ের জন্য জান্নাতকে বাসস্থান বানানোর কথা বলা হয়েছে। যা সংক্ষিপ্ত শব্দে এভাবেও বলা যেতো اُسْكُنَا الْجَنَّةَ (আপনারা উভয়ে বেহেশতে বসবাস করুন। যেমন, এরপরে كُلَا এবং لَا تَقْرَبَا-এর মধ্যে দ্বিবচনমূলক একই ক্রিয়ায় উভয়কে একত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে এর বিপরীতভাবে اَنْتَ وَزَوْجُكَ শব্দসমূহ গ্রহণ করে প্রত্যক্ষভাবে শুধু আদম (আ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে যে, আপনার স্ত্রীও যেন জান্নাতে বসবাস করেন। এ দ্বারাও দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথমত স্ত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব স্বামীর উপর, দ্বিতীয়ত বসবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর অধীন। যে বাড়িতে স্বামী বসবাস করবে, সে বাড়িতেই স্ত্রীর বসবাস করা উচিত।

মাসআলা ঃ اُسْكُنْ শব্দে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, সে সময়ে হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-এর জান্নাতবাস ছিল নিতান্তই সাময়িক; ফেরেশতাদের মত স্থায়ী ছিল না। কেননা اُسْكُنْ শব্দের অর্থ, সে বাড়িতে বসবাস করতে থাক। তাঁদেরকে একথা বলা হয়নি যে, এ বাড়ি তোমাদেরকে দিয়ে দেয়া হলো, সুতরাং এটা তোমাদেরই বাড়ি। কারণ একথা আল্লাহ্ পাকের জানা ছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, যাতে আদম ও হাওয়া (আ)-কে জান্নাতের আবাস পরিত্যাগ করতে হবে। অধিকন্তু জান্নাতের অধিকার ঈমান এবং সৎকর্মের বিনিময়ে লাভ করা যায়, যা কিয়ামতের পরে হবে। এর দ্বারা ফকীহগণ এ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে বলে, আমার বাড়িতে বসবাস করতে থাক বা আমার এ বাড়ি তোমার বাসস্থান, তবে এর ফলে সে ব্যক্তির জন্য বাড়ির স্বত্ব বা স্থায়ী অধিকার লাভ হয় না।

খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর অনুসারী নয় ঃ

وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا অর্থাৎ–'তোমরা উভয়ে জান্নাতে অতি স্বাচ্ছন্দ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাও-দাও। এখানে পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে শুধু আদম (আ)-কে সম্বোধন করা হয়নি, বরং উভয়কে একই শব্দের অন্তর্ভুক্ত করে كُلَا (উভয়ে খাও) বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর অনুসারী ও অধীন নয়। স্বামী যেমন নিজস্ব ইচ্ছানুসারে প্রয়োজন ও চাহিদা মত খাবার ব্যবহার করবে, তেমনি স্ত্রীও নিজ চাহিদা ও ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করবে।

যে কোন স্থানে চলাফেরার স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার ঃ

رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا — رَغَدًا শব্দে খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য ও ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যে জিনিস যত ইচ্ছা খেতে পার। শুধু একটি গাছ ছাড়া অন্য কোন বস্তুতে কোন

বাধা-নিষেধ নেই। شِئْتُمَا শব্দের দ্বারা স্থান ও জায়গার ব্যাপকতা ও পর্যাপ্ততা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র জান্নাত যেখানে খুশি, যেমন করে খুশি ভোগ করবে। গমনাগমনে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গতিবিধি এবং বিভিন্ন স্থান থেকে নিজের প্রয়োজনাদি মেটাবার স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। যদি একটা সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট বাড়ি বা জায়গায় প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাবার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়, কিন্তু সেখান থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ থাকে, তবে তাও এক প্রকারের বন্দীদশা। এজন্য হযরত আদম (আ)-কে খাওয়া-পরার যাবতীয় বস্তু প্রচুর ও পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়নি, বরং حَيْثُ شِئْتُمَا (যেখানে এবং যত ইচ্ছা) বলে তাদেরকে চলাফেরা এবং সর্বত্র যাতায়াতের স্বাধীনতাও প্রদান করা হয়েছে।

মাধ্যমসমূহ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় ঃ

وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ অর্থাৎ "এ গাছের ধারে-কাছেও যেও না।" এ বারণের ফলে একথা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে বৃক্ষের ফল না খাওয়াই ছিল এই নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু সাবধানতাসূচক নির্দেশ ছিল এই যে, সে গাছের কাছেও যেও না। এর দ্বারাই ফিকাহ্ শাস্ত্রের কারণ-উপকরণের নিষিদ্ধতার মাসআলাটি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ কোন বস্তু নিজস্বভাবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ না হলেও যখন তাতে এমন আশংকা থাকে যে, ঐ বস্তু গ্রহণ করলে অন্য কোন হারাম ও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিতে পারে, তখন ঐ বৈধ বস্তুও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। যেমন, গাছের কাছে যাওয়া তার ফল-ফসল খাওয়ার কারণও হতে পারতো। সেজন্য তাও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। একে ফিকাহ্শাস্ত্রের পরিভাষায় سد ذرائع (উপকরণের নিষিদ্ধতা) বলা হয়।

নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া ঃ এ বর্ণনার দ্বারা হযরত আদম (আ)-কে বিশেষ গাছ বা তার ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারেও সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত করে না দেয়। এতদসত্ত্বেও হযরত আদম (আ)-এর তা খাওয়া বাহ্যিকভাবে পাপ বলে গণ্য। অথচ নবীগণ পাপ থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র। সঠিক তথ্য এই যে, নবীগণের যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকার কথা যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা এবং লিখিত ও বর্ণনাগতভাবে প্রমাণিত। চার ইমাম ও উম্মতের সম্মিলিত অভিমতেও নবীগণ ছোট-বড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

কারণ, নবী (আ)-দেরকে গোটা মানব জাতির অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। যদি তাঁদের দ্বারাও আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছার পরিপন্থী ছোট-বড় কোন পাপ কাজ সম্পন্ন হতো, তবে নবীদের বাণী ও কার্যাবলীর উপর আস্থা ও বিশ্বাস উঠে যেত এবং তাঁরা আস্থাভাজন থাকতেন না। যদি নবীদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে, তবে দীন ও শরীয়তের স্থান কোথায় ? অবশ্য কোরআন পাকের বহু আয়াতে অনেক নবী (আ) সম্পর্কে এ ধরনের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের দ্বারাও পাপ সংঘটিত হয়েছে এবং আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এজন্য তাঁদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। হযরত আদম (আ)-এর ঘটনাও এ শ্রেণীভুক্ত।

এ ধরনের ঘটনাবলী সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, কোন ভুল বোঝাবুঝি বা অনিচ্ছাকৃত কারণে নবীদের দ্বারা এ ধরনের কাজ সংঘটিত হয়ে থাকবে। কোন নবী (আ) জেনেশুনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্ পাকের হুকুমের পরিপন্থী কোন কাজ করেন নি। এ ত্রুটি ইজতেহাদগত ও অনিচ্ছাকৃত–এবং তা ক্ষমাযোগ্য। শরীয়তের পরিভাষায় একে পাপ বলা চলে না এবং এ ধরনের ভ্রান্তিজনিত ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সেসব বিষয়ে হতেই পারে না, যার সম্পর্ক শিক্ষা-দীক্ষা এবং শরীয়তের প্রচারের সাথে রয়েছে, বরং তাঁদের ব্যক্তিগত কাজকর্মে এ ধরনের ভুল-ত্রুটি হতে পারে।

কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ পাকের দরবারে নবীদের স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে এবং যেহেতু মহান ব্যক্তিদের দ্বারা ক্ষুদ্র ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হলেও তাকে অনেক বড় মনে করা হয়, সেহেতু কোরআন হাকীমে এ ধরনের ঘটনাবলীকে অপরাধ ও পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো আদৌ পাপ নয়।

হযরত আদম (আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে তফসীরবিদরা বহু কারণ বর্ণনা করেছেন এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ

১. হযরত আদম (আ)-কে যখন নিষেধ করা হয়েছিল, তখন এক বিশেষ গাছের প্রতি ইঙ্গিত করেই তা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে শুধুমাত্র সে গাছটিই উদ্দেশ্য ছিল না ; বরং সে জাতীয় যাবতীয় গাছই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) এক খণ্ড রেশমী কাপড় ও এক খণ্ড স্বর্ণ হাতে নিয়ে এরশাদ করলেন, এ বস্তু দু'টি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্যে হারাম। একথা সুস্পষ্ট যে, হুযূর (সা)-এর হাতের ঐ বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণখণ্ডের ব্যবহারই শুধু হারাম ছিল না বরং যাবতীয় রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ সম্পর্কেই ছিল এ হুকুম। কিন্তু এখানে হয়তো এ ধারণাও হতে পারে যে, এ নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক সেই বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যেগুলো সে সময় তাঁর হাতে ছিল। অনুরূপভাবে হযরত আদম (আ)-এর হয়তো এ ধারণা হয়েছিল যে, যে গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে নিষেধ করা হয়েছিল, নিষেধের সম্পর্ক শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শয়তান এ ধারণা তাঁর অন্তরে সঞ্চার করে বদ্ধমূল করে দিয়েছিল এবং কসম খেয়ে খেয়ে বিশ্বাস জন্মিয়েছিল যে, "যেহেতু আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, অতএব, আমি তোমাদেরকে এমন কোন কাজের পরামর্শ দিচ্ছি না, যা তোমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। যে গাছ সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে, সেটি অন্য গাছ।"

তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, শয়তান এ প্রবঞ্চনা তাঁর অন্তঃকরণে ঢেলে দিয়েছিল যে, এ গাছ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা আপনার সৃষ্টির সূচনাপর্বের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। যেমন, সদ্যজাত শিশুকে জীবনের প্রথম পর্যায়ে শক্ত ও গুরুপাক আহার থেকে বিরত রাখা হয়। কিন্তু সময় ও শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে সব ধরনের আহার গ্রহণের অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং আপনি এখন শক্ত-সমর্থ হয়েছেন ; এখন সে বিধি-নিষেধ কার্যকর নয়।

আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, শয়তান যখন হযরত আদম (আ)-কে সে গাছের উপকারিতা ও গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছিল, যেমন–সে গাছের ফল খেয়ে আপনি অনন্তকাল নিশ্চিন্তে জান্নাতের নেয়ামতাদি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারবেন, তখন তাঁর সৃষ্টির প্রথম পর্বে সে গাছ সম্পর্কে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কথা তাঁর মনে ছিল না। কোরআন মজীদের

فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (অর্থাৎ, আদম [আ] ভুলে গেলেন এবং আমি তাঁর মধ্যে [সংকল্পের] দৃঢ়তা পাইনি) আয়াতও এ সম্ভাব্যতা সমর্থন করে।

যা হোক, এ ধরনের বহু সম্ভাবনা থাকতে পারে। তবে সারকথা এই যে, হযরত আদম (আ) বুঝে-শুনে, ইচ্ছাকৃতভাবে এ হুকুম অমান্য করেন নি, বরং তিনি ভুল করেছিলেন বা তাঁর ইজতেহাদগত বিচ্যুতি ঘটেছিল, যা প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ নয়। কিন্তু হযরত আদম (আ)-এর শানে-নবূয়ত এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চ-মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিচ্যুতিকেও যথেষ্ট বড় মনে করা হয়েছিল। আর কোরআন মজীদ সেজন্যই একে পাপ বলে অভিহিত করেছে। অবশ্য আদম (আ)-এর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পর তা মাফ করে দেওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

এ বিতর্ক অনাবশ্যক যে, শয়তান জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আদম (আ)-কে প্রতারিত করার জন্য কিভাবে আবার সেখানে প্রবেশ করল। কারণ শয়তানের প্রবঞ্চনার জন্য জান্নাতে প্রবেশের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ পাক শয়তান ও জ্বিন জাতিকে দূরে থেকেও প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে এ প্রশ্ন যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-কে পূর্বাহ্নেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমাদেরকে দিয়ে যেন এমন কোন কাজ করিয়ে না বসে, যে কারণে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হতে হয়। এতদসত্ত্বেও হযরত আদম (আ) শয়তান কর্তৃক কেমন করে প্রতারিত হলেন ? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ পাক জ্বিন ও শয়তানকে বিভিন্ন আকার ও অবয়বে আত্মপ্রকাশের শক্তি দিয়েছেন। হতে পারে, সে এমন রূপ ধারণ করে সামনে এসেছিল যে, হযরত আদম (আ) বুঝতেই পারেন নি যে, সে-ই শয়তান।

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

(৩৭) অতঃপর হযরত আদম (আ) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ্য করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। (৩৮) আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন

কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে। (৩৯) আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী, অনন্তকাল সেখানে থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর হযরত আদম (আ) তাঁর পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, (অর্থাৎ বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশক বাক্য যা আল্লাহ্ পাকের নিকট থেকেই লাভ করেছিলেন। হযরত আদম (আ)-এর অনুশোচনার কারণে আল্লাহ্ পাকের রহমত ও কৃপাদৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলো এবং তিনি নিজেই বিনয় ও প্রার্থনারীতি সম্বলিত বাক্যাবলী তাঁকে শিখিয়ে দিলেন।) তখন আল্লাহ্ পাক তাঁর দিকে করুণার সাথে লক্ষ্য করলেন। আল্লাহ্ পাক নিঃসন্দেহে তওবা কবূলকারী এবং অতি মেহেরবান। (হযরত হাওয়া [আ]-এর তওবার বিবরণ সূরা আ'রাফে বর্ণিত রয়েছে। قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا- (তাঁরা উভয়ে বললেন, হে মহান পরওয়ারদেগার, আমরা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি)-এর দ্বারা বোঝা গেল যে, তিনিও তওবা ও তওবা কবূলের ক্ষেত্রে হযরত আদমের সাথে শরীক ছিলেন। কিন্তু ক্ষমা করার পরেও পৃথিবীতে নেমে যাওয়ার নির্দেশ রহিত হলো না, তাতে বহু রহস্য ও মঙ্গল নিহিত ছিল। অবশ্য এর রূপ পাল্টে গেল। কেননা প্রথমবারে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ ছিল শাসকোচিত –শাস্তিরূপে। আর এবারকার নির্দেশ ছিল অসীম তত্ত্ব ও রহস্যবিদ ও মহাজ্ঞানীসুলভ পদ্ধতিতে। তাই এরশাদ হলো, 'আমি তাঁদের সবাইকে জান্নাত থেকে নিচে নেমে যেতে বললাম। পরে যদি তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত (অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে কোন শরীয়তী বিধানমালা) পৌঁছে, তখন যে ব্যক্তি আমার এ হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয়ের কারণ নেই এবং পরিণামে এরা সন্তাপগ্রস্ত হবে না।' (অর্থাৎ তারা কোন ভয়াবহ ঘটনার সম্মুখীন হবে না। অবশ্য কিয়ামতের বিভীষিকাময় ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়া এর পরিপন্থী নয়। যেমন, সহীহ্ হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের ভয় ও ত্রাস সাধারণভাবে সবার উপরই নিপতিত হবে। কোন বিপদাপদে আক্রান্ত হলে মনের যে অবস্থা হয়, তাকে حزن [হুয্‌ন] বলা হয়। আর حزن [ভয়] সর্বদা বিপদে নিপতিত হওয়ার পূর্বে সঞ্চারিত হয়। এখানে আল্লাহ্ পাক ভয় ও সন্তাপ উভয়ই নিষেধ করে দিয়েছেন। কেননা, তাদের উপর এমন কোন বিপদাপদ বা দুঃখ-কষ্ট আপতিত হবে না, যার কারণে তারা ভীত বা শংকাগ্রস্ত হতে পারে)। আর যারা কুফরী করবে এবং আমার বিধানমালাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পাবে তারা জাহান্নামবাসী হবে এবং অনন্তকাল সেখানে অবস্থান করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শয়তানের প্রবঞ্চনা, হযরত আদম (আ)-এর পদস্খলন এবং পরিণতিস্বরূপ জান্নাত থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশের বিবরণ ছিল। হযরত আদম (আ) ইতিপূর্বে কখনও এ ধরনের শাসন ও কোপদৃষ্টির সম্মুখীন হননি। তিনি এমন পাষাণচিত্তও ছিলেন না যে, বেমালুম তা সয়ে যেতে পারেন। তাই চরমভাবে বিচলিত হয়ে মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। কিন্তু নবীসুলভ প্রজ্ঞাদৃষ্টি এবং সে কারণে চরমভাবে সঞ্চারিত ভীতির দরুন মুখ থেকে কোন কথাই বের হচ্ছিল না। ক্ষমা

ভিক্ষা মর্যাদার পরিপন্থী বিবেচিত হয়ে অধিক শাস্তি ও কোপানলের কারণরূপে পরিগণিত হতে পারে এমন আশংকায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতবাক হয়ে বসে থাকেন। মহান আল্লাহ্ অন্তর্যামী এবং অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়। এ করুণ অবস্থা দেখে স্বতঃপ্রণো হয়ে আল্লাহ্ পাক ক্ষমা প্রার্থনা রীতিসম্বলিত কয়েকটি বচন তাঁদেরকে শিখিয়ে দিলেন। তারই বর্ণনা এ আয়াতসমূহে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আ) স্বীয় প্রভুর কাছ থেকে কয়েকটি শব্দ লাভ করলেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁদের প্রতি করুণাভরে লক্ষ্য করলেন। (অর্থাৎ তাঁদের তওবা গ্রহণ করে নিলেন, নিঃসন্দেহে তিনি মহা ক্ষমাশীল এবং অতি মেহেরবান।) কিন্তু যেহেতু পৃথিবীতে আগমনের মধ্যে আরও অনেক রহস্য ও কল্যাণ নিহিত ছিল–যেমন, তাঁদের বংশধরদের মধ্য থেকে ফেরেশতা ও জ্বিন জাতির মাঝে এক নতুন জাতি–'মানব' জাতির আবির্ভাব ঘটা, তাদেরকে এক ধরনের কর্ম-স্বাধীনতা দিয়ে তাদের প্রতি শরীয়তী বিধান প্রয়োগের যোগ্য করে গড়ে তোলা, বিশ্বে আল্লাহ্র খেলাফত প্রতিষ্ঠা এবং অপরাধীর শাস্তি বিধান, শরীয়তী আইন ও নির্দেশাবলী প্রবর্তন। এই নতুন জাতি উন্নতি সাধন করে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে এমন এক স্তরে পৌঁছবে, যা ফেরেশতাদের সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে। এসব উদ্দেশ্য সম্পর্কে আদম সৃষ্টির পূর্বে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছিল।

এজন্য অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়ার পরও পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ রহিত করা হয়নি, অবশ্য তার রূপ পাল্টে দেওয়া হয়েছে। আর এখানকার এ নির্দেশ মহাজ্ঞানী ও রহস্যবিদসুলভ এবং পৃথিবীতে আগমন আল্লাহর খেলাফতের সম্মানসূচক। পরবর্তী আয়াতসমূহে উক্ত পদ-সংশ্লিষ্ট সেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহ্ পাকের একজন খলীফা হিসাবে তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল। এজন্য পৃথিবীতে অবতণের নির্দেশ পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমি তাদের সবাইকে নিচে নেমে যেতে নির্দেশ দিলাম। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন পথ নির্দেশ বা হেদায়েত (অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে শরীয়তী বিধান) আসে, তখন যেসব লোক আমার সে হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের না থাকবে কোন ভয়, না তারা সন্তপ্ত হবে। (অর্থাৎ কোন অতীত বস্তু হারাবার গ্লানি থাকবে না এবং ভবিষ্যতে কোন কষ্টের আশংকা থাকবে না।)

تَلَقَّى শব্দের অর্থ আগ্রহ ও উৎসাহসহ কাউকে সংবর্ধনা জানানো এবং তাকে গ্রহণ করা। এর মর্ম এই যে, আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে যখন তাঁদেরকে তওবার বাক্যগুলো শিখিয়ে দেওয়া হলো, তখন হযরত আদম (আ) যথোচিত মর্যাদা ও গুরুত্বসহ তা গ্রহণ করলেন।

كَلِمَاتٍ তথা যে সব বাক্য হযরত আদমকে তওবার উদ্দেশ্যে বলে দেওয়া হয়েছিল, তা কি ছিল ? এ সম্পর্কে মুফাস্সির সাহাবীদের কয়েক ধরনের রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমতই এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যা কোরআন মজীদের অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদেগার ! আমরা আমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যাব।

تَوْبَةٌ — تَابَ(তওবা)-এর প্রকৃত অর্থ, ফিরে আসা। যখন তওবার সম্বন্ধ মানুষের সঙ্গে হয়, তখন তার অর্থ হবে তিনটি বস্তুর সমষ্টি ঃ

১. কৃত পাপকে পাপ মনে করে সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া।

২. পাপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা।

৩. ভবিষ্যতে আবার এরূপ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা।

এ তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির অভাব থাকলে তওবা হবে না। সুতরাং বোঝা গেল যে, মৌখিকভাবে 'আল্লাহ্ তওবা' বা অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করা নাজাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। অতীতের পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, বর্তমানে তা পরিহার করা এবং ভবিষ্যতে না করার সংকল্প গ্রহণ—এই তিনটি বিষয়ের সমাবেশ না ঘটা পর্যন্ত তওবা হবে না। تَابَ عَلَيْهِ এর মধ্যে তওবার সম্বন্ধ আল্লাহ্র সাথে। এর অর্থ তওবা গ্রহণ করা।

প্রথম যুগের কোন কোন মনীষীর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কারো দ্বারা পাপ সংঘটিত হলে সে কি করবে? উত্তরে বলা হয়েছিল যে, তাই করবে যা আদি পিতামাতা হযরত আদম ও হাওয়া (আ) করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আ) নিবেদন করেছিলেন—رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ (হে আমার পরওয়াদিগার, আমি আমার নফসের উপর অত্যাচার করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন) হযরত ইউনুস (আ) পদস্খলনের পর নিবেদন করেন ঃ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তুমি অতি পবিত্র। আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি।

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর দ্বারা যে ইজতেহাদগত বিচ্যুতি বা ত্রুটি সাধিত হয়েছিল, প্রথমত কোরআন করীম তার সম্বন্ধ উভয়ের সাথে করেছে। বলা হয়েছে, فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا (অতঃপর শয়তান উভয়কে পদস্খলিত করে দেয়)।

পৃথিবীতে অবতরণের হুকুমকেও হযরত হাওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে, اِهْبِطُوْا (তোমরা নেমে যাও)। কিন্তু পরে তওবা ও তা কবূলের ক্ষেত্রে একবচন ব্যবহার করে শুধু হযরত আদম (আ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত হাওয়ার উল্লেখ নেই। এছাড়া অন্যত্রও এ পদস্খলন প্রসঙ্গে শুধু হযরত আদম (আ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে ঃ عَصٰى اٰدَمُ অর্থাৎ আদম (আ) স্বীয় পালনকর্তার হুকুম লঙ্ঘন করলেন।

এর কারণ হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা নারী জাতির প্রতি বিশেষ রেয়াত প্রদর্শন করে হযরত হাওয়ার বিষয়টি গোপন রেখেছেন এবং পাপ ও ভর্ৎসনার ক্ষেত্রে সরাসরি তাঁর উল্লেখ করেন নি। এক জায়গায় উভয়ের তওবার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا... (হে আমাদের প্রভু, আমরা আমাদের নফসের উপর জুলুম করেছি)। এ ব্যাপারে কারো সংশয় থাকা উচিত নয় যে, হযরত হাওয়ার অপরাধও ক্ষমা হয়েছে। এছাড়া স্ত্রী যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের অধীন, সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে তাঁর (হাওয়ার) উল্লেখের প্রয়োজনবোধ করা হয় নি। (কুরতুবী)

'তওয়াব' ও 'তায়েবের' পার্থক্য

ইমাম কুরতুবীর মতে تَوَّابٌ (তাওয়াব) শব্দের সম্বন্ধ মানুষের সাথেও হতে পারে,

যেমন, إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ (নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তওবাকারীদের পছন্দ করেন।) এবং আল্লাহ্‌র সাথেও হতে পারে। যেমন, هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (তিনিই মহান, তওবা কবূলকারী, অতি দয়ালু)। যখন শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ হয়, পাপ থেকে পুণ্য ও আনুগত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা। আর যখন আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন অর্থ হয় তওবা কবূল করা। সমার্থবোধক অপর শব্দ تَائِبْ-এর ব্যবহার আল্লাহ্ পাকের ক্ষেত্রে জায়েয নয়। যদিও আভিধানিক অর্থে ভুল নয়, কিন্তু আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে শুধু সে সমস্ত গুণবাচক শব্দ ও উপাধির ব্যবহারই বৈধ, যেগুলো কোরআন ও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য শব্দ যদিও অর্থগতভাবে ঠিক, কিন্তু আল্লাহ্ পাকের জন্য তার ব্যবহার বৈধ নয়।

তওবা গ্রহণের অধিকার আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নেই ঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তওবা গ্রহণের অধিকারী আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কেউ নয়। খ্রীস্টান ও ইহুদীরা এক্ষেত্রে মারাত্মক ভুলের শিকার হয়ে পড়েছে। তারা পাদ্রী পুরোহিতদের কাছে গিয়ে কিছু হাদিয়া উপঢৌকনের বিনিময়ে পাপ মোচন করিয়ে নেয় এবং মনে করে যে, তারা মাফ করে দিলেই আল্লাহ্‌র কাছেও মাফ হয়ে যায়। বর্তমানে বহু মুসলমানও এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে। অথচ কোন পীর বা আলেম কারো পাপ মোচন করিয়ে দিতে পারেন না : তাঁরা বড়জোর দোয়া করতে পারেন।

হযরত আদম (আ)-এর পৃথিবীতে অবতরণ শাস্তিস্বরূপ নয়, বরং এক বিশেষ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্য ঃ

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا (তোমরা জান্নাত থেকে নেমে যাও)-এর পূর্ববর্তী আয়াতেও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ ছিল। এখানে পুনরায় এর উল্লেখ করার মাঝে সম্ভবত এ উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে যে, প্রথম আয়াতে পৃথিবীতে অবতরণের হুকুম ছিল শাস্তিমূলক। সেই জন্যই তার সাথে সাথে মানবের পারস্পরিক শত্রুতারও বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশে বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। আর তা হলো বিশ্বে আল্লাহর খেলাফতের পূর্ণতাসাধন। এজন্য এর সাথে হেদায়েত প্রেরণার উল্লেখও রয়েছে, যা আল্লাহর খেলাফতের পদগত কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এতে বোঝা গেল যে, পৃথিবীতে অবতরণের প্রথম নির্দেশটি যদিও শাস্তিমূলক ছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হলো, তখন অন্যান্য মঙ্গল ও হেকমতসমূহের বিবেচনায় পৃথিবীতে প্রেরণের হুকুমের রূপ পরিবর্তন করে মূল হুকুম বহাল রাখা হলো এবং তাদের অবতরণ হলো বিশ্বের শাসক ও খলীফা হিসাবে। এটা সে হিকমত ও রহস্য, আদম সৃষ্টির পূর্বেই ফেরেশতাদের সাথে যার আলোচনা করা হয়েছিল অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে তাঁর খলীফা পাঠাতে হবে।

শোক-সন্তাপ থেকে শুধু তারাই মুক্তি পেতে পারে যারা আল্লাহ্‌র বাধ্য ও অনুগত

فَمَنْ تَبِعَ هُدَىَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ .

(যারা আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের আশংকা নেই এবং কোন চিন্তাও করতে হবে না।) এ আয়াতে আসমানী হেদায়েতের অনুসারিগণের জন্য দু'ধরনের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমত তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং দ্বিতীয়ত তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

خَوْفٌ আগত দুঃখ-কষ্টজনিত আশংকার নাম। আর حُزْنٌ বলা হয় কোন উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে সৃষ্ট গ্লানি ও দুশ্চিন্তাকে। লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এ দু'টি শব্দে যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করে দেয়া হয়েছে যে, স্বাচ্ছন্দের এক বিন্দুও এর বাইরে নেই। অতঃপর এ দু'টি শব্দের মধ্যে তত্ত্বগত ব্যবধানও রয়েছে। এখানে لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ-এর ন্যায় لَا حُزْنٌ عَلَيْهِمْ না বলে ক্রিয়াবাচক শব্দ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ-এর ব্যবহারের মধ্যে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, কোন উদ্দেশ্য সফল না হওয়াজনিত গ্লানি ও দুশ্চিন্তা থেকে শুধু তাঁরাই মুক্ত থাকতে পারেন, যাঁরা আল্লাহ্‌র ওলীর স্তরে পৌঁছতে পেরেছেন। যাঁরা আল্লাহ্‌প্রদত্ত হেদায়েতসমূহের পূর্ণ অনুসরণকারী, তাঁরা ছাড়া অন্য কোন মানুষ এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন না। তা সে সারা বিশ্বের রাজাধিরাজই হোন বা সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তিই হোন। কেননা এদের মধ্যে কেউই এমন নন, যাঁর স্বভাব এ ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোন অবস্থার সম্মুখীন হবেন না এবং সেজন্য দুশ্চিন্তায় লিপ্ত হবেন না। অপরপক্ষে আল্লাহ্‌র ওলীগণ নিজের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মাঝে বিলীন করে দেন। এজন্য কোন ব্যাপারে তাঁরা সফলকাম না হলে মোটেও বিচলিত হন না। কোরআন মজীদের অন্যত্র একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিশিষ্ট জান্নাতবাসীদের অবস্থা হবে এই যে, তাঁরা জান্নাতে পৌঁছার পর আল্লাহ্‌র সেসব নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করবেন, যার দ্বারা তিনি তাঁদের সন্তাপ ও দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ (সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্ পাকের জন্য, যিনি আমাদেরকে দুশ্চিন্তামুক্ত করেছেন।) এতে বোঝা গেল যে, এ দুনিয়ায় কোন না কোন চিন্তা থাকা মানুষের জন্য অবশ্যাম্ভাবী। শুধু তাঁরাই এর ব্যতিক্রম, যাঁরা আল্লাহ্ পাকের সাথে নিজেদের সম্পর্ক পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ় করে নিয়েছেন।

এই আয়াতে আল্লাহ্‌ওয়ালাদের যাবতীয় ভয়ভীতি ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার অর্থ, পার্থিব কোন কষ্ট বা আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের মনে কোন ভয় বা দুশ্চিন্তার উদ্রেক হবে না। পরকালের চিন্তাভাবনা ও আল্লাহ্‌র ভয় তো অন্যদের চাইতে তাঁদের আরো বেশি হয়ে থাকে। এজন্য হুযূরে পাক (সা) সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি অধিকাংশ সময় চিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত থাকতেন। তাঁর এই চিন্তা-ভাবনা পার্থিব বস্তু হারাবার কারণে বা কোন বিপদের আশংকায় ছিল না, বরং তা ছিল আল্লাহ্‌র ভয় ও উম্মতের কারণে।

এতে একথা বোঝা যায় না যে, দুনিয়াতে যেসব জিনিসের ভয়ংকর বলে মনে করা হয়, সেগুলো মানবিক রীতি অনুসারে নবী ও ওলীগণের স্বাভাবিক ভয়ের উদ্রেক করবে না। কেননা যখন মূসা (আ)-এর সামনে লাঠি সাপের রূপ ধারণ করল, যখন তাঁর ভয় পাওয়ার কথা কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى (হযরত মূসার মনে ভয়ের সঞ্চার করল) কেননা স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত এ ভয় মূসা (আ)-এর মধ্যে প্রথম অবস্থাতেই ছিল। যখন আল্লাহ পাক বলেন, لَاتَخَفْ (ভয় পেও না), তখন সে ভয় সম্পূর্ণভাবে চলে গেল।

অবশ্য এ ব্যাখ্যাও দেওয়া যেতে পারে যে, হযরত মূসা (আ)-এর এ ভয় সাধারণ মানুষের ভয়ের এ কারণে ছিল না যে, সাপ কোন কষ্ট দিতে পারে, বরং এ কারণে ছিল যে, না জানি বনী ইসরাঈল এর দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এ ভয়ও পরকাল সংক্রান্তই ছিল। শেষ আয়াত وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا (এবং যারা কুফরী করেছে)-এর দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যারা

আল্লাহ্ প্রেরিত হেদায়েতের অনুসরণ করবে না। অনন্তকালের জন্য তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। এর উদ্দেশ্য সে সব লোক, যারা এ হেদায়েতকে হেদায়েত মনে করতে বা তার অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে অর্থাৎ–কাফিরগণ। কেননা মু'মিনগণ যারা হেদায়েতকে হেদায়েত বলে মনে করে তারা কার্যত যত পাপীই হোক, নিজের পাপের শাস্তি ভোগ করে অবশেষে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে।

يٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّٰىَ فَٱرْهَبُونِ ﴿٤٠﴾ وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّٰىَ فَٱتَّقُونِ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

(৪০) হে বনী-ইসরাঈলগণ, তোমরা স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহ, যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি এবং তোমরা পূরণ কর আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা, তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। আর ভয় কর আমাকেই। (৪১) আর তোমরা সে গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্য বক্তা হিসাবে তোমাদের কাছে। বস্তুত তোমরা তার প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না আর আমার আয়াতের অল্প মূল্য দিও না। এবং আমার (আযাব) থেকে বাঁচ। (৪২) তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে তোমরা গোপন করো না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ ঃ

হে বনী-ইসরাঈল (অর্থাৎ হযরত ইয়াকুবের সন্তানগণ)! তোমরা আমার অনুকম্পাসমূহের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছি, (যাতে নেয়ামতের হক অনুধাবন করে ঈমান গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে সহজ হয়ে যায়। এ স্মরণ করার মর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূরণ কর (অর্থাৎ তওরাত গ্রন্থে তোমরা আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলে, যার বর্ণনা কোরআনের এ আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا ۔

[এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক বনী-ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। আর আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন দলপতি মনোনীত করে প্রেরণ করলাম]। আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করব। (অর্থাৎ ঈমান গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলাম–যেমন উল্লিখিত আয়াতের শেষাংশে আছে لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ [তোমাদের পাপসমূহ মুছে দেবো] এবং শুধু আমাকেই ভয় কর। এ কথা ভেবে (সাধারণ ভক্তদেরকে ভয় করো না যে, তাদের ভক্তি না থাকলে আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে।) এবং আমি যে গ্রন্থ নাযিল

করেছি (অর্থাৎ কোরআন) তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এ গ্রন্থ তোমাদের উপর নাযিলকৃত গ্রন্থের সত্যতা বর্ণনাকারী (অর্থাৎ তওরাত যে আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত গ্রন্থ তা সমর্থন করে এবং সত্যতা প্রমাণ করে। অবশ্য এতে পরবর্তীকালে পরিবর্তন সাধন করে যে কৃত্রিম ও অলীক তথ্য সংযোজন করা হয়েছে সেগুলো মূল তওরাত ও ইঞ্জীলের অন্তর্ভুক্তই নয়। সুতরাং এ দ্বারা সেগুলোর [পরিবর্তন করার পর] সংযোজিত অংশের সমর্থন করা বোঝায় না) এবং কোরআনের প্রথম অস্বীকারকারী বলে পরিগণিত হয়ো না। (অর্থাৎ পরবর্তীকালে তোমাদেরকে দেখে যত লোক অস্বীকারকারী হতে থাকবে, তাদের মধ্যে তোমরাই হবে কুফ্র ও অস্বীকারপ্রসূত পাপের প্রথম ভিত্তি স্থাপনকারী। ফলত কিয়ামত পর্যন্ত সবার কুফ্র ও অবিশ্বাসজনিত পাপের বোঝা তোমাদের আমলনামাভুক্ত হতে থাকবে।) আর আমার শরীয়তের নির্দেশনাবলীর বিনিময়ে তোমরা কোন নগণ্য বস্তু গ্রহণ করো না এবং বিশেষভাবে শুধু আমাকেই ভয় কর। (অর্থাৎ আমার নির্দেশাবলী পরিত্যাগ করে বা পরিবর্তন করে অথবা গোপন করে সাধারণ জনমণ্ডলীর কাছ থেকে এর বিনিময়ে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ দুনিয়া গ্রহণ করো না–যেমন তাদের অভ্যাস ছিল যার বিশদ বিবরণ সামনে দেয়া হচ্ছে।) আর সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত করে দিও না এবং জেনে শুনে সত্যকে গোপনও করো না (কেননা সত্য গোপন করা অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ সূরা বাকারাহ্ কোরআন সংক্রান্ত আলোচনা দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে এবং তাতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোরআনের হেদায়েত যদিও গোটা সৃষ্টি জগতের জন্য ব্যাপক, কিন্তু এর দ্বারা শুধু মু'মিনগণই উপকৃত হবেন। এর পরে যারা এর প্রতি ঈমান আনেনি, তাদের জন্য নির্ধারিত কঠিন শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে এক শ্রেণী ছিল সরাসরি কাফির ও অবিশ্বাসীদের। অপর একটা শ্রেণী ছিল মুনাফিক ও কপটদের। উভয় শ্রেণীর যাবতীয় অবস্থা ও কুকীর্তির তালিকাসহ বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর মু'মিন, মুশরিক ও মুনাফিক–এই তিন শ্রেণীকে সম্বোধন করেই সবাইকে আল্লাহ্ পাকের ইবাদত ও আরাধনার তাকীদ দেওয়া হয়েছে এবং কোরআন মজীদের অলৌকিক শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে ঈমানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অতঃপর হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির ঘটনা বর্ণনা করে তাদের সম্মুখে নিজেদের মূল ভিত্তি ও প্রকৃত স্বরূপ এবং আল্লাহ্ পাকের অনন্য ও পরিপূর্ণ ক্ষমতাসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ্ পাকের ইবাদত ও আরাধনার প্রতি আগ্রহ এবং নাফরমানির ব্যাপারে চিন্তার উদ্রেক করে।

অতঃপর প্রকাশ্যে কাফির ও মুনাফিকদের যে দু'টি শ্রেণীর কথা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে–তাদের মধ্যে আবার দু'শ্রেণীর লোক ছিল। এক শ্রেণী পৌত্তলিক মুশরিকদের–যারা কেবল পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতির অনুসরণ করতো। তারা প্রাচীন ও আধুনিক কোন জ্ঞানেরই অধিকারী ছিল না। সাধারণত ওরা ছিল নিরক্ষর। যেমন, সাধারণ মক্কাবাসী। এজন্য কোরআন পাক এদেরকে 'উম্মিয়্যীন' (নিরক্ষর) বলে আখ্যায়িত করেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীটি ছিল তাদের, নবীগণের উপর যারা ঈমান এনেছিল এবং পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহ ; যথা–তওরাত, ইঞ্জীল প্রভৃতির জ্ঞানও তাদের ছিল। ফলে তারা শিক্ষিত ও জ্ঞানী হিসাবে পরিচিত ছিল। এদের মধ্যে কতক হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান না এনে মূসা (আ)-এর উপর ঈমান এনেছিল। এদেরকে বলা হতো ইহুদী। আবার কতক হযরত ঈসা

(আ)-এর প্রতি ঈমান রাখতো, কিন্তু হযরত মূসা (আ)-কে নবী হিসেবে নিষ্পাপ বলে মনে করতো না। এদেরকে বলা হত 'নাসারা'। এরা আসমানী কিতাব তওরাত বা ইঞ্জীলের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করতো বলে কোরআন এদের উভয়কে আহ্‌লে কিতাব (গ্রন্থধারী) বলে আখ্যায়িত করেছে। এরা জ্ঞানী ও শিক্ষিত ছিল বলে সবাই তাদেরকে অত্যন্ত সম্মান করত ও আস্থার নজরে দেখত। এদের কথা সাধারণ মানুষের উপর বিশেষ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত। এরা সার্বিকভাবে পথে এসে গেলে অন্যরাও মুসলমান হয়ে যাবে–এমন একটা আশাবাদ পোষণ করা হতো। মদীনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এদের সংখ্যাই ছিল গরিষ্ঠ।

সূরা বাকারাহ্ যেহেতু মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, সুতরাং এতে মুশরিক ও মুনাফিকদের বিবরণের পর যে কোন আসমানী গ্রন্থে বিশ্বাসী আহলে-কিতাবদেরকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সূরার চল্লিশতম আয়াত থেকে আরম্ভ করে একশত তেইশতম আয়াত পর্যন্ত শুধু এদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সেখানে তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রথমে তাদের বংশগত কৌলীন্য, বিশ্বের বুকে তাদের যশ-খ্যাতি, মান-মর্যাদা এবং তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের অগণিত অনুকম্পাধারার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের পদচ্যুতি ও দুষ্কৃতির জন্য সাবধান করে দেওয়া হয়েছে এবং সঠিক পথের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। প্রথম সাত আয়াতে এসব বিষয়েরই আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে প্রথম তিন আয়াতে ঈমানের দাওয়াত এবং চার আয়াতে সৎকাজের শিক্ষা ও প্রেরণা রয়েছে। তৎপর অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। বিস্তারিত সম্বোধনের সূচনা সমাপ্তিপর্বে গুরুত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ–(হে ইসরাঈলের বংশধর!) শব্দসমষ্টি দ্বারা সংক্ষিপ্ত সম্বোধনের সূচনা হয়েছিল, সেগুলোই পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ এখানে ইসরাঈল اسرائيل হিব্রু ভাষার শব্দ। এর অর্থ 'আবদুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র দাস)। ইয়াকূব (আ)-এর অপর নাম। কতিপয় উলামায়ে-কিরামের মতানুসারে হুযূরে পাক (সা) ব্যতীত অন্য কোন নবীর একাধিক নাম নেই। কেবল–হযরত ইয়াকুব (আ)-এর দু'টি নাম রয়েছে–ইয়াকুব ও ইসরাঈল। কোরআন পাক এক্ষেত্রে তাদেরকে বনী-ইয়াকুব بَنِىْ يَعْقُوْبَ বলে সম্বোধন না করে বনী-ইসরাঈল নাম ব্যবহার করেছে। এর তাৎপর্য এই যে, স্বয়ং নিজেদের নাম ও উপাধি থেকেই যেন তারা বুঝতে পারে যে, তারা 'আবদুল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আরাধনাকারী দাসের বংশধর এবং তাঁরই পদাংক অনুসরণ করে চলতে হবে। এ আয়াতে বনী-ইসরাঈলকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে ঃ

'এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূরণ কর।' অর্থাৎ তোমরা আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলে, তা পূরণ কর। হযরত কাতাদাহ্ (রা)-এর মতে তওরাতে বর্ণিত সে অঙ্গীকারের কথাই কোরআনের এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۚ

অর্থাৎ–নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক বনী-ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মাঝ থেকে ১২ জনকে দলপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলাম (সূরা মায়েদাহ্, ৩য় রুকূ)। সমস্ত রসূলের উপর ঈমান আনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার এর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাঁদের মধ্যে আমাদের হুযূর পাক (সা)-ও বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এছাড়া নামায, যাকাত এবং

অন্যান্য সাদকা-খয়রাতও এ অঙ্গীকারভুক্ত, যার মূল মর্ম হল রসূলে করীম (সা)-এর উপর ঈমান ও তাঁর পুরোপুরি অনুসরণ। এজন্যই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন যে, অঙ্গীকারের মূল অর্থ মুহাম্মদ (সা)- এর পূর্ণ অনুসরণ।

'আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করব।' অর্থাৎ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ এ ওয়াদা করেছেন যে, যারা এ অঙ্গীকার পালন করবে, আল্লাহ্ পাক তাদের যাবতীয় পাপ মোচন করে দেবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদেরকে জান্নাতের সুখ-সম্পদের দ্বারা গৌরবান্বিত করা হবে।

মূল বক্তব্য এই যে, হে বনী-ইসরাঈল, তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ করার ব্যাপারে আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছ, তা পূরণ কর। তবে আমিও তোমাদের সাথে কৃত ক্ষমা ও জান্নাত বিষয়ক অঙ্গীকার পূরণ করবো। আর শুধু আমাকেই ভয় কর। একথা ভেবে সাধারণ ভক্তদেরকে ভয় করো না যে, সত্য কথা বললে তারা আর বিশ্বাসী থাকবে না, ফলে আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে।

মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের বিশেষ মর্যাদা ঃ তফসীরে-কুরতুবীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক বনী-ইসরাঈলকে প্রদত্ত সুখ-সম্পদ ও অনুগ্রহরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর যিক্র ও অনুসরণের আহ্বান করেছেন এবং উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে তাঁর দয়া ও করুণার উদ্ধৃতি না দিয়েই একই কাজের উদ্দেশ্যে আহ্বান করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ (তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব)। এখানে উম্মতে-মুহাম্মদীর এক বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, দাতা ও করুণাময়ের সাথে তাদের সম্পর্ক মাধ্যমহীন–একেবারে সরাসরি। এরা দাতাকে চেনে।

অঙ্গীকার পালন করা ওয়াজিব এবং তা লঙ্ঘন করা হারাম ঃ এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, অঙ্গীকার ও চুক্তির শর্তাবলী পালন করা অবশ্য কর্তব্য আর তা লঙ্ঘন করা হারাম। সূরা মায়েদা-তে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (তোমরা কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি পালন কর।)

রসূলে করীম (সা) এরশাদ করেছেন যে, অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদেরকে নির্ধারিত শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে এই শাস্তি দেওয়া হবে যে, হাশরের ময়দানে যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানব সমবেত হবে, তখন অঙ্গীকার লঙ্ঘনকারীদের মাথার উপর নিদর্শনস্বরূপ একটি পতাকা উত্তোলন করে দেওয়া হবে এবং যত বড় অঙ্গীকার করবে, পতাকাও তত উঁচু ও বড় হবে। এভাবে তাদেরকে হাশরের ময়দানে লজ্জিত ও অপমানিত করা হবে।

পাপ বা পুণ্যের প্রবর্তকের আমলনামায় তার সম্পাদনকারীর সমান পাপ-পুণ্য লেখা হয় ঃ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ –যে কোন পর্যায়ে কাফির হওয়া চরম অপরাধ ও জুলুম। কিন্তু এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রথম কাফিরে পরিণত হয়ো না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি প্রথম কুফরী গ্রহণ করবে, তার অনুসরণে পরবর্তীকালে যত লোক এ পাপে লিপ্ত হবে, তাদের সবার কুফরী ও অবিশ্বাসজনিত পাপের বোঝার সমতুল্য বোঝা তাকে একাই বহন করতে হবে। কারণ সে-ই কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য এ অবিশ্বাসপ্রসূত পাপের মূল কারণ ও উৎস। সুতরাং তার শাস্তি বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে।

জ্ঞাতব্য ঃ এতদ্বারা বোঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারও পাপের কারণে পরিণত হয় তবে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক তার কারণে এ পাপে জড়িত হবে, তাদের সবার সমতুল্য পাপ তার একারই হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অন্য কারও পুণ্যের কারণ হয়, তাকে অনুসরণ করে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক সৎকাজ সাধন করে যে পরিমাণ পুণ্য লাভ করবে, তাদের সবার সমতুল্য পুণ্য সে ব্যক্তির আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হবে। এ মর্মে কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াত এবং রসূল (সা)-এর অগণিত হাদীস রয়েছে।

وَلَاتَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا (এবং তোমরা আমার আয়াতসমূহ কোন নগণ্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করো না।) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো মানুষের মর্জি ও স্বার্থের তাগিদে আয়াতসমূহের মর্ম বিকৃত বা ভুলভাবে প্রকাশ করে কিংবা তা গোপন রেখে টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা—এ কাজটি উম্মতের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

কোরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয ঃ এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ ঠিক ঠিকভাবে শিক্ষা দিয়ে বা ব্যক্ত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সঙ্গত কি না। এই প্রশ্নটির সম্পর্ক উল্লিখিত আয়াতের সঙ্গে নয়। স্বয়ং এ মাসআলাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও পর্যালোচনাসাপেক্ষ। কোরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কিনা—এ সম্পর্কে ফিকাহ্শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র) জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আজম আবূ হানীফা (র) প্রমুখ কয়েকজন ইমাম তা নিষেধ করেছেন। কেননা রসূলে করীম (সা) কোরআনকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে পরিণত করতে বারণ করেছেন।

অবশ্য পরবর্তী হানাফী ইমামগণ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, পূর্বে কোরআনের শিক্ষকমণ্ডলীর জীবন যাপনের ব্যয়ভার ইসলামী বায়তুলমাল (ইসলামী ধনভাণ্ডার) বহন করত, কিন্তু বর্তমানে ইসলামী শাসন-ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শিক্ষকমণ্ডলী কিছুই লাভ করেন না। ফলে যদি তাঁরা জীবিকার অন্বেষণে চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে ছেলেমেয়েদের কোরআন শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য কোরআন শিক্ষার বিনিময়ে প্রয়োজনানুপাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমামতি, আযান, হাদীস ও ফিকাহ্ শিক্ষা দান প্রভৃতি যে সব কাজের উপর দীন ও শরীয়তের স্থায়ীত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে সেগুলোকেও কোরআন শিক্ষাদানের সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজনমত এগুলোর বিনিময়েও বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। (দুররে-মুখতার, শামী)

ইসালে সওয়াব উপলক্ষে খতমে-কোরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না-জায়েয ঃ আল্লামা শামী 'দুররে মুখতারের শারহে' এবং 'শিফাউল-'আলীল' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং অকাট্য দলীলাদিসহ একথা প্রমাণ করেছেন যে, কোরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তীকালের ফকীহগণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরীয়তের বিধান ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসবে। সুতরাং এ অনুমতি এ সব বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক। এজন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদের

ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন খতম করানো বা অন্য কোন দোয়া-কালাম ও অজিফা পড়ানো হারাম। কারণ এর উপর কোন ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। এখন যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পড়া হারাম, সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে, তারা উভয়ই গোনাহ্গার হবে। বস্তুত যে পড়েছে সে-ই যখন কোন সওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌঁছাবে ? কবরের পাশে কোরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন খতম করানোর রীতি সাহাবী, তাবেয়ীন এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বিদ'আত।

সত্য গোপন করা এবং তাতে সংযোজন ও সংমিশ্রণ হারাম ঃ

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ (সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত করো না)—এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শ্রোতা ও সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ না-জায়েয। অনুরূপভাবে কোন ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে সত্য গোপন করাও হারাম।

খলীফা সুলায়মানের দরবারে হযরত আবূ হাযেম (র)-এর উপস্থিতি ঃ 'মসনাদে-দারেমী'-তে সনদসহ বর্ণিত আছে যে, একবার খলীফা সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক মদীনায় গিয়ে কয়েকদিন অবস্থানের পর লোকদের জিজ্ঞেসা করলেন যে, মদীনায় এমন কোন লোক বর্তমানে আছেন কি, যিনি কোন সাহাবীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন ? লোকেরা বলল ঃ আবূ হাযেম (র) এমন ব্যক্তি। খলীফা লোক মারফত তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তশরীফ আনার পর খলীফা বললেন, হে আবূ হাযেম, এ কোন্ ধরনের অসৌজন্যমূলক ও অভদ্রজনোচিত কাজ। হযরত আবূ হাযেম বললেন, আপনি আমার মাঝে এমন কি অসৌজন্য ও অভদ্রতা দেখতে পেলেন ? সুলায়মান বললেন, মদীনার প্রত্যেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, কিন্তু আপনি আসেন নি। আবূ হাযেম বললেন, আমীরুল মু'মিনীন ! বাস্তবতারবিরোধী কোন কথা বলা থেকে আমি আপনাকে আল্লাহ্র আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। ইতিপূর্বে আপনি আমাকে চিনতেন না। আমিও আপনাকে কখনো দেখিনি। এমতাবস্থায় আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং অসৌজন্য কেমন করে হলো ?

সুলায়মান উত্তরে শুনে ইবনে শিহাব যুহ্রী ও অন্যান্য উপস্থিত সুধীর প্রতি তাকালে পর ইমাম যুহ্রী (র) বললেন, আবূ হাযেম তো ঠিকই বলেছেন ; আপনি ভুল বলেছেন।

অতঃপর সুলায়মান কথাবার্তার ধরন পাল্টিয়ে কিছু প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। বললেন, যে, আবূ হাযেম ! আমি মৃত্যুভয়ে ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়ি কেন? তিনি বললেন, কারণ আপনি পরকালকে বিরান এবং ইহকালকে আবাদ করেছেন। সুতরাং আবাদী ছেড়ে বিরান জায়গায় যেতে মন চায় না।

সুলায়মান এ বক্তব্য সমর্থন করে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, পরকালে আল্লাহ্র দরবারে কিভাবে উপস্থিত হতে হবে ? বললেন, পুণ্যবানগণ তো আল্লাহ্র দরবারে এমনভাবে হাযির হবেন, যেমন কোন মুসাফির সফর থেকে ফিরে নিজ বাড়ীতে পরিবার-পরিজনের মাঝে ফিরে যায়। আর পাপীরা এমনভাবে উপস্থিত হবে, যেমন কোন পলাতক গোলামকে ধরে নিয়ে মনিবের সামনে উপস্থিত করা হয়।

সুলায়মান কথা শুনে কেঁদে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন, আল্লাহ্ পাক আমার জন্য কি ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যদি তা আমি জানতে পারতাম ! আবূ হাযেম (র) এরশাদ করলেন, নিজের আমলসমূহ কোরআন পাকের কষ্টিপাথরে যাচাই করলেই তা জানতে পারবেন।

সুলায়মান জিজ্ঞেস করলেন, কোরআনের কোন্ আয়াতে এর সন্ধান পাওয়া যাবে? বললেন, এ আয়াত দ্বারা ঃ

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ وَّاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ .

(নিশ্চয়ই সৎ লোকগণ জান্নাতে সুখ-সম্পদে অবস্থান করবেন এবং অসৎ ও অবাধ্যজন নরকে।)

সুলায়মান বলেন, আল্লাহ্র রহমত ও করুণা তো অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং তা অবাধ্যদেরও পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। বললেন ঃ

اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ .

(নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাকের দয়া ও করুণা সৎকর্মশীলদের সন্নিকটে রয়েছে।)

সুলায়মান জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ হাযেম ! আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান কে ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি শালীনতা ও মানবতাবোধ এবং বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ও বিবেকের অধিকারী।

অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কাজ কি ? বললেন, হারাম বস্তুসমূহ পরিহার করে যাবতীয় ওয়াজিব পালন করা।

সুলায়মান আবার জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য দোয়া কোন্‌টি ? এরশাদ করলেন, দাতার প্রতি দানগ্রহীতার দোয়া। আবার জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোৎকৃষ্ট দান কোনটি ? এরশাদ করলেন ঃ কোন প্রসঙ্গে নিজ কৃত দানের উদ্ধৃতি না দিয়ে বা কোন রকম কষ্ট না দিয়ে নিজের প্রয়োজন ও অভাব সত্ত্বেও কোন বিপদগ্রস্ত সায়েলকে (যাচ্‌নাকারীকে) দান করা।

অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কথা কোনটি ? বললেন, যার ভয়ে তুমি ভীত বা তোমার কোন প্রয়োজন বা আশা-আকাঙ্ক্ষা যার সাথে জড়িত তাঁর সম্মুখে নিঃসংকোচে ও নির্বিবাদে সত্য কথা প্রকাশ করা।

জিজ্ঞেস করলেন, সর্বাধিক জ্ঞানী ও দূরদর্শী মুসলমান কে ? এরশাদ হল, যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি অনুগত থেকে কাজ করে এবং অনুরূপভাবে অপরকেও করতে আহ্বান করে।

জিজ্ঞেস করলেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক নির্বোধ কে ? বললেন, যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের অত্যাচারে সহযোগিতা করে। তার অর্থ হল এই যে, সে নিজের ধর্ম বিক্রি করে অপরের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার করে। সুলায়মান বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন।

অতঃপর সুলায়মান স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের সম্পর্কে আপনার কি অভিমত ? আবূ হাযেম বললেন, আপনার এ প্রশ্ন থেকে যদি আমাকে অব্যাহতি দেন তবে অতি উত্তম। সুলায়মান বললেন, মেহেরবানী করে আপনি আমাদেরকে কিছু উপদেশ বাক্য শোনান।

আবূ হাযেম বললেন, আপনার পিতৃপুরুষ তরবারির দৌলতে ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন এবং জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তাদের উপর রাজত্ব করেছেন। আর এতোসব

কীর্তির পরও তাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আফসোস ! আপনি যদি জানতেন যে, তাঁরা মৃত্যুর পর কি বলেন এবং প্রতি-উত্তরে তাঁদেরকে কি বলা হচ্ছে !

অনুচরদের একজন খলীফার মেজাজবিরুদ্ধ আবূ হাযেমের স্পষ্টোক্তি শুনে বলল, আবূ হাযেম, তুমি অতি জঘন্য উক্তি করলে। আবূ হাযেম (র) বললেন, আপনি ভুল বলছেন। কোন ন্যক্কারজনক কথা বলিনি, বরং আমাদের প্রতি যেরূপ নির্দেশ রয়েছে তদনুসারেই কথা বলেছি। কারণ আল্লাহ্ পাক উলামাদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, তারা মানুষকে সত্য কথা বলবে, কখনো তা গোপন করবে না। لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ (যেন তোমরা যা সত্য, মানুষের নিকট তা প্রকাশ কর এবং তা গোপন না কর)।

ইমাম কুরতুবী এই সুদীর্ঘ ঘটনা উল্লিখিত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সুলায়মান আবার জিজ্ঞেস করলেন, এখন আমাদের সংশোধনের পথ কি ? এরশাদ হল, গর্ব ও অহংকার পরিহার করুন। নম্রতা ও শালীনতা গ্রহণ করুন এবং হকদারদের প্রাপ্য ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন করে দিন।

সুলায়মান বললেন, আপনি কি মেহেরবানী করে আমাদের সাথে থাকতে পারেন ? আপত্তি করে আবূ হাযেম বললেন, আল্লাহ রক্ষা করুন। সুলায়মান জিজ্ঞেস করলেন, কেন ? তিনি বললেন, এ আশংকায় যে, পরে আপনাদের ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদার প্রতি না আকৃষ্ট হয়ে পড়ি–পরিণামে যে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

অতঃপর খলীফা বলেন, আপনার যদি কোন অভাব থাকে, তবে মেহেরবানী করে বলুন–তা পূরণ করে দেব। এরশাদ হল, একটি প্রয়োজন আছে, দোযখ থেকে অব্যাহতি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। খলীফা বললেন, এটা তো আমার ক্ষমতাধীন নয়। বললেন, তাহলে আপনার কাছে কিছু চাওয়ার বা পাওয়ার নেই।

পরিশেষে সুলায়মান বললেন, আমার জন্য মেহেরবানী করে দোয়া করুন। তখন আবূ হাযেম (র) দোয়া করলেন, আল্লাহ্ ! সুলায়মান যদি আপনার পছন্দনীয় ব্যক্তি হয়ে থাকে, তবে তার জন্য ইহকাল ও পরকালের সকল মঙ্গল ও কল্যাণ সহজতর করে দিন। আর যদি সে আপনার শত্রু হয়ে থাকে, তবে তার মাথা ধরে আপনার সন্তুষ্টি বিধান ও অনুমোদিত কার্যাবলীর দিকে নিয়ে আসুন।

খলীফা বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। বললেন, সারকথা এই যে, আপন পালনকর্তাকে এত বড় ও প্রতাপশালী মনে করুন যে, তিনি যেন আপনাকে এমন স্থানে বা অবস্থায় না পান, যা থেকে বারণ করেছেন এবং যেদিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে যেন অনুপস্থিত না দেখেন।

এ মজলিস থেকে প্রস্থানের পর খলীফা আবূ হাযেম (র)-এর খেদমতে উপঢৌকনস্বরূপ এক'শ গিনি পাঠিয়ে দিলেন। আবূ হাযেম (র) একখানা চিঠিসহ তা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল, "এই একশ' গিনি যদি আমার উপদেশাবলী ও উপস্থাপিত বক্তব্যের বিনিময়ে প্রদান করা হয়ে থাকে, তবে আমার নিকট এগুলোর চাইতে রক্ত ও শূকরের মাংসও প্রিয়। আর যদি সরকারী ধনভাণ্ডারে আমার অধিকার ও প্রাপ্য আছে বলে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে আমার ন্যায় দীনী খেদমতে ব্রতী হাজার হাজার উলামায়ে কিরাম রয়েছেন। যদি তাঁদের সবাইকে সমসংখ্যক গিনি প্রদান করে থাকেন, তবে আমিও গ্রহণ করতে পারি। অন্যথায় আমার এগুলোর প্রয়োজন নেই।"

আবূ হাযেম (র) উপদেশ বাক্যের বিনিময় গ্রহণকে রক্ত ও শূকরের সমতুল্য বলে মন্তব্য করার ফলে এ মাসআলার উপরও আলোকপাত হয়েছে যে, কোন ইবাদত বা উপাসনার বিনিময় গ্রহণ করা তাঁদের মতে জায়েয নয়।

وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَوٰةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّٰكِعِينَ ﴿৪৩﴾ أَتَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿৪৪﴾
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَٰشِعِينَ ﴿৪৫﴾ الَّذِينَ
يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿৪৬﴾

(৪৩) আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে যারা অবনত হয়। (৪৪) তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর ? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না ? (৪৫) ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব। (৪৬) যারা একথা খেয়াল করে যে, তাদের সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় পরওয়ারদেগারের এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তোমরা (মুসলমান হয়ে) নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর এবং বিনয়ীদের সাথে বিনয় প্রকাশ কর, (বনী-ইসরাঈলের পুরোহিতদের কোন কোন আত্মীয়-স্বজন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যখন এদের সাথে কথাবার্তা হত, তখন গোপনে এসব পুরোহিত তাদেরকে বলতো যে, মুহাম্মদ [সা] নিঃসন্দেহে সত্য রসূল। আমরা তো বিশেষ মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান হচ্ছি না। তোমরা কিন্তু ইসলাম ধর্ম ছেড়ো না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক বলেন, একি মারাত্মক কথা যে,) তোমরা অপর লোককে সৎকাজ করতে আদেশ কর, অথচ নিজেদেরকে ভুলে বসেছো। বস্তুত তোমরা কিতাব পাঠ করতে থাক (অর্থাৎ তওরাতের বিভিন্ন স্থানে আমলহীন পুরোহিতদের নিন্দাবাদ পাঠ কর)। তোমরা কি এতটুকুও বুঝ না ? এবং তোমরা সাহায্য কামনা কর (অর্থাৎ ধন-লিপ্সা ও মর্যাদার মোহে পড়ে তোমাদের নিকট ঈমান আনা যদি কঠিন বোধ হয়, তবে সাহায্য প্রার্থনা কর) ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে। (অর্থাৎ ঈমান এনে ধৈর্য ও নামাযকে অবশ্য করণীয় হিসেবে গ্রহণ কর। তখন সম্পদের লিপ্সা ও মর্যাদার মোহ অন্তর থেকে সরে যাবে। এখন যদি কেউ বলে, ধৈর্য ও নামাযকে অবশ্যকরণীয়রূপে গ্রহণ করাও কঠিন কাজ, তবে শুনে নাও) এবং বিনয়ী ও বিনম্রগণ ব্যতীত অন্যদের পক্ষে এ নামায

নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর বিনয়ী তারাই, যারা মনে করে যে, নিঃসন্দেহে তারা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং নিশ্চয়ই তারা তাঁর নিকটে ফিরে যাবে (এবং সেখানে তাদের হিসাব-নিকাশও পেশ করতে হবে। এরূপ দ্বিবিধ ধারণা পোষণের ফলে আগ্রহ ও ভয় উভয়ই সঞ্চারিত হবে এবং এ দু'টি বস্তুই প্রতিটি আমলের প্রাণ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রদত্ত সুখ-সম্পদ ও অনুকম্পার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে ঈমান ও সৎকাজের প্রতি আহ্বান করেছেন। পূর্ববর্তী তিন আয়াতে ঈমান ও আকীদা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। এখন আলোচ্য চার আয়াতে সৎকার্যাবলীর নির্দেশ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমলের বর্ণনা রয়েছে। আয়াতসমূহের মূল বক্তব্য এই যে, যদি ধন-লিপ্সা ও যশ-খ্যাতির মোহে তোমাদের পক্ষে ঈমান আনা কঠিন বোধ হয়, তবে তার প্রতিবিধান এই যে, ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। এতে ধন-লিপ্সা হ্রাস পাবে। কেননা ধন-সম্পদ মানবের কামনা-বাসনা ও ভোগ চরিতার্থ করার মাধ্যম বলেই তা তাদের নিকট এত প্রিয় ও কাম্য। যখন বল্গাহীনভাবে এ কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার অভিলাষ পরিত্যাগ করতে দৃঢ়সংকল্প হবে, তখন সম্পদ ও প্রাচুর্যের কোন আবশ্যকতাও থাকবে না এবং এর প্রতি কোন মোহ কিংবা আকর্ষণও এত প্রবল হবে না, যা নিজস্ব লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে একেবারে অন্ধ করে দেয়। আর নামায দ্বারা যশ-খ্যাতির মোহ হ্রাস পাবে। কারণ নামাযে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সব রকম বিনয় ও নম্রতাই বর্তমান। যখন সঠিক ও যথাযথভাবে নামায আদায় করার অভ্যাস গড়ে উঠবে, তখন যশ ও পদ-মর্যাদার মোহ এবং অহংকার ও আত্মম্ভরিতা হ্রাস পাবে। সম্পদের লালসা ও যশ-খ্যাতির মোহই ছিল অশান্তির প্রধান উৎস। যে কারণে ঈমান গ্রহণ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। যখন এ অশান্তির উপাদান হ্রাস পাবে, তখন ঈমান গ্রহণ করাও সহজতর হয়ে যাবে।

ধৈর্যধারণ করার জন্য কেবল অপ্রয়োজনীয় কামনা-বাসনাগুলোই পরিহার করতে হয়। কিন্তু নামাযের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কাজও সম্পন্ন করতে হয় এবং বহু বৈধ কামনাও সাময়িকভাবে বর্জন করতে হয়। যেমন—পানাহার, কথাবার্তা, চলাফেরা এবং অন্য মানবীয় প্রয়োজনাদি, যেগুলো শরীয়তানুসারে বৈধ ও অনুমোদিত, সেগুলোও নামাযের সময় বর্জন করতে হয়। তাও নির্ধারিত সময়ে দিনরাতে পাঁচবার করতে হয়। এজন্য কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করা এবং নির্ধারিত সময়ে যাবতীয় বৈধ ও অবৈধ বস্তু ধারণ করার নাম নামায।

মানুষ অপ্রয়োজনীয় কামনাসমূহ বর্জন করতে সংকল্পবদ্ধ হলে কিছুদিন পর তার স্বাভাবিক চাহিদাও লোপ পেয়ে যায়। কোন প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা থাকে না। কিন্তু নামাযের সময়সূচির অনুসরণ এবং তৎসম্পর্কিত যাবতীয় শর্ত যথাযথভাবে পালন এবং সব সময়ে প্রয়োজনীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি মানব স্বভাবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ও আয়াসসাধ্য। এজন্য এখানে সন্দেহের উদ্ভব হতে পারে যে, ঈমানকে সহজলব্ধ করার জন্য ধৈর্য ও নামাযরূপ ব্যবস্থাপত্রের যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তার অনুশীলন কঠিন ব্যাপার, বিশেষ করে নামায সম্পর্কিত শর্তাবলী ও নিয়মাবলী পালন ও অনুসরণ করা। নামায সংক্রান্ত এসব জটিলতার প্রতিবিধান প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে, নিঃসন্দেহে নামায কঠিন ও আয়াসসাধ্য কাজ। কিন্তু যাদের

অন্তঃকরণে বিনয় বিদ্যমান, তাদের পক্ষে এটা মোটেও কঠিন কাজ নয়। এতে নামাযকে সহজসাধ্য করার ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে।

মোটকথা, নামায কঠিন বোধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, মানবমন কল্পনারাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। আর মানুষের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মনেরই অনুসরণ করে। কাজেই যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনেরই অনুসরণে মুক্তভাবে বিচরণ করতে প্রয়াসী। নামায এরূপ স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। না বলা, না হাসা, না খাওয়া, না চলা প্রভৃতি নানাবিধ বাধ্যবাধকতার ফলে মন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং মনের অনুগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ থেকে কষ্টবোধ করতে থাকে।

মোটের উপর নামাযের মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তিবোধের একমাত্র কারণ হচ্ছে মনের বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার অবাধ বিচরণ। এর প্রতিবিধান মনের স্থিরতার দ্বারাই হতে পারে خُشُوْع বা বিনয়ের অর্থ মূলত سكون قلب বা মনের স্থিরতা। কাজেই বিনয়কে নামায সহজসাধ্য হওয়ার কারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হবে ঃ মনের স্থিরতা অর্থাৎ বিনয় কিভাবে লাভ করা যায় ? একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যদি কোন ব্যক্তি তার অন্তরের বিচিত্র চিন্তাধারা ও নানাবিধ কল্পনাকে তার মন থেকে সরাসরি দূরীভূত করতে চায়, তবে এতে সফলতা লাভ করা প্রায় অসম্ভব, বরং এর প্রতিবিধান এই যে, মানব মন যেহেতু এক সময় বিভিন্ন দিকে ধাবিত হতে পারে না, সুতরাং যদি তাকে একটি মাত্র চিন্তায় মগ্ন ও নিয়োজিত করে দেওয়া যায়, তবে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা আপনা থেকেই হৃদয় থেকে বেরিয়ে যাবে। এজন্য خشوع বা বিনয়ের বর্ণনার পর এমন এক চিন্তার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে নিমগ্ন থাকলে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা প্রশমিত ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এগুলো দমে যাওয়ার ফলে হৃদয়ের অস্থিরতা দূর হয়ে স্থিরতা জন্মাবে। স্থিরতার দরুন নামায অনায়াসলব্ধ হবে এবং নামাযের উপর স্থায়িত্ব লাভ সম্ভব হবে। আর নামাযের নিয়মানুবর্তিতার দরুন গর্ব-অহংকার ও যশ-খ্যাতির মোহও হ্রাস পাবে। তাছাড়া ঈমানের পথে যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে তা দূরীভূত হয়ে পূর্ণ ঈমান লাভ সম্ভব হবে। কি চমৎকার সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিক চিকিৎসালয় !

এখন উল্লিখিত ভাব ও চিন্তার বর্ণনা এবং তা শিক্ষা প্রদান এভাবে করেছেন, আর বিনয়ী তারা যারা এ ধারণা পোষণ করে যে, তারা স্বীয় পালনকর্তার সাথে নিঃসন্দেহে সাক্ষাৎ করবে এবং সে সময় এ খেদমতের উত্তম ও যথোচিত পুরস্কার লাভ করবে। তাছাড়া এ ধারণাও পোষণ করে যে, তারা যখন স্বীয় পালনকর্তার নিকট ফিরে যাবে, তখন এর হিসাব-নিকাশও পেশ করতে হবে। এ দু'ধরনের চিন্তা দ্বারা رغبت ورهبت (আসক্তি ও ভীতি) সৃষ্টি হবে। যে কোন সচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকলে মন সৎকাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে, বিশেষত সৎকাজে প্রস্তুত ও আগ্রহী করে তোলার ক্ষেত্রে رغبت ورهبت-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ — صَلٰوة এর শাব্দিক অর্থ প্রার্থনা বা দোয়া। শরীয়তের পরিভাষায় সেই বিশেষ ইবাদত, যাকে নামায বলা হয়। কোরআন করীমে যতবার নামাযের তাকীদ দেওয়া হয়েছে—সাধারণত اقامت। শব্দের মাধ্যমেই দেওয়া হয়েছে। নামায পড়ার কথা শুধু দু'এক জায়গায় বলা হয়েছে। এজন্য اقامت صلوة (নামায প্রতিষ্ঠা)-এর মর্ম অনুধাবন করা উচিত اقامت।-এর শাব্দিক অর্থ সোজা করা, স্থায়ী রাখা। সাধারণত যে সব খুঁটি, দেওয়াল বা

গাছ প্রভৃতির আশ্রয়ে সোজাভাবে দাঁড়ানো থাকে, সেগুলো স্থায়ী থাকা এবং পড়ে যাওয়ার আশংকা কম থাকে। এজন্য اقامت স্থায়ী ও স্থিতিশীলকরণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

কোরআন ও সুন্নাহ্র পরিভাষায় اقامت صلوة অর্থ–নির্ধারিত সময় অনুসারে যাবতীয় শর্ত ও নিয়ম রক্ষা করে নামায আদায় করা। শুধু নামায পড়াকে اقامت صلوة বলা হয় না। নামাযের যত গুণাবলী, ফলাফল, লাভ ও বরকতের কথা কোরআন-হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই اقامت صلوة (নামায প্রতিষ্ঠা)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, কোরআন করীমে আছে– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (নিশ্চয়ই নামায মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।)

নামাযের এ ফল ও ক্রিয়ার তখনই প্রকাশ ঘটবে, যখন নামায উপরে বর্ণিত অর্থে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এজন্য অনেক নামাযীকে অশ্লীল ও ন্যক্কারজনক কাজে জড়িত দেখে এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে সন্দেহ্ পোষণ করা ঠিক হবে না। কেননা, তারা নামায পড়েছে বটে কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেনি। اٰتُوا الزَّكٰوةَ আভিধানিকভাবে যাকাতের অর্থ দু'রকম–পবিত্র করা ও বর্ধিত হওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় সম্পদের সে অংশকে যাকাত বলা হয়, যা শরীয়তের নির্দেশানুসারে সম্পদ থেকে বের করা হয় এবং শরীয়ত মোতাবেক খরচ করা হয়।

যদিও এখানে সমসাময়িক বনী-ইসরাঈলদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, নামায ও যাকাত ইসলাম-পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈলদের উপরই ফরয ছিল। কিন্তু সূরা মায়েদার আয়াত–

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ .

(নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক বনী-ইসরাঈল থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারজন দলপতি মনোনীত করে প্রেরণ করলাম। আর আল্লাহ্ পাক বললেন, যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর, তবে নিশ্চয়ই আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে।) এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী-ইসরাঈলের উপর নামায ও যাকাত ফরয ছিল। অবশ্য তার রূপ ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন।

وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ — رُكُوْع রুকূর শাব্দিক অর্থ ঝোঁকা বা প্রণত হওয়া। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এ শব্দ সিজদার স্থলেও ব্যবহৃত হয়। কেননা, সেটাও ঝোঁকারই সর্বশেষ স্তর। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় ঐ বিশেষ ঝোঁকাকে রুকূ বলা হয়, যা নামাযের মধ্যে প্রচলিত। আয়াতের অর্থ এই–'রুকুকারিগণের সাথে রুকু কর।' এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, নামাযের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে রুকূকে বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করা হলো ? উত্তর এই যে, এখানে নামাযের একটি অংশ উল্লেখ করে গোটা নামাযকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন কোরআন মজীদের এক জায়গায় قُرْاٰنَ الْفَجْرِ (ফজর নামাযের কোরআন পাঠ) বলে সম্পূর্ণ ফজরের নামাযকে বোঝানো হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের কোন কোন রেওয়ায়েতে 'সিজদা' শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ এক রাকা'আত বা গোটা নামাযকেই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং এর মর্ম এই যে, নামাযীদের সাথে নামায পড়। কিন্তু এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নামাযের অন্যান্য অংশের মধ্যে বিশেষভাবে রুকুর উল্লেখের তাৎপর্য কি ?

উত্তর এই যে, ইহুদীদের নামাযে সিজদাসহ অন্যান্য সব অঙ্গই ছিল, কিন্তু রুকূ ছিল না। রুকূ মুসলমানদের নামাযের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। এজন্য رَاكِعِيْنَ শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর নামাযিগণকে বোঝানো হবে, যাতে রুকূও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোমরাও উম্মতে মুহাম্মদীর নামাযীদের সাথে নামায আদায় কর। অর্থাৎ, প্রথম ঈমান গ্রহণ কর, পরে জামাতের সাথে নামায আদায় কর।

নামাযের জামাত সম্পর্কিত নির্দেশাবলী ঃ নামাযের হুকুম এবং তা ফরয হওয়া তো اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ শব্দের দ্বারা বোঝা গেল। এখানে مَعَ الرّٰاكِعِيْنَ (রুকূকারীদের সাথে) শব্দের দ্বারা নামায জামাতের সাথে আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ হুকুমটি কোন্ ধরনের ? এ ব্যাপারে উলামা ও ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাহাবা, তাবেয়ীন এবং ফুকাহাদের মধ্যে একদল জামাতকে ওয়াজিব বলেছেন এবং তা পরিত্যাগ করাকে কঠিন পাপ বলে অভিহিত করেছেন। কোন কোন সাহাবী তো শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত জামাতহীন নামায জায়েয নয় বলেই মন্তব্য করেছেন। যারা জামাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা এ আয়াতটি তাদের দলীল। এতদ্ভিন্ন কতক হাদীস দ্বারা জামাত ওয়াজিব বলে বোঝা যায়। যেমন– لاصلوة لجار المسجد الا فى المسجد (মসজিদের প্রতিবেশিগণের নামায মসজিদ ভিন্ন কোথাও জায়েয নয়) আর মসজিদের নামায অর্থ যে জামাতের নামায এটা সুস্পষ্ট। সুতরাং শব্দগতভাবে হাদীসের অর্থ এই যে, মসজিদের নিকটস্থ অধিবাসীদের নামায জামাত ব্যতীত জায়েয নয়। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, একজন অন্ধ সাহাবী হুযূর (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আমাকে মসজিদে পৌঁছাতে এবং সেখান থেকে নিয়ে যেতে পারে–আমার সাথে এমন লোক নেই। যদি আপনি অনুমতি দেন, তবে ঘরে বসেই নামায পড়বো। হুযূর (সা) প্রথমে তাকে অনুমতি দিলেন, কিন্তু রওয়ানা হওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বাড়ী থেকে আযান শোনা যায় কি ? সাহাবী (রা) আরয করলেন, আযান তো অবশ্যই শুনতে পাই। হুযূর (সা) বললেন, তাহলে তোমরাতো শরীক হওয়া উচিত। অন্য রেওয়ায়েতে আছে–তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের জন্য অন্য কোন সুযোগ বা অবকাশ দেখতে পাচ্ছি না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা) এরশাদ করেছেন ঃ من سمع النداء فلم يجب فلا صلواة الا من عذر (কোন ব্যক্তি আযান শোনার পর শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত যদি জামাতে উপস্থিত না হয়, তবে তার নামায হবে না)। এসব হাদীসের ভিত্তিতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ, আবূ মূসা আশ'আরী (রা) প্রমুখ সাহাবী ফতওয়া দিয়েছেন, যে ব্যক্তি মসজিদের এত নিকটে থাকে, যেখান থেকে আযানের আওয়াজ শোনা যায়, শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া সে যদি জামাতে শরীক না হয়, তবে তার নামায আদায় হবে না। (আওয়াজ শোনার অর্থ–মধ্যম ধরনের স্বরের অধিকারী লোকের আওয়াজ যেখানে পৌঁছাতে পারে। যন্ত্র বর্ধিত আওয়াজ বা অসাধারণ উচুঁ আওয়াজ ধর্তব্য নয়।)

এসব রেওয়ায়েত জামাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তাগণের স্বপক্ষে দলীল। কিন্তু অধিকাংশ উলামা, ফুকাহা, সাহাবা ও তাবেঈনের মতে জামাত হল সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্। কিন্তু ফজরের সুন্নতের ন্যায় সর্বাধিক তাকীদপূর্ণ সুন্নত। ওয়াজিবের একেবারে নিকটবর্তী। কোরআন করীমে

বর্ণিত وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ (এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর) اَمْرٌ (নির্দেশ)-কে এসব বিশেষজ্ঞগণ আয়াত ও রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে তাকীদ বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর বাহ্যিকভাবে যেসব হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, মসজিদের নিকটে বসবাসকারীদের নামায জামাত ব্যতীত আদায় হয় না—তার অর্থ এই বলে প্রকাশ করেছেন যে, এ নামায পরিপূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতই যথেষ্ট। সেখানে একদিকে যেমন জামাতের তাকীদ, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা রয়েছে, সাথে সাথে এর মর্যাদার ও স্তরের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তা 'সুনানে হুদা'র পর্যায়ভুক্ত, যাকে ফকীহগণ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং কেউ যদি রোগ-ব্যাধি প্রভৃতি কোন শরীয়তস্বীকৃত কারণ ছাড়া জামাতে শরীক না হয়ে একাকী নামায পড়ে নেয়, তবে তার নামায হয়ে যাবে, কিন্তু সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ছেড়ে দেওয়ার দরুন সে শাস্তিযোগ্য হবে। অথচ যদি জামাত ছেড়ে দেওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করে নেয়, তবে মস্ত বড় পাপী হবে। বিশেষত যখন এমন অবস্থা হয় যে, মানুষ ঘরে বসে নামায পড়ে মসজিদ বিরাণ হতে থাকে, তখন এরা সবাই শরীয়তানুযায়ী শাস্তিযোগ্য হবে। কাজী আয়ায (র) বলেছেন যে, এসব লোককে বোঝানোর পরেও যদি ফিরে না আসে, তবে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে।

আমলহীন উপদেশ প্রদানকারীর নিন্দা ঃ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ। (তোমরা অন্যকে সৎকাজের নির্দেশ দাও অথচ নিজেদেরকে ভুলে বস)। এ আয়াতে ইহুদী আলেমদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, তারা তো নিজেদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ করতে এবং ইসলামের উপর স্থির থাকতে নির্দেশ দেয়। (এ থেকে বোঝা যায় ইহুদী আলেমগণ দীন ইসলামকে নিশ্চিতভাবে সত্য বলে মনে করত)। নিজেরা প্রবৃত্তির কামনার দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ করতে কখনো প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু যারাই অপরকে পুণ্য ও মঙ্গলের প্রেরণা দেয়, অথচ নিজের ক্ষেত্রে তা কার্যে পরিণত করে না, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা সবাই ভর্ৎসনা ও নিন্দাবাদের অন্তর্ভুক্ত। এ শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে হাদীসে করুণ পরিণতি ও ভয়ংকর শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর (সা) এরশাদ করেন, মি'রাজের রাতে আমি এমন কিছু সংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যাদের জিহ্বা ও ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম—এরা কারা ? জিবরাঈল বললেন—এরা আপনার উম্মতের পার্থিব স্বার্থপূজারী উপদেশদানকারী, যারা অপরকে তো সৎকাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজের খবর রাখতো না। (কুরতুবী)

নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন, কতিপয় জান্নাতবাসী কতক নরকবাসীকে অগ্নিদগ্ধ হতে দেখে জিজেস করলেন যে, তোমরা কিভাবে দোযখে প্রবেশ করলে অথচ আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তো সেসব সৎকাজের দৌলতেই জান্নাত লাভ করেছি, যা তোমাদের কাছে শিখেছিলাম? দোযখবাসীরা বলবে, আমরা মুখে অবশ্য বলতাম কিন্তু নিজে তা কাজে পরিণত করতাম না।

পাপী ওয়ায়েজ উপদেশ প্রদান করতে পারে কি না ঃ উল্লেখিত বর্ণনা থেকে একথা যেন বোঝা না হয় যে, কোন আমলহীন বিরুদ্ধাচারীর পক্ষে অপরকে উপদেশ দান করা জায়েয নয়

এবং কোন ব্যক্তি যদি কোন পাপে লিপ্ত থাকে, তবে সে অপরকে উক্ত পাপ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে পারে না। কারণ, সৎকাজের জন্য ভিন্ন নেকী ও সৎকাজের প্রচার-প্রসারের জন্য পৃথক ও স্বতন্ত্র নেকী। আর এটা সুস্পষ্ট যে, এক নেকী পরিহার করলে অপর নেকীও পরিহার করতে হবে এমন কোন কথা নেই, যেমন, কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে অপরকেও নামায পড়তে বলতে পারবে না, এমন কোন কথা নয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে রোযাও রাখতে পারবে না, এমন কোন কথা নেই। তেমনিভাবে কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়া ভিন্ন পাপ এবং নিজের অধীনস্থ লোকদেরকে ঐ অবৈধ কাজ থেকে বারণ না করা পৃথক পাপ। একটি পাপ করেছে বলে অপর পাপও করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

যদি প্রত্যেক মানুষ নিজে পাপী বলে সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বাধাদান করা ছেড়ে দেয় এবং বলে যে, যখন নিষ্পাপ হতে পারবে, তখনই অপরকে উপদেশ দেবে, তাহলে ফল দাঁড়াবে এই যে, কোন তাবলীগকারীই অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা, এমন কে আছে, যে পরিপূর্ণ নিষ্পাপ ? হযরত হাসান (রা) এরশাদ করেছেন—শয়তান তো তা-ই চায় যে, মানুষ এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তাবলীগের দায়িত্ব পালন না করে বসে থাক।

মূল কথা এই যে, أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (তোমরা কি অপরকে সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে ভুলে বস ?) আয়াতের অর্থ এই যে, উপদেশ দানকারী (ওয়ায়েজকে) আমলহীন থাকা উচিত নয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ওয়ায়েজ কিংবা ওয়ায়েজ নয়—এমন কারো পক্ষেই যখন আমলহীন থাকা জায়েয নয়, তাহলে এখানে বিশেষভাবে ওয়ায়েজের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা কি ? উত্তর এই যে, বিষয়টি উভয়ের জন্য নাজায়েয, কিন্তু ওয়ায়েজ বহির্ভূতদের তুলনায় ওয়ায়েজের অপরাধ অধিক মারাত্মক। কেননা, ওয়ায়েজ অপরাধকে অপরাধ মনে করে জেনে শুনে করছে। তার পক্ষে এ ওযর গ্রহণযোগ্য নয় যে, এটা যে অপরাধ তা আমার জানা ছিল না। অপরপক্ষে ওয়ায়েজ বহির্ভূত মূর্খদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এছাড়া ওয়ায়েজ ও আলেম যদি কোন অপরাধ করে তবে তা হয় ধর্মের সাথে এক প্রকারের পরিহাস। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর (সা) এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক অশিক্ষিত লোকদেরকে যত ক্ষমা করবেন, শিক্ষিতদেরকে তত ক্ষমা করবেন না।

দু'টি মানসিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার ঃ সম্পদ-প্রীতির ও যশ-খ্যাতির মোহ এমন ধরনের দু'টি মানসিক ব্যাধি, যদ্দরুন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনই নিষ্প্রভ ও অসার হয়ে পড়ে। গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, মানবেতিহাসে এযাবৎ যতগুলো মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং যত বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বিস্তার লাভ করেছে, সেগুলোর উৎপত্তিই হয়েছিল উল্লেখিত এ দু'টি ব্যাধি থেকে।

সম্পদ প্রাপ্তির পরিণতি ও ফলাফল ঃ

(১) অর্থ গৃধ্নুতা ও কৃপণতার অন্যতম জাতীয় ক্ষতির দিক হল এই যে, তার সম্পদ জাতির কোন উপকারে আসে না। দ্বিতীয় ক্ষতিটি তার ব্যক্তিগত। এ প্রকৃতির লোককে সমাজে কখনও সুনজরে দেখা হয় না।

(২) স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা ঃ তার সম্পদলিপ্সা পূরণার্থে জিনিসে ভেজাল মেশানো, মাপে কম দেওয়া, মজুদদারী, মুনাফাখোরী, প্রবঞ্চনা-প্রতারণা প্রভৃতি ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন তার মজ্জাগত হয়ে যায়। স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে সে অপরের রক্ত নিংড়ে নিতে চায়। পরিশেষে পুঁজিপতি ও মজুরদের পারস্পরিক বিবাদের উৎপত্তি হয়।

(৩) এমন লোক যত সম্পদই লাভ করুক, কিন্তু আরো অধিক উপার্জনের চিন্তা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে, অবকাশ ও অবসর বিনোদনের সময়েও তার একই ভাবনা থাকে যে, কিভাবে তার পুঁজি আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে যে সম্পদ তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে পরিণত হতে পারত তা পরিণামে তার জীবনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

(৪) সত্য কথা যত উজ্জ্বল হয়েই সামনে উদ্ভাসিত হোক না কেন, তার এমন কোন কথা মনে নেওয়ার সৎসাহস থাকে না, যাকে সে তার উদ্দেশ্য সাধন ও সম্পদ লাভের পথে প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। এসব বিষয় পরিশেষে গোটা সমাজের শান্তি বিনষ্ট করে।

গভীরভাবে চিন্তা করলে যশ-খ্যাতির মোহের অবস্থাও প্রায় একই রকম বলে পরিলক্ষিত হবে। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ অহংকার, স্বার্থান্বেষী, অধিকার হরণ, ক্ষমতা লিপ্সা এবং এর পরিণতিতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও অনুরূপ আরো অগণিত মানবেতর সমাজবিরোধী ও নৈতিকতা বিবর্জিত দাঙ্গা-হাঙ্গামার উৎপত্তি ঘটে, যা পরিণামে গোটা বিশ্বকে নরকে পরিণত করে দেয়। এই উভয় ব্যাধির প্রতিকার কুরআন পাক এভাবে উপস্থাপন করেছে-বলা হয়েছে ঃ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (তোমরা নাসাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।) অর্থাৎ ধৈর্যধারণ করে ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে বশীভূত করে ফেলে। তাতে সম্পদপ্রীতি হ্রাস পাবে। কেননা, সম্পদ বিভিন্ন আস্বাদ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যম বলেই ধন-প্রেমের উদ্ভব হয়। যখন এসব আস্বাদ ও কামনা-বাসনার অন্ধ অনুসরণ পরিহার করতে দৃঢ়সংকল্প হবে, তখন প্রাথমিক অবস্থার খানিকটা কষ্টবোধ হলেও ধীরে ধীরে এসব কামনা যথোচিত ও ন্যায়সঙ্গত পর্যায়ে নেমে আসবে এবং ন্যায় ও মধ্যম পন্থা তোমাদের স্বভাব ও অভ্যাসে পরিণত হবে। তখন আর সম্পদের প্রাচুর্যের কোন আবশ্যকতা থাকবে না। সম্পদের মোহও এত প্রবল হবে না যে, নিজস্ব লাভ-ক্ষতির বিবেচনা ও নেশা তোমাকে অন্ধ করে দেবে।

আর নামায দ্বারা যশ-খ্যাতির আকর্ষণও দমে যাবে। কেননা নামাযের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সব ধরনের বিনয় ও নম্রতাই বিদ্যমান। যখন যথানিয়মে ও যথাযথভাবে নামায আদায় করার অভ্যাস গড়ে উঠবে, তখন সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের সামনে নিজের অক্ষমতা ও ক্ষুদ্রতার ধারণা বিরাজ করতে থাকবে। ফলে অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও মান-মর্যাদার মোহ হ্রাস পাবে।

বিনয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব ঃ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ। (কিন্তু বিনয়ীদের পক্ষে মোটেও কঠিন নয়।) কুরআন ও সুন্নাহ যেখানে خُشُوْع বা বিনয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে এর অর্থ অক্ষমতা ও অপারগতাজনিত সেই মানসিক অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ পাকের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে সৃষ্টি। এর ফলে ইবাদত-উপাসনা সহজতর হয়ে যায়। কখনও এর লক্ষণাদি দেহেও প্রকাশ

পেতে থাকে। তখন এ শিষ্টাচার-সম্পন্ন বিনম্র ও কোমলমন বলে পরিদৃষ্ট হয়। যদি হৃদয়ে আল্লাহ্-ভীতি ও নম্রতা না থাকে, তবে মানুষ বাহ্যিকভাবে যতই শিষ্টাচারের অধিকারী ও বিনম্র হোক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বিনয়ের অধিকারী হয় না। বিনয়ের লক্ষণাদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করাও পছন্দনীয় ও বাঞ্ছনীয় নয়।

হযরত উমর (রা) একবার এক যুবককে নতশিরে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'মাথা ওঠাও, বিনয় হৃদয়ে অবস্থান কর।'

হযরত ইব্রাহীম নখয়ী (র) বলেন, মোটা কাপড় পরা, মোট খাওয়া এবং মাথা নত করে থাকার নামই বিনয় নয়।

خشوع বা বিনয় অর্থ حق বা অধিকারের ক্ষেত্রে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সবার সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করা এবং আল্লাহ্ পাক তোমার উপর যা ফরয করে দিয়েছেন, তা পালন করতে গিয়ে হৃদয়কে শুধু তারই জন্য নির্দিষ্ট ও কেন্দ্রীভূত করে নেওয়া।

সারকথা—ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বিনয়ীদের রূপ ধারণ করা শয়তান ও প্রবৃত্তির প্রতারণামাত্র। আর তা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তা ক্ষমার্হ।

জ্ঞাতব্য ঃ خشوع-এর সাথে সাথে অপর একটি শব্দ خضوع-ও ব্যবহৃত হয়। কোরআন করীমের বিভিন্ন জায়গায়ও তা রয়েছে। এ শব্দ দু'টি প্রায় সমার্থক। কিন্তু خشوع শব্দ মূলত কণ্ঠ ও দৃষ্টির নিম্নমুখিতা ও বিনয় প্রকাশার্থ ব্যবহৃত হয়—যখন তা কৃত্রিম হবে না, বরং অন্তরের ভীতি ও নম্রতার ফলস্বরূপ হবে। কোরআন করীমে আছে خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ (শব্দ নীচু হয়ে গেল।) এবং خضوع শব্দে দৈহিক ও বাহ্যিক বিনয় ও ক্ষুদ্রতাকে বোঝায়। কোরআন করীমে আছে فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (অতঃপর তাদের কাঁধ তার সামনে ঝুঁকিয়ে দিল।)

নামাযে বিনয়ের ফেকাহ্গত মর্যাদা ঃ নামাযে خشوع বিনয়ের তাকীদ বারবার এসেছে। এরশাদ হয়েছে ঃ أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ (আমার স্মরণে নামায প্রতিষ্ঠা কর) এবং একথা স্পষ্ট যে, غَفْلَتْ (অমনোযোগিতা) স্মরণের পরিপন্থী। যে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে غافل (অমনোযোগী) সে আল্লাহ্কে স্মরণ করার দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ নয়। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ (এবং অমনোযোগীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না)। রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন ঃ নামায বিনয় ও ক্ষুদ্রতা প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। অন্য কথায়, অন্তরে বিনয় ও ক্ষুদ্রতা-বোধ না থাকলে তা নামাযই নয়। অপর এক হাদীসে আছে—যার নামায তাকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত না রাখে, সে আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। আর গাফেল বা অমনোযোগীর নামায তাকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল, যে লোক অন্যমনস্ক হয়ে নামায পড়ে, সে আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ইমাম গাযালী (র) উল্লিখিত আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহ এবং অন্য উদ্ধৃতি দিয়ে এরশাদ করেছেন, এগুলোর দ্বারা বোঝা যায় যে, خشوع বা বিনয় নামাযের শর্ত এবং নামাযের বিশুদ্ধতা এরই উপর নির্ভরশীল। হযরত

মু'আয ইবনে জাবাল (রা), সুফিয়ান সওরী ও হাসান বসরী (র) প্রমুখের অভিমত এই যে, খুশু ও বিনয় ব্যতীত নামায আদায় হয় না, বরং তা ভঙ্গ হয়ে যায়।

কিন্তু ইমাম চতুষ্টয় ও অধিকাংশ ফকীহ্‌র মতে খুশু নামাযের শর্ত না হলেও তারা একে নামাযের রূহ বা আত্মা বলে মন্তব্য করে এ শর্ত আরোপ করেছেন যে, তাকবীরে-তাহরীমার সময় বিনয়সহ মনের একাগ্রতা বজায় রেখে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নামযের নিয়ত করতে হবে। পরে যদি খুশু (خشوع) বিদ্যমান না থাকে তবে যদিও সে নামাযের অতটুকু অংশের সওয়াব লাভ করবে না, যে অংশে খুশু উপস্থিত ছিল না, তবে ফেকাহ্ অনুযায়ী তাকে নামায পরিত্যাগকারীও বলা চলবে না এবং নামায পরিত্যাগকারীর উপর যে শাস্তি প্রযোজ্য, তার জন্য সে শাস্তি বিধানও করা যাবে না। কারণ ফকীহ্‌গণ মানসিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থাদি বিবেচনা করে হুকুম প্রয়োগ করেন না, বরং তারা নিছক বাহ্যিক কার্যাবলীর ভিত্তিতে হুকুম বর্ণনা করেন। কোন কাজের সাওয়াব পরকালে পাবে কি পাবে না একথা ফেকাহ্ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ই নয়। সুতরাং যেহেতু অভ্যন্তরীণ অবস্থার ভিত্তিতে হুকুম প্রয়োগ করা তাঁদের আলোচনাবহির্ভূত এবং খুশু (বিনয়) একটি আভ্যন্তরীণ অবস্থা। সুতরাং তাঁরা খুশুকে সম্পূর্ণ নামাযের শর্ত নির্ধারণ করেন নি, বরং খুশুর ন্যূনতম পর্যায়কে শর্ত সাব্যস্ত করেছেন। আর তা হল এই যে, কমপক্ষে তাকবীরে-তাহরীমার সময় তা যেন বিদ্যমান থাকে।

খুশুকে গোটা নামাযে শর্ত নির্ধারণ না করার দ্বিতীয় কারণ এই যে, কুরআন করীমের অন্যান্য আয়াতে শরীয়তী বিধান প্রয়োগের সুস্পষ্ট নীতি বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের জন্য এমন কোন কাজ ফরয করা হয়নি, যা তার ক্ষমতা ও সাধ্যের অতীত। পুরো নামাযে খুশু বজায় রাখা কিছু সংখ্যক বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং সাধ্যাতীত দায়িত্ব আরোপ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য পুরো নামাযের স্থলে কেবল নামাযের প্রারম্ভিক স্তরে খুশুকে শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

খুশুহীন নামাযও সম্পূর্ণ নিরর্থক নয় ঃ সবশেষে 'খুশু'র এ অসাধারণ গুরুত্ব সত্ত্বেও মহান পরওয়ারদিগারের দরবারে আমাদের এই কামনা যেন অন্যমনস্ক ও গাফেল নামাযীও সম্পূর্ণভাবে নামায পরিত্যাগকারীর পর্যায়ভুক্ত না হয়। কেননা যে অবস্থায়ই হোক, সে অন্তর ফরয আদায়ের পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সামান্য সময়ের জন্য হলেও অন্তরকে যাবতীয় আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র প্রতি নিয়োজিত করেছে। কেননা, কমপক্ষে নিয়তের সময় শুধু সে আল্লাহ্ পাকেরই ধ্যানে নিমগ্ন ছিল। এ ধরনের নামাযে অন্তত এতটুকু উপকার অবশ্যই হবে যে, তাদের নাম অবাধ্য ও বেনামাযীদের তালিকা-বহির্ভূত থাকবে।

কিন্তু তা নাহলে অন্যমনস্কদের অবস্থা পরিত্যাগকারীদের চাইতেও করুণ ও নিকৃষ্ট হয়ে যেতে পারে। কেননা, যে গোলাম প্রভুর খেদমতে উপস্থিত থেকেও তার প্রতি অমনোযোগী থাকে এবং তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলে, তার অবস্থা যে গোলাম আদৌ খেদমতে হাযির হয় না তার চাইতে অধিক ভয়াবহ ও মারাত্মক।

সারকথা, এটা আশা ও নিরাশার ব্যাপার ; এতে শাস্তির আশঙ্কাও রয়েছে, পুরস্কারের আশাও রয়েছে।

يٰبَنِىٓ اِسۡرَآءِيۡلَ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتِىَ الَّتِىٓ اَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَاَنِّىۡ فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوۡا يَوۡمًا لَّا تَجۡزِىۡ نَفۡسٌ عَنۡ نَّفۡسٍ شَيۡـًٔا وَّلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٌ وَّلَا هُمۡ يُنۡصَرُوۡنَ ﴿٤٨﴾

(৪৭) হে বনী-ইসরাঈলগণ! তোমরা স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা, যা আমি তোমাদের ওপর করেছি এবং (স্মরণ কর) সে বিষয়টি যে, আমি তোমাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি সমগ্র বিশ্বের ওপর। (৪৮) আর সে দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবূল হবে না, কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেওয়া হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যও পাবে না।

তফসীরের সার সংক্ষেপ

হে ইয়াকূব (আ)-এর বংশধর ! তোমরা আমার প্রদত্ত সে সব নেয়ামতের কথা স্মরণ কর (যাতে কৃতজ্ঞতা ও উপাসনা-আরাধনার প্রেরণা সৃষ্টি হয়) এবং এ কথাও স্মরণ কর যে, আমি তোমাদেরকে (বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে) বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি (এর অর্থ এও হতে পারে 'এবং আমি তোমাদেরকে সৃষ্ট জগতে এক বিরাট অংশের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি।)

জ্ঞাতব্য ঃ এ আয়াতে যেহেতু হুযূর (সা)-এর সমসাময়িক ইহুদীদের সম্বোধন করা হয়েছে এবং সাধারণ যে অনুকম্পা ও সম্মান পিতৃপুরুষের ওপর প্রদর্শন করা হয়, তদ্দ্বারা তার পরবর্তী বংশধরগণও উপকৃত হয়। এটাই সাধারণভাবে দেখা যায়। এজন্য ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তারাও এ আয়াতের সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। আর এমন একদিন সম্পর্কে ভয় কর, যেদিন কোন ব্যক্তি কারো পক্ষে কোন দাবী আদায় করতে পারবে না এবং কারো কোন সুপারিশও গৃহীত হবে না। (যার সম্পর্কে সুপারিশ করা হচ্ছে তার মধ্যে যদি ঈমান না থাকে)। আর কারো পক্ষ থেকে কোন বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের কারো পক্ষপাতিত্বও করা যাবে না।

জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য আয়াতে যে দিনের কথা বলা হয়েছে, সেটি হল কিয়ামতের দিন। দাবী আদায় করে দেওয়ার অর্থ—যেমন, কেউ নামায-রোযা সংক্রান্ত হিসাবের সম্মুখীন হলে, তখন অপর কেউ যদি বলে যে, আমার নামায-রোযার বিনিময়ে তাকে হিসাবমুক্ত করে দেওয়া হোক, তবে তা গৃহীত হবে না। বিনিময় অর্থ, টাকা-পয়সা বা ধন-সম্পদের বিনিময়ে দায়মুক্ত করে দেওয়া। এ দু'টির কোনটিই গ্রহণ করা হবে না। ঈমান ব্যতীত সুপারিশ গৃহীত না হওয়ার কথা কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও বোঝা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে এদের পক্ষে কোন

সুপারিশই গৃহীত হবে না। ফলে তা গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই উঠবে না। আর পক্ষপাতিত্বের রূপ এই যে, কোন ক্ষমতাশীল ব্যক্তি সাহায্য করে কাউকে জোরপূর্বক উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারবে না।

মোটকথা, দুনিয়াতে সাহায্য করার যত পদ্ধতি আছে, ঈমান ব্যতীত সেগুলোর কোনটাই আখিরাতে কার্যকর হবে না।

وَإِذْ نَجَّيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

(৪৯) আর স্মরণ কর, সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদিগকে মুক্তি দান করেছি ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে, যারা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করত ; তোমাদের পুত্র-সন্তানদের জবাই করত এবং তোমাদের স্ত্রীদিগকে অব্যাহতি দিত। বস্তুত তাতে পরীক্ষা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মহাপরীক্ষা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ওপরে যে বিশেষ আচরণের বিষয় উদ্ধৃত করা হয়েছে, এখান থেকে তার বিস্তারিত বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে। প্রথম আচরণ ও ঘটনা এই) আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের (পিতৃপুরুষদেরকে ফেরাউনের হাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলাম) যারা (সর্বক্ষণ) তোমাদেরকে (মানসিক কষ্ট) ও কঠোর যন্ত্রণা দেওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকত, আর তোমাদের পুত্র-সন্তানদের গলা কেটে মেরে ফেলত এবং তোমাদের স্ত্রীলোকদেরকে (অর্থাৎ কন্যা সন্তানদেরকে) জীবিত রাখত, (যেতে তারা পূর্ণ বয়স্কা মহিলার পর্যায়ে পৌঁছে)। বস্তুত এই (ঘটনার) মধ্যে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা ছিল।

জ্ঞাতব্য ঃ কোন ব্যক্তি ফেরাউনের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ইসরাঈল বংশে এমন এক ছেলের জন্ম হবে, যার হাতে তোমার রাজ্যের পতন ঘটবে। এজন্য ফেরাউন নবজাত পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করল। আর যেহেতু মেয়েদের দিক থেকে কোন রকম আশংকা ছিল না, সুতরাং তাদের সম্পর্কে নিশ্চুপ রইলো। দ্বিতীয়ত, এতে তার নিজস্ব একটি মতলবও ছিল যে, সেই স্ত্রীলোকদেরকে দিয়ে ধাত্রী পরিচারিকার কাজও করানো যাবে। সুতরাং এ অনুকম্পাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

এই ঘটনার দ্বারা হয় উল্লিখিত হত্যাকাণ্ডকে বোঝানো হয়েছে অথবা বিপদে ধৈর্যের পরীক্ষা অথবা অব্যাহতি দানের কথা বোঝানো হয়েছে, যা এক অনুগ্রহ ও নিয়ামত। আর নিয়ামতের ক্ষেত্রেই শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা হয়। পরবর্তী আয়াতে অব্যাহতি দানের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝٥٠ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝٥١

(৫০) আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরাউনের লোকদিগকে অথচ তোমরা দেখছিলে। (৫১) আর তখন আমি মূসার সাথে ওয়াদা করেছি চল্লিশ রাত্রির, অতঃপর তোমরা গো-বৎস বানিয়ে নিয়েছ মূসার অনুপস্থিতিতে। বস্তুত তোমরা ছিলে জালিম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের (পথ বের করার) উদ্দেশ্যে সমুদ্রকে বিভক্ত করে দিলাম। অতঃপর আমি তোমাদেরকে (ডুবে মরার হাত থেকে) উদ্ধার করলাম এবং ফেরাউনসহ তার সহচরদেরকে ডুবিয়ে মারলাম। অথচ তোমরা স্বচক্ষে দেখছিলে।

জ্ঞাতব্য ঃ এ ঘটনা ঐ সময় ঘটে যখন মূসা (আ) জন্মগ্রহণের পর নবুয়ত লাভ করেন এবং বহুকাল পর্যন্ত ফেরাউনকে বোঝাতে থাকেন, কিন্তু সে কোনক্রমেই যখন সঠিক পথে আসল না, তখন হুকুম হল যে, বনী ইসরাঈলসহ গোপনে তুমি এখান থেকে চলে যাও। কিন্তু পথে সমুদ্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। এমন সময় ফেরাউন পেছন দিকে থেকে সসৈন্যে সেখানে এসে পৌঁছল। আল্লাহ্ পাকের হুকুমে সমুদ্র দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়ায় বনী-ইসরাঈলরা পথ পেয়ে পার হয়ে গেল। ফেরাউনের আগমন পর্যন্ত সমুদ্র দ্বিধাবিভক্ত হয়েই রইলো। সেও পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে সে পথেই ঢুকে পড়লো। এমন সময় দু'দিক থেকে পানি চেপে এল এবং সমুদ্র পূর্ববর্তী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। ফলে সপারিষদ ও সসৈন্যে ফেরাউনের সলিল সমাধি ঘটল।

আর (ঐ সময়টির কথাও স্মরণ কর,) যখন আমি মূসা (আ)-এর সাথে (তওরাত অবতীর্ণ করার নির্দিষ্ট সময়ান্তে সে নির্ধারিত সময়ের সাথে আরো দশ দিন বর্ধিত করে সর্বমোট) চল্লিশ রাতের অঙ্গীকার করেছিলাম। মূসা (আ)-এর (প্রস্থানের) পর তোমরা গো-বৎস বানিয়ে (পূজার ব্যবস্থা করে) নিলে এবং তোমরা (এ ব্যবস্থা অবলম্বন করে প্রকাশ্য) জুলুমে (সীমালঙ্ঘনে দৃঢ়ভাবে হয়েছিলে, অর্থাৎ এক অবাস্তব ও অপ্রাসঙ্গিক কথার সমর্থক ও বিশ্বাসী হয়েছিলে)।

জ্ঞাতব্য ঃ এ ঘটনা ঐ সময়ের, যখন ফেরাউন সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী-ইসরাঈলরা কারো কারো মতে মিসরে ফিরে এসেছিল—আবার কারো কারো মতে অন্য কোথাও বসবাস

করছিল–তখন মূসা (আ)-এর খেদমতে বনী-ইসরাঈলরা আরয করল ঃ আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিত। যদি আমাদের জন্য কোন শরীয়ত নির্ধারিত হয়, তবে আমাদের জীবন বিধান হিসাবে আমরা তা গ্রহণ ও বরণ করে নেব। মূসা (আ)-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক অঙ্গীকার প্রদান করলেন ঃ তুমি তূর-পর্বতে অবস্থান করে এক মাস পর্যন্ত আমার আরাধনা ও অতন্দ্র সাধনায় নিমগ্ন থাকার পর তোমাকে এক কিতাব দান করব। মূসা (আ) তা-ই করলেন। ফলে তওরাত লাভ করলেন। কিন্তু অতিরিক্ত দশদিন উপাসনা-আরাধনায় মগ্ন থাকার নির্দেশ দেওয়ার কারণ ছিল এই যে, হযরত মূসা (আ) এক মাস রোযা রাখার পর ইফ্তার করে ফেলেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে রোযাদারের মুখের গন্ধ অত্যন্ত পছন্দনীয় বলে মূসা (আ)-কে আরো দশদিন রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন, যাতে পুনরায় সে গন্ধের উৎপত্তি হয়। এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হলো। মূসা (আ) তো ওদিকে তূর পর্বতে রইলেন। এদিকে সামেরী নামক এক ব্যাক্তি সোনা-রূপা দিয়ে গো-বৎসের একটি প্রতিমূর্তি তৈরী করল এবং তার কাছে পূর্ব থেকে সংরক্ষিত জিবরাঈল (আ)-এর ঘোড়ার খুরের তলার কিছু মাটি প্রতিমূর্তির ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ায় সেটি জীবন্ত হয়ে উঠলো এবং অশিক্ষিত বনী ইসরাঈলরা তারই পূজা করতে আরম্ভ করে দিল।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٢﴾

---

(৫২) অতঃপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তবুও আমি (তোমাদের তওবার পরিপ্রেক্ষিতে) এত বড় অপরাধ করা সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম–এ আশায় যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে।

জ্ঞাতব্য ঃ এ তওবার বর্ণনা পরবর্তী তৃতীয় আয়াতে রয়েছে। আর আশার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ পাকের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল, বরং এর অর্থ এই যে, মাফ করে দেওয়া এমনই জিনিস, যার প্রতি লক্ষ্য করে বনী ইসরাঈল আল্লাহ্ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে বলে দর্শকদের মনে আশার সঞ্চার হতে পারে।

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾

---

(৫৩) আর (স্মরণ কর) যখন আমি মূসাকে কিতাব এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বিধানকারী নির্দেশ দান করেছি, যাতে তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হতে পার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সে সময়ের কথা স্মরণ কর,) যখন আমি মূসা (আ)-কে (তওরাত) গ্রন্থ এবং সত্য-অসত্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী নির্দেশাবলী দান করেছিলাম–যেন তোমরা (সরল ও সঠিক) পথে চলতে পার।

জ্ঞাতব্য ঃ মীমাংসার বস্তু দ্বারা হয়ত তওরাতের অন্তর্ভুক্ত শরীয়তী বিধানমালাকে বোঝানো হয়েছে। কেননা শরীয়তের মাধ্যমে যাবতীয় বিশ্বাসগত ও কর্মগত মতবিরোধের মীমাংসা হয়ে যায়। অথবা মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনাবলীকে বোঝোনো হয়েছে–যদ্দ্বারা সত্য ও মিথ্যা দাবীর ফয়সালা হয় অথবা স্বয়ং তওরাতই এর অর্থ। কেননা এর মধ্যে গ্রন্থ ও মীমাংসাকারীর জন্য প্রয়োজনীয় উভয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ রয়েছে।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾

(৫৪) আর যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদেরই ক্ষতি সাধন করেছ এই গো-বৎস নির্মাণ করে। কাজেই এখন তওবা কর স্বীয় স্রষ্টার প্রতি এবং নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের স্রষ্টার নিকট। তারপর তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করা হল। নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাকারী, অত্যন্ত মেহেরবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সে সময়ের কথাও স্মরণ কর) যখন মূসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, নিশ্চয়ই তোমরা গো-বৎস পূজার ব্যবস্থাও প্রচলন করে নিজেদের ভয়ানক ক্ষতি সাধন করেছ। এখন তোমরা তোমাদের স্রষ্টার প্রতি ফিরে আস। অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ (যারা গো-বৎস পূজায় অংশ গ্রহণ করেনি) অন্যদেরকে (যারা গো-বৎস পূজায় অংশ নিয়েছিল) হত্যা কর। এ নির্দেশ (কার্যে পরিণত করা) তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তোমাদের জন্য শুভ ও মঙ্গলজনক হবে। অতঃপর (তা কার্যে পরিণত করলে) আল্লাহ্ পাক তোমাদের অবস্থার প্রতি (কৃপাদৃষ্টিসহ) লক্ষ্য করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি তো এমনই, যে তওবা কবূল করে নেন এবং করুণা বর্ষণ করেন।

জ্ঞাতব্য ঃ এটা তাদের তওবার প্রস্তাবিত বর্ণনা—অর্থাৎ অপরাধীগণকে হত্যা করে দেওয়া। আমাদের শরীয়তেও এমন কোন কোন অপরাধের জন্য তওবা করা সত্ত্বেও মৃত্যুদণ্ড বা শারীরিক দণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন, ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হত্যা। সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত

যেনার (ব্যভিচার) শাস্তি 'রজ্ম' বা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। তওবার দ্বারা এ শাস্তি থেকে অব্যাহতি নেই। বস্তুত তারা এ নির্দেশ কার্যে পরিণত করেছিল বলে দয়া ও করুণার অধিকারী হয়েছে।

وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٥﴾

(৫৫) আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা, কস্মিনকালেও আমরা তোমাদের বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমারা আল্লাহ্‌কে (প্রকাশ্য) দেখতে পাব। বস্তুত তোমাদেরকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ। অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সে সময়টির কথা স্মরণ কর) যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা, আমরা (শুধু) তোমার বলাতে কখনো মানব না (যে, এটি আল্লাহ্‌র বাণী) যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা (স্বচক্ষে) আল্লাহ্‌কে স্পষ্টভাবে দেখতে না পাব। সুতরাং (এ ধৃষ্টতার জন্য) তোমাদের উপর বজ্রপাত হলো, যা তোমাদের স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলে।

জ্ঞাতব্য ঃ ঘটনা এই যখন হযরত মূসা (আ) তূর পর্বত থেকে তওরাত নিয়ে এসে বনী ইসরাঈলের সামনে পেশ করে বললেন যে, এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত কিতাব, তখন কিছু সংখ্যক উদ্ধত লোক বলল, যদি আল্লাহ্ স্বয়ং বলে দেন যে, এ কিতাব তাঁর প্রদত্ত, তবে অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস এসে যাবে। মূসা (আ) আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে এতদুদ্দেশ্যে তাদেরকে তূর পর্বতে যেতে বললেন। বনী ইসরাঈলরা সত্তর জন লোককে মনোনীত করে হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গে তূর পর্বতে পাঠাল। সেখানে পৌঁছে তারা আল্লাহ্‌র বাণী স্বয়ং শুনতে পেল। তখন তারা নতুন ভান করে বলল, শুধু কথা শুনে তো আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না—আল্লাহ্‌ই জানেন এ কথা কে বলছে। যদি আল্লাহ্‌কে দেখতে পাই, তবে অবশ্যই মেনে নেব। কিন্তু যেহেতু এ মরজগতে আল্লাহ্‌কে দেখার ক্ষমতা কারো নেই, কাজেই এ ধৃষ্টতার জন্য তাদের উপর বজ্রপাত হল এবং সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের এ ধ্বংসপ্রাপ্তির বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

(৫৬) তারপর মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি তুলে দাঁড় করিয়েছি, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর আমি (হযরত মূসা (আ)-এর বদৌলতে) মরে যাওয়ার পর তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করলাম এ আশায় যে, তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার করে নেবে।

জ্ঞাতব্য ঃ 'মউত' শব্দ দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তারা বজ্রপাতের ফলে মৃত্যুবরণ করেছিল। তাদের পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনা এরূপ—মূসা (আ) আল্লাহ্‌র দরবারে নিবেদন করলেন, বনী ইসরাঈল এমনিতে আমার প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে থাকে। এখন তাঁরা ভাববে যে, এ লোকগুলোকে কোথাও নিয়ে গিয়ে কোন উপায়ে আমিই স্বয়ং তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং আমাকে মেহেরবানীপূর্বক এ অপবাদ থেকে রক্ষা করুন। তাই আল্লাহ্ পাক দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনর্জীবিত করে দিলেন।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾

(৫৭) আর আমি তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি 'মান্না' ও 'সালওয়া'। সেসব পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। বস্তুত তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বরং নিজেদেরকে ক্ষতি সাধন করেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি মেঘমালাকে (তীহ প্রান্তরে) তোমাদের উপর ছায়া প্রদানকারী করে দিলাম এবং (আমার অদৃশ্য ধনভাণ্ডার থেকে) তোমাদের প্রতি মান্না ও সালাওয়াসমূহ পৌঁছাতে লাগলাম (এবং তোমাদেরকে অনুমতি দিলাম) যে, তোমরা সেসব উৎকৃষ্ট বস্তু থেকে ভক্ষণ কর, যা আমি তোমাদেরকে খাবার হিসাবে প্রদান করছি। (কিন্তু তারা এক্ষেত্রেও অঙ্গীকার লংঘন করে বসল) এবং (এর ফলে) তারা আমার কোন অনিষ্ট সাধন করতে পারেনি বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছিল।

জ্ঞাতব্য ঃ উভয় ঘটনাই ঘটেছিল তীহ্ প্রান্তরে। তার বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, বনী ইসরাঈলের আদি বাসস্থান ছিল শাম দেশে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময়ে তারা মিসরে এসে বসবাস করতে থাকে। আর 'আমালেকা' নামক এক জাতি শাম দেশ দখল করে নেয়। ফেরাউনের ডুবে মরার পর যখন এরা শান্তিতে বসবাস করতে থাকে, তখন আল্লাহ্ পাক আমালেকাদের সাথে জিহাদ করে তাদের আদি বাসস্থান পুনর্দখল করতে নির্দেশ দিলেন। বনী

ইসরাঈল এতদুদ্দেশ্যে মিসর থেকে রওয়ানা হল। শামের সীমান্তে পৌঁছার পর আমালেকাদের শৌর্য-বীর্যের কথা জেনে তারা সাহস হারিয়ে হীনবল হয়ে পড়ল এবং জিহাদ করতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। তখন আল্লাহ্ পাক এ শাস্তি প্রদান করলেন, যাতে তারা একই প্রান্তরে চল্লিশ বছর হতবুদ্ধি হয়ে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্যভাবে বিচরণ করতে থাকে। ঘরে ফেরা আর তাদের ভাগ্যে জুটেনি।

এ প্রান্তরে কোন বিশাল ভূ-খণ্ড ছিল না। 'তীহ্' প্রান্তর মিসর ও শাম দেশের মধ্যবর্তী দশ মাইল এলাকাবিশিষ্ট একটি ভূ-ভাগ। বর্ণিত আছে, এরা নিজেদের বাসস্থান মিসরে পৌঁছার জন্য সারা দিন চলতে থাকত, রাতে কোন মঞ্জিলে অবস্থান করত। কিন্তু ভোরে দেখতে পেত–যেখানে থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেখানেই রয়ে গেছে। এভাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এ প্রান্তরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শ্রান্ত ও ক্লান্তভাবে বিচরণ করছিল।

এই 'তীহ্' উপত্যকা ছিল এক উন্মুক্ত প্রান্তরে। এখানে কোন লোকালয় বা গাছ-বৃক্ষ ছিল না–যার নিচে শীত-গরম বা সূর্যতাপ বা সূর্যতাপ থেকে আশ্রয় নেওয়া চলে। তেমনিভাবে এখানে পানাহারের উপকরণ বা পরিধানের বস্ত্রসামগ্রীও কিছুই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আ)-র দোয়ার বদৌলতে মু'জিযা হিসাবে যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করে দেন। বনী ইসরাঈল সূর্যতাপের অভিযোগ করলে আল্লাহ্ পাক হাল্কা মেঘখণ্ড দিয়ে তাদের ওপর ছায়ার ব্যবস্থা করে দেন। ক্ষুধা পেলে তাদের জন্য 'মান্না ও সালওয়া' (তুরাঞ্জাবীন ও বাটের পাখী) অবতীর্ণ করতে থাকেন। গাছপালার ওপর পর্যাপ্ত পরিমাণে তুরাঞ্জাবীন (বরফের মত স্বচ্ছ শুভ্র এক ধরনের মিষ্ট খাবার) উৎপন্ন হত আর তারা সেগুলো সংগ্রহ করে নিত। বাটের পাখী তাদের কাছে ঝাঁকে ঝাঁকে সমবেত হত ; তাদের কাছ থেকে পালাত না। তারা সেগুলো ধরে জবাই করে খেত। যেহেতু তুরাঞ্জাবীনের অসাধারণ প্রাচুর্য এবং বাট পাখীর লোকভীতি না থাকাও ছিল অস্বাভাবিক। এ হিসাবে উভয় বস্তুই অদৃশ্য ধনভাণ্ডার হতে দেওয়া হয়েছিল বলে প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের যখন পানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, তখন মূসা (আ)-কে লাঠি দিয়ে পাথরের ওপর আঘাত করতে নির্দেশ দেওয়া হল। আঘাতের সাথে সাথে পাথর থেকে ঝরনা প্রবাহিত হয়ে পড়ল। এ ব্যাপারে কোরআনের অন্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। রাতের আঁধারের অভিযোগ করায় অদৃশ্যলোক হতে লোকালয়ের মাঝখানে ঝোলানোভাবে স্থায়ী আলোর ব্যবস্থা করা হল। আল্লাহ্ পাক অলৌকিক ক্ষমতাবলে এমন ব্যবস্থা করে দিলেন, যাতে তাদের পরিধেয় পোশাক না ছিঁড়ে এবং ময়লা না হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের পোশাক, তাদের শরীর বৃদ্ধির সাথে সাথে সমানুপাতে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকত। –(কুরতুবী)

তাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামতরাজি প্রয়োজনানুপাতে ব্যয় করতে এবং ভবিষ্যতের জন্য মজুদ না রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু লোভের বশবর্তী হয়ে তারা এরও বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করল। ফলে মজুতকৃত গোশত পঁচতে লাগল। আয়াতে একেই নিজের ক্ষতি বলে অভিহিত করা হয়েছে।

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

(৫৮) আর যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে এবং এতে যেখানে খুশী খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে থাক এবং দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার সময় সিজদা করে ঢুক, আর বলতে থাক–'আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও'–তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মশীলদেরকে অতিরিক্ত দানও করব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সে সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদেরকে হুকুম করলাম যে, এ লোকালয়ে প্রবেশ কর, অতঃপর (এখানে প্রাপ্ত বস্তু-সামগ্রী) যেখানে চাও পরম তৃপ্তি সহকারে স্বাচ্ছন্দ্যে ভক্ষণ কর। (এবং এ হুকুমও দিলাম যে,) যখন ভেতরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করবে, তখন দরজা দিয়ে (বিনয়ের সাথে) প্রণত মস্তকে প্রবেশ করবে এবং (মুখে) বলতে থাকবে, তওবা ! (তওবা !) তাহলে তোমাদের পূর্বকৃত যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করে দেব এবং (নিষ্ঠা) ও আন্তরিকতার সাথে সৎ কাজ সম্পন্নকারীদেরকে তার চাইতেও অধিক দান করব।

জ্ঞাতব্য ঃ শাহ আবদুল কাদের (র)-এর বক্তব্যানুসারে এ ঘটনাও তীহ্ উপত্যকায় বসবাসকালে সংঘটিত হয়েছিল। যখন বনী ইসরাঈলের একটানা 'মান্না' ও 'সালাওয়া' খেতে খেতে বিস্বাদ এসে গেল এবং স্বাভাবিক খাবারের জন্য প্রার্থনা করল (যেমন, পরবর্তী চতুর্থ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে) তখন তাদেরকে এমন এক নগরীতে প্রবেশ করতে হুকুম দেওয়া হল, যেখানে পানাহারের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পাওয়া যাবে। সুতরাং এ হুকুমটি সে নগরীতে প্রবেশ করা সম্পর্কিত। এখানে নগরীতে প্রবেশকালে কর্মজনিত ও বাক্যজনিত দু'টি আদবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ('তওবা তওবা' বলে প্রবেশ করার মধ্যে বাক্যজনিত এবং প্রণত মস্তকে প্রবেশ করার মধ্যে কার্যজনিত আদব) এর প্রসঙ্গে বড়জোর এ কথা বলা যাবে যে, ঘটনার পরের অংশটি আগে এবং আগের অংশটি পরে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে জটিলতা তখনই হত, যখন কোরআন মজীদে ঘটনাই মূখ্য উদ্দেশ্য হত। কিন্তু যখন ফলাফল বর্ণনাই মূল লক্ষ্য তখন যদি একটি ঘটনার বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রতিটি অংশের ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং ফলাফলগুলোর কোন প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের কথা বিবেচনা করে যদি আগের অংশকে পরে এবং পরের অংশকে আগে বর্ণনা করা হয়, তবে এতে কোন দোষের কারণ নেই এবং কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না।

অন্যান্য তফসীরকারের মতে এ হুকুম ঐ নগরী সংক্রান্ত ছিল, যেখানে তাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তীহ্ উপত্যকায় তাদের অবস্থানকাল শেষ হওয়ার পর আবার সেখানে জিহাদ সংঘটিত হয়েছিল এবং সে নগরীর উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় হযরত ইউশা (يوشع) (আ) নবী ছিলেন। সে নগরীতে জিহাদের হুকুমটি তাঁরই মাধ্যমে এসেছিল।

প্রথম অভিমত অনুসারে 'মান্না' ও 'সালওয়া' বর্জন করে সাধারণ খাবার সংক্রান্ত বনী ইসরাঈলের আবেদনকেও পূর্ববর্তী অপরাধগুলোর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া উচিত। তখন মর্ম দাঁড়াবে এই যে, আবেদনটি তো ধৃষ্টতাপূর্ণই ছিল, কিন্তু তবুও তারা যদি এ শিষ্টাচার (আদব) ও নির্দেশ পালন করে, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এই উভয় অভিমত অনুযায়ী এ ক্ষমা সকল বক্তার জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবেই। তদুপরি যারা নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে সৎকার্যাবলী সম্পন্ন করবে, তাদের জন্য এছাড়াও অতিরিক্ত পুরস্কার থাকবে।

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

(৫৯) অতঃপর জালিমরা কথা পাল্টে দিয়েছে যা কিছু তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছিল তা থেকে। তারপর আমি অবতীর্ণ করেছি জালিমদের উপর আযাব আসমান থেকে নির্দেশ লঙ্ঘন করার কারণে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সুতরাং ঐ অত্যাচারীরা সে বাক্যটি আর একটি বাক্যাংশ দিয়ে পরিবর্তিত করে নিল, যা ঐ বাক্যাংশের বিপরীত ছিল– যা তাদেরকে (বলতে) নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে আমি ঐ অত্যাচারীদের উপর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণের কারণে একটি আসমানী বিপদ নাযিল করলাম।

এ আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের পরিশিষ্ট। সে বিপরীত বাক্যাংশ এই ছিল যে, তারা حِطَّةٌ (তওবা, তওবা)-এর স্থলে পরিহাস করে حِنْطَةٌ যার অর্থ حَبَّةٌ فِىْ شَعِيْرَةٍ (অর্থাৎ যবের মধ্যে শস্য) বলতে আরম্ভ করল। সে আসমানী বিপদটি প্লেগ রোগ, যা হাদীস অনুযায়ী অবাধ্যদের পক্ষে শাস্তি এবং অনুগতদের পক্ষে রহমতস্বরূপ। এ গর্হিত আচরণের শাস্তি হিসাবে তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিল এবং তাতে অগণিত লোকের মৃত্যু ঘটল। (কেউ কেউ মৃতের সংখ্যা সত্তর হাজার পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বাক্যের শব্দগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান ঃ এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, বনী ইসরাঈলকে উক্ত নগরীতে حِطَّةٌ বলতে বলতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারা দুষ্টুমি করে সে শব্দের পরিবর্তে حِنْطَةٌ বলতে আরম্ভ করল। ফলে তাদের উপর

আসমানী শাস্তি অবতীর্ণ হল। এই শব্দগত পরিবর্তন এমন ছিল-যাতে শুধু শব্দই পরিবর্তিত হয়ে যায়নি, বরং অর্থও সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গিয়েছিল। حِطَّةٌ অর্থ তওবা ও পাপ বর্জন করা। আর حِنْطَةٌ অর্থ গম। এ ধরনের শব্দগত পরিবর্তন, তা কোরআনেই হোক বা হাদীসে কিংবা অন্য কোন খোদায়ী বিধানে নিঃসন্দেহে এবং সর্ববাদীসম্মতভাবে হারাম। কেননা এটা এক ধরনের تحريف তথা শব্দগত ও অর্থগত বিকৃতি সাধন।

বলা বাহুল্য, অর্থ ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি রক্ষা করে নিছক শব্দগত পরিবর্তন সম্পর্কে কি হুকুম ? ইমাম কুরতুবী এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, কোন বাক্যাংশে বা বক্তব্যে শব্দই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মর্ম ও ভাব প্রকাশের জন্য শব্দই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। এ ধরনের উক্তি ও বাণীর ক্ষেত্রে শব্দগত পরিবর্তনও জায়েয নয়। যেমন, আযানের জন্য নির্ধারিত শব্দের স্থলে সমার্থবোধক অন্য কোন শব্দ পাঠ করা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে নামাযের মাঝে নির্দিষ্ট দোয়াসমূহ যেমন-ছানা, আত্তাহিয়্যাতু, দোয়ায়ে কুনূত ও রুকূ-সিজদার তসবীহ্সমূহ। এগুলোর অর্থ সম্পূর্ণভাবে ঠিক রেখেও কোন রকম শব্দগত পরিবর্তন জায়েয নয়। তেমনিভাবে সমগ্র কোরআন মজীদের শব্দাবলীরও একই হুকুম অর্থাৎ কোরআন তিলাওয়াতের সঙ্গে যেসব হুকুম সম্পর্কযুক্ত, তা শুধু ঐ শব্দাবলীতেই তিলাওয়াত করতে হবে, যাতে কোরআন নাযিল হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি এসব শব্দের অনুবাদ অন্য এমন সব শব্দের দ্বারা করে পাঠ করতে থাকে, যাতে অর্থ পুরোপুরিই ঠিক থাকে, তবে একে শরীয়তের পরিভাষায় কোরআন তিলাওয়াত বলা যাবে না। কোরআন পাঠ করার জন্য যে সওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে, তাও লাভ করতে পারবে না। কারণ কোরআন শুধু অর্থের নাম নয়, বরং অর্থের সাথে সাথে যে শব্দাবলীতে তা নাযিল হয়েছে, তার সমষ্টির নামই কোরআন।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ উল্লিখিত আয়াতের ভাষ্যে দৃশ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, তাদেরকে তওবার উদ্দেশ্যে যে শব্দটি বাত্লে দেওয়া হয়েছিল, তার উচ্চারণও করণীয় ছিল ; সেগুলোতে পরিবর্তন সাধন ছিল পাপ। আর তারা যে পরিবর্তন করেছিল তা ছিল অর্থেরও পরিপন্থী। কাজেই তারা আসমানী আযাবের সম্মুখীন হয়েছিল।

কিন্তু যে উক্তিও বাক্যাংশে অর্থই মূল উদ্দেশ্য-শব্দ নয়, যদি সেগুলোতে শব্দগত এমন পরিবর্তন করা হয় যাতে অর্থের ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহার মতে এ পরিবর্তন জায়েয। ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও ইমাম আজম (র) থেকে ইমাম কুরতবী উদ্ধৃত করেন যে, হাদীসের অর্থভিত্তিক বর্ণনা জায়েয আছে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে এই যে, বর্ণনাকারীকে আরবী ভাষায় পারদর্শী হতে হবে এবং হাদীস বর্ণনার স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত থাকতে হবে—যাতে তার ভুলের কারণে অর্থের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য সৃষ্টি না হয়।

মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র), কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (র) প্রমুখ একদল হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে হাদীসের শব্দাবলী যে রকম শুনেছে অবিকল সে রকম বর্ণনা করাই আবশ্যক। এদের প্রমাণ সে হাদীস যে, একদিন হুযূর (সা) জনৈক সাহাবীকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, বিছানায়

ঘুমোতে যাওয়ার সময় آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ.
(আল্লাহ্, আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার উপর ঈমান এনেছি এবং যে নবী পাঠিয়েছেন, তাঁর উপর ঈমান এনেছি।) এ দোয়া পাঠ করবে। সে সাহাবী نبيك এর স্থলে رسولك পড়লেন। তখন হুযূর (সা) এই হেদায়েত করলেন যে, نبيك -ই পড়বে। এতে বোঝা গেল যে, শব্দগত পরিবর্তনও জায়েয নয়।

অনুরূপভাবে অন্য এক হাদীসে হুযূর (সা) ইরশাদ করেন ঃ

نضر الله امرأ سمع مقالتى فبلغها كما سمعها .

(আল্লাহ্ পাক ঐ ব্যক্তিকে সদা হাসিমুখ ও আনন্দোজ্জ্বল রাখুন, যে আমার কোন বাণী শুনেছে এবং যেমন শুনেছে অবিকল তেমনই অপরের নিকট পৌছিয়েছে।) এটা সুস্পষ্ট যে, হাদীস যে শব্দে শোনা হয় ঠিক সে শব্দে পৌছানোকেই 'হাদীস বর্ণনা' বলা হয়।

কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহ্র মতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যে শব্দে শুনেছে ইচ্ছাকৃতভাবে এতে কোন পরিবর্তন না করে অবিকল সে শব্দে নকল করা যদিও উত্তম—কিন্তু যদি সে শব্দাবলী পুরোপুরি স্মরণ না থাকে, তবে তার মর্ম ও ভাবার্থ নিজস্ব শব্দে ব্যক্ত করাও জায়েয। হাদীস بلغها كما سمعها অর্থ এও হতে পারে, 'যে বিষয় শুনেছে অবিকল সে বিষয়ই পৌছিয়ে দেয়।' শব্দগত পরিবর্তন এর পরিপন্থী নয়। এ মতের সমর্থনে ইমাম কুরতুবী বলেছেন, প্রয়োজনানুসারে শব্দগত পরিবর্তন যে জায়েয—স্বয়ং এ হাদীসই এর প্রমাণ। কারণ এ হাদীসের রেওয়ায়েত আমাদের নিকট পর্যন্ত বিভিন্ন শব্দে পৌঁছেছে।

পূর্ববর্তী হাদীসে যে হুযূর نبيك -এর স্থলে رسولك পড়তে বারণ করেছেন, তার এক কারণ এও হতে পারে যে, نبى শব্দে رسول শব্দের চাইতে প্রশংসা বেশি। কেননা 'দূত' অর্থে رسول শব্দের ব্যবহার অন্যদের ক্ষেত্রেও হতে পারে। অপর পক্ষে نبى শব্দ শুধু সে পদ-মর্যাদার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, যা স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে দান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এও হতে পারে যে, দোয়ার ক্ষেত্রে বর্ণিত শব্দাবলীর অনুসরণ, বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; অন্যান্য শব্দে সে বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। এজন্য আলিম মনীষিগণ যাঁরা তাবীজ-তুমার লিখে থাকেন, তাঁরা এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন, যাতে বর্ণিত শব্দাবলীর কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, দোয়ায়ে-মাসূরাসমূহ ও কোরআন-হাদীসে যদিও অন্যান্য দোয়া এই প্রথম শ্রেণীভুক্ত—যাতে অর্থের সাথে সাথে শব্দের সংরক্ষণও উদ্দেশ্য।

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ
اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا
مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

(৬০) আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্টির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে। অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবণ। তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক খাও, পান কর আর দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে বেড়িও না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সে সময়টির কথা স্মরণ কর,) যখন হযরত মূসা (আ) নিজ সম্প্রদায়ের জন্য পানির দোয়া করেছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে আমি (মূসা-কে) হুকুম করলাম যে, (অমুক) পাথরের ওপর লাঠি দ্বারা আঘাত কর (তাহলেই তা থেকে পানি নিঃসৃত হয়ে আসবে)। বস্তুত (লাঠির আঘাতের সাথে সাথে) তৎক্ষণাৎ বারটি প্রস্রবণ ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ল আর (বনী-ইসরাঈলরা যেহেতু বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল কাজেই প্রত্যেকে) নিজ নিজ পানি পান করার স্থান চিনে নিল এবং আমি এ উপদেশ দিলাম যে, (খাবার জিনিস) খাও এবং (পান করার জিনিস) পান কর। আল্লাহ্ প্রদত্ত আহার্য (পরিমিত) এবং সীমালঙ্ঘন করে দুনিয়ার বুকে অশান্তি ও কলহ সৃষ্টি করো না।

জ্ঞাতব্য ঃ এ ঘটনাটিও তীহ্ প্রান্তরেই ঘটেছিল। সেখানে তৃষ্ণা পেলে পর তারা পানি চাইল। হযরত মূসা (আ)-এর দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাকের অপার মহিমায় নিছক একটি লাঠির আঘাতে একটি নির্দিষ্ট পাথর থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে পড়ল। ইহুদীদের বারটি গোত্র নিম্নরূপ ছিল—হযরত ইয়াকুব (আ)-এর বার পুত্র ছিলেন। প্রত্যেকের সন্তান-সন্ততিরই একেকটি গোত্র বা বংশ ছিল এবং সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক রাখা হতো। সব গোত্রের দলপতিও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য প্রস্রবণও বারটি বের হলো। এখানে 'খাও' অর্থ মান্না ও সালওয়া খাওয়া এবং 'পান কর' শব্দে প্রস্রবণের পানি পান করাই বোঝানো হয়েছে।

এ ধরনের অলৌকিক ঘটনাবলী অস্বীকার করা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক ব্যাপার। যখন আল্লাহ্ পাক কোন কোন পাথরের মধ্যে কল্পনাতীত ও সাধারণ বুদ্ধি-বিবেক বহির্ভূতভাবে এমন গুণও রেখেছেন, যা লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে, তখন পাথরের মধ্যস্থিত ভূমির অংশ থেকে পানি আকর্ষণের গুণ সৃষ্টি করে তা থেকে প্রস্রবণ প্রবাহিত করা তাঁর পক্ষে মোটেও অসম্ভব নয়।

এ বর্ণনার দ্বারা বর্তমান কালের প্রজ্ঞাবান ও বিদগ্ধ মহলের শিক্ষা গ্রহণ করা ও উপকৃত হওয়া উচিত। আবার এ দৃষ্টান্তও নিছক স্থূলবুদ্ধি লোকদের জন্য নতুবা পাথরের অংশগুলো থেকেও যদি পানি বের হয়, তাইবা কেন অসম্ভব হবে ? যেসব বিজ্ঞজন এ ধরনের ঘটনা অসম্ভব বলে মনে করেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভবের মর্মই অনুধাবন করতে পারেন নি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ) নিজ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে পানির জন্য দোয়া করলে আল্লাহ্ পাক পানির ব্যবস্থা করে দিলেন। পাথরের উপর লাঠির আঘাতের

সাথে সাথে প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে পড়ল। এতে বোঝা গেল যে, ইস্তিস্কা (পানির জন্য প্রার্থনা)-এর মূল হলো দোয়া। মূসা (আ)-এর শরীয়তেও বিষয়টিকে শুধু দোয়াতেই সীমিত রাখা হয়েছে। যেমন, ইমাম আজম আবূ হানীফা (র) বলেন যে, ইস্তিস্কার মূল হলো পানির জন্য দোয়া করা। এ দোয়া কোন কোন সময়ে ইস্তিস্কার নামাযের আকারেও করা হয়েছে। যেমন, ইস্তিস্কার নামাযের উদ্দেশ্যে হুযূর (সা)-এর ঈদগাহে তশরীফ নেওয়া এবং সেখানে নামায, খুতবা ও দোয়া করার কথা বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। আবার কখনও নামায বাদ দিয়ে শুধু বাহ্যিক অর্থে দোয়া করেই ক্ষান্ত করেছেন। যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা) জুমার খুতবায় পানির জন্য দোয়া করেন—ফলে আল্লাহ্ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

একথা সর্ববাদীসম্মত যে, ইস্তিস্কা নামাযের আকারে হোক বা দোয়ার রূপে হোক, তা ক্রিয়াশীল ও গুরুত্ববহ হওয়ার জন্য পাপ থেকে তওবা নিজের দীনতা-হীনতা ও দাসত্বসুলভ আচরণের অভিব্যক্তি একান্ত আবশ্যক। পাপে অটল এবং আল্লাহ্র অবাধ্যতায় অনড় থেকে দোয়া করলে তা ক্রিয়াশীল হবে বলে আশা করার অধিকার কারো নেই।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ
لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا
وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ
اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ
وَالْمَسْكَنَةُ ۗ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا
يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ
ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾

(৬১) আর তোমরা যখন বললে, হে মূসা, আমরা একই ধরনের খাদ্যদ্রব্যে কখনও ধৈর্যধারণ করব না। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্য এমন বস্তুসামগ্রী দান করেন, যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তরকারি, কাঁকড়ী, গম, মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি। মূসা (আ) বললেন, তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও যা নিকৃষ্ট সে বস্তুর পরিবর্তে যা উত্তম ? তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই

পাবে যা তোমরা কামনা করছ। আর তাদের উপর আরোপ করা হলো লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহ্‌র রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। এমন হলো এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মানত না এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান, সীমালঙ্ঘনকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সে সময়টির কথা স্মরণ কর,) যখন তোমরা (এরূপ) বললে, হে মূসা! (প্রতি দিন) একই খাবার (অর্থাৎ মান্না-সালওয়া) আমরা কখনো খেতে থাকব না। আপনি আপনার পালনকর্তার নিকট দোয়া করুন, যেন তিনি এমন বস্তু (খাবার হিসাবে) সৃষ্টি করে দেন, যা ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়—শাকসব্জি, কাঁকড়ী, গম, মসুরের ডাল, পেঁয়াজ-রসুন প্রভৃতি (যাই হোক না কেন)। তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) বললেন, তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তু-সামগ্রী বদলিয়ে নিকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করতে চাও ? (বেশ যদি না-ই মান) তবে কোন নগরীতে (গিয়ে) অবতরণ কর, (সেখানে) নিশ্চয়ই তোমরা এসব জিনিস পাবে যার জন্য আবেদন করছ। এবং (এ ধরনের পর্যায়ক্রমিক ধৃষ্টতার দরুন এককালে) তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা (ক্ষতচিহ্নের মত) স্থায়ী হলো। (অর্থাৎ অপরের দৃষ্টিতে তাদের কোন মর্যাদাই রইল না।) এবং (তাদের দীনতা ও হীনতা) (অর্থাৎ তাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে উচ্চাশা ও মহৎ সংকল্প গুণ বিদ্যমান রইল না)। বস্তুত তারা আল্লাহ্‌র রোষ ও গযবের যোগ্য হয়ে পড়ল। আর এ (লাঞ্ছনা ও রোষ) এজন্য (হলো) যে, তারা আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের প্রতি কুফরী করেছিল এবং নবীদের হত্যা করেছিল। এ হত্যা তাদের দৃষ্টিতেও ছিল অন্যায়। এ (লাঞ্ছনা ও রোষ) এ কারণেও হলো যে, তারা আনুগত্য প্রকাশ করত না এবং আনুগত্যের সীমালঙ্ঘন করে যাচ্ছিল।

জ্ঞাতব্য ঃ এ ঘটনাও তীহ্ উপত্যকাসংশ্লিষ্ট ঘটনাই। মান্না ও সালওয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই তারা ওসব সব্জি ও শস্যের জন্য আবেদন করল। এ প্রান্তরের সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি শহর ছিল। সেখানে গিয়ে চাষাবাদ করে উৎপন্ন ফসলাদি ভোগ করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে এটাও একটা যে, কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য ইহুদীদের থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হলো। অবশ্য কিয়ামতের অব্যবহিত পূর্বে সর্বমোট চল্লিশ দিনের জন্য নিছক লুটেরা দলের ন্যায় অনিয়মিত ও আইন-শৃঙ্খলা বিবর্জিত ইহুদী দাজ্জালের কিঞ্চিৎ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। একে কোন বুদ্ধিমান ও বিবেকবানই রাজ্য বলতে পারবে না। আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে পূর্বেই তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যদি নির্দেশ অমান্য কর, তবে চিরকাল তোমরা অন্য জাতির দ্বারা শাসিত হতে থাকবে। যেমন সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ ‐

এবং সে সময়টি স্মরণ করুন, যখন আপনার পালনকর্তা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় তিনি ইহুদীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত এমন শাসক প্রেরণ (নিয়োগ) করতে থাকবেন, যারা তাদের প্রতি কঠিন শাস্তি পৌঁছাতে থাকবে।

বস্তুত বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের মর্যাদাও আমেরিকা ও বৃটেনের গোলাম বৈ আর কিছু নয়।

তা ছাড়াও বহু নবী বিভিন্ন সময়ে ইহুদীদের হাতে নিহত হয়েছেন—যা নিতান্ত অন্যায় বলে তাঁরা নিজেরাও মনে মনে উপলব্ধি করত, কিন্তু প্রতিহিংসা ও হঠকারিতা তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইহুদীদের চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার অর্থ, বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের ফলে উদ্ভূত সন্দেহ ও তার উত্তর ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে ইহুদীদের শাস্তি, ইহকালে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং ইহকাল ও পরকালে খোদায়ী গযব ও রোষের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট তফসীরকারগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের বর্ণনানুসারে ওদের স্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনার প্রকৃত অর্থ, কোরআনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইবনে কাসীরের ভাষায় ঃ

لا يزالون مستذلين من وجدهم استذلهم وضرب عليهم الصغار

অর্থাৎ তারা যত ধন-সম্পদের অধিকারীই হোক, বিশ্ব-সম্প্রদায়ের মাঝে তুচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। যার সংস্পর্শে আসবে সে-ই তাদেরকে অপমানিত করবে এবং তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে রাখবে।

বিশিষ্ট তফসীরকার ইমাম যাহ্হাকের ভাষায় এ লাঞ্ছনা-অবমাননার অর্থ ঃ هم اهل القبالات يعنى الجزيه। অর্থাৎ ইহুদীগণ সর্বদা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে।

একই মর্মে সূরা 'আলে-ইমরানের' এক আয়াতে রয়েছে ঃ

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ .

অর্থাৎ আল্লাহ্প্রদত্ত ও মানবপ্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত তারা যেখানে যাবে সেখানেই তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে। আল্লাহ্প্রদত্ত ও মানবপ্রদত্ত মাধ্যমের অর্থ এই যে, যাদেরকে আল্লাহ্ পাক নিজের বিধান অনুসারে আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকগণ বা রমণীকুল বা এমন সাধক ও উপাসক যে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না, তারা নিরাপদ আশ্রয়ে থাকবে। আর মানবপ্রদত্ত মাধ্যম অর্থ শান্তিচুক্তি যার একটি রূপ এও হতে পারে যে, মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে বা অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসাবে জিযিয়া কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে তাদের দেশে বসবাসের সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু কোরআনের আয়াতে مِنَ النَّاس বলা হয়েছে مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ বলা হয়নি। সুতরাং এমন হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, অন্য অমুসলিমদের সাথে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে তাদের আশ্রয়াধীন হয়ে সাময়িক শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

সারকথা, ইহুদীগণ উপরিউক্ত দু'অবস্থা ব্যতীত সর্বত্র ও সর্বদাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। (১) আল্লাহ্প্রদত্ত ও অনুমোদিত আশ্রয়ের মাধ্যমে, যার ফলে তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি, নারী প্রভৃতি এই লাঞ্ছনা ও অবমাননা থেকে অব্যাহতি পাবে। (২) কিংবা শান্তিচুক্তির মাধ্যমে নিজেদেরকে এ অবমাননা থেকে মুক্ত রাখতে পারে। এ চুক্তি মুসলমানদের সাথেও হতে পারে কিংবা অন্যান্য অমুসলিম জাতির সাথেও শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে তাদের আশ্রয়াধীন হয়ে তাদের সাহায্যে এ গঞ্জনা ও অবমাননা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

এমনিভাবে সূরা 'আলে-ইমরানে'র আয়াত দ্বারা সূরা বাকারাহ্ আয়াতের বিশদ বিশ্লেষণ হয়ে গেল। অধুনা ফিলিস্তীনে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে সন্দেহের অবতারণা হয়েছে, এর দ্বারা তাও দূরীভূত হয়ে যায়। তা এই যে, কোরআনের আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ইহুদীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হবে না। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, ফিলিস্তীনে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। উত্তর সুস্পষ্ট—কেননা ফিলিস্তীনে ইহুদীদের বর্তমান রাষ্ট্রের গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত, তারা ভালভাবেই জানেন যে, এ রাষ্ট্র প্রকৃত প্রস্তাবে ইসরাঈলের নয়, বরং আমেরিকা ও বৃটেনের এক ঘাঁটি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ রাষ্ট্র নিজস্ব সম্পদ ও শক্তির উপর নির্ভর করে এক মাসও টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্যের খৃস্টান শক্তি ইসলামী বিশ্বকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝখানে ইসরাঈল নাম দিয়ে একটি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ রাষ্ট্র আমেরিকা-ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে একটা অনুগত ও আজ্ঞাবহ ষড়যন্ত্র কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোন গুরুত্ব বহন করে না। এ যেন কোরআনের বাণী بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ এরই বাস্তব রূপ। পাশ্চাত্য শক্তিবলয়, বিশেষ করে আমেরিকার সাথে নানা ধরনের প্রকাশ্যে ও গোপন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের পক্ষপুষ্ট ও আশ্রিত হয়ে নিছক ক্রীড়নকরূপে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তাও অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও অবমাননার ভিতর দিয়ে। সুতরাং বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দরুন কোরআনের কোন আয়াত সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে না। এছাড়া এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ইহুদীরাই সর্বপ্রাচীন জাতি। তাদের ধর্ম, তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি সর্বাপেক্ষা পুরাতন। সারা বিশ্বে ফিলিস্তীনের এক ক্ষুদ্র ভূ-ভাগে কোন প্রকারে তাদের অধিকার যদি প্রতিষ্ঠিত হয়েও থাকে, তবু এটা বিশাল বিশ্ব-মানচিত্রে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর চাইতে অধিক মর্যাদার দাবি রাখে না। অপরপক্ষে খৃস্টান রাষ্ট্রসমূহ মুসলমানদের পতন-যুগ সত্ত্বেও তাদের রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য পৌত্তলিক ও বিধর্মীদের রাষ্ট্রসমূহ যা বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত, সে তুলনায় ফিলিস্তীন এবং তাও আবার অর্ধাংশ—তদুপরি আমেরিকা ও বৃটেনের পক্ষপুষ্ট এবং আশ্রয়াধীন, এরূপভাবে যদি সেখানে ইসরাঈলদের কোন অধিকার ও শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হয়েও যায়, তবে এর দ্বারা গোটা ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে আরোপিত চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার অবসান হয়েছে এরূপ ভাবতে পারা যায় কি?

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

(৬২) নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী, নাসারা ও সাবেঈন, (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। আর তাদের কোনই ভয়-ভীতি নেই, তারা দুঃখিতও হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এখানে ইহুদীদের গর্হিত আচরণ ও অনাচারের কথা জেনে শ্রোতাদের অথবা স্বয়ং ইহুদীদের এ ধারণা হতে পারে যে, এমতাবস্থায় যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে ঈমান আনতেও চায়, তবে হয়তো আল্লাহ্ পাকের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ধারণা অপনোদনের জন্য এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক একটি সাধারণ নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। সে নীতি এই,) মুসলমান, ইহুদী, খৃস্টান এবং সাবেঈন সম্প্রদায়-এর মধ্যে যারা আল্লাহ্ তা'আলার (সত্তা ও গুণাবলীর) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কিয়ামতের উপর এবং (শরীয়তী বিধান অনুসারে) সৎকাজ করে, এমন লোকের জন্য তাদের পালনকর্তার নিকটে (পৌঁছে) তাদের প্রতিদানও রয়েছে। এবং (সেখানে পৌঁছে) তাদের কোন আশংকা থাকবে না এবং তারা সন্তাপগ্রস্তও হবে না।

জ্ঞাতব্য ঃ নীতি বা আইনের মর্ম সুস্পষ্ট। আল্লাহ্ পাক বলেছেন যে, আমার দরবারে কোন ব্যক্তির বিশেষ মর্যাদা নেই। যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও কর্মে পুরোপুরি আনুগত্য স্বীকার করবে, সে পূর্বে যেমনই থাকুক, সে আমার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং তার আমল পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয়। আর এটা সুস্পষ্ট যে, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর 'পূর্ণ আনুগত্য' মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মুসলমান হওয়াতে সীমাবদ্ধ। যার অর্থ এই যে, যে মুসলমান হবে, সে-ই পরকালে নাজাতের অধিকারী হবে। এখানে পূর্ববর্তী ধারণার উত্তর হয়ে গেল। অর্থাৎ এতসব অনাচার ও গর্হিত আচরণের পরেও যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে আমি সব মাফ করে দেব।

আরবে সাবেঈন নামে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিল, তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না বলে তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। বস্তুত আলোচ্য এ আইনে বাহ্যত মুসলমানদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেননা তারা তো মুসলমান আছেই। কিন্তু

এতে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এর উদাহরণ এই যে, কোন শাসক বা সম্রাট কোন বিধান প্রয়োগকালে যদি এরূপ ঘোষণা করেন যে, আমার বিধান সাধারণ ও ব্যাপক—সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য, স্বপক্ষীয়-বিপক্ষীয় শত্রু-মিত্র যে-ই এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে সে-ই অনুকম্পার পাত্র হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, যারা স্বপক্ষীয় মিত্র তারা তো আনুগত্য প্রদর্শন করেই চলেছে—আসলে যারা বিরোধী ও শত্রু তাদেরকেই ঘোষণাটি শোনানোর উদ্দেশ্য। কিন্তু এর নিগূঢ় তত্ত্ব এই যে, অনুগত ও মিত্রদের প্রতি আমার যে অনুকম্পা, তার কারণ কোন ব্যক্তিবিশেষ নয় বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যও নয়; বরং তার মিত্রতা ও বশ্যতাগুণের উপরই আমার অনুকম্পা বা অনুগ্রহ নির্ভরশীল। সুতরাং বিরোধী শত্রুও যদি এ বশ্যতা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে সেও স্বপক্ষীয় মিত্রের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে সমপরিমাণ অনুকম্পা ও অনুগ্রহ লাভ করবে। সে জন্যেই পূর্বোক্ত আইনে বিরোধী শত্রুর সাথে স্বপক্ষীয় মিত্রেরও উল্লেখ করা হয়েছে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

(৬৩) আর আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে, তোমাদিগকে যে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাকে ধর সুদৃঢ়ভাবে এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা মনে রেখো, যাতে তোমরা ভয় কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর ঐ সময়টির কথা স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম (যে, তোমরা তওরাতের উপর আমল করবে।) এবং (এ অঙ্গীকার গ্রহণ করার জন্য) আমি তূর পর্বতকে উঠিয়ে (সমান্তরালে) ঝুলিয়ে দিলাম এবং (সে সময়ে বললাম,) যে কিতাব আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি (অর্থাৎ, তওরাত) তা (সত্বর) দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর। এবং এতে (কিতাবে) যে নির্দেশাবলী রয়েছে, তা স্মরণ রেখো, যাতে (আশা করা যায় যে,) তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।

জ্ঞাতব্য ঃ যখন হযরত মূসা (আ)-কে তূর পর্বতে তওরাত প্রদান করা হলো, তখন তিনি ফিরে এসে তা বনী-ইসরাঈলকে দেখাতে ও শোনাতে আরম্ভ করলেন। এতে হুকুমগুলো কিছুটা কঠোর ছিল—কিন্তু তাঁদের অবস্থানুযায়ীই ছিল। এ সম্পর্কে প্রথম তারা একথাই বলেছিল যে, যখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বলে দেবেন যে, 'এটা আমার কিতাব' তখনই আমরা

মেনে নেব। (যে বর্ণনা উপরে চলে গেছে) মোটকথা, যে সত্তরজন লোক মূসা (আ)-এর সাথে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে সাক্ষী দিল। কিন্তু তাদের সাক্ষ্যের সাথে এ কথাটিও নিজেদের পক্ষ হতে সংযুক্ত করে দিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষে একথাও বলে দিয়েছেন, "তোমরা যতটুকু পার আমল কর, আর যা না পার তা আমি ক্ষমা করে দেব।" এটা কতকটা তাদের স্বভাবগত দুরন্তপনা ও হঠকারিতার পরিচয়। হুকুমগুলো কিছুটা কঠিন হওয়াতে বরং উপরিউক্ত বাক্যটি সংযুক্ত হওয়াতে তাদের এক সুবর্ণ সুযোগ হয়ে গেল। তারা পরিষ্কারভাবে বলে দিল, আমাদের দ্বারা এ গ্রন্থের উপর আমল করা সম্ভব হবে না। ফলে আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদেরকে হুকুম করলেন, "তূর পর্বতের একটি অংশ উঠিয়ে তাদের মাথার উপরে ঝুলিয়ে রেখে দাও এবং বল, হয় কিতাব মেনে নাও, নইলে এক্ষুণি মাথার উপর পড়ল।" অবশেষে নিরুপায় হয়ে তাদের তা মেনে নিতে হলো।

একটি সন্দেহের অপনোদন ঃ এখানে এ সন্দেহ হতে পারে যে, ধর্মে যদি কোন জোর-জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা না থাকবে, তবে এক্ষেত্রে কেন এমন করা হলো ? উত্তর এই যে, জবরদস্তি ঈমান গ্রহণ করার জন্য নয়; বরং স্বেচ্ছায়-সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করার পর এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে। প্রত্যেক রাষ্ট্রে বিদ্রোহীদের শাস্তি, সাধারণ দুষ্কৃতকারী ও অপরাধী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রে তাদের জন্য দু'টি পথই থাকে—হয় আনুগত্য স্বীকার, না হয় প্রাণদণ্ড। এজন্য শরীয়ত অনুযায়ী ইসলাম পরিত্যাগকারীর শাস্তি প্রাণদণ্ড। কিন্তু কুফরীর (ধর্ম গ্রহণ না করার) শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয়।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ

لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٤﴾

---

(৬৪) তারপরেও তোমরা তা থেকে ফিরে গেছ। কাজেই আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও মেহেরবানী যদি তোমাদের উপর না থাকত তবে অবশ্যই তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর তোমরা (সেই প্রতিজ্ঞা করার পর) তা থেকে ফিরে গেছ। অতএব, তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্র করুণা ও মেহেরবানী না হতো, তবে (তোমাদের সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের তাগিদ অনুসারে) নিশ্চয়ই তোমরা (সঙ্গে সঙ্গে) ধ্বংস (ও বিধ্বস্ত) হয়ে যেতে। (কিন্তু এ আমার একান্ত অনুগ্রহ ও দয়া যে,) তোমাদের জন্য নির্ধারিত জীবনকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের অবকাশ দিয়ে রেখেছি। অবশ্য মৃত্যুর পর কৃতকর্মের প্রতিফল তোমাদের ভোগ করতে হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ আল্লাহ্র সাধারণ রহমত পৃথিবীতে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সবার জন্যই ব্যাপক। তারই প্রভাব হলো পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শারীরিক সুস্থতা। তবে বিশেষ রহমতের বিকাশ ঘটবে আখেরাতে, যার ফলে মুক্তি ও আল্লাহ্র নৈকট্যলাভ সম্ভব হবে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে আয়াতের শেষাংশের লক্ষ্য হলো সে সমস্ত ইহুদী, যারা মহানবী (সা)-এর সময়ে উপস্থিত ছিল। হুযূর আকরাম (সা)-এর ওপর ঈমান না আনাও যেহেতু উল্লিখিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু তারাও পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীদের আওতাভুক্ত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, এতদসত্ত্বেও আমি দুনিয়াতে তোমাদের উপর তেমন কোন আযাব অবতীর্ণ করিনি, যেমনটি পূর্বকালে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীদের উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকত। এটা একান্তই আল্লাহ্‌র রহমত।

আর হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে আযাব অবতীর্ণ না হওয়াটা যেহেতু মহানবী (সা)-এর বরকত, কাজেই কোন কোন তফসীরকার মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবকেই আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা বলে বিশ্লেষণ করেছেন।

এ বিষয়টির সমর্থনকল্পে বিগত বেঈমানদের একটি ঘটনা পরবর্তী আয়াতে বিবৃত হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

---

(৬৫) তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছ, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিল। আমি বলেছিলাম ঃ তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। (৬৬) অতঃপর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ্ ভীরুদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপাদান করে দিয়েছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তোমরা সে সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত রয়েছ, তোমাদের মধ্য থেকে যারা শনিবার সম্পর্কিত নির্দেশ অমান্য করে শরীয়তের সীমালঙ্ঘন করেছিল। (তাদের জন্য শনিবারে মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল)। অতঃপর আমি তাদের (আদি ও অলঙ্ঘনীয় নির্দেশের মাধ্যমে বিকৃত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে) বলে দিলাম ঃ তোমরা বানর হয়ে যাও (সেমতে তারা বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল)। অতঃপর আমি একে একটি নিদর্শনমূলক ঘটনা করে দিলাম তাদের সমসাময়িকদের এবং পরবর্তীদের জন্য। আর (এ ঘটনাকে) উপদেশপ্রদ (করে দিলাম) আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য।

জ্ঞাতব্য ঃ বনী-ইসরাঈলের এ ঘটনাটিও হযরত দাউদ (আ)-এর আমলে সংঘটিত হয়। বনী-ইসরাঈলের জন্য শনিবার ছিল পবিত্র এবং সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট। এ দিন

মৎস্য শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী ছিল বলে মৎস্য শিকার ছিল তাদের প্রিয় কাজ। ফলে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা মৎস্য শিকার করে। এতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে 'মস্‌খ' তথা আকৃতি রূপান্তরের শাস্তি নেমে আসে। তিনদিন পর এদের সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এ ঘটনার দর্শক ও শ্রোতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অবাধ্য শ্রেণী ও অনুগত শ্রেণী। অবাধ্যদের জন্য এ ঘটনাটি ছিল অবাধ্যতা থেকে তওবা করার উপকরণ। এ কারণে একে نَكَالً এ (শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত) বলা হয়েছে। অপরদিকে অনুগতদের জন্য এটা ছিল আনুগত্যে অটল থাকার কারণ। এজন্য একে مَوْعِظَةً (উপদেশপ্রদ) ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধর্মীয় কাজে এমন কলাকৌশল অবলম্বন করা হারাম, যাতে শরীয়তের নির্দেশ বাতিল হয়ে যায়। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতে বনী-ইসরাঈলের যে শাস্তিযোগ্য সীমালঙ্ঘনের কথা বলা হয়েছে, তা শরীয়তের নির্দেশের পরিষ্কার বিরোধী ছিল না, বরং সেটা ছিল এমন এক অপকৌশল, যাতে শরীয়তের নির্দেশ আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যায়। উদাহরণত শনিবার দিন মাছের লেজে লম্বা সূতা বেঁধে দেওয়া এবং তার একটা মাথা ডাঙায় কোন কিছুর সাথে বেঁধে রাখা এবং রবিবার আসতেই সুতা টেনে মাছ শিকার করে নেওয়া। বলা বাহুল্য, এ অপকৌশলের মাধ্যমে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘিত হয়ে যায়, বরং এটা এক রকম উপহাসও বটে। এহেন অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণকারীদের উদ্ধত নাফরমান সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তাদের উপর শাস্তি নেমে এসেছে।

কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, ঐসব কলাকৌশলও হারাম যা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলে দিয়েছেন। উদাহরণত এক সের উৎকৃষ্ট খেজুরের বিনিময়ে দুই সের নিকৃষ্ট খেজুর ক্রয় করা সুদের অন্তর্ভুক্ত। এ সুদ থেকে বাঁচার জন্য স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি কৌশল বলে দিয়েছেন। তা হচ্ছে বস্তুর বিনিময়ে বস্তু না দিয়ে তার মূল্য দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় করা। উদাহরণত দুই সের নিকৃষ্ট খেজুর দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় কর। অতঃপর দুই দিরহাম দ্বারা এক সের উৎকৃষ্ট খেজুর কিনে নাও। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তের নির্দেশে বাতিল হয় না এবং তা উদ্দেশ্যও নয়; বরং নির্দেশ পালন করাই লক্ষ্য। এমনি ধরনের আরও কতিপয় মাসআলায় ফিকাহ্‌বিদগণ হারাম থেকে আত্মরক্ষার জন্য বৈধ পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। সেগুলোকে বনী-ইসরাঈলদের কলাকৌশলের অনুরূপ বলা বা মনে করা নিতান্ত ভুল।

আকৃতি রূপান্তরের ঘটনা ঃ তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, ইহুদীরা প্রথম প্রথম কলাকৌশলের অন্তরালে এবং পরে সাধারণ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল সৎ ও বিজ্ঞ লোকদের। তারা এ

অপকর্মে বাধা দিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ বিরত হলো না। অবশেষে তারা এদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি বাসস্থানও দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। একভাগে অবাধ্যরা বসবাস করত আর অপরভাগে সৎ ও বিজ্ঞ জনেরা বাস করতেন। একদিন তারা অবাধ্যদের বস্তিতে অস্বাভাবিক নীরবতা লক্ষ্য করলেন। অতঃপর সেখানে পৌছে দেখলেন যে, সবাই বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। হযরত কাতাদাহ্ (রা) বলেন, তাদের যুবকরা বানরে এবং বৃদ্ধরা শূকরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রূপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনত এবং তাদের কাছে এসে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করত।

রূপান্তরিত সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি ঃ এ সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি অভ্রান্ত উক্তি করেছেন। সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, কয়েকজন সাহাবী একবার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হুযূর! আমাদের যুগের বানর ও শূকরগুলোও কি সেই রূপান্তরিত ইহুদী সম্প্রদায় ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়ের ওপর আকৃতি রূপান্তরের আযাব নাযিল করেন, তখন তারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তিনি আরও বললেন, বানর ও শূকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। এদের সাথে রূপান্তরিত বানর ও শূকরদের সম্পর্ক নেই।

এ প্রসঙ্গে কোন কোন টীকাকার সহীহ্ বুখারীর বরাত দিয়ে বানরদের মধ্যে ব্যভিচারের অপরাধে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ঘটনাটি বুখারীর কোন নির্ভরযোগ্য সংকলনে নেই। রেওয়ায়েতের নীতি অনুযায়ীও তা অভ্রান্ত নয়। -(কুরতুবী)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً ۖ قَالُوٓا۟
أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٦٧﴾

---

(৬৭) যখন মূসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের একটি গরু জবাই করতে বলেছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ ? মূসা (আ) বললেন, মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(স্মরণ কর,) যখন (হযরত) মূসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, (যদি ঐ মৃতদেহের হত্যাকারীর সন্ধান পেতে চাও, তবে) একটি গরু জবাই কর। তারা বলতে লাগল ঃ তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ ? (কোথায় হত্যাকারীর সন্ধান, আর কোথায় গরু জবাই করা।) মূসা (আ) বললেন, (নাউযুবিল্লাহ্!) আমি কি আল্লাহ্‌র নির্দেশ নিয়ে ঠাট্টা করার মত মূর্খজনোচিত কাজ করতে পারি ?

জ্ঞাতব্য ঃ ঘটনার বিবরণ এই যে, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। মিশকাতের টীকা গ্রন্থ মিরকাতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল বিবাহজনিত। জনৈক ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির কন্যার পাণিগ্রহণ করার প্রস্তাব করলে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং প্রস্তাবক কন্যার পিতাকে হত্যা করে গা-ঢাকা দেয়। ফলে হত্যাকারী কে, তা জানা কঠিন হয়ে পড়ে।

মাআলী (রা) কাল্বী (রা)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তখন পর্যন্তও তওরাতে হত্যা সম্পর্কে কোন আইন বিদ্যমান ছিল না। এতে বোঝা যায়, ঘটনাটি তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার।

মোটকথা, বনী ইসরাঈল মূসা (আ)-এর কাছে হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তিনি আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী তাদের একটি গরু জবাই করার জন্য আদেশ দেন। তারা চিরাচরিত অভ্যাস ও প্রকৃতি অনুযায়ী এতে নানা প্রকার বাদানুবাদের অবতারণা করতে থাকে।

পরবর্তী আয়াতসমূহে এ বাদানুবাদেরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ
لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ۖ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ إِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ۖ وَإِنَّآ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ
لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا
تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ
فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

(৬৮) তারা বলল, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন সেটির রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। মূসা (আ) বললেন, তিনি বলেছেন, সেটা হবে একটা

গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়—বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের। এখন আদিষ্ট কাজ করে ফেল। (৬৯) তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যে, তার রং কিরূপ হবে ? মূসা (আ) বললেন, তিনি বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাভী—যা দর্শকদের আনন্দ দান করে। (৭০) তারা বলল, তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর—তিনি বলে দিন যে, সেটা কিরূপ ? কেননা, গরু আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল মনে হয়। ইন্‌শাআল্লাহ্ এবার আমরা অবশ্যই পথ প্রাপ্ত হব। (৭১) মূসা (আ) বললেন, 'তিনি বলেন যে, এ গাভী ভূকর্ষণ ও পানি সেচের শ্রমে অভ্যস্ত নয়–হবে নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত।' তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা সেটা জবাই করল, অথচ জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা বলতে লাগল ঃ আপনি স্বীয় প্রভুর কাছে আমাদের জন্যে প্রার্থনা করুন। তিনি যেন বলে দেন যে, গরুটির গুণাবলী কি হবে ? মূসা (আ) বললেন, প্রভু (আমাদের প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে) বলেন যে, গরুটি না বৃদ্ধ হবে, না শাবক, বরং উভয় বয়সের মাঝামাঝি। সুতরাং এখন (বেশি বাদানুবাদ না করে) যা আদেশ করা হয়েছে, তা করে ফেল। তারা বলতে লাগল (আরও একটি) প্রার্থনা করুন যে, ওর রং কিরূপ হবে, তিনি (যেন তাও) বলে দেন। মূসা (আ) বললেন, (এ সম্পর্কে) আল্লাহ্ বলেন যে, গরুটি হবে পীত বর্ণের। এর রং এত গাঢ় হবে যে, দর্শকরা আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়বে। তারা বলতে লাগল ঃ (এবার) আমাদের জন্যে আরো একটা প্রার্থনা করুন যে, তিনি প্রথমবারের প্রশ্নের উত্তর আরও স্পষ্ট করে বলে দিন যে, ওর কি গুণাবলী হবে ? কেননা, গরু সম্পর্কে আমাদের মনে (কিছু) সন্দেহ আছে (যে, এটা সাধারণ গরু, না অত্যাশ্চর্য ধরনের—যাতে হত্যাকারী অনুসন্ধানের বিশেষ কোন চিহ্ন থাকবে)। ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই (এবার) ঠিক ঠিক বুঝে নেব। মূসা (আ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, এটা কোন অত্যাশ্চর্য গরু নয়; বরং সাধারণ গরুই হবে। তবে উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। উল্লিখিত গুণাবলীসহ একে এমনও হতে হবে যে, একে হালচাষে জোড়া হয়নি এবং (কুয়ায় জুড়ে) শস্যক্ষেত্রে সেচের কাজও করা হয়নি (মোটকথা) যাবতীয় দোষমুক্ত সুস্থকায় এবং এতে (কোন প্রকার) খুঁত যেন না থাকে। (একথা শুনে) তারা বলতে লাগল, (হ্যাঁ) এবার আপনি পূর্ণ (এবং পরিষ্কার) কথা বলেছেন। (অবশেষে তারা গরু খুঁজে কিনে আনল) অতঃপর তারা তাকে জবাই করল। কিন্তু (বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে) জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না।

হাদীসে বর্ণিত আছে, বনী-ইসরাঈল এসব বাদানুবাদে প্রবৃত্ত না হলে এতসব শর্তও আরোপিত হতো না। বরং যে কোন গরু জবাই করে দিলেই যথেষ্ট হতো।

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

(৭২) যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে। যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেওয়া ছিল আল্লাহ্র অভিপ্রায়। (৭৩) অতঃপর আমি বললাম ঃ গরুর একটি খণ্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এইভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন—যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(স্মরণ কর) যখন তোমাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করল, অতঃপর (নিজের সাফাইয়ের উদ্দেশ্যে) অন্যের উপর দোষারোপ করতে লাগল। (তখন আল্লাহ্র কাজ ছিল তা প্রকাশ করে দেওয়া) যা (তোমাদের) অপরাধী ও দোষী লোকেরা গোপন করেছিল। এ কারণে (গরু জবাই করার পর) আমি নির্দেশ দিলাম যে, মৃতদেহকে গরুর কোন টুকরা ছুঁইয়ে দাও। (সেমতে ছুঁইয়ে দিতেই মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘটনাকে কিয়ামতের অস্বীকারকারীদের সামনে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করে বলেন যে,) এভাবেই আল্লাহ্ (কিয়ামতের দিন) মৃতদের জীবিত করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় (কুদরতের) নিদর্শনাবলী তোমাদের প্রদর্শন করেন এ আশায় যে, তোমরা চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগাবে এবং এক নিদর্শনকে দেখে অপর নিদর্শনকে অস্বীকার করা থেকে বিরত থাকবে।

মৃতদেহকে গরুর টুকরা স্পর্শ করাতেই সে জীবিত হয়ে যায় এবং হত্যাকারীর নাম বলে তৎক্ষণাৎ আবার মরে যায়।

এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, মূসা (আ) ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, নিহত ব্যক্তি সত্য বলবে। নতুবা শরীয়তসম্মত সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়া নিহত ব্যক্তির জবানবন্দীই হত্যা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না।

এক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহ করাও ঠিক নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এমনিতেই মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম ছিলেন, অথবা নিহত ব্যক্তিকে জীবিত না করেও হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় এতসব আয়োজনের কি প্রয়োজন ছিল ? উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেক কাজ প্রয়োজন অথবা বাধ্যতার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয় না। বরং

উপযোগিতা ও বিশেষ তাৎপর্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। প্রত্যেক ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। ঘটনার উপযোগিতা জানার জন্য আমরা আদিষ্টও নই এবং প্রতিটি রহস্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়া অপরিহার্যও নয়। এ কারণে এর পেছনে পড়ে জীবন বরবাদ করার চাইতে মেনে নেওয়া অথবা মৌনতা অবলম্বন করাই উত্তম।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

---

(৭৪) অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমনও আছে; যা থেকে ঝরনা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে, যা আল্লাহ্র ভয়ে খসে পড়তে থাকে। আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(বিগত ঘটনাবলীতে প্রভাবিত না হওয়ার দরুন অভিযোগের ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে ঃ) এমন ঘটনার পর (তোমাদের অন্তর একেবারে নরম ও আল্লাহ্র মহত্ত্বে আপ্লুত হয়ে যাওয়াই সঙ্গত ছিল। কিন্তু) তোমাদের অন্তরই কঠিন রয়ে গেছে। এখন (বলা যায় যে,) তা পাথরের মত অথবা (বলা যায় যে, কঠোরতায়) পাথর অপেক্ষাও বেশি। (পাথর থেকেও অধিক কঠিন হওয়ার কারণ এই যে,) কোন কোন পাথর তো এমনও রয়েছে যা থেকে বড় বড় নদ-নদী প্রবাহিত হয়। আবার কোন কোন পাথর বিদীর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর তা থেকে (বেশি না হলেও অল্প) পানি নির্গত হয়। এ ছাড়া কোন পাথর আল্লাহ্র ভয়ে উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে তোমাদের অন্তরে কোন প্রকার প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় না। (এহেন কঠিন অন্তর থেকে যেসব মন্দ কাজকর্ম প্রকাশ পায়,) তোমাদের (সেসব) কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বেখবর নন (তিনি সত্বরই তোমাদের সমুচিত শাস্তি দেবেন)।

জ্ঞাতব্য ঃ এখানে পাথরের তিনটি ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে ঃ (১) পাথর থেকে বেশি পানি প্রসরণ (২) কম পানির নিঃসরণ। এ দু'টি প্রভাব সবারই জানা। (৩) আল্লাহ্র ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়া। এ তৃতীয় ক্রিয়াটি কারও কারও অজানা থাকতে পারে। কারণ, পাথরের

কোনরূপ জ্ঞান ও অনুভূতি নেই। কিন্তু জানা উচিত যে, ভয় করার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। জন্তু-জানোয়ারের জ্ঞান নেই, কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি প্রত্যক্ষ করি। তবে চেতনার প্রয়োজনও অবশ্য আছে। জড় পদার্থের মধ্যে এতটুকু চেতনাও নেই বলে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না। কারণ চেতনা প্রাণের উপর নির্ভরশীল। খুব সম্ভব জড় পদার্থের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম প্রাণ আছে যা আমরা অনুভব করতে পারি না। উদাহরণত বহু পণ্ডিত মস্তিষ্কের চেতনাশক্তি অনুভব করতে পারেন না। তারা একমাত্র যুক্তির ভিত্তিতেই এর প্রবক্তা। সুতরাং ধারণাপ্রসূত প্রমাণাদির চাইতে কোরআনী আয়াতের যৌক্তিকতা কোন অংশে কম নয়।

এ ছাড়া আমরা এরূপ দাবিও করি না যে, পাথর সব সময় ভয়ের দরুনই নিচে গড়িয়ে পড়ে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা 'কতক পাথর' বলেছেন। সুতরাং নিচে গড়িয়ে পড়ার অন্য আরও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তন্মধ্যে একটি হলো আল্লাহ্র ভয়। আর অন্যগুলো প্রাকৃতিক হতে পারে।

এখানে তিন রকমের পাথরের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সাবলীল ভঙ্গিতে এদের শ্রেণীবিন্যাস ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। কতক পাথরের প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা এত প্রবল যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তা দ্বারা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর এমন নয় যে, সৃষ্ট জীবের দুঃখ-দুর্দশায় অশ্রুসজল হবে। কতক পাথরের মধ্যে প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা কম। ফলে সেগুলোর দ্বারা উপকারও কম হয়। এ ধরনের পাথর প্রথম ধরনের পাথরের তুলনায় কম নরম হয়। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর এ দ্বিতীয় ধরনের পাথর থেকেও বেশি শক্ত।

কতক পাথরের মধ্যে উপরোক্ত রূপ প্রভাব না থাকলেও এতটুকু প্রভাব অবশ্যই আছে যে, আল্লাহ্র ভয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে। এ পাথর উপরোক্ত দুই প্রকার পাথরের তুলনায় অধিক দুর্বল। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর দুর্বলতম প্রভাব থেকেও মুক্ত।

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

(৭৫) (হে মুসলমানগণ)! তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ করত। অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা অবগত ছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুসলমানেরা ইহুদীদের ঈমানদার করার চেষ্টায় অনেক কষ্ট স্বীকার করত।) আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে ইহুদীদের অবস্থা ও ঘটনাবলী বলে ও শুনিয়ে মুসলমানদের আশার অবসান ঘটাচ্ছেন এবং তাদের কষ্ট দূর করছেন।

হে মুসলমানগণ, (এসব কাহিনী শুনে) এখনও কি তোমরা আশা কর যে, ইহুদীরা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে ? (অথচ তাদের দ্বারা উপরোক্ত ঘটনাবলী ছাড়া আরও একটি জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তা এই যে, তাদের একদল লোক (অতীতে) আল্লাহ্র বাণী শুনে তা বিকৃত করে দিত, তা হৃদয়ঙ্গম করার পর (এমন করত)। এবং (মজার ব্যাপার এই যে,) তারা জানত (যে তারা জঘন্য অপরাধ করেছে; শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই তারা এমনটি করত)।

জ্ঞাতব্য ঃ উদ্দেশ্য এই যে, যারা এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ ও স্বার্থান্বেষী, তারা অন্যের সদুপদেশে কখনও মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে না।

এখানে 'আল্লাহ্র বাণী' অর্থাৎ তওরাত। 'শ্রবণ কর' অর্থাৎ পয়গম্বরদের মাধ্যমে শ্রবণ কর। 'পরিবর্তন করা' অর্থাৎ কোন কোন বাক্য অথবা ব্যাখ্যা অথবা উভয়টিকে বিকৃত করে ফেলা।

অথবা 'আল্লাহ্র বাণী' অর্থাৎ ঐ বাণী, যা মূসা (আ)-এর সত্যায়নের উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে গমনকারী সত্তরজন ইহুদী তূর পর্বতে শুনেছিল। 'শ্রবণ' অর্থ মাধ্যমবিহীনভাবে সরাসরি শ্রবণ। 'পরিবর্তন' অর্থ স্বগোত্রের কাছে প্রসঙ্গক্রমে এরূপ বর্ণনা করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা উপসংহারে বলে দিয়েছেন ঃ তোমরা যেসব নির্দেশ পালন করতে না পার, তা মাফ।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আমলে যেসব ইহুদী ছিল, তাদের দ্বারা উল্লিখিত কোন কুকর্ম সংঘটিত হয়নি সত্য; কিন্তু পূর্ববর্তীদের এসব দুষ্কর্মকে তারা অপছন্দ ও ঘৃণা করত না। এ কারণে তারাও কার্যত পূর্ববর্তীদের মতই।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

---

(৭৬) যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে ঃ আমরা মুসলমান হয়েছি। আর যখন পরস্পরের সাথে নিভৃতে অবস্থান করে, তখন বলে ঃ পালনকর্তা তোমাদের জন্য যা প্রকাশ করেছেন, তা কি তাদের কাছে বলে দিচ্ছ ? তাহলে যে তারা এ নিয়ে পালনকর্তার সামনে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তোমরা কি তা উপলব্ধি কর না ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তারা (অর্থাৎ কপট ইহুদীরা) মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন (তাদের) বলে ঃ আমরা (এই মাত্র) ঈমান এনেছি। আর যখন নিভৃতে যায়, কতক (কপট ইহুদী) অন্য কতকের (অর্থাৎ প্রকাশ্য ইহুদীর) সাথে (তখন তাদের সহচর ও সহধর্মী হওয়ার দাবি করে) তখন তারা

(প্রকাশ্য ইহুদীরা) বলে ঃ তোমরা (একি সর্বনাশা কাজ কর যে, মুসলমানদের তোষামোদ করতে গিয়ে তাদের ধর্মের পক্ষে উপকারী কথাবার্তা) বলে দাও, যা আল্লাহ্ তা'আলা তওরাতে তোমাদের জন্য প্রকাশ করেছেন ? (কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যে আমরা তা গোপন রাখি।) এর ফল হবে এই যে, তারা বাদানুবাদে তোমাদের (একথা বলে) হারিয়ে দেবে (যে, দেখ এ বিষয়টি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের ধর্মগ্রন্থেও বর্ণিত রয়েছে)। তোমরা কি (এ স্থূল বিষয়টিও) উপলব্ধি কর না ?

মুনাফিক ইহুদীরা তোষামোদের ছলে নিজেদের ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে কিছু গোপন কথা বলে দিত। উদাহরণত, তওরাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে, কোরআন মজীদ সম্পর্কে সংবাদ উল্লিখিত হয়েছে ইত্যাদি। এ কারণে অন্যরা তাদের তিরস্কার করত।

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ
أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ
وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

(৭৭) তারা কি এতটুকুও জানে না যে, আল্লাহ্ সেসব বিষয়ও পরিজ্ঞাত যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে। (৭৮) তোমাদের কিছু লোক নিরক্ষর। তারা মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আল্লাহ্র গ্রন্থের কিছুই জানে না। তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া কিছুই নেই। (৭৯) অতএব তাদের জন্য আফসোস, যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ—যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের উপার্জনের জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাদের কি একথা জানা নেই যে, আল্লাহ্ সে সবই জানেন—যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। (কাজেই মুসলমানদের কাছে মুনাফিকদের কুফরী বিষয় গোপন করে এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ সম্পর্কিত বিষয় গোপন করে কোন লাভ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা সবই জানেন। সেমতে তিনি উভয় বিষয়ই মুসলমানদের বলে দিয়েছেন।)

এ আয়াতে শিক্ষিত ইহুদীদের কথা বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে অশিক্ষিতদের কথা এভাবে বলা হয়েছে ঃ

তাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিতও রয়েছে। এরা খোদায়ী গ্রন্থের জ্ঞান রাখে না। কিন্তু (ভিত্তিহীন) আকর্ষণীয় কথাবার্তা বেশ ভাল করেই মনে করে রেখেছে। তারা আর কিছু নয়, শুধু অলীক কল্পনার জালবোনে। (এর কারণ, কিছুটা তাদের আলিমদের অসম্পূর্ণ শিক্ষা, আর কিছুটা তাদের নিজস্ব বোধশক্তির অভাব। এমতাবস্থায় অলীক কল্পনাবিলাস ছাড়া সত্যানুসন্ধান কিরূপে সম্ভব ? কথায় বলে, "এমনিতেই কড়লা, তা আবার নিম গাছের।" এতে মিষ্টতা কোথায়!

তাদের এ কুসংস্কার প্রীতির জন্য আলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতকতাই প্রধানত দায়ী। এ কারণে তারা সাধারণ লোক অপেক্ষা বেশি অপরাধী। পরের আয়াতে তাই বলা হচ্ছে ঃ

(সাধারণ লোকের মূর্খতার জন্য আলেমরাই যখন দায়ী, তখন) বড় আক্ষেপ তাদের হবে, যারা (বিকৃত করে) গ্রন্থ (অর্থাৎ তওরাত) স্বহস্তে লিখে এবং পরে (জনসাধারণকে) বলে যে, এ নির্দেশ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (এভাবেই) এসেছে। উদ্দেশ্য (শুধু) তার দ্বারা কিছু নগদ অর্থ-কড়ি বাগিয়ে নেওয়া। অতএব, তাদের বড় আক্ষেপ হবে গ্রন্থ বিকৃত করার জন্য, যা তারা স্বহস্তে লিখেছিল এবং বড় আক্ষেপ হবে তাদের (নগদ অর্থ) উপার্জনের জন্য।

জনগণের সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে ভুল বিষয় পরিবেশন করলে তারা কিছু নগদ অর্থ-কড়িও পেয়ে যেত এবং মান-সম্মানও বজায় থাকত। এ কারণে তারা তওরাতে শাব্দিক ও মর্মগত—উভয় প্রকার পরিবর্তন করার চেষ্টা করত। উল্লিখিত আয়াতে এ বিষয়ের উপরই কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে।

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

---

(৮০) তারা বলে ঃ আগুন আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করবে না; কিন্তু কয়েক দিন ব্যতীত। বলে দিন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্র কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যে, আল্লাহ্ তার খেলাফ করবেন না—না তোমরা যা জান না, তা আল্লাহ্র সাথে জুড়ে দিচ্ছ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইহুদীরা আরও বলে ঃ দোযখের আগুন কখনও আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। (হ্যাঁ) তবে খুব অল্প দিন যা (আঙ্গুলে) গোণা যায়, এমন কয়দিন মাত্র। হে মুহাম্মদ, আপনি বলে দিন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এ মর্মে কোন চুক্তি করেছ যে, তিনি স্বীয় চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করবেন না ? না, (চুক্তি করনি; বরং) এমনিতেই আল্লাহ্র সাথে এমন কথা জুড়ে দিচ্ছ, যার কোন যুক্তিগ্রাহ্য সনদ তোমাদের কাছে নেই ?

তফসীরবিদগণ ইহুদীদের এ বক্তব্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, ঈমানদার ব্যক্তি গোনাহ্গার হলে গোনাহ্ পরিমাণে দোযখ ভোগ করবে। কিন্তু ঈমানের ফলস্বরূপ চিরকাল দোযখে থাকবে না। কিছুকাল পরই তা থেকে মুক্তি পাবে।

অতএব, ইহুদীদের দাবির সারমর্ম এই যে, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত মূসা (আ) প্রচারিত ধর্ম রহিত হয়নি। কাজেই তারা ঈমানদার। ঈসা (আ) ও হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবূয়ত অস্বীকার করার পরও তারা কাফের নয়। সুতরাং যদি কোন পাপের কারণে তারা দোযখে চলেও যায়, কিন্তু কিছু দিন পরই মুক্তি পাবে। বলা বাহুল্য, এ দাবিটি একটি অসত্যের উপর অসত্যের ভিত্তি বৈ নয়। কেননা মূসা (আ) কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম চিরকালের জন্য–এরূপ দাবিই অসত্য। অতএব ঈসা (আ) ও হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবূয়ত অস্বীকার করার কারণে ইহুদীরা কাফের। কাফেরও কিছুদিন পর দোযখ থেকে মুক্তি পাবে–এমন কথা কোন আসমানী গ্রন্থে নেই—যা আলোচ্য আয়াতে অঙ্গীকার শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ইহুদীদের দাবিটি যুক্তিহীন বরং যুক্তিবিরুদ্ধ।

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨٢﴾

---

(৮১) হ্যাঁ, যে ব্যক্তি গোনাহ অর্জন করেছে এবং সে গোনাহ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে, তারাই দোযখের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। (৮২) পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকার্য করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপে

অনন্তকাল দোযখবাসের বিধি ঃ সামান্য কিছুদিন ছাড়া দোযখের আগুন তোমাদের কেন স্পর্শ করবে না ? বরং দোযখেই তোমাদের অনন্তকাল বাস করার কথা। কেননা, আমার বিধি এই যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক মন্দ কাজ করে এবং পাপ ও অপকর্ম তাকে এমনভাবে বেষ্টন করে নেয় (যে, কোথাও সততার কোন চিহ্নমাত্র থাকে না,) এমন সব লোকই দোযখের অধিবাসী। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আর যারা (আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি) ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তারা জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গোনাহ্‌র দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার যে অর্থ তফসীরের সারাংশে উল্লিখিত হয়েছে, তা শুধু কাফেরদের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। কারণ কুফরের কারণে কোন সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। কুফরের পূর্বে কিছু সৎকর্ম করে থাকলেও তা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই কাফেরদের মধ্যে আপাদমস্তক গোনাহ্ ছাড়া আর কিছুরই কল্পনা করা যায় না। ঈমানদারদের অবস্থা কিন্তু তা নয়। প্রথমত, তাদের ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য নেক আমল তাদের আমলনামায় লেখা হয়। সে জন্য ঈমানদার সৎকর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। সুতরাং উল্লিখিত বেষ্টনী তাদের বেলায় অবান্তর।

মোটকথা উপরোক্ত রীতি অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, কাফেররা অনন্তকাল দোযখে বাস করবে। হযরত মূসা (আ) সর্বশেষ পয়গম্বর নন। তাঁর পর হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও পয়গম্বর। তাঁদেরকে অস্বীকার করার কারণে ইহুদীরা কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ফলে উপরোক্ত বিধি অনুযায়ী তারাও অনন্তকাল দোযখে বাস করবে। সুতরাং তাদের দাবি অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে অসার প্রমাণিত হয়েছে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ قف

وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ

وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ط

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

---

(৮৩) যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও ইবাদত করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠিত করবে এবং যাকাত দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

স্মরণ কর, যখন আমি (তওরাতে) বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতার উত্তম সেবাযত্ন করবে, আত্মীয়-স্বজন, এতিম বালক-বালিকা এবং দীন-দরিদ্রদেরও (সেবাযত্ন করবে) এবং সাধারণ লোকের সাথে যখন কোন কথা বলবে, তখন একান্ত নম্রতার সাথে বলবে। নিয়মিত নামায পড়বে এবং যাকাত দেবে। অতঃপর তোমরা (অঙ্গীকার করে) তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে কয়েকজন ছাড়া। অঙ্গীকার করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই তোমাদের নিত্যকার অভ্যাস।

জ্ঞাতব্য ঃ 'অল্প কয়েকজন' অর্থাৎ তারাই যারা তওরাতের পুরোপুরি অনুসরণ করত, তওরাত রহিত হওয়ার পূর্বে তারা মূসা (আ) প্রবর্তিত শরীয়তের অনুসারী ছিল এবং তওরাত রহিত হওয়ার পর তারা ইসলামী শরীয়তের অনুসারী হয়ে যায়। আয়াত দৃষ্টে বোঝা যায় যে, একত্ববাদে ঈমান এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম বালক-বালিকা ও দীন-দরিদ্রদের সেবাযত্ন করা, সব মানুষের সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলা, নামায পড়া এবং যাকাত দেওয়া ইসলামী শরীয়তসহ পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও বিদ্যমান ছিল।

শিক্ষা ও প্রচার ক্ষেত্রে কাফেরের সাথেও অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা বৈধ নয় ঃ قُولُوا لِلنَّاسِ আয়াতে এমন قول বোঝানো হয়েছে, যা সৌন্দর্যমণ্ডিত। এর অর্থ এই যে, যখন মানুষের সাথে কথা বলবে, নম্রভাবে হাসিমুখে ও খোলা মনে বলবে—যার সাথে কথা বলবে, সে সৎ হউক বা অসৎ, সুন্নী হউক বা বেদাতী। তবে ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অথবা কারও মনোরঞ্জনের জন্য সত্য গোপন করবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যখন মূসা ও হারুন (আ)-কে নবুয়ত দান করে ফেরআউনের প্রতি পাঠিয়েছিলেন, তখন এ নির্দেশ দিয়েছিলেন فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا

অর্থাৎ তোমরা উভয়েই ফেরআউনকে নরম কথা বলবে। আজ যারা অন্যের সাথে কথা বলে, তারা হযরত মূসা (আ)-এর চাইতে উত্তম নয় এবং যার সাথে বলে, সে ফেরআউন অপেক্ষা বেশি মন্দ ও পাপিষ্ঠ নয়।

তালহা ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ আমি তফসীর ও হাদীসবিদ 'আতা (র)-কে বললাম ঃ আপনার কাছে ভ্রান্ত লোকেরাও আনাগোনা করে। কিন্তু আমার মেজায কঠোর। এ ধরনের লোক আমার কাছে এলে আমি ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেই। 'আতা বললেন ঃ তা করবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে এই ঃ

قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (মানুষকে সুন্দর কথাবার্তা বল।) ইহুদী-খৃস্টানও এ নির্দেশের আওতাভুক্ত। সুতরাং মুসলমান যত মন্দই হোক, সে কেন এ নির্দেশের আওতায় পড়বে না?

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

---

(৮৪) যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা পরস্পর খুনোখুনি করবে না এবং নিজদিগকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে না, তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্বে যে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, এ আয়াতে তারই পরিশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ) স্মরণ কর, সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকারও নিলাম যে, (গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে) পরস্পর খুনোখুনি করো না এবং একে অন্যকে দেশত্যাগে বাধ্য করো না, তখন (সে অঙ্গীকারকে) তোমরা স্বীকারও করেছিলে, আর (স্বীকারোক্তি ও আনুষঙ্গিক ছিল না, বরং এমনভাবে অঙ্গীকার করছিলে যেন) তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে।

জ্ঞাতব্য ঃ কোন কোন সময় কারও বক্তব্যের ভেতরেই কোন কিছুর অঙ্গীকারও বোঝা যায় যদিও তা সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ অনিশ্চয়তার অপনোদন করে বলা হয়েছে যে, তাদের অঙ্গীকার সাক্ষ্যদানের মতই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ছিল।

দেশ ত্যাগ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই যে, কাউকে এমন উৎপীড়ন করবে না, যাতে সে দেশত্যাগে বাধ্য হয়।

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ
دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؕ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى
تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ
الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ
فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ
وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾

(৮৫) অতঃপর তোমরাই পরস্পরে খুনোখুনি করছ এবং তোমাদেরই একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করছ। তাদের বিরুদ্ধে গোনাহ্ ও অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমণ করছ। আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিষ্কার করাও তোমাদের জন্য অবৈধ। তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর! যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(অঙ্গীকারের উপসংহারে তাদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার লজ্ঘন সম্পর্কে এ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে) অতঃপর (সুস্পষ্ট অঙ্গীকারের পর) তোমরা যা করছ, তা স্পষ্ট। আর তা এই যে, তোমরা পরস্পর খুনোখুনিও করছ এবং একে অন্যকে দেশত্যাগেও বাধ্য করছ। (তা এভাবে যে,) নিজেদেরই লোকের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে তাদের শত্রুদের সাহায্য করছ। (এ দু'টি নির্দেশ তো এভাবেই বান্‌চাল করে দিয়েছ। তৃতীয় আরেকটি নির্দেশ, যা পালন করা তোমাদের কাছে সহজ, তা পালনে বেশ তৎপরতা প্রদর্শন করছ। তা হলো এই যে,) যদি তাদের কেউ বন্দী হয়ে তোমাদের কারও কাছে আসে, তবে কিছু অর্থের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করছ। অথচ (এটা জানা কথা যে,) তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করাও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ (হত্যা করা তো আরো বেশী নিষিদ্ধ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জ্ঞাতব্য ঃ বনী ইসরাঈলকে তিনটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রথমত, খুনোখুনি না করা; দ্বিতীয়ত, বহিষ্কার অর্থাৎ দেশত্যাগে বাধ্য না করা, এবং তৃতীয়ত, স্বগোত্রের কেউ কারও হাতে বন্দী হলে অর্থের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করা। কিন্তু তারা প্রথমোক্ত দু'টি নির্দেশ অমান্য করে তৃতীয় নির্দেশ পালনে বিশেষ তৎপর ছিল। ঘটনার বিবরণ এরূপ ঃ মদীনাবাসীদের মধ্যে 'আওস' ও 'খাযরাজ' নামে দু'টি গোত্র ছিল। তাদের মধ্যে শত্রুতা লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে যুদ্ধও বাধত। মদীনার আশেপাশে ইহুদীদের দু'টি গোত্র 'বনী কুরায়যা' ও 'বনী নাজীর' বসবাস করত। আওস গোত্র ছিল বনী-কুরায়যার মিত্র এবং খাযরাজ গোত্র বনী নাজীরের মিত্র। আওস ও খাযরাজের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে মিত্রতার ভিত্তিতে বনী কুরায়যা আওসের সাহায্য করত এবং নাজীর খাযরাজের পক্ষ অবলম্বন করত। যুদ্ধে আওস ও খাযরাজের যেমন লোকক্ষয় ও ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হতো, তাদের মিত্র বনী কুরাযযা ও বনী নাজীরেরও তেমনি হতো। বনী কুরায়যাকে হত্যা ও বহিষ্কারের ব্যাপারে শত্রুপক্ষের মিত্র নাজীরেরও হাত থাকত। তেমনি নাজীরের হত্যা ও বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করার কাজে শত্রুপক্ষের মিত্র বনী কুরায়যারও হাত থাকত। তবে তাদের একটি আচরণ ছিল অদ্ভুত। ইহুদীদের দুই দলের কেউ আওস অথবা খাযরাজের হাতে বন্দী হয়ে গেলে প্রতিপক্ষীয় দলের ইহুদী স্বীয় মিত্রদের অর্থে বন্দীকে মুক্ত করে দিত। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলত ঃ বন্দীকে মুক্ত করা আমাদের উপরে ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যুদ্ধে সাহায্য করার ব্যাপারে কেউ আপত্তি করলে তারা বলত ঃ কি করব, মিত্রদের সাহায্যে এগিয়ে না আসা লজ্জার ব্যাপার। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাদের এ আচরণেরই নিন্দা করেছেন এবং তাদের এ অপকৌশলের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন।

আয়াতে যে সব শত্রু গোত্রকে সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হলো আওস ও খাযরাজ গোত্র। আওস বনী কুরায়যার বন্ধুত্ব লাভের জন্য বনী নাজীরের শত্রু ছিল এবং খাযরাজ বনী নাজীরের বন্ধুত্ব লাভের জন্য বনী কুরায়যার শত্রু ছিল।

اثم ও عدوان । (গোনাহ্ ও অন্যায়)–আয়াতে ব্যবহৃত এ দু'টি শব্দ দ্বারা দু'রকম হক বা অধিকার নষ্ট করার প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে। আর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে তারা একদিকে আল্লাহ্র হক নষ্ট করেছে এবং অপরকে কষ্ট দিয়ে বান্দার হকও নষ্ট করেছে।

পরবর্তী আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে তিরস্কার করার সাথে সাথে শাস্তির কথাও বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

"তোমরা কি (আসলে) গ্রন্থের (তওরাতের) কতক (নির্দেশ) বিশ্বাস কর এবং কতক (নির্দেশ) অবিশ্বাস কর ? তোমাদের মধ্যে যে ব্যাক্তি এমন করে, পার্থিব জীবনের দুর্গতি ছাড়া তার আর কি সাজা (হওয়া উচিত) ? কিয়ামতের দিন তারা ভীষণ আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা (মোটেই) বে-খবর নন তোমাদের (বিশ্রী) কাজকর্ম সম্বন্ধে।

ঘটনায় বর্ণিত ইহুদীরা নবী করীম (সা)-এর নবুয়ত স্বীকার না করায় নিঃসন্দেহে কাফের। কিন্তু এখানে তাদের কুফর উল্লেখ করা হয়নি। বরং কতিপয় নির্দেশ পালন না করাকে কুফর বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথচ যতক্ষণ কেউ হারামকে হারাম মনে করে, ততক্ষণ কাফের হয় না। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, শরীয়তের পরিভাষায় কঠোর গোনাহ্কে শুধু কঠোরতার প্রেক্ষিতেই কুফর বলে দেওয়া হয়। আমরা নিজেদের পরিভাষায়ও এর দৃষ্টান্ত অহরহ দেখতে পাই। উদাহরণত কাউকে কোন নিকৃষ্ট কাজ করতে দেখলে আমরা বলে দেই ঃ তুই একেবারে চামার। অথচ সে মোটেই চামার নয়। এক্ষেত্রে তীব্র ঘৃণা এবং সংশ্লিষ্ট কাজটির নিকৃষ্টতা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر (যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দেয়, সে কাফের হয়ে যায়)। এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদীসের বেলায়ও এ অর্থই বুঝতে হবে।

আয়াতে উল্লিখিত দু'টি শাস্তির প্রথমটি হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি। তা এভাবে বাস্তব রূপ লাভ করেছে যে, নবী করীম (সা)-এর আমলেই মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিভঙ্গের অপরাধে বনী-কুরায়যা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও বন্দী হয়েছে এবং বনী নাজীরকে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে সিরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٦﴾

---

(৮৬) এরাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে। অতএব এদের শাস্তি লঘু হবে না এবং এরা সাহায্যও পাবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তাদের শাস্তির কারণ এই যে,) তারাই (নির্দেশ অমান্য করে) পার্থিব জীবনের স্বাদ গ্রহণ করেছে পরকালের (মুক্তির) বিনিময়ে (অথচ মুক্তির উপায় ছিল নির্দেশ মান্য করা)। অতএব, (শাস্তিদাতার পক্ষ থেকে) তাদের শাস্তি লঘু হবে না এবং (কোন উকিল-মোক্তার বা আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে) সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۫ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۫ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿۸۷﴾

---

(৮৭) অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি। এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রসূল পাঠিয়েছি। আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট মো'জেযা দান করেছি এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে শক্তিদান করেছি। অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনে ভাল লাগেনি, তখনই তোমরা অহঙ্কার প্রদর্শন করেছ। শেষ পর্যন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছ এবং একদলকে হত্যা করেছ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বনী-ইসরাঈল; আমি (তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য অনেক বড় বড় আয়োজন করেছি। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম) মূসাকে (তওরাত) গ্রন্থ দিয়েছি। তারপর (অন্তর্বর্তীকালে) একের পর এক পয়গম্বর পাঠিয়েছি। (অতঃপর এ পরিবারের শেষ প্রান্তে) আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে (নবুয়তের) সুস্পষ্ট প্রমাণাদি (ইঞ্জীল ও মু'জিযা) দান করেছি এবং আমি তাকে পবিত্র রূহ, (তথা জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম)-এর মাধ্যমে শক্তি দান করেছি (এটিও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ ছিল)। অতঃপর (এটা কি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এতসব সত্ত্বেও তোমরা অবাধ্যতায় অটল রইলে এবং) যখনই কোন পয়গম্বর তোমাদের কাছে এমন নির্দেশ নিয়ে এলেন, যা তোমাদের মনঃপূত হয়নি, তখনই তোমরা (এই পয়গম্বরের অনুসরণ করতে) অহংকার করতে লাগলে। ফলে (এসব পয়গম্বরের একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ এবং আরেক দলকে (নির্দ্বিধায়) হত্যা করেছ।

কোরআন-হাদীসের বিভিন্ন স্থানে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে 'রূহুল কুদুস' (পবিত্রাত্মা) বলা হয়েছে। কোরআনের আয়াত قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ এবং হাদীসে হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেতের কবিতা রয়েছে ঃ

وجبرائيل رسول الله فينا – وروح القدس ليس له كفاء

জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে ঈসা (আ)-কে কয়েক রকম শক্তি দান করা হয়েছে। প্রথমত, জন্মগ্রহণের সময় শয়তানের স্পর্শ হতে রক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া তাঁরই দম করার ফলে মরিয়মের উদরে হযরত ঈসার গর্ভ সঞ্চারিত হয়। বহু ইহুদী ঈসা (আ)-এর শত্রু ছিল। এ কারণে দেহরক্ষী হিসাবে জিবরাঈল (আ) তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। এমনকি, শেষ পর্যন্ত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমেই তাঁকে আকাশে তুলে নেওয়া হয়। ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ)-সহ অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যাবাদী বলেছে, এবং হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে হত্যাও করেছে।

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۭ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

---

(৮৮) তারা বলে, আমাদের হৃদয় অর্ধাবৃত। এবং তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তারা অল্পই ঈমান আনে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (ইহুদীরা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে) বলে, আমাদের হৃদয় (এমন) সংরক্ষিত (যে, তাতে ধর্ম বিরোধী প্রভাব অর্থাৎ ইসলামের প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। নিজ ধর্মের ব্যাপারে আমরা খুব পাকাপোক্ত। আল্লাহ্ বলেন যে, এটা দৃঢ়তা নয়;) বরং তোমাদের কুফরের জন্য আল্লাহ্র অভিসম্পাত (ফলে সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে রহিত ধর্মকেই পুঁজি করে নিয়েছে)। ফলে তারা অল্পই ঈমান আনে। (অল্প ঈমান গ্রহণীয় নয়। কাজেই তারা নিঃসন্দেহে কাফের)।

জ্ঞাতব্য ঃ ইহুদীদের 'অল্প ঈমান' এ সব বিষয়ে যা তাদের ধর্ম ও ইসলামে সমভাবে বিদ্যমান। যেমন, আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করা ও কিয়ামতে বিশ্বাস করা, এসব বিষয় তারাও স্বীকার করে। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত ও কোরআনকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের ঈমান পূর্ণ নয়।

এ অল্প ঈমানকে আভিধানিক দিক দিয়ে ঈমান বলা হয়েছে। এর অর্থ সাধারণ বিশ্বাস। শরীয়তের পরিভাষায় একে ঈমান বলা যায় না। শরীয়তে সে ঈমানই স্বীকৃত, যা শরীয়ত বর্ণিত সব বিষয় বিশ্বাস করার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۡ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾

---

(৮৯) যখন তাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছাল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে করত। অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। অতএব, অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তাদের কাছে এমন (একটি) গ্রন্থ এসে পৌঁছাল (অর্থাৎ কোরআন মজীদ) যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছে (এবং যা) ঐ গ্রন্থেরও সত্যায়ন করে যা (পূর্ব থেকেই) তাদের কাছে রয়েছে (অর্থাৎ তওরাত)।

অথচ এর পূর্বে স্বয়ং তারা কাফেরদের কাছে (অর্থাৎ আরবের মুশরিকদের কাছে) বলত যে, একজন পয়গম্বর আসবেন এবং তিনি একটি গ্রন্থ নিয়ে আসবেন। কিন্তু পরে যখন তা এল যা তারা চিনত, তখন তারা তা (পরিষ্কার) অস্বীকার করে বসল। অতএব, (এমন) অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত (যারা শুধু পক্ষপাতিত্বের কারণে অস্বীকার করে)।

জ্ঞাতব্য ঃ কোরআনকে তওরাতের 'মুসাদ্দিক' (সত্যায়নকারী) বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, তওরাতে মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব ও কোরআন অবতরণের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল কোরআনের মাধ্যমেও সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যারা তওরাতকে স্বীকার করে, তারা কিছুতেই কোরআন ও মুহাম্মদ (সা)-কে অস্বীকার করতে পারে না। তা করতে গেলে তওরাতকে অস্বীকার করতে হবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, তারা যখন সত্যকে সত্য বলেই জানত, তখন তাদেরকে ঈমানদার বলাই উচিত। কাফের বলা হলো কেন ?

এর উত্তর এই যে, শুধু জানাকে ঈমান বলা যায় না। শয়তানের সত্যজ্ঞান সবার চাইতে বেশি। তাই বলে সে ঈমানদার হয়ে যাবে কি ? জানা সত্ত্বেও অস্বীকার করার কারণে কুফরের তীব্রতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের শত্রুতাকে কুফরের কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩٠﴾

(৯০) যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে, তা খুবই মন্দ; যেহেতু তারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তা অস্বীকার করেছে এই হঠকারিতার দরুন যে, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ নাযিল করেন। অতএব, তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে অবস্থা খুবই মন্দ,) যার প্রেক্ষিতে তারা (পরকালের শাস্তি থেকে) নিজেদের মুক্ত করতে চায়। (অবস্থাটি এই যে,) তারা কুফর (অস্বীকার) করে এমন বস্তুর প্রতি, যা আল্লাহ্ তা'আলা (একজন পয়গম্বরের উপর) নাযিল করেছেন (অর্থাৎ কোরআন)। এই অস্বীকারও শুধু এরূপ হঠকারিতার দরুন করা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা (অর্থাৎ মুহাম্মদ [সা]-এর প্রতি কেন) অনুগ্রহ নাযিল করলেন ! (কুফরের উপর এ হিংসার কারণে) তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে। পরকালে এই কাফেরদের এমন শাস্তি দেওয়া হবে, যাতে কষ্ট (তো আছেই), অপমানও থাকবে।

এক ক্রোধ কুফরের কারণে এবং অপর ক্রোধ হিংসার কারণে। এ জন্যই ক্রোধের উপর ক্রোধ বলা হয়েছে। শাস্তির সাথে 'অপমানজনক' শব্দ যোগ করে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা, পাপী ঈমানদারকে যে শাস্তি দেওয়া হবে তা হবে তাকে পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যেই, অপমান করার উদ্দেশ্যে নয়। পরবর্তী আয়াতে তাদের যে উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা থেকে কুফর প্রমাণিত হয় এবং হিংসাও বোঝা যায়।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

---

(৯১) যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা পাঠিয়েছেন, তা মেনে নাও, তখন তারা বলে, আমরা মানি, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সেটি ছাড়া সবগুলোকে তারা অস্বীকার করে। অথচ এ গ্রন্থটি সত্য এবং সত্যায়ন করে ঐ গ্রন্থের, যা তাদের কাছে রয়েছে। বলে দিন, তবে তোমরা ইতিপূর্বে পয়গম্বরদের হত্যা করতে কেন—যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে ?

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তাদেরকে (ইহুদীদের) বলা হয়, তোমরা ঐসব গ্রন্থের প্রতি ঈমান আন, যা আল্লাহ্ তা'আলা (কয়েকজন পয়গম্বরের প্রতি) নাযিল করেছেন (সেগুলোর মধ্যে কোরআন অন্যতম)।

তখন তারা বলে, আমরা (শুধু) সে গ্রন্থের প্রতিই ঈমান আনব, যা আমাদের প্রতি [হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে] নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ তওরাত)। সেটি ছাড়া (অবশিষ্ট) যত গ্রন্থ রয়েছে (যেমন, ইঞ্জীল ও কোরআন) তারা সেগুলোকে অস্বীকার করে। অথচ তওরাত ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থও (প্রকৃত) সত্য (এবং বাস্তব। তদুপরি) সেগুলো সত্যায়নও করে ঐ গ্রন্থের, যা তাদের কাছে রয়েছে (অর্থাৎ তওরাত)। আপনি আরও বলে দিন, তবে ইতিপূর্বে তোমরা কেন আল্লাহ্‌র পয়গম্বরদের হত্যা করতে—যদি তোমরা তওরাতের প্রতি বিশ্বাসী ছিলে ?

"আমরা শুধু তওরাতের প্রতিই ঈমান আনব, অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনব না"—ইহুদীদের এ উক্তি সুস্পষ্ট কুফর। সেই সাথে তাদের উক্তি 'যা (তওরাত) আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে'—এ থেকে প্রতিহিংসা বোঝা যায়। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, অন্যান্য গ্রন্থ যেহেতু আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়নি, কাজেই আমরা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনব না। আল্লাহ্ তা'আলা তিন পন্থায় তাদের এ উক্তি খণ্ডন করেছেন ঃ

প্রথমত, অন্যান্য গ্রন্থের সত্যতা ও বাস্তবতা যখন অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তখন সেগুলো অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য দলীলের মধ্যে কোন আপত্তি থাকলে তারা তা উপস্থিত করে তা দূর করে নিতে পারত। অহেতুক অস্বীকারের কোন অর্থ হয় না।

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআন মজীদ, যা তওরাতেরও সত্যায়ন করে। সুতরাং কোরআন মজীদকে অস্বীকার করলে তওরাতের অস্বীকৃতিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, সকল খোদায়ী গ্রন্থের মতেই পয়গম্বরদের হত্যা করা কুফর। তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা কয়েকজন পয়গম্বরকে হত্যা করেছে। অথচ তারা বিশেষভাবে তওরাতের শিক্ষাই প্রচার করতেন। তোমরা সেসব হত্যাকারীকেই নেতা ও পুরোহিত মনে করেছ। এভাবে কি তোমরা তওরাতের সাথেই কুফরি করনি ? সুতরাং তওরাতের প্রতি তোমাদের ঈমান আনার দাবি অসার প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা, কোন দিক দিয়েই তোমাদের কথা ও কাজ শুদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

পরবর্তী আয়াতে আরও কতিপয় যুক্তি দ্বারা ইহুদীদের দাবি খণ্ডন করা হয়েছে।

وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿٩٢﴾

---

(৯২) সুস্পষ্ট মো'জেযাসহ মূসা তোমাদের কাছে এসেছেন। এরপর তার অনুপস্থিতিতে তোমরা গোবৎস বানিয়েছ। বাস্তবিকই তোমরা অত্যাচারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হযরত মূসা (আ) তোমাদের কাছে (তওহীদ ও রিসালতের) সুস্পষ্ট মো'জেযা (তথা যুক্তি-প্রমাণসহ) এসেছেন। (কিন্তু) এর পরেও তোমরা গোবৎসকে (উপাস্য) বানিয়েছ মূসা (আ)-এর অনুপস্থিতিতে (অর্থাৎ তাঁর তূর পর্বতে চলে যাওয়ার পর)। (এ উপাস্য নির্ধারণে) তোমরা অত্যাচারী ছিলে।

ঘটনাটি ঘটে তওরাত অবতরণের পূর্বে। তখন মূসা (আ)-এর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যেসব যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত ছিল, আয়াতে بَيِّنَات বলে সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন—লাঠি, জ্যোতির্ময় হাত, সাগর দ্বি-খণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি।

ইহুদীদের দাবির খণ্ডনে আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা একদিকে ঈমানের দাবি কর, অন্যদিকে প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হও। ফলে শুধু মূসা (আ)-কেই নয়, আল্লাহ্‌কেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলছ। কোরআন অবতরণের সময় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আমলে যেসব ইহুদী ছিল, তারা গোবৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করেনি সত্য। কিন্তু তারা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের সমর্থক ছিল। অতএব তারাও মোটামুটিভাবে এ আয়াতের লক্ষ্য।

এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, যাদের পূর্ব-পুরুষরা মূসা (আ)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে কুফর করেছে, তারা মুহাম্মদ (সা)-কে অস্বীকার করলে তা তেমন আশ্চর্যের বিষয় নয়।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

(৯৩) আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের উপর উঁচু করে ধরলাম যে, শক্ত করে ধর, আমি যা তোমাদের দিয়েছি আর শোন। তারা বলল, আমরা শুনেছি আর অমান্য করেছি। কুফরের কারণে তাদের অন্তরে গোবৎস-প্রীতি পান করানো হয়েছিল। বলে দিন, তোমরা বিশ্বাসী হলে, তোমাদের সে বিশ্বাস মন্দ বিষয়াদি শিক্ষা দেয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং (এ প্রতিশ্রুতি নেওয়ার জন্য) তূর পর্বতকে তোমাদের (মাথার) ওপর উঁচু করে ধরেছিলাম, (তখন আদেশ

করেছিলাম যে,) বিধান হিসাবে যা আমি তোমাদের দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর এবং (সেগুলোকে অন্তর দ্বারা) শোন। তখন তারা (ভয়ের আতিশয্যে মুখে বলল ঃ আমরা কবূল করলাম এবং শুনলাম (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ স্বীকারোক্তিটি আন্তরিক ছিল না। তাই তারা যেন একথাও বলছিল যে,) আমাদের দ্বারা এসব পালন করা হবে না। তাদের (এহেন হীনমন্যতার কারণ ছিল এই যে, সাবেক কুফরের কারণে তাদের) অন্তরের (রন্ধ্রে রন্ধ্রে) গোবৎস-প্রীতি বদ্ধমূল হয়ে বসেছিল। (ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার পর এক সম্প্রদায়কে মূর্তিপূজায় লিপ্ত দেখে তারাও সাকার উপাস্যের পূজা বৈধ করার জন্য আবেদন করেছিল।) আপনি বলে দিন যে, তোমরা স্বকল্পিত ঈমানের পরিণতি দেখে নিয়েছ। বস্তুত এসবের পরিণতি মন্দ, তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান যা শিক্ষা দেয়—যদিও তোমরা তোমাদের ধারণামতে ঈমানদার হও (অর্থাৎ এটা প্রকৃতপক্ষে ঈমানই নয়)।

আয়াতে বর্ণিত কারণ ও ঘটনাসমূহের সারমর্ম এই যে, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার পর তারা একটি কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে। পরে মূসা (আ)-এর শাসানোর ফলে যদিও তওবা করে নেয়, কিন্তু তওবারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। উচ্চস্তরের তওবার অভাবে তাদের অন্তরে কুফরের অন্ধকার কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়। পরে সেটাই বেড়ে গিয়ে গোবৎস পূজার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন টীকাকারের বর্ণনা মতে, গোবৎস পূজা থেকে তওবা করতে গিয়ে তাদের কিছু লোককে মৃত্যুবরণ করতে হয় এবং কিছু লোক সম্ভবত এমনিতেই ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়। এদের তওবাও সম্ভবত দুর্বল ছিল। এছাড়া যারা গোবৎস পূজায় জড়িত ছিল না, তারাও অন্তরে গোবৎস পূজারীদের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃণা পোষণ করতে পারেনি। ফলে তাদের অন্তরে শিরকের প্রভাব কিছু না কিছু অবশিষ্ট ছিল। মোটকথা, তওবার দুর্বলতা ও শিরকের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃণার অভাব—এতদুভয়ের প্রতিক্রিয়ায় তাদের অন্তরে ধর্মের প্রতি শৈথিল্য দানা বেঁধে উঠেছিল। এ কারণেই অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য তূর পর্বতকে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখা দরকার হয়েছিল।

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾

(৯৪) বলে দিন, যদি আখিরাতের বাসস্থান আল্লাহ্র কাছে একমাত্র তোমাদের জন্যই বরাদ্দ হয়ে থাকে—অন্য লোকদের বাদ দিয়ে, তবে মৃত্যু কামনা কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে। (৯৫) কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না ঐসব গোনাহর কারণে, যা তাদের হাত পাঠিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্ গোনাহ্গারদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কতক ইহুদীর দাবি ছিল যে, পরকালের নেয়ামতসমূহ একমাত্র তাদেরই প্রাপ্য। এ দাবির খণ্ডনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন) আপনি (তাদেরকে) বলে দিন, (তোমাদের কথামত) পরকাল যদি সবাইকে বাদ দিয়ে, একমাত্র তোমাদের জন্যই সুখকর হয়, তবে তোমরা (এর সত্যতা প্রমাণের জন্য) মৃত্যু কামনা করে দেখাও, যদি তোমরা (এ দাবিতে) সত্যবাদী হয়ে থাক। (এতদসঙ্গে আমি আরও বলে দিচ্ছি যে,) তারা কস্মিনকালেও মৃত্যু কামনা করবে না—ঐসব (কুফর) কাজ-কর্মের (শাস্তির ভয়ের) কারণে, যা তারা স্বহস্তে অর্জন করে পাঠিয়েছে। আল্লাহ্ সম্যক অবগত রয়েছেন এহেন জালিমদের (অবস্থা) সম্পর্কে (মোকদ্দমার তারিখ আসতেই অভিযোগনামা পাঠ করে শুনিয়ে শাস্তির নির্দেশ জারি করা হবে)।

কোরআনের আরও কতিপয় আয়াত থেকে তাদের উপরোক্ত দাবির কথা জানা যায় যেমন–

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلاَّ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً .

(তারা বলে, দোযখের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না—তবে অল্প কয়েকদিন মাত্র।)

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصَارٰى .

(তারা বলে, একমাত্র যারা ইহুদী অথবা নাসারা, তারাই বেহেশ্তে প্রবেশ করবে –অন্য কেউ নয়।)

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗ .

(ইহুদী ও খৃস্টানরা বলে, আমরাই আল্লাহ্র সন্তান ও প্রিয়জন।)

এসব দাবির সারমর্ম এই যে, আমরা সত্য ধর্মের অনুসারী। কাজেই আখিরাতে আমাদের মুক্তি অবধারিত। আমাদের মধ্যে যারা তওবা করেছে অথবা গতায়ু হয়ে গেছে, প্রাথমিক পর্যায়েই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। আর যারা গোনাহ্গার, তারা অল্প কয়েকদিন সাজা ভোগ করেই মুক্তি পাবে। পক্ষান্তরে যারা অনুগত, তারা সন্তান ও স্বজনের মতই প্রিয়পাত্র ও নৈকট্যশীল হবে।

কতিপয় শাব্দিক ত্রুটি ছাড়া এসব দাবি সত্য ধর্মের অনুসারী হলে সঠিক ও নির্ভুল। কিন্তু ধর্ম রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে ইহুদীরা সত্য ধর্মের অনুসারী ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দ ও পন্থায় তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। এখানে একটি বিশেষ পন্থা বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী আলোচনা ও যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে মীমাংসায় আসতে না চাইলে, অলৌকিক পন্থা অর্থাৎ মু'জিযার মাধ্যমে মীমাংসা হওয়াই উচিত। এতে বেশি জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই—শুধু মুখে কথা বলাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, তোমরা মুখেও "আমরা মৃত্যু কামনা করি" বলে বলতে পারবে না।

এ ভবিষ্যদ্বাণীর পর আমি বলছি, যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্য হয়ে থাক, তবে বলে দাও। না বললে তোমরা যে মিথ্যাবাদী তা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

ইহুদীরা দিবালোকের মত স্পষ্টভাবে জানত যে, তারা মিথ্যা ও কুফরের অনুসারী এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনগণ সত্যধর্মের অনুসারী। এ কারণে তাদের মনে এমন আতঙ্ক দেখা দিল যে, জিহ্বাও আন্দোলিত হলো না। অথবা তাদের ভয় হলো যে, এ বাক্য মুখে উচ্চারণ করতেই মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবে। এরপর সোজা জাহান্নাম। এরূপ না হলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাদের শত্রুতার পরিপ্রেক্ষিতে আনন্দে গদগদ হয়ে মৃত্যু কামনার বাক্য মুখে উচ্চারণ করাই ছিল তাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম যে সত্য ধর্ম, তা প্রমাণ করার জন্য এ ঘটনাটি যথেষ্ট। এখানে আরও দু'টি বিষয় উল্লেখযোগ্য ঃ

প্রথমত, নবী করীম (সা)-এর আমলে বিদ্যমান ইহুদীদের সঙ্গে উপরোক্ত যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল—যাঁরা তাঁকে নবী হিসাবে চেনার পরেও শত্রুতা ও হঠকারিতাবশত অস্বীকার করেছিল, সকল যুগের ইহুদীদের সঙ্গে নয়।

দ্বিতীয়ত, এখানে এরূপ সন্দেহ করা ঠিক নয় যে, মন ও জিহবা উভয়ের দ্বারাই কামনা হতে পারে। ইহুদীরা সম্ভবত মনে মনে মৃত্যুর কামনা করেছে। উত্তর এই যে, প্রথমত, আল্লাহ্র উক্তি وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ (কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না) এ সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, তারা মনে মনে মৃত্যু কামনা করে থাকলে তা অবশ্যই মুখেও প্রকাশ করত। কারণ, এতে তাদেরই জয় হতো এবং নবী করীম (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার একটা সুযোগ পেয়ে যেত।

এরূপ সন্দেহও অমূলক যে, বোধ হয় তারা কামনা করেছে; কিন্তু তার প্রচার হয়নি। কারণ, সর্বযুগেই ইসলামের শত্রু ও সমালোচকদের সংখ্যা ইসলামের মিত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যার চাইতে বেশি ছিল। এরূপ কোন ঘটনা ঘটে থাকলে তারা কি একে ফলাও করে প্রচার করত না যে, দেখ, তোমাদের নির্ধারিত সত্যের মাপকাঠিতেও আমরা পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছি।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

---

(৯৬) আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে এমন কি, মুশরিকদের চাইতেও অধিক লোভী দেখবেন। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বছর আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ্ দেখেন, যা কিছু তারা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তারা মৃত্যু কি কামনা করবে ? বরং) আপনি তাদেরকে (পার্থিব) জীবনের প্রতি (অপরাপর) লোকদের চাইতে এমন কি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মুশরিকদের চাইতেও বেশি লোভী দেখবেন। (তাদের অবস্থা এই যে,) তাদের এককেজন এরূপ কামনায় মগ্ন যে, তার বয়স যদি হাজার বছর হতো! অথচ (যদি ধরে নেওয়া যায় যে, তার বয়স এতটুকু হয়েই গেল, তবে) এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তাদের (মন্দ) কাজকর্ম আল্লাহ্র দৃষ্টির সামনেই রয়েছে (কাজেই তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে।)

আরবের মুশরিকরা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না। তাদের মতে বিলাস-ব্যসন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবই ছিল পার্থিব। এ কারণে তারা দীর্ঘায়ু কামনা করলে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। কিন্তু ইহুদীরা শুধু পরকালে বিশ্বাসীই ছিল না। বরং তাদের ধারণামতে পরকালের যাবতীয় আরাম-আয়েস ও নেয়ামতরাজি তাদেরই প্রাপ্ত ছিল। এরপরও তাদের পৃথিবীতে দীর্ঘায়ু কামনা করা বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কি ?

সুতরাং পরকালের বিশ্বাস সত্ত্বেও তাদের দীর্ঘায়ু কামনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পারলৌকিক নেয়ামত সম্পর্কিত তাদের দাবি সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য। প্রকৃত ব্যাপার তাদেরও ভালভাবে জানা রয়েছে যে, সেখানে পৌঁছলে জাহান্নামই হবে তাদের আবাসস্থল। তাই যতদিন বাঁচা যায়, ততদিনই মঙ্গল।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٨﴾

---

(৯৭) আপনি বলে দিন, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু হয়-যেহেতু তিনি আল্লাহ্র আদেশে এ কালাম আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন, যা সত্যায়নকারী তাদের সম্মুখস্থ কালামের (যা ইতিপূর্বে নাযিল হয়েছিল) এবং মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা। (৯৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয়, নিশ্চিতই আল্লাহ্ সেসব কাফেরের শত্রু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে আগমন করেন—একথা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে শুনে কতক ইহুদী বলতে থাকে, ইনি তো আমাদের শত্রু; আমাদের সম্প্রদায়ের উপর প্রলয়ঙ্করি ঘটনাবলী এবং প্রাণান্তকর নির্দেশাবলী তাঁর মাধ্যমেই অবতীর্ণ হয়েছে। পক্ষান্তরে মিকাঈল (আ) অত্যন্ত গুণী ফেরেশতা। তিনি বৃষ্টি ও রহমতের সাথে জড়িত। তিনি ওহী নিয়ে এলে আমরা তা মেনে নিতাম। এসব বক্তব্যের খণ্ডনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ!] আপনি বলে দিন, যদি কেউ জিবরাঈলের প্রতি শত্রুতা রাখে, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোরআন মানা-না-মানার সাথে এর কি সম্পর্ক ? কারণ, তিনি তো দূত ছাড়া আর কিছু নন। যেহেতু তিনি আল্লাহ্র আদেশে এ কালামে পাক আপনার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং তার বৈশিষ্ট্য না দেখে স্বয়ং কোরআনকে দেখা দরকার। কোরআন (এর অবস্থা এই যে,) সে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সত্যায়ন করে (প্রয়োজনীয় বিষয়াদির প্রতি) পথ প্রদর্শন করে এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দেয় (আসমানী কিতাবসমূহের অবস্থা তা-ই হয়ে থাকে)। সুতরাং কোরআন সর্বাবস্থায় খোদায়ী গ্রন্থ এবং অনুসরণযোগ্য। জিবরাঈলের সাথে শত্রুতার দোহাই দিয়ে একে অমান্য করা নিরেট বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। এখন জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা সম্পর্কে কথা এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্র সাথে অথবা অন্য ফেরেশতাদের সাথে অথবা পয়গম্বরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা অথবা স্বয়ং মিকাঈলের সাথে, যার সাথে বন্ধুত্ব দাবি করা হয়—সবই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সমপর্যায়ের। এসব শত্রুতার পরিণতি এই যে, যে কেউ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয় (তবে এসব শত্রুতার শাস্তি এই যে,) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এমন কাফেরদের শত্রু।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾

---

(৯৯) আমি আপনার প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। অবাধ্যরা ব্যতীত কেউ এগুলো অস্বীকার করে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[কতক ইহুদী হুযূর (সা)]-কে বলেছিল, আমরাও জানি এমন কোন উজ্জ্বল নিদর্শন আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়নি। এর উত্তরে বলা হয়েছে, একটি উজ্জ্বল নিদর্শনই তাদের সম্বল। অথচ) আমি আপনার প্রতি বহু উজ্জ্বল নিদর্শন অবতারণ করেছি। (সেগুলো তারাও খুব চিনে। তাদের অস্বীকার অজ্ঞতার কারণে নয়; আদেশ লঙ্ঘনের চিরাচরিত বদাভ্যাসের কারণে। আর স্বতঃসিদ্ধ রীতি এই যে) আদেশ লঙ্ঘনে অভ্যস্তরা ব্যতীত কেউ এমন নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না।

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾

(১০০) কি আশ্চর্য, যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তখন তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলে বরং অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে তওরাতে ইহুদীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। কতক ইহুদীকে সে অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে তারা অঙ্গীকার করেনি বলে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়। সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তারা কি এ অঙ্গীকার করার কথা অস্বীকার করে ? তাদের অবস্থা এই যে, তারা স্বীকৃত অঙ্গীকারগুলোও কোনদিন পূর্ণ করেনি, বরং] যখন তারা (ধর্ম সম্পর্কে) কোন অঙ্গীকার করেছে তখন (অবশ্যই) তাদের কোন-না-কোন দল তা উপেক্ষা ভরে ছুঁড়ে ফেলেছে। বরং তাদের অধিকাংশই এমন, যারা (গোড়া থেকেই এ অঙ্গীকারকে) বিশ্বাস করে না।

এখানে বিশেষভাবে 'একদল' বলার কারণ এই যে, তাদের কেউ কেউ উপরোক্ত অঙ্গীকার পূর্ণও করতো। এমনকি, শেষ পর্যন্ত তারা রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঈমানও এনেছিল।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

(১০১) যখন তাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন রসূল আগমন করলেন—যিনি ঐ কিতাবের সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে, তখন আহলে কিতাবদের একদল আল্লাহ্র গ্রন্থকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল—যেন তারা জানেই না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান না আনার ব্যাপারে একটি বিশেষ অঙ্গীকার ভঙ্গের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ] যখন তাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন মহান পয়গম্বর আসলেন, যিনি (রসূল হওয়ার সাথে সাথে) ঐ কিতাবেরও সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে (অর্থাৎ তওরাত) তাতে হযরত রসূলে করীম (সা)-এর নবুয়তের সংবাদ ছিল। এমতাবস্থায় হযরত রসূলে করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনা তওরাতের নির্দেশ পালনেরই নামান্তর ছিল। তওরাতকে তারাও আল্লাহ্র গ্রন্থ মনে করত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ

আহলে কিতাবদের একদল স্বয়ং আল্লাহ্‌র গ্রন্থকেই (এমনভাবে) পিঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করলো, যেন তারা (সে গ্রন্থের বিষয়বস্তু অথবা আল্লাহ্‌র গ্রন্থ হওয়া সম্পর্কে কিছু) জানেই না।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ
وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى
الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ؕ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ
اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ
وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ
مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۫ؕ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ؕ
لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ
اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۳﴾ ع

(১০২) তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে যাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত–দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়েই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারো অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ—যদি তারা জানত। (১০৩) যদি তারা ঈমান আনত এবং আল্লাহ্‌ভীরু হতো, তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পেত। যদি তারা জানত!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইহুদীরা এমন নির্বোধ যে) তারা (আল্লাহ্ প্রদত্ত কিতাবের অনুসরণ না করে,) ঐ শাস্ত্রের (অর্থাৎ যাদুর) অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা চর্চা করত। (কতক নির্বোধ হযরত সুলায়মানকে যাদুকর মনে করত। তাদের এ ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন। কারণ, যাদু বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যগতভাবে কুফর), সুলায়মান (কখনও) কুফর করেন নি। হ্যাঁ, শয়তানরা (অর্থাৎ দুষ্ট জ্বিনরা অবশ্য) কুফর (অর্থাৎ যাদু) করত। (নিজেরা তো করতই) তারা (অপরাপর) মানুষকেও যাদু শিক্ষা দিত। (সে যাদুই বংশ পরম্পরায় প্রচলিত রয়েছে এবং ইহুদীরা তা-ই শিক্ষা করে। এমনিভাবে তারা ঐ যাদুও অনুসরণ করে, যা বাবেল শহরে 'হারূত' ও 'মারূত'—দুই ফেরেশতার প্রতি (বিশেষ উদ্দেশ্যে) অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা উভয়ে (সে যাদু) কাউকে শিক্ষা দিত না, যতক্ষণ না (সাবধান করে আগেই) বলে দিত যে, আমাদের অস্তিত্বও মানুষের জন্য খোদায়ী পরীক্ষা (যে, কে আমাদের কাছ থেকে এ যাদু শিক্ষা করে বিপদে জড়িয়ে পড়ে, আর কে তা থেকে বেঁচে থাকে)। কাজেই তুমি (একথা জেনেও) কাফির হয়ো না (তাহলে বিপদে জড়িয়ে পড়বে)। অতঃপর তারা (কিছু লোক) তাদের (ফেরেশতাদ্বয়ের) কাছ থেকে এমন যাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিত। (এতে কারও এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে ভীত হওয়া উচিত নয় যে, যাদুকররা যা ইচ্ছা, তাই করতে পারে। কেননা, এটা নিশ্চিত যে,) তারা আল্লাহ্র (ভাগ্য সম্পর্কিত) আদেশ ব্যতীত তদ্দ্বারা কারও (বিন্দু পরিমাণও) অনিষ্ট করতে পারত না। তারা (এহেন যাদু আয়ত্ত করে) যা তাদের ক্ষতি করে এবং যথার্থ উপকার করে না (সুতরাং যাদু অনুসরণ করে ইহুদীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে)। আর এটা শুধু আমারই কথা নয়; বরং তারা ভালরূপে জানে যে, যে লোক আল্লাহ্র গ্রন্থের বিনিময়ে যাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ অবশিষ্ট নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে (অর্থাৎ যাদু ও কুফর) তা খুবই মন্দ। যদি তারা (কুফর ও দুষ্কর্মের পরিবর্তে) ঈমান আনত এবং আল্লাহ্ভীরু হতো, তবে আল্লাহ্র কাছ থেকে (কুফর ও দুষ্কর্মের চাইতে হাজার গুণ) উত্তম প্রতিদান পেত। যদি তারা বুঝত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীর ও শানেনুযুল প্রসঙ্গে অনেক ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়। সেসব রেওয়ায়েত পাঠ করে অনেক পাঠকের মনে নানা প্রশ্ন দেখা যায়। হাকীমুল উম্মত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) সুস্পষ্ট ও সহজভঙ্গিতে এসব প্রশ্নের উত্তর দান করেছেন। তাঁর বর্ণনাকে যথেষ্ট মনে করে এখানে হুবহু উদ্ধৃত করে দিলাম।

(১) নির্বোধ ইহুদীরাই হযরত সুলায়মান (আ)-কে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতের মাঝখানে তাঁর নিষ্কলুষতাও প্রকাশ করে দিয়েছেন।

(২) বর্ণিত আয়াতসমূহে ইহুদীদের নিন্দা করাই উদ্দেশ্য। কারণ, তাদের মধ্যে যাদুবিদ্যার চর্চা ছিল। এসব আয়াত সম্পর্কে পরমাসুন্দরী যোহ্রার একটি মুখরোচক কাহিনীও সুবিদিত রয়েছে। কাহিনীটি কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত নয়। শরীয়তের নীতিবিরুদ্ধ মনে করে অনেক আলেম কাহিনীটিকে নাকচ করে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ সদর্থে ব্যাখ্যা করা শরীয়ত-বিরুদ্ধ মনে না করে নাকচ করেন নি। বাস্তবে কাহিনীটি সত্য কি মিথ্যা, এখানে তা আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে এটা ঠিক যে, আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা কাহিনীর উপর নির্ভরশীল নয়।

(৩) সবকিছু জানা সত্ত্বেও ইহুদীরা আমল বা কাজ করত, 'ইল্ম' বা জানার বিপরীত এবং এ ব্যাপারে তারা মোটেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিত না। তাই আয়াতে প্রথমে তাদের জানার সংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং পরিশেষে 'যদি তারা জানত' বলে না জানার কথাও বলা হয়েছে। কারণ, যে জানার সাথে তদনুরূপ কাজ ও বিচক্ষণতা যুক্ত হয় না, তা না জানারই শামিল।

(৪) ঠিক কখন, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য জানা না থাকলেও এক সময়ে পৃথিবীতে বিশেষ করে বাবেল শহরে যাদুবিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। যাদুর অত্যাশ্চর্য ক্রিয়া দেখে মূর্খ লোকদের মধ্যে যাদু ও পয়গম্বরগণের মো'জেযার স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্তি দেখা দিতে থাকে। কেউ কেউ যাদুকরদেরও সজ্জন ও অনুসরণযোগ্য মনে করতে থাকে। আধুনিক যুগে মেস্‌মেরিজমের বেলায়ও তাই হচ্ছে। এই বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বাবেল শহরে 'হারূত' ও 'মারূত' নামে দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাদের কাজ ছিল যাদুর স্বরূপ ও ভেল্কিবাজি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা—যাতে বিভ্রান্তি দূর হয় এবং যাদুর আমল ও যাদুকরদের অনুসরণ থেকে তারা বিরত থাকতে পারে। পয়গম্বরগণের নবুয়তকে যেমন মো'জেযা ও নিদর্শনাদি দ্বারা প্রমাণ করে দেওয়া হয়, তেমনি হারূত ও মারূত যে ফেরেশতা, তার উপর যুক্তি-প্রমাণ খাড়া করে দেওয়া হলো, যাতে তাদের নির্দেশাবলী জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

এ কাজে পয়গম্বরগণকে নিযুক্ত না করার কারণ এই যে, প্রথমত, এতে পয়গম্বর ও যাদুকরদের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল। এদিক দিয়ে তাঁরা যেন ছিলেন একটি পক্ষ। কাজেই উভয় পক্ষকে বাদ দিয়ে তৃতীয় পক্ষকে বিচারক নিযুক্ত করাই বিধেয়।

দ্বিতীয়ত, যাদুর বাক্যাবলী মুখে উচ্চারণ ও বর্ণনা ব্যতীত এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর ছিল না। যদিও 'কুফরের' বর্ণনা কুফর নয়, এই স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী পয়গম্বরগণ তা করতে পারতেন, তথাপি হেদায়েতের প্রতীক হওয়ার কারণে এ কাজে তাঁদের নিযুক্তি সমীচীন মনে করা হয়নি। একাজের জন্য ফেরেশতাই মনোনীত হন। কারণ, সৃষ্টিজগতে ফেরেশতাদের দ্বারা এমন কাজও নেওয়া হয় যা সামগ্রিক উপযোগিতার দিক দিয়ে ভাল কিন্তু অনিষ্টের কারণে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে মন্দ। যেমন, কোন হিংস্র ও ইতর প্রাণীর লালন-পালন ও দেখাশোনা করা। সৃষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে এ কাজ সঠিক ও প্রশংসনীয়, কিন্তু জাগতিক কল্যাণমূলক আইনের দৃষ্টিতে অঠিক ও নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে পয়গম্বরগণকে শুধু জাগতিক কল্যাণমূলক আইন তদারকের কাজেই নিযুক্ত করা হয়—যা সাধারণত ভাল কাজেই হয়ে থাকে। উপরোক্ত যাদুর উচ্চারণ ও বর্ণনা

উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে জাগতিক কল্যাণমূলক কাজ হলেও যাদুর আমলে লিপ্ত হয়ে পড়ার (যেমন, বাস্তবে হয়েছে) ক্ষীণ সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে পয়গম্বরগণকে এ থেকে দূরে রাখাই পছন্দ করা হয়েছে।

মোটকথা, ফেরেশতাদ্বয় বাবেল শহরে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। তারা যাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করে জনগণকে এ কুকর্ম থেকে আত্মরক্ষা ও যাদুকরদের ঘৃণা করার উপদেশ দিলেন। যেমন কোন আলিম যদি দেখেন যে, জনগণ মূর্খতাবশত কুফরী বাক্য বলে ফেলে, তবে তিনি প্রচলিত কুফরী বাক্যগুলোকে বক্তৃতায় অথবা লেখায় সন্নিবেশিত করে জনগণকে বলে দেবেন যে, এ বাক্যগুলো থেকে সাবধান থাকা দরকার।

ফেরেশতাদ্বয়ের কাজ আরম্ভ করার পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক তাদের কাছে আসা-যাওয়া করতে থাকে। পরে যাতায়াতকারীরা অনুরোধ করতে থাকে যে, যাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে আমাদেরকেও অবহিত করা হোক যাতে আমরা অজ্ঞতাবশত কোন বিশ্বাসগত অথবা কার্যগত অপকর্মে লিপ্ত হয়ে না পড়ি। তখন ফেরেশতাদ্বয় সাবধানতাবশত একথা বলে দিতেন,—দেখ আমাদের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার পরীক্ষাও নিতে চান যে, এগুলো শিক্ষা করে কে স্বীয় ধর্মের হেফাজত ও সংস্কার করে এবং কে এগুলো সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজেই সে অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং স্বীয় দীন-ঈমান বরবাদ করে দেয়। দেখ, আমাদের উপদেশ এই যে, দুনিয়াতে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করে সুনিয়তের উপরই কায়েম থেকো। এমন যেন না হয় যে, আত্মরক্ষার অজুহাতে আমাদের কাছ থেকে শিখে নিজেই অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড় এবং দীন-ঈমান বরবাদ করে বস।

তখন ফেরেশতাদ্বয় এর চাইতে বেশি আর কিই বা করতে পারতেন ? তাদের কথামত যারা ওয়াদা-অঙ্গীকার করত, তারা তাদের সামনে যাদুর মূল ও শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করে দিতেন। কারণ, এটাই ছিল তাদের কর্তব্য কাজ। এখন যদি কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে কাফির হয়ে যায়, সেজন্য তারা দায়ী হবেন কেন ? কেউ কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে যাদুকে সৃষ্ট জীবের অনিষ্ট সাধনে নিয়োজিত করে, যা নিশ্চিতরূপেই একটি দুষ্কর্ম। যাদু ব্যবহারের কোন কোন প্রক্রিয়া কুফরপূর্ণও বটে। এভাবে যাদু প্রয়োগকারী কাফিরে পরিণত হয়।

উপরোক্ত বিষয়টির উদাহরণ এভাবে দেওয়া যায়—ধরুন এক ব্যক্তি কুরআন হাদীস ও যুক্তি-তর্কে পারদর্শী পরহেযগার কোন আলেমের কাছে পৌছে বলল, হুযূর, আমাকে প্রাচীন অথবা আধুনিক দর্শন সম্পর্কে শিখিয়ে দিন, যাতে দর্শনে ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে নিজেও অবগত হতে পারি এবং বিরোধীদের জওয়াব দিতে পারি। আলেম সাহেব মনে করলেন, লোকটি ধোঁকা দিয়ে দর্শন শিখে একে শরীয়তবিরোধী ভ্রান্ত বিশ্বাসকে জোরদার করার কাজেও ব্যবহার করতে পারে। তাই তিনি আগন্তুককে উপদেশ দিয়ে এরূপ না করতে বললেন। অতঃপর আগন্তুক যথাযথ ওয়াদা করায় আলেম সাহেব তাকে দর্শন পড়িয়ে দিলেন। কিন্তু দর্শন শিক্ষা করার পর লোকটি যদি ইসলাম-বিরোধী বিশ্বাস ও মতবাদকেই বিশুদ্ধ ও নির্ভুল মনে করতে থাকে , তবে শিক্ষক আলেম সাহেবকে কোন পর্যায়ে দোষী সাব্যস্ত করা যায় কি ? তেমনিভাবে যাদু বলে দেওয়ার কারণে ফেরেশতাদ্বয়ও দোষী হতে পারেন না।

কর্তব্য সমাধা করার পর সম্ভবত ফেরেশতাদ্বয়কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। (বয়ানুল-কোরআন)

যাদুর স্বরূপ ঃ অভিধানে 'সিহ্র' শব্দের অর্থ এমন প্রতিক্রিয়া, যার কারণ প্রকাশ্য নয়।–(কামুস) কারণটি অর্থগতও হতে পারে। যেমন বিশেষ বিশেষ বাক্যের প্রতিক্রিয়া। আবার তা ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়ের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। যেমন, জ্বিন-পরী ও শয়তানের প্রতিক্রিয়া। অথবা মেসমেরিজমে কল্পনাশক্তির প্রতিক্রিয়াও হতে পারে, অথবা এমন ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়ের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে, যা দৃশ্য নয় যেমন দৃষ্টির অন্তরালে থেকে চুম্বকের প্রতিক্রিয়া লোহার জন্য অথবা অদৃশ্য ঔষধ-পত্রের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে অথবা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতিক্রিয়াও হতে পারে।

এ কারণেই যাদুর বহু প্রকারভেদ রয়েছে। কিন্তু সাধারণত পরিভাষায় যাদু বলতে এমন বিষয়কে বোঝায়, যাতে জ্বিন ও শয়তানের কারসাজি, কোন কোন শব্দ ও বাক্যের প্রভাব অথবা মেসমেরিজমে কল্পনাশক্তির প্রভাব। কারণ যুক্তি ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকরাও স্বীকার করেন, অক্ষর ও শব্দাবলীর মধ্যেও বিশেষভাবে কিছু কার্যকারিতা রয়েছে। কোন বিশেষ অক্ষর অথবা শব্দকে বিশেষ সংখ্যায় পাঠ করলে অথবা লিপিবদ্ধ করলে বিশেষ বিশেষ প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। মানুষের চুল-নখ ইত্যাদি অথবা ব্যবহারের কাপড়ের সাথে অন্যান্য বস্তু-সামগ্রী একত্রিত করেও কিছু কার্যকারিতা হাসিল করা যায় ; সাধারণ ভাষায় এগুলো টোনা-টোটকা (তন্ত্রমন্ত্র) নামে অভিহিত। এগুলোও যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এমন অদ্ভুত কর্মকাণ্ডকে যাদু বলা হয়, যাতে শয়তানকে সন্তুষ্ট করে ওদের সাহায্য নেওয়া হয়। শয়তানদের সন্তুষ্ট করার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। কখনও এমন মন্ত্র পাঠ করা হয়, যাতে শির্‌ক ও কুফরের বাক্যাবলী অথবা শয়তানের প্রশংসাসূচক চরণাবলী থাকে। আবার কখনও গ্রহ-নক্ষত্রের আরাধনা করা হয়। এতেও শয়তান সন্তুষ্ট হয়।

শয়তানের পছন্দনীয় কাজকর্ম করেও শয়তানকে সন্তুষ্ট করা যায়। উদাহরণত কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, তার রক্ত ব্যবহার করা, অপবিত্র অবস্থায় থাকা, পবিত্রতা বর্জন করা ইত্যাদি।

পরহেযগারী, পবিত্রতা, আল্লাহ্‌র যিকির পুণ্য কাজ, দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকা ইত্যাকার পছন্দনীয় কাজকর্ম অবলম্বন করে যেমন ফেরেশতাদের সাহায্য পাওয়া যায়, তেমনিভাবে শয়তানের পছন্দনীয় কথাবার্তা ও কাজকর্মের মাধ্যমে শয়তানের সাহায্য লাভ করা যায়। এ কারণেই যারা সর্বদা নোংরা ও অপবিত্র থাকে, আল্লাহ্‌র নাম মুখে উচ্চারণ করে না এবং অশ্লীল কাজকর্মে লিপ্ত থাকে, একমাত্র তারাই যাদুবিদ্যায় সফলতা অর্জন করে থাকে। হায়েয অবস্থায় রমণীরা এ কাজ করলে তা খুব কার্যকরী হয়। এ ছাড়া রূপক অর্থে ভেল্কিবাজি, টোটকা, হাতের সাফাই, মেসমেরিজম ইত্যাদিকেও যাদু বলা হয়। (রূহুল মা'আনী)

যাদুর প্রকারভেদ ঃ ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল-কোরআন' নামক গ্রন্থে লিখেন, যাদু বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। তন্মধ্যে একপ্রকার নিছক নজরবন্দী ও কল্পনাপ্রসূত। বাস্তবতা বলতে এতে কিছুই নেই। উদাহরণত কোন কোন ভেল্কিবাজ হাতের সাফাই দ্বারা এমন কাজ

করে ফেলে, যা সাধারণ লোক দেখতে সক্ষম হয় না। অথবা মেসমেরিজম তথা কল্পনাশক্তির মাধ্যমে কারও মস্তিষ্কে এমন প্রভাব সৃষ্টি করে যে, সে একটি অবাস্তব বস্তুকে চোখে দেখতে থাকে অথবা কানে শুনতে থাকে। মাঝে মাঝে শয়তানের প্রভাব দ্বারাও মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তির মস্তিষ্কে ও দৃষ্টিশক্তিতে এমন প্রভাব সৃষ্টি করা যায়। তখন সে অবাস্তব বস্তুকে বাস্তব মনে করতে থাকে। এটা দ্বিতীয় প্রকার যাদু। কোরআন মজীদে বর্ণিত ফেরআউনের যাদুকরদের যাদু ছিল প্রথম প্রকারের। যেমন বলা হয়েছে ঃ سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ -(তারা মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে যাদু করল)। আরও বলা হয়েছে ঃ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى (তাদের যাদুর ফলে মূসার কল্পনায় ভাসতে লাগল যে, রশির সাপগুলো ইতস্তত ছুটোছুটি করছে)। এখানে يخيل (কল্পনায় ভাসতে লাগল) শব্দ দ্বারা বলা হয়েছে যে, যাদুকরদের নিক্ষিপ্ত রশি ও লাঠিগুলো প্রকৃতপক্ষে সাপও হয়নি এবং কোনরূপ ছুটোছুটিও করেনি; বরং হযরত মূসা (আ)-এর কল্পনাশক্তি প্রভাবান্বিত হয়ে সেগুলোকে ধাবমান সাপ বলে মনে করতে লাগল।

কোরআন মজীদে শয়তানের প্রভাবযুক্ত নজরবন্দি ও কল্পনাপ্রসূত দ্বিতীয় প্রকার যাদুর কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِيْنُ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ .

অর্থাৎ –আমি তোমাদের বলি, কাদের উপর শয়তান অবতরণ করে, যতসব মিথ্যা অপবাদ রটনাকারী গোনাহ্‌গারের উপর শয়তান অবতরণ করে।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ .

অর্থাৎ– বরং শয়তানরাই কুফরী করেছে, ওরা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত।

তৃতীয় প্রকার যাদু হচ্ছে যাদুর মাধ্যমে বস্তুর সত্তা পরিবর্তন করে দেওয়া। যেমন, কোন মানুষ অথবা প্রাণীকে পাথর অথবা অন্য প্রাণী বানিয়ে দেওয়া। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী, আবূ বকর জাস্‌সাস প্রমুখ পণ্ডিত এই প্রকার যাদুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, যাদুর মাধ্যমে বস্তুর মূল সত্তা পরিবর্তন করা যায় না। বরং যাদুর প্রভাব নজর ও কল্পনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। মুতাযিলা সম্প্রদায়ও একথাই বলে। কিন্তু সাধারণ আলেমগণের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, বস্তুর সত্তা পরিবর্তন যুক্তি ও শরীয়তের দিক দিয়ে অসম্ভব নয়। উদাহরণত মানব দেহকে পাথরে পরিণত করা যেতে পারে।

কোরআন মজীদে ফেরআউনী যাদুকরদের যাদুকে কল্পনাপ্রসূত বলে আখ্যায়িত করা অর্থ এই নয় যে, সমস্ত যাদুই কাল্পনিক হবে–কল্পনার উর্ধ্বে যাদু হবে না। যাদুর মাধ্যমে বস্তুর সত্তা পরিবর্তন করা সম্ভব–এ দাবির সমর্থনে কেউ কেউ কা'ব আহ্‌বার বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করেন। হাদীসটি 'মুয়াত্তা ইমাম মালেক' গ্রন্থে কা'কা' ইবনে হাকীমের রেওয়ায়েতক্রমে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لو لا كلمات اقولهن لجعلتني اليهود حماراً .

"আমি কিছুসংখ্যক বাক্য নিয়মিত পাঠ করি। এগুলো না হলে ইহুদীরা আমাকে গাধা বানিয়ে ছাড়ত।"

'গাধা বানানো' শব্দটি রূপক অর্থে 'বোকা' বানানোর অর্থেও হতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন ব্যতিরেকে প্রকৃত অর্থ বাদ দিয়ে রূপক অর্থ নেওয়া ঠিক নয়। তাই হাদীসের প্রকৃত অর্থ এই যে, 'বাক্যগুলো নিয়মিত পাঠ না করলে ইহুদী যাদুকররা আমাকে গাধা বানিয়ে দিত।'

এতদ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হলো ঃ (এক) যাদু দ্বারা মানুষকে গাধা বানানোও সম্ভব। (দুই) তিনি যে কতকগুলো বাক্য নিয়মিত পাঠ করতেন, সেগুলোর প্রভাবে তিনি নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলো উল্লেখ করেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ لَيْسَ بِشَىْءٍ اَعْظَمُ مِّنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَايُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ وَبِاَسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَءَ وَذَرَءَ ٠

অর্থাৎ (আমি মহান আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করি, যাঁর চাইতে মহান কেউ নেই। আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালামের আশ্রয় গ্রহণ করি, যা কোন পুণ্যবান কিংবা পাপাচারী অতিক্রম করতে পারে না। আমি আল্লাহ্র সুন্দর নামসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করি, যেগুলি আমি জানি বা জানি না ; প্রত্যেক ঐ বস্তুর অনিষ্ট থেকে যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং বিস্তৃত করেছেন।

মোটকথা, যাদুর উল্লিখিত তিনটি প্রকারই বাস্তবে সম্ভব।

যাদু ও মো'জেযার পার্থক্য ঃ পয়গম্বরগণের মো'জেযা ও ওলীদের কারামাত দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, যাদুর মাধ্যমেও বাহ্যত তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মূর্খেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে যাদুকরদেরকেও সম্মানিত ও মাননীয় মনে করতে থাকে। এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করা দরকার।

বলা বাহুল্য, প্রকৃত সত্তার দিক দিয়ে এবং বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সত্তার পার্থক্য এই যে, যাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ঘটনাবলীও কারণের আওতা-বহির্ভূত নয়। পার্থক্য শুধু কারণটি দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে। যেখানে কারণ দৃশ্যমান, সেখানে ঘটনাকে কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয় এবং ঘটনাকে মোটেও বিস্ময়কর মনে করা হয় না। কিন্তু যেখানে কারণ অদৃশ্য, সেখানেই ঘটনাকে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক মনে করা হয়। সাধারণ লোক 'কারণ' না জানার দরুন এ ধরনের ঘটনাকে অলৌকিক মনে করতে থাকে। অথচ বাস্তবে তা অন্যান্য অলৌকিক ঘটনারই মতো। কোন দূরদেশ থেকে আজকের লেখা পত্র হঠাৎ সামনে পড়লে দর্শকমাত্রই সেটাকে অলৌকিক বলে আখ্যায়িত করবে। অথচ জ্বিন ও শয়তানরা এ জাতীয় কাজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছে। মোটকথা এই যে, যাদুর প্রভাবে দৃষ্ট ঘটনাবলীও প্রাকৃতিক কারণের অধীন। তবে কারণ অদৃশ্য হওয়ার দরুন মানুষ অলৌকিকতায় বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।

মো'জেযার অবস্থা এর বিপরীত। মো'জেযা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কাজ। এতে প্রাকৃতিক কারণের কোন হাত নেই। ইবরাহীম (আ)-এর জন্য নমরূদের জ্বালানো আগুনকে

আল্লাহ্ তা'আলাই আদেশ করেছিলেন, 'ইবরাহীমের জন্য সুশীতল হয়ে যাও। কিন্তু এতটুকু শীতল নয় যে, ইব্রাহীম কষ্ট অনুভব করে।' আল্লাহ্র এই আদেশের ফলে অগ্নি শীতল হয়ে যায়।

ইদানিং কোন কোন লোক শরীরে ভেষজ প্রয়োগ করে আগুনের ভেতর চলে যায়। এটা মো'জেযা নয় ; বরং ভেষজের ক্রিয়া। তবে ভেষজটি অদৃশ্য, তাই মানুষ একে অলৌকিক বলে ধোঁকা খায়।

স্বয়ং কোরআনের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, মো'জেযা সরাসরি আল্লাহ্র কাজ। বলা হয়েছে ঃ

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

অর্থাৎ–আপনি যে একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেন নি; আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছিলেন। অর্থাৎ, এক মুষ্টি কঙ্কর যে সমবেত সবার চোখে পৌঁছে গেল, এতে আপনার কোন হাত ছিল না। এটা ছিল একান্তভাবেই আল্লাহ্র কাজ। এই মো'জেযাটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) এক মুষ্টি কঙ্কর কাফের বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন যা সবার চোখেই পড়েছিল।

মো'জেযা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ্র কাজ আর যাদু অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। এ পার্থক্যটিই মো'জেযা ও যাদুর স্বরূপ বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সাধারণ লোক এই পার্থক্যটি কিভাবে বুঝবে ? কারণ, বাহ্যিক রূপ উভয়েরই এক। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সাধারণ লোকদের বোঝার জন্যও আল্লাহ্ তা'আলা কয়েকটি পার্থক্য প্রকাশ করেছেন।

প্রথমত, মো'জেযা ও কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাদের আল্লাহ্ভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে থাকে। পক্ষান্তরে যাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহ্র যিক্র থেকে দূরে থাকে। এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মো'জেযা ও যাদুর পার্থক্য বোঝতে পারে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্র চিরাচরিত রীতি এই যে, যে ব্যক্তি মো'জেযা ও নবুয়ত দাবি করে যাদু করতে চায়, তার যাদু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। হ্যাঁ, নবুয়তের দাবি ছাড়া যাদু করলে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পয়গম্বরগণের উপর যাদু ক্রিয়া করে কি না? ঃ এ প্রশ্নের উত্তর হবে হ্যাঁ-বাচক। কারণ, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, যাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। পয়গম্বরগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতেন। এটা নবুয়তের মর্যাদার পরিপন্থী নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পয়গম্বরগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হতেন, রোগাক্রান্ত হতেন এবং আরোগ্য লাভ করতেন। তেমনিভাবে যাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হতে পারেন এবং এটা নবুয়তের পরিপন্থী নয়। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর যাদু করেছিল এবং সে যাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং যাদুর প্রভাব দূরও করা হয়েছিল। মূসা (সা)-এর যাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া কোরআনেই উল্লিখিত রয়েছে ঃ

فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً এবং يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى مُّوْسٰى যাদুর কারণেই মূসা (সা)-এর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল।

শরীয়তে যাদু সম্পর্কিত বিধি-বিধান

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় যাদু এমন অদ্ভুত কর্মকাণ্ড, যাতে কুফর, শিরক এবং পাপাচার অবলম্বন করে জ্বিন ও শয়তানকে সন্তুষ্ট করা হয় এবং ওদের সাহায্য নেওয়া হয়। কোরআনে বর্ণিত বাবেল শহরে যাদু ছিল তাই।–(জাস্সাস) এ যাদুকেই কোরআন কুফর বলে অভিহিত করেছে। আবূ মনসুর (র) বলেন, বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, যাদুর সকল প্রকারই কুফর নয়; বরং যাতে ঈমানের বিপরীত কথাবার্তা এবং কাজকর্ম অবলম্বন করা হয়, তা-ই কুফর।–(রূহুল মা'আনী)

শয়তানকে অভিসম্পাত করা এবং শয়তানের বিরোধিতা করার নির্দেশ কোরআনে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। এর বিপরীতে শয়তানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং ওকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা করা কঠিন গোনাহর কাজ। তদুপরি শয়তান তখনই সন্তুষ্ট হবে, যখন মানুষ ঈমান বিধ্বংসী কুফর ও শিরকে অথবা পাপাচারে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদের পছন্দের বিপরীতে নোংরা ও অপবিত্র থাকবে। যাদুর সাহায্যে অনর্থক কারও ক্ষতি করলে তা হয় অধিকতর গোনাহ্।

মোটকথা, কোরআন ও হাদীসে যাকে যাদু বলা হয়েছে, তা বিশ্বাসগত কুফর অথবা অন্তত কার্যগত কুফর থেকে মুক্ত নয়। শয়তানকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কিছু শিরক ও কুফরী বাক্য বললে অথবা পন্থা অবলম্বন করলে, তা হবে প্রকৃত বিশ্বাসগত কুফর। পক্ষান্তরে এসব থেকে আত্মরক্ষা করে অপরাপর গোনাহ্ অবলম্বন করা হলে, তা কার্যগত কুফর থেকে মুক্ত হবে না। কোরআন মজীদের আয়াতসমূহে এ কারণেই যাদুকে কুফর বলা হয়েছে।

মোটকথা, শিরক ও কুফরযুক্ত যাদু যে কুফর, সে বিষয়ে 'ইজমা' রয়েছে। যেমন, শয়তানের সাহায্য লওয়া, গ্রহ ও নক্ষত্রের প্রভাব স্বতন্ত্রভাবে স্বীকার করা, যাদুকে মো'জেযা আখ্যা দিয়ে নবুয়ত দাবি করা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে গোনাহযুক্ত যাদু কবীরা গোনাহ।

০ বিশ্বাসগত অথবা কার্যগত কুফর থেকে মুক্ত নয়–এমন যাদু শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া এবং তার আমল করা হারাম। তবে মুসলমানদের ক্ষতি দূর করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুপাতে যাদু শিক্ষা করা কোন কোন ফিকাহ্বিদের মতে জায়েয।

০ কোরআন ও সুন্নাহ্র পরিভাষায় যেগুলোকে যাদু বলা হয়, সেগুলো ছাড়া অন্যান্য যাদুর মধ্যেও কুফর ও শিরক অবলম্বন করা হলে তাও হারাম।

০ তাবীজ-গণ্ডায় জ্বিন ও শয়তানের সাহায্য নেওয়া হলে তাও যাদুর মতই হারাম। যদি অস্পষ্টতার কারণে বাক্যাবলীর অর্থ জানা না যায় এবং যেসব শব্দ দ্বারা শয়তানের সাহায্য লওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাও হারাম।

০ অনুমোদিত ও জায়েয বিষয়াদির সাহায্যে হলে এবং তা অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহার না করার শর্তে জায়েয।

০ কোরআন ও হাদীসের বাক্যাবলীর সাহায্যে হলেও যদি তা অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহার করা হয়, তবে জায়েয নয়। উদাহরণত কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাবিজ করা

অথবা ওযীফা পাঠ করা। এহেন ওযীফা আল্লাহ্‌র নাম ও কোরআনের আয়াত সম্বলিত হলেও তা হারাম। (কাযী খান ও শামী)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

(১০৪) হে মু'মিনগণ, তোমরা 'রায়িনা' বলো না–'উনযুরনা' বল এবং শুনতে থাক আর কাফিরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[কোন কোন ইহুদী রসূলুল্লাহ্ (সা)]-এর নিকট এসে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে তাঁকে 'রায়িনা' বলে সম্বোধন করত। হিব্রু ভাষায় এর অর্থ একটি বদদোয়া। তারা এ নিয়তেই তা বলত। কিন্তু আরবী ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন।' ফলে আরবী ভাষীরা তাদের এই দুরভিসন্ধি বুঝতে পারত না। ভাল অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে কোন কোন মুসলমানও রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই শব্দে সম্বোধন করতেন। এতে দুষ্টরা আরও আশকারা পেতো। তারা পরস্পর বসে হাসাহাসি করত আর বলত, এতদিন আমরা গোপনেই তাকে মন্দ বলতাম। এখন এতে মুসলমানদেরও শরীক হওয়ার কারণে প্রকাশ্যে মন্দ বলার সুযোগ এসেছে। তাদের এই সুযোগ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ হে মু'মিনগণ, তোমরা 'রায়িনা' (শব্দটি) বলো না। (এর পরিবর্তে) 'উনযুরনা' বলবে। (কেননা, আরবী ভাষায় 'রায়িনা' ও 'উনযুরনা'র অর্থ এক হলেও 'রায়িনা' বললে ইহুদীরা দুষ্টুমির সুযোগ পায়। তাই একে বর্জন করে অন্য শব্দ ব্যবহার কর)। আর এ নির্দেশটি (ভালরূপে) শুনে নাও (এবং স্মরণ রাখ)। কাফিরদের জন্যে তো বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছেই। (কারণ, ওরা ধূর্ততা সহকারে পয়গম্বরের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে)।

আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আপনার কোন জায়েয কাজ থেকে যদি অন্যরা নাজায়েয কাজের আশকারা পায়, তবে সে জায়েয কাজটিও আপানার পক্ষে জায়েয থাকবে না। উদাহরণত কোন আলিমের কোন কাজ দেখে যদি সাধারণ লোকেরা বিভ্রান্ত হয় এবং নাজায়েয কাজে লিপ্ত হয়, তবে সে আলিমের জন্য সে জায়েয কাজটিও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। তবে শর্ত এই যে, সংশ্লিষ্ট কাজটি শরীয়তের দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় হওয়া উচিত। কোরআন ও হাদীসে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর একটি প্রমাণ ঐ হাদীস, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, জাহেলিয়াত যুগে কোরাইশরা যখন কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণ করে, তখন এতে কয়েকটি কাজই এমন করা হয়েছে, যা ইব্‌রাহীম (আ) কর্তৃক রচিত ভিত্তির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। আমার মন চায়, একে ভেঙে আবার ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কা'বাগৃহ ভেঙে দিলে অজ্ঞ জনগণের বিভ্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই আমি স্বীয় আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করছি না—এ

বিধানটি সমস্ত ফেকাহ্‌বিদের কাছেই গ্রহণীয়। তবে হাম্বলী মযহাবের আলেমগণ এ ব্যাপারে অধিক সাবধানতা অবলম্বনের পক্ষপাতী।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ
عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿١٠٥﴾

(১০৫) আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের মনঃপূত নয় যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ্ মহান অনুগ্রহদাতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ইহুদীদের আচরণ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের আচরণ সম্পর্কে বিবৃত হচ্ছে। কোন কোন ইহুদী কোন কোন মুসলমানকে বলত, আল্লাহ্‌র কসম আমরা অন্তর দ্বারা তোমাদের শুভেচ্ছা কামনা করি। তোমরা আমাদের চাইতে উত্তম ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রাপ্ত হও—আমরা মনেপ্রাণে তাই আশা করি। এরূপ হলে আমরাও তা কবূল করব। কিন্তু ঘটনাচক্রে তোমাদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চাইতে শ্রেষ্ঠ হতে পারেনি। আল্লাহ্ তা'আলা হিতাকাঙ্ক্ষার এই ভানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলেন, (মুশরিক হোক অথবা আহলে-কিতাব হোক) কাফিরদের (একটুও) মনঃপূত নয় যে, তোমরা পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হও। (তাদের এ হিংসায় কিছু আসে যায় না। কারণ) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মহান অনুগ্রহদাতা।

ইহুদীদের দাবি ছিল দু'টি (এক) ইহুদীবাদ ইসলামের চাইতে শ্রেষ্ঠ। (দুই) তারা মুসলমানদের শুভাকাঙ্ক্ষী। প্রথম দাবিটি তারা প্রমাণ করতে পারেনি। নিছক দাবিতে কিছু হয় না। এছাড়া দাবিটি নিরর্থকও বটে। কারণ, 'নাসিখ' (যে রহিত করে) আগমন করলে 'মনসূখ' (যাকে রহিত করা হয়) বর্জনীয় হয়ে যায়। তা উত্তম ও অধমের পার্থক্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। এই উত্তরটি সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত, এ কারণে আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়নি। আয়াতে শুধু দ্বিতীয় দাবিটি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুকে শক্তিশালী ও জোরদার করার উদ্দেশ্যে আহ্‌লে-কিতাবদের সাথে মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিকরা যেমন নিশ্চিতরূপেই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী নয় তাদেরকেও তেমনি মনে করো।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾

(১০৬) আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ সব কিছুর ওপর শক্তিমান ? (১০৭) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্র জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য ? আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা সংঘটিত হলে ইহুদীরা তিরস্কার করতে থাকে এবং কোন কোন বিধান রহিত করার কারণে মুশরিকরাও মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপবান বর্ষণ করতে শুরু করে। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তিরস্কার ও আপত্তির জওয়াব দিয়েছেন।) আমি কোন আয়াতের বিধান রহিত করে দিলে (যদিও কোরআনে অথবা স্মৃতিতে সে আয়াত অবশিষ্ট থাকে) অথবা (আয়াতটিকেই স্মৃতি থেকে) বিস্মৃত করিয়ে দিলে (তা কোন আপত্তির বিষয় নয়। কারণ যুক্তিসঙ্গত কারণেই তা করা হয়। সেমতে) তদপেক্ষা উত্তম আয়াত বা তার সমপর্যায়ের আয়াত (তদস্থলে আনয়ন করি। হে আপত্তিকারিগণ) তোমরা কি জান যে, আল্লাহ্ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান ? (এমন ক্ষমতাবানের পক্ষে উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা কঠিন ?) তোমরা কি জান না যে, নভোমণ্ডলে একমাত্র তাঁরই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত (এহেন বিরাট রাজত্বে যখন তাঁর কোন অংশীদার নেই, তখন উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করে ভিন্ন নির্দেশ দিলে তাকে কে বাধা দিতে পারে ? মোটকথা, ভিন্ন নির্দেশ দান এবং প্রস্তাব ও তা কার্যকরী করার ব্যাপারে তাঁর প্রতিবন্ধক কেউ নেই।) আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। (তিনি যখন বন্ধু, তখন বিধি-বিধানে অবশ্যই উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। আর তিনি যখন সাহায্যকারী, তখন বিধান পালন করার সময় শত্রুদের আগমন থেকেও তোমাদের হেফাযত করবেন। তবে বৃহত্তর পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে বাহ্যত তোমাদের উপর শত্রুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তা ভিন্ন কথা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا–এই আয়াতে কোরআনী আয়াত রহিত হওয়ার সম্ভাব্য সকল প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে। অভিধানে 'নসখ' শব্দের অর্থ দূর করা, লেখা। সমস্ত

মুসলিম টীকাকার এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে 'নস্খ' শব্দ দ্বারা বিধি-বিধান দূর করা অর্থাৎ রহিত করা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হাদীস ও কোরআনের পরিভাষায় এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে 'নস্খ' বলা হয়। 'অন্য বিধানটি' কোন বিধানের বিলুপ্ত ঘোষণাও হতে পারে, আবার এক বিধানের পরিবর্তে অপর বিধান বলে দেওয়াও হতে পারে।

আল্লাহ্‌র বিধানে নস্খের স্বরূপ ঃ জগতের রাষ্ট্র ও আইন-আদালতে এক নির্দেশকে রহিত করে অন্য নির্দেশ জারি করার ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত। রচিত আইনে 'নস্খ' বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। (১) ভুল ধারণার উপর নির্ভর করে প্রথমে যদি কোন আইন প্রবর্তন করা হয়, তবে পরে বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ উদঘটিত হলে পূর্বেকার আইন পরিবর্তন করা হয়। (২) ভবিষ্যৎ অবস্থার গতি-প্রকৃতি জানা না থাকার কারণে কোন কোন সাময়িক আইন জারি করা হয়। পরে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সে আইনও পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু এ ধরনের নস্খ আল্লাহ্‌র আইন হতে পারে বলে ধারণা করা যায় না।

তৃতীয় প্রকার 'নস্খ' এরূপ ঃ আইন–রচয়িতা আগেই জানে যে, অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন এই আইন আর উপযোগী থাকবে না; অন্য আইন জারি করতে হবে। এরূপ জানার পর সাময়িকভাবে এই আইন জারি করে দেন, পরে পূর্বজ্ঞান অনুযায়ী যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তখন পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনও পরিবর্তন করেন। উদাহরণত রোগীর বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র দেন। তিনি জানেন যে, এই ওষুধ দু'দিন সেবন করার পর রোগীর অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন অন্য ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে। অবস্থার এহেন পরিবর্তন জানার ফলেই চিকিৎসক প্রথম দিন এক ওষুধ এবং পরে অন্য ওষুধ দেন।

অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথম দিনেই পরিবর্তনসহ চিকিৎসার পূর্ণ প্রোগ্রাম কাগজে লিখে দিতে পারে যে, দু'দিন এই ওষুধ, তিন দিন অন্য ওষুধ এবং এক সপ্তাহ পর অমুক ওষুধ সেব্য। কিন্তু এরূপ করা হলে রোগীর পক্ষে জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থাকে এবং এতেও ভুল বোঝাবুঝির কারণে ত্রুটিরও আশংকা থাকে। তাই ডাক্তার প্রথম দিনেই পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন না।

আল্লাহ্‌র আইনে এবং আসমানী গ্রন্থসমূহে শুধু তৃতীয় প্রকার নস্খই হতে পারে এবং হয়ে থাকে। প্রতিটি নবুয়ত ও প্রতিটি আসমানী গ্রন্থ পূর্ববর্তী নবুয়ত ও আসমানী গ্রন্থের বিধান নস্খ তথা রহিত করে নতুন বিধান জারি করেছে। এমনিভাবে একই নবুয়ত ও শরীয়তে এমন রয়েছে যে, এক বিধান কিছু দিন প্রচলিত থাকার পর খোদায়ী হেকমত অনুযায়ী সেটি পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে আছে ঃ

لم تكن نبوة قط الا تناسخت .

অর্থাৎ এমন নবুয়ত কখনও ছিল না, যাতে নস্খ ও পরিবর্তন করা হয়নি।–(কুরতুবী)

মূর্খজনোচিত আপত্তি ঃ কিছুসংখ্যক মূর্খ ইহুদী অজ্ঞতাবশত খোদায়ী বিধানে নস্খকে সঠিক অর্থে বুঝতে পারেনি। তারা খোদায়ী নস্খকে জাগতিক আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার নস্খের অনুরূপ ধরে নিয়ে নবী করীম (সা)-এর প্রতি ভর্ৎসনার বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। এর উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। (ইবনে-কাসীর)

মুসলমানদের মধ্যে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের কিছুসংখ্যক আলেম সম্ভবত উপরোক্ত বিরোধীদের ভর্ৎসনা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই বলেছেন যে, খোদায়ী বিধানে নস্‌খের সম্ভাবনা অবশ্যই আছে– এতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, কিন্তু সমগ্র কোরআনে বাস্তবে কোন নস্‌খ হয়নি। কোন আয়াত নাসেখও নয়, মনসূখও নয়। আবু মুসলিম ইস্পাহানীকে এই মতবাদের প্রবক্তা বলা হয়। আলেম সম্প্রদায় যুগে যুগে তাঁর মতবাদ খণ্ডন করেছেন। তফসীরে রূহুল-মা'আনীতে বলা হয়েছে ঃ

واتفقت اهل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه وخالفت اليهود غير العيسوية فى جوازه وقالوا يمتنع عقلا وابو مسلم الاصفهانى فى وقوعه فقال انه وان جاز عقلا لكنه لم يقع .

(নস্‌খের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে সকল ধর্মাবলম্বীই একমত। তবে খৃস্টান সম্প্রদায় ব্যতীত সকল ইহুদী এর সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করেছে। আবূ মুসলিম ইস্পাহানী এর বাস্তবতা অস্বীকার করে বলেছেন যে, খোদায়ী বিধানে নস্‌খ সম্ভব ; কিন্তু বাস্তবে কোথাও নস্‌খ হয়নি) ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীরে বলেন ঃ

معرفة هذا الباب اكيدة وفائدته عظيمة لا تستغنى عن معرفته العلماء ولا ينكره الا الجهلة الاغبياء .

(নস্‌খ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা খুবই জরুরী এবং এর উপকারিতা অনেক। আলিমগণ একে উপেক্ষা করতে পারেন না। একমাত্র মূর্খ ও নির্বোধ ছাড়া কেউ নস্‌খ অস্বীকার করতে পারে না।)

কুরতুবী এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা)-এর একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। একবার তিনি মসজিদে এসে এক ব্যক্তিকে ওয়াজে রত দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কি করছে ? উত্তর হলো, সে ওয়াজ-নসীহত করছে। হযরত আলী (রা) বললেন–না, সে ওয়াজ করছে না, বরং সে বলতে চায় যে, আমি অমুকের পুত্র অমুক। আমাকে চিনে নাও। অতঃপর লোকটিকে ডেকে তিনি বললেন, তুমি কি কোরআন ও হাদীসের নাসেখ ও মনসূখ বিধানসমূহ জান ? লোকটি বলল, না আমার জানা নেই। হযরত আলী (রা) বললেন, তাহলে আমাদের মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাও। ভবিষ্যতে এখানে আর ওয়াজ করো না।

কোরআন ও হাদীসে নস্‌খের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি এত বেশি যে, সেগুলো উদ্ধৃত করা সহজ নয়। তফসীরে ইবনে কাসীর, ইবনে জরীর, দুররে-মনসূর প্রভৃতি গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বহু রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে– দুর্বল রেওয়ায়েতের তো গণনাই নেই।

এ কারণেই প্রশ্নটি ইজমায়ী তথা সর্বসম্মত। শুধু আবূ মুসলিম ইস্পাহানী ও কতিপয় মু'তাযিলী এ প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। তফসীরে-কবীর গ্রন্থে ইমাম রাযী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাদের মতামত খণ্ডন করেছেন।

নস্‌খের অর্থে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিভাষায় পার্থক্য ঃ নস্‌খের পারিভাষিক অর্থ বিধান পরিবর্তন করা। এ পরিবর্তন একটি বিধানকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে তদস্থলে অন্য বিধান রাখার

মাধ্যমেও হতে পারে। যেমন বায়তুল-মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা শরীফকে কেবলা বানিয়ে দেওয়া। এমনিভাবে কোন শর্তহীন ও ব্যাপক বিধানে কোন শর্ত যুক্ত করে দেওয়াও এক প্রকার পরিবর্তন। পূর্ববর্তী আলেম সম্প্রদায় নস্‌খকে এই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে কোন বিধানের সম্পূর্ণ পরিবর্তন, আংশিক পরিবর্তন, শর্ত যুক্তকরণ অথবা ব্যতিক্রম বর্ণনা ইত্যাদি সবই নস্‌খের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই তাঁদের মতে কোরআনে মনসূখ আয়াতের সংখ্যা পাঁচশ যেখানে পরিবর্তনের পূর্বের বিধান ও পরের বিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য বর্ণনা করা কিছুতেই সম্ভব হয় না, পরবর্তী আলেমগণ শুধু সেখানেই নস্‌খ হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। এই অভিমত মেনে নিলে স্বভাবতই মনসূখ আয়াতের সংখ্যা বিপুল হারে হ্রাস পাবে। এরই অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ আলেমদের বর্ণিত পাঁচ শ মনসূখ আয়াতের স্থলে পরবর্তী আলেম আল্লামা সুয়ুতী মাত্র বিশটি আয়াতকে মনসূখ প্রতিপন্ন করেছেন। তারপর হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) এগুলোর মধ্যেও সামঞ্জস্য বর্ণনা করে মাত্র পাঁচটি আয়াতকে মনসূখ বলেছেন। এ প্রচেষ্টা এদিক দিয়ে সঙ্গত যে, পরিবর্তন না হওয়াই বিধানের পক্ষে স্বাভাবিক। কাজেই যেখানে আয়াতকে কার্যকরী রাখার পক্ষে কোন ব্যাখ্যা সম্ভব হয়, সেখানে বিনা প্রয়োজনে নস্‌খ স্বীকার করা ঠিক নয়।

কিন্তু এই সংখ্যা হ্রাসের অর্থ এই নয় যে, নস্‌খের ব্যাপারটি ইসলাম অথবা কোরআনের মধ্যে একটা ত্রুটিপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিদ্যমান ছিল- যা মোচনের চেষ্টা চৌদ্দ শ' বছর যাবত চলছে। অবশেষে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র প্রচেষ্টায় সে দোষ হ্রাস পেতে পেতে পাঁচ-এ এসে দাঁড়িয়েছে। এরপরও কোন আধুনিক চিন্তাবিদের অপেক্ষা করা হচ্ছে–যিনি এসে এই পাঁচটিকেও বিলুপ্ত করে একেবারে শূন্যের কোটায় পৌঁছে দেবেন।

নস্‌খ প্রশ্নের গবেষণায় এই পথ অবলম্বন করা ইসলাম ও কোরআনের সঠিক খেদমত নয়। এই পথ অবলম্বন করে সাহাবী, তাবেয়ী তথা চৌদ্দশ' বছরের (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী) আলেমগণের রচনা ও গবেষণাকে ধুয়েমুছে ফেলা সম্ভব নয়। এতে করে বিরোধীদের সমালোচনা বন্ধ হবে না। লাভের মধ্যে শুধু আধুনিক যুগের ধর্মদ্রোহীদের হাতে একটি অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে। তারা একথা বলার সুযোগ পাবে যে, চৌদ্দ শ' বছর যাবত আলেমরা যা বলছেন, পরিশেষে তা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে –(মা'আযাল্লাহ্)। এ পথ উন্মুক্ত হয়ে গেলে কোরআন ও শরীয়তের উপর থেকে আস্থা উঠে যাবে। কারণ আজকের গবেষণা যে আগামীকাল ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে না, এরই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

আমি বর্তমান যুগের কোন কোন আলেমের লেখা পাঠ করেছি। তারা مَا نَنْسَخْ আয়াতটিকে متضمن معنى شرط হওয়ার কারণে قضيه فرضيه সাব্যস্ত করেছেন। যেমন, لَوْكَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ এবং لَوْكَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ অতঃপর আয়াত দ্বারা তারা শুধু নস্‌খের সম্ভাবনা প্রমাণিত করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং নস্‌খের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছেন। অথচ قضيه شرطيه بحرف لَوْ এবং تضمن معنى شرط এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। বলা বাহুল্য, এটা আবূ মুসলিম ইস্পাহানী এবং মু'তাযিলা সম্প্রদায়েরই যুক্তি।

অথচ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তফসীর এবং সমগ্র মুসলিম সমাজের অনুবাদ দেখার পর উপরোক্ত ব্যাখ্যা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম উপরোক্ত আয়াত দ্বারা নস্খের বাস্তবতা প্রমাণ করে এ সম্পর্কিত একাধিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। (ইবনে-কাসীর, ইবনে জরীর প্রভৃতি)

এ কারণেই পূর্ববর্তী মুসলিম মনীষিগণের মধ্যে কেউ নস্খের বাস্তবতাকে শর্তহীনভাবে অস্বীকার করেন নি। স্বয়ং হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) সামঞ্জস্য বর্ণনা করে সংখ্যা হ্রাস করেছেন বটে ; কিন্তু নস্খের বাস্তবতাকে শর্তহীনভাবে অস্বীকার করেন নি। তাঁর পরবর্তী যমানায়ও দেওবন্দের প্রখ্যাত আলেমগণের সবাই একবাক্যে নস্খের বাস্তবতা স্বীকার করেছেন। তাঁদের কারও কারও সম্পূর্ণ অথবা আংশিক তফসীরও বিদ্যমান রয়েছে والله سبحانه وتعالى اعلم

أو ننسها প্রসিদ্ধ কেরাআত অনুযায়ী এর উৎপত্তি انساءٌ ও نسيانٌ ধাতু থেকে। উদ্দেশ্য এই যে, কখনও রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সমস্ত সাহাবীর মন থেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত করিয়ে নস্খ করা হয়। এর সমর্থনে টীকাকারগণ একাধিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ভবিষ্যতে যাতে আয়াতটির উপর আমল করা না হয়, সে উদ্দেশ্যেই এরূপ বিস্মৃত করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নস্খের অবশিষ্ট বিধান উসূলে ফেকাহ্ গ্রন্থসমূহে দেখা যেতে পারে।

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

---

(১০৮) ইতিপূর্বে মূসা (আ) যেমন জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, (মুসলমানগণ) তোমরাও কি তোমাদের রসূলকে তেমনি প্রশ্ন করতে চাও ? যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[কোন কোন ইহুদী হঠকারিতাবশত হুযূর (সা)-কে বলল, মূসা (আ)-এর নিকট তওরাত যেমন একযোগে নাযিল হয়েছিল, আপনিও তেমনি একযোগে কোরআন আনয়ন করুন। এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, হে ইহুদীগণ, তোমরা কি চাও যে, তোমাদের (সমসাময়িক) রসূলের নিকট (অন্যায়) আবদার পেশ করবে যেমন ইতিপূর্বে (তোমাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষ থেকে) মূসা (আ)-এর নিকটও আবদার করা হয়েছিল ? (উদাহরণত তারা আল্লাহ্‌কে চাক্ষুষ দেখার আবদার করেছিল। বস্তুত সেসব আবেদনের উদ্দেশ্য রসূল (সা)-কে জব্দ করা এবং খোদায়ী বিধানের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। এরূপ আচরণ নির্জলা কুফর বৈ নয়। আর] যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফরের কথাবার্তা বলে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

'অন্যায় আবদার' বলার কারণ এই যে, প্রতিটি কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার হেকমত ও উপযোগিতা নিহিত থাকে। তাতে পন্থা নির্দেশ করার কোন অধিকার বান্দার নেই যে, সে বলবে, এ কাজটি এভাবে করা হোক। বান্দার কর্তব্য হচ্ছে ঃ

زبان تازه کردن باقرار توا * نینگیختن علت از کار تو

শায়খুল-হিন্দ (র)-এর তরজমা অনুযায়ী এ আয়াতে ইহুদীদেরকে নয়-মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে অর্থাৎ মুসলমানদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যেন তারা রসূল (সা)-কে অন্যায় প্রশ্নবাণে জর্জরিত না করে।

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهٖ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٩﴾ وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٠﴾

(১০৯) আহ্‌লে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশত চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদের কোন রকমে কাফির বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)। যাক, তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (১১০) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্য পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহ্‌র কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষ করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কোন কোন ইহুদী দিবারাত্র বিভিন্ন পন্থায় বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে মুসলমানদের ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করত। অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও তারা এ প্রচেষ্টা থেকে বিরত হতো না। আল্লাহ্ তা'আলা এজন্য মুসলমানদের হুঁশিয়ার করে দেন যে) আহলে কিতাবদের (অর্থাৎ ইহুদীদের) অনেকেই মনে মনে চায় যে, ঈমান আনার পর তোমাদের আবার কাফির বানিয়ে দেয়। (তাদের এ মনোবাঞ্ছা তাদের প্রদর্শিত শুভেচ্ছার কারণে নয়; বরং শুধু প্রতিহিংসাবশত, যা (তোমাদের কোন বিষয় থেকে উদ্ভূত নয়, বরং) তাদের অন্তর থেকেই

উদ্ভূত। (আর এমনও নয় যে, সত্য তাদের কাছে প্রকাশিত হয়নি, বরং) সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও (তাদের) এই অবস্থা। (এমতাবস্থায় মুসলমানদের ক্রোধান্বিত হওয়ার কথা। তাই আল্লাহ্ বলেন,) যাক (এখন) তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা (এ ব্যাপারে) স্বীয় নির্দেশ (বিধান) প্রেরণ না করেন। (ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, তাদের হঠকারিতার প্রতিকার আমি সত্বরই নিরাপত্তামূলক বিধান অর্থাৎ হত্যা ও জিযিয়ার মাধ্যমে করব। এতে স্বীয় দুর্বলতা ও প্রতিপক্ষের শক্তি-সামর্থ্য দেখে এ আইন প্রয়োগের ব্যাপারে মুসলমানদের মনে সংশয় দেখা দিতে পারত। তাই বলা হচ্ছে, তোমরা সংশয়াপন্ন হবে কেন ?) নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তোমরা (শুধু) নামায প্রতিষ্ঠা করে যাও আর (যাদের ওপর যাকাত ফরয, তারা) যাকাত দিয়ে যাও। আর (যখন প্রতিশ্রুত আইন আসবে, তখন এসব সৎকর্মের সাথে তাও যুক্ত করে নেবে। এরূপ মনে করবে না যে, জিহাদের আদেশ না আসা পর্যন্ত শুধু-নামায-রোযা দ্বারা পুণ্যকর্ম হবে না। বরং তোমরা) নিজের জন্য পূর্বে যে সৎ কর্মই সঞ্চয় করবে, আল্লাহ্র কাছে (পৌছে) তা (প্রতিদানসহ পুরোপুরি) পাবে। কারণ, আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখছেন (তোমাদের বিন্দু পরিমাণ আমলও নষ্ট হবে না)।

(তখনকার অবস্থানুযায়ী ক্ষমার নির্দেশই ছিল বিধেয়। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন এবং জিহাদের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর ইহুদীদের প্রতিও সে আইন বলবৎ করা হয় এবং অপরাধের ক্রমানুপাতে দুষ্টদের হত্যা, নির্বাসন, জিযিয়া ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হয়।)

وَقَالُوا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾ بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۪ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

(১১১) তারা বলে, ইহুদী অথবা খৃষ্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না। এটা তাদের মনের বাসনা। বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর। (১১২) হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে, তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (১১৩) ইহুদীরা বলে, খৃষ্টানরা কোন পথেই নয় এবং খৃষ্টানরা বলে, ইহুদীরা কোন পথেই নয়। অথচ সবাই খোদায়ী কিতাব পাঠ করে। এমনিভাবে যারা মূর্খ, তারাও তাদের মতই উক্তি করে। অতএব আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে নির্দেশ দেবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলে যে, বেহেশতে কখনও কেউ যেতে পারবে না ; কিন্তু যারা ইহুদী (তাদের ব্যতীত) অথবা খৃস্টান (খৃস্টানদের ছাড়া অন্য কেউ যেতে পারবে না)। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উক্তি খণ্ডন করে বলেন, এগুলো তাদের কল্পনাবিলাস (প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়)। আপনি তাদের একথা বলে দিন, তোমরা (এ দাবিতে) সত্যবাদী হলে প্রমাণ উপস্থিত কর। (কিন্তু তারা কস্মিনকালেও পারবে না। কারণ এর কোন প্রমাণ নেই। এখন আমি এর বিপক্ষে প্রথমে দাবি করছি যে, অন্য লোকেরাও বেহেশতে যাবে। অতঃপর এর প্রমাণ উপস্থিত করছি যে, সকল আসমানী ধর্মের অনুসারীদের স্বীকৃত আমার আইন এই যে,) যে কোন ব্যক্তি স্বীয় মুখমণ্ডল আল্লাহ্র দিকে নত করে দেয় (অর্থাৎ বিশ্বাস ও কাজকর্মে আনুগত্য অবলম্বন করে) এবং (তৎসঙ্গে শুধু বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানই নয়, আন্তরিকভাবেও) সৎকর্ম করে, সে তার আনুগত্যের প্রতিদান তার প্রতিপালকের কাছে পৌঁছে পাবে। কিয়ামতের দিন তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা (সে দিন) চিন্তিতও হবে না। (কারণ, ফেরেশতারা তাদের সুসংবাদ শুনিয়ে নিশ্চিন্ত করে দেবেন)।

(এ যুক্তির সারমর্ম এই যে, যখন এ আইনটি সর্বজনস্বীকৃত, তখন শুধু দেখে নাও যে, আইন অনুযায়ী কারা জান্নাতে যেতে পারে ? পূর্ববর্তী মনসূখ নির্দেশের ওপর আমল করাই যাদের সম্বল, তারা আনুগত্যশীল হতে পারে না। এ হিসাবে ইহুদী ও খৃস্টানরা আল্লাহ্র অনুগত নয়। বরং পরবর্তী নির্দেশ পালন করাই হবে আনুগত্য। এ দিক দিয়ে মুসলমানরাই অনুগত। কারণ তারা শরীয়তে-মুহাম্মদীকে কবূল করেছে। সুতরাং তারাই জান্নাতে প্রবেশকারীরূপে গণ্য হবে।

'আন্তরিকভাবে' শর্তটি যুক্ত হওয়ায় মুনাফিকরা বাদ পড়ে গেল। কারণ, শরীয়তের পরিভাষায় তারা কাফিরদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং জাহান্নামের উপযুক্ত। [একবার কয়েকজন ইহুদী ও কয়েকজন খৃস্টান একত্রিত হয়ে ধর্মীয় বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়। ইহুদীরা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী খৃস্ট ধর্মকে মিথ্যা বলে এবং হযরত ঈসা (আ)-এর নবুয়ত ও ইঞ্জীলকে অস্বীকার করতে থাকে। পক্ষান্তরে খৃস্টানরাও একগুঁয়েমির বশবর্তী হয়ে ইহুদী ধর্মকে ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে এবং মূসা (আ)-এর

রিসালত ও তওরাতকে অস্বীকার করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা ঘটনাটি উদ্ধৃত করে তা খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে বলেছেন,] ইহুদীরা বলতে লাগল, খৃস্টানদের ধর্ম কোন ভিত্তির ওপর (প্রতিষ্ঠিত) নয় (অর্থাৎ সর্বৈব মিথ্যা)। তেমনিভাবে খৃস্টানরা বলতে লাগল, ইহুদীদের ধর্ম কোন ভিত্তির ওপর কায়েম নয় (অর্থাৎ সর্বৈব মিথ্যা)। অথচ তারা (উভয় পক্ষের) সবাই আসমানী গ্রন্থসমূহ পড়ে এবং পড়ায়। (অর্থাৎ ইহুদীরা তওরাত এবং খৃস্টানরা ইঞ্জীল গ্রন্থ পড়ে এবং চর্চা করে। উভয় গ্রন্থে উভয় পয়গম্বর ও উভয় গ্রন্থের সত্যায়ন বিদ্যমান রয়েছে। এটাই উভয় ধর্মের আসল ভিত্তি। অবশ্য মনসূখ হওয়ার ফলে বর্তমানে এতদুভয়ের একটিও পালনীয় নয়)।

(আহলে-কিতাবরা তো উপরোক্ত দাবি করতই, তাদের দেখাদেখি মুশরিকদের মনেও জোশ দেখা দিল।) তেমনিভাবে যারা নিরেট বিদ্যাহীন, তারাও আহলে-কিতাবদের মত একথাই বলতে লাগল (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানদের ধর্ম ভিত্তিহীন, সত্যপন্থী একমাত্র আমরা)। অতএব (দুনিয়াতে প্রত্যেকেই আপন আপন কথা বলতে থাক) কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে ঐসব ব্যাপারে কার্যত ফয়সালা করে দেবেন, যাতে তারা বিরোধ করত (অর্থাৎ সত্যপন্থীদের জান্নাতে এবং অসত্যপন্থীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। "কার্যত ফয়সালা" বলার কারণ এই যে, নীতিগত ফয়সালা তো বিভিন্ন যুক্তি ও হাদীস-কোরআনের মাধ্যমে দুনিয়াতেও করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদী ও খৃস্টানদের পারস্পরিক মতবিরোধ উল্লেখ করে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও মতবিরোধের কুফল বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আসল সত্য উদঘাটন করেছেন। এসব ঘটনায় মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত (পথনির্দেশ) নিহিত রয়েছে, যা পরে বর্ণিত হবে।

খৃস্টান ও ইহুদী—উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মের প্রকৃত সত্যকেই উপেক্ষা করে ধর্মের নাম-ভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে তুলেছিল এবং তারা প্রত্যেকেই স্বজাতিকে জান্নাতি ও আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র বলে দাবি করত এবং তাদের ছাড়া জগতের সমস্ত জাতিকে জাহান্নামী ও পথভ্রষ্ট বলে বিশ্বাস করত।

এই অযৌক্তিক মতবিরোধের ফলে মুশরিকরা একথা বলার সুযোগ পেল যে, খৃস্টধর্ম ও ইহুদী ধর্ম মিথ্যা ও বানোয়াট এবং তাদের মূর্তিপূজাই একমাত্র সত্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম।

আল্লাহ্ তা'আলা উভয় সম্প্রদায়ের মূর্খতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এরা উভয় জাতিই জান্নাতে যাওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে উদাসীন, তারা শুধু ধর্মের নাম-ভিত্তিক জাতীয়তার অনুসরণ করে। বস্তুত ইহুদী, খৃস্টান অথবা ইসলাম যে কোন ধর্মই হোক, সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে দুটি বিষয় ঃ

এক—বান্দা মনে-প্রাণে নিজেকে আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করবে। তাঁর আনুগত্যকেই স্বীয় মত ও পথ মনে করবে। এ উদ্দেশ্যটি যে ধর্মে অর্জিত হয় তা-ই প্রকৃত ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে পেছনে ফেলে ইহুদী অথবা খৃস্টান জাতীয়তাবাদের ধ্বজা উত্তোলন করা ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

দুই—যদি কেউ মনে-প্রাণে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের সংকল্প গ্রহণ করে ; কিন্তু আনুগত্য ও ইবাদত নিজ খেয়াল-খুশিমত মনগড়া পন্থায় সম্পাদন করে, তবে তাও জান্নাতে

যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এক্ষেত্রে আনুগত্য ও ইবাদতের সেই পন্থাই অবলম্বন করতে হবে, যা আল্লাহ্ তা'আলা রসূলের মাধ্যমে বর্ণনা ও নির্ধারণ করেছেন।

প্রথম বিষয়টি ... بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ বাক্যাংশের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি وَهُوَ مُحْسِنٌ... বাক্যাংশের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে জানা গেল যে, পারলৌকিক মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য শুধু আনুগত্যের সংকল্পই যথেষ্ট নয়, বরং সৎকর্মও প্রয়োজন। কোরআন ও রসূলুলাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্র সাথে সামঞ্জস্যশীল শিক্ষা ও পন্থাই সৎকর্ম।

আল্লাহ্র কাছে বংশগত ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমানের কোন মূল্য নেই ; গ্রহণীয় বিষয় হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম ঃ ইহুদী হউক অথবা খৃস্টান কিংবা মুসলমান–যে কেউ উপরোক্ত মৌলিক বিষয়াদির মধ্য থেকে কোন একটি ছেড়ে দেয়, অতঃপর শুধু নামভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নিজেকে জান্নাতের ইজারাদার মনে করে নেয় ; সে আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছুই করে না। আসল সত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব নামের ওপর ভরসা করে কেউ আল্লাহ্র নিকটবর্তী ও মকবুল হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার মধ্যে ঈমান ও সৎকর্ম থাকে।

প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তেই ঈমানের মূলনীতি এক ও অভিন্ন। তবে সৎকর্মের আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে। তওরাতের যুগে যেসব কাজ-কর্ম মূসা (আ) ও তওরাতের শিক্ষার অনুরূপ ছিল, তাই ছিল সৎকর্ম। তদ্রূপ ইন্জীলের যুগে নিশ্চিতরূপে তা-ই ছিল সৎকর্ম, যা হযরত ঈসা (আ) ও ইন্জীলের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এখন কোরআনের যুগে ঐসব কার্যকলাপই সৎকর্মরূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, যা সর্বশেষ পয়গম্বর (সা)-এর বাণী ও তৎকর্তৃক আনীত গ্রন্থ কোরআন মজীদের হেদায়েতের অনুরূপ।

মোটকথা, ইহুদী ও খৃস্টানদের মতবিরোধ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা এই যে, উভয় সম্প্রদায় মূর্খতাসুলভ কথাবার্তা বলেছে ; তাদের কেউই জান্নাতের ইজারাদার নয়। তাদের কারও ধর্ম ভিত্তিহীন ও বানোয়াট নয় ; বরং উভয় ধর্মের নির্ভুল ভিত্তি রয়েছে। ভুল বোঝাবুঝির প্রকৃত কারণ হচ্ছে এই যে, তারা ধর্মের আসল প্রাণ অর্থাৎ বিশ্বাস, সৎকর্ম ও সত্য মতবাদকে বাদ দিয়ে বংশ অথবা দেশের ভিত্তিতে কোন সম্প্রদায়কে ইহুদী আর কোন সম্প্রদায়কে খৃস্টান নামে অভিহিত করেছে।

যারা ইহুদীদের বংশধর অথবা ইহুদী নগরীতে বাস করে অথবা আদমশুমারীতে নিজেকে ইহুদী বলে প্রকাশ করে, তাদেরকেই ইহুদী মনে করে নেওয়া হয়েছে। তেমনিভাবে খৃস্টানদের পরিচিতি ও সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে। অথচ ঈমানের মূলনীতি ভঙ্গ করে এবং সৎকর্ম থেকে বিমুখ হয়ে কোন ইহুদীই ইহুদী এবং কোন খৃস্টানই খৃস্টান থাকতে পারে না।

কোরআন মজীদে আহ্লে-কিতাবদের মতবিরোধ ও আল্লাহ্র ফয়সালা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের সতর্ক করা, যাতে তারাও ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়ে এ কথা না বলে যে, আমরা পুরুষানুক্রমে মুসলমান, প্রত্যেক অফিস ও রেজিস্টারে আমাদের নাম মুসলমানদের কোটায় লিপিবদ্ধ এবং আমরা মুখেও নিজেদের মুসলমান বলি ; সুতরাং জান্নাত এবং নবী (সা)-এর মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে ওয়াদাকৃত সকল পুরস্কারের যোগ্য হকদার আমরাই।

এই ফয়সালা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধু দাবি করলে, মুসলমান নাম লিপিবদ্ধ করলে অথবা মুসলমানের ঔরসে কিংবা মুসলমানদের আবাসভূমিতে জন্মগ্রহণ করলেই প্রকৃত মুসলমান

হয় না, বরং মুসলমান হওয়ার জন্য পরিপূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ করা অপরিহার্য। ইসলামের অর্থ আত্মসমর্পণ। দ্বিতীয়—সৎকর্ম অর্থাৎ সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমল করাও জরুরী।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কোরআন মজীদের এই হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও অনেক মুসলমান উপরোক্ত ইহুদী ও খৃস্টানী ভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছে। তারা আল্লাহ্, রাসূল, পরকাল ও কিয়ামতের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে বংশগত মুসলমান হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করতে শুরু করেছে। কোরআন ও হাদীসে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য সম্পর্কে মুসলমানদের সাথে যেসব অঙ্গীকার করা হয়েছে, তারা নিজেকে সেগুলোর যোগ্য হকদার মনে করে সেগুলোর পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করছে। অতঃপর সেগুলো পূর্ণ হওয়ার লক্ষণ দেখতে না পেয়ে কোরআন ও হাদীসের অঙ্গীকার সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। তারা লক্ষ্য করে না যে, কোরআন নিছক বংশগত মুসলমানদের সাথে কোন অঙ্গীকার করেনি—যতক্ষণ না তারা নিজেদের ইচ্ছাকে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সা)-এর ইচ্ছার অধীন করে দেয়। بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ আয়াতের সারমর্ম তাই।

আজকাল সমগ্র বিশ্বের মুসলমান নানাবিধ বিপদাপদ ও সঙ্কটে নিমজ্জিত। অনেক অর্বাচীনের ধারণা—এ অবস্থার জন্য সম্ভবত আমাদের ইসলামই দায়ী। কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইসলাম নয় বরং ইসলামকে পরিহার করাই এর জন্য দায়ী। আমরা ইসলামের শুধু নামটুকুই রেখেছি ; আমাদের মধ্যে ইসলামের বিশ্বাস, চরিত্র, আমল ইত্যাদি কিছুই নেই। কবির ভাষায়— وضع میں تم ہیں نصاری تو تمدن میں ہنود (চালচলনে তোমরা খৃস্টান আর সংস্কৃতিতে হিন্দু)।

এরপর ইসলাম ও মুসলমানের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণের জন্য অপেক্ষা করার অধিকার কি আমাদের থাকতে পারে ?

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আমরা যাই হই ইসলামেরই নাম নিই এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও রসূল (সা)-কেই স্মরণ করি। পক্ষান্তরে যেসব কাফির খোলাখুলিভাবে আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ইসলামের নাম মুখে উচ্চারণ করাও পছন্দ করে না, তারাই আজ বিশ্বের বুকে সব দিক দিয়ে উন্নত, তারাই বিশাল রাষ্ট্রের অধিকারী এবং তারাই বিশ্বের শিল্প ও ব্যবসায়ের ইজারাদার। দুষ্কর্মের শাস্তি হিসাবেই যদি আজ আমরা সর্বত্র লাঞ্ছিত ও পদদলিত, তবে কাফির ও পাপাচারীদের সাজা আরও বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলেই এ প্রশ্নের অবসান হয়ে যায়।

প্রথমত, এর কারণ এই যে, মিত্র ও শত্রুর সাথে একই রকম ব্যবহার করা হয় না। মিত্রের দোষ পদে-পদে ধরা হয়। নিজ সন্তান ও শিষ্যকে সামান্য বিষয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু শত্রুর সাথে তেমন ব্যবহার করা হয় না। তাকে অবকাশ দেওয়া হয় এবং সময় আসলে হঠাৎ পাকড়াও করা হয়।

মুসলমান যতক্ষণ ঈমান ও ইসলামের নাম উচ্চারণ করে, আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও ভালবাসা দাবি করে, ততক্ষণ সে বন্ধুরই তালিকাভুক্ত। ফলে তার মন্দ আমলের সাজা সাধারণত দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়—যাতে পরকালের বোঝা হালকা হয়ে যায়। কাফিরের অবস্থা এর বিপরীত। সে বিদ্রোহী ও শত্রুর আইনের অধীন। দুনিয়াতে হালকা শাস্তি দিয়ে তার শাস্তির মাত্রা হ্রাস করা হয় না। তাকে পুরোপুরি শাস্তির মধ্যেই নিক্ষেপ করা হবে। "দুনিয়া মুমিনের জন্য বন্দীশালা, আর কাফিরের জন্য জান্নাত।"—মহানবী (সা)-এর এ উক্তির তাৎপর্যও তাই।

মুসলমানদের অবনতি ও অস্থিরতা এবং কাফিরদের উন্নতি ও প্রশান্তির মূলে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক কর্মেরই ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এক কর্ম দ্বারা অন্য কর্মের বৈশিষ্ট্য অর্জিত হতে পারে না। উদাহরণত ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আর্থিক উন্নতি আর ওষুধপত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শারীরিক সুস্থতা। এখন যদি কেউ দিবারাত্র ব্যবসায়ে মগ্ন থাকে, অসুস্থতা ও তার চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ না দেয়, তবে শুধু ব্যবসায়ের কারণে সে রোগের কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে না। এমনিভাবে কেউ ওষুধপত্র ব্যবহার করেই ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আর্থিক উন্নতি লাভ করতে পারে না। কাফিরদের পার্থিব উন্নতি এবং আর্থিক প্রাচুর্য তাদের কুফরের ফলশ্রুতি নয়, যেমন মুসলমানদের দারিদ্র্য ও অস্থিরতা ইসলামের ফলশ্রুতি নয় বরং কাফিররা যখন পরকালের চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে পরিপূর্ণভাবে জাগতিক অর্থ-সম্পদ ও আরাম-আয়েশের পেছনে আত্মনিয়োগ করছে— ব্যবসা, শিল্প, কৃষি ও রাজনীতির লাভজনক পন্থা অবলম্বন করছে এবং ক্ষতিকর পন্থা থেকে বিরত থাকছে, তখনই তারা জগতে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে। তারাও যদি আমাদেরই মত ধর্মের নাম নিয়ে বসে থাকত এবং জাগতিক উন্নতির লক্ষ্যে যথাবিহিত চেষ্টা-সাধনা না করত তবে তাদের কুফর তাদেরকে অর্থ-সম্পদ ও রাষ্ট্রের মালিক বানাতে পারত না। এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে, আমাদের (তথাকথিত নামের) ইসলাম আমাদের সামনে সকল বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে ? ইসলাম ও ঈমান সঠিক মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তার আসল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পারলৌকিক মুক্তি ও জান্নাতের অফুরন্ত শান্তি লাভ। উপযুক্ত চেষ্টা-সাধনা না করা হলে ইসলাম ও ঈমানের ফলশ্রুতিতে জগতে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের প্রাচুর্য লাভ করা অবশ্যম্ভাবী নয়।

একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যে কোন দেশে যে কোন মুসলমান যদি ব্যবসা, শিল্প ও রাজনীতির বিশুদ্ধ মূলনীতি শিক্ষা করে তদনুযায়ী কাজ করে, তবে সেও কাফিরদের অর্জিত জাগতিক ফলাফল লাভে বঞ্চিত হয় না।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, জগতে আমাদের দারিদ্র্য, পরমুখাপেক্ষিতা, বিপদাপদ ও সঙ্কট ইসলামের কারণে নয়, বরং এগুলো একদিকে ইসলামী চরিত্র ও কর্মকাণ্ড পরিহার করার এবং অন্যদিকে ঐ সমস্ত তৎপরতা থেকে বিমুখতারই পরিণতি যদ্দ্বারা আর্থিক প্রাচুর্য অর্জিত হয়ে থাকে।

পরিতাপের বিষয়, ইউরোপীয়দের সাথে মেলামেশার সুবাদে আমরা তাদের কাছ থেকে শুধু কুফর, পরকালের প্রতি উদাসীনতা, নির্লজ্জতা, অসচ্চরিত্রতা প্রভৃতি ঠিকই শিখে নিয়েছি, কিন্তু তাদের ঐসব কর্মকাণ্ড শিক্ষা করিনি, যদ্দ্বারা তারা জগতে সাফল্য অর্জন করেছে। উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও সাধনা, লেনদেনে সততা, জগতে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের লক্ষ্যে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে ইসলামেরই শিক্ষা ছিল, কিন্তু আমরা তাদের দেখেও তাদের অনুকরণ করার চেষ্টা করিনি। এমতাবস্থায় দোষ ইসলামের, না আমাদের?

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপে অবলম্বন না করলে শুধু বংশগতভাবে ইসলামের নাম ব্যবহারের দ্বারা কোন শুভ ফল আশা করা যায় না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ۚ أُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَّدْخُلُوْهَآ إِلَّا خَآئِفِيْنَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

(১১৪) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড় জালিম আর কে ? এদের পক্ষে মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধেয় নয়, অবশ্য ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়। ওদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। (১১৫) পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই ! অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ্ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কেবলা পরিবর্তনের সময় ইহুদীরা বিভিন্ন ধরনের আপত্তি উত্থাপন করে স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন লোকদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার কাজে লিপ্ত ছিল। এসব সন্দেহ অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করলে এর অনিবার্য পরিণতি ছিল রেসালতের অস্বীকৃতি এবং নামায বর্জন। নামায বর্জনের ফলে মসজিদ উজাড় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কাজেই ইহুদীরা যেন নিজেদের অপকর্মের মাধ্যমে নামায বর্জন এবং মসজিদসমূহকে [বিশেষ করে মসজিদে নববীকে] জনশূন্য করার ষড়যন্ত্রেও সচেষ্ট ছিল। এছাড়া অতীতে রোম সম্রাটদের মধ্যে যেহেতু কিছু সংখ্যক ছিলেন খৃস্ট ধর্মাবলম্বী,এ জন্য সাধারণভাবে রোম সম্রাটদের কার্যকলাপের প্রতি খৃস্টানরা কখনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করত না। এ রোম সম্রাটরাই অতীতে একবার সিরিয়ার ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহও হয়েছিল। তখন কোন কোন অর্বাচীনের হাতে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদের অবমাননা ঘটে এবং এ অস্থিরতার কারণে মসজিদে নামায ও যিকর অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। এভাবে খৃস্টানদের পূর্বপুরুষেরা নামায বর্জন ও মসজিদ উজাড় করার পথিকৃতরূপে চিহ্নিত হয়। এই অপকর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করার কারণে খৃস্টানদেরও এ অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বায়তুল মোকাদ্দাস অভিযানকারী এ সম্রাটের নাম ছিল তায়তোস। খৃস্টানরা ইহুদীদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত। উপরোক্ত ঘটনার মধ্যে ইহুদীদের অবমাননা নিহিত ছিল। এ কারণে খৃস্টানরা সম্রাট তায়তোসের অপকর্মের কাহিনীর নিন্দা করত না। এতদ্ব্যতীত মক্কা বিজয়ের পূর্বে রসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করে কা'বা গৃহের তওয়াফ ও নামায আদায় করার ইচ্ছা করলেন, তখন মুশরিকরা তাঁকে বাধা দান করে। ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি

নামায আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। এভাবে মুশরিকরাও মসজিদে হারামে (কা'বাগৃহ) ইবাদতকারীর পথ রোধ করার কাজে সচেষ্ট হয়। (এসব কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে এ কাজের দোষ প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ) ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালিম আর কে যে আল্লাহ্র মসজিদসমূহে (মক্কার মসজিদে-হারাম, মদীনার মসজিদে নববী এবং মসজিদে বায়তুল মোকাদ্দাস প্রভৃতি সব মসজিদই এর অন্তর্ভুক্ত) তাঁর নাম উচ্চারণ (ও ইবাদত) করতে বাধা দেয় এবং সে (মসজিদ)-গুলোকে জনশূন্য (ও পরিত্যক্ত) করতে চেষ্টা করে ? তাদের পক্ষে কখনও নিঃসংকোচ (ও নির্ভীকচিত্তে) মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধেয় নয়। (বরং প্রবেশকালে ভয়-ভীতি, সম্মান ও শিষ্টাচার সহকারে প্রবেশ করাই বিধেয় ছিল। যখন নির্ভীকচিত্তে ভেতরে প্রবেশেরই অধিকার নেই, তখন মসজিদের অবমাননা করার অধিকার এল কোত্থেকে ? একেই বলা হয়েছে জুলুম) তাদের জন্য ইহকালে রয়েছে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি।

(কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ আসার পর ইহুদীরা প্রশ্ন তোলে যে, মুসলমানরা এদিক থেকে সেদিকে কেন মুখ ফিরিয়ে নিল ? আল্লাহ্ তা'আলা এর উত্তরে বলেন,) পূর্ব ও পশ্চিম—সকল দিকই আল্লাহ্র (তবে তা তাঁর বাসস্থান নয়)।

(সব দিকের মালিক যখন তিনিই, তখন যে দিককে ইচ্ছা কেবলারূপে নির্ধারিত করতে পারেন। কারণ ইবাদতকারীদের মনের একাগ্রতা হাসিলের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট দিককে প্রতীক হিসাবে কেবলা নির্ণয় করা হয়। প্রত্যেক দিক থেকেই এ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ্ যে দিক সম্পর্কে নির্দেশ দেবেন, সে দিকই নির্ধারিত হবে। (নাউযুবিল্লাহ) উপাস্যের সত্তা যদি বিশেষ কোন দিকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত, তবে প্রয়োজনের খাতিরে সে দিককেই কেবলারূপে নির্ধারণ করা শোভন হতো ; কিন্তু সে পবিত্র সত্তা কোন দিকের মধ্যেই আবদ্ধ নন। তাই, তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাও, সে দিকেই আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা বিরাজমান। (কেননা) আল্লাহ্ স্বয়ং সকল দিক ও বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন, যেরূপ বেষ্টন করা তাঁর পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু বেষ্টনকারী ও অসীম হওয়া সত্ত্বেও ইবাদতের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ এই যে, (তিনি) সর্বজ্ঞ। (প্রত্যেক বিষয়ের উপযোগিতা সম্পর্কেই তিনি জ্ঞাত। কোন বিশেষ উপযোগিতার কারণেই তিনি কেবলা নির্ধারণের এ নির্দেশ দিয়েছেন)।

বয়ানুল-কোরআন থেকে উদ্ধৃতি ঃ (১) মসজিদসমূহ জনশূন্য করার প্রয়াসী দলটি জগতে লাঞ্ছিত হয়েছে। এসব জাতির সবাই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা ও করদাতায় পরিণত হয়েছে। এছাড়া কাফির হওয়ার কারণে পরকালে যে শাস্তি ভোগ করবে, তা সবারই জানা। মসজিদ জনশূন্য করার অপচেষ্টার দরুন পরকালে এই শাস্তির কঠোরতা আরো বৃদ্ধি পাবে। পূর্ববর্তী আয়াতে এই তিনটি দলেরই সত্যপন্থী হওয়ার যে দাবি বর্ণিত হয়েছিল, এ ঘটনা কতক পরিমাণে সে দাবির অসারতাও প্রমাণ করেছে যে, এহেন অপকর্ম করে সত্যপন্থী হওয়ার দাবি করা নিঃসন্দেহে লজ্জাকর।

(২) কেবলা নির্দিষ্ট করার একটি রহস্য উদাহরণস্বরূপ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাতে মুসলমানরা কা'বার পূজা করে বলে কোন কোন ইসলাম বিদ্বেষী যে অপবাদ রটনা করে, তা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়ে গেছে।

এর সারমর্ম এই যে, ইবাদত-উপাসনা আল্লাহ্ তা'আলারই করা হয় ; কিন্তু উপাসনার সময় মনের একাগ্রতা অপরিহার্য। এ একাগ্রতার জন্য উপাসনাকারীদের একটা সমষ্টিগত 'দিক'-এর গুরুত্বও প্রচুর। এর প্রমাণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা। দিকের ঐক্যের মাধ্যমে একাগ্রতা অর্জন করার উদ্দেশ্যেই শরীয়তে দিক নির্দিষ্টকরণ সিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপনের মোটেই অবকাশ নেই।

নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে এতে যদি কেউ দাবি করে যে, আমরাও এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই সামনে মূর্তি স্থাপন করে উপসনা করে থাকি, তবে প্রথমত তাদের এ দাবির কারণে মুসলিমদের উপর উপরোক্ত আপত্তি নতুনভাবে আরোপিত হয় না ; বরং তা খণ্ডিতই থাকে। এক্ষেত্রে এটাই আসল উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত, মুসলমান ও কাফিরদের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে সবাই বুঝতে পারে যে, মুসলিমরা যে বিশেষ প্রতীকের পূজা আদৌ করে না এবং কাফিররা যে শুধু প্রতীকেরই পূজা করে—একথা সর্ববাদীসম্মত।

তৃতীয়ত, একধাপ নীচে নেমে বলা যায় যে, এ দাবি মেনে নিলেও এ নির্দিষ্টকরণের পক্ষে এমন শরীয়তের নির্দেশ উপস্থিত করা প্রয়োজন, যা রহিত হয়ে যায়নি। মুসলমান ছাড়া এরূপ শরীয়ত অন্য কারও কাছে নেই।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তত্ত্ব বর্ণনায় 'প্রতীক হিসাবে' শব্দটি যোগ করার কারণ এই যে, খোদায়ী বিধি-বিধানের রহস্য সম্পূর্ণ শেষ করে ও সীমাবদ্ধ করে হৃদয়ঙ্গম করা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। সুতরাং এ নির্দেশের মধ্যেও হাজারো কারণ থাকতে পারে। দু'-একটি বুঝে ফেললেই তাতে সীমাবদ্ধতা এবং অন্যগুলোর অস্বীকৃতি প্রমাণিত হয় না।

'সেদিকেই আল্লাহ্ বিরাজমান', 'আল্লাহ্ বেষ্টনকারী' এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়বস্তুর ব্যাপারে অধিক তথ্যানুসন্ধান সমীচীন নয়। কেননা, আল্লাহ্র সত্তা হৃদয়ঙ্গম করা যেমন কোন বান্দার পক্ষে সম্ভবপর নয়, তেমনি তাঁর সিফাতও মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উর্ধ্বে। মোটামুটিভাবে এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা দরকার। এর চাইতে বেশির জন্য মানুষ আদিষ্ট নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

ঘটনাটি এই যে, ইসলাম-পূর্বকালে ইহুদীরা হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে হত্যা করলে খৃষ্টানরা তার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। তারা ইরাকের একজন অগ্নি-উপাসক সম্রাট তায়তোসের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর নেতৃত্বাধীনে সিরিয়ার ইহুদীদের উপর আক্রমণ চালায়—তাদের হত্যা ও লুণ্ঠন করে, তওরাতের কপিসমূহ জ্বালিয়ে ফেলে, বায়তুল মোকাদ্দাসে আবর্জনা ও শূকর নিক্ষেপ করে, মসজিদের প্রাচীর ক্ষত-বিক্ষত করে সমগ্র শহরটিকে জনমানবহীন বিরানায় পরিণত করে। এতে ইহুদীদের শক্তি পদদলিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মহানবী (সা)-এর আমল পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাস এমনিভাবে পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল।

ফারুকে-আযম হযরত উমর (রা)-এর খেলাফত আমলে যখন সিরিয়া ও ইরাক বিজিত হয়, তখন তাঁরই নির্দেশক্রমে বায়তুল-মোকাদ্দাস পুনর্নির্মিত হয়। এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমস্ত সিরিয়া ও বায়তুল মোকাদ্দাস মুসলমানদের অধিকারে ছিল। অতঃপর বায়তুল মোকাদ্দাস মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয় এবং প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কাল পর্যন্ত ইউরোপীয় খৃস্টানদের অধিকারে থাকে। অবশেষে হিজরী ষষ্ঠ শতকে সুলতান সালাহ্উদ্দীন আইয়ুবী বায়তুল মোকাদ্দাস পুনর্দখল করেন।

তওরাতের কপিসমূহে অগ্নিসংযোগ করা, বায়তুল মোকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত ও জনশূন্য করার মত রোমীয় খৃস্টানদের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এই বক্তব্য কোরআনের ভাষ্যকার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের। হযরত ইবনে যায়েদ প্রমুখ অপরাপর ভাষ্যকার শানে নুযুল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, হোদায়বিয়ার ঘটনায় মক্কায় মুশরিকরা যখন রসূল (সা)-কে কা'বা প্রাঙ্গণে প্রবেশ এবং তাঁর তওয়াফে বাধা প্রদান করে, তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

ইবনে-জরীর প্রথম রেওয়ায়েতকে এবং ইবনে কাসীর দ্বিতীয় রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

যাহোক, ভাষ্যকারদের মতে আয়াতের শানে নুযুল উপরোক্ত দু'টি ঘটনার মধ্য থেকেই কোন একটি হবে। কিন্তু বর্ণনায় সাধারণ শব্দের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র আইনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে–যাতে নির্দেশটিকে বিশেষ করে এসব খৃস্টান ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করা না হয় ; বরং বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করা হয়। এ কারণেই আয়াতে বিশেষভাবে বায়তুল-মোকাদ্দাসের নামোল্লেখের পরিবর্তে 'আল্লাহ্র মসজিদসমূহ' বলে সব মসজিদের ক্ষেত্রেই নির্দেশটিকে ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে। এসব আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার কোন মসজিদে যিকর করতে বাধা দেয় অথবা এমন কোন কাজ করে, যার দরুন মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়ে, সে সবচাইতে বড় জালিম।

মসজিদসমূহের মাহাত্ম্যের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে ভয়, সম্মান, বিনয় ও নম্রতা সহকারে প্রবেশ করা কর্তব্য—যেমন, কোন প্রভাবশালী সম্রাটের দরবারে প্রবেশ করার সময় করা হয়।

এ আয়াত থেকে কতিপয় প্রয়োজনীয় মাসআলা এবং বিধানও প্রমাণিত হয়।

প্রথমত, শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। বায়তুল-মোকাদ্দাস, মসজিদে-হারাম ও মসজিদে নববীর অবমাননা যেমন বড় জুলুম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা সমভাবে প্রয়োজ্য। তবে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত। মসজিদে-হারামে এক রাকাআত নামাযের সওয়াব একলক্ষ রাকাআতের নামাযের সমান এবং মসজিদে-নববী ও বায়তুল-মোকাদ্দাসের পঞ্চাশ হাজার রাকাআতের নামাযের সমান। এই তিন মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্তর থেকে সফর করে সেখানে পৌঁছা বিরাট সওয়াব ও বরকতের বিষয়। কিন্তু অন্য কোন মসজিদে নামায পড়া উত্তম মনে করে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসতে বারণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মসজিদে যিকর ও নামাযে বাধা দেওয়ার যত পন্থা হতে পারে, সে সবগুলোই হারাম। তন্মধ্যে একটি পন্থা এই যে, মসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে নামায ও তিলাওয়াত করতে পরিষ্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মসজিদে হট্টগোল করে অথবা আশপাশে গান-বাজনা করে মুসল্লীদের নামায ও যিকরে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

এমনিভাবে নামাযের সময়ে যখন মুসল্লীরা নফল নামায, তসবীহ, তিলাওয়াত ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকেন, তখন মসজিদে সরবে তিলাওয়াত ও যিকর করা এবং নামাযীদের নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করাও বাধা প্রদানেরই নামান্তর। এ কারণেই ফিকহ্‌বিদগণ একে না-জায়েয আখ্যা দিয়েছেন। তবে, মসজিদে যখন মুসল্লী না থাকে, তখন সরবে যিকর অথবা তিলাওয়াত করায় দোষ নেই।

এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, যখন মুসল্লীরা নামায, তসবীহ ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে, তখন মসজিদে নিজের জন্য অথবা কোন ধর্মীয় কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করাও নিষিদ্ধ।

তৃতীয়ত, মসজিদ জনশূন্য করার জন্য সম্ভবপর যত পন্থা হতে পারে, সবই হারাম। খোলাখুলিভাবে মসজিদকে বিধ্বস্ত করা ও জনশূন্য করা যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়ে। মসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ এই যে, সেখানে নামায পড়ার জন্য কেউ আসে না কিংবা নামাযীর সংখ্যা হ্রাস পায়। কেননা, প্রাচীর ও কারুকার্য দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মসজিদ আবাদ হয় না ; বরং তা আবাদ হয় আল্লাহ্‌র যিকরকারী মুসল্লীদের দ্বারা। তাই কোরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَآتَى الزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ .

অর্থাৎ—প্রকৃতপক্ষে মসজিদ আবাদ হয় ঐসব লোক দ্বারা, যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করে না।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন–কিয়ামত নিকটবর্তী হলে মুসলমানদের মসজিদসমূহ বাহ্যত আবাদ, কারুকার্যখচিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হবে জনশূন্য। এসব মসজিদে নামাযীর উপস্থিতি হ্রাস পাবে।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—ভদ্রতা ও মানবতার কাজ ছয়টি। তিনটি মুকীম বা স্বগৃহে বসবাসকালীন ও তিনটি মুসাফির বা সফরকালীন। স্বগৃহে বসবাসকালীন তিনটি হচ্ছে এই–(১) কোরআন তিলাওয়াত করা, (২) মসজিদসমূহ আবাদ করা এবং (৩) বন্ধু-বান্ধবের এমন সংগঠন তৈরি করা, যারা আল্লাহ্ ও দীনের কাজে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে সফরকালীন তিনটি হচ্ছে এই–(১) আপন পাথেয় থেকে দরিদ্র সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করা, (২) সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করা এবং (৩) সফর-সঙ্গীদের সাথে হাসি-খুশি, আমোদ-প্রমোদ ও প্রফুল্লচিত্ত হওয়া। তবে আমোদ-প্রমোদে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা শর্ত।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ উক্তিতে মসজিদ আবাদ করার অর্থ, সেখানে বিনয় নম্রতা সহকারে উপস্থিত হওয়া এবং যিকর ও তিলাওয়াতে নিয়োজিত থাকা। পক্ষান্তরে

মসজিদ জনশূন্য হওয়া অর্থ হচ্ছে সেখানে নামাযী না থাকা কিংবা কমে যাওয়া অথবা এমন কারণের সমাবেশ ঘটা, যদ্দ্বারা বিনয় ও নম্রতা বিঘ্নিত হয়।

যদি হোদায়বিয়ার ঘটনা এবং মসজিদে হারামে প্রবেশ ও মুশরিকদের বাধা প্রদান আয়াতের শানে নুযুল হয়, তবে এ আয়াত দ্বারা আরও বোঝা যায় যে, মসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ মসজিদকে বিধ্বস্ত করাই নয় বরং যে উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মিত হয় অর্থাৎ নামায ও আল্লাহ্র যিকর, সে উদ্দেশ্যে অর্জিত না হলে কিংবা কম হলেও মসজিদকে জনশূন্য বলা হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে রসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কেরামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা আপনাকে মক্কা ও বায়তুল্লাহ থেকে হিজরত করতে বাধ্য করেছে, মদীনায় পৌঁছার পর প্রথম দিকে ষোল-সতের মাস পর্যন্ত আপনাকে বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এতে আপনার কোন ক্ষতি হয়নি এবং এ ব্যাপারে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ, আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা কোন বিশেষ দিকে সীমাবদ্ধ নয়, তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। পূর্ব পশ্চিম তাঁর কাছে সমান। নামাযের কেবলা কা'বা হোক কিংবা বায়তুল-মোকাদ্দাস হোক—এতে কিছুই যায় আসে না। আল্লাহ্র নির্দেশ পালন উভয় জায়গায়ই সওয়াবের কারণ।

কাজেই যখন বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশ ছিল, তখন তাতেই সওয়াব ছিল এবং যখন কা'বার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন এতেই সওয়াব। আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। বান্দা নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্র মনোযোগ উভয় অবস্থাতেই সমান।

কয়েক মাসের জন্য বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেবলা সাব্যস্ত করার নির্দেশ দিয়ে কার্যক্ষেত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, কোন বিশেষ স্থান অথবা দিককে কেবলা সাব্যস্ত করার কারণ এই নয় যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্ পাক সেই স্থান অথবা দিকের মধ্যেই রয়েছেন, অন্যত্র নেই। বরং আল্লাহ্ তা'আলা সর্বত্র এবং সবদিক সমান মনোযোগ সহকারে তিনি বিদ্যমান। রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও এ বিষয়টি নিজের বাণীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে কোন বিশেষ দিককে সারা বিশ্বের কেবলা সাব্যস্ত করার পেছনে অন্যান্য রহস্য ও উপযোগিতাও থাকতে পারে। কারণ আল্লাহ্র মনোযোগ যখন কোন বিশেষ দিক অথবা স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তখন নামায পড়ার ব্যাপারে দুই পন্থাই অবলম্বন করা সম্ভব। প্রথমত, প্রত্যেককেই যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই মুখ করে নামায পড়ার স্বাধীনতা দেওয়া। দ্বিতীয়ত, সবার জন্য বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করে দেওয়া। প্রথমাবস্থায় একটি বিশৃঙ্খল দৃশ্য সামনে ভেসে উঠবে। দশজন একত্রে নামায পড়লে প্রত্যেকের মুখ থাকবে পৃথক পৃথক দিকে এবং প্রত্যেকের কেবলা হবে পৃথক পৃথক। দ্বিতীয় অবস্থায় শৃঙ্খলা ও একতার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠবে। এসব রহস্যের কারণে সারা বিশ্বের কেবলা এক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এখন তা বায়তুল-মোকাদ্দাস হোক অথবা কা'বাগৃহে, উভয় স্থানই পবিত্র ও পুণ্যময়। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক যুগের উপযুক্ত বিধি-বিধান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে। এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেবলা রাখা হয়েছে। এরপর হুযূর আকরাম (সা) ও সাহাবায়ে-কেরামের ইচ্ছা অনুযায়ী এ নির্দেশ রহিত করে কা'বাকে সারা বিশ্বের কেবলা স্থির করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ .

অর্থাৎ—আমি লক্ষ্য করছি, কা'বাকে কেবলা বানিয়ে দেওয়ার আন্তরিক বাসনার কারণে আপনি বারবার আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকেন যে, হয় তো ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছেন। এ কারণে আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ফিরিয়ে দেব, যা আপনি কামনা করেন। এখন থেকে আপনি নামাযে থেকেই স্বীয় মুখ মসজিদে-হারামের দিকে ফিরিয়ে নিন। এ নির্দেশ বিশেষভাবে শুধু আপনার জন্যই নয়, বরং সমগ্র উম্মতকেও দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা যেখানেই থাক, এমনকি বায়তুল-মোকাদ্দাসের অভ্যন্তরে থাকলেও নামাযে মুখমণ্ডল মসজিদে হারামের দিকে ফিরিয়ে নেবে।

মোটকথা, وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ আয়াতটিতে কেবলামুখী হওয়ার পূর্ণস্বরূপ বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, এর উদ্দেশ্য (নাঊযুবিল্লাহ) বায়তুল্লাহ্ অথবা বায়তুল-মোকাদ্দাসের পূজা করা নয় কিংবা এ দুটি স্থানের সাথে আল্লাহ্র পবিত্র সত্তাকে সীমিত করে নেওয়াও নয়। তাঁর সত্তা সমগ্র বিশ্বকে বেষ্টন করে রেখেছে এবং সর্বত্রই তাঁর মনোযোগ সমান। এরপরও বিভিন্ন রহস্যের কারণে বিশেষ স্থান অথবা দিককে কেবলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

আয়াতের এই বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট ও অন্তরে বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত হুযূরে আকরাম (সা) ও সাহাবায়ে-কেরামকে হিজরতের প্রথম দিকে ষোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার আদেশ দেওয়া হয়। এভাবে কার্যত বলে দেওয়া হয় যে, আমার মনোযোগ সর্বত্র রয়েছে। নফল নামাযসমূহের এক পর্যায়ে এই নির্দেশ অব্যাহত রাখা হয়েছে। সফরে কোন ব্যক্তি উট, ঘোড়া ইত্যাদি যানবাহনে সওয়ার হয়ে পথ চললে তাকে তদবস্থায় ইশারায় নফল নামায পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তার জন্য যানবাহন যেদিকে চলে সেদিকে মুখ করাই যথেষ্ট।

কোন কোন মুফাস্‌সির فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ আয়াতকে এই নফল নামাযেরই বিধান বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই বিধান সে সমস্ত যানবাহনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাতে সওয়ার হয়ে চলার সময় কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন। পক্ষান্তরে যেসব যানবাহনে সওয়ার হলে কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন নয়, যেমন রেলগাড়ী, সামুদ্রিক জাহাজ, উড়োজাহাজ উত্যাদিতে নফল নামাযেও কেবলার দিকেই মুখ করতে হবে। তবে নামাযরত অবস্থায় রেলগাড়ী অথবা জাহাজের যদি দিক পরিবর্তন হয়ে যায় এবং আরোহীর পক্ষে কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সেই অবস্থাতেই নামায পূর্ণ করবে।

এমনিভাবে কেবলার দিক সম্পর্কে নামাযীর জানা না থাকলে, রাত্রির অন্ধকারে দিক নির্ণয় করা কঠিন হলে এবং বলে দেওয়ার লোক না থাকলে সেখানেও নামাযী অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকই তার কেবলা বলে গণ্য হবে। নামায আদায় করার পর যদি দিকটি ভ্রান্তও প্রমাণিত হয়, তবুও তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে—পুনরায় পড়তে হবে না।

আয়াতে এই বর্ণনায় হুযূর (সা)-এর আমল এবং উল্লিখিত খুঁটিনাটি মাসআলা দ্বারা কেবলামুখী হওয়া সম্পর্কিত শরীয়তের নির্দেশটির পূর্ণ স্বরূপ ফুটে উঠেছে।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿١١٦﴾

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾

(১১৬) তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব কিছু থেকে পবিত্র ; বরং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর আজ্ঞাধীন। (১১৭) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি স্রষ্টা। যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[কোন কোন ইহুদী হযরত উযাইর (আ)-কে এবং খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলার পুত্র বলে দাবি করত। এছাড়া আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে 'আল্লাহ্র কন্যা' বলে অভিহিত করত। বিভিন্ন আয়াতে ওদের এসব উক্তি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এসব উক্তির ত্রুটি ও অসারতা বর্ণনা করেছেন।] তারা (বিভিন্ন শিরোনামে) বলে, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। সোবাহানাল্লাহ ! (কি বাজে কথা !) বরং (তাঁর সন্তান ধারণ) যুক্তির দিক দিয়েও সম্ভবপর নয়। কারণ আল্লাহ্র সন্তান হয় ভিন্ন জাতি হবে, না হয় সমজাতি হবে। যদি ভিন্ন জাতি হয় তবে ভিন্ন জাতি সন্তান হওয়া একটি ত্রুটি। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত। যুক্তির দিক দিয়ে এটা স্বীকৃত এবং কোরআন-হাদীসের দিক দিয়েও প্রমাণিত। যেমন, سبحانه শব্দের মাধ্যমে তাই বোঝা যাচ্ছে। পক্ষান্তরে সন্তান যদি সমজাতির হয়, তবে তা বাতিল হওয়ার এক কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন সমজাতি নেই। কারণ, পূর্ণত্বের যে সব গুণ-বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্র সত্তার অপরিহার্য অঙ্গ, সে সবই আল্লাহ্র সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত—অন্যের মধ্যে তা নেই। কাজেই অন্যের পক্ষে আল্লাহ হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং আল্লাহ্র সন্তান সমজাতি হওয়াও বাতিল। পূর্ণত্বের যাবতীয় সিফাত যে আল্লাহ্র সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত, এখানে তারই প্রমাণ বর্ণিত হচ্ছে। প্রথমত, (নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে,) সবই বিশেষভাবে আল্লাহ্র মালিকানাধীন। দ্বিতীয়ত (মালিকানাধীন হওয়ার সাথে সাথে) সবাই তাঁর আজ্ঞাধীনও বটে। (এই অর্থে যে, শরীয়তের বিধি-বিধান কেউ কেউ এড়াতে পারলেও জীবন ও মৃত্যু প্রভৃতির বিধান কেউ এড়াতে পারে না। তৃতীয়ত, তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের একক স্রষ্টা। চতুর্থত, (তাঁর সৃষ্টিক্ষমতাও এমন বিরাট ও অভাবনীয় যে) যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের ইচ্ছা করেন, তখন (মাত্র) তাকে একথাই বলেন, 'হয়ে যা'

(অতঃপর) তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। (যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, কারিগর কিংবা কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয় না। এই চারটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে নেই। যারা আল্লাহ্‌র সন্তান আছে বলে দাবি করে, তাদের কাছেও একথা স্বীকৃত। সুতরাং প্রমাণ সব দিক দিয়েই পূর্ণ হয়ে গেল)।

জ্ঞাতব্য ঃ (১) বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ফেরেশতা নিযুক্ত করা- যেমন, বৃষ্টিবর্ষণ ও রিযিক পৌঁছানো ইত্যাদি কোন না কোন রহস্যের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন উপকরণ ও শক্তিকে কাজে লাগানোও তেমনি। এর কোনটিই এজন্য নয় যে, মানুষ এগুলোকে ক্ষমতাশালী স্বীকার করে তাদের কাছে সাহায্য চাইবে।

(২) ইমাম বায়যাভী বলেন, পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে আদি কারণ হওয়ার দরুন আল্লাহ্‌কে 'পিতা' বলা হতো। একেই মূর্খরা জন্মদাতা অর্থ বুঝে নিয়েছে। ফলে এরূপ বিশ্বাস করা অথবা বলা কুফর সাব্যস্ত হয়েছে। অনিষ্টের ছিদ্রপথ বন্ধ করার লক্ষ্যে বর্তমানেও এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের অনুমতি নেই।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿١١٨﴾

(১১৮) যারা কিছু জানে না, তারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন না অথবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন কেন আসে না ? এমনিভাবে তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারাও তাদেরই অনুরূপ কথা বলেছে। তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয় আমি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি তাদের জন্য, যারা প্রত্যয়শীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কোন কোন মূর্খ [ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিক রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরোধিতায়] বলে, (স্বয়ং) আল্লাহ্, আমাদের সাথে (ফেরেশতাদের মাধ্যম ছাড়া) কেন কথা বলেন না (যেমন, নিজে ফেরেশতাদের সাথে কথা বলেন, এই কথাবার্তায় হয় নিজেই আমাদের বিধি-বিধান বলে দিবেন—যাতে একজন রসূলের প্রয়োজন না থাকে, না হয় অন্তত এতটুকু বলে দেবেন যে, মুহাম্মদ আমার রসূল। এরূপ হলে আমরা তাঁর রিসালত মেনে নিয়ে তাঁরই আনুগত্য করব)। অথবা (কথা না বললে) আমাদের কাছে (রিসালত প্রমাণের অন্য) কোন নিদর্শন কেন আসে না? (আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে একে মূর্খতাসুলভ রীতি বলে আখ্যা দিচ্ছেন যে,) এমনিভাবে

তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারাও তাদের অনুরূপ (মূর্খতাসুলভ) কথা বলেছে। (সুতরাং বোঝা গেল যে, এই উক্তি কোনরূপে গভীরতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার উপর ভিত্তিশীল নয় ; এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এই উক্তির কারণ বর্ণনা করেছেন যে,) তাদের (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মূর্খদের) অন্তর (বোকামিতে) একই রকম। (এ কারণেই সবার মুখ থেকে একই রকম কথা বের হয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উক্তির জওয়াব দিচ্ছেন। তাদের উক্তির প্রথম অংশ ছিল নিরেট বোকামিপ্রসূত। কারণ তারা আপনাকে ফেরেশতা ও পয়গম্বরদের সমান যোগ্যতাসম্পন্ন বলতে প্রয়াস পেয়েছিল, যা একেবারেই অলীক। এ কারণেই এই অংশকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দ্বিতীয় অংশের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা এক নিদর্শনের কথা বলছ ; অথচ) আমি (রিসালত প্রমাণের বহু) উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি, কিন্তু তা তাদের জন্য (উপকারী ও যথেষ্ট) যারা বিশ্বাস করে। (কিন্তু আপত্তিকারীদের উদ্দেশ্য হলো হঠকারিতা। এ কারণে সত্যান্বেষীর দৃষ্টিতে তারা প্রকৃত সত্যের খোঁজ নিতে চায় না। সুতরাং এমন লোকদের সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব কে নেবে ?)

(ইহুদী ও খৃস্টানরা ছিল আসমানী কিতাবের অধিকারী। তাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকও ছিল। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, প্রচুর অকাট্য ও শক্তিশালী নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করা সত্ত্বেও সেগুলো অস্বীকার করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তাদেরকে মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন।)

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

---

(১১৯) নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। আপনি দোযখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(রসূলুল্লাহ্ [সা] ছিলেন 'রাহ্মাতুল্লিল-আলামীন'—সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যে রহমত। তাই কাফিরদের মূর্খতা, শত্রুতা ও কুফরের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা দেখে তিনি বিষণ্ন ও মনঃক্ষুণ্ন হয়ে পড়তেন। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সান্ত্বনার জন্যে বলেন, হে রসূল !) নিশ্চয় আপনাকে সত্য ধর্মসহ (সৃষ্টজীবের প্রতি) পাঠিয়েছি, যাতে আপনি (অনুগতদের) সুসংবাদ শোনাতে থাকেন ও (অবাধ্যদের প্রতি শাস্তির) ভীতি প্রদর্শন করতে থাকেন। (দোযখবাসীদের সম্পর্কে) আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না (যে, ওরা সত্যধর্ম কবূল না করে কেন দোযখে গেল ? আপনি নিজ দায়িত্ব পালন করতে থাকুন, কেউ মানল কি মানল না, সে চিন্তা আপনার করা উচিত নয়)।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۲۰﴾

(১২০) ইহুদী ও খৃস্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ্ প্রদর্শন করেন, তা-ই হলো সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহ্‌র কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কখনও সন্তুষ্ট হবে না আপনার প্রতি ইহুদী ও খৃস্টানরা ; যে পর্যন্ত না আপনি ওদের ধর্মের (সম্পূর্ণ) অনুসারী হয়ে যান। (অথচ তা অসম্ভব। সুতরাং ওদের সন্তুষ্ট হওয়াও অসম্ভব। যদি এ সমস্ত কথা তাদের মুখ থেকে অথবা অবস্থাদৃষ্টে প্রকাশ পায়, তবে) আপনি (পরিষ্কার ভাষায়) বলে দিন, (ভাই) আল্লাহ্ (হেদায়েতের জন্য) যে পথ প্রদর্শন করেন, (বাস্তবে) সেটিই (হেদায়েতের) সরল পথ। (বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামই সে পথ ; সুতরাং ইসলামই হলো হেদায়েতের পথ।) আপনার কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছার পর, যদি আপনি তাদের সে সমস্ত (ভ্রান্ত) ধারণাসমূহের অনুসরণ করেন, (যেগুলোকে তারা ধর্ম মনে করে ; কিন্তু বিকৃত ও কিছু রহিত হওয়ার ফলে এখন তা শুধু ভ্রান্ত ধারণার সমষ্টি হয়ে রয়েছে,) তবে (এমতাবস্থায়) আল্লাহ্‌র কবল থেকে আপনাকে উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী কেউ নেই। (বরং এজন্য আল্লাহ্‌র ক্রোধানলে পতিত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে। কিন্তু এরূপ হওয়া অসম্ভব। কারণ আল্লাহ্ অনন্তকাল আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন, একথা অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত রয়েছে। সুতরাং ক্রোধ অসম্ভব। উপরিউক্ত অনুসরণের ফলে এই অসম্ভাব্যতা অনিবার্য হয়েছিল। তাই তার পক্ষে অনুসরণ অসম্ভব। অনুসরণ ব্যতীত তাদের সন্তুষ্টিও সম্ভবপর নয়। সুতরাং এর আশা করাও বৃথা। কাজেই মন থেকে তা মুছে ফেলা দরকার।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

(১২১) আমি যাদেরকে গ্রন্থ দান করেছি, তারা তা যথাযথভাবে পাঠ করে। তারাই তৎপ্রতি বিশ্বাস করে। আর যারা তা অবিশ্বাস করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে আহলে-কিতাব শত্রুদের উল্লেখ এবং বিরোধীদের ঈমানের ব্যাপারে পূর্ণ নৈরাশ্যের কথা বর্ণিত হয়েছিল। এরপর কোরআনের রীতি অনুযায়ী আহলে-কিতাবদের বর্ণনা আসছে, যারা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর হুযূর (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুসরণ করছে। আল্লাহ্ বলেন,) আমি যাদেরকে (তওরাত ও ইঞ্জীল) গ্রন্থ (এই শর্তে) দান করেছি, (যে,) তারা তা যথার্থভাবে তিলাওয়াত করে (অর্থাৎ বোধশক্তিকে বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করার কাজে নিয়োগ করে এবং ইচ্ছাশক্তিকে সত্যের অনুসরণে ব্যবহার করে,) তারাই তৎপ্রতি (অর্থাৎ আপনার সত্যধর্ম ও ওহীর জ্ঞানের প্রতি) ঈমান আনে (ও বিশ্বাস স্থাপন করে)। আর যারা অবিশ্বাস করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে (অর্থাৎ ঈমানের ফলাফল থেকে বঞ্চিত হবে)।

يٰبَنِيٓ اِسۡرَآءِيۡلَ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتِيَ الَّتِيٓ اَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَاَنِّيۡ فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿١٢٢﴾ وَاتَّقُوۡا يَوۡمًا لَّا تَجۡزِيۡ نَفۡسٌ عَنۡ نَّفۡسٍ شَيۡـًٔا وَّلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٌ وَّلَا تَنۡفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمۡ يُنۡصَرُوۡنَ ﴿١٢٣﴾

---

(১২২) হে বনী ইসরাঈল! আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (১২৩) তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যেদিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও সুপারিশ ফলপ্রদ হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াত পর্যন্ত বনী ইসরাঈল সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বর্ণনা সমাপ্ত হয়েছিল। এ আয়াতে সেসব বিষয়বস্তুর প্রাথমিক ভূমিকা পুনর্বার বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলো ছিল এই ভূমিকারই পূর্ণ বিবরণ। পুনর্বার করার উদ্দেশ্য, আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে সাধারণ ও বিশেষ অনুগ্রহগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং ভীতি সঞ্চারের লক্ষ্যে কিয়ামতকে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করা। ভূমিকার বিশেষ বিষয়বস্তু বারবার উল্লেখের উদ্দেশ্য যেন তা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। কেননা, মোটামুটি কথাটিই আসল উদ্দেশ্য হয়ে

থাকে। সাধারণ বাক-পদ্ধতিতেও এ নিয়মকেই উৎকৃষ্ট মনে করা হয়। দীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করার পূর্বে সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট শিরোনামে মোটামুটি কথাটি ব্যক্ত করা হয়, যাতে পরবর্তী পূর্ণ বিবরণ বোঝার পক্ষে এই শিরোনামটি যথেষ্ট সহায়ক হয়। উপসংহারে সারমর্ম হিসাবে সংক্ষিপ্ত শিরোনামটি পুনরুল্লেখ করা হয়। উদাহরণত যেমন বলা হয়, অহঙ্কার খুবই ক্ষতিকর অভ্যাস ; এতে এক ক্ষতি এই, দ্বিতীয় ক্ষতি এই, তৃতীয় ক্ষতি এই। দশ-বিশটি ক্ষতি বর্ণনা করার পর উপসংহারে বলে দেওয়া হয়, মোটকথা, অহঙ্কার খুবই ক্ষতিকর অভ্যাস। এই নিয়ম অনুযায়ীই আয়াতে "ইয়া বনী ইসরাঈল"-এর পুনরুল্লেখ হয়েছে)।

হে ইয়াকুব (আ)-এর সন্তানবর্গ ! তোমরা আমার ঐসব অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা আমি বিভিন্ন সময়ে তোমাদেরকে দান করেছি এবং (আরও স্মরণ কর যে,) আমি (অনেক মানুষের উপর অনেক বিষয়ে) তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। তোমরা ঐ দিনকে (অর্থাৎ কিয়ামত দিবসকে) ভয় কর যেদিন কোন ব্যক্তি কারও পক্ষ থেকে কোন দাবি আদায় করতে পারবে না এবং কারও পক্ষ থেকে (পাওনার পরিবর্তে) কোন বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না কিংবা (ঈমান না থাকলে) কারও কোন সুপারিশও ফলপ্রদ হবে না এবং কেউ তাদের (বলপূর্বক) বাঁচাতে পারবে না।

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ
قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

---

(১২৪) যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও ! তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা (স্বীয় বিধি-বিধানের) কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন এবং তিনি তা পুরোপুরি পালন করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা (তাকে) বললেন, আমি তোমাকে (এর প্রতিদানে নবুয়ত দিয়ে অথবা উম্মত বাড়িয়ে) মানব জাতির নেতা করব। তিনি নিবেদন করলেন, আমার বংশধরের মধ্য থেকেও কোন কোনজনকে (নবুয়ত দিন)। উত্তর হলো, (তোমরা প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো ; কিন্তু এর রীতিনীতি শুনে নাও) আমার (এই নবুয়তের) অঙ্গীকার আইন অমান্যকারীদের পর্যন্ত পৌঁছবে না। (সুতরাং এ ধরনের লোকদের জন্য 'না'-ই হলো পরিষ্কার জওয়াব। তবে অনুগতদের মধ্য থেকে কেউ কেউ নবুয়তপ্রাপ্ত হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পয়গম্বর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিভিন্ন পরীক্ষা, তাতে তাঁর সাফল্য, পুরস্কার ও প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। হযরত খলীলুল্লাহ্ যখন স্নেহপরবশ হয়ে স্বীয় সন্তান-সন্ততির জন্যও এ পুরস্কারের প্রার্থনা জানালেন, তখন পুরস্কার লাভের জন্য একটি নিয়ম-নীতি বলে দেওয়া হলো। এতে হযরত খলীলুল্লাহ্র প্রার্থনাকে শর্তসাপেক্ষভাবে মঞ্জুর করে বলা হয়েছে যে, আপনার বংশধরগণও এই পুরস্কার পাবে, তবে তাদের মধ্যে যারা অবাধ্য ও জালিম হবে, তারা এ পুরস্কার পাবে না।

হযরত খলীলুল্লাহর পরীক্ষাসমূহ ও পরীক্ষার বিষয়বস্তু

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমত, যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যেই সাধারণত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ। কারও কোন অবস্থা অথবা গুণ-বৈশিষ্ট্যই তাঁর অজানা নয়। এমতাবস্থায় এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল ?

দ্বিতীয়ত, কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে ?

তৃতীয়ত, কি ধরনের সাফল্য হয়েছে ?

চতুর্থত, কি পুরস্কার দেওয়া হলো ?

পঞ্চমত, পুরস্কারের জন্য নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতির কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। এই পাঁচটি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর লক্ষ্য করুন ঃ

প্রথমত, পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল ? কোরআনের একটি শব্দ ربه (তাঁর পালনকর্তা) এ প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এ পরীক্ষার পরীক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। আর তাঁর 'আসমায়ে হুসনার' মধ্য থেকে এখানে 'রব' (পালনকর্তা) নামটি ব্যবহার করে রবুবিয়্যাতের (পালন কর্তৃত্বের) দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর অর্থ কোন বস্তুকে ধীরে ধীরে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌছানো ।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই পরীক্ষা কোন অপরাধের সাজা হিসাবে কিংবা অজ্ঞাত যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ছিল না ; বরং এর উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষার মাধ্যমে স্বীয় বন্ধুর লালন করে তাঁকে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌছানো। অতঃপর আয়াতে কর্মকে পূর্বে এবং কারককে পরে উল্লেখ করে ইবরাহীম (আ)-এর মহত্ত্বকে আরও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে—এ সম্পর্কে কোরআনে শুধু كلمات (বাক্যসমূহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীদের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ খোদায়ী বিধানসমূহের মধ্য থেকে দশটি, কেউ ত্রিশটি এবং কেউ কমবেশি অন্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এতে কোন বিরোধ নেই, বরং সবগুলোই ছিল হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পরীক্ষার বিষয়বস্তু। প্রখ্যাত তফসীরকার ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীরের অভিমত তা-ই।

আল্লাহর কাছে শিক্ষা বিষয়ক সূক্ষ্মদর্শিতার চাইতে চারিত্রিক দৃঢ়তার মূল্য বেশি

পরীক্ষার এসব বিষয়বস্তু পাঠশালায় অধীত জ্ঞান-অভিজ্ঞতার যাচাই কিংবা তৎসম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ছিল না, বরং তা ছিল চারিত্রিক মূল্যবোধ এবং কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়তা যাচাই করা।

এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র দরবারে যে বিষয়ে মূল্য বেশি, তা শিক্ষা বিষয়ক সূক্ষ্মদর্শিতা নয়, বরং কার্যগত ও চরিত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব।

এ ধরনের পরীক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই

আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-কে স্বীয় বন্ধুত্বের বিশেষ মূল্যবান পোশাক উপহার দেওয়া। তাই তাঁকে বিভিন্ন রকম কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। সমগ্র জাতি, এমনকি তাঁর আপন পরিবারের সবাই মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। সবার বিশ্বাস ও রীতি-নীতির বিপরীত একটি সনাতন ধর্ম তাঁকে দেওয়া হয়। জাতিকে এ ধর্মের দিকে আহ্বান জানানোর গুরু দায়িত্ব তাঁর কাঁধে অর্পণ করা হয়। তিনি পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মাধ্যমে নির্ভয়ে জাতিকে এক আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানান। বিভিন্ন পন্থায় তিনি মূর্তি পূজার নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে কার্যক্ষেত্রে তিনি মূর্তিসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। ফলে সমগ্র জাতি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। বাদশাহ্ নমরূদ ও তার পারিষদবর্গ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ্‌র খলীল প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এসব বিপদাপদ সত্ত্বেও হাসিমুখে নিজেকে অগ্নিতে নিক্ষেপের জন্য পেশ করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বন্ধুকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখে আগুনকে নির্দেশ প্রদান করলেন ঃ

قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ .

অর্থাৎ—আমি হুকুম দিয়ে দিলাম, হে অগ্নি, ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপত্তার কারণ হয়ে যাও।

নমরূদের অগ্নি সম্পর্কিত এ নির্দেশের মধ্যে ভাষা ছিল ব্যাপক। বস্তুত কোন বিশেষ স্থানের অগ্নিকে নির্দিষ্ট করে এ নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এ কারণে সমগ্র বিশ্বে যেখানেই অগ্নি ছিল, এ নির্দেশ আসা মাত্রই স্ব স্ব স্থানে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নমরূদের অগ্নি এর আওতায় পড়ে শীতল হয়ে গেল।

কোরআন بَرْدًا (শীতল) শব্দের সাথে سَلَامًا (নিরাপদ) শব্দটি যুক্ত করার কারণ এই যে, কোন বস্তু সীমাতিরিক্ত শীতল হয়ে গেলে তাও বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়ক, বরং মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। سلاما বলা না হলে অগ্নি বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়ক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল।

এ পরীক্ষা সমাপ্ত হলে জন্মভূমি ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেওয়া হয়। ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় স্বগোত্র ও মাতৃভূমিকেও হাসিমুখে ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনসহ সিরিয়ায় হিজরত করলেন।

انکس که ترا شناخت جان را چه کند
فرزند و عیال وخانماں را چه کند

অর্থ–যে ব্যক্তি তোমাকে চিনেছে সে তার জীবন, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন দিয়ে কি করবে ?

মাতৃভূমি ও স্বজাতি ত্যাগ করে সিরিয়ায় অবস্থান শুরু করতেই নির্দেশ এলো, বিবি হাজেরা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকেও স্থানান্তরে গমন করুন।-(ইবনে কাসীর)

জিবরাঈল (আ) আগমন করলেন এবং তাঁদের সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে কোন শস্য-শ্যামল বনানী এলেই হযরত খলীল বলতেন, এখানে অবস্থান করানো হোক। জিবরাঈল (আ) বলতেন, এখানে অবস্থানের নির্দেশ নেই–গন্তব্যস্থল সামনে রয়েছে। চলতে চলতে যখন শুষ্ক পাহাড় ও উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তরে এসে গেল (যেখানে ভবিষ্যতে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ ও মক্কানগরী সৃষ্টির লক্ষ্য ছিল), তখন সেখানেই তাঁদের থামিয়ে দেওয়া হলো। আল্লাহ্র বন্ধু স্বীয় পালনকর্তার মহব্বতে মত্ত হয়ে এই জনশূন্য তৃণলতাহীন প্রান্তরেই বসবাস আরম্ভ করলেন। কিন্তু পরীক্ষার এখানেই শেষ হলো না। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) নির্দেশ পেলেন, 'বিবি হাজেরা ও শিশুকে এখানেই রেখে সিরিয়ায় ফিরে যাও।' আল্লাহ্র বন্ধু নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা পালন করতে তৎপর হলেন এবং সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। 'আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক আমি যাচ্ছি'–বিবিকে এতটুকু কথা বলে যাওয়ার দেরিও তিনি সহ্য করতে পারলেন না। হযরত হাজেরা তাঁকে চলে যেতে দেখে কয়েকবার ডেকে অবশেষে কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এই জনমানবহীন প্রান্তরে আমাদের একা ফেলে রেখে কোথায় যাচ্ছেন ?' হযরত ইবরাহীম নির্বিকার রইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। অবশ্য হাজেরাও ছিলেন খলীলুল্লাহ্রই সহধর্মিণী। ব্যাপার বুঝে ফেললেন। স্বামীকে ডেকে বললেন, 'আপনি কি আল্লাহ্র কোন নির্দেশ পেয়েছেন ?' হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, হ্যাঁ। খোদায়ী নির্দেশের কথা জানতে পেরে হযরত হাজেরা খুশি মনে বললেন, 'যান। যিনি আপনাকে চলে যেতে বলেছেন, তিনি আমাদের ধ্বংস হতে দেবেন না।'

অতঃপর হযরত হাজেরা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে জন-মানবহীন প্রান্তরে কালাতিপাত করতে থাকেন। এক সময় দারুণ পিপাসা তাঁকে পানির খোঁজে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করল। তিনি শিশুকে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়ে বারবার ওঠানামা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পানির চিহ্নমাত্র দেখলেন না এবং এমন কোন মানুষ দৃষ্টিগোচর হলো না, যার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে পারেন। সাতবার ছুটোছুটি করার পর তিনি নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন। এ ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যেই 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড় দু'টির মাঝখানে সাতবার দৌড়ানো কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য হজ্জের বিধি-বিধানে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। হযরত হাজেরা যখন দৌড়াদৌড়ি শেষ করে নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন, তখন আল্লাহ্র রহমত নাযিল হলো। জিবরাঈল (আ) এলেন এবং শুষ্ক মরুভূমিতে পানির একটি ঝর্ণাধারা বইয়ে দিলেন। বর্তমানে এই ঝর্ণাধারার নামই যম যম। পানির সন্ধান পেয়ে প্রথমে জন্তু-জানোয়ারেরা এলো। জন্তু-জানোয়ার দেখে মানুষ এসে সেখানে আস্তানা গাড়ল। মক্কায় জনপদের ভিত্তি রচিত হয়ে গেল। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপত্রও সংগৃহীত হয়ে গেল।

হযরত ইসমাঈল (আ) নামে খ্যাত এই সদ্যোজাত শিশু লালিত-পালিত হয়ে কাজকর্মের উপযুক্ত হয়ে গেলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র ইঙ্গিতে মাঝে মাঝে এসে বিবি হাজেরা

ও শিশুকে দেখে যেতেন। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বন্ধুর তৃতীয় পরীক্ষা নিতে চাইলেন। বালক ইসমাঈল অসহায় ও দীন-হীন অবস্থায় বড় হয়েছিলেন এবং পিতার স্নেহ-বাৎসল্য থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। এমতাবস্থায় পিতা খোলাখুলি নির্দেশ পেলেন ঃ 'এ ছেলেকে আপন হাতে জবাই কর।' কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَا بُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرٰى . قَالَ يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُوْنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ .

"বালক যখন পিতার কাজে কিছু সাহায্য করার যোগ্য হয়ে গেল, তখন ইবরাহীম (আ) তাকে বললেন ঃ হে বৎস, আমি স্বপ্নে তোমাকে জবাই করতে দেখেছি। এখন বল, তোমার কি অভিপ্রায় ? পিতৃভক্ত বালক আরয করলেন ঃ পিতা, আপনি যে আদেশ পেয়েছেন, তা পালন করুন। ইনশাআল্লাহ্ আমাকেও আপনি এ ব্যাপারে সুদৃঢ় পাবেন।"

এর পরবর্তী ঘটনা সবাই জ্ঞাত আছেন যে, হযরত খলীল (আ) পুত্রকে জবাই করার উদ্দেশ্যে মিনা প্রান্তরে নিয়ে যান। অতঃপর আল্লাহ্র আদেশ পালনে নিজের পক্ষ থেকে যা করণীয় ছিল, তা পুরোপুরিই সম্পন্ন করেন। কিন্তু প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে পুত্রকে জবাই করাটা উদ্দেশ্য নয়; বরং পুত্রবৎসল পিতার পরীক্ষা নেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। স্বপ্নের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) স্বপ্নে 'জবাই করে দিয়েছেন' দেখেন নি ; বরং জবাই করছেন, অর্থাৎ জবাই করার কাজটি দেখেছেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) সেটাই বাস্তবে পরিণত করেছিলেন। প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে কাজটি দেখানো হয়েছে। এ কারণেই صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا বলা হয়েছে যে, স্বপ্নে যা দেখেছিলেন, আপনি তা পূর্ণ করে দিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশত থেকে এর পরিপূরক আয়াত নাযিল করে কুরবানী করার আদেশ দিলেন। এ রীতিটিই পরে ভবিষ্যতের জন্য একটি চিরন্তন রীতিতে পরিণতি লাভ করে।

এগুলো ছিল শক্ত ও বড় কঠিন পরীক্ষা, যার সম্মুখীন হযরত খলীলুল্লাহ্কে করা হলো। এর সাথে সাথেই আরও অনেকগুলো কাজ ও বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতাও তাঁর উপর আরোপ করা হলো। তন্মধ্যে দশটি কাজ 'খাসায়েলে ফিতরত' (প্রকৃতিসুলভ অনুষ্ঠান) নামে অভিহিত। এগুলো হলো শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত। ভবিষ্যত উম্মতের জন্যও এগুলো স্থায়ী বিধি-বিধানে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও তাঁর উম্মতকে এসব বিধি-বিধান পালনের জোর তাকিদ দিয়েছেন।

ইবন কাসীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস্ (রা) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। এতে বলা হয়েছে, সমস্ত ইসলাম ত্রিশটি অংশে সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে দশটি সূরা বারাআতে, দশটি সূরা আহযাবে এবং দশটি সূরা মু'মিনূনে বর্ণিত হয়েছে ; হযরত ইবরাহীম (আ) এগুলো পূর্ণরূপে পালন করেছেন এবং সব পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সূরা বারাআতে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসলমানের দশটি বিশেষ লক্ষণ ও গুণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

"তারা হলেন তওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রোযাদার, রুকূ-সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী অসৎ কাজে বাধাদানকারী, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমার হেফাযতকারী–এহেন ঈমানদারদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।"

সূরা মু'মিনূনে উল্লিখিত দশটি গুণ এই ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ . اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ . فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاۤءَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ . اُوْلٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ط هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ .

"নিশ্চিতরূপেই ঐসব মুসলমান কৃতকার্য, যারা নামাযে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, যারা অনর্থক বিষয় থেকে দূরে সরে থাকে, যারা নিয়মিত যাকাত প্রদান করে, যারা স্বীয় লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করে ; কিন্তু আপন স্ত্রী ও যাদের উপর বিধিসম্মত অধিকার রয়েছে তাদের ব্যতীত। কারণ এ ব্যাপারে তাঁদের অভিযুক্ত করা হবে না। যারা এদের ছাড়া অন্যকে তালাশ করে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। যারা স্বীয় আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে, যারা নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামায পড়ে, এমন লোকেরাই উত্তরাধিকারী হবে। তারা হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী। সেখানে তারা অনন্তকাল বাস করবে।"

সূরা আহ্‌যাবে উল্লিখিত দশটি গুণ এই ঃ

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا .

"নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, আনুগত্যকারী পুরুষ ও আনুগত্যকারী নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল

নারী, বিনয় অবলম্বনকারী পুরুষ ও বিনয় অবলম্বকারিণী নারী, খয়রাতকারী পুরুষ ও খয়রাতকারিণী নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী নারী, অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারিণী নারী—তাদের সবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মাগফিরাত ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

কোরআনের মুফাস্সির হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের উপরোদ্ধৃত উক্তির দ্বারা বোঝা গেল যে, মুসলমানদের জন্য যেসব জ্ঞান এবং কর্মগত ও নৈতিক গুণ অর্জন করা দরকার, তার সবই এ তিনটি সূরার কয়েকটি আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোই কোরআনোক্ত كلمات যেসব বিষয়ে হযরত খলীলুল্লাহর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। وَاِذِابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ আয়াতের ইঙ্গিতও এসব বিষয়ের দিকেই।

এ পর্যন্ত আয়াত সম্পর্কিত পাঁচটি প্রশ্নের মধ্য থেকে দু'টির উত্তর সম্পন্ন হলো।

তৃতীয় প্রশ্ন ছিল এ পরীক্ষায় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাফল্যের প্রকার ও শ্রেণী সম্পর্কে। এর উত্তর এই যে, স্বয়ং কোরআনই বিশেষ ভঙ্গিতে তাঁকে সাফল্যের স্বীকৃতি ও সনদ প্রদান করেছে ঃ وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى আর ইবরাহীম পরীক্ষায় পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে অর্থাৎ প্রতিটি পরীক্ষার সম্পূর্ণ ও একশ' ভাগ সাফল্যের ঘোষণা আল্লাহ্ দিয়েছেন।

চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, এই পরীক্ষার পুরস্কার কি পেলেন। এরও বর্ণনা এই আয়াতেই রয়েছে–বলা হয়েছে ঃ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا–পরীক্ষার পর আল্লাহ্ বলেন–আমি তোমাকে মানব সমাজের নেতৃত্ব দান করব।

এ আয়াত দ্বারা একদিকে বোঝা গেল যে, হযরত খলীল (আ)-কে সাফল্যের প্রতিদানে মানব সমাজের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে মানব সমাজের নেতা হওয়ার জন্য যে পরীক্ষা দরকার, তা জাগতিক পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার অনুরূপ নয়। জাগতিক পাঠশালাসমূহের পরীক্ষায় কতিপয় বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণকেই সাফল্যের স্তর বিবেচনা করা হয়। কিন্তু নেতৃত্ব লাভের পরীক্ষায় আয়াতে বর্ণিত ত্রিশটি নৈতিক ও কর্মগত গুণে পুরোপুরি গুণান্বিত হওয়া শর্ত। কোরআনের অন্য এক জায়গায় এ বিষয় এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ٠

"যখন তারা শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজে সংযমী হলো এবং আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাসী হলো, তখন আমি তাদেরকে নেতা করে দিলাম, যাতে আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করে।"

এই আয়াতে صبر (সংযম) ও يقين (বিশ্বাস) শব্দদ্বয়ের মধ্যে পূর্বোক্ত ত্রিশটি গুণ সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে। صبر হলো শিক্ষাগত ও বিশ্বাসগত পূর্ণতা আর يقين কর্মগত ও নৈতিক পূর্ণতা।

পঞ্চম প্রশ্ন ছিল এই যে, পাপাচারী ও জালিমকে নেতৃত্ব লাভের সম্মান দেওয়া হবে না বলে ভবিষ্যত বংশধরদের নেতৃত্ব লাভের জন্য যে বিধান ব্যক্ত হয়েছে, তার অর্থ কি ?

এর ব্যাখ্যা এই যে, নেতৃত্ব একদিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলার খেলাফত তথা প্রতিনিধি। আল্লাহ্র অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে এ পদ দেয়া যায় না। এ কারণেই আল্লাহ্র অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে স্বেচ্ছায় নেতা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত না করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য।

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

(১২৫) যখন আমি কা'বাগৃহকে মানুষের জন্য সম্মিলন স্থল ও শান্তির আলয় করলাম, আর তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকূ সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।

শব্দার্থ ঃ مَثَابَةً শব্দটি ثَابَ يَثُوْبُ ثَوْبًا وَّمَثَابًا থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। এ কারণে مَثَابَة শব্দের অর্থ হবে প্রত্যাবর্তনস্থল—যেখানে মানুষ বারবার ফিরে আসে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ঐ সময়টিও স্মরণযোগ্য) যখন আমি কা'বাগৃহকে মানুষের জন্য উপাসনাস্থল ও (সর্বদা) শান্তির আবাসস্থল হিসাবে পরিণত করে রেখেছি। (পরিশেষে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছি যে, বরকত লাভের জন্য) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও। আমি কা'বা নির্মাণের সময় (হযরত) ইবরাহীম ও (হযরত) ইসমাঈল (আ)-এর কাছে আদেশ পাঠিয়েছি যে, আমার (এই) গৃহকে বহিরাগত ও স্থানীয় লোকদের (ইবাদতের) জন্য এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য খুব পাক (সাফ) রাখ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত খলীলুল্লাহর মক্কায় হিজরত ও কা'বা নির্মাণের ঘটনা ঃ এই আয়াতে কা'বাগৃহের ইতিহাস, হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ) কর্তৃক কা'বাগৃহের পুনর্নির্মাণ, কা'বা ও মক্কার কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে। এ বিষয়টি কোরআনের অনেক আয়াতে বিভিন্ন সূরায় ছড়িয়ে রয়েছে। এখানে সংক্ষেপে তা-ই বর্ণিত হচ্ছে। এতে উল্লিখিত আয়াতসমূহের বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে। সূরা হজ্জের ২৬তম আয়াতে এ বিষয়টি এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لاَّ تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ . وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ

رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۔

অর্থাৎ—"ঐ সময়টির কথা স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে কা'বাগৃহের স্থান নির্দেশ করে দিলাম যে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, আমার গৃহকে তওয়াফকারী ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দেবে। তারা তোমার কাছে পদব্রজে এবং শ্রান্তক্লান্ত উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে আসবে।"

তফসীরে ইবনে-কাসীরে খ্যাতনামা মুফাসসির হযরত মুজাহিদ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র হযরত ইসমাঈলসহ সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় তিনি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পান যে, আপনাকে কা'বা গৃহের স্থান নির্দেশ করা হবে। আপনি সে স্থানকে পাক-সাফ করে তওয়াফ ও নামায দ্বারা আবাদ রাখবেন। এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জিবরাঈল (আ) বোরাক নিয়ে আগমন করলেন এবং ইবরাহীম ইসমাঈল ও হাজেরাকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে কোন জনপদ দৃষ্টিগোচর হলেই হযরত ইবরাহীম (আ) জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করতেন, আমাদের কি এখানেই অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ? হযরত জিবরাঈল (আ) বলতেন ঃ না, আপনার গন্তব্যস্থান আরও সামনে। অবশেষে মক্কার স্থানটি সামনে এলো ! এখানে কাঁটাযুক্ত বন-জঙ্গল ও বাবলা বৃক্ষ ছাড়া কিছুই ছিল না। এ ভূ-খণ্ডের আশেপাশে কিছু জনবসতি ছিল, তাদের বলা হতো 'আমালীক'। আল্লাহ্র গৃহটি তখন টিলার আকারে বিদ্যমান ছিল। এখানে পৌঁছে হযরত ইবরাহীম (আ) জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমাদের কি এখানেই বসবাস করতে হবে ? জিবরাঈল (আ) বললেন ঃ হ্যাঁ।

হযরত ইবরাহীম (আ) শিশু-পুত্র ও স্ত্রী হাজেরাসহ এখানে অবতরণ করলেন । কা'বাগৃহের অদূরেই একটি ছোট কুঁড়েঘর নির্মাণ করে ইসমাঈল ও হাজেরাকে সেখানে রেখে দিলেন। খাদ্যপাত্রে কিছু খেজুর এবং মশকে পানিও রাখলেন। তখন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি সেখানে থাকার নির্দেশ ছিল না। তাই দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তাঁর জননীকে আল্লাহ্র হাতে সমর্পণ করে তিনি ফিরে যেতে লাগলেন। তাঁকে প্রস্থানোদ্যত দেখে হাজেরা বললেন, এ জন-মানবহীন প্রান্তরে আমাদের রেখে আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? এখানে না আছে খাদ্য-পানীয়, না আছে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র।

হযরত খলীলুল্লাহ্ কোন উত্তর না দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। হাজেরা পেছন থেকে বারবার এ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু কোন উত্তর নেই। অবশেষে হাজেরা নিজেই ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন কি ? এবার হযরত ইবরাহীম (আ) মুখ খুললেন। বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই এ নির্দেশ।

এ কথা শুনে হাজেরা বললেন ঃ তবে আপনি স্বচ্ছন্দে যান। যিনি আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও ধ্বংস করবেন না। ইবরাহীম (আ) চলতে লাগলেন ; কিন্তু দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার মায়ের কথা বারবার তাঁর মনে পড়তে লাগল। যখন রাস্তার এমন এক

মোড়ে গিয়ে পৌঁছলেন, যেখান থেকে হাজেরা তাঁকে দেখতে পান না, তখন দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলেন। দোয়াটি সূরা ইবরাহীমের ৩৬ ও ৩৭তম আয়াতে এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۔

"হে পালনকর্তা ! এ শহরকে শান্তিময় করে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ।" এরপর দোয়ায় বললেন ঃ

رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۔

"পরওয়ারদেগার ! আমি আমার সন্তানকে আপনার সম্মানিত গৃহের নিকটবর্তী একটি চাষাবাদের অযোগ্য প্রান্তরে আবাদ করেছি, পরওয়ারদেগার, যাতে তারা নামায প্রতিষ্ঠিত করে। আপনি কিছু মানুষের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন এবং তাদেরকে কিছু ফলের দ্বারা উপজীবিকা দান করুন, যাতে কৃতজ্ঞ হয়।"

যে নির্দেশের ভিত্তিতে ইসমাঈল ও তাঁর জননীকে সিরিয়া থেকে এখানে আনা হয় তাতে বলা হয়েছিল যে, আমার গৃহকে পাক-সাফ রাখবে। হযরত ইবরাহীম (আ) জানতেন যে, পাক রাখার অর্থ বাহ্যিক ময়লা ও আবর্জনা থেকে পাক রাখাও বোঝান হয়েছে। এ কারণেই পথিমধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি যে দোয়া করেন, তাতে প্রথমে বস্তিকে নিরাপদ ও শান্তিময় করার কথা বলে পরে বললেন, "আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।" কেননা হযরত খলীলুল্লাহ মা'আরেফতের এমন স্তরে উপনীত ছিলেন, যেখানে মানুষ নিজের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিলুপ্ত দেখতে পায়, নিজের ক্রিয়াকর্ম ও ইচ্ছাকে আল্লাহ্র করায়ত্ত এবং তাঁরই ইচ্ছায় সব কাজকর্ম সম্পন্ন হয় বলে অনুভব করে। কাজেই তিনি কুফর ও শিরক থেকে আল্লাহ্র ঘরকে পাক রাখার নির্দেশের ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করলেন। দোয়ায় কুফর ও শিরক থেকে দূরে রাখার জন্য যে আবেদন করা হয়েছে, তাতে আরও একটি তাৎপর্য রয়েছে। তা এই যে, কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ থেকে ভবিষ্যতে কোন অজ্ঞ ব্যক্তি স্বয়ং কা'বাগৃহকেই উপাস্য বানিয়ে নিয়ে শিরকে লিপ্ত হতে পারত। এ কারণেই দোয়া করলেন যে, শিরক থেকে আমাদের দূরে রাখুন।

অতঃপর দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার মায়ের প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে দোয়া করলেন যে, আপনার নির্দেশ মোতাবেক আপনার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে আমি তাদের আবাদ করেছি। কিন্তু স্থানটি চাষাবাদের যোগ্যও নয় যে, কেউ কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমেও তা থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। তাই আপনিই কৃপা করে তাদেরকে ফল দ্বারা রিযিক দান করুন।

এই দোয়ার পর হযরত খলীলুল্লাহ্ সিরিয়ায় চলে গেলেন। এদিকে খেজুর ও পানি নিঃশেষ হয়ে গেলে হাজেরা ও তাঁর পুত্র উভয়েই পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন। এরপর পানির জন্য বের হওয়া, কখনও সাফা পাহাড়ে—কখনও মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করা, উভয় পাহাড়ের মাঝখানে দাঁড়ানো—যাতে ইসমাঈল দৃষ্টির অন্তরালে না পড়ে—ইত্যাকার ঘটনা সাধারণ মুসলমানের অজানা নেই। হজ্জ পালন করতে গিয়ে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো সে ঘটনারই স্মৃতিচারণ।

কাহিনীর শেষভাগে আল্লাহ্র আদেশে জিবরাঈল (আ)-এর সেখানে পৌঁছা, যম্ যম প্রবাহিত হওয়া, যৌবনে পদার্পণ করে জুরহাম গোত্রের জনৈকা রমণীর সাথে ইসমাঈলের বিয়ে প্রভৃতি ঘটনা সহীহ বুখারী শরীফে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত একত্র করলে জানা যায় যে, সূরা হজ্জে প্রথম ভাগের আয়াতে কা'বাগৃহকে আবাদ করা ও পাক-সাফ রাখার নির্দেশ দ্বারা সে স্থানকে হযরত ইসমাঈল ও হাজেরা দ্বারা আবাদ করাই উদ্দেশ্য ছিল। সে নির্দেশ শুধু হযরত ইবরাহীমকে লক্ষ্য করেই দেওয়া হয়েছিল। কেননা, ইসমাঈল ছিলেন তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু। তখন কা'বা পুনর্নির্মাণের নির্দেশ ছিল না। কিন্তু সূরা বাকারার আলোচ্য আয়াতে وَعَهِدْنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ হযরত ইবরাহীমের সঙ্গে ইসমাঈলকেও যোগ করা হয়েছে। কারণ এ নির্দেশটি তখনকার, যখন হযরত ইসমাঈল যুবক ও বিবাহিত।

সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে ঃ একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) স্ত্রী ও পুত্রকে দেখার উদ্দেশ্যে মক্কা আগমন করলে ইসমাঈলকে একটি গাছের নিচে বসে তীর বানাতে দেখতে পান। পিতাকে দেখে পুত্র সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে তুমি আমাকে সাহায্য করবে। অতঃপর যে ঢিবির নিচে কা'বাগৃহ অবস্থিত ছিল, হযরত ইবরাহীম (আ) সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন ঃ আমি এর নির্মাণের জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীমকে কা'বা গৃহের চতুর্সীমা বলে দিয়েছিলেন। পিতাপুত্র উভয়ে মিলে কাজ আরম্ভ করলে কা'বাগৃহের প্রাচীন ভিত্তি বেরিয়ে পড়ল। এ ভিত্তির উপরই তারা নির্মাণ কাজ আরম্ভ করলেন। পরবর্তী আয়াতে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কা'বাগৃহের পুনর্নির্মাতা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ) আর হযরত ইসমাঈল (আ) ছিলেন তাঁর সাহায্যকারী।

কোন কোন হাদীসে এবং ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, কা'বাগৃহ পূর্ব থেকেই পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। কোরআনে উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকেও এ সত্যই প্রতিভাত হয়। কেননা, আয়াতসমূহে কোথাও কা'বাগৃহের স্থান নির্দেশ করার কথা এবং কোথাও পাক-সাফ রাখার কথা আছে। কিন্তু একটি নতুন গৃহ নির্মাণের কথা কোথাও নেই। কাজেই বোঝা যায় যে, এ ঘটনার পূর্ব থেকেই কা'বাগৃহ বিদ্যমান ছিল। অতঃপর নূহের আমলে সংঘটিত মহাপ্লাবনের সময় হতে তা বিধ্বস্ত হয়ে যায়, না হয় ভিত্তিটুকু ঠিক রেখে বাকিটুকু উঠিয়ে নেওয়া হয়। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) কা'বাগৃহের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা নন ; বরং তাঁদের হাতে প্রাচীন ভিত্তির উপর এ গৃহ পুনর্নির্মিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, কা'বাগৃহ প্রথমে কখন কে নির্মাণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে কোন সহীহ্ হাদীস বর্ণিত নেই। আহলে-কিতাব ইহুদী ও খৃষ্টানদের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত আদমের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বে সর্বপ্রথম ফেরেশতারা এ গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। এরপর আদম (আ) এর পুনর্নির্মাণ করেন। নূহের মহা প্লাবন পর্যন্ত এ নির্মাণ অক্ষত ছিল। মহাপ্লাবনে বিধ্বস্ত হওয়ার পর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আমল পর্যন্ত তা একটি টিলার আকারে বিদ্যমান ছিল। অতঃপর হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) এর পুনর্নির্মাণ করেন। এরপর এর প্রাচীরে বহু ভাঙা-গড়া হয়েছে কিন্তু একেবারে বিধ্বস্ত হয়নি। মহানবী (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে কুরায়েশরা একে বিধ্বস্ত করে নতুনভাবে নির্মাণ করে। এ নির্মাণকাজে হযরত (সা) নিজেও বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

হেরেম সম্পর্কিত বিধি-বিধান

১. مَثَابَةً শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কা'বাগৃহকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। ফলে তা সর্বদাই মানব জাতির প্রত্যাবর্তনস্থল হয়ে থাকবে এবং মানুষ বরাবর তার দিকে ফিরে যেতে আকাঙ্ক্ষী হবে। মুফাসসির শ্রেষ্ঠ হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ لا يقضى احد منها وطرا অর্থাৎ, কোন মানুষ কা'বাগৃহের যিয়ারত করে তৃপ্ত হয় না, বরং প্রতিবারেই যিয়ারতের অধিকতর বাসনা নিয়ে ফিরে আসে। কোন কোন আলিমের মতে কা'বাগৃহ থেকে ফিরে আসার পর আবার সেখানে যাওয়ার আগ্রহ হজ্জ কবূল হওয়ার অন্যতম লক্ষণ। সাধারণভাবে দেখা যায়, প্রথমবার কা'বাগৃহ যিয়ারত করার যতটুকু আগ্রহ হয়, দ্বিতীয়বার তা আরও বৃদ্ধি পায় এবং যতবারই যিয়ারত করতে থাকে, এ আগ্রহ উত্তরোত্তর ততই বেড়ে যেতে থাকে।

এ বিস্ময়কর ব্যাপারটি একমাত্র কা'বাগৃহেরই বৈশিষ্ট্য। নতুবা জগতের শ্রেষ্ঠতম মনোরম দৃশ্যও এক-দু'বার দেখেই মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। পাঁচ-সাতবার দেখলে আর দেখার ইচ্ছাই হয় না। অথচ এখানে না আছে কোন মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপট, না এখানে পৌঁছা সহজ এবং না আছে ব্যবসায়িক সুবিধা, তা সত্ত্বেও এখানে পৌঁছার আকুল আগ্রহ মানুষের মনে অবিরাম ঢেউ খেলতে থাকে। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এখানে পৌঁছানোর জন্য মানুষ ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

২. এখানে أَمْنًا শব্দের অর্থ مأمن অর্থাৎ, শান্তির আবাসস্থল بيت শব্দের অর্থ শুধু কা'বাগৃহ নয় ; বরং সম্পূর্ণ হেরেম। অর্থাৎ কা'বাগৃহের পবিত্র প্রাঙ্গণ। কোরআনে بيت الله। ও كعبه শব্দ বলে যে সম্পূর্ণ হেরেমকে বোঝানো হয়েছে, তার আরও বহু প্রমাণ রয়েছে। যেমন, এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ এখানে كعبة বলে সমগ্র হেরেমকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, এতে কোরবানীর কথা আছে। কোরআনী কা'বাগৃহের অভ্যন্তরে হয় না এবং সেখানে কোরবানী করা বৈধও নয়। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে যে, "আমি কা'বার হেরেমকে শান্তির আলয় করেছি। শান্তির আলয় করার অর্থ মানুষকে নির্দেশ দেওয়া যে, এ স্থানকে সাধারণ হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অশান্তিজনিত কার্যক্রম থেকে মুক্ত রাখতে হবে। -(ইবনে-আরাবী)

আইয়্যামে-জাহিলিয়াতে আরবদের হাতে ইবরাহীমী ধর্মের যে শেষ চিহ্নটুকু অবশিষ্ট ছিল, তারই ফলে হেরেমে পিতা বা ভ্রাতার হত্যাকারীকে পেয়েও কেউ প্রতিশোধ নিত না। তারা হেরেমে সাধারণ যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম মনে করত। এ বিধানটি ইসলামী শরীয়তেও হুবহু বাকি রাখা হয়েছে। মক্কা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হেরেমে যুদ্ধ করা কয়েক ঘণ্টার জন্য বৈধ করা হয়েছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার চিরতরে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের পরবর্তী ভাষণে বিষয়টি ঘোষণা করে দেন।-(সহীহ্ বুখারী)

যদি কেউ হেরেমের অভ্যন্তরেই এমন অপরাধ করে বসে, ইসলামী আইনে যার সাজা হদ ও কিসাস (মৃত্যুদণ্ড, হত্যার বিনিময়ে মৃত্যু বা অর্থদণ্ড)-এর শাস্তি হয়, তবে হেরেম তাকে আশ্রয় দেবে না, বরং হদ ও কিসাস জারি করতে হবে। এটাই ইজমা তথা সর্বসম্মত রায়।-(আহকামুল কোরআন-জাসসাস, কুরতুবী) কেননা, কোরআনে বলা হয়েছে ঃ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ অর্থাৎ তারা যদি হেরেমে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদের হত্যা কর।'

এখানে একটি মাসআলার ব্যাপারে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি হেরেমের বাইরে অপরাধ করে হেরেমে আশ্রয় নেয়, তবে তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে ? কোন কোন ইমামের মতে হেরেমের মধ্যেই তাকে দণ্ড দেওয়া হবে। ইমাম আবূ হানিফা (র) বলেন, সে সাজার কবল থেকে রেহাই পাবে না। কারণ, তাকে রেহাই দেওয়া হলে অপরাধের সাজা থেকে বাঁচার একটি পথ খুলে যাবে। ফলে পৃথিবীতে অশান্তি বৃদ্ধি পাবে এবং হেরেম শরীফ অপরাধীদের আখড়ায় পরিণত হবে। কিন্তু হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাকে হেরেমের ভিতরে সাজা দেওয়া হবে না, বরং হেরেম থেকে বের হতে বাধ্য করতে হবে। বের হওয়ার পর সাজা দেওয়া হবে।

৩. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى এখানে মাকামে-ইবরাহীমের অর্থ ঐ পাথর, যাতে মু'জিযা হিসাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। কা'বা নির্মাণের সময় এ পাথরটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন। -(সহীহ্ বুখারী)

হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি এই পাথরে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পদচিহ্ন দেখেছি। যিয়ারতকারীদের উপর্যুপরি স্পর্শের দরুণ চিহ্নটি এখন অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে।-(কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মাকামে-ইবরাহীমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, সমগ্র হেরেমটিই মাকামে-ইবরাহীম। এর অর্থ বোধ হয় এই যে, তওয়াফের পর যে দু'রাকআত নামায মাকামে-ইবরাহীমে পড়ার নির্দেশ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, তা হেরেমের যে কোন অংশে পড়লেই নির্দেশটি পালিত হবে। অধিকাংশ ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ এ ব্যাপারে একমত।

৪. আলোচ্য আয়াতে মাকামে-ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নিতে বলা হয়েছে। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের সময় কথা ও কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি তওয়াফের পর কা'বাগৃহের সম্মুখে অনতিদূরে রক্ষিত মাকামে-ইবরাহীমের কাছে আগমন করলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

অতঃপর মাকামে-ইবরাহীমের পেছনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে দু'রাকআত নামায পড়লেন যে, কা'বা ছিল তাঁর সম্মুখে এবং কা'বা ও তার মাঝখানে ছিল মাকামে-ইবরাহীম। -(সহীহ্ মুসলিম)

এ কারণেই ফিকহ্শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন ঃ যদি কেউ মাকামে-ইবরাহীমের পেছনে সংলগ্ন স্থানে জায়গা না পায়, তবে মাকামে-ইবরাহীম ও কা'বা—উভয়টিকে সামনে রেখে যে কোন দূরত্বে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে নির্দেশ পালিত হবে।

৫. আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তওয়াফের পরবর্তী দুই রাকআত নামায ওয়াজিব।-(জাস্সাস, মোল্লাহ আলী কারী)

তবে এ দু'রাকআত নামায বিশেষভাবে মাকামে-ইবরাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত। হেরেমের অন্যত্র পড়লেও আদায় হবে। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সা) এ দু'রাকআত নামায কা'বাগৃহের দরজা সংলগ্ন স্থানে পড়েছেন বলেও প্রমাণিত রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-ও তাই করেছেন বলে বর্ণিত আছে (জাস্সাস)। মোল্লা আলী ক্বারী 'মানাসেক' গ্রন্থে বলেছেন, এ দু'রাকআত মাকামে-ইবরাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত। যদি কোন কারণে সেখানে পড়তে কেউ অক্ষম হয়, তবে হরম অথবা হরমের বাইরে যে কোনখানে পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। বিদায় হজ্জে হযরত উম্মে সালমা (রা) এমনি বিপাকে পড়েন, তখন তিনি মসজিদে-হারামে নয়, বরং মক্কা থেকে বের হয়ে দু'রাকআত ওয়াজিব নামায পড়েন। রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। প্রয়োজনবশত হরমের বাইরে এ নামায পড়লে ফিক্হবিদদের মতে কোন কোরবানীও ওয়াজিব হয় না। একমাত্র ইমাম মালেকের মতে কোরবানী ওয়াজিব হয়।-(মানাসেক, মোল্লা আলী কারী)

৬. طَهِّرَا بَيْتِىَ একানে কা'বাগৃহকে পাক-সাফ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যিক অপবিত্রতা ও আবর্জনা এবং আত্মিক অপবিত্রতা-উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন-কুফর, শিরক, দুশ্চরিত্রতা, হিংসা, লালসা, কুপ্রবৃত্তি, অহংকার, রিয়া, নাম-যশ ইত্যাদির কলুষ থেকেও কা'বাগৃহকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ নির্দেশে بَيْتِىَ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ আদেশ যে কোন মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ সব মসজিদই আল্লাহ্র ঘর। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ .

হযরত ফারূকে আযম (রা) মসজিদে এক ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে শুনে বললেন ঃ 'তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ জান না?' (কুরতুবী) অর্থাৎ মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত ; এতে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা উচিত নয়। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে কা'বাগৃহকে যেমন যাবতীয় বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখতে বলা হয়েছে, তেমনি অন্যান্য মসজিদকেও পাক-পবিত্র রাখতে হবে। দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদকে যাবতীয় অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পাক-সাফ করে এবং অন্তরকে কুফর, শিরক, দুশ্চরিত্রতা, অহংকার; হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি থেকে পবিত্র করে মসজিদে প্রবেশ করা অবশ্য কর্তব্য। রসূলুল্লাহ

(সা) পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। তিনি ছোট শিশু এবং উন্মাদদেরও মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। কারণ তাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশংকা থাকে।

৭. لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ আয়াতের শব্দগুলো থেকে কতিপয় বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়। প্রথমত, কা'বাগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য তওয়াফ, ইতেকাফ ও নামায। দ্বিতীয়ত, তওয়াফ আগে আর নামায পরে (হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমত তাই)। তৃতীয়ত, বিশ্বের বিভিন্ন কোণ্ থেকে আগমনকারী হাজীদের পক্ষে নামাযের চাইতে তওয়াফ উত্তম। চতুর্থত, ফরয হোক অথবা নফল —কা'বাগৃহের অভ্যন্তরে যে কোন নামায পড়া বৈধ।—(জাসসাস)

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ۖ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾

(১২৬) স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বললেন, পরওয়ারদেগার ! এ স্থানকে তুমি শান্তিধাম কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ফলের দ্বারা রিযিক দান কর। বললেন ঃ যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরও কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ দেবো, অতঃপর তাদেরকে বল-প্রয়োগে দোযখের আযাবে ঠেলে দেবো ; সেটা নিকৃষ্ট বাসস্থান। (১২৭) স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করছিল ঃ পরওয়ারদেগার ! আমাদের এ কাজ কবূল কর। নিশ্চয়ই, তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। (১২৮) পরওয়ারদেগার ! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্জের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবূলকারী, দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে সময়টিও স্মরণযোগ্য) যখন ইবরাহীম (আ) (দোয়া প্রসঙ্গে) বললেন, পরওয়ারদেগার, এ (স্থান)-কে তুমি (আবাদ) শহর কর, (কেমন শহর ?) শান্তিধাম কর, এর অধিবাসীদের রিযিক দান কর ফলমূলের মাধ্যমে, (আমি সব অধিবাসীর কথা বলি না, বিশেষ করে তাদের কথা বলি,) যারা তাদের মধ্যে আল্লাহ্ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে। (অবশিষ্টদের ব্যাপার আপনিই জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা) বললেন, (আমার রিযিক বিশেষভাবে দেওয়ার রীতি নেই। এ কারণে ফলমূল সবাইকে দেব—মু'মিনকেও এবং) যারা অবিশ্বাস করে, (তাদেরকেও। তবে পরকালে মু'মিনরাই বিশেষভাবে মুক্তি পাবে। তাই যারা কাফির) তাদের কিছুদিন (অর্থাৎ ইহকালে) প্রচুর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেব। অতঃপর (অর্থাৎ মৃত্যুর পর) তাদের বল-প্রয়োগের মাধ্যমে দোযখের আযাবে পৌঁছে দেব। (পৌঁছার) এ জায়গাটি খুবই নিকৃষ্ট। (সে সময়টিও স্মরণযোগ্য) যখন উত্তোলন করছিল ইবরাহীম (আ) কা'বাঘরের প্রাচীর (তার সঙ্গে) ইসমাঈলও। (তারা বলছিল,) পরওয়ারদেগার! আমাদের এ শ্রম কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ (আমাদের দোয়া শোন এবং আমাদের নিয়ত জান) পরওয়ারদেগার! (আমরা উভয়ে আরও দোয়া করি) আমাদের উভয়কে তোমার আরও আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধরের মধ্যেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর; আমাদের হজ্জ (ইত্যাদির) বিধি-বিধান বলে দাও এবং আমাদের প্রতি সদয় মনোযোগ দাও। (প্রকৃতপক্ষে) তুমিই মনোযোগদাতা, দয়ালু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত খলীলুল্লাহ (আ) আল্লাহ্র পথে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজন এবং নিজের মনের কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্র আদেশ পালনে তৎপর হওয়ার যেসব অক্ষয় কীর্তি তিনি স্থাপন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ও নজীরবিহীন।

সন্তানের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা শুধু একটি স্বাভাবিক ও সহজাত বৃত্তিই নয়। বরং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলারও নির্দেশ রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহ এর প্রমাণ। তিনি সন্তানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া ঃ ইবরাহীম (আ) رب শব্দ দ্বারা দোয়া আরম্ভ করেছেন। এর অর্থ, 'হে আমার পালনকর্তা!' তিনি এই শব্দের মাধ্যমে দোয়া করার রীতি শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ, এ জাতীয় শব্দ আল্লাহ্র রহমত ও কৃপা আকৃষ্ট করার ব্যাপারে খুবই কার্যকর ও সহায়ক। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম দোয়া এই ঃ "তোমার নির্দেশে আমি এই জনমানবহীন প্রান্তরে নিজ পরিবার-পরিজনকে ফেলে রেখেছি। তুমি একে একটি শান্তিপূর্ণ শহর বানিয়ে দাও—যাতে এখানে বসবাস করা আতঙ্কজনক না হয় এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য হয়।" এ দোয়াটিই সূরা ইবরাহীমে هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا শব্দের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তাতে الف ও لام সহ البلد উল্লিখিত হয়েছে। আরবী ব্যাকরণে একে معرفه বলা হয়। পার্থক্যের কারণ সম্ভবত এই যে, সূরা বাকারার এই প্রথম দোয়াটি তখন করা হয়, যখন স্থানটি একান্তই জনমানবহীন প্রান্তর ছিল। আর দ্বিতীয় দোয়াটি বাহ্যত তখন করা হয়, যখন মক্কায় বসতি স্থাপিত হয়ে স্থানটি একটি নগরীতে পরিণত হয়েছিল। এর সমর্থনসূচক ইঙ্গিত সূরা ইবরাহীমের শেষভাগে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ .

—"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি বার্ধক্য সত্ত্বেও আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাক—এ দু'টি সন্তান দান করেছেন।" এতে বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় দোয়াটি হযরত ইসহাকের জন্মের পরবর্তী সময়ের। হযরত ইসহাক হযরত ইসমাঈলের তের বছর পর জন্মগ্রহণ করেন।—(ইবনে কাসীর)

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বিতীয় দোয়ায় বলা হয়েছে, পরওয়ারদেগার! শহরটিকে শান্তিধাম করে দাও অর্থাৎ হত্যা, লুণ্ঠন, কাফিরদের অধিকার স্থাপন, বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখ।

হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া কবুল হয়েছে। মক্কা মুকাররমা শুধু একটি জনবহুল নগরীই নয়, সারা বিশ্বের প্রত্যাবর্তনস্থলেও পরিণত হয়েছে। বিশ্বের চারদিক থেকে মুসলমানগণ এ নগরীতে পৌঁছাকে সর্ববৃহৎ সৌভাগ্য মনে করে। নিরাপদ ও সুরক্ষিতও এতটুকু হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত কোন শত্রুজাতি অথবা শত্রু-সম্রাট এর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। 'আসহাবে-ফীলের' ঘটনা স্বয়ং কোরআনে উল্লিখিত রয়েছে। তারা কা'বাঘরের উপর আক্রমণের ইচ্ছা করতেই সমগ্র বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

এ শহরটি হত্যা ও লুটতরাজ থেকেও সর্বদা নিরাপদ রয়েছে। জাহিলিয়ত যুগে আরবরা অগণিত অনাচার, কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কা'বাঘর ও তার পার্শ্ববর্তী হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত। তারা প্রাণের শত্রুকে হাতে পেয়েও হরমের মধ্যে পাল্টা হত্যা অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ করত না। এমনকি, হরমের অধিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের রীতি সমগ্র আরবে প্রচলিত ছিল। এ কারণেই মক্কাবাসীরা বাণিজ্যব্যাপদেশে নির্বিঘ্নে সিরিয়া ও ইয়ামানে যাতায়াত করত। কেউ তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করত না।

আল্লাহ্ তা'আলা হরমের চতুঃসীমার জন্তু-জানোয়ারকেও নিরাপত্তা দান করেছেন। এই এলাকায় শিকার করা জায়েয নয়। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও স্বাভাবিক নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা সেখানে শিকারী দেখলেও ভয় পায় না।

হরমের শান্তিস্থল হওয়ার এসব বিধান (যা ইবরাহীম [আ]-এর দোয়ারই ফল) জাহিলিয়ত যুগ থেকেই কার্যকরী রয়েছে। ইসলাম ও কোরআন এগুলোকে অধিকতর সুসংহত ও বিকশিত করেছে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ও করামেতা শাসকবর্গের হাতে হরমে অত্যাচার-উৎপীড়ন ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে, কোন কাফির জাতি আক্রমণ করেনি। কেউ নিজ হাতে নিজের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলে তা শান্তির পরিপন্থী নয়। এছাড়া এগুলো একান্তই বিরল ঘটনা। হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার বছরের মধ্যে কয়েকটি গুনাগুন্তি ঘটনা। হত্যাকাণ্ডের নায়কদের ভয়াবহ পরিণতিও সবার সামনে ফুটে উঠেছে।

মোটকথা, হযরত ইবরাহীমের দোয়া অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা শহরটিকে প্রাকৃতিক দিক দিয়েও সারা বিশ্বের জন্য শান্তির আলয়ে পরিণত করে দিয়েছেন। এমনকি দাজ্জালও হরমে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। এছাড়া শরীয়তের পক্ষ থেকে এ বিধানও জারি করা হয়েছে যে, হরমে পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড তো দূরের কথা, জন্তু-জানোয়ার শিকার করা পর্যন্ত হারাম।

হযরত ইবরাহীমের তৃতীয় দোয়া এই যে, এ শহরের অধিবাসীদের উপজীবিকা হিসাবে যেন ফলমূল দান করা হয়। মক্কা মুকাররমা ও পার্শ্ববর্তী ভূমি কোনরূপ বাগবাগিচার উপযোগী ছিল না। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছিল না পানির নাম-নিশানা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীমের দোয়া কবুল করে নিয়ে এ মক্কার অদূরে 'তায়েফ' নামক একটি ভূখণ্ড সৃষ্টি করে দিলেন। তায়েফে যাবতীয় ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে তা মক্কার বাজারেই বেচাকেনা হয়। কোন অসমর্থিত রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তায়েফ সিরিয়ার একটি ভূখণ্ড। আল্লাহ্র নির্দেশে জিবরাঈল (আ) তায়েফকে এখানে স্থানান্তরিত করে দিয়েছেন

দোয়ার রহস্য ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর দোয়ায় একথা বলেন নি যে, মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে ফলোদ্যান অথবা চাষাবাদযোগ্য করে দাও। বরং তাঁর দোয়া ছিল এই যে, ফলমূল উৎপন্ন হবে অন্যত্র, কিন্তু পৌছাবে মক্কায়। এর রহস্য সম্ভবত এই যে, হযরত ইবরাহীমের সন্তানরা চাষাবাদ অথবা বাগানের কাজে মশগুল হয়ে পড়ুক, এটা তাঁর কাম্য ছিল না। কারণ, তাদের এখানে আবাদ করার উদ্দেশ্যই ছিল হযরত ইবরাহীমের ভাষায় رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এতে বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর সন্তানদের প্রধান বৃত্তি কা'বাঘরের সংরক্ষণ ও নামাযকে সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। নতুবা স্বয়ং মক্কা মুকাররমাকে এমন সুশোভিত ফলোদ্যানে পরিণত করা মোটেই কঠিন ছিল না—যার প্রতি দামেস্ক এবং বৈরুতও ঈর্ষা করত।

জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ ফলেরই অন্তর্ভুক্ত ঃ ثَمَرَاتٌ শব্দটি ثَمَرَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ ফল। বাহ্যত এর দ্বারা গাছের ফল বোঝানো হয়েছে। কিন্তু সূরা কাসাসের ৫৭তম আয়াতে এ দোয়া কবুল হওয়ার কথা এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ يُجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ। (মক্কায় সবকিছুর ফল আনা হবে) এখানে প্রথমত, বলা হয়েছে যে, স্বয়ং মক্কায় ফল উৎপন্ন করার ওয়াদা নয় ; বরং অন্য স্থান থেকে এখানে আনা হবে। يُجْبٰى শব্দের অর্থ তাই। দ্বিতীয়ত, ثمرات كل شجر (প্রত্যেক গাছের ফল) বলা হয়নি। এ শাব্দিক পরিবর্তন থেকে বোঝা যায় যে, এখানে ফলকে ব্যাপক অর্থে বোঝানোই উদ্দেশ্য। কারণ সাধারণ প্রচলিত ভাষায় ثمر প্রত্যেক বস্তু থেকে উৎপন্ন দ্রব্যকে বোঝায়। গাছ থেকে উৎপন্ন ফল যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি মেশিন থেকে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীও মেশিনের ফল। বিভিন্ন হাতের তৈরি আসবাবপত্রও হস্তশিল্পের ফল। এভাবে ثمرات كل شيء এর মধ্যে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় আসবাবপত্রই ফলের অন্তর্ভুক্ত। অবস্থা এবং ঘটনাবলীও প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হরমের পবিত্র ভূমিকে চাষাবাদ ও শিল্পোৎপাদনের যোগ্য না করলেও সারা বিশ্বে উৎপাদিত কৃষি ও শিল্পসামগ্রী এখানে সহজলভ্য করে দিয়েছেন। সম্ভবত আজও কোন বৃহত্তম বাণিজ্য ও শিল্প শহরে এমন সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান নেই, যাতে সারা বিশ্বের উৎপাদিত শিল্পসামগ্রী মক্কার মত প্রচুর পরিমাণে ও সহজে লাভ করা যায়।

হযরত খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর সাবধানতা ঃ আলোচ্য আয়াতে মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সমগ্র মক্কাবাসীর জন্য শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এক দোয়ায় যখন হযরত খলীল স্বীয় বংশধরের মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, মু'মিনদের পক্ষে এ দোয়া কবুল হলো, জালিম ও মুশরিকদের জন্য নয়। সে দোয়াটি ছিল নেতৃত্ব লাভের দোয়া; হযরত খলীল (আ) ছিলেন

আল্লাহ্র বন্ধুত্বের মহান মর্যাদায় উন্নীত ও আল্লাহ্-ভীতির প্রতীক। তাই এ ক্ষেত্রে সে কথাটি মনে পড়ে গেল এবং তিনি দোয়ার শর্ত যোগ করলেন যে, আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির এ দোয়া শুধু মু'মিনদের জন্য করেছি। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ ভয় ও সাবধানতার মূল্য দিয়ে বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ كَفَرَ অর্থাৎ পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা আমি সমস্ত মক্কাবাসীকেই দান করব, যদিও তারা কাফির ও মুশরিক হয়। তবে মু'মিনদেরকে ইহকাল ও পরকাল সর্বত্রই তা দান করব, কিন্তু কাফিররা পরকালে শাস্তি ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

স্বীয় সৎকর্মের উপর ভরসা না করা ও তুষ্ট না হওয়ার শিক্ষা ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র নির্দেশে সিরিয়ার সুজলা-সুফলা সুদর্শন ভূখণ্ড ছেড়ে মক্কার বিশুষ্ক পাহাড়সমূহের মাঝখানে স্বীয় পরিবার-পরিজনকে এনে ফেলে রাখেন এবং কা'বাগৃহের নির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোন আত্মত্যাগী সাধকের অন্তরে অহংকার দানা বাঁধতে পারত এবং সে তাঁর ক্রিয়াকর্মকে অনেক মূল্যবান মনে করতে পারত। কিন্তু এখানে ছিলেন আল্লাহ্র এমন এক বন্ধু, যিনি আল্লাহ্র প্রতাপ ও মহিমা সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত। তিনি জানতেন, আল্লাহ্র উপযুক্ত ইবাদত ও আনুগত্য কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে। তাই আমল যত বড়ই হোক সেজন্য অহংকার না করে কেঁদে কেঁদে এমনি দোয়া করা প্রয়োজন যে, হে পরওয়ারদেগার! আমার এ আমল কবুল হোক। কা'বাগৃহ নির্মাণের আমল প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম তাই বলেছেন ঃ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا হে পরওয়ারদেগার! আমাদের এ আমল কবুল করুন। কেননা, আপনি শ্রোতা, আপনি সর্বজ্ঞ।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ —এ দোয়াটিও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান ও আল্লাহ্ভীতির ফল, আনুগত্যের অদ্বিতীয় কীর্তি স্থাপন করার পরও তিনি এরূপ দোয়া করেন যে, আমাদের উভয়কে তোমাদের আজ্ঞাবহ কর। কারণ, মা'আরেফাত তথা আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান যার যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, সে তত বেশি অনুভব করতে থাকে যে, যথার্থ আনুগত্য তার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না।

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا—এ দোয়াতেও স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ্র প্রেমিক, আল্লাহ্র পথে নিজের সন্তান-সন্ততিকে বিসর্জন দিতেও এতটুকু কুণ্ঠিত নন। তিনিও সন্তানদের প্রতি কতটুকু মহব্বত ও ভালবাসা রাখেন! কিন্তু এই ভালবাসার দাবিসমূহ কয়জন পূর্ণ করতে পারে? সাধারণ লোক সন্তানদের শুধু শারীরিক সুস্থতা ও আরামের দিকেই খেয়াল রাখে। তাদের যাবতীয় স্নেহ-মমতা এ দিকটিকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা শারীরিকের চাইতে আত্মিক এবং জাগতিকের চাইতে পারলৌকিক আরামের জন্য চিন্তা করেন অধিক। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করলেন ঃ 'আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে একটি দলকে পূর্ণ আনুগত্যশীল কর। সন্তানদের জন্য এ দোয়ার মধ্যে আরও একটি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সমাজে যারা গণ্যমান্য, তাদের সন্তানরা পিতার পথ অনুসরণ করলে সমাজে তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তাদের যোগ্যতা জনগণের যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। (বাহ্রে মুহীত)

হযরত খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর এ দোয়াটিও কবুল হয়েছে। তাঁর বংশধরের মধ্যে কখনও সত্যধর্মের অনুসারী ও আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ আদর্শ পুরুষের অভাব হয়নি। জাহিলিয়ত আমলের আরবে যখন সর্বত্র মূর্তিপূজার জয়-জয়কার ছিল, তখনও ইবরাহীমের বংশধরের মধ্যে কিছু

লোক একত্ববাদ ও পরকালে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ্র আনুগত্যশীল ছিলেন। যেমন যায়েদ ইবনে আমর, ইবনে নওফেল এবং কুস ইবনে সায়েদা প্রমুখ। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, মূর্তিপূজার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল।—(বাহ্রে মুহীত)

مَنَاسِكُ – أَرِنَا مَنَاسِكَنَا – مَنَاسِكَ – مَنسِك -এর বহুবচন। হজ্জের ক্রিয়াকর্মকে বলা হয় এবং আরাফাত, মিনা, মুয্দালেফা ইত্যাদি হজ্জের স্থানকেও 'মানাসিক' বলা হয়। এখানে শব্দটি উভয় অর্থেই হতে পারে। দোয়ার সারমর্ম এই যে, হজ্জের ক্রিয়াকর্ম এবং হজ্জের স্থানসমূহ আমাদের পুরোপুরি বুঝিয়ে দাও। أَرِنَا শব্দের অর্থ 'দেখিয়ে দাও' দেখা চোখ দ্বারাও হতে পারে, অন্তর দ্বারাও। দোয়ার মর্মানুযায়ী জিবরাঈলের মাধ্যমে হজ্জের স্থানসমূহ দেখিয়ে দেওয়া হয় এবং হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে শিখিয়ে দেওয়া হয়।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

---

(১২৯) হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন—যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনিই পরাক্রমশীল, হেকমতওয়ালা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আমাদের পালনকর্তা! (আরও প্রার্থনা এই যে, আমার বংশধরের মধ্য থেকে যে দলের জন্য দোয়া করছি) তাদের মধ্য থেকেই এমন একজন পয়গম্বর নিযুক্ত করুন—যিনি তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবেন, তাদেরকে (খোদায়ী) গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও সুবুদ্ধি অর্জনের পদ্ধতি শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে (এ শিক্ষা ও তিলাওয়াত দ্বারা মূর্খজনোচিত চিন্তাধারা ও কাজকর্ম থেকে) পবিত্র করবেন, নিশ্চয়ই আপনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

শব্দার্থ বিশ্লেষণ

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ –তিলাওয়াতের আসল অর্থ অনুসরণ করা। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি কোরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব পাঠ করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ, যে লোক এসব কালাম পাঠ করে, এর অনুসরণ করাও তার অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। আসমানী গ্রন্থ ঠিক যেভাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয় হুবহু তেমনিভাবে পাঠ করা জরুরী। নিজের পক্ষ থেকে তাতে কোন শব্দ অথবা স্বরচিহ্নটিও পরিবর্তন করার অনুমতি নেই। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল কোরআন' গ্রন্থে বলেন, 'আল্লাহ্র কালাম ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ অথবা কালাম পাঠ করাকে সাধারণ পরিভাষায় তিলাওয়াত বলা যায় না।'

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ–এখানে কিতাব বলে আল্লাহ্‌র কিতাব বোঝানো হয়েছে। 'হেকমত' শব্দটি আরবী অভিধানে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা—সত্যে উপনীত হওয়া, ন্যায় ও সুবিচার, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি। (কামূস)

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী লেখেন, এ শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় বিদ্যমান বস্তুসমূহের বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সৎকর্ম। শায়খুল হিন্দ (র)-এর অনুবাদে এর অনুবাদ করা হয়েছে تہ کی باتیں অর্থাৎ গূঢ়তত্ত্ব। এ অনুবাদে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। 'হেকমত' শব্দটি আরবী ভাষায় একাধিক অর্থে বলা হয়। 'বিশুদ্ধ জ্ঞান' 'সৎকর্ম', 'ন্যায়', 'সুবিচার', 'সত্য কথা' ইত্যাদি। (কামূস ও রাগেব)

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, আয়াতে হেকমতের কি অর্থ ? তফসীরকার সাহাবীগণ হুযূরে আকরাম (সা)-এর কাছ থেকে শিখে কোরআনের ব্যাখ্যা করতেন। এখানে 'হেকমত' শব্দের অর্থে তাঁদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবগুলোর মর্মই এক। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্। ইবনে কাসীর ও ইবনে জরীর কাতাদাহ্ থেকে এ ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত করেছেন। হেকমতের অর্থ কেউ কোরআনের তফসীর, কেউ ধর্মে গভীর জ্ঞান অর্জন, কেউ শরীয়তের বিধি-বিধানের জ্ঞান, কেউ এমন বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন বলেছেন, যা শুধু রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বর্ণনা থেকেই জানা যায়। নিঃসন্দেহে এ সব উক্তির সারমর্ম হলো রসূল (সা)-এর সুন্নাহ।

وَيُزَكِّيهِمْ – زَكٰوةٌ শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পবিত্রতা। বাহ্যিক ও আত্মিক সর্বপ্রকার পবিত্রতার অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। হযরত ইবরাহীম (আ) ভবিষ্যত বংশধরদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছেন যে, আমার বংশধরের মধ্যে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন—যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের তিলাওয়াত করে শোনাবেন, কোরআন ও সুন্নাহ্‌র শিক্ষা দেবেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে তাদের পবিত্র করবেন। দোয়ায় নিজের বংশধরের মধ্য থেকেই পয়গম্বর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ প্রথমত এই যে, এটা তাঁর সন্তানদের জন্য গৌরবের বিষয়। দ্বিতীয়ত, এতে তাদের কল্যাণও নিহিত রয়েছে। কারণ, স্বগোত্র থেকে পয়গম্বর হলে তাঁর চাল-চলন ও অভ্যাস-আচরণ সম্পর্কে তারা উত্তমরূপে অবগত থাকবে। ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনার আশংকা থাকবে না। হাদীসে বলা হয়েছে, 'প্রত্যুত্তরে ইবরাহীম (আ)-কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয় যে, আপনার দোয়া কবুল হয়েছে এবং আকাঙ্ক্ষিত পয়গম্বরকে শেষ যমানায় প্রেরণ করা হবে।' (ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর)

রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মের বৈশিষ্ট্য ঃ 'মসনদে আহ্‌মদ' গ্রন্থে উদ্ধৃত এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) বলেন, 'আমি আল্লাহ্‌র কাছে তখনও পযগম্বর ছিলাম যখন আদম (আ)-ও পয়দা হননি; বরং তাঁর সৃষ্টির জন্য উপাদান তৈরি হচ্ছিল মাত্র। আমি আমার সূচনা বলে দিচ্ছি ঃ 'আমি পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া, ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ এবং স্বীয় জননীর স্বপ্নের প্রতীক। ঈসা (আ)-এর সুসংবাদের অর্থ তাঁর এ উক্তি مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (আমি এমন এক পয়গম্বরের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন। তাঁর নাম আহমদ)। তাঁর জননী গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর পেট থেকে

একটি নূর বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছে। কোরআনে হুযূর (সা)-এর আবির্ভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে দু'জায়গায় সূরা আলে-ইমরানের ১৬৪তম আয়াতে এবং সূরা জুমু'আয় ইবরাহীমের দোয়ায় উল্লিখিত ভাষারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) যে পয়গম্বরের জন্য দোয়া করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)।

পয়গম্বর প্রেরণের অর্থ তিনটি ঃ সূরা বাকারার আলোচ্য আয়াতে এবং সূরা আলে ইমরান ও সূরা জুমু'আর বিভিন্ন আয়াতে হুযূর (সা) সম্পর্কে একই বিষয়বস্তু অভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতে মহানবী (সা)-এর জগতে পদার্পণ ও তাঁর রিসালতের তিনটি লক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত, কোরআন তিলাওয়াত, দ্বিতীয়ত, আসমানী গ্রন্থ ও হেকমতের শিক্ষাদান এবং তৃতীয়ত, মানুষের চরিত্র শুদ্ধি।

প্রথম উদ্দেশ্য কোরআন তিলাওয়াত ঃ এখানে সর্বপ্রথম প্রণিধানযোগ্য যে, তিলাওয়াতের সম্পর্ক শব্দের সাথে এবং শিক্ষাদানের সম্পর্ক অর্থের সাথে। তিলাওয়াত ও শিক্ষাদান পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হওয়ার মর্মার্থ এই যে, কোরআনের অর্থসম্ভার যেমন উদ্দেশ্য, শব্দসম্ভারও তেমনি একটি লক্ষ্য। এসব শব্দের তিলাওয়াত ও হেফাযত একটি ফরয ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যাঁরা মহানবী (সা)-এর প্রত্যক্ষ শিষ্য ও সম্বোধিত ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা শুধু আরবী ভাষা সম্পর্কেই ওয়াকিফহাল ছিলেন না, বরং অলংকারপূর্ণ আরবী ভাষার একেকজন বাগ্মী এবং কবিও ছিলেন। তাঁদের সামনে কোরআন পাঠ করাই বাহ্যত তাঁদের শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট ছিল—পৃথকভাবে অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। এমতাবস্থায় কোরআন তিলাওয়াতকে পৃথক উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থ শিক্ষাদানকে পৃথক উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করার কি প্রয়োজন ছিল ? অথচ কার্যক্ষেত্রে উভয় উদ্দেশ্যই এক হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ থেকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদ্ভব হয়। প্রথম এই যে, কোরআন অপরাপর গ্রন্থের মত নয়—যাতে শুধু অর্থসম্ভারের উপর আমল করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং শব্দসম্ভার থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে; শব্দে সামান্য পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়ে গেলেও ক্ষতির কারণ মনে করা হয় না। অর্থ না বুঝে এসব গ্রন্থের শব্দ পাঠ করা একেবারেই নিরর্থক, কিন্তু কোরআন এমন নয়। কোরআনের অর্থসম্ভার যেমন উদ্দেশ্য, তেমনি শব্দসম্ভারও উদ্দেশ্য। কোরআনে শব্দের সাথে বিশেষ বিশেষ বিধি-বিধান সম্পৃক্ত রয়েছে। ফিকহ্‌শাস্ত্রের মূলনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে কোরআনের সংজ্ঞা এভাবে هو النظم والمعنى جميعا বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ শব্দসম্ভার ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমন্বিত গ্রন্থের নামই কোরআন। এতে বোঝা যায় যে, কোরআনের অর্থসম্ভারকে অন্য শব্দ অথবা অন্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হলে তাকে কোরআন বলা যাবে না, যদিও বিষয়বস্তু একেবারে নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত হয়। কোরআনের বিষয়বস্তুকে পরিবর্তিত শব্দের মাধ্যমে কেউ নামাযে পাঠ করলে তার নামায হবে না। এমনিভাবে কোরআন সম্পর্কিত অপরাপর বিধি-বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। হাদীসে কোরআন তিলাওয়াতের যে সওয়াব বর্ণিত রয়েছে, তা পরিবর্তিত শব্দের কোরআন পাঠে অর্জিত হবে না। এ কারণেই ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণ কোরআনের মূল শব্দ বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদ লিখতে ও মুদ্রিত করতে নিষেধ

করেছেন। সাধারণ পরিভাষার এ জাতীয় অনুবাদ 'উর্দু কোরআন, বাংলা কোরআন অথবা ইংরেজি কোরআন' বলে দেওয়া হয়। কারণ, ভাষান্তরিত কোরআন প্রকৃতপক্ষে কোরআন বলে কথিত হওয়ারই যোগ্য নয়।

মোটকথা, আয়াতে কোরআন তিলাওয়াতকে কোরআন শিক্ষাদান থেকে পৃথক করে একটি উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআনের অর্থসম্ভার যেমন উদ্দেশ্য, শব্দসম্ভারও তেমনি উদ্দেশ্য। কেননা, তিলাওয়াত করা হয় শব্দের—অর্থের নয়। অতএব, অর্থ শিক্ষা দেওয়া যেমন পয়গম্বরের কর্তব্য, তেমনি শব্দের তিলাওয়াত এবং সংরক্ষণও তাঁর একটি স্বতন্ত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, কোরআন অবতরণের আসল লক্ষ্য তাঁর প্রদর্শিত জীবন-ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, তাঁর শিক্ষাকে বোঝানো। সুতরাং শুধু শব্দ উচ্চারণ করেই তুষ্ট হয়ে বসে থাকা কোরআনের বাস্তব রূপ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং তার অবমাননারই নামান্তর।

অর্থ না বুঝে কোরআনের শব্দ পাঠ করা নিরর্থক নয়—সওয়াবের কাজ ঃ কিন্তু এতদসঙ্গে একথা বলা কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, অর্থ না বুঝে তোতা পাখির মত শব্দ পাঠ করা অর্থহীন। বিষয়টির প্রতি বিশেষ জোর দেওয়ার কারণ এই যে, আজকাল অনেকেই কোরআনকে অন্যান্য গ্রন্থের সাথে তুলনা করে মনে করে যে, অর্থ না বুঝে কোন গ্রন্থের শব্দাবলী পড়া ও পড়ানো বৃথা কালক্ষেপণ বৈ কিছুই নয়। কোরআন সম্পর্কে তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, শব্দ ও অর্থ এই দুয়েরই সমন্বিত আসমানী গ্রন্থের নাম কোরআন। কোরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং তার বিধি-বিধান পালন করা যেমন ফরয ও উচ্চস্তরের ইবাদত, তেমনিভাবে তার শব্দ তিলাওয়াত করাও একটি স্বতন্ত্র ইবাদত ও সওয়াবের কাজ।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য গ্রন্থ শিক্ষাদান ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে-কেরাম কোরআনের অর্থ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু উপরোক্ত কারণেই তাঁরা শুধু অর্থ বোঝা ও তা বাস্তবায়ন করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি। বোঝা এবং আমল করার জন্য একবার পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাঁরা সারা জীবন কোরআন তিলাওয়াতকে 'অন্ধের যষ্ঠি' মনে করেছেন। কতক সাহাবী দৈনিক একবার কোরআন খতম করতেন, কেউ দু'দিনে এবং কেউ তিন দিনে কোরআন খমতে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে কোরআন খতম করার রীতি মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কোরআনের সাত মনযিল এই সাপ্তাহিক তিলাওয়াত রীতিরই চিহ্ন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে-কেরামের এ কার্যধারাই প্রমাণ করে যে, কোরআনের অর্থ বোঝা এবং সে অনুযায়ী আমল করা যেমন ইবাদত, তেমনিভাবে শব্দ তিলাওয়াত করাও স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে একটি উচ্চস্তরের ইবাদত এবং বরকত, সৌভাগ্য ও মুক্তির উপায়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্তব্যসমূহের মধ্যে কোরআন তিলাওয়াতের একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যে মুসলমান আপাতত কোরআনের অর্থ বুঝে না, শব্দের সওয়াব থেকেও বঞ্চিত হওয়া তার পক্ষে উচিত নয়। বরং অর্থ বোঝার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরী, যাতে কোরআনের সত্যিকার নূর ও বরকত প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং কোরআন অবতরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। (মা'আযাল্লাহ্) কোরআনকে তন্ত্র-মন্ত্র মনে করে শুধু ঝাড়-ফুঁকে ব্যবহার করা উচিত নয় এবং আল্লামা ইকবালের ভাষায় সূরা ইয়াসীন সম্পর্কে শুধু এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নয় যে, এ সূরা পাঠ করলে মরণোন্মুখ ব্যক্তির আত্মা সহজে বের হয়।

মোটকথা, আয়াতে রসূলের কর্তব্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআন তিলাওয়াতকে স্বতন্ত্র কর্তব্যের মর্যাদা দিয়ে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, কোরআনের শব্দ তিলাওয়াত, শব্দের সংরক্ষণ এবং যে ভঙ্গিতে তা অবতীর্ণ হয়েছে, সে ভঙ্গিতে তা পাঠ করা একটি স্বতন্ত্র ফরয। এমনিভাবে এ কর্তব্যটির সাথে গ্রন্থ শিক্ষাদানকে পৃথক কর্তব্য সাব্যস্ত করার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, কোরআন বোঝার জন্য শুধু আরবী ভাষা শিখে নেওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং রসূল (সা)-এর শিক্ষা অনুযায়ী এর শিক্ষা লাভ করাও অপরিহার্য। সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য গ্রন্থের ভাষা জানা বা সে ভাষায় পারদর্শী হওয়াই যথেষ্ট নয়—যে পর্যন্ত শাস্ত্রটি কোন সুদক্ষ ওস্তাদের কাছ থেকে অর্জন করা না হয়। উদাহরণত আজকাল হোমিও প্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থাদি সাধারণত ইংরেজিতে লেখা। কিন্তু সবাই জানে যে, শুধু ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থাদি পাঠ করেই কেউ ডাক্তার হতে পারে না। প্রকৌশল বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করে কেউ প্রকৌশলী হতে পারে না। বড় বড় শাস্ত্রের কথা বাদ দিয়ে সাধারণ দৈনন্দিন কর্ম-পদ্ধতিও শুধু পুস্তক পাঠ করে, ওস্তাদের কাছে না শিখে কেউ অর্জন করতে পারে না। আজকাল প্রতিটি শিল্প ও কারিগরি বিষয়ে শত শত পুস্তক লিখিত হয়েছে, চিত্রের সাহায্যে কাজ শেখার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এসব পুস্তক দেখে কেউ কোনদিন দর্জি, বাবুর্চি অথবা কর্মকার হতে পেরেছে কি? যদি শাস্ত্র অর্জন ও শাস্ত্রের পুস্তক বোঝার জন্য ভাষা শিখে নেওয়াই যথেষ্ট হতো, তবে যে ব্যক্তি সব শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ভাষা জানে, সে জগতে সব শাস্ত্র অর্জন করতে পারত। এখন প্রত্যেকেই চিন্তা করে দেখতে পারে যে, সাধারণ শাস্ত্র বোঝার জন্য যখন ভাষাজ্ঞান যথেষ্ট নয়, ওস্তাদের প্রয়োজন; তখন কোরআনের বিষয়বস্তু যাতে ধর্মবিদ্যা থেকে শুরু করে পদার্থবিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি সবই রয়েছে—শুধু ভাষাজ্ঞান দ্বারাই কেমন করে তা অর্জিত হতে পারে ? তাই যদি হতো, তবে যে আরবী ভাষা শেখে, তাকেই কোরআন তত্ত্ববিশারদ মনে করা হতো। আজও আরব দেশসমূহে হাজার হাজার ইহুদী খৃষ্টান আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ও সাহিত্যিক রয়েছেন। তাঁরাও বড় বড় তফসীরবিদ বলে গণ্য হতেন এবং নবুয়তের যুগে আবূ লাহাব ও আবূ জহলকে কোরআন বিশারদ মনে করা হতো।

মোটকথা, কোরআন একদিকে রসূল (সা)-এর কর্তব্যকর্মের মধ্যে আয়াত তিলাওয়াতকে স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করে এবং অন্যদিকে গ্রন্থ শিক্ষাদানকে পৃথক কর্তব্য সাব্যস্ত করে বলে দিয়েছে যে, কোরআন বোঝার জন্য শুধু তিলাওয়াত শুনে নেওয়াই আরবী ভাষাবিদের পক্ষেও যথেষ্ট নয়; বরং রসূলের শিক্ষাদানের মাধ্যমেই কোরআনী শিক্ষা সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জিত হতে পারে। কোরআনকে রসূলের শিক্ষাদান থেকে পৃথক করে নিজে বোঝার চিন্তা করা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। কোরআনের বিষয়বস্তু শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন না থাকলে রসূল প্রেরণেরও প্রয়োজন ছিল না; আল্লাহ্‌র গ্রন্থ অন্য কোন উপায়েও মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভবপর ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী। তিনি জানেন, জগতের অন্যান্য শাস্ত্রের তুলনায় কোরআনের বিষয়বস্তু শেখানো ও বোঝানোর জন্য ওস্তাদের প্রয়োজন অধিক। এ ব্যাপারে সাধারণ ওস্তাদও যথেষ্ট নন; বরং এসব বিষয়বস্তুর ওস্তাদ এমন ব্যক্তিই হতে পারেন, যিনি ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে কথাবার্তা বলার গৌরবে গৌরবান্বিত। ইসলামের পরিভাষায় তাঁকেই বলা হয় নবী ও রসূল। এ কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জগতে প্রেরণের উদ্দেশ্য

কোরআনে এরূপ সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, তিনি কোরআনের অর্থ ও বিধি-বিধান সবিস্তারে বর্ণনা করবেন। বলা হয়েছে ঃ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ অর্থাৎ আপনাকে প্রেরণের লক্ষ্য এই যে, আপনি মানুষের সামনে আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য বর্ণনা করবেন। তাঁর কর্তব্যসমূহের মধ্যে কোরআন শিক্ষাদানের সাথে সাথে হেকমত শিক্ষাদানও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমি পূর্বেই বলেছি যে, আরবী ভাষায় যদিও হেকমতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে কিন্তু এ আয়াতে এবং এর সমার্থক অন্যান্য আয়াতে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ 'হেকমতের' তফসীর করেছেন রসূলের সুন্নাহ্। এতে বোঝা গেল যে, কোরআনের অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দায়িত্ব, তেমনি সুন্নাহ্ নামে খ্যাত পয়গম্বরসুলভ প্রশিক্ষণের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়াও তাঁর অন্যতম কর্তব্য। এ কারণেই মহানবী (সা) বলেছেন ঃ انما بعثت معلما (আমি শিক্ষক হিসাবেই প্রেরিত হয়েছি)। অতএব, শিক্ষক হওয়াই যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, তখন তাঁর উম্মতের পক্ষেও ছাত্র হওয়া অপরিহার্য। এ কারণে প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও মহিলার উচিত তাঁর শিক্ষাসমূহের আগ্রহী ছাত্র হওয়া। কোরআন ও সুন্নাহ্র পরিপূর্ণ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সাহস ও সময়ের অভাব হলে যতটুকু দরকার, ততটুকু অর্জনেই উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য।

তৃতীয় উদ্দেশ্য পবিত্রকরণ ঃ মহানবী (সা)-এর তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে পবিত্রকরণ। এর অর্থ বাহ্যিক ও আত্মিক না-পাকী থেকে পবিত্র করা। বাহ্যিক না-পাকী সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানরাও ওয়াকিফহাল। আত্মিক না-পাকী হচ্ছে কুফর, শিরক, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপর পুরোপুরি ভরসা করা, অহংকার, হিংসা, শত্রুতা, দুনিয়া প্রীতি ইত্যাদি। কোরআন ও সুন্নাহ্তে এসব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। পবিত্রকরণকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পৃথক কর্তব্য সাব্যস্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন শাস্ত্র পুঁথিগতভাবে শিক্ষা করলেই তার প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জিত হয় না। প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জন করতে হলে গুরুজনের শিক্ষাধীনে থেকে তাঁর অনুশীলনের অভ্যাসও গড়ে তুলতে হয়। সূফীবাদে কামেল পীরের দায়িত্বও তাই। তিনি কোরআন ও সুন্নাহ্ থেকে অর্জিত শিক্ষাকে কার্যক্ষেত্রে অনুশীলন করে অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা করেন।

হেদায়েত ও সংশোধনের দু'টি ধারা ঃ আল্লাহ্র গ্রন্থ ও রসূল ঃ এ প্রসঙ্গে আরও দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির আদিকাল থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত মানুষের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্যে দু'টি ধারা অব্যাহত রেখেছেন। একটি খোদায়ী গ্রন্থসমূহের ধারা এবং অপরটি রসূলগণের ধারা। আল্লাহ্ তা'আলা শুধু গ্রন্থ নাযিল করাই যেমন যথেষ্ট মনে করেন নি, তেমনি শুধু রসূল প্রেরণ করেও ক্ষান্ত হননি। বরং সর্বদা উভয় ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এতদুভয় ধারা সমভাবে প্রবর্তন করে আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিরাট শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তা এই যে, মানুষের নির্ভুল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য শুধু গ্রন্থ কিংবা শুধু শিক্ষাটাই যথেষ্ট নয় বরং একদিকে খোদায়ী হেদায়েত ও খোদায়ী সংবিধানেরও প্রয়োজন, যাকে কোরআন বলা হয় এবং অপরদিকে একজন শিক্ষাগুরুরও প্রয়োজন যিনি স্বীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে খোদায়ী হেদায়েতে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারণ, মানুষই মানুষের প্রকৃত শিক্ষাগুরু হতে পারে। গ্রন্থ কখনও গুরু বা অভিভাবক হতে পারে না। তবে শিক্ষা-দীক্ষায় সহায়ক অবশ্যই হতে পারে।

ইসলামের সূচনা একটি গ্রন্থ ও একজন রসূলের মাধ্যমে হয়েছে। এ দু'য়ের সম্মিলিত শক্তিই জগতে একটি সুস্থ ও উচ্চস্তরের আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনিভাবে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যও একদিকে পবিত্র শরীয়ত ও অন্যদিকে কৃতী পুরুষগণ রয়েছেন। কোরআনও নানা স্থানে এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ .

—"হে মু'মিনগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।" অন্যত্র সত্যবাদীদের সংজ্ঞা ও গুণাবলী বর্ণনা করে বলেন ঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ .

—"তারাই সত্যবাদী এবং তারাই পরহেযগার।"

সমগ্র কোরআনের সারমর্ম হলো সূরা ফাতিহা। আর সূরা ফাতিহার সারমর্ম হলো সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত। এখানে সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান দিতে গিয়ে কোরআনের পথ, রসূলের পথ অথবা সুন্নাহ্‌র পথ বলার পরিবর্তে কিছু আল্লাহ্-ভক্তের সন্ধান দেওয়া হয়েছে যে, তাদের কাছ থেকে সিরাতে-মুস্তাকীমের সন্ধান জেনে নাও। বলা হয়েছে ঃ

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ—"সিরাতে-মুস্তাকীম হলো তাদের পথ, যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে। তাদের পথ নয়, যারা গযবে পতিত ও গোমরাহ।"

অন্য এক জায়গায় নেয়ামত প্রাপ্তদের আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ .

—এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও পরবর্তীকালের জন্য কিছুসংখ্যক লোকের নাম নির্দিষ্ট করে তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ

يايها الناس اني تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي اهل بيتي .

—"হে মানব জাতি, আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। এতদুভয়কে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্‌র কিতাব এবং অপরটি আমার সন্তান ও পরিবার-পরিজন। সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ اقتدوا بالذين من بعدى ابى بكر وعمر অর্থাৎ—আমার পরে তোমরা আবূ বকর ও উমরের অনুসরণ করবে। অন্য এক হাদীসে আছে– عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين অর্থাৎ–আমার সুন্নত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অবলম্বন করা তোমাদের কর্তব্য।

মোটকথা, কোরআনের উপরোক্ত নির্দেশ ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শিক্ষা থেকে এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানুষের হেদায়েতের জন্য সর্বকালেই দু'টি বস্তু অপরিহার্য। (১) কোরআনের হেদায়েত এবং (২) তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ও আমলের যোগ্যতা অর্জনের জন্য শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ও আল্লাহ্-ভক্তদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এ রীতি শুধু ধর্মীয় শিক্ষার বেলাতেই প্রযোজ্য নয়; বরং যে কোন বিদ্যা ও শাস্ত্র নিখুঁতভাবে অর্জন করতে হলে এ রীতি অপরিহার্য। একদিকে শাস্ত্র সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি

থাকতে হবে এবং অন্যদিকে থাকতে হবে শাস্ত্রবিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। প্রত্যেক শাস্ত্রের উন্নতি ও পূর্ণতার এ দু'টি অবলম্বন থেকে উপকার লাভের ক্ষেত্রে বহু মানুষ ভুল পন্থার আশ্রয় নেয়। ফলে উপকারের পরিবর্তে অপকার এবং মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই ঘটে বেশি।

কেউ কেউ কোরআনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে শুধু ওলামা ও মাশায়েখকেই সবকিছু মনে করে বসে। তারা শরীয়তের অনুসারী কিনা, তারও খোঁজ নেয় না। এ রোগটি আসলে ইহুদী ও খৃস্টানদের রোগ। কোরআন বলে ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ .

অর্থাৎ-"তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে ওলামা ও মাশায়েখকে স্বীয় উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে।" এটা নিঃসন্দেহে শিরক ও কুফরের রাস্তা। লক্ষ লক্ষ মানুষ এ রাস্তায় বের হয়েছে এবং হচ্ছে। পক্ষান্তরে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা অর্জনের জন্য কোন ওস্তাদ ও অভিভাবকের প্রয়োজনই মনে করে না। তারা বলে ঃ আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এটাও আরেক পথভ্রষ্টতা। এর ফল হচ্ছে ধর্মচ্যুত হয়ে মানবীয় প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হওয়া। কেননা বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ব্যতিরেকে শাস্ত্র অর্জন মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। এরূপ ব্যক্তি অবশ্যই ভুল বোঝাবুঝির শিকারে পরিণত হয়। এ ভুল বোঝাবুঝি কোন কোন সময় তাকে ধর্মচ্যুতও করে দেয়।

এ কারণে উপরোক্ত দু'টি অবলম্বনকে যথাস্থানে বজায় রেখে তা থেকে উপকার লাভ করা দরকার। মনে করতে হবে যে, আসল নির্দেশ একমাত্র আল্লাহ্‌র। প্রকৃত আনুগত্য তাঁরই, আমল করা ও করানোর জন্য রসূল হচ্ছেন একটি উপায়। রসূলের আনুগত্য এদিক দিয়েই করা হয় যে, তা হুবহু আল্লাহ্‌র আনুগত্য। এছাড়া কোরআন ও হাদীস বোঝা ও আমল করার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলোর সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞদের উক্তি ও কর্ম থেকে সাহায্য নেওয়াকে সৌভাগ্য ও মুক্তির কারণ মনে করা কর্তব্য। উল্লিখিত আয়াতে কিতাবের শিক্ষাদানকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করায় আরও একটি বিষয় বোঝা যায়। তা হলো এই যে, কোরআনকে বোঝার জন্য যখন রসূলের শিক্ষাদান অপরিহার্য এবং এ ছাড়া যখন সঠিকভাবে কোরআনের উপর আমল করা অসম্ভব, তখন কোরআন ও কোরআনের যের-যবর যেমন কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত, তেমনি রসূলের শিক্ষাও সমষ্টিগতভাবে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। নতুবা শুধু কোরআন সংরক্ষিত থাকলেই কোরআন অবতরণের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। রসূলের শিক্ষা বলতে সুন্নাহ্ ও হাদীসকে বোঝায়। তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হাদীস সংরক্ষণের ওয়াদা কোরআন সংরক্ষণের ওয়াদার মত জোরদার নয়। কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ অর্থাৎ-"আমিই কোরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাযত করব।"

এ ওয়াদার ফলেই কোরআনের প্রতিটি যের ও যবর পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সুন্নাহ্‌র ভাষা যদিও এভাবে সংরক্ষিত নয়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সুন্নাহ্ এবং হাদীসেরও সংরক্ষিত হওয়া উল্লিখিত আয়াতদৃষ্টে অপরিহার্য। বাস্তবে সুন্নাহ্ এবং হাদীসও সংরক্ষিত রয়েছে। যখনই কোন পক্ষ থেকে এতে কোন বাধা সৃষ্টি অথবা মিথ্যা রেওয়ায়েত

সংমিশ্রিত করা হয়েছে, তখনই হাদীস বিশেষজ্ঞরা এগিয়ে এসেছেন এবং দুধ ও পানিকে পৃথক করে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এ কর্মধারাও অব্যাহত থাকবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমার উম্মতে কিয়ামত পর্যন্ত সত্যপন্থী এমন একদল আলেম থাকবেন, যাঁরা কোরআন ও হাদীসকে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত রাখবেন এবং সকল বাধা-বিপত্তির অবসান ঘটাবেন।

মোটকথা, কোরআন বাস্তবায়নের জন্য রসূলের শিক্ষা অপরিহার্য। কোরআনের বাস্তবায়ন কিয়ামত পর্যন্ত যরূরী। কাজেই রসূলের শিক্ষাও কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকা অবশ্যম্ভাবী। অতএব, উল্লিখিত আয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত রসূলের শিক্ষা সংরক্ষিত হওয়ারও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে-কেরামের আমল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একে হাদীস বিশারদ ওলামা ও বিশুদ্ধ গ্রন্থাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত রেখেছেন। সাম্প্রতিককালে কিছু লোক ইসলামী বিধি-বিধান থেকে গা-বাঁচানোর উদ্দেশ্যে একটি অজুহাত আবিষ্কার করেছে যে, হাদীসের বর্তমান ভাণ্ডার সংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য নয়। উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের ধর্মদ্রোহিতার স্বরূপই ফুটে উঠেছে। তাদের বোঝা উচিত যে, হাদীসের ভাণ্ডার থেকে আস্থা উঠে গেলে কোরআনের উপরও আস্থা রাখার উপায় থাকে না।

সংশোধনের নিমিত্ত বিশুদ্ধ শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, চারিত্রিক প্রশিক্ষণও আবশ্যক ঃ পবিত্রকরণকে একটি স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত দান করা হয়েছে যে, শিক্ষা যতই বিশুদ্ধ হোক, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুরুব্বীর অধীন কার্যত প্রশিক্ষণ লাভ না করা পর্যন্ত শুধু শিক্ষা দ্বারাই চরিত্র সংশোধিত হয় না। কারণ, শিক্ষার কাজ হলো প্রকৃতপক্ষে সরল ও নির্ভুল পথপ্রদর্শন। এ কথা সুস্পষ্ট যে, পথ জানা থাকাই গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্য যথেষ্ট নয়। এ জন্য সাহস করে পা বাড়াতে হবে এবং চলতেও হবে। সাহসী বুযুর্গদের সংসর্গ ও আনুগত্য ছাড়া সাহস অর্জিত হয় না। সাহস না করলে সবকিছু জানা ও বোঝার পরও অবস্থা দাঁড়ায় এরূপ ঃ

جانتا ہوں ثواب طاعت وزہد

پہر طبیعت ادہر نہیں آتی

(আনুগত্য ও পরহেযগারীর সওয়াব জানি; কিন্তু কি করব, মন যে এ পথে আসে না।)

আমলের সাহস ও শক্তি গ্রন্থ পাঠে অর্জিত হয় না। এর একটিমাত্র পথ আল্লাহ্ ভক্তদের সংসর্গ এবং তাদের কাছ থেকে সাহসের প্রশিক্ষণ লাভ করা। একেই বলে তাযকিয়া তথা পবিত্রকরণ। কোরআন এ বিষয়টিকেই রিসালাতের স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করে ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। কারণ, শুধু শিক্ষা ও বাহ্যিক সভ্যতাকে প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ধর্মেই কোন না কোন আকারে সম্পূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ পন্থায় অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয়। প্রত্যেক ধর্ম ও সমাজে একে অন্যতম মানবিক প্রয়োজন হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য এই যে, সে নির্ভুল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা পেশ যা মানুষ ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে এবং চমৎকার জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন করে। অন্যান্য জাতি ও ধর্মে এর নজীর খুঁজে পাওয়া যায় না। এর সাথে সাথে চরিত্র সংশোধন ও আত্মিক পবিত্রকরণ এমন একটি কাজ, যা অন্যান্য ধর্মে ও সম্প্রদায়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। তারা শিক্ষার ডিগ্রীকেই মানুষের যোগ্যতার মাপকাঠি মনে

করে। এসব ডিগ্রীর ওজনের সাথে সাথে মানুষের ওজন বাড়ে ও কমে। ইসলাম, শিক্ষার সাথে পবিত্রকরণের বক্তব্য যোগ করে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ করে দেখিয়েছে।

যেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে শিক্ষা অর্জন করেছেন, শিক্ষার সাথে সাথে তাঁদের আত্মিক পরিশুদ্ধিও সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে তাঁর প্রশিক্ষণাধীনে সাহাবীগণের যে একটি দল তৈরি হয়েছিল, একদিকে তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধির গভীরতা ছিল বিস্ময়কর, বিশ্বের দর্শন তাঁদের সামনে হার মেনেছিল এবং অন্যদিকে তাঁদের আত্মিক পবিত্রতা, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক এবং আল্লাহ্র উপর ভরসাও ছিল অভাবনীয়। স্বয়ং কোরআন তাদের প্রশংসায় বলে ঃ

وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا .

অর্থাৎ—"যারা পয়গম্বরের সঙ্গে রয়েছে, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পর সদয়। তুমি তাদের রুকূ-সিজদা করতে দেখবে। তারা আল্লাহ্র কৃপা ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে।"

এ কারণেই তাঁরা যে দিকে পা বাড়াতেন, সাফল্য ও কৃতকার্যতা তাঁদের পদ চুম্বন করত এবং আল্লাহ্র সাহায্য ও সমর্থন তাঁদের সাথে থাকত। তাঁদের বিস্ময়কর কীর্তিসমূহ আজও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার মস্তিষ্ককে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। বলা বাহুল্য, এগুলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেরই ফল। বর্তমান পৃথিবীতে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের চিন্তা সবাই করেন। কিন্তু শিক্ষার প্রাণ সংশোধনের দিকে মোটেই মনোযোগ দেওয়া হয় না। অর্থাৎ শিক্ষক ও গুরুর চারিত্রিক সংশোধন এবং সংস্কারক-সুলভ প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয় না। ফলে হাজারো চেষ্টা-যত্নের পরও এমন কৃতী পুরুষের সৃষ্টি হয় না, যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বলিষ্ঠতা অন্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং অন্যকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষকেরা যে ধরনের জ্ঞান ও চরিত্রের অধিকারী হবেন, তাদের শিক্ষাধীন ছাত্ররাও সে ধরনের জ্ঞান ও চরিত্রের অধিকারী হতে পারবে। এ কারণে শিক্ষাকে কল্যাণকর ও উন্নত করতে হলে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন-পরিবর্ধনের চাইতে শিক্ষকদের শিক্ষাগত, কর্মগত ও চরিত্রগত অবস্থার দিকে বেশি করে নজর দেওয়া আবশ্যক।

এ পর্যন্ত নবুয়ত ও রিসালতের তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হলো। পরিশেষে সংক্ষেপে আরও জানা প্রয়োজন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর অর্পিত তিনটি কর্তব্য তিনি কতদূর বাস্তবায়ন করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্য কতটুকু হয়েছে ? এর জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, তাঁর তিরোধানের সময় সমগ্র আরব উপত্যকার ঘরে ঘরে কোরআন তিলাওয়াত হতো। হাজার হাজার হাফেজ ছিলেন। শত শত লোক দৈনিক অথবা প্রতি তৃতীয় দিনে কোরআন খতম করতেন। কোরআন ও হিকমত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

یتیمے کہ ناکردہ قرآں درست * کتب خانہ چند ملت بشست

"সেই ব্যক্তি প্রকৃত অনাথ যে ঠিকমত কোরআন পাঠে সক্ষম নয়।"

বিশ্বের সমগ্র দর্শন কোরআনের সামনে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। তওরাত ও ইন্জীলের বিকৃত সংকলনসমূহ গল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছিল, কিন্তু কোরআনের নীতিমালাকে সম্মান ও শিষ্টাচারের মানদণ্ড বলে গণ্য করা হতো। অপরদিকে 'তাযকিয়া' তথা পবিত্রকরণও চরম

উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এককালের দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরাও চরিত্র-দর্শনের শ্রেষ্ঠ গুরুত্ব আসনে আসীন হয়েছিলেন। চরিত্রহীনতার রোগীরা শুধু রোগমুক্তই হয়নি। সফল চিকিৎসকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। যারা দস্যু ছিল তারা পথপ্রদর্শক হয়ে গেল। মূর্তিপূজারীরা মূর্তমান ত্যাগ ও সহানুভূতিশীল হয়ে গিয়েছিল। কঠোরতা ও যুদ্ধলিপ্সার স্থলে নম্রতা ও পারস্পরিক শান্তি বিরাজমান ছিল। এক সময় ডাকাতিই যাদের পেশা ছিল, তারাই মানুষের ধন-সম্পদের রক্ষকে পরিণত হয়েছিল।

মোটকথা, হযরত খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর দোয়ার ফলে যে তিনটি কর্তব্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর অর্পিত হয়েছিল, তাতে তিনি স্বীয় জীবদ্দশায়ই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর সহচরগণ এগুলোকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে তথা সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত করে দেন।

فصلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا بعدد من صلى وصام وقعد وقام .

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾ وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

(১৩০) **ইবরাহীমের ধর্ম থেকে কে মুখ ফেরায় ? কিন্তু সে ব্যক্তি যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে। নিশ্চয়ই আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং সে পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (১৩১) স্মরণ কর, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন ঃ অনুগত হও। সে বলল ঃ আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম। (১৩২) এরই ওসিয়ত করেছে ইবরাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না।**

سفه نفسه এখানে سفه অর্থ অজ্ঞতা বিখ্যাত পণ্ডিত ফাররা তাই বলেছেন। হযরত শায়খুল হিন্দ (র) এ মতই অবলম্বন করেছেন। সুতরাং প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী سفه نفسه অর্থ হবে যে, নিজের সত্তাগতভাবে নির্বোধ। এটাই তফসীরের সার-সংক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা মোতাবেক অর্থ হবে এই যে, ইবরাহীমী মিল্লাত থেকে সে-ই বিমুখতা অবলম্বন করতে পারে, যে মনস্তাত্ত্বিকভাবেও মূর্খ হবে। অর্থাৎ নিজের সত্তা সম্পর্কেও

যার কোন জ্ঞান নেই—অর্থাৎ আমি কে বা কি, সে সম্বন্ধে সে অজ্ঞ। কয়েকটা জাতির গ্রন্থাগার আয়ত্ত করার পরও তার সে এতীমী ঘুচে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইবরাহীমের ধর্ম থেকে ঐ ব্যক্তিই মুখ ফেরাবে, যে নিজের সম্পর্কে বোকা। (এমন ধর্ম বর্জনকারীকে বোকাই বলা হবে। এ ধর্মের অবস্থা এই যে, এর কারণেই) আমি তাকে [অর্থাৎ ইবরাহীম (আ)-কে রসূল পদের জন্যে] পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং (এরই কারণে) সে পরকালে অন্যান্য যোগ্য লোকের অন্তর্ভুক্ত (যারা সবকিছুই পাবে। রসূল পদের জন্য এ মনোনয়ন তখন হয়েছিল,) যখন তার পালনকর্তা (ইল্হামের মাধ্যমে) তাকে বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য অবলম্বন কর। তিনি বললেন, আমি বিশ্বপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম। (এহেন আনুগত্য অবলম্বনের ফলে আমি তাকে নবুয়তের মর্যাদা দান করলাম। তা তখনই হোক কিংবা কিছুদিন পর) বর্ণিত ধর্মের উপর কায়েম থাকার নির্দেশ ইবরাহীম তদীয় সন্তানদের দিয়েছেন এবং ইয়াকুবও (তাই করেছেন)। (নির্দেশের ভাষা ছিল এই,) হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (ইসলাম ও আল্লাহ্র আনুগত্যের) এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা (মৃত্যু পর্যন্ত একে পরিত্যাগ করো না এবং) ইসলাম ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইবরাহীমী ধর্মের মৌলিক নীতিমালা, তার অনুসরণের তাগিদ এবং তা থেকে বিমুখতার অনিষ্টতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, এতে ইবরাহীমী ধর্মের অনুসরণ সম্পর্কে ইহুদী ও খৃষ্টানদের দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। একমাত্র ইসলামই যে ইবরাহীমী ধর্মের অনুরূপ এবং ইসলাম যে সকল পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম—এসব বিষয়ও উল্লিখিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে সন্তানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের প্রতি পয়গম্বরগণের বিশেষ মনোযোগের কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতে ইবরাহীমী দীনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর দৌলতেই ইহকাল ও পরকালে ইবরাহীম (আ)-এর সম্মান লাভের কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এ ধর্ম থেকে বিমুখ হয় সে নির্বোধদের স্বর্গে বাস করে।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ .

অর্থাৎ—ইবরাহীমী ধর্ম থেকে সে ব্যক্তিই মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, যার বিন্দুমাত্রও বোধশক্তি নেই। কারণ, এ ধর্মটি হুবহু স্বভাব-ধর্ম। কোন সুস্থ-স্বভাব ব্যক্তি এ ধর্মকে অস্বীকার করতে পারে না। পরবর্তী আয়াতে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ এতেই এ ধর্মের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ধর্মের বদৌলতেই হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ইহকালে সম্মান ও মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং পরকালেও। ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাত্ম্য সারা বিশ্বই প্রত্যক্ষ করেছে। নমরূদের মত পরাক্রমশালী সম্রাট ও তার পারিষদবর্গ এই মহাপুরুষের একার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, ক্ষমতার যাবতীয় কলাকৌশল তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে এবং সর্বশেষে ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে তাঁকে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু জগতের যাবতীয় উপাদান ও শক্তি যে অসীম ক্ষমতাবানের আজ্ঞাধীন, তিনি নমরূদের সমস্ত পরিকল্পনাকে ধূলিসাৎ করে দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রচণ্ড আগুনকেও স্বীয় দোস্তের জন্য পুষ্পোদ্যানে

পরিণত করে দিলেন। ফলে বিশ্বের সমগ্র জাতি তাঁর অপরিসীম মাহাত্ম্যের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হলো। বিশ্বের সমস্ত মু'মিন ও কাফির, এমনকি পৌত্তলিকেরাও এ মূর্তি সংহারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে। আরবের মুশরিকরা আর যাই হোক, হযরত ইবরাহীমেরই সন্তান-সন্ততি ছিল। এ কারণে মূর্তিপূজা সত্ত্বেও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্মান ও মাহাত্ম্য মনেপ্রাণে স্বীকার করত এবং তাঁরই ধর্ম অনুসরণের দাবি করত। ইবরাহীমী ধর্মের কিছু অস্পষ্ট চিহ্ন তাদের কাজেকর্মেও বিদ্যমান ছিল। হজ্জ, ওমরা, কোরবানী ও অতিথিপরায়ণতা এ ধর্মেরই নিদর্শন। তবে তাদের মূর্খতার কারণে এগুলো বিকৃত হয়ে পড়েছিল। বলা বাহুল্য, এটা ঐ নেয়ামতেরই ফল—যার দরুন খলীলুল্লাহ্ (আ)-কে 'মানব নেতা' উপাধি দেওয়া হয়েছিলঃ

اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۔

ইবরাহীম (আ) ও তাঁর ধর্মের অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য ছাড়াও এ ধর্মের জনপ্রিয়তা ও স্বভাবধর্ম হওয়ার বিষয়টি সারা দুনিয়ার সামনে প্রতিভাত হয়ে গেছে। ফলে যার মধ্যে এতটুকুও বোধশক্তি ছিল, সে এ ধর্মের সামনে মাথা নত করেছিল।

এই ছিল ইবরাহীম (আ)-এর ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা। পারলৌকিক ব্যাপারটি আমাদের সামনে উপস্থিত নেই, কিন্তু ইবরাহীম (আ)-এর মর্যাদা কোরআনের সে আয়াতেই ফুটে উঠেছে, যাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহকালে তাঁকে যেমন সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তেমনি পরকালেও তাঁর উচ্চাসন নির্ধারিত রয়েছে।

ইবরাহীমী ধর্মের মৌলনীতি আল্লাহর আনুগত্য শুধু ইসলামেই সীমাবদ্ধ ঃ অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে ইবরাহীমী ধর্মের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

অর্থাৎ-'ইবরাহীম (আ)-কে যখন তাঁর পালনকর্তা বললেন, "আনুগত্য অবলম্বন কর, তখন তিনি বললেন, আমি বিশ্বপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম।" এ বর্ণনা ভঙ্গিতে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ্ তা'আলার اَسْلِمْ (আনুগত্য অবলম্বন কর।) সম্বোধনের উত্তরে সম্বোধনেরই ভঙ্গিতে اَسْلَمْتُ لَكَ (আমি আপনার আনুগত্য অবলম্বন করলাম) বলা যেত, কিন্তু হযরত খলীল (আ) এ ভঙ্গি ত্যাগ করে اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলেছেন। অর্থাৎ আমি বিশ্বপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম। প্রথমত, এতে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর স্থানোপযোগী গুণকীর্তনও করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আমি আনুগত্য অবলম্বন করে কারো প্রতি অনুগ্রহ করিনি ; বরং এমন করাই ছিল আমার জন্য অপরিহার্য। কারণ, তিনি রাব্বুল-আলামীন—সারা জাহানের পালনকর্তা। তাঁর আনুগত্য না করে বিশ্ব তথা বিশ্ববাসীর কোনই গত্যন্তর নেই। যে আনুগত্য অবলম্বন করে, সে স্বীয় কর্তব্য পালন করে লাভবান হয়। এতে আরও জানা যায় যে, ইবরাহীমী ধর্মের মৌলনীতির যথার্থ ও স্বরূপ এক 'ইসলাম' শব্দের মধ্যেই নিহিত—যার অর্থ আল্লাহর আনুগত্য। ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের সারমর্মও তাই। ঐসব পরীক্ষার সারমর্মও তাই, যাতে উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর এই দোস্ত মর্যাদার উচ্চতর শিখরে পৌঁছেছেন। ইসলাম তথা আল্লাহর খাতিরেই সমগ্র সৃষ্টি। এরই জন্য পয়গম্বরগণ প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিল করা হয়েছে।

এতে আরও বোঝা যায় যে, ইসলামই সমস্ত পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত রসূল ইসলামের দিকেই মানুষকে আহবান করেছেন এবং তাঁরা এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে পরিচালনা করেছেন। কোরআন স্পষ্ট ভাষায় বলেছে ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ—وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ‎.

"ইসলামই আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে, তা কখনও কবূল করা হবে না।"

জগতে পয়গম্বরগণ যত ধর্ম এনেছেন, নিজ নিজ সময়ে সে সবই আল্লাহ্র কাছে মকবুল ছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে সেসব ধর্মও ছিল ইসলাম—যদিও সেগুলো বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। যেমন, মূসা (আ)-এর ধর্ম, ঈসা (আ)-এর ধর্ম, তথা ইহুদী ধর্ম, খৃস্ট ধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু এসব ধর্মের স্বরূপ ছিল ইসলাম, যার মর্ম আল্লাহ্র আনুগত্য। তবে এ ব্যাপারে ইবরাহীমী ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি নিজ ধর্মের নাম 'ইসলাম' রেখেছিলেন এবং স্বীয় উম্মতকে 'উম্মতে-মুসলিমাহ্' নামে অভিহিত করেছিলেন। তিনি দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ‎.

অর্থাৎ—"হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উভয়কে (ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে) মুসলিম (অর্থাৎ আনুগত্যশীল) কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও এক দলকে আনুগত্যকারী কর।"

হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর সন্তানদের প্রতি ওসীয়ত প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ‎.

—তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া অন্য ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করো না।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পর তাঁরই প্রস্তাবক্রমে মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মত এই বিশেষ নাম লাভ করেছে। ফলে এ উম্মতের নাম হয়েছে 'মুসলমান'। এ উম্মতের ধর্মও 'মিল্লাতে-ইসলামিয়্যাহ্' নামে অভিহিত।

কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۔ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا ‎.

"এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। তিনিই ইতিপূর্বে তোমাদের 'মুসলমান' নামকরণ করেছেন এবং এতেও (অর্থাৎ কোরআনেও) এ নামই রাখা হয়েছে।"

ধর্মের কথা বলতে গিয়ে ইহুদী, খৃস্টান এবং আরবের মুশরিকরাও বলে যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী, কিন্তু এসব তাদের ভুল ধারণা অথবা মিথ্যা দাবি মাত্র। বাস্তবে মুহাম্মদী ধর্মই শেষ যমানায় ইবরাহীমী ধর্ম তথা স্বভাব-ধর্মের অনুরূপ।

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যত পয়গম্বর আগমন করেছেন এবং যত আসমানী গ্রন্থ ও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে ইসলাম তথা আল্লাহ্র আনুগত্য। এ

আনুগত্যের সারমর্ম হলো, রিপুর কামনা-বাসনার বিপরীতে আল্লাহ্র নির্দেশের আনুগত্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ ত্যাগ করে হেদায়েতের অনুসরণ।

পরিতাপের বিষয়, আজ ইসলামের নাম উচ্চারণকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমান এ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা ধর্মের নামেও স্বীয় কামনা-বাসনারই অনুসরণ করতে চায়। কোরআন ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যাই তাদের কাছে পছন্দ, যা তাদের কামনা-বাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা শরীয়তের জামাকে টেনে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের কামনার মূর্তিতে পরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে—যাতে বাহ্যদৃষ্টিতে শরীয়তেরই অনুসরণ করছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কামনারই অনুসরণ।

গাফেলরা জানে না যে, এসব অপকৌশল ও অপব্যাখ্যার দ্বারা সৃষ্টিকে প্রতারিত করা গেলেও স্রষ্টাকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর জ্ঞান প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। তিনি মনের গোপন ইচ্ছা ও ভেদকে পর্যন্ত দেখেন ও জানেন। তাঁর কাছে খাঁটি আনুগত্য ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণীয় নয়।

কোন্ কাজে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন এবং আমার জন্য তাঁর নির্দেশ কি ? খাহেশ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে এসব প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করাই সত্যিকার ইসলাম। আল্লাহ্ কোন্ দিকে যেতে বলেন এবং কোন্ কাজের নির্দেশ দেন, তা শোনার জন্য আজ্ঞাবহ গোলামের মত সদা উৎকর্ণ থাকা উচিত। কাজটি কিভাবে করলে আল্লাহ্ কবুল করবেন এবং সন্তুষ্ট হবেন—এসব চিন্তা করাই প্রকৃত ইবাদত ও বন্দেগী।

আনুগত্য ও মহব্বতের এই যে প্রেরণা, এর পূর্ণতাই মানুষের উন্নতির সর্বশেষ স্তর। এ স্তরকেই 'মাকামে আবদিয়াত' তথা দাসত্বের স্তর বলা হয়। এখানে পৌঁছেই হযরত ইবরাহীম (আ) 'খলীল' উপাধি লাভ করেছিলেন এবং মহানবী (সা) عـبـدنـا (আমার দাস) উপাধিতে ভূষিত হন। এ স্তরের নীচেই রয়েছে আউলিয়া ও কুতুবদের স্তর। এটাই সত্যিকার তওহীদ, যা অর্জিত হলে মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করে না, কারও কাছে কিছু আশা করে না।

মোটকথা, ইসলামের অর্থ ও স্বরূপ হচ্ছে আল্লাহ্র আনুগত্য। এ আনুগত্যের পথ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্ অনুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ সম্পর্কে কোরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

—"আপনার পালনকর্তার কসম, তারা কখনও ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত না তারা আপনাকে নিজেদের কলহ-বিবাদে বিচারক নিযুক্ত করে, অতঃপর আপনার সিদ্ধান্ত ও মীমাংসাকে খোলা ও সরল মনে স্বীকার করে নেয়।"

উল্লিখিত আয়াতে ইবরাহীম (আ) সন্তানদের ওসীয়ত করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করবে না। অর্থাৎ ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন করতে থাকবে, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মৃত্যুও ইসলামের উপরই দান করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা জীবনে যে অবস্থাকে আঁকড়ে থাকবে, তোমাদের মৃত্যুও সে অবস্থাতেই হবে এবং

হাশরের ময়দানেও সে অবস্থাতেই উপস্থিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন রীতিও তাই। যে বান্দা সৎকর্মের ইচ্ছা করে এবং সেজন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সে কর্মেরই সামর্থ্য দান করেন এবং তার জন্য তা সহজ করে দেন।

এক্ষেত্রে অপর এক হাদীস থেকে বাহ্যত এর বিপরীত অর্থও বোঝা যায়। তাতে বলা হয়েছে, "কেউ কেউ জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের কাজ করতে করতে জান্নাতের নিকটবর্তী হয়ে যায়, যখন জান্নাত এবং তার মাঝে মাত্র এক হাতের ব্যবধান থাকে, তখন তার ভাগ্য বিরূপ হয়ে ওঠে। ফলে সে দোযখীদের মত কাজ করতে আরম্ভ করে। পরিণামে সে দোযখে প্রবেশ করে। এমনিভাবে কেউ কেউ সারা জীবন দোযখের কাজে লিপ্ত থাকে, দোযখ এবং তার মাঝে যখন এক হাতের ব্যবধান থাকে, তখন তার ভাগ্য প্রসন্ন হয়ে ওঠে। ফলে সে জান্নাতীদের মত কাজ করতে আরম্ভ করে; পরিণামে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।" প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসটি বিপরীত অর্থ বোঝায় না। কারণ, কোন কোন জায়গায় এ হাদীসেই فيما يبدو للناس কথাটি যুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সারা জীবন জান্নাতের কাজ করে অবশেষে দোযখের কাজে লিপ্ত হয়, প্রকৃতপক্ষে পূর্বেও সে দোযখের কাজেই লিপ্ত থাকে, কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে মানুষ তাকে জান্নাতের কাজে লিপ্ত মনে করে। এমনিভাবে, যে ব্যক্তি সারা জীবন দোযখের কাজে লিপ্ত থাকে এবং অবশেষে জান্নাতের কাজ করতে থাকে, সেও প্রকৃতপক্ষে পূর্বেও জান্নাতের কাজই করে থাকে, কিন্তু মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা দোযখের কাজ বলে মনে হয়।-(ইবনে-কাসীর)

মোটকথা, যে ব্যক্তি সারা জীবন সৎকাজে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা ও রীতি অনুযায়ী আশা করা দরকার যে, তার মৃত্যুও সৎকাজের মধ্যেই হবে।

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

---

(১৩৩) তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয় ? যখন সে সন্তানদের বলল ঃ আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে ? তারা বলল, আমরা তোমার, তোমার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের প্রভুর ইবাদত করব। তিনি একক উপাস্য। (১৩৪) আমরা সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। তারা ছিল এক সম্প্রদায়—যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদেরই জন্য। তারা কি করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তোমরা কোন নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ উদ্ধৃতির মাধ্যমে উপরোক্ত দাবি করছ, না) তোমরা (স্বয়ং তখন সেখানে) উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের অন্তিম সময় নিকটবর্তী হয় ? (এবং) যখন তিনি সন্তানদের (অঙ্গীকার নবায়নের জন্য) বলেন, তোমরা আমার (মৃত্যুর) পরে কিসের ইবাদত করবে ? (তখন) তারা সর্বসম্মতিক্রমে উত্তর দেয় ঃ আমরা (সেই পবিত্র সত্তারই) ইবাদত করব, যার ইবাদত তুমি, তোমার পিতৃপুরুষ (হযরত) ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক করে এসেছেন। (অর্থাৎ) সেই প্রভুর, যিনি এক ও অদ্বিতীয়। আমরা (বিধি-বিধানে) তাঁর আনুগত্যের উপর (কায়েম) থাকব। তারা ছিল (সে সব পূর্ব-পুরুষদের) এক সম্প্রদায়, যারা (নিজ নিজ যমানায়) গত হয়েছেন। তাদের কর্ম তাদের কাজে আসবে এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের কাজে আসবে। তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাও করা হবে না। (শুধু শুধু আলোচনাও হবে না—তা দ্বারা তোমাদের উপকার তো দূরের কথা।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর ধর্ম ইসলামের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, ইবরাহীমের ধর্ম বলুন, আর ইসলামই বলুন, তা সমগ্র জাতি বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যই এক অনন্য নির্দেশনামা। এমতাবস্থায় আয়াতে যে বিশেষভাবে ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আ) কর্তৃক সন্তানদের সম্বোধন করার কথা বলা হয়েছে এবং উভয় মহাপুরুষ ওসীয়তের মাধ্যমে স্বীয় সন্তানদেরকে যে ইসলামে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণ কি ?

উত্তর এই যে, এতে বোঝা যায় যে, সন্তানের ভালবাসা ও মঙ্গলচিন্তা রিসালত এমনকি বন্ধুত্বের স্তরেরও পরিপন্থী নয়। আল্লাহ্‌র বন্ধু, যিনি এক সময় পালনকর্তার ইঙ্গিতে স্বীয় আদরের দুলালকে কোরবানী করতে কোমর বেঁধেছিলেন, তিনিই অন্য সময় সন্তানের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য তাঁর পালনকর্তার দরবারে দোয়াও করেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সন্তানকে এমন বিষয় দিয়ে যেতে চান, যা তাঁর দৃষ্টিতে সর্ববৃহৎ নেয়ামত অর্থাৎ ইসলাম। উল্লেখিত আয়াত وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ আর আয়াত اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِىْ এর সারমর্মও তাই। পার্থক্য এতটুকু যে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নেয়ামত ও ধন-সম্পদ হচ্ছে দুনিয়ার ধ্বংসশীল ও নিকৃষ্ট বস্তু নিয়ে। অথচ পয়গম্বরগণের দৃষ্টি অনেক উর্ধ্বে। তাঁদের কাছে প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম তথা ইসলাম।

সাধারণ মানুষ মৃত্যুর সময় সন্তানকে বৃহত্তম ধন-সম্পদ দিয়ে যেতে চায়। আজকাল একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী কামনা করে—তার সন্তান মিল-ফ্যাক্টরীর মালিক হোক, আমদানি ও রফতানির বড় বড় লাইসেন্স লাভ করুক, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স গড়ে তুলুক। একজন চাকরিজীবী চায়—তার সন্তান উচ্চপদ ও মোটা বেতনে চাকরি করুক। অপরদিকে একজন শিল্পপতি মনেপ্রাণে কামনা করে—তার সন্তান শিল্পক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করুক। সে সন্তানকে সারা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ কলাকৌশল বলে দিতে চায়।

এমনিভাবে পয়গম্বর এবং তাঁদের অনুসারী ওলীগণের সর্ববৃহৎ বাসনা থাকে, যে বস্তুকে তাঁরা সত্যিকার চিরস্থায়ী এবং অক্ষয় সম্পদ মনে করেন, তা সন্তানরাও পুরোপুরিভাবে লাভ করুক। এজন্যই তাঁরা দোয়া করেন এবং চেষ্টাও করেন। অন্তিম সময়ে এরই জন্য ওসীয়ত করেন।

ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষাদানই সন্তানের জন্য বড় সম্পদ ঃ পয়গম্বরগণের এই বিশেষ আচরণের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্যও একটি নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, তারা যেভাবে সন্তানদের লালন-পালন ও পার্থিব আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে, সেভাবে, বরং তার চাইতেও বেশি তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা দরকার। মন্দ পথ ও মন্দ কার্যকলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক। এরই মধ্যে সন্তানদের সত্যিকার ভালবাসা ও প্রকৃত শুভেচ্ছা নিহিত। এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে, সন্তানকে রৌদ্রের তাপ থেকে বাঁচাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, কিন্তু চিরস্থায়ী অগ্নি ও আযাবের কবল থেকে রক্ষা করার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না। সন্তানের দেহ থেকে কাঁটা বের করার জন্য সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাকে বন্দুকের গুলী থেকে রক্ষা করবে না।

পয়গম্বরদের এ কর্মপদ্ধতি থেকে আরও একটি মৌলিক বিষয় জানা যায় যে, সর্বপ্রথম সন্তানদের মঙ্গলচিন্তা করা এবং এরপর অন্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া পিতা-মাতার কর্তব্য। পিতামাতার নিকট থেকে এটাই সন্তানদের প্রাপ্য। এতে দু'টি রহস্য নিহিত রয়েছে—প্রথমত, প্রাকৃতিক ও দৈহিক সম্পর্কের কারণে তারা পিতামাতার উপদেশ সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করবে। অতঃপর সংস্কার প্রচেষ্টায় ও সত্য প্রচারে তারা পিতামাতার সাহায্যকারী হতে পারবে।

দ্বিতীয়ত, এটাই সত্য প্রচারের সবচাইতে সহজ ও উপযোগী পথ যে, প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের সংশোধনের কাজে মনেপ্রাণে আত্মনিয়োগ করবে। এভাবে সত্য প্রচার ও সত্য শিক্ষার কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে পরিবারের লোকজনের শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র জাতিরও শিক্ষা হয়ে যায়। এ সংগঠন-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করেই কোরআন বলে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا .

—"হে মু'মিনগণ, নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর।"

মহানবী (সা) ছিলেন সারা বিশ্বের রসূল। তাঁর হেদায়েত কিয়ামত পর্যন্ত সবার জন্য ব্যাপক। তাঁকেও সর্বপ্রথম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ (নিকট-আত্মীয়দেরকে আল্লাহর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন)। আরও বলা হয়েছে ঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا অর্থাৎ—পরিবার-পরিজনকে নামায পড়ার নির্দেশ দিন এবং নিজেও নামায অব্যাহত রাখুন।

মহানবী (সা) সর্বদাই এ নির্দেশ পালন করেছেন।

তৃতীয়ত, আরও একটি রহস্য এই যে, কোন মতবাদ ও কর্মসূচীতে পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন সহযোগী ও সমমনা না হলে সে মতবাদ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ কারণেই প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা)-এর প্রচারকার্যের জওয়াবে সাধারণ লোকদের উত্তর ছিল যে, প্রথমে আপনি নিজ গোত্র কোরায়েশকে ঠিক করে নিন; এরপর আমাদের কাছে আসুন। হুযূর (সা)-এর পরিবারে যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করল এবং মক্কা বিজয়ের সময় তা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করল, তখন এর প্রতিক্রিয়া কোরআনের ভাষায় এরূপ পেল- يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا অর্থাৎ—মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে।

আজকাল ধর্মহীনতার যে সয়লাব শুরু হয়েছে, তার বড় কারণ এই যে, পিতামাতা নিজ ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী ও ধার্মিক হলেও সন্তানদের ধার্মিক হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করে না। সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টি সন্তানের পার্থিব ও স্বল্পকালীন আরাম-আয়েশের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং আমরা এর ব্যবস্থাপনায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকি। অক্ষয় ধন-সম্পদের দিকে মনোযোগ দিই না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে তওফীক দিন, যাতে আমরা আখেরাতের চিন্তায় ব্যাপৃত হই এবং নিজের ও সন্তানদের জন্য ঈমান ও নেক আমলাকে সর্ববৃহৎ পুঁজি মনে করে তা অর্জনে চেষ্টিত হই।

দাদার উত্তরাধিকার সম্পর্কিত একটি মাসআলা ঃ আয়াতে ইয়াকুব (আ)-এর সন্তানদের পক্ষ থেকে উত্তরে اِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ। (আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ্) বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দাদাকেও পিতা বলা হয় এবং দাদা ও পিতার একই হুকুম। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াতদৃষ্টে বলেছেন যে, উত্তরাধিকার স্বত্বে দাদাও পিতার মত সম-অংশীদার।

বাপ-দাদার কৃতকর্মের ফলাফল সন্তানরা ভোগ করবে না ঃ لَهَا مَا كَسَبَتْ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, বাপ-দাদার সৎকর্ম সন্তানদের উপকারে আসবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা সৎকর্ম সম্পাদন করবে। এমনিভাবে বাপ-দাদার কুকর্মের শাস্তিও সন্তানরা ভোগ করবে না, যদি তারা সৎকর্মশীল হয়। এতে বোঝা যায় যে, মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি সাবালক হওয়ার পূর্বে মারা গেলে পিতামাতার কুফর ও শিরকের কারণে তারা শাস্তি ভোগ করবে না। এতে ইহুদীদের সে দাবিও ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হলো যে, আমরা যা ইচ্ছা তা-ই করব, আমাদের বাপ-দাদার সৎকর্মের দ্বারাই আমাদের মাগফেরাত হয়ে যাবে। আজকাল সৈয়দ পরিবারের কিছু লোকও এমনি বিভ্রান্তিতে লিপ্ত যে, আমরা রসূলের আওলাদ। আমরা যা-ই করি না কেন, আমাদের মাগফেরাত হয়েই যাবে।

কোরআন এ বিষয়টি বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا (প্রত্যেকের আমলের দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে)। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى (কিয়ামতের দিন একজনের বোঝা অন্যজন বহন করবে না।) রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

হে বনী হাশেম! এমন যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোক নিজ নিজ সৎকর্ম নিয়ে আসবে আর তোমরা আসবে সৎকর্ম থেকে উদাসীন হয়ে শুধু বংশ গৌরব নিয়ে এবং আমি বলব যে, আল্লাহর আযাব থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারব না। অন্য এক হাদীসে আছে ঃ

مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (আমল যাকে পেছনে ফেলে দেয়, বংশ তাকে এগিয়ে নিতে পারে না)।

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

(১৩৫) তারা বলে, তোমরা ইহুদী অথবা খৃস্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে। আপনি বলুন, কখনই নয়; বরং আমরা ইবরাহীমের ধর্মে আছি, যাতে বক্রতা নেই। সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১৩৬) তোমরা বল, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর ঈমান এনেছি। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।'

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (ইহুদী ও খৃস্টানরা মুসলমানদের) বলে ঃ তোমরা ইহুদী হয়ে যাও (এটা ইহুদীদের কথা) অথবা খৃস্টান হয়ে যাও (এটা খৃস্টানদের উক্তি), তবে তোমরাও সুপথ পাবে। (হে মুহাম্মদ,) আপনি (উত্তরে) বলে দিন ঃ আমরা (ইহুদী অথবা খৃস্টান কখনও হব না) বরং ইবরাহীমের ধর্মে (অর্থাৎ ইসলামে) থাকব—যাতে নামমাত্রও বক্রতা নেই। (এর বিপরীতে ইহুদীবাদ ও খৃস্টবাদে তা রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে বক্রতা রয়েছে।) ইবরাহীম (আ) মুশরিকও ছিলেন না। (মুসলমানগণ, ইহুদী ও খৃস্টানদের উত্তরে তোমরা যে সংক্ষেপে বলেছ

যে, ইবরাহীমের ধর্মেই থাকবে, এখন এ ধর্মের বিবরণ দান প্রসঙ্গে) তোমরা বল ঃ (এ ধর্মে থাকার তাৎপর্য এই যে,) আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং (ঐ নির্দেশের উপরও) যা আমাদের প্রতি (রসূলের মাধ্যমে) অবতীর্ণ হয়েছে এবং (ঐ নির্দেশ ও মো'জেযার উপরও) যা হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (আ) ও তদীয় বংশধরদের (মধ্যে যারা পয়গম্বর ছিলেন, তাদের) প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং (ঐ নির্দেশ ও মো'জেযার উপরও) যা হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-কে প্রদান করা হয়েছে এবং (ঐ নির্দেশের উপরও) যা অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে। (আমরা তৎসমুদয়ের উপরই ঈমান রাখি। ঈমানও এমনভাবে যে,) আমরা তাঁদের মধ্যে (কোন একজনের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে অন্যজন থেকে) পার্থক্য করি না (যে একজনের প্রতি ঈমান আনব, আরেকজনের প্রতি আনব না।) আমরা আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্যশীল (তিনি 'ধর্ম' বলে দিয়েছেন, আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা যে ধর্মে আছি, তার সারমর্ম তা-ই। কারও পক্ষে একে অস্বীকার করার অবকাশ নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআন ইয়াকুব (আ)-এর বংশধরকে اسباط শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এটা سبط এর বহুবচন। এর অর্থ গোত্র ও দল। তাদের سبط বলার কারণ এই যে, হযরত ইয়াকুব (আ)-এর ঔরসজাত পুরুষের সংখ্যা ছিল বার জন। পরে প্রত্যেক পুত্রের সন্তানরা এক-একটি গোত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বংশে বিশেষ বরকত দান করেছিলেন। তিনি যখন হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাছে মিসরে যান, তখন তাঁরা ছিলেন বার ভাই। পরে ফেরআউনের সাথে মুকাবিলার পর মূসা (আ) যখন মিসর থেকে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে বের হলেন, তখন তাঁর সাথে ইয়াকুব (আ)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের সন্তান হাজার হাজার সদস্যের সমন্বয়ে একটি গোত্র ছিল। তাঁর বংশে আল্লাহ্ তা'আলা আরও একটি বরকত দান করেছেন এই যে, দশজন নবী ছাড়া সব নবী ও রসূল ইয়াকুব (আ)-এর বংশধরের মধ্যেই পয়দা হয়েছেন। বনী ইসরাঈল ছাড়া অবশিষ্ট পয়গম্বরগণ হলেন আদম (আ)-এর পর হযরত নূহ (আ), শোয়াইব (আ), হুদ (আ), সালেহ (আ), লূত (আ), ইবরাহীম (আ), ইসহাক (আ), ইয়াকুব (আ), ইসমাঈল (আ) ও মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾

(১৩৭) অতএব তারা যদি ঈমান আনে তোমাদের ঈমান আনার মত, তবে তারা সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (১৩৮) আমরা আল্লাহ্র রঙ গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্র রঙ-এর চাইতে উত্তম রঙ আর কার হতে পারে ? আমরা তাঁরই ইবাদত করি।

অভিধান ও অলংকার

اَلشِّقَاقُ –বায়দাভী বলেন, এটা হলো বিরোধ ও শত্রুতা। সুতরাং সমস্ত বিরোধীই তাদের নিজ নিজ অবস্থানে বিদ্যমান। شق – اَلصِّبْغَةُ 'সিবগুন' থেকে উদ্ভূত। صبغ হলো রঙের দরুন এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় প্রত্যাবর্তন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতএব, (পূর্ববর্তী বর্ণনায় যখন সত্যধর্ম ইসলামেই সীমাবদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে, তখন) যদি তারাও (ইহুদী ও খৃস্টানরাও) তেমন ঈমান আনে, যেমন তোমরা (মুসলমানরা) ঈমান এনেছ, তবে তারাও সুপথ পাবে। আর যদি তারা (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (তোমরা তাদের বিমুখতায় বিস্মিত হয়ো না। কারণ,) তারা (সর্বদাই) বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত রয়েছে। এখন (তাদের বিরুদ্ধাচরণের ফলে কোনরূপ বিপদাশঙ্কা থাকলে জেনে নিন,) আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট। (আপনার ও তাদের কথাবার্তা) তিনি শ্রবণ করেন এবং (আপনার ও তাদের আচরণ) জানেন (আপনার চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না)।

(হে মুসলমানগণ! বলে দাও যে, ইতিপূর্বে তোমাদের উত্তরে আমরা বলেছিলাম, 'আমরা ইবরাহীমের ধর্মে আছি' এর স্বরূপ এই যে,) আমরা (ধর্মের) ঐ অবস্থায় থাকব, যাতে আল্লাহ্ আমাদের রাঙিয়ে দিয়েছেন (এবং তা রঙের মত আমাদের শিরা-উপশিরায় ভরে দিয়েছেন)। অন্য আর কে আছে, যার রাঙিয়ে দেওয়ার অবস্থা আল্লাহ্র (রাঙিয়ে দেওয়ার অবস্থার) চাইতে উত্তম হবে ? (অন্য কেউ যখন এমন নেই, তখন আমরা অন্য কারও ধর্ম অবলম্বন করিনি এবং এ কারণেই) আমরা তাঁরই দাসত্ব অবলম্বন করেছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ঈমানের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যাখ্যা ঃ فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ (যদি তারা তদ্রূপ ঈমান আনে, যেরূপ তোমরা ঈমান এনেছ)-সূরা বাকারার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত ঈমানের স্বরূপ কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। কেননা, 'তোমরা ঈমান এনেছ' বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতে তাঁদের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ঈমান হচ্ছে সে রকম ঈমান, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবায়ে

কেরাম অবলম্বন করেছেন। যে ঈমান ও বিশ্বাস এ থেকে চুল পরিমাণও ভিন্ন; তা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

এর ব্যাখ্যা এই যে, যে সব বিষয়ের উপর তাঁরা ঈমান এনেছেন তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারবে না। তাঁরা যেরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ঈমান এনেছেন, তাতেও প্রভেদ থাকতে পারবে না। নিষ্ঠায় পার্থক্য হলে তা 'নিফাক' তথা কপট বিশ্বাসে পর্যবসিত হবে। আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী, ফেরেশতা, নবী-রসূল, আল্লাহ্র কিতাব ও এ সবের শিক্ষা সম্বন্ধে যে ঈমান ও বিশ্বাস রসূলুল্লাহ (সা) অবলম্বন করেছেন, একমাত্র তাই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য। এ সবের বিপরীত ব্যাখ্যা করা অথবা ভিন্ন অর্থ নেওয়া আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ফেরেশতা ও নবী-রসূলগণের যে মর্তবা, মর্যাদা ও স্থান নির্ধারিত হয়েছে, তা হ্রাস করা অথবা বাড়িয়ে দেওয়াও ঈমানের পরিপন্থী।

এ ব্যাখ্যার ফলে কতিপয় ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ঈমানের ত্রুটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা ঈমানের দাবিদার; কিন্তু ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঈমানের মৌখিক দাবি মূর্তিপূজক, মুশরিক, ইহুদী, খৃস্টানরাও করত এবং এর প্রতিটা যুগে ধর্মভ্রষ্ট বিপথগামীরাও করছে। যেহেতু আল্লাহ্, রসূল, ফেরেশতা, কিয়ামত-দিবস ইত্যাদির প্রতি তাদের ঈমান তেমন নয়, যেমন রসূলুল্লাহ (সা)-এর ঈমান, এ কারণে আল্লাহ্র কাছে ধিক্কৃত ও গ্রহণের অযোগ্য।

ফেরেশতা ও রসূলের মহত্ত্ব ও ভালবাসার ভারসাম্য বজায় রাখা কর্তব্য, বাড়াবাড়ি পথভ্রষ্টতা ঃ মুশরিকদের কেউ কেউ ফেরেশতাদের অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না, আবার কেউ কেউ তাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা বলে মনে করে। بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ বলে উপরোক্ত উভয় প্রকার বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। ইহুদী ও খৃস্টানদের কোন কোন দল পয়গম্বরদের অবাধ্যতা করেছে। এমনকি কোন কোন পয়গম্বরকে হত্যাও করেছে। পক্ষান্তরে কোন কোন দল পয়গম্বরদের সম্মান ও মহত্ত্ব বৃদ্ধি করতে গিয়ে তাঁদের 'খোদা' অথবা 'খোদার পুত্র' অথবা খোদার সমপর্যায়ে নিয়ে স্থাপন করেছে। এ উভয় প্রকার ত্রুটি ও বাড়াবাড়িকেই পথভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ইসলামী শরীয়তে রসূলের মহত্ত্ব ও ভালবাসা ফরয তথা অপরিহার্য কর্তব্য। এ ছাড়া ঈমানই শুদ্ধ হয় না। কিন্তু রসূলকে এলেম, কুদরত ইত্যাদি গুণে আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করা পথভ্রষ্টতা ও শিরক। কোরআনে শিরকের স্বরূপ সেরূপই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ কোন সিফাত তথা গুণে বা বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে অন্যকে আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থও তাই। আজকাল কোন কোন মুসলমান রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'আলেমুল-গায়েব' 'আল্লাহ্র মতই সর্বত্র বিরাজমান' উপস্থিত ও দর্শক (হাযির ও নাযির) বলেও বিশ্বাস করে। তারা মনে করে যে, এভাবে তারা মহানবী (সা)-এর মহত্ত্ব ও মহব্বত ফুটিয়ে তুলছে। অথচ এটা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ ও আজীবন সাধনার প্রকাশ্য বিরোধিতা। আলোচ্য আয়াতে এসব মুসলমানের জন্যও শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ্র কাছে মহানবী (সা)-এর মহত্ত্ব ও মহব্বত এতটুকু কাম্য, যতটুকু সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে তাঁর প্রতি ছিল। এতে ত্রুটি করাও অপরাধ এবং একে বাড়িয়ে দেওয়াও বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা।

নবী ও রসূলের যে কোন রকম মনগড়া প্রকারভেদই পথভ্রষ্টতা ঃ এমনিভাবে কোন কোন সম্প্রদায় খতমে নবুয়ত অস্বীকার করে নতুন নবীর আগমনের পথ খুলে দিতে চেয়েছে। তারা কোরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' (সর্বশেষ নবী)-কে উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিবন্ধক মনে করে নবী ও রসূলের অনেক মনগড়া প্রকার আবিষ্কার করে নিয়েছে। এসব প্রকারের নাম রেখেছে 'নবী যিল্লী' (ছায়া-নবী) 'নবী বুরুযী' (প্রকাশ্য নবী) ইত্যাদি। আলোচ্য আয়াতটি তাদের অবিমৃশ্যকারিতা ও পথভ্রষ্টতাকেও ফুটিয়ে তুলেছে। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা) রসূলগণের উপর যে ঈমান এনেছেন, তাতে 'যিল্লী বুরুযী' বলে কোন নামগন্ধও নেই। সুতরাং এটা পরিষ্কার ধর্মদ্রোহিতা।

আখেরাতের উপর ঈমান সম্পর্কে কোন অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় ঃ কিছুসংখ্যক লোকের মস্তিষ্ক ও চিন্তা-ভাবনা শুধু বস্তু ও বস্তুবাচক বিষয়াদির মধ্যেই নিমজ্জিত। অদৃশ্যজগৎ ও পরজগতের বিষয়াদি তাদের মতে অবান্তর ও অযৌক্তিক। তারা এসব ব্যাপারে নিজ থেকে নানাবিধ ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয় এবং একে দীনের খেদমত বলে মনে করে। তারা এসব জটিল বিষয়কে বোধগম্য করে দিয়েছে বলে মনে করে গর্বও করে। কিন্তু এসব ব্যাখ্যা بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ উক্তির পরিপন্থী হওয়ার কারণে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। আখেরাতের অবস্থা ও ঘটনাবলী কোরআন ও হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, বিনা দ্বিধায় ও বিনা ব্যাখ্যায় তা বিশ্বাস করাই প্রকৃতপক্ষে ঈমান। হাশরের পুনরুত্থানের পরিবর্তে আত্মিক পুনরুত্থান স্বীকার করা এবং আযাব, সওয়াব, আমল, ওজন ইত্যাদি বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা বর্ণনা করা সবই গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারণ।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেছেন ঃ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ বাক্যে বলা হয়েছে যে,—আপনি বিরুদ্ধাচরণকারীদের ব্যাপারে মোটেও চিন্তা করবেন না। আমি স্বয়ং তাদের বুঝে নেব। এ বিষয়টি وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (আল্লাহ্ আপনাকে শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা করছেন) —আয়াতে আরও পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ নিজেই তাদের হাত থেকে আপনাকে হেফাযত করবেন।

দীন ও ঈমানের এক সুগভীর নমুনা রয়েছে, যা মানুষের আকার-অবয়বে বিধৃত হওয়া প্রয়োজন ঃ صِبْغَةَ اللَّهِ . . . . . পূর্ববর্তী আয়াত مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا বলে ইসলামকেই ইবরাহীমের ধর্ম বলা হয়েছিল। এ আয়াতে ইসলামকে সরাসরি আল্লাহ্র ধর্ম আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র ধর্মই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম। তবে রূপক অর্থে কোন পয়গম্বরের দিকে সম্বন্ধ করে একে সে পয়গম্বরের ধর্ম বলা হয়। এখানে ধর্মকে صِبْغَة (রঙ) বা নমুনা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। এতে প্রথমত খৃষ্টানদের একটি কুসংস্কারের খণ্ডন করা হয়েছে। কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা সপ্তম দিনে তাকে রঙীন পানিতে গোসল করাত এবং খত্‌নার পরিবর্তে একেই সন্তানের পবিত্রতা এবং খৃষ্টধর্মের গভীর রঙে রাঙানো বলে মনে করত। আয়াতে বলা হয়েছে যে, পানির এ রঙ ধোয়ার পরেই শেষ হয়ে যায়। খত্‌না না করার ফলে দেহে যে ময়লা ও অপবিত্রতা থাকে, এ গোসল

দ্বারা তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। কাজেই ধর্ম ও ঈমানের রঙই প্রকৃত রঙ। এ রঙ বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতার নিশ্চয়তা দেয় এবং স্থায়ীও থাকে।

দ্বিতীয়ত ধর্ম ও ঈমানকে নমুনা বা রঙ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রঙ বা নমুনা যেমন চোখে দেখা যায়, মু'মিনের ঈমানের লক্ষণও তেমনি আকার-অবয়বে ওঠা-বসায়, চলাফেরায়, কাজে-কর্মে ও অভ্যাস-আচরণে ফুটে ওঠা প্রয়োজন।

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ
وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

(১৩৯) আপনি বলে দিন, তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ্ সম্পর্কে তর্ক করছ ? অথচ তিনিই আমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম, তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। এবং আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ। (১৪০) অথবা তোমরা কি বলছ যে, নিশ্চয়ই ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (আ) ও তাঁদের সন্তানগণ ইহুদী অথবা খৃষ্টান ছিলেন। আপনি বলে দিন, তোমরা বেশি জান, না আল্লাহ্ বেশি জানেন ? (১৪১) তার চাইতে অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্যকে গোপন করে ? আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন। সে সম্প্রদায় অতীত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা করছ তা তোমাদের জন্য। তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (ইহুদী ও খৃষ্টানদের) বলে দিন, তোমরা কি (এখনও) আমাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কাজ সম্পর্কে বিতর্ক করছ ? যে, তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন না। অথচ তিনি আমাদের এবং তোমাদের (সকলেরই) পালনকর্তা (ও মালিক। সুতরাং এ ব্যাপারে তোমাদের সাথে কোন বিশেষ সম্পর্ক নেই; যদিও তোমরা نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ [আমরা আল্লাহর সন্তান] বলে বিশেষ সম্পর্ক দাবি করছ।) আমরা আমাদের কৃতকর্মের ফল পাব, তোমরা তোমাদের

কৃতকর্মের ফল পাবে। (এ পর্যন্ত যেসব বিষয় বলা হলো, তা তো তোমাদের কাছেও স্বীকৃত।) আর (আল্লাহ্‌র শোকর যে,) আমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই (সন্তুষ্টির) জন্য নিজ (ধর্ম)-কে (শিরক ইত্যাদি থেকে) নির্ভেজাল রেখেছি। (তোমাদের বর্তমান অবস্থা এর বিপরীত। তোমাদের ধর্ম একে তো রহিত, তার উপর শিরক মিশ্রিত। 'উযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র,' 'ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র'–এসব উক্তি থেকে তা জানা যায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাদের অগ্রগণ্যতা দান করেছেন। কাজেই আমাদের মুক্তি না পাওয়ার কোন কারণ নেই।) অথবা (এখনও নিজেদেরকে সত্যপন্থী বলে প্রমাণিত করার জন্য) তোমরা (এ কথাই) বলছ যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের সন্তানদের (মধ্যে যারা পয়গম্বর ছিলেন, তাঁরা) সবাই ইহুদী অথবা খৃস্টান ছিলেন। এতদ্বারা তাদেরকেও তোমাদের স্বধর্মী সাব্যস্ত করার মাধ্যমে নিজেদের সত্যপন্থী হওয়া প্রমাণ করছ। (এর উত্তরে বলা হলো,) হে মুহাম্মদ! (এতটুকু তাদের) বলে দিন, (আচ্ছা বল দেখি–) তোমরা বেশি জান, না আল্লাহ্ তা'আলা বেশি জানেন? (একথা বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা বেশি জানেন। তিনি এসব পয়গম্বর [আ]-এর ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার বিষয়টি পূর্বেই প্রমাণ করেছেন। কাফিররাও একথা জানে, কিন্তু গোপন করে। সুতরাং) তার চাইতে বড় অত্যাচারী আর কে, যে এমন সাক্ষ্যকে গোপন করে, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার কাছে এসে পৌঁছেছে? (হে আহলে-কিতাবগণ!) আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। (সুতরাং উপরোক্ত পয়গম্বরগণ) যখন ইহুদী কিংবা খৃস্টান ছিলেন না, তখন ধর্মের ক্ষেত্রে তোমরা তাঁদের অনুরূপ কি করে হলে? (অতএব তোমাদের সত্যপন্থী হওয়া সাব্যস্ত হয় না। এরা ছিলেন কৃতীপুরুষদের) সে সম্প্রদায় (যাঁরা) অতীত হয়ে গেছেন। তাঁদের কর্ম তাঁদের উপকারে আসবে এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের উপকারে আসবে। তাঁদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না। (যখন আলোচনাও হবে না তখন তদ্দ্বারা তোমাদের কোন উপকারও হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইখলাসের তাৎপর্য ঃ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُوْنَ বাক্যটিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে নিষ্ঠাবান। নিষ্ঠা বা ইখলাসের অর্থ হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা)-এর বর্ণনা মতে ধর্মে নিষ্ঠাবান হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার না করা এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য সৎকর্ম করা, মানুষকে দেখানোর জন্য অথবা মানুষের প্রশংসা অর্জনের জন্য নয়।

কোন কোন বুযুর্গ বলেছেন, ইখলাস বা নিষ্ঠা হলো এমন একটি আমল, যা ফেরেশতাও জানে না, শয়তানও না। এটা আল্লাহ্ তা'আলা ও বান্দার মধ্যকার একটি গোপন রহস্য।

(১৪২) এখন নির্বোধরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের ঐ কেবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল ? আপনি বলুন ঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কা'বাগৃহ নামাযের কেবলা নির্দিষ্ট হওয়ার ফলে ইহুদীদের কেবলা পরিত্যক্ত হয়। এটি তাদের মনঃপূত না হওয়ার কারণে) এখন (এই) নির্বোধরা অবশ্যই বলবে, (মুসলমানদেরকে) তাদের পূর্বেকার কেবলা থেকে যেদিকে তারা মুখ করত (অর্থাৎ বায়তুল-মোকাদ্দাস) কিসে (অন্যদিকে) ফিরিয়ে দিল ? আপনি (উত্তরে) বলুন, পূর্ব (হউক) পশ্চিম (হউক, সব দিকই) আল্লাহ্‌র (মালিকানাধীন। তিনি মালিক-সুলভ ক্ষমতার দ্বারা যেদিককে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করেন। এ ব্যাপারে কারণ জিজ্ঞেস করার অধিকার কারও নেই। শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাসই হলো সরল পথ। কিন্তু কারও কারও এ পথ অবলম্বন করার তওফীক হয় না। তারা অনর্থক কারণ খুঁজে বেড়ায়। তবে) আল্লাহ্ তা'আলা (নিজ কৃপায়) যাকে ইচ্ছা সোজা পথ বলে দেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে বিরোধিতাকারীদের আপত্তি বর্ণনা করে তার জওয়াব দেওয়া হয়েছে। আপত্তি ও জওয়াবের পূর্বে কেবলার স্বরূপ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে আপত্তি ও তার জওয়াবটি সহজে বোঝা যাবে।

কেবলার শাব্দিক অর্থ মুখ করার দিক। প্রত্যেক ইবাদতে মু'মিনের মুখ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র দিকেই থাকে। আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বন্ধন থেকে মুক্ত, তিনি কোন বিশেষ দিকে অবস্থান করেন না। ফলে কোন ইবাদতকারী যদি যে দিকে ইচ্ছা সেদিকেই মুখ করত কিংবা একই ব্যক্তি এক সময় একদিকে অন্য সময় অন্যদিকে মুখ করত, তবে তাও স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী হতো না।

কিন্তু অপর একটি রহস্যের কারণে সমস্ত ইবাদতকারীর মুখ একদিকেই হওয়া উচিত। রহস্যটি এই—ইবাদত বিভিন্ন প্রকার। কিছু ইবাদত ব্যক্তিগত, আর কিছু ইবাদত সমষ্টিগত। আল্লাহ্‌র যিকির, রোযা প্রভৃতি ব্যক্তিগত ইবাদত। এগুলো নির্জনে ও গোপনভাবে সম্পাদন করতে হয়। নামায ও হজ্জ সমষ্টিগত ইবাদত। এগুলো সংঘবদ্ধভাবে এবং প্রকাশ্যে সম্পাদন করতে হয়। সমষ্টিগত ইবাদতের বেলায় ইবাদতের সাথে সাথে মুসলমানদের সংঘবদ্ধ জীবনের রীতি-নীতিও শিক্ষা দেওয়া লক্ষ্য থাকে। এটা সবারই জানা যে, সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থার প্রধান মৌলনীতি হচ্ছে বহু ব্যক্তিভিত্তিক ঐক্য ও একাত্মতা। এ ঐক্য যত দৃঢ় ও মজবুত হবে, সংঘবদ্ধ জীবন-ব্যবস্থাও ততই শক্ত ও সুদৃঢ় হবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও বিচ্ছিন্নতা সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থার পক্ষে বিষতুল্য। এরপর ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু কি হবে, তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে বিভিন্ন যুগের মানুষ বিভিন্ন মত পোষণ করেছে। কোন কোন সম্প্রদায় বংশকে কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছে,

কেউ দেশ ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে এবং কেউ বর্ণ ও ভাষাকে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে সাব্যস্ত করেছে।

কিন্তু আল্লাহ্‌র ধর্ম এবং পয়গম্বরদের শরীয়ত এ সব ইখতিয়ার-বহির্ভূত বিষয়কে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু করার যোগ্য মনে করেনি। প্রকৃতপক্ষে এসব বিষয় সমগ্র মানব জাতিকে একই কেন্দ্রে সমবেত করতে সমর্থও নয়। বরং চিন্তা করলে দেখা যায়, এ জাতীয় ঐক্য প্রকৃতপক্ষে মানব জাতিকে বহুধা-বিভক্ত করে দেয় এবং পারস্পরিক সংঘর্ষ ও মতানৈক্যই সৃষ্টি করে বেশি।

বিশ্বের সকল পয়গম্বরের ধর্ম ইসলাম ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের ঐক্যকেই ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছে এবং কোটি কোটি প্রভুর ইবাদতে বিভক্ত বিশ্বকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি আহবান জানিয়েছে। বলা বাহুল্য, এ কেন্দ্রবিন্দুতেই পূর্ব ও পশ্চিম, ভূত ও ভবিষ্যতের মানবমণ্ডলী একত্রিত হতে পারে। অতঃপর এ ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের ঐক্যকে বাস্তবে রূপায়ণ এবং শক্তিদানের উদ্দেশ্যে তৎসঙ্গে কিছু বাহ্যিক ঐক্যও যোগ করা হয়েছে। কিন্তু এসব বাহ্যিক ঐক্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তা এই যে, ঐক্যের বিষয়বস্তু কার্যগত ইচ্ছাধীন হতে হবে—যাতে সমগ্র মানব জাতি স্বেচ্ছায় তা অবলম্বন করে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হতে পারে। বংশ, দেশ, ভাষা, বর্ণ প্রভৃতি ঐচ্ছিক বিষয় নয়। যে ব্যক্তি এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, সে অন্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে পারে না। যে ব্যক্তি পাকিস্তানে অথবা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছে, সে বিলেতে অথবা আফ্রিকায় জন্মগ্রহণে সক্ষম নয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণকায়, সে যেমন স্বেচ্ছায় শ্বেতকায় হতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে একজন শ্বেতকায় ব্যক্তিও স্বেচ্ছায় কৃষ্ণকায় হতে পারে না।

এমন বিষয়কে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করা হলে মানবতা অপরিহার্যভাবে শতধা, এমনকি সহস্রভাবে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এ কারণে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে জড়িত এসব বিষয়কে ইসলাম পরিপূর্ণ সম্মান দান করলেও, মানব ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হতে দেয়নি। কারণ, এতে মানবমণ্ডলী শতধা বিভক্ত হয়ে যাবে। তবে ইসলাম ইচ্ছাধীন বিষয়সমূহে চিন্তাগত ঐক্যের সাথে সাথে কার্যগত ও আকারগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে। এতেও এমন বিষয়কে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা স্বেচ্ছায় অবলম্বন করা প্রত্যেক পুরুষ-স্ত্রী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে-গ্রাম্য, ধনী-দরিদ্রের পক্ষে সমান সহজ হয়। কাজেই ইসলামী শরীয়ত সারা বিশ্বের মানুষকে পোশাক, বাসস্থান ও পানাহারের ব্যাপারে কোন এক নিয়মের অধীন করেনি। কারণ, প্রত্যেক দেশের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে প্রয়োজনাদিও ভিন্ন ভিন্ন। এমতাবস্থায় সবাইকে একই ধরনের পোশাক ও ইউনিফর্মের অধীন করে দিলে নানা অসুবিধা দেখা দেবে। যদি ন্যূনতম ইউনিফর্মেরও অধীন করে দেওয়া হয়, তাতেও মানবিক সমস্তার প্রতি অবিচার করা হবে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত উৎকৃষ্ট পোশাক ও বস্ত্রের অবমাননা করা হবে। পক্ষান্তরে আরও বেশি দামের ইউনিফর্মের অধীন করে দেওয়া হলে দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এ কারণে ইসলামী শরীয়ত মুসলমানদের জন্য কোন বিশেষ পোশাক বা ইউনিফর্ম নির্দিষ্ট করেনি, বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব পন্থা ও পোশাক প্রচলিত ছিল, সবগুলো যাচাই করে অপব্যয়, অযথা, গর্ব ও বিজাতীয় অনুকরণভিত্তিক পন্থা ও পোশাক-পরিচ্ছদকে নিষিদ্ধ

করেছে। অবশিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এমনি বিষয়াদিকে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা ইচ্ছাধীন, সহজলভ্য ও সস্তা। উদাহরণত জামা'তের নামাযে কাতারবন্দী হওয়া, ইমামের ওঠা-বসার পূর্ণ অনুকরণ, হজ্জের সময় পোশাক ও অবস্থানের অভিন্নতা ইত্যাদি।

এমনিভাবে কেবলার ঐক্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা যদিও যাবতীয় দিকের বন্ধন থেকে মুক্ত, তাঁর জন্য সবদিকই সমান, তথাপি নামাযে সমষ্টিগত ঐক্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববাসীর মুখমণ্ডল একই দিকে নিবদ্ধ থাকা একটি উত্তম, সহজ ও স্বাভাবিক ঐক্য পদ্ধতি। এতে সমগ্র পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণের মানবমণ্ডলী সহজেই একত্রিত হতে পারে। এখন সমগ্র বিশ্বের মুখ করার দিক কোন্‌টি হবে এর মীমাংসা মানুষের হাতে ছেড়ে দিলে তাও বিরাট মতানৈক্য এবং কলহের কারণ হয়ে যাবে। এ কারণে এর মীমাংসা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হওয়াই উচিত। হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেই ফেরেশতাদের দ্বারা কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। আদম ও আদম-সন্তানদের জন্য সর্বপ্রথম কেবলা কা'বাগৃহকেই সাব্যস্ত করা হয়।

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۔

—মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ নির্মিত হয় তা মক্কায় অবস্থিত এবং এ গৃহ বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত ও বরকতের উৎস।

নূহ্ (আ) পর্যন্ত সবার কেবলাই ছিল এ কা'বাগৃহ। নূহের আমলে সংঘটিত মহাপ্লাবনের সময় সমগ্র দুনিয়া নিমজ্জিত হয়ে যায় এবং কা'বাগৃহের দেয়াল বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। তারপর হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) আল্লাহ্র নির্দেশে কা'বাগৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। কা'বাগৃহই ছিল তাঁর এবং তাঁর উম্মতের কেবলা। অতঃপর বনী ইসরাঈলের পয়গম্বরগণের জন্য বায়তুল মোকাদ্দাসকে কেবলা সাব্যস্ত করা হয়। আবুল আলীয়া বলেন ঃ পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ বায়তুল মোকাদ্দাসে নামায পড়ার সময় এমনভাবে দাঁড়াতেন, যাতে বায়তুল মোকাদ্দাসের 'ছখরা' ও কা'বাগৃহ—উভয়টিই সামনে থাকে।—(কুরতুবী)

শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নামায ফরয করা হলে কোন কোন আলেমের মতে প্রথমদিকে কা'বাগৃহকেই তাঁর কেবলা সাব্যস্ত করা হয়। মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় পৌছার পর, কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী হিজরতের কিছুদিন পূর্বে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেবলা স্থির করার নির্দেশ আসে। সহীহ্ বোখারীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা) ষোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করেই নামায পড়েন। মসজিদে নববীর যে জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন, সেখানে অদ্যাবধি চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। —(কুরতুবী)

আল্লাহ্র নির্দেশ পালন ক্ষেত্রে মহানবী (সা) ছিলেন আপাদমস্তক আনুগত্যের প্রতীক। সেমতে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়া অব্যাহত রাখলেও তাঁর স্বভাবগত আগ্রহ ও মনের বাসনা ছিল এই যে, আদম ও ইবরাহীম (আ)-এর কেবলাকেই পুনরায় তাঁর

কেবলা সাব্যস্ত করা হোক। প্রিয়জনের মনের বাসনা পূর্ণ করাই আল্লাহ্ তা'আলার চিরাচরিত রীতি।

কবির ভাষায় ঃ

"তুমি যেমন চাইবে আল্লাহ্ তেমনি চাইবেন,
পরহেযগারের ইচ্ছা আল্লাহ্ স্মরণ করেন।"

মহানবী (সা)-এর অন্তরেও দৃঢ় আস্থা ছিল যে, তাঁর বাসনা অপূর্ণ থাকবে না। তাই ওহীর অপেক্ষায় তিনি বারবার আকাশের দিকে তাকাতেন। এ প্রসঙ্গেই কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .

"–আপনার বারবার আকাশের দিকে তাকানো আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। আমি আপনাকে আপনার পছন্দমত কেবলার দিকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেব। সেমতে ভবিষ্যতে আপনি নামাযে মসজিদে-হারাম তথা কা'বাগৃহের দিকে মুখ করুন।"

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-এর মনের বাসনা প্রকাশ করে তা পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নামাযে হুবহু কা'বার দিকে মুখ করাই জরুরী নয়–কা'বা যেদিকে অবস্থিত, সেদিকে মুখ করাই যথেষ্ট ঃ এখানে একটি ফিকহ্-বিষয়ক সূক্ষ্ম তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। আয়াতে কা'বা অথবা বায়তুল্লাহ্ বলার পরিবর্তে 'মসজিদে-হারাম' বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বসবাসকারীদের পক্ষে হুবহু কা'বাগৃহ বরাবর দাঁড়ানো জরুরী নয়; বরং পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের মধ্য থেকে যে দিকটিতে কা'বা অবস্থিত সেদিকে মুখ করলেই যথেষ্ট হবে। তবে যে ব্যক্তি মসজিদে-হারামে উপস্থিত রয়েছে কিংবা নিকটস্থ কোন স্থান বা পাহাড় থেকে কা'বা দেখতে পাচ্ছে, তার পক্ষে এমনভাবে দাঁড়ানো জরুরী যাতে কা'বাগৃহ তার চেহারার বরাবরে অবস্থিত থাকে। যদি কা'বাগৃহের কোন অংশ তার চেহারা বরাবরে না পড়ে তবে তার নামায শুদ্ধ হবে না। কা'বাগৃহ যাদের চোখের সামনে নেই এ বিধান তাদের জন্য নয়। তারা কা'বাগৃহ কিংবা মসজিদে-হারামের দিকে মুখ করলেই যথেষ্ট।

মোটকথা, হিজরতের ষোল-সতের মাস পর কা'বাগৃহ পুনর্বার মহানবী (সা) ও মুসলমানদের কেবলা নির্ধারিত হয়। এতে ইহুদী এবং কতিপয় মুশরিক ও মুনাফিক প্রশ্ন তুলে বলতে থাকে যে, তাদের ধর্মে স্থিতিশীলতা নেই, রোজ রোজ কেবলা পরিবর্তন হতে থাকে।

কোরআনের আলোচ্য আয়াতে 'নির্বোধরা আপত্তি করে' শিরোনামে তাদের এ আপত্তিরই উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে আপত্তির যে জওয়াব দেওয়া হয়েছে তাতে তাদের বোকামির নিদর্শন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থাৎ—আপনি বলে দিন ঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্ তা'আলারই মালিকানাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা সোজা-সরল পথ প্রদর্শন করেন।

এতে কেবলামুখী হওয়ার তাৎপর্য বিধৃত হয়েছে যে, কা'বা এবং বায়তুল মোকাদ্দাসকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করে আল্লাহ্ তা'আলাই এ দু'টিকে পর্যায়ক্রমে কেবলা বানিয়েছেন, এছাড়া কা'বা কিংবা বায়তুল মোকাদ্দাসের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এ দু'টিকে বাদ দিয়ে কোন তৃতীয় বা চতুর্থ বস্তুকেও কেবলা সাব্যস্ত করতে পারতেন। বস্তুত যা কেবলা বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেদিকে মুখ করলে যে সওয়াব হয়, তার একমাত্র কারণ আল্লাহ্র আনুগত্য। এ আনুগত্যই কা'বার পুনর্নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের মৌলিক বিষয়। এ বিষয়টি অন্য এক আয়াতে আরও সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ط وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ .

অর্থাৎ—পশ্চিম দিক অথবা পূর্বদিকে মুখ করার মধ্যে স্বতন্ত্র কোন সওয়াব বা পুণ্য নেই, কিন্তু আল্লাহ্র উপর ঈমান ও আনুগত্যের মধ্যেই পুণ্য নিহিত রয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ اَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র আদেশ অনুযায়ী যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকেই আল্লাহ্র মনোযোগ আকৃষ্ট পাবে।

এসব আয়াতে কেবলা অথবা কেবলামুখী হওয়ার তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলে বলা হয়েছে যে, এসব স্থানের নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নেই; বরং কেবলা হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা যে এগুলোকে মনোনীত করছেন, এটাই সে স্থানের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র কারণ। এ দু'দিকে মুখ করার মধ্যে সওয়াবের কারণও আল্লাহ্র আনুগত্য ছাড়া অন্য কিছু নয়। মহানবী (সা)-এর বেলায় কেবলা পরিবর্তনের রহস্য সম্ভবত এই যে, কার্যক্ষেত্রে মানুষ জেনে নিক যে, কেবলা কোন পূজনীয় মূর্তি বিগ্রহ নয়; বরং আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র নির্দেশ। এই নির্দেশ যখন বায়তুল মোকাদ্দাস সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো তখন তারা এদিকেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পরবর্তী আয়াতে স্বয়ং কোরআন এ রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছে ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ .

অর্থাৎ—আপনি পূর্বে যে কেবলার দিকে ছিলেন তাকে কেবলা করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে পেছনে সরে যায়, তা প্রকাশ করা।

কেবলার তাৎপর্য বর্ণনার মধ্যে নির্বোধ আপত্তিকারীদেরও জওয়াব হয়ে গেছে। তারা কেবলার পরিবর্তনকে ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী মনে করত এবং এজন্য মুসলমানদের ভর্ৎসনা করত। পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নির্দেশের জন্য কোমর বেঁধে প্রস্তুত থাকাই হলো সরল পথ। আল্লাহ্র কৃপায় মুসলমানরা এ সরল পথ অর্জন করেছে।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তিনটি বিষয়ের কারণে আহলে কিতাবরা মুসলমানদের সাথে সর্বাধিক হিংসা করে। প্রথমত, ইবাদতের জন্য সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট করার নির্দেশ সব উম্মতকেই দেওয়া হয়েছিল। ইহুদীরা শনিবারকে এবং খৃষ্টানরা রবিবারকে নির্দিষ্ট করে নেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র কাছে সে দিনটি ছিল শুক্রবার, যা মুসলমানদের ভাগে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনের পর মুসলমানদের জন্য যে কেবলা নির্ধারিত হয়েছে, অন্য কোন উম্মতের ভাগ্যে তা জোটেনি। তৃতীয়ত, ইমামের পেছনে 'আমীন' বলা। এ তিনটি বিষয় একমাত্র মুসলমানরাই প্রাপ্ত হয়েছে। আহলে কিতাবরা এগুলো থেকে বঞ্চিত। −(মসনদে আহমদ)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ

(১৪৩) এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি—যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য এবং যাতে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদের অনুসারীবৃন্দ!) এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে (এমন এক) সম্প্রদায় করেছি, (যারা সর্বদিক দিয়ে একান্ত) মধ্যপন্থী যেন, (জাগতিক সম্মান ও স্বাতন্ত্র্য ছাড়াও আখেরাতে তোমাদের অশেষ সম্মান প্রকাশ পায় যে,) তোমরা (একটি বড় মোকদ্দমায়, যার এক পক্ষ হবেন পয়গম্বরগণ এবং অপর পক্ষ হবে তাঁদের বিরোধীদের) মানবমণ্ডলীর বিপক্ষে সাক্ষ্যদাতা (সাব্যস্ত) হও এবং (অধিকতর সম্মান এই যে,) তোমাদের (সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন। (এ সাক্ষ্য দ্বারা তোমাদের সাক্ষ্য যে নির্ভরযোগ্য তা প্রমাণিত হবে। তোমাদের সাক্ষ্যের ফলে মোকদ্দমার রায় পয়গম্বরগণের পক্ষে যাবে এবং বিরোধীদল অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করবে। এটা যে উচ্চস্তরের সম্মান, তা বলাই বাহুল্য)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশেষ মধ্যপন্থা ঃ وسط শব্দের অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়। আবূ সায়ীদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মহানবী (সা) عدل শব্দ দ্বারা وسط -এর ব্যাখ্যা করেছেন। এর অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট। (কুরতুবী) আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত করা হয়েছে। এর ফলে তারা হাশরের ময়দানে একটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে। সকল পয়গম্বরের উম্মতরা তাঁদের হেদায়েত ও প্রচারকার্য অস্বীকার করে বলতে থাকবে, দুনিয়াতে আমাদের কাছে কোন আসমানী গ্রন্থ পৌঁছেনি এবং কোন পয়গম্বরও আমাদের হেদায়েত করেননি। তখন মুসলিম সম্প্রদায় পয়গম্বরগণের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে উপস্থিত হবে এবং সাক্ষ্য দিবে যে, পয়গম্বরগণ সব যুগেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আনীত

হেদায়েত তাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য তাঁরা সাধ্যমত চেষ্টাও করেছেন। বিবাদী উম্মতরা মুসলিম সম্প্রদায়ের সাক্ষ্যে প্রশ্ন তুলে বলবে, আমাদের আমলে এই সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আমাদের ব্যাপারাদি তাদের জানার কথা নয়। কাজেই আমাদের বিপক্ষে তাদের সাক্ষ্য কেমন করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে ?

মুসলিম সম্প্রদায় এ প্রশ্নের উত্তরে বলবে, নিঃসন্দেহে তখন আমাদের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু আমাদের নিকট তাদের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কিত তথ্যাবলী একজন সত্যবাদী রসূল ও আল্লাহ্র গ্রন্থ কোরআন সরবরাহ করেছে। আমরাও সে গ্রন্থের ওপর ঈমান এনেছি এবং তাদের সরবরাহকৃত তথ্যাবলীকে চাক্ষুষ দেখার চাইতেও অধিক সত্য মনে করি, তাই আমাদের সাক্ষ্য সত্য। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত হবেন এবং সাক্ষীদের সমর্থন করে বলবেন, তারা যা কিছু বলছে, সবই সত্য। আল্লাহ্র গ্রন্থ এবং আমার শিক্ষার মাধ্যমে তারা এসব তথ্য জানতে পেরেছে।

হাশরের ময়দানে সংঘটিতব্য এ ঘটনার বিবরণ সহীহ্ বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী ও মসনদে আহ্মদের একাধিক হাদীসে সংক্ষেপে ও সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করা হয়েছে। তাই এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

মধ্যপন্থার রূপরেখা, তার গুরুত্ব ও কিছু বিবরণ ঃ (১) মধ্যপন্থার অর্থ ও তাৎপর্য কি ? (২) মধ্যপন্থার এত গুরুত্বই বা কেন যে, এর ওপরই শ্রেষ্ঠত্বকে নির্ভরশীল করা হয়েছে ? (৩) মুসলিম সম্প্রদায় যে মধ্যপন্থী, বাস্তবতার নিরিখে এর প্রমাণ কি ? ধারাবাহিকভাবে এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর ঃ

(১) اعتدال (ভারসাম্য)-এর শাব্দিক অর্থ সমান হওয়া عدل মূল ধাতু থেকে এর উৎপত্তি, আর عدل এর অর্থও সমান হওয়া।

(২) যে গুরুত্বের কারণে ভারসাম্যকে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। বিষয়টি প্রথমে একটি স্থূল উদাহরণ দ্বারা বুঝুন। ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ইত্যাদি যত নতুন ও পুরাতন চিকিৎসা-পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে, সে সবই এ বিষয়ে একমত যে, 'মেযাজে'র বা স্বভাবের ভারসাম্যের উপরই মানবদেহের সুস্থতা নির্ভরশীল। ভারসাম্যের ত্রুটিই মানবদেহে রোগ বিকার সৃষ্টি করে। বিশেষত ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির মূলনীতিই মেযাজ পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল। এ শাস্ত্র মতে মানবদেহ চারটি উপাদান—রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল ও পিত্ত দ্বারা গঠিত। এ চারটি উপাদান থেকে উৎপন্ন চারটি অবস্থা শৈত্য, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা মানবদেহে বিদ্যমান থাকা জরুরী। এ চারটি উপাদানের ভারসাম্যই মানবদেহে প্রকৃত সুস্থতা নিশ্চিত করে। পক্ষান্তরে যে কোন একটি উপাদান মেযাজের চাহিদা থেকে বেড়ে অথবা কমে গেলেই তা হবে রোগ-ব্যাধি। চিকিৎসা দ্বারা এর প্রতিকার না করলে এক পর্যায়ে পৌঁছে তাই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই স্থূল উদাহরণের পর এখন আধ্যাত্মিক সুস্থতা এবং ভারসাম্যহীনতার নাম আত্মিক ও চারিত্রিক অসুস্থতা। এ অসুস্থতার চিকিৎসা করে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা না হলে পরিণামে

আত্মিক মৃত্যু ঘটে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রই জানে যে, যে উৎকৃষ্টতার কারণে মানুষ সমগ্র সৃষ্টি জীবের সেরা, তা তার দেহ অথবা দেহের উপাদান অথবা সেগুলোর অবস্থা; তাপ-শৈত্য নয়। কারণ, এসব উপাদান ও অবস্থার ক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্যান্য জীব-জন্তুও মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত; বরং তাদের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষ এসব উপাদান মানুষের চাইতেও বেশি থাকে।

যে বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ 'আশরাফুল-মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা বলে গণ্য হয়েছে, তা নিশ্চিতই তার রক্ত, মাংস, চর্ম এবং তাপ ও শৈত্যের ঊর্ধ্বে কোন বস্তু যা মানুষের মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান রয়েছে—অন্যান্য সৃষ্ট জীবের মধ্যে ততটুকু নেই। এ বস্তুটি নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করাও কোন সূক্ষ্ম ও কঠিন কাজ নয়। বলা বাহুল্য, তা হচ্ছে মানুষের আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠা। মাওলানা রুমী বলেন ঃ

آدمیت لحم وشحم وپوست نیست
آدمیت جز رضائے دوست نیست

অর্থাৎ—মেদ-মাংস কিংবা ত্বক মানবতা নয়; মানবতা একমাত্র খোদাপ্রেম ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এ কারণেই যারা স্বীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মূল্য বোঝে না এবং তা নষ্ট করে দেয়, তাদের সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

اینکه می بینی خلاف آدم اند
نیستند آدم غلاف آدم اند

এসব যা দেখছ, তা মানবতা বিরোধী, এরা মানুষ নয়, শুধু মানুষের আবরণ মাত্র।

আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠাই যখন মানুষের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি, মানবদেহের মত মানবাত্মাও যখন ভারসাম্য ও ভারসাম্যহীনতার শিকার হয় এবং মানবদেহের সুস্থতা যখন মেযাজ ও উপাদানের ভারসাম্য আর মানবাত্মার সুস্থতা যখন আত্মা ও চরিত্রের ভারসাম্য, তখন কামেল মানব একমাত্র তিনিই হতে পারেন, যিনি দৈহিক ভারসাম্যের সাথে সাথে আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্যেরও অধিকারী হবেন। এ উভয়বিধ ভারসাম্য পয়গম্বরকে বিশেষভাবে দান করা হয়েছিল এবং আমাদের রসূল (সা) তা সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ কারণে তিনিই সর্বপ্রধান কামেল মানব হওয়ার যোগ্য। শারীরিক চিকিৎসার জন্য যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সর্বকালে ও সর্বত্র চিকিৎসক, ডাক্তার, ঔষধপত্র ও যন্ত্রপাতির একটা অটুট ব্যবস্থা স্থাপন করে রেখেছেন, তেমনি আত্মিক চিকিৎসা এবং মানুষের মধ্যে চারিত্রিক ভারসাম্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে পয়গম্বরগণ প্রেরিত হয়েছেন। তাঁদের সাথে আসমানী গ্রন্থও পাঠানো হয়েছে এবং ভারসাম্য বিধানের লক্ষ্যে আইন প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্যও প্রদত্ত হয়েছে। কোরআনের সূরা হাদীদ-এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ

অর্থাৎ–আমি প্রমাণাদিসহ রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের সাথে গ্রন্থ এবং মানদণ্ডও অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আমি লৌহ নাযিল করেছি—এতে প্রবল শক্তি রয়েছে এবং নিহিত রয়েছে মানুষের জন্য অনেক উপকারিতা।

আয়াতে পয়গম্বর প্রেরণ ও গ্রন্থ অবতরণের রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এগুলোর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে চারিত্রিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা হবে এবং লেনদেন ও পারস্পরিক আদান-প্রদান বৈষয়িক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানদণ্ড নাযিল করা হয়েছে। মানদণ্ড অর্থ প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়ত হতে পারে। শরীয়ত দ্বারা সত্যিকার ভারসাম্য জানা যায় এবং ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, মানবমণ্ডলীকে আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্যের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করাই পয়গম্বর ও আসমানী গ্রন্থ প্রেরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এটাই মানবমণ্ডলীর সুস্থতা।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্বপ্রকার ভারসাম্য নিহিত ঃ মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

অর্থাৎ–'আমি তোমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় করেছি।' উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আপনি অনুমান করতে পারেন যে, وسط শব্দটি উচ্চারণ ও লেখায় একটি সাধারণ শব্দ হলেও তাৎপর্যের দিক দিয়ে কোন সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তির মধ্যে যত পরাকাষ্ঠা থাকা সম্ভব, সে সবগুলোকে পরিব্যাপ্ত করেছে।

আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী, ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের উৎকৃষ্টতা তাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে এবং পয়গম্বর ও আসমানী গ্রন্থসমূহ প্রেরিত হয়েছে, তাতে এ সম্প্রদায় অপরাপর সম্প্রদায় থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ।

কোরআন বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করেছে। সূরা আ'রাফের শেষভাগে এ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ অর্থাৎ, আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা সৎপথ প্রদর্শন করে এবং তদনুযায়ী ন্যায়বিচার করে।

এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্য বিধৃত হয়েছে যে, তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আসমানী গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেরাও চলে এবং অন্যদেরকেও চালাবার চেষ্টা করে। কোন ব্যাপারে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়ে গেলে, তার মীমাংসাও তারা গ্রন্থের সাহায্যেই করে, যাতে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার কোন আশংকা নেই।

সূরা আলে-ইমরানে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ভারসাম্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ .

তোমরাই সেই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান রাখবে

অর্থাৎ, তারা যেমন সব পয়গম্বরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর প্রাপ্ত হয়েছে, সব গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক পরিব্যাপ্ত ও পূর্ণতর গ্রন্থ লাভ করেছে, তেমনি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাধিক সুস্থ মেযাজ এবং ভারসাম্যও সর্বাধিক প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে তারা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তত্ত্ব-রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। ঈমান, আমল ও আল্লাহ্‌ভীতির সমস্ত শাখা-প্রশাখা তাদের ত্যাগের দৌলতে সজীব ও সতেজ হয়ে উঠবে। তারা কোন বিশেষ দেশ ও ভৌগোলিক সীমার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে না। তাদের কর্মক্ষেত্র হবে সমগ্র বিশ্ব এবং জীবনের সকল শাখায় পরিব্যাপ্ত। তাদের অস্তিত্ব অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষা ও তাদের বেহেশতের দ্বারে উপনীত করার কাজে নিবেদিত হবে। أُخْرِجَتْ لِلنَّاس বাক্যাংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়টি অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষা ও উপকারের নিমিত্তেই সৃষ্ট। তাদের অভীষ্ট কর্তব্য ও জাতীয় পরিচয় এই যে, তারা মানুষকে সৎকাজের দিকে পথ দেখাবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।

الدين النصيحة রসূলুল্লাহ (সা)-এর এ উক্তির অর্থও তা-ই। অর্থাৎ, সকল মুসলমানের হিতাকাঙ্ক্ষা করাই হচ্ছে ধর্ম। কুফর, শিরক, বিদ্‌আত, কুসংস্কার, পাপাচার, অসচ্চরিত্রতা, অন্যায় কথাবার্তা ইত্যাদি সবই মন্দ কাজ। এসব থেকে বিরত রাখার উপায়ও বিবিধ। কখনও বাহুবলে, কখনও কলমের জোরে এবং কখনও তরবারির সাহায্যে। মোটকথা, সবরকম জিহাদই এর অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম সম্প্রদায় যেমন ব্যাপকভাবে ও পরম নিষ্ঠার সাথে এসব কর্তব্য পালন করছে তার দৃষ্টান্ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না।

(৩) বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় হওয়ার প্রমাণ কি ? এখন এ তৃতীয় প্রশ্নটি আলোচনাসাপেক্ষ। এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে হলে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, কর্ম চরিত্র ও কীর্তিসমূহ যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে নমুনাস্বরূপ কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

বিশ্বাসের ভারসাম্য ঃ সর্বপ্রথম বিশ্বাসগত ভারসাম্য নিয়েই আলোচনা করা যাক। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায় তারা পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্‌র পুত্র মনে করে তাদের উপাসনা ও আরাধনা করতে শুরু করেছে। যেমন, এক আয়াতে রয়েছে ঃ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ بْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارٰى الْمَسِيْحُ بْنُ اللّٰهِ (ইহুদীরা বলেছে, ওযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র এবং খৃস্টানরা বলেছে, মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র) অপরদিকে এসব সম্প্রদায়েরই অপর ব্যক্তিরা পয়গম্বরের উপর্যুপরি মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও তাদের পয়গম্বর যখন তাদেরকে কোন ন্যায়যুদ্ধে আহবান করেছেন, তখন পরিষ্কার বলে দিয়েছে ঃ

اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ (অর্থাৎ, আপনি এবং আপনার পালনকর্তাই যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব।) আবার কোথাও পয়গম্বরগণকে স্বয়ং তাদের অনুসারীদের হাতেই নির্যাতিত হতে দেখা গেছে।

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা তা নয়। তারা একদিকে রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি এমন ইশ্ক ও মহব্বত পোষণ করে যে, এর সামনে জানমাল, সন্তান-সন্ততি, ইজ্জত-আবরু সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

سلام اسپر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں

بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں

অপরদিকে রসূলকে রসূল এবং আল্লাহ্কে আল্লাহ্ই মনে করে। এতসব পরাকাষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তারা আল্লাহ্র বান্দা ও রসূল বলেই বিশ্বাস করে এবং মুখে প্রকাশ করে। তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে গিয়েও তারা একটা সীমার ভেতরে থাকে। 'কাছীদাহ-বুরদা' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

دع ما ادعته النصارى فى نبيهم

واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم

অর্থাৎ—খৃষ্টানরা তাদের পয়গম্বর সম্পর্কে যা দাবি করে, সে কুফরী বাক্য পরিহার করে মহানবীর প্রশংসায় যা বলবে, তা-ই সত্য ও নির্ভুল।

এরই সারমর্ম পারস্য কবি হাফেয নিম্নের পংক্তিতে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر অর্থাৎ—সংক্ষেপে খোদার পরে আপনিই মহত্তর।

কর্ম ও ইবাদতের ভারসাম্য ঃ বিশ্বাসের পরই শুরু হয় আমল ও ইবাদতের পালা। এক্ষেত্রেও সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায় তারা শরীয়তের বিধি-বিধানকে কানাকড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, ঘুষ-উৎকোচ নিয়ে আসমানী গ্রন্থকে পরিবর্তন করে অথবা মিথ্যা ফতোয়া দেয়, বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান পরিবর্তন করে এবং ইবাদত থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। অপরদিকে তাদের উপাসনালয়সমূহে এমন লোকও দেখা যায়, সংসারধর্ম ত্যাগ করে যারা বৈরাগ্য অবলম্বন করেছে। তারা আল্লাহ্প্রদত্ত হালাল নিয়ামত থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখে এবং কষ্ট সহ্য করাকেই সওয়াব ও ইবাদত বলে মনে করে।

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায় একদিকে বৈরাগ্যকে মানবতার প্রতি জুলুম বলে মনে করে এবং অপরদিকে আল্লাহ্ ও রসূলের বিধি-বিধানের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা রোম ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসনের অধিপতি ও মালিক হয়েও বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ধর্মনীতি ও রাজনীতির মধ্যে কোন বৈরিতা নেই এবং ধর্ম মসজিদ ও খানকায় আবদ্ধ থাকার জন্য আসেনি; বরং হাট-ঘাট, মাঠ-ময়দান, অফিস-আদালত এবং মন্ত্রণালয়সমূহে এর সাম্রাজ্য অপ্রতিহত। তাঁরা বাদশাহীর মাঝে ফকিরী এবং ফকিরীর মাঝে বাদশাহী শিক্ষা দিয়েছে।

چو فقر اندر لباس شاهى آمد * زتدبير عبيد اللهى آمد

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য ঃ এরপর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য করুন। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা মানবাধিকারের প্রতি পরওয়া করেনি; ন্যায়-অন্যায়ের তো কোন কথাই নেই। নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাউকে যেতে দেখলে তাকে

নিষ্পেষিত করা, হত্যা ও লুণ্ঠন করাকেই বড় কৃতিত্ব মনে করা হয়েছে। জনৈক বিত্তশালীর চারণভূমিতে অপরের উট প্রবেশ করে কিছু ক্ষতি সাধন করায় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যায়। এতে কত মানুষ যে নিহত হয়, তার কোন ইয়ত্তা নেই। মহিলাদের মানবাধিকার দান করা তো দূরের কথা, তাদের জীবিত থাকারও অনুমতি দেওয়া হতো না। কোথাও প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের জীবন্ত সমাহিত করার প্রথা এবং কোথাও মৃত স্বামীর সাথে দাহ করার প্রথা। অপরদিকে এমন নির্বোধ দয়ার্দ্রতার প্রচলন ছিল যে, পোকা-মাকড় হত্যা করাকে অবৈধ জ্ঞান করা হতো। জীব-হত্যাকে তো দস্তুরমত মহাপাপ বলে সাব্যস্ত করা হতো। আল্লাহর হালাল করা প্রাণীর গোশত ভক্ষণকে মনে করা হতো অন্যায়।

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরীয়ত এসব ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটিয়েছে। তারা একদিকে মানুষের সামনে মানবাধিকারকে তুলে ধরছে শুধু শান্তি ও সন্ধির সময়ই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রেও শত্রুর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেক কাজের একটা সীমা নির্ধারণ করেছে, যা লঙ্ঘন করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। নিজ অধিকারের ব্যাপারে ক্ষমা, মার্জনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং অপরের অধিকার প্রদানে যত্নবান হওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য ঃ এরপর অর্থনীতি বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রেও অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এতে হালাল-হারাম এবং অপরের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুরবস্থা থেকে চক্ষু বন্ধ করে অধিকতর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকেই সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য গণ্য করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তিমালিকানাকে অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, উভয় অর্থব্যবস্থার সারমর্মই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপাসনা, ধন-সম্পদকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান করা এবং এরই জন্য যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করা।

মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরীয়ত এক্ষেত্রেও একান্ত ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব অর্থব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছে। ইসলামী শরীয়ত একদিকে ধন-সম্পদকে জীবনের লক্ষ্য মনে করতে বারণ করেছে এবং সম্মান, ইজ্জত ও কোন পদমর্যাদা লাভকে এর উপর নির্ভরশীল রাখেনি; অপরদিকে সম্পদ বণ্টনের নিষ্কলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে—যাতে কোন মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না বসে। এছাড়া সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ ও সাধারণ ওয়াকফের আওতায় রেখেছে। বিশেষ বস্তুর মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। হালাল মালের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

মোটকথা, এ আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ। এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে ভারসাম্য ও ভারসাম্যহীনতার কয়েকটি নমুনা পেশ করাই ছিল উদ্দেশ্য। সুতরাং এতটুকুই যথেষ্ট। এতে আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু ফুটে উঠেছে যে, মুসলমান সম্প্রদায়কে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় করা হয়েছে।

সাক্ষ্যদানের জন্য ন্যায়ানুগ হওয়া শর্ত ঃ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ মুসলিম সম্প্রদায়কে ভারসাম্যপূর্ণ তথা ন্যায়ানুগ করা হয়েছে--যাতে তারা সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়।

এতে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি আদেল বা ন্যায়ানুগ নয়, সে সাক্ষ্যদানের যোগ্য নয়। আদেলের অর্থ সাধারণ 'নির্ভরযোগ্য' করা হয়। এর সম্পূর্ণ শর্ত ফিকাহ্ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত রয়েছে।

ইজমা শরীয়তের দলীল ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন, ইজমা (মুসলিম ঐকমত্য) যে শরীয়তের একটি দলীল, আলোচ্য আয়াত তার প্রমাণ। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্প্রদায়কে সাক্ষ্যদাতা সাব্যস্ত করে অপরাপর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে তাদের বক্তব্যকে দলীল করে দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের ইজমা বা ঐকমত্যও একটি দলীল এবং তা পালন করা ওয়াজিব। সাহাবীগণের ইজমা তাবেয়ীগণের জন্য এবং তাবেয়ীগণের ইজমা তাঁদের পরবর্তীদের জন্য দলীলস্বরূপ।

তফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে ঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের যেসব ক্রিয়াকর্ম সর্বসম্মত, তা আল্লাহ্র কাছে প্রশংসনীয় ও গ্রহণীয়। কারণ, যদি মনে করা হয় যে, তারা ভ্রান্ত বিষয়ে একমত হয়েছে, তবে তাদের নির্ভরযোগ্য সম্প্রদায় বলার কোন অর্থ থাকে না।

ইমাম জাস্সাস বলেন ঃ এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক যুগের মুসলমানদের ইজমাই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয়। 'ইজমা শরীয়তের দলীল'—এ কথাটি প্রথম শতাব্দী অথবা বিশেষ কোন যুগের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। কারণ আয়াতে সমগ্র সম্প্রদায়কেই সম্বোধন করা হয়েছে। যারা আয়াত নাযিলের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁরাই শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নন; বরং কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান আসবে, তারা সবই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং প্রতি যুগের মুসলমানই 'আল্লাহ্র সাক্ষ্যদাতা'। তাদের উক্তি দলীল। তারা কোন ভুল বিষয়ে একমত হতে পারে না।

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

(১৪৩) আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিতই এটা কঠোরতম বিষয়, কিন্তু তাদের জন্য নয়, যাদের আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল করুণাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আমি মুহাম্মদী শরীয়তের জন্য প্রকৃতপক্ষে কা'বাকেই কেবলা মনোনীত করে রেখেছিলাম)। আপনি যে কেবলার উপর (কিছুদিন কায়েম) ছিলেন, (অর্থাৎ বায়তুল মোকাদ্দাস) তা শুধু এ

কারণেই ছিল যে, আমি (বাহ্যতও) জেনে নেই যে, (এ কেবলা সাব্যস্ত হওয়ায় অথবা পরিবর্তন হওয়ায় ইহুদী ও অ-ইহুদীদের মধ্য থেকে) কে রসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ করে এবং কে আতংকে পিঠটান দেয়। (এবং ঘৃণা ও বিরোধিতা করে। এ পরীক্ষার জন্য এই সাময়িক কেবলা নির্দিষ্ট করেছিলাম। পরে প্রকৃত কেবলার মাধ্যমে এ কেবলা রহিত করে দিয়েছি)। কেবলার এ পরিবর্তন (অবাধ্য লোকদের জন্য) কঠোরতর বিষয়। (তবে) যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পথ প্রদর্শন করেছেন (আল্লাহর নির্দেশাবলী বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হয়নি। তারা আগেও যেমন একে আল্লাহর নির্দেশ মনে করত, এখনও তা-ই মনে করে। 'বায়তুল-মোকাদ্দাস প্রকৃত কেবলা ছিল না'—আমার এ উক্তি থেকে কেউ যেন মনে না করে যে, যেসব নামায বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে পড়া হয়েছে, তাতে সওয়াব কম হবে। কারণ, সেগুলো প্রকৃত কেবলার দিকে মুখ করে পড়া হয়নি। যাক এ কুমন্ত্রণাকে মনে স্থান দিও না। কারণ,) আল্লাহ্ তা'আলা এমন নন যে, তোমাদের ঈমান (সম্পর্কিত কাজকর্ম যেমন, নামাযের সওয়াব) নষ্ট (ও হ্রাস) করে দিবেন। বাস্তবিক, আল্লাহ্ তা'আলা (এমন যে,) মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল (ও) করুণাময়। (অতএব এমন স্নেহশীল ও করুণাময় সত্তা সম্পর্কে এরূপ কু-ধারণা সঙ্গত নয়। কারণ, কেবলা আসল হওয়া না হওয়া প্রসঙ্গে আমিই জানি। তোমরা উভয়টিকে আমার নির্দেশ মনে করে কবুল করেছ, কাজেই সওয়াব হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কা'বা শরীফ সর্বপ্রথম কখন নামাযের কেবলা হয় ঃ হিজরতের পূর্বে মক্কা মোকাররমায় যখন নামায ফরয হয়, তখন কা'বাগৃহই নামাযের জন্য কেবলা ছিল, না বায়তুল-মোকাদ্দাস ছিল—এ প্রশ্নে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতভেদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ শুরু থেকেই কেবলা ছিল বায়তুল-মোকাদ্দাস। হিজরতের পরও ষোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসই কেবলা ছিল। এরপর কা'বাকে কেবলা করার নির্দেশ আসে। তবে রসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় অবস্থানকালে হাজরে-আসওয়াদ ও রোকনে-ইয়ামানীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যাতে কা'বা ও বায়তুল-মোকাদ্দাস উভয়টিই সামনে থাকে। মদীনায় পৌছার পর এরূপ করা সম্ভবপর ছিল না। তাই তাঁর মনে কেবলা পরিবর্তনের বাসনা দানা বাঁধতে থাকে।—(ইবনে কাসীর)

অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেন ঃ মক্কায় নামায ফরয হওয়ার সময় কা'বাগৃহই ছিল মুসলমানদের প্রাথমিক কেবলা। কেননা, হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর কেবলাও তা-ই ছিল। মহানবী (সা) মক্কায় অবস্থানকালে কা'বাগৃহের দিকে মুখ করেই নামায পড়তেন। মদীনায় হিজরতের পর তাঁর কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাস সাব্যস্ত হয়। তিনি মদীনায় ষোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। এরপর প্রথম কেবলা অর্থাৎ কা'বাগৃহের দিকে মুখ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। তফসীরে-কুরতুবীতে আবূ আমরের বরাত দিয়ে এ শেষোক্ত উক্তিকেই অধিকতর বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। এর রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে, মদীনায় আগমনের পর যখন ইহুদীদের সাথে মেলামেশা শুরু হয়, তখন মহানবী (সা) তাদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর নির্দেশে তাদের কেবলাকেই কেবলা হিসাবে গ্রহণ

করেন। কিন্তু পরে যখন অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহুদীরা হঠকারিতা ত্যাগ করবে না, তখন হুযূর (সা)-কে সাবেক কেবলার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কারণ, পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের কেবলা হওয়ার কারণে তিনি স্বভাবতই তাকে পছন্দ করতেন।

কুরতবী আবুল-আলিয়া রিয়াহী থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সালেহ (আ)-এর মসজিদের কেবলাও কা'বাগৃহের দিকে ছিল। এরপর আবুল-আলিয়া বলেন যে, জনৈক ইহুদীর সাথে একবার তিনি বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। ইহুদী বলল ঃ মূসা (আ)-এর কেবলা ছিল বায়তুল মোকাদ্দাসের সাখরা। আবুল আলিয়া বলেন ঃ না, মূসা (আ) বায়তুল-মোকাদ্দাসের সাখরার নিকটেই নামায পড়তেন, কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডল কা'বাগৃহের দিকে থাকত। ইহুদী অস্বীকার করলে আবুল-আলিয়া বললেন ঃ আচ্ছা, তোমার আমার বিতর্কের মীমাংসা সালেহ (আ)-এর মসজিদই করে দেবে। মসজিদটি বায়তুল-মোকাদ্দাসের পাদদেশে একটি পাহাড়ে অবস্থিত। এরপর উভয়ে সেখানে গিয়ে দেখলেন, মসজিদটির কেবলা কা'বাগৃহের দিকেই রয়েছে।

যারা প্রথমোক্ত উক্তি গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মতে তাৎপর্য এই যে, মুসলমানদের মক্কা মোকাররমায় মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ ও নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করা ছিল লক্ষ্য। এজন্য তাদের কেবলা ছেড়ে বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেবলা করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে হিজরতের পর মদীনায় ইহুদী ও খৃস্টানদের বিরুদ্ধাচরণ ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল। এ কারণে তাদের কেবলার পরিবর্তে কা'বাকে কেবলা করা হয়েছিল। উপরোক্ত মতভেদের ফলে আলোচ্য আয়াতের তফসীরেও মতভেদ দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ আয়াতে উল্লিখিত কেবলার অর্থ প্রথমোক্ত উক্তি অনুযায়ী বায়তুল-মোকাদ্দাস এবং শেষোক্ত উক্তি অনুযায়ী কা'বাগৃহ হতে পারে। কেননা এটাই ছিল মহানবী (সা)-এর কেবলা।

উভয় উক্তি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমি কেবলা পরিবর্তনের ঘটনাকে আপনার অনুসারী মুসলমানদের জন্য একটি পরীক্ষা সাব্যস্ত করেছি--যাতে প্রকাশ্যভাবেও জানা যায় যে, কে আপনার খাঁটি অনুসারী এবং কে নিজ মতামতের অনুসরণ করে। বস্তুত কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ নাযিল হওয়ার পর কতিপয় দুর্বল বিশ্বাসী মুসলমান অথবা কপট বিশ্বাসী মুনাফিক ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দোষারোপ করে বলে যে, তিনি স্বজাতির ধর্মের দিকেই ফিরে গেছেন।

কতিপয় মাসআলা

সুন্নাহকে কখনও কোরআনের দ্বারাও রহিত করা হয় ঃ জাস্সাস 'আহকামুল কোরআন' গ্রন্থে বলেন ঃ কোরআন মজীদে কোথাও একথা উল্লেখ নেই যে, রসূলুল্লাহ (সা)-কে হিজরতের পূর্বে অথবা পরে বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; বরং একথার প্রমাণ শুধু হাদীস ও সুন্নাহ থেকে পাওয়া যায়। অতএব, যে বিষয়টি সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল, কোরআনের আয়াত সেটি রহিত করে কা'বাকে কেবলা করে দিয়েছে।

এতে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, হাদীসও একদিক দিয়ে কোরআন এবং কিছু বিধি-বিধান এমনও আছে, যা কোরআনে উল্লিখিত নেই--শুধু হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। কোরআন এসব বিধি-বিধানের শরীয়তগত মর্যাদা স্বীকার করে। কেননা আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে একথাও

বলা হয়েছে যে, যেসব নামায রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে পড়া হয়েছে, তাও আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয়।

'খবরে-ওয়াহিদ' 'কারীনা' দ্বারা জোরদার হলে তদ্দ্বারা কোরআনী নির্দেশ রহিত মনে করা যায় ঃ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ আসার পর মহানবী (সা) প্রথম কা'বাগৃহের দিকে মুখ করে আসরের নামায পড়েন (কোন কোন রেওয়ায়েতে আসরের পরিবর্তে যোহরের নামাযেরও উল্লেখ রয়েছে)। জনৈক সাহাবী নামাযের পর এখান থেকে বাইরে গিয়ে দেখতে পান যে, বনী সালামা গোত্রের মুসলমানরা নিজেদের মসজিদে পূর্বের ন্যায় বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করেই নামায পড়ছেন। তিনি সজোরে বললেন, এখন কেবলা কা'বার দিকে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ে এসেছি। একথা শুনে তাঁরা নামাযের মধ্যেই বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিক থেকে কা'বার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। নোয়ায়লা বিনতে মুসলিম বর্ণিত রেওয়াতে আছে, তখন মহিলারা পেছনের কাতার থেকে সামনে এসে যায় এবং পুরুষরা সামনের কাতার থেকে পেছনে চলে যায়। যখন কা'বার দিকে মুখ ফেরানো হলো, তখন পুরুষদের কাতার ছিল সামনে, আর মহিলাদের কাতার ছিল পেছনে।-(ইবনে কাসীর)

বনু সালমার মুসলমানরা যোহর অথবা আসরের নামায থেকেই কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ কার্যকর করে নেয়। কিন্তু কোবার মসজিদে এ সংবাদ পরদিন ফজরের নামাযে পৌঁছায় তারাও নামাযের মধ্যেই বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিক থেকে কা'বার দিকে মুখ করে নেন।-(ইবনে কাসীর, জাস্সাস)

ইমাম জাস্সাস এসব হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ

هذا خبر صحيح مستفيض فى ايدى اهل العلم قد تلقوه بالقبول فصار خبر التواتر الموجب للعلم .

অর্থাৎ—এ হাদীসটি প্রকৃতপক্ষে খবরে ওয়াহিদ হলেও শক্তিশালী কারীনার কারণে তাওয়াতুরের তথা ধারাবাহিক রেওয়ায়েতের পর্যায়ে পৌঁছে—যা নিশ্চিত জ্ঞান দান করে।

কিন্তু হানাফী মযহাবের ফিকহ্‌বিদগণের নীতি এই যে, খবরে-ওয়াহিদ দ্বারা কোন অকাট্য কোরআনী নির্দেশ রহিত হতে পারে না। এমতাবস্থায় হানাফী আলিমগণের বিরুদ্ধে প্রশ্ন থেকে যায় যে, তাঁরা এ হাদীস গ্রহণ করে কিভাবে কোরআনের নির্দেশ রহিত স্বীকার করলেন ? হাদীসটি তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌঁছলেও পৌঁছেছে পরবর্তীকালে ঃ সংবাদটি প্রথম বনু সালমা গোত্রের লোকদের একজনেই দিয়েছিল। জাস্সাস বলেন, আসল ব্যাপার এই যে, বনু সালমাসহ সাহাবীগণ আগেই জানতেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বাকে কেবলা করার বাসনা পোষণ করেন। তিনি এজন্য দোয়াও করতেন। এই বাসনা ও দোয়ার কারণে সাহাবীগণের দৃষ্টিতে বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশটি ভবিষ্যতে বলবৎ না থাকার আশংকা প্রকট হয়ে উঠেছিল। এ সম্ভাবনার কারণে বায়তুল-মোকাদ্দাসে কেবলা থাকার বিষয়টি ধারণাভিত্তিক হয়ে

গিয়েছিল। সুতরাং তা রহিত করার জন্য খবরে-ওয়াহিদই যথেষ্ট হয়েছে। অন্যথায় শুধু খবরে-ওয়াহিদ দ্বারা কোরআনী নির্দেশ রহিত হওয়া অযৌক্তিক।

লাউডস্পীকারের শব্দে নামাযে উঠা-বসা করলে নামায নষ্ট না হওয়ার প্রমাণ ঃ সহীহ বুখারীর 'কেবলা' অধ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে কোরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর কেবলা পরিবর্তনের সংবাদ পৌঁছা ও নামাযের মধ্যেই মুসল্লীদের কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে আল্লামা আইনী হানাফী বলেন ঃ فيه جواز تعليم من ليس فى الصلوٰة من هو فيها অর্থাৎ, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি নামাযে শরীক নয়, সে নামাযে শরীক ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে পারে।-(উমদাতুল ক্বারী, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৮ পৃ.)

আল্লামা আইনী এ হাদীস প্রসঙ্গে অন্যত্র লিখেন ঃ وفيه استماع المصلى لكلام من ليس فى الصلوٰة يضر صلوٰته অর্থাৎ—এ হাদীসেই প্রমাণ রয়েছে যে, মুসল্লী নামাযরত অবস্থায় নামাযের বাইরের লোকের কথা শুনতে পারে এবং তদনুযায়ী আমল করতে পারে। এতে তার নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। --(উমদাতুল ক্বারী, ১ম খণ্ড, ২৪২ পৃঃ)

সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী ফিকহবিদ আলিমগণ বলেন, নামাযরত অবস্থায় নামাযের বাইরের লোকের কথায় সাড়া দিলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। এর উদ্দেশ্য এই যে, নামাযে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নির্দেশ অনুসরণ করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি কোন মানুষের মধ্যস্থতায় আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসরণ করে, তবে নামায ফাসেদ হবে না।

ফিকহ্‌বিদগণ আরও একটি মাসআলা লিখেছেন। তা এই যে, যদি কেউ নামাযের জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য এমন সময় আসে, যখন প্রথম কাতার পূর্ণ হয়ে যায় এবং তাকে একাকী পেছনের কাতারে দাঁড়াতে হয়, তবে সে প্রথম কাতার থেকে একজনকে পেছনে টেনে নিজের সঙ্গে যুক্ত করে নেবে। এখানেও প্রশ্ন আসে যে, তার কথায় যে ব্যক্তি প্রথম কাতার থেকে পেছনে সরে আসবে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্যের আদেশ অনুসরণ করল। সুতরাং তার নামায নষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু দুররে-মুখতার গ্রন্থের 'ইমামত' অধ্যায়ে এ মাস'আলা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

ثم نقل تصحيح عدم الفساد فى مسئلة من جذب من الصف فتاخر فهل ثم فرق فليحرر -এর উপর আল্লামা তাহ্তাভী লেখেন- لانه امتثل امر الله অর্থাৎ—এ অবস্থায় নামায নষ্ট না হওয়ার কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে সে আগন্তুকের আদেশ পালন করেনি; বরং আল্লাহর সে আদেশই পালন করেছে যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে তার কাছে পৌঁছেছে যে, এরূপ অবস্থা দেখা দিলে সামনের কাতার থেকে পেছনে সরে আসা উচিত।

'শরহে ওয়াহ্‌বানীয়া' গ্রন্থে শরণবলালী (র) এ মাসআলা উল্লেখ করে নামায নষ্ট হওয়া সম্পর্কিত অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। এরপর নিজের ভাষায় এভাবে তা খণ্ডন করেছেন ঃ

لذا قيل لمصل تقدم فتقدم (الى) فسدت صلوٰته . لانه امتثل امر غير

الله فى الصلوة . لان امتثاله انما هو لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يضر .

উল্লিখিত সব রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় নামাযের বাইরের কোন লোকের কথায় সাড়া দিলে তা দুই কারণে হতে পারে। প্রথমত, বাইরের ব্যক্তির সন্তুষ্টির জন্য সাড়া দেওয়া। এ অবস্থায় নামায নষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, সে ব্যক্তি যদি কোন মাসআলা বলে এবং নামাযী তা অনুসরণ করে, তবে তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র আদেশেরই অনুসরণ। এজন্য তার নামায নষ্ট হবে না। আল্লামা তাহ্তাভীর মীমাংসাও তা-ই।

اقول لو قيل بالتفصيل بين كونه امتثل امر الشارع فلا تفسد وبين كونه امتثل امر الداخل مراعاة لخاطره من غير نظر الى امر الشارع فتفسد لكان حسنا (طحطاوى على الدررص ٢٤٧ج٢).

এভাবে লাউডস্পীকারের মাসআলাটির মীমাংসাও সহজ হয়ে যাচ্ছে। এখানে লাউডস্পীকারের অনুসরণ করার কোন সম্ভাবনাই নেই। বরং এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সা)-এর এ নির্দেশেরই অনুসরণ করা হয় যে, ইমাম যখন রুকূ করে, তখন তোমরাও রুকূ কর, ইমাম যখন সিজদা করে, তখন তোমরাও সিজদা কর। লাউডস্পীকার দ্বারা শুধু এতটুকু জানা যায় যে, এখন ইমাম রুকূ অথবা সিজদায় যাচ্ছেন। এটা জানার পর মুসল্লী ইমামেরই অনুসরণ করে, লাউডস্পীকারের নয়। বস্তুত ইমামের অনুসরণ হলো আল্লাহ্র নির্দেশ।

উপরোক্ত আলোচনা এ ভিত্তিতে করা হলো যে, কারো কারো মতে লাউডস্পীকারের আওয়াজ হুবহু ইমামের আওয়াজ নয়; বরং ইমামের আওয়াজের উদ্ধৃতি ও বর্ণনা। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, লাউডস্পীকারের আওয়াজ হুবহু ইমামেরই আওয়াজ (লাউডস্পীকারের নিজস্ব কোন আওয়াজ নেই)। এমতাবস্থায় নামায জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ما كان الله ليضيع ايمانكم এখানে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা ঈমানের প্রচলিত অর্থ নেওয়া হলে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, কেবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধেরা মনে করতে থাকে যে, এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না। কাজেই তোমরা নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত করো না।

কোন কোন হাদীসে এবং মনীষীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে নামায। মর্মার্থ এই যে, সাবেক কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে যে সব নামায পড়া হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সেগুলো নষ্ট করবেন না; বরং তা শুদ্ধ ও মকবুল হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ইবনে-'আযেব (রা) এবং তিরমিযীতে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কা'বাকে কেবলা করার পর অনেকেই প্রশ্ন করে যে, যে সব মুসলমান ইতিমধ্যেই ইন্তিকাল করেছেন, তাঁরা বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে নামায পড়ে গেছেন—কা'বার দিকে

নামায পড়ার সুযোগ পাননি, তাঁদের কি হবে ? এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এতে নামাযকে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের সব নামাযই শুদ্ধ ও গ্রহণীয়। তাদের ব্যাপারে কেবলা পরিবর্তনের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾

(১৪৪) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সেই কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব, যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর। যারা আহলে-কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ বেখবর নন সেই সমস্ত কর্ম সম্পর্কে যা তারা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আপনি মনে মনে কা'বাকে কেবলা করার বাসনা পোষণ করেন এবং ওহীর আশায় বারবার আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখেন যে, বোধ হয় ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছে। অতএব) নিশ্চয় আমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখছি--(আপনার মনস্তুষ্টি আমার লক্ষ্য) এ কারণে আমি (ওয়াদা করছি যে,) আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দিব, যাকে আপনি পছন্দ করেন। নিন, আমি সাথে সাথেই নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি যে,) এখন থেকে নামাযের মধ্যে আপন চেহারা মসজিদে-হারামের দিকে করুন (এ নির্দেশ একমাত্র আপনার জন্যই নয়; বরং আপনি এবং আপনার সম্প্রদায়ও তা-ই করবেন।) যেখানেই যে থাক (মদীনায় অথবা অন্যত্র, এমনকি স্বয়ং বায়তুল-মোকাদ্দাসে থাকলেও) স্বীয় মুখমণ্ডল সে (মসজিদে হারামের) দিকেই কর। (এ কেবলা নির্ধারণ সম্পর্কে) আহলে কিতাবও (সাধারণ আসমানী গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে) অবশ্যই জানত যে, (শেষ যমানার পয়গম্বরের কেবলা এরূপ হবে এবং) এ নির্দেশ সম্পূর্ণ ঠিক (এবং) তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকেই (আগত। কিন্তু হঠকারিতাবশত তারা তা স্বীকার করে না)। আল্লাহ তা'আলা তাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বে-খবর নন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে কা'বার প্রতি রসূলুল্লাহ (সা)-এর আকর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে। এ আকর্ষণের বিভিন্ন কারণ বর্ণিত হয়েছে। এসব কারণের মধ্যে কোন বিরোধ

নেই--সবই সম্ভবপর। উদাহরণত মহানবী (সা) ওহী অবতরণ ও নবূয়ত-প্রাপ্তির পূর্বে স্বীয় স্বভাবগত ঝোঁকে দীনে ইবরাহিমীর অনুসরণ করতেন। ওহী অবতরণের পর কোরআনও তাঁর শরীয়তকে দীনে-ইবরাহিমীর অনুরূপ বলেই আখ্যা দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর কেবলাও কা'বাই ছিল।

আরও কারণ ছিল এই যে, আরব গোত্রগুলো মৌখিকভাবে হলেও দীনে ইবরাহিমী স্বীকার করত এবং নিজেদেরকে তার অনুসারী বলে দাবি করত। ফলে কা'বা মুসলমানদের কেবলা হয়ে গেলে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারত। সাবেক কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাস দ্বারা আহ্‌লে কিতাবদের আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ষোল-সতের মাসের অভিজ্ঞতার পর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ, মদীনার ইহুদীরা এর কারণে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে দূরে সরে যাচ্ছিল।

মোটকথা, কা'বা মুসলমানদের কেবলা সাব্যস্ত হোক--এটাই ছিল মহানবী (সা)-এর আন্তরিক বাসনা। তবে আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীল পয়গম্বরগণ কোন দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করার অনুমতি আছে বলে না জানা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দরবারে কোন দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করেন না। এতে বোঝা যায় যে, মহানবী (সা) এ দোয়া করার অনুমতি পূর্বাহ্নেই পেয়েছিলেন। এজন্য তিনি কেবলা পরিবর্তনের দোয়া করেছিলেন এবং তা কবূল হবে বলে আশাবাদীও ছিলেন। এ কারণেই তিনি বারবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখতেন যে, ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছে কিনা! আলোচ্য আয়াতে এ দৃশ্যটি বর্ণনা করার পর প্রথমে দোয়া কবূল করার ওয়াদা করা হয়-- فَلَنُوَلِّيَنَّكَ অর্থাৎ 'আমি আপনার চেহারা মোবারক সে-দিকেই ফিরিয়ে দিব' যেদিকে আপনি পছন্দ করেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ সেদিকে মুখ করার আদেশ নাযিল করা হয়, যথা فَوَلِّ وَجْهَكَ এর বর্ণনা পদ্ধতিটি বিশেষ আনন্দদায়ক। এতে প্রথমে ওয়াদার আনন্দ ও পরে ওয়াদা পূরণের আনন্দ একই সাথে উপভোগ করা যায়। (---কুরতুবী, জাস্‌সাস মাযহারী)

নামাযে কেবলামুখী হওয়ার মাসআলা ঃ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে সব দিকই সমান। قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহরই মালিকানাধীন। কিন্তু উম্মতের স্বার্থে সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য একটি দিককে কেবলা হিসাবে নির্দিষ্ট করে সবার মাঝে ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তবে এ দিকটি বায়তুল-মোকাদ্দাসও হতে পারত। কিন্তু মহানবী (সা)-এর আন্তরিক বাসনার কারণে কা'বাকে কেবলা সাব্যস্ত করে আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে فول وجهك الى الكعبة অর্থাৎ—'কা'বার দিকে অথবা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ কর' বলার পরিবর্তে شطر المسجد الحرام (অর্থাৎ—মসজিদে হারামের দিকে) বলা হয়েছে। এতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

প্রথমত, যদিও আসল কেবলা বায়তুল্লাহ্ তথ্য কা'বা কিন্তু কা'বার দিকে মুখ করা সেখান পর্যন্তই সম্ভব, যেখান থেকে তা দৃষ্টিগোচর হয়। যারা সেখান থেকে দূরে এবং কা'বা তাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকে, তাঁদের উপরও হুবহু কা'বার দিকে মুখ করার কড়াকড়ি আরোপ করা হলে, তা পালন করা খুবই কঠিন হতো। বিশেষ যন্ত্রপাতি ও অঙ্কের মাধ্যমেও নির্ভুল দিক নির্ণয়

করা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে অনিশ্চিত হয়ে পড়তো। অথচ শরীয়ত সহজ-সরল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে বায়তুল্লাহ্ অথবা কা'বা শব্দের পরিবর্তে মসজিদুল হারাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বায়তুল্লাহ্ অপেক্ষা মসজিদুল-হারাম অনেক বেশি স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এ বিস্তৃত স্থানের দিকে মুখ করা দূর-দূরান্তের মানুষের জন্যও সহজ।

সংক্ষিপ্ত শব্দ الى। -এর পরিবর্তে شطر শব্দটি ব্যবহার করায় কেবলার দিকে মুখ করার ব্যাপারটি আরও সহজ হয়ে গেছে। شطر দু' অর্থে ব্যবহৃত হয়- বস্তুর অর্ধাংশ ও বস্তুর দিক। আলোচ্য আয়াতে এর অর্থ হচ্ছে বস্তুর দিক। এতে বোঝা যায় যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বা অঞ্চলে বিশেষভাবে মসজিদে হারামের দিকে মুখ করাও জরুরী নয়; বরং মসজিদে হারাম যেদিকে অবস্থিত, সে দিকের প্রতি মুখ করাই যথেষ্ট। -(বাহ্‌রে মুহীত)

প্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশের জন্য মসজিদে হারামের দিক হলো পশ্চিম; যেদিকে সূর্য অস্ত যায়, সেই দিক। অতএব, সূর্যাস্তের দিকে মুখ করলেই কেবলার দিকে মুখ করার ফরয পালিত হবে। তবে শীত-গ্রীষ্মের পরিবর্তনে সূর্যাস্তের দিকও পরিবর্তিত হতে থাকে। এ কারণে ফিকহ্‌বিদগণ শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর অস্তস্থলের মাঝামাঝি দিককে অস্তস্থলের কেবলার দিক সাব্যস্ত করেছেন। অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী গ্রীষ্মের অস্তস্থল ও শীতের অস্তস্থলের মধ্যবর্তী ৪৮ ডিগ্রী পর্যন্ত কেবলার দিক ঠিকই থাকবে এবং নামায জায়েয হবে। অঙ্কশাস্ত্রের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শরহে-চিগ্‌মিনী'র চতুর্থ অধ্যায় ৬৬ পৃষ্ঠায় উভয় অস্তদিকের দূরত্ব ৪৮ ডিগ্রী বলা হয়েছে।

কেবলার দিক জানার জন্য শরীয়ত মতে মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ও অঙ্কশাস্ত্র প্রয়োগ করা অপরিহার্য নয় ঃ কিছুসংখ্যক লোক উপমহাদেশের অনেক মসজিদের কেবলার দিকে দু'চার ডিগ্রী পার্থক্য দেখে বলে দিয়েছে যে, এসব মসজিদে নামায জায়েয হয় না। এটা নিছক মূর্খতা এবং অহেতুকভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস বৈ কিছু নয়।

ইসলামী শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যত বংশধর এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য সমভাবে কার্যকরী। এ কারণে শরীয়তের বিধি-বিধানকে প্রত্যেক পর্যায়েই সহজ রাখা হয়েছে—যাতে প্রত্যেক শহর-গ্রাম, পাহাড়-ময়দান ও উপত্যকায় বসবাসকারী মুসলমান এসব বিধানকে দেখে-শুনে বাস্তবায়ন করতে পারে এবং যাতে কোন পর্যায়েই গণিত, অংক অথবা দিকদর্শন যন্ত্রের প্রয়োজন না পড়ে। ৪৮ ডিগ্রী পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম দিক প্রাচ্যবাসীদের কেবলা। এতে পাঁচ-দশ ডিগ্রী পার্থক্য হয়ে গেলেও তাতে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এক হাদীস দ্বারা বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়ে যায়। বলা হয়েছে ঃ ما بين المشرق والمغرب قبلة -অর্থাৎ—পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝামাঝি কেবলা। তিনি মদীনাবাসীদের উদ্দেশ্যে একথা বলেছিলেন। কারণ, তাদের কেবলা পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝামাঝি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এ হাদীস যেন شطر المسجد الحرام -এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছে যে, মসজিদে-হারামের দিকে মুখ করাই যথেষ্ট। তবে মসজিদ নির্মাণের সময় যতটুকু সম্ভব কা'বার দিকের সঠিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করা উত্তম। সাহাবী, তাবেয়ী ও পূর্ববর্তী মনীষিগণের কেবলা নির্ণয়ের ব্যাপারে সরল ও সোজা পন্থা ছিল এই যে, তাঁরা সাহাবীগণের নির্মিত কোন মসজিদ থাকলে

তা দেখে তার আশপাশের মসজিদসমূহের কেবলা ঠিক করতেন। এমনিভাবে সারা বিশ্বের মুসলমানদের কেবলা ঠিক করা হয়েছে। এ কারণে দূরবর্তী দেশসমূহে কেবলার দিক জানার বিশুদ্ধ পন্থা হলো প্রাচীন মসজিদসমূহের অনুসরণ করা। কারণ, অধিকাংশ দেশে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেছেন এবং কেবলার দিক নির্ণয় করেছেন। অতঃপর এগুলো দেখে মুসলমানরা অন্যান্য জনপদে নিজ নিজ মসজিদ নির্মাণ করেছেন।

অতএব মুসলমানদের এসব মসজিদই কেবলার দিক জানার জন্য যথেষ্ট। এ কাজে অহেতুক দার্শনিক প্রশ্নাদি উত্থাপন করা প্রশংসনীয় নয়, বরং নিন্দনীয় ও উদ্বেগের কারণ। অনেক সময় এ দুশ্চিন্তায় পড়ে মানুষ সাহাবী, তাবেয়ীন ও সাধারণ মুসলমানদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করে যে, তাঁদের নামায দুরস্ত হয়নি। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ও চরম ধৃষ্টতা বৈ কিছু নয়। হিজরী অষ্টম শতাব্দীর খ্যাতনামা আলিম ইবনে রাজাব হাম্বলী এ কারণেই কেবলার দিক সম্পর্কে মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও সূক্ষ্ম গাণিতিক তর্কে প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করেছেন। তাঁর ভাষ্য—

واما علم التسيير فاذا تعلم منه ما يحتاج اليه للاستهداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور وما زاد عليه فلاحاجة اليه وهو يشغل عما هو اهم منه وربما ادى التدقيق فيه الى اساءة الظن بمحاريب المسلمين فى امصارهم كما وقع فى ذلك كثير من اهل هذا العلم قديما وحديثا . وذالك يقضى الى اعتقاد الصحابة والتابعين فى صلواتهم فى كثير من الامصار وهو باطل وقد انكر الامام احمد الاستدلال بالجدى وقال انما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة .

—অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের মতে সৌরবিদ্যা এতটুকু শিক্ষা করা জায়েয, যদ্দ্বারা কেবলা ও রাস্তার পরিচয় লাভ করা যায়। এর বেশি শিক্ষা করার প্রয়োজন নেই। কারণ, এর বেশি শিক্ষা অন্যান্য অধিকতর জরুরী বিষয়াদি থেকে উদাসীন করে দিতে পারে। সৌরবিদ্যার গভীর তথ্যানুসন্ধান অনেক সময় মুসলিম দেশসমূহের মসজিদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে। এ বিদ্যার্জনে নিয়োজিত ব্যক্তিরা প্রায়ই এ ধরনের সন্দেহের সম্মুখীন হয়। এতে এরূপ বিশ্বাসও অন্তরে দানা বাঁধতে থাকে যে, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের নামায দুরস্ত হয়নি। এটা একেবারেই ভ্রান্ত কথা। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) তারকার সাহায্যে কেবলা নির্ণয় করতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, "হাদীস অনুযায়ী পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী সম্পূর্ণ দিকই (মদীনার) কেবলা।"

যেসব জনবসতিহীন এলাকায় প্রাচীন মসজিদ নেই, সেখানে এবং নতুন দেশে কেবলা নির্ণয়ের ব্যাপারে শরীয়তসম্মত যে পন্থা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে বর্ণিত রয়েছে তা এই যে, চন্দ্র, সূর্য ও ধ্রুবতারা প্রভৃতির দ্বারা অনুসন্ধান করে কেবলার দিক নির্ণয় করতে হবে। এতে সামান্য বিচ্যুতি থাকলেও তা উপেক্ষা করতে হবে। কারণ 'বাদায়ে' গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী

দূরবর্তী দেশসমূহে অনুমান-ভিত্তিক দিকই কেবলার সমতুল্য। এর উপর ভিত্তি করেই দূরবর্তী বিধি-বিধান কার্যকর হবে। উদাহরণত শরীয়ত নিদ্রাকে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু নির্গত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত করেছে। ফলে এখন ওযু ভঙ্গের বিধান নিদ্রার সাথেও সম্পৃক্ত হয়েছে—বায়ু নির্গত হোক বা না হোক। অথবা শরীয়ত সফরকে কষ্টের পর্যায়ভুক্ত করেছে। এখন সফর হলেই রোযা রাখার ব্যাপারে স্বাধীনতার নির্দেশ দেওয়া হবে—কষ্ট হোক বা না হোক। এমনিভাবে দূরবর্তী দেশসমূহে প্রসিদ্ধ নির্দেশাদির মাধ্যমে অনুমান করে কেবলার যেদিক নির্ণয় করা হবে, তা-ই শরীয়তে কা'বার সমতুল্য হবে। আল্লামা বাহরুল উলুম 'রাসায়েলুল-আরকান' গ্রন্থে বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

والشرط وقوع المسامتة على حسب ما يرى المصلى ونحن غير مامورين بالمسامتة على ما يحكم به الا لات الرصدية ولهذا افتوا ان الانحراف المفسدان يتجاوز المشارق والمغارب .

—কেবলামুখী হওয়ার ব্যাপারে শর্ত ও কর্তব্য বিষয় এতটুকুই যে, মুসল্লীর মত ও অনুমান অনুযায়ী কা'বার সামনা-সামনি হতে হবে। মানমন্দিরের যন্ত্রপাতির মাধ্যমে যে দিক নির্ণয় করা হয়, তা অর্জন করতে আমরা আদিষ্ট নই। এ কারণে ফিক্হবিদগণের ফতোয়া এই যে, বিচ্যুতির কারণে নামায নষ্ট হয়, তা হলো পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বিচ্যুত হওয়া।

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾

---

(১৪৫) যদি আপনি আহ্লে-কিতাবদের কাছে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কেবলা মেনে নেবে না এবং আপনিও তাদের কেবলা মানেন না। তারাও একে অন্যের কেবলা মানে না। যদি আপনি তাদের বাসনা অনুসরণ করেন সে জ্ঞানলাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে নিশ্চয় আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সবকিছু বোঝা সত্ত্বেও তাদের হঠকারিতা এই পর্যায়ের যে) যদি আপনি (এসব) আহ্লে কিতাবের সামনে (সারা দুনিয়ার সমুদয়) নিদর্শন (একত্রিত করে) উপস্থাপন করেন তবুও তারা (কখনও) আপনার কেবলাকে গ্রহণ করবে না। (তাদের বন্ধুত্বের আশা করা এজন্যও উচিত নয়

যে, আপনার এ কেবলাও আর রহিত হবে না, সুতরাং) আপনিও তাদের কেবলা কবূল করতে পারেন না। (কাজেই ঐক্য বিধানের আর কোন উপায় অবশিষ্ট রইল না। আহলে কিতাবরা যেমন আপনার সাথে হঠকারিতা করে, তেমনি তাদের পরস্পরের মধ্যেও কোন মিল নেই। কেননা,) তাদের কোন দলই অন্যদলের কেবলা কবূল করে না। (উদাহরণত ইহুদীরা বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেবলা করে রেখেছিল এবং খৃষ্টানরা পূর্বদিককে কেবলা করে রেখেছিল।) আর (আপনি তাদের রহিত ও শরীয়তে নিষিদ্ধ কেবলাকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ, যদিও তা এক সময় খোদায়ী নির্দেশ ছিল, কিন্তু মনসুখ বা রহিত হয়ে যাবার দরুন তার উপর তাদের বর্তমান আমল একান্তই বিদ্বেষপ্রসূত। কাজেই আল্লাহ্ না করুন), আপনি যদি তাদের (এহেন খামখেয়ালীপূর্ণ) কামনা-বাসনাগুলোর অনুসরণ করেন, (তাও আপনার নিকট প্রকৃষ্ট) জ্ঞান (সংক্রান্ত ওহী) আগমনের পর, তা'হলে নিশ্চিতই আপনি জালিমে পরিগণিত হয়ে যাবেন। (বস্তুত তারা হলো হুকুম অমান্যকারী। আর আপনি যেহেতু নিরপেক্ষ, কাজেই আপনার পক্ষে তেমনটি হওয়া অসম্ভব। সুতরাং আপনার পক্ষে তাদের মতামত অবলম্বন করে নেওয়া কেবলার বিষয়বস্তু ও যার অন্তর্গত সম্পূর্ণ অসম্ভব)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ—আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, খানায়ে কা'বা কিয়ামত পর্যন্ত আপনার কেবলা থাকবে। এতে ইহুদী-নাসারাদের সে মতবাদের খণ্ডন করাই ছিল উদ্দেশ্য যে, মুসলমানদের কেবলার কোন স্থিতি নেই, ইতিপূর্বে তাদের কেবলা ছিল খানায়ে কা'বা, পরিবর্তিত হয়ে বায়তুল-মোকাদ্দাস হলো, আবার তাও বদলে গিয়ে পুনরায় খানায়ে-কা'বা হলো। আবারও হয়তো বায়তুল-মোকাদ্দাসকেই কেবলা বানিয়ে নেবে।--(বাহরে মুহীত)

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ এখানে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নিয়ে হুযূর (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টির দ্বারা উম্মতে-মুহাম্মদীকে অবহিত করাই উদ্দেশ্য যে, উল্লিখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ এতই কঠিন ব্যাপার যে, স্বয়ং রসূলে করীম (সা)-ও যদি এমনটি করেন (অবশ্য তা অসম্ভব), তবে তিনিও সীমালংঘনকারী বলে সাব্যস্ত হবেন।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ

الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤٦﴾ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

---

(১৪৬) আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনেশুনে সত্যকে গোপন করে। (১৪৭) বাস্তব সত্য সেটাই, যা তোমার পালনকর্তা বলেন। কাজেই তুমি সন্দিহান হয়ো না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতে আহলে-কিতাব সম্প্রদায় কর্তৃক মুসলমানদের কেবলাকে সত্য জানা এবং মুখে তা অস্বীকার করার কথা আলোচিত হয়েছে। এ আয়াতে তেমনিভাবে কেবলার প্রবর্তক অর্থাৎ মহানবী [সা]-কে মনে মনে সত্য জানা এবং মুখে মুখে অস্বীকার করার বিষয় আলোচিত হচ্ছে।

যাদেরকে আমি (তওরাত ও ইঞ্জিল প্রভৃতি) কিতাব দান করেছি, তারা তওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত সুসংবাদসমূহের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ্ [(সা)-কে রসূল হিসাবে] এমন সন্দেহাতীতভাবে চেনে, যেমন নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে (তাদের আকার-অবয়বের দ্বারা) চিনতে পারে। [নিজের সন্তান-সন্ততিকে দেখে যেমন কখনো সন্দেহ হয় না যে, সে কে, তেমনিভাবে রসূল (সা)-এর ব্যাপারেও তাদের কোন সন্দেহ সংশয় নেই। বরং অনেকে তো ঈমান গ্রহণও করে নিয়েছে।] আবার তাদের মধ্যে অনেকে (রয়েছে, যারা) বিষয়টি বিস্তারিত জানা সত্ত্বেও গোপন করে। (অথচ) এটা যে বাস্তবিক আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং (প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, এমন একটি বাস্তব ব্যাপারে) কখনও কোন প্রকার সন্দেহে পতিত হয়ো না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে রসূলে করীম (সা)-কে রসূল হিসাবে চেনার উদাহরণ সন্তানদের চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এরা যেমন কোন রকম সন্দেহ-সংশয়হীনভাবে নিজেদের সন্তানদেরকে জানে, তেমনিভাবে তওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত রসূলে করীম (সা)-এর সুসংবাদ, প্রকৃষ্ট লক্ষণ ও নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাঁকেও সন্দেহাতীতভাবেই চেনে। কিন্তু তাদের যে অস্বীকৃতি, তা একান্তভাবেই হঠকারিতা ও বিদ্বেষপ্রসূত।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পরিপূর্ণভাবে চেনার উদাহরণ পিতা-মাতাকে চেনার সাথে না দিয়ে সন্তান-সন্ততিকে চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে। অথচ মানুষ স্বভাবত পিতা-মাতাকেও অত্যন্ত ভাল করেই জানে। এহেন উদাহরণ দেওয়ার কারণ হলো এই যে, পিতা-মাতার নিকট সন্তানাদির পরিচয় সন্তানের নিকট পিতা-মাতার পরিচয় অপেক্ষা বহুগুণ বেশি হয়ে থাকে। কারণ, পিতা জন্মলগ্ন থেকে সন্তান-সন্ততিকে স্বহস্তে লালন-পালন করে। তাদের শরীরের এমন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই, যা পিতা-মাতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে পিতা-মাতার গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সন্তানরা কখনও দেখে না।

এ বর্ণনার দ্বারা এ কথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, এখানে সন্তানকে শুধু সন্তান হিসাবে চেনাই উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তার পৈতৃক সম্পর্ক ক্ষেত্র বিশেষে সন্দেহজনকও হতে পারে। স্ত্রীর খেয়ানতের দরুন সন্তান তার নিজের নাও হতে পারে। বরং এখানে আকার-অবয়বের পরিচয় জানা হলো উদ্দেশ্য। পুত্র-কন্যা প্রকৃতপক্ষে নিজের হোক বা নাই হোক, কিন্তু মানুষ সন্তান হিসাবে যাকে প্রতিপালন করে, তার আকার-অবয়ব চেনার ব্যাপারে কখনও সন্দেহ হয় না।

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۗ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ
جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۗ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۗ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۗ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

(১৪৮) আর সবার জন্যই রয়েছে কেবলা একেক দিকে, যে দিকে সে মুখ করে (ইবাদত করবে)। কাজেই সৎ কাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাকবে, আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব বিষয়ে ক্ষমাশীল। (১৪৯) আর যে স্থান থেকে তুমি বের হও, নিজের মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও--নিঃসন্দেহে এটাই হলো তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত বাস্তব সত্য। বস্তুত তোমার পালনকর্তা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবহিত নন। (১৫০) আর তোমরা যেখান থেকেই বেরিয়ে আস এবং যেখানেই অবস্থান কর, সে দিকেই মুখ ফেরাও, যাতে করে মানুষের জন্য তোমাদের সাথে ঝগড়া করার অবকাশ না থাকে। অবশ্য যারা অবিবেচক তাদের কথা আলাদা। কাজেই তাদের আপত্তিতে ভীত হয়ো না; আমাকেই ভয় কর! যাতে আমি তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহসমূহ পূর্ণ করে দেই এবং তাতে যেন তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (কেবলা পরিবর্তনের দ্বিতীয় তাৎপর্য হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার রীতি অনুসারে) প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের জন্যই একেকটি কেবলা নির্ধারিত রয়েছে, (ইবাদত করার সময়) তারা সেদিকেই মুখ করে থাকে। (শরীয়তে মুহাম্মদীও যেহেতু একটি স্বতন্ত্র দীন, কাজেই এর জন্যও একটি কেবলা নির্ধারণ করে দেওয়া হলো। এ তাৎপর্যটি যখন সবাই জানতে পারল) কাজেই (হে মুসলমানগণ, এখন এসব বিতর্ক পরিহার করে) তোমরা সৎকাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাবার চেষ্টা কর। (কারণ, একদিন তোমাদেরকে নিজেদের মালিকের সম্মুখীন হতে হবে। কাজেই) তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের

সবাইকে (নিজের সামনে) অবশ্যই হাযির করবেন। (তখন সৎকাজের প্রতিদান এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।) বস্তুত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিশ্চয়ই যাবতীয় বিষয়ে ক্ষমতাশীল। আর (এ তাৎপর্যের তাকীদও এই যে, যেভাবে মুকীম অবস্থায় কা'বার দিকে মুখ করা হয়, তেমনিভাবে মদীনা কিংবা অন্য) যে কোনখান থেকে যদি আপনি সফরে গমন করেন, (তখনও নামায পড়ার সময়) নিজের চেহারা মসজিদে হারামের দিকে রাখবেন। (সারকথা, মুকীম অবস্থায় হোক কিংবা সফরকালে হোক, সর্বাবস্থায় এটাই হলো কেবলা।) আর (কেবলার ব্যাপারে) এই সাধারণ নির্দেশই হলো সম্পূর্ণ ও সঠিক এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে এতটুকুও অনবহিত নন।

কেবলা পরিবর্তনের তৃতীয় তাৎপর্য ঃ আর (আবারও বলা হচ্ছে যে,) আপনি যেখানে সফরে বেরুবেন, (নামায পড়তে গিয়ে) মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করবেন (আর এ হুকুম মুকীম অবস্থায় অবশ্যই পালনীয়)। এছাড়া তোমরা (যারা মুসলমান, সবাই শুনে নাও) যেখানেই থাক না কেন, (নামায পড়তে গিয়ে) নিজেদের চেহারা এই মসজিদুল হারামের দিকেই রাখবে। (এই হুকুমটি এজন্যই নির্দিষ্ট করা হচ্ছে,) যাতে (বিরোধী) লোকদের পক্ষে তোমাদের বিরুদ্ধে এমন (কোন) কথা বলার সাহস না থাকে [যে, মুহাম্মদ (সা)-ই যদি শেষ যমানার সেই প্রতিশ্রুত নবী হতেন, তবে তাঁর লক্ষণগুলোর মধ্যে তো একথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, তাঁর আসল কেবলা হবে কা'বাগৃহ, অথচ তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। এই হলো কেবলা পরিবর্তনের তৃতীয় তাৎপর্য। তবে হ্যাঁ,] এদের মধ্যে যারা (একান্তই) অবিবেচক, অর্বাচীন (তারা এখনও এমন কূট-যুক্তির অবতারণা করবে যে, তিনি যদি নবীই হবেন, তাহলে সমস্ত নবীর বিরুদ্ধে--মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করে নামায পড়েন কেমন করে। কিন্তু এহেন অবান্তর আপত্তিতে যেহেতু দীনের কিছুই আসে যায় না, সেহেতু) তাদের কথা আলাদা। সুতরাং তাদের ব্যাপারে এতটুকুও আশংকা করো না--(এবং তাদের জওয়াব দেওয়ার পেছনেও পড়ো না)। একমাত্র আমাকেই ভয় করতে থাক (যাতে আমার বিধি-বিধানের কোন রকম বিরোধিতা না হয়। কারণ, এ ধরনের বিরোধিতা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর)। আর (আমি উল্লিখিত বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করার তওফীকও দিয়েছি) যাতে তোমাদের উপর আমার যে অনুগ্রহ ও করুণারাজি এসেছে, (তোমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে) তা পরিপূর্ণ করে দিতে পারি। এবং যাতে তোমরা (পৃথিবীতে ইসলামের) সরল ও সত্যপথের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পার (যার উপর নিয়ামতের পরিপূর্ণতা নির্ভরশীল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বলতে গিয়ে-- فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ বাক্যটি তিনবার এবং حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ বাক্যটি দু'বার করে আবৃত্তি করা হয়েছে। এর একটা সাধারণ কারণ এই যে, কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশটি বিরোধীদের জন্য তো এক হৈ-চৈয়ের ব্যাপার ছিলই; স্বয়ং মুসলমানদের জন্যও তাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে ছিল একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। কাজেই এই নির্দেশটি যদি যথার্থ তাকীদ ও গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করা না হতো, তাহলে মনের প্রশান্তি অর্জন হয়ত যথেষ্ট সহজ

হতো না। আর সেজন্যই নির্দেশটিকে বারবার আবৃত্তি করা হয়েছে। তদুপরি এতে এরূপ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, কেবলার এই যে পরিবর্তন এটাই সর্বশেষ পরিবর্তন। এরপর পুনঃপরিবর্তনের আর কোন সম্ভাবনাই নেই।

বয়ানুল-কোরআনের তফসীরে, সংক্ষেপে নির্দেশটি বারবার উল্লেখের যে কারণ বর্ণিত হয়েছে, কুরতুবীতেও প্রায় একই যুক্তির কথা বলে পুনরুল্লেখের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা হয়েছে। যথা--প্রথমবারের নির্দেশ ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ

--"অতঃপর তুমি তোমার মুখমণ্ডল মসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও এবং যেখানেই তুমি থাক না কেন, এরপর থেকে তুমি তোমার চেহারা সেদিকেই ফেরাবে"--এ নির্দেশটি মুকীম অবস্থায় থাকার সময়ের। অর্থাৎ যখন আপনি আপনার স্থায়ী বাসস্থানে অবস্থান করেন, তখন নামাযে মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন। এরপর সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে, حَيْثُمَا كُنْتُمْ নিজের দেশে বা শহরে যেখানেই থাক না কেন, নামাযে বায়তুল্লাহর দিকেই মুখ ফেরাবে, এ নির্দেশ শুধু মসজিদে নববীতে নামায পড়ার বেলাতেই নয় বরং যে কোন স্থানের লোকেরা নিজ নিজ শহরে যখন নামায পড়বে, তখন তারা মসজিদুল হারামকেই কেবলা বানিয়ে নামায পড়বে।

এ নির্দেশ দ্বিতীয়বার পুনরুল্লেখ করার পূর্বে وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ অর্থাৎ "যেখানেই তুমি বের হয়ে যাও না কেন" কথাটা যোগ করে বোঝানো হয়েছে যে, নিজ নিজ বাসস্থানে মুকীম থাকা অবস্থায় যেমন তোমরা মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে নামায পড়বে, তেমনি কোথাও সফরে বের হলেও নামাযের সময় মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করেই দাঁড়াবে।

সফরের মধ্যেও কখনো কখনো বিভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সফর ছোট হয়, লম্বাও হয়। অনেক সময় কিছুটা চলার পর যাত্রা বিরতি করতে হয়, আবার সেখান থেকে নতুন করে সফর শুরু হয়। এরূপ অবস্থাতেও কেবলার ব্যাপারে কোন পরিবর্তন হবে না। সফর যে ধরনের এবং যে দিকেই হোক না কেন, নামাযে দাঁড়াবার সময় তোমাদেরকে ঘুরে-ফিরে মসজিদুল হারামের দিকেই মুখ ফেরাতে হবে।

তৃতীয়বারের পুনরুল্লেখের যৌক্তিকতা বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, বিরোধীরা যাতে কথা বলতে না পারে যে, তওরাত এবং ইঞ্জিলে তো বলা হয়েছিল যে, তওরাত এবং ইঞ্জিলে উল্লিখিত নির্দেশসমূহের মধ্যে আখেরী যমানার প্রতিশ্রুত নবীর কেবলা মসজিদুল হারাম হওয়ার কথা, কিন্তু এ রসূল (সা) কা'বার পরিবর্তে বায়তুল মোকাদ্দাসকে কেবলা করে নামায পড়ছেন কেন?

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا শব্দটিতে وِجْهَةٌ শব্দটির আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু যার দিকে মুখ করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ কেবলা। এক্ষেত্রে হযরত উবাই ইবনে কা'ব وِجْهَةٌ-এর স্থলে قِبْلَةٌ ও পড়েছেন বলে বর্ণিত রয়েছে।

তফসীরের ইমামগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই--প্রত্যেক জাতিরই ইবাদতের সময় মুখ করার জন্য একটা নির্ধারিত কেবলা চলে আসছে। সে কেবলা আল্লাহ্র তরফ হতে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে অথবা তারা নিজেরাই তা নির্ধারণ করে নিয়েছে। মোটকথা, ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিই কোন না কোন দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় আখেরী নবীর উম্মতগণের জন্য যদি কোন একটা বিশেষ দিককে কেবলা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কি আছে?

দীনী ব্যাপারে অর্থহীন বিতর্ক পরিহার করার নির্দেশ

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ এ আয়াতের পূর্বে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব কেবলা চলে আসছে। সুতরাং একের পক্ষে অন্যের কেবলা মান্য না করাই স্বাভাবিক। সে হিসেবে নিজেদের কেবলার যথার্থতা নিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া অর্থহীন। উপরোক্ত বাক্যটির মূল বক্তব্য বিষয় হচ্ছে যে, যখন বোঝা যাচ্ছে যে, এ বিতর্কে তাদের কোন উপকার হবে না, তারা তাদের ঐতিহ্যগত কেবলার ব্যাপারে অন্যের যুক্তি মানবে না, তখন এ অর্থহীন বিতর্কে কালক্ষেপণ না করে তোমাদের আসল কাজে আত্মনিয়োগ করাই কর্তব্য। সে কাজ হচ্ছে সৎকাজে সকল সাধনা নিয়োজিত করে একে অপর থেকে আগে চলে যাওয়ার চেষ্টা করা। যেহেতু অর্থহীন বিতর্কে সময় নষ্ট করা এবং সৎকর্মে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে আলসেমি প্রদর্শন করা সাধারণত আখিরাতের চিন্তায় গাফলতির কারণে হয়, সে জন্য আখিরাত সম্পর্কে যাদের চিন্তা রয়েছে, তারা কখনও অর্থহীন বিতর্কে জড়িত হয়ে সময় নষ্ট করে না। তারা সব সময় নিজ নিজ কর্তব্য করে যাওয়ার চিন্তায় বিভোর থাকে। এ জন্যই পরবর্তী আয়াতে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا .

যার মর্মার্থ হচ্ছে, বিতর্কে জয়-পরাজয় এবং সাধারণ লোকের নানা প্রশ্ন থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ব্যাপার। খুব শীঘ্রই এমন দিন আসছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র দুনিয়ার সকল জাতির মানুষকেই একত্র করে স্ব-স্ব আমলের হিসাব গ্রহণ করবেন। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে যতটুকু সময় পাওয়া যায়, তা সে কঠিন দিনের চিন্তায় ব্যয় করা।

নেক কাজ সমাধা করতে গিয়ে অনর্থক বিলম্ব করা সমীচীন নয় ঃ فَاسْتَبِقُوا—শব্দ দ্বারা এও বোঝা যায় যে, কোন সৎকাজের সুযোগ পাওয়ার পর তা সমাধা করার ব্যাপারে বিলম্ব করা উচিত নয়। কেননা অনেক সময় ইচ্ছাকৃত বিলম্বের ফলে সে কাজ সমাধা করার তওফীক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, সাদকা, খয়রাত প্রভৃতি সর্ববিধ সৎ কাজে একই অবস্থা হতে পারে। বিষয়টি সূরা আনফালের এক আয়াতে আরো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ .

অর্থাৎ--"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হও, যখন তাঁরা তোমাদেরকে নবজীবনদায়িনী বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানান। মনে রেখো, অনেক সময় আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ এবং তার অন্তরের মধ্যে আড়ালও সৃষ্টি করে থাকেন।"

প্রত্যেক নামাযই কি সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেলা উত্তম ঃ সৎ কাজ দ্রুত সম্পাদন করার উপরোক্ত নির্দেশের ভিত্তিতে কোন কোন ফিক্হবিদ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, প্রত্যেক নামায সময় হওয়ার সাথে সাথে পড়ে নেওয়া উত্তম। আয়াতের সমর্থনে তাঁরা প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার ফযীলত সম্বলিত হাদীসও উদ্ধৃত করেন। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অভিমত তা-ই। ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মালেক (র) এ ব্যাপারে অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে কিছুটা ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেসব নামায কিছুটা দেরি করে পড়েছেন বা পড়তে বলেছেন, সেগুলো তাঁর অনুসরণে একটু দেরি করে পড়াই উত্তম। অবশিষ্টগুলো প্রথম ওয়াক্তে পড়া ভাল। যেমন সহীহ্ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে এশার নামায একটু দেরি করে পড়ার ফযীলত উল্লিখিত হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এশার নামায কিছুটা দেরি করে পড়া পছন্দ করতেন।--(কুরতুবী)

অনুরূপ বুখারী ও তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ যর (রা) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে যে, এক সফরে হযরত বিলাল (রা) প্রথম ওয়াক্তেই যোহরের আযান দিতে চাইলে হুযূর (সা) তাঁকে এই বলে বারণ করলেন যে, 'দুপুরের গরম জাহান্নামের উত্তাপের একটা নমুনা। সুতরাং একটু ঠাণ্ডা হওয়ার পর আযান দাও।' এতে বোঝা যায় যে, গরমের দিনে যোহরের নামায তিনি একটু দেরি করে পড়া পছন্দ করতেন। উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মালেক (র)-এর অভিমত হচ্ছে যে, উল্লিখিত দুই ওয়াক্তে হুযূর (সা) অনুসৃত মুস্তাহাব ওয়াক্ত হওয়ার পর আর দেরি করা উচিত নয়। অন্যান্য ওয়াক্ত যেমন মাগরিবের সময়ে প্রথম ওয়াক্তেই নামায পড়ে নেওয়া উত্তম।

মোটকথা, এ আয়াত দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার পর শরীয়তের দৃষ্টিতে অথবা প্রকৃতিগত কোন বাধার সৃষ্টি না হলে নামায পড়তে দেরি করা উচিত নয়, প্রথম ওয়াক্তে পড়ে নেওয়াই উত্তম। যেসব নামায কিছুটা দেরি করে পড়তে হুযূর (সা) নির্দেশ দিয়েছেন বা নিজে আমল করেছেন কিংবা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অসুবিধার কারণে দেরি করতে হয়, শুধুমাত্র সেগুলোতে কিছুটা দেরি করা যেতে পারে।

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

(১৫১) যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ তেলাওয়াত করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দিবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দিবেন এমন বিষয়, যা কখনো তোমরা জানতে না। (১৫২) সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কা'বাগৃহ নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম (আ) যেসব দোয়া করেছিলেন, কা'বাকে কেবলা নির্ধারণের মাধ্যমে আমি তা কবূল করেছি) যেভাবে (কবুল করেছি একজন রসূল প্রেরণ সম্পর্কিত দোয়া।) তোমাদের মধ্যে আমি একজন (মহান) রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি (যিনি) তোমাদেরই একজন। তিনি আমার আয়াত (নির্দেশ)সমূহ তেলাওয়াত করে তোমাদের শুনিয়ে থাকেন এবং (জাহেলী যুগের ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ থেকে) তোমাদিগকে পবিত্র করেন এবং তোমাদিগকে (আল্লাহ্‌র) কিতাব ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় বলে দেন। তিনি তোমাদিগকে এমন (উপকারী) বিষয়াদি শিক্ষা দেন, যেসব বিষয় সম্পর্কে তোমরা কিছুই জানতে না [পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও যে সম্পর্কে কোন তথ্য দেওয়া হয়নি। এভাবে একজন রসূল প্রেরণ করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ) যে দোয়া করেছিলেন, তারই বাস্তব প্রকাশ হয়ে গেল]। এসব (উল্লিখিত) নিয়ামতসমূহের জন্য আমাকে (যেহেতু আমিই তা দান করেছি) স্মরণ কর। আমিও তোমাদিগকে (অনুগ্রহের মাধ্যমে) স্মরণ রাখব ; আর আমার (নিয়ামতসমূহের) শোকরগুযারী কর এবং (নিয়ামত অস্বীকার করে বা আনুগত্য পরিহার করে আমার প্রতি) অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ পর্যন্ত কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়টির ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী (সা)-এর আবির্ভাব। এতে এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা)-এর আবির্ভাবে কা'বা নির্মাতার দোয়ারও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তাঁর কেবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের কিছুই নেই।

كَمَا أَرْسَلْنَا বাক্যে উদাহরণসূচক যে 'কাফ' (ك) বর্ণটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটি ব্যাখ্যা তো উল্লিখিত তফসীরের মাধ্যমেই বোঝা গেছে। এ ছাড়াও আরেকটি বিশ্লেষণ রয়েছে, যা কুরতুবী গ্রহণ করেছেন। তা হলো এই যে, 'কাফ'-এর সম্পর্ক হলো পরবর্তী আয়াত فَاذْكُرُونِي -এর সাথে। অর্থাৎ, আমি যেমন তোমাদের প্রতি কেবলাকে একটি নিয়ামত হিসাবে দান করেছি এবং অতঃপর দ্বিতীয় নিয়ামত দিয়েছি রসূলের আবির্ভাবের মাধ্যমে,

তেমনি আল্লাহ্র যিকিরও আরেকটি নিয়ামত। এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে, যাতে এসব নিয়ামতের অধিকতর প্রবৃদ্ধি হতে পারে। কুরতুবী বলেন, এখানে كَمَا أَرْسَلْنَا-এর 'কাফ'টির ব্যবহার ঠিক তেমনি, যেমনটি সূরা আনফালের كَمَا أَخْرَجْنَا এবং সূরা হিজর-এর كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ-এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ--এতে 'যিকির'-এর অর্থ হলো স্মরণ করা, যার সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। তবে জিহ্বা যেহেতু অন্তরের মুখপাত্র, কাজেই মুখে স্মরণ করাকেও 'যিকির' বলা যায়। এতে বোঝা যায় যে, মৌলিক যিকিরই গ্রহণযোগ্য, যার সাথে মনেও আল্লাহ্র স্মরণ বিদ্যমান থাকবে। এ প্রসঙ্গেই মওলানা রুমী (র) বলেছেন ঃ

برزبان تسبیح دردل گاؤ وخر * ایں چنیں تسبیح کے دارد اثر

অর্থাৎ, মুখে থাকবে তসবীহ ; আর মনে থাকবে গরু-গাধার চিন্তা, এমন তসবীহ্র ক্রিয়া কি হবে ? তবে এতদসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন লোক যদি মুখে তসবীহ্ জপে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার মন যদি অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ যিকিরে না লাগে, তবুও তা একেবার ফায়দাহীন নয়। হযরত আবু ওসমান (র)-এর কাছে জনৈক ভক্ত এমনি অবস্থায় অভিযোগ করেছিল যে, মুখে মুখে যিকির করি বটে, কিন্তু অন্তরে তার কোনই মাধুর্য অনুভব করতে পারি না ; তখন তিনি বললেন, তবুও আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় কর যে, তিনি তোমার একটি অঙ্গ--জিহ্বাকে তো অন্তত তাঁর যিকিরে নিয়োজিত করেছেন।--(কুরতুবী)

যিকিরের ফযীলত ঃ যিকিরের ফযীলত অসংখ্য। তন্মধ্যে এটাও কম ফযীলত নয় যে, বান্দা যদি আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তাহলে আল্লাহ্ তাকে স্মরণ করেন। আবু ওসমান মাহদী (র) বলেছেন, আমি সে সময়টির কথা জানি, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে স্মরণ করেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি তা কেমন করে জানতে পারেন ? বললেন, তা এজন্য যে, কোরআন করীমের ওয়াদা অনুসারে যখন কোন মু'মিন বান্দা আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ্ নিজেও তাকে স্মরণ করেন। কাজেই বিষয়টি জানা সবার জন্যই সহজ যে, আমরা যখন আল্লাহ্র স্মরণে আত্মনিয়োগ করব, আল্লাহ্ তা'আলাও আমাদের স্মরণ করবেন।

আর আয়াতের অর্থ হলো এই যে, তোমরা যদি আমাকে আমার হুকুমের আনুগত্যের মাধ্যমে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে সওয়াব ও মাগফিরাত দানের মাধ্যমে স্মরণ করব।

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রা) 'যিকরুল্লাহ্'র তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যিকিরের অর্থই হচ্ছে আনুগত্য এবং নির্দেশ মান্য করা। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে ঃ

فمن لم يطعه لم يذكره وان كثر صلوته وتسبيحه .

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশের আনুগত্য করে না, সে আল্লাহ্র যিকিরই করে না, প্রকাশ্যে যত বেশি নামায এবং তসবীহ্ই সে পাঠ করুক না কেন।

যিকিরের তাৎপর্য ঃ মুফাস্সির কুরতুবী ইবনে-খোয়াইয-এর আহকামুল কোরআনের বরাত দিয়ে এ সম্পর্কিত একখানা হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটির মর্মার্থ হচ্ছে যে, রসূল

(সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করে অর্থাৎ তাঁর হালাল ও হারাম সম্পর্কিত নির্দেশগুলোর অনুসরণ করে, যদি তার নফল নামায-রোযা কিছু কমও হয়, সে-ই আল্লাহ্কে স্মরণ করে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে সে নামায-রোযা, তসবীহ-তাহলীল প্রভৃতি বেশি করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্কে স্মরণ করে না।

হযরত যুন্নুন মিসরী (র) বলেন, "যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহ্কে স্মরণ করে, সে অন্য সব কিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই সবদিক দিয়ে তাকে হেফাজত করেন এবং সব কিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন।"

হযরত মু'আয (রা) বলেন, "আল্লাহ্র আযাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মানুষের কোন আমলই যিকরুল্লাহ্র সমান নয়।" হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এক হাদীসে-কুদসীতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোঁট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি।"

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

(১৫৩) হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

যোগসূত্র : কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে ব্যাপক সমালোচনা চলছিল। ফলে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। প্রথমত, নানা রকম জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করে ইসলামের সত্যতার উপর আঘাত এবং মুসলমানদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছিল। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব কূট-প্রশ্নের জবাব দিয়ে সেগুলোকে প্রতিহত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ওদের তরফ থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন যুক্তিপূর্ণ জওয়াব দেওয়ার পরও যেহেতু আরো নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপন এবং তর্কের পর তর্কের অবতারণা করে মুসলমানদের মন-মস্তিষ্ককে বিষাক্ত করে তোলার ষড়যন্ত্র চলছিল, সেহেতু এ আয়াতে ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আত্মিক শক্তি অর্জন করে সে সব আঘাতের মোকাবেলা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! (মানসিক আঘাত ও দুশ্চিন্তার বোঝা হালকা করার লক্ষ্যে) ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা (সর্ব বিষয়েই) ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন, বিশেষত নামাযীগণের সাথে তো তিনি অবশ্যই থাকেন। কেননা নামায হলো সর্বোত্তম ইবাদত। ধৈর্যধারণের ফলেই যদি আল্লাহ্ তা'আলা সঙ্গী হন, তবে নামাযের মধ্যে তো এ সুসংবাদ আরো প্রবলতর হওয়াই স্বাভাবিক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধৈর্য ও নামায যাবতীয় সংকটের প্রতিকার ঃ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

"ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর"—এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকটের নিশ্চিত প্রতিকার দু'টি বিষয়ের মধ্যে নিহিত। একটি 'সবর' বা ধৈর্য এবং অন্যটি 'নামায'। বর্ণনা-রীতির মধ্যে اسْتَعِينُوا শব্দটিকে বিশেষ কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার ফলে এখানে যে মর্মার্থ দাঁড়ায়, তার মর্ম হচ্ছে এই যে, মানব জাতির যে কোন সংকট বা সমস্যার নিশ্চিত প্রতিকার হচ্ছে ধৈর্য ও নামায। যে কোন প্রয়োজনেই এ দু'টি বিষয়ের দ্বারা মানুষ সাহায্য লাভ করতে পারে। তফসীরে মাযহারীতে শব্দ দু'টির ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের তাৎপর্য এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত স্বতন্ত্রভাবে দু'টি বিষয়েরই তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে।

সবর-এর তাৎপর্য ঃ 'সবর' শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযম অবলম্বন ও নফস-এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা।

কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'সবর'-এর তিনটি শাখা রয়েছে ঃ (ক) নফসকে হারাম ও না-জায়েয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা, (দুই) ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং (তিন) যে কোন বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা অর্থাৎ যে সব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহ্‌র বিধান বলে মেনে নেওয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কোন কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায় কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করা হয়, তবে তা 'সবর'-এর পরিপন্থী হবে না--(ইবনে কাসীর, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে)

'সবর'-এর উপরিউক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় তিনটি কর্তব্য। সাধারণ মানুষের ধারণায় সাধারণত তৃতীয় শাখাকেই সবর হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রথম দু'টি শাখা যে প্রক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। এমনকি এ দু'টি বিষয়ও যে 'সবর'-এর অন্তর্ভুক্ত এ ধারণাও যেন অনেকের নেই।

কোরআন-হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্য ধারণকারী বা 'সবর' সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরিউক্ত তিন প্রকারেই 'সবর' অবলম্বন করে থাকেন। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, "ধৈর্য ধারণকারীরা কোথায় ?" এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেসব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা তিন প্রকারেই সবর করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। এসব লোককে প্রথমেই বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। 'ইবনে-কাসীর' এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন যে, কোরআনের অন্যত্র ঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ۔

অর্থাৎ—'সবরকারী বান্দাগণকে তাদের পুরস্কার বিনা হিসাবে প্রদান করা হবে।' এ আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

নামায ঃ মানুষের যাবতীয় সমস্যা ও সংকট দূর করা এবং যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে কোরআন-উল্লিখিত দ্বিতীয় পন্থাটি হচ্ছে নামায।

'সবর'-এর তফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার ইবাদতই সবরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এরপরও নামাযকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যে, নামায এমনই একটি ইবাদত, যাতে 'সবর' তথা ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা বিদ্যমান। কেননা নামাযের মধ্যে একাধারে যেমন নফ্স তথা রিপুকে আনুগত্যে বাধ্য রাখা হয়, তেমনি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ, নিষিদ্ধ চিন্তা, এমনকি অনেক হালাল ও মোবাহ বিষয় থেকেও সরিয়ে রাখা হয়। সেমতে নিজের 'নফ্স'-এর উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে সর্বপ্রকার গোনাহ ও অশোভন আচার-আচরণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নিজেকে আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে 'সবর'-এর যে অনুশীলন করতে হয়, নামাযের মধ্যেই তার একটা পরিপূর্ণ নমুনা ফুটে উঠে।

যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভ করার ব্যাপারে নামাযের একটা বিশেষ 'তাছীর' বা প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ বিশেষ রোগে কোন কোন ওষধী গুল্ম-লতা ও ডাল-শিকড় গলায় ধারণ করায় বা মুখে রাখায় যেমন বিশেষ ফল লক্ষ্য করা যায়, লোহার প্রতি চুম্বকের বিশেষ আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক, কিন্তু কেন এরূপ হয়, তা যেমন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না, তেমনি বিপদ-মুক্তি এবং যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে নামাযের তাছীরও ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যথাযথ আন্তরিকতা ও মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করলে যেমন বিপদমুক্তি অবধারিত, তেমনি যে কোন প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারেও এতে সুনিশ্চিত ফল লাভ হয়।

হুযূর (সা)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, যখনই তিনি কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখনই তিনি নামায আরম্ভ করতেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা সে নামাযের বরকতেই তাঁর যাবতীয় বিপদ দূর করে দিতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে--

اذا حزبه امر فزع الى الصلوة

অর্থাৎ—মহানবী (সা)-কে যখনই কোন বিষয় চিন্তিত করে তুলত, তখনই তিনি নামায পড়তে শুরু করতেন।

আল্লাহর সান্নিধ্য ঃ নামায ও 'সবর'-এর মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের প্রতিকার হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ দু' পন্থায়ই আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভ হয়।

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ٠

বাক্যের দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, নামাযী এবং সবরকারিগণের সাথে আল্লাহ্র সান্নিধ্য তথা তাঁর শক্তির সমাবেশ ঘটে। যেখানে বা যে অবস্থায় বান্দার সাথে আল্লাহ্র শক্তির সমাবেশ ঘটে, সেখানে দুনিয়ার কোন শক্তি কিংবা কোন সংকটই যে টিকতে পারে না, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না। বান্দা যখন আল্লাহ্র শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার অগ্রগমন ব্যাহত করার মত শক্তি কারও থাকে না। বলা বাহুল্য,

মকসুদ হাসিল করা এবং সংকট উত্তরণের নিশ্চিত উপায় একমাত্র আল্লাহ্‌র শক্তিতে শক্তিমান হওয়াই হতে পারে।

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

(১৫৪) আর যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা' বোঝ না। (১৫৫) এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের--(১৫৬) যখন তারা বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। (১৫৭) তারা সে সব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে একটা বিশেষ প্রতিকূল অবস্থায় সবর করার তালীম এবং ধৈর্য ধারণকারীদের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছিল। এ আয়াতে অনুরূপ আরো কতিপয় অসুবিধাজনক অবস্থার বিবরণ দিয়ে সেসব অবস্থাতেও সবর করার উৎসাহ দান এবং সে পরিস্থিতিতেও সবর করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। সে অবস্থাগুলোর মধ্যে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহের বিষয়টি সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হচ্ছে এ কারণে যে, পরীক্ষার এ অবস্থাটাই সর্বাপেক্ষা বেশি বিপজ্জনক ও গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যারা এ অবস্থার মোকাবেলা করতে পারবে, তারা স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও হালকা বিপদে ধৈর্যধারণ করতে সমর্থ হবে। দ্বিতীয়ত যারা মুসলমানদের সাথে কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে বিতর্কের অবতারণা করছিল, এ বিপদ তাদের মোকাবেলাতেই যেহেতু দেখা দেবে, সেহেতু এটি সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যেসব লোক আল্লাহ্‌র পথে (অর্থাৎ দীনের জন্য) নিহত হয় (তাদের ফযীলত এমন যে,) তাদের মৃত বলো না। বরং এসব লোক (একটা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ জীবনের সাথে) জীবিত, কিন্তু তোমরা (তোমাদের বর্তমান অনুভূতিতে সে জীবন সম্পর্কে) অনুভব করতে পার না। এবং আমি (আল্লাহর প্রতি তোমাদের সন্তুষ্টি এবং আত্মসমর্পণের গুণ সম্পর্কে যা ঈমানেরই

লক্ষণ) তোমাদের পরীক্ষা গ্রহণ করব, কিছুটা ভয়ে নিপতিত করে (যা তোমাদের শত্রুদের সংখ্যাধিক্য অথবা উপর্যুপরি আপদ-বিপদের মাধ্যমে) এবং কিছুটা (দারিদ্র্য ও) ক্ষুধায় নিপতিত করে (কিছুটা) জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে (যথা ঃ পশুমড়ক, মানুষের মৃত্যু, রোগজরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফল-ফসলের ক্ষতি সাধন করে। এমতাবস্থায়) তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর। (যারা এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং অটল থাকে,) আপনি সে সব সবরকারীকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন (যাদের রীতি হচ্ছে যে,) তাদের উপর যখন কোন বিপদ আসে, তখন তারা (অন্তরে অনুভব করে এরূপ) বলে যে, আমরা (আমাদের ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততিসহ প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ্ তা'আলারই মালিকানাধীন। (প্রকৃত মালিকের তো তাঁর সম্পদে যে কোন হস্তক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে, এতে মালিকানাধীনদের পক্ষে উদ্বিগ্ন হওয়া অর্থহীন।) এবং আমরা সবাই (এ দুনিয়া থেকে) আল্লাহ্র নিকটই ফিরে যাবো (এখানকার ক্ষতির বদলা সেখানে গিয়ে অবশ্যই আমরা পাবো)। বস্তুত সুসংবাদের যে কথা তাদের শোনানো হবে, তা হচ্ছে এই যে, এসব লোকের প্রতি (স্বতন্ত্রভাবে) তাদের পরওয়ারদিগারের তরফ থেকে বিশেষ রহমত (প্রদত্ত) হবে এবং সবার প্রতিই (সমষ্টিগতভাবে) ব্যাপক রহমত হবে। আর এসব লোকই তারা, যারা (প্রকৃত অবস্থায়) হেদায়েতের (যথার্থ মর্যাদার) স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলাই যে প্রকৃত মালিক এবং সমস্ত ক্ষতি পূরণ করার অধিকারী-একথা তারা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলমে-বরযখে নবী এবং শহীদগণের হায়াত ঃ ইসলামী রেওয়ায়েত মোতাবেক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি আলমে-বরযখে বিশেষ ধরনের এক হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের আযাব বা সওয়াব অনুভব করে থাকে—একথা সবাই জানেন। এই জীবন প্রাপ্তির ব্যাপারে মু'মিন, কাফির এবং পুণ্যবান ও গোনাহগারের কোন পার্থক্য নেই। তবে বরযখের এ জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক স্তরে সর্বশ্রেণীর লোকই সমানভাবে শরীক। কিন্তু বিশেষ এক স্তর নবী-রাসূল এবং বিশেষ নেককার বান্দাদের জন্য নির্ধারিত। এ স্তরেও অবশ্য বিশেষ পার্থক্য এবং পরস্পরের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে আলিমগণ বিস্তর আলোচনা করেছেন। তবে এ ব্যাপারে কোরআন ও সুন্নাহর তথ্যের সাথে সর্বাপেক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছেন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)। সুতরাং তাঁর রচিত বয়ানুল-কোরআনের আলোচনাটুকু উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট বলে মনে করছি।

ফায়দা ঃ যেসব লোক আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হন তাঁদেরকে শহীদ বলা হয়। সাধারণভাবে অবশ্য তাঁদের মৃত বলাও জায়েয। তবে তাঁদের মৃত্যুকে অন্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীবন লাভ করে থাকে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনে অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়। তা হলো অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য মৃতের তুলনায় তাঁদের বেশি অনুভূতি দেওয়া হয়। যেমন, মানুষের পায়ের গোঁড়ালি ও হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ—উভয় স্থানেই অনুভূতি থাকে; কিন্তু গোঁড়ালির তুলনায়

আঙ্গুলের অনুভূতি অনেক বেশি তীব্র, তেমনি সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদগণ বরযখের জীবনে বহু গুণ বেশি অনুভূতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এমন কি শহীদের এ জীবনানুভূতি অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জড়দেহেও এসে পৌঁছিয়ে থাকে। অনেক সময় তাঁদের হাড়-মাংসের দেহ পর্যন্ত মাটিতে বিনষ্ট হয় না, জীবিত মানুষের দেহের মতই অবিকৃত থাকতে দেখা যায়। হাদীসের বর্ণনা এবং বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হয়েছে এবং সাধারণ মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে সাধারণ নিয়মে তাঁদেরকেও মৃতই ধরা হয় এবং তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিসগণের মধ্যে বন্টিত হয় এবং তাঁদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুনর্বিবাহ করতে পারে।

এ আয়াতের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণ শহীদগণের চাইতেও অনেক বেশি মর্তবার অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁদের পবিত্র দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকার পরও বাহ্যিক হুকুম-আহকামে তার কিছু প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। যথা—যাদের পরিত্যক্ত কোন সম্পদ বন্টন করার রীতি নেই, তাদের স্ত্রীগণ দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারেন না।

মোটকথা, বরযখের এ জীবনে সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হচ্ছেন নবী-রসূলগণ, অতঃপর শহীদগণ এবং তারপর অন্যান্য সাধারণ মৃত ব্যক্তি। অবশ্য কোন কোন হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, ওলী-আউলিয়া এবং নেককার বান্দাগণের অনেকেই বরযখের হায়াতের ক্ষেত্রে শহীদগণের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। কেননা আত্মশুদ্ধির সাধনায় রত অবস্থায় যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের মৃত্যুকেও শহীদের মৃত্যু বলা যায়। ফলে তাঁরাও শহীদগণেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যান। আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী নিঃসন্দেহে অন্যান্য নেককার সালেহগণের তুলনায় শহীদগণের মর্যাদা বেশি, তবে নেককারগণও শহীদের পর্যায়ভুক্ত হতে পারেন।

যদি কোন শহীদের লাশ মাটিতে বিনষ্ট হতে দেখা যায়, তাহলে এমন ধারণা করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্র পথে সে নিহত হয়েছে সত্য, তবে হয়তো তার নিয়ত বিশুদ্ধ না থাকায় তার সে মৃত্যু যথার্থ শহীদের মৃত্যু হয়নি। কিন্তু এমন কোন শহীদের লাশ যদি মাটির নিচে বিনষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, আল্লাহ্র পথে শহীদ হওয়ার ব্যাপারে যার নিষ্ঠায় কোন সন্দেহ নেই, তবে সেক্ষেত্রে অবশ্য এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, তিনি শহীদ নন অথবা কোরআনের আয়াতের মর্মার্থ এখানে টিকছে না। কেননা মানুষের লাশ যে কেবল মাটিতেই বিনষ্ট হয় তাই নয়। অনেক সময় ভূনিম্নস্থ অন্যান্য ধাতু কিংবা অন্য কোন কিছুর প্রভাবেও জড়দেহ বিনষ্ট হওয়া সম্ভব। নবী-রসূল ও শহীদগণের লাশ মাটিতে ভক্ষণ করে না বলে হাদীসে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে একথা বোঝা যায় না যে, মাটি ছাড়া তাদের লাশ অন্য কোন ধাতু কিংবা খনিজ পদার্থের প্রভাবেও বিনষ্ট হতে পারে না।

নবী-রাসূলগণের পবিত্র দেহও যে সাধারণ মানব-দেহের মত বিভিন্ন উপকরণের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁদের দেহও অস্ত্রের আঘাত কিংবা ওষুধের প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবান্বিত হয়েছে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, নবী-রসূলগণের মৃত্যু-পূর্ববর্তী জীবনের তুলনায় শহীদগণের মৃত্যু-পূর্ববর্তী জীবন বেশি শক্তিসম্পন্ন হতে পারে না। নবী-রসূলগণের জীবিত দেহে অস্ত্র এবং অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার

নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং মাটির সাথে মিশ্রিত অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ কিংবা অন্য কোন উপাদানের প্রভাবে যদি শহীদের লাশে কোন প্রকার বিকৃতি ঘটে যায়, তবে এর দ্বারা 'মাটি শহীদের লাশে বিকৃতি ঘটাতে পারে না'—এ হাদীসের যথার্থতা বিঘ্নিত হয় না।

সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদের লাশ অধিককাল পর্যন্ত মাটির দ্বারা প্রভাবান্বিত না হওয়াকে তাঁদের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দু'অবস্থাতেই হতে পারে। প্রথমত, চিরকাল জড়দেহ অবিকৃত থাকার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত, অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি দিন অবিকৃত থাকার মাধ্যমে। যদি বলা হয় যে, তাঁদের দেহও সাধারণ লোকের দেহের তুলনায় আশ্চর্যজনকভাবে বেশি দিন অবিকৃত থাকে এবং হাদীসের দ্বারা এ কথাই বোঝানো হয়েছে, তবে তাও অবাস্তব হবে না। যেহেতু বরযখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না, সেহেতু কোরআনে শহীদের সে জীবন সম্পর্কে لَا تَشْعُرُوْنَ (তোমরা বুঝতে পার না,) বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো এই যে, সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মত অনুভূতি তোমাদের দেওয়া হয়নি।

বিপদে ধৈর্যধারণ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে বান্দাদের যে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার তাৎপর্য কোরআন وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ আয়াতের তফসীরে বর্ণিত হয়েছে। কোন বিপদে পতিত হওয়ার আগেই যদি সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে বিপদে ধৈর্য ধারণ সহজতর হয়ে যায়। কেননা, হঠাৎ করে বিপদ এসে পড়লে পেরেশানী অনেক বেশি হয়। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করেই পরীক্ষার কথা বলেছেন, সেহেতু সবার পক্ষেই অনুধাবন করা উচিত যে, এ দুনিয়া দুঃখ-কষ্ট সহ্য করারই স্থান। সুতরাং এখানে যেসব সম্ভাব্য বিপদ-আপদের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে না করলেই ধৈর্যধারণ করা সহজ হতে পারে। এ উম্মত পরীক্ষায় সমগ্র উম্মত সমষ্টিগতভাবে উত্তীর্ণ হলে পর সমষ্টিগতভাবেই তার পুরস্কার দেওয়া হবে ; এ ছাড়াও সবরের পরীক্ষায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা যতটুকু উত্তীর্ণ হবেন, তাদের ঠিক ততটুকু বিশেষ মর্যাদাও প্রদান করা হবে।

বিপদে 'ইন্নালিল্লাহ্' পাঠ করা ঃ আয়াতে সবরকারিগণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা বিপদের সম্মুখীন হলে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, কেউ বিপদে পড়লে যেন এ দোয়াটি পাঠ করে। কেননা, এরূপ বলাতে একাধারে যেমন অসীম সওয়াব পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি যদি অর্থের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে পাঠ করা হয়, তবে বিপদে আন্তরিক শান্তিলাভ এবং তা থেকে উত্তরণও সহজতর হয়ে যায়।

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٨﴾

(১৫৮) নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বাঘরে হজ্জ বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দু'টিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সেই আমলের সঠিক মূল্য দেবেন।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর মধ্যে وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهٖمَ শুরু করে সুদীর্ঘ আলোচনায় কা'বার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গাদি সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এর প্রথমে ছিল কা'বা শরীফ ইবাদতের স্থান হওয়া সংক্রান্ত আলোচনা এবং পরে ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া সম্পর্কিত বিবরণ। সে দোয়ার মাঝেই হযরত ইবরাহীম (আ) 'মানাসেক'-এর নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়ার জন্য নিবেদন করেছিলেন। আর এই 'মানাসেক'-এর মধ্যে হজ্জ এবং ওমরাহ্ও অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী আলোচনায় বায়তুল্লাহ্কে কেবলায় পরিণত করে একদিক থেকে ইবাদতের বিশেষ স্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তেমনি হজ্জ ও ওমরাহ্র কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করে এর গুরুত্বকে আরো সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতেও বায়তুল্লায় হজ্জ এবং ওমরাহ্ পালন সম্পর্কিত অপর একটি প্রসঙ্গে—'সাফা' ও 'মারওয়ায়' প্রদক্ষিণের বিষয় আলোচিত হয়েছে।

'সাফা' এবং 'মারওয়া' বায়তুল্লাহ সন্নিহিত দু'টি পাহাড়ের নাম। হজ্জ কিংবা ওমরার সময় কা'বাঘর তওয়াফ করার পর এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে দৌড়াতে হয়। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় 'সায়ী'। জাহিলিয়ত যুগেও যেহেতু এ সায়ীর রীতি প্রচলিত ছিল এবং তখন এ দুটি পাহাড়ের মধ্যে কয়েকটি মূর্তি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। এজন্য মুসলমানদের কারো কারো মনে এরূপ একটা দ্বিধার ভাব জাগ্রত হয়েছিল যে, বোধ হয় এ 'সায়ী' জাহিলিয়ত যুগের কোন অনুষ্ঠান এবং ইসলাম যুগে এর অনুসরণ করা হয়তো গোনাহ্র কাজ।

কোন কোন লোক যেহেতু জাহিলিয়ত যুগে একে একটা অর্থহীন কুসংস্কার বলে মনে করতেন, সেজন্য ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁরা একে জাহিলিয়ত যুগের কুসংস্কার হিসাবেই গণ্য করতে থাকেন। এরূপ সন্দেহের নিরসনকল্পে আল্লাহ্ পাক যেভাবে বায়তুল্লাহ শরীফের কেবলা হওয়া সম্পর্কিত সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছেন, তেমনিভাবে পরবর্তী আয়াতে বায়তুল্লাহ সংশ্লিষ্ট আরো একটি সংশয়ের অপনোদন করে দিয়েছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার সায়ী'র ব্যাপারে কোন দ্বিধা-সংশয় অন্তরে স্থান দিও না), নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া (এবং এতদুভয়ের মাঝে 'সায়ী' করা দীনেরই একটা স্মরণীয় ঘটনা'ও) আল্লাহ্র নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত (এবং দীনের ঐতিহ্য। সুতরাং) যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্তে হজ্জ কিংবা ওমরাহ্ পালন করে তার উপর মোটেও গোনাহ হবে না (যেমন, তোমাদের মনে সংশয়ের উদ্রেক হয়েছে) এ দু'য়ের মধ্যে সায়ী করাতে (তার চিরাচরিত পন্থা অনুসারে, এতে গোনাহ্ তো নয়ই; বরং সওয়াব হবে। কারণ, সায়ী শরীয়তের দৃষ্টিতেও একটা সৎকর্ম।) এবং (আমার নিয়ম হচ্ছে--) কোন ব্যক্তি যদি সানন্দচিত্তে কোন সৎকর্ম সম্পাদন করে, তবে আল্লাহ্

তা'আলা তার (অত্যন্ত) কদর করে থাকেন। (এবং সেই সৎকর্ম সম্পাদনকারীর নিয়ত ও আন্তরিক নিষ্ঠা সম্পর্কে) খুব ভালভাবেই জানেন (সুতরাং এ নিয়মেই যারা সায়ী করে তাদের নিয়ত এবং ইখলাসের অনুরূপ সওয়াব বা প্রতিদান দেওয়া হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ شَعَائِرُ اللّٰهِ এখানে شَعَائِرُ শব্দটি شَعِيْرَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন বা নিদর্শন। شَعَائِرُ اللّٰهِ -বলতে সেসব আমলকে বোঝায়, যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা দীনের নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

حج-এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য স্থির করা। কোরআন-সুন্নাহর পরিভাষায় বায়তুল্লাহ শরীফের উদ্দেশ্যে গমন এবং সেখানে বিশেষ সময়ে বিশেষ ধরনের কয়েক প্রকার আমল সম্পাদন করাকে বলা হয় হজ্জ।

عمره -শব্দের আভিধানিক অর্থ দর্শন করা। শরীয়তরে পরিভাষায় বায়তুল্লাহ শরীফে হাযির হয়ে তওয়াফ-সায়ী প্রভৃতি বিশেষ ধরনের কয়েকটি ইবাদত সম্পাদন করার নামই ওমরাহ্।

'সায়ী' ওয়াজিব ঃ হজ্জ, ওমরাহ্ এবং সায়ীর বিস্তারিত বিবরণ ফিক্হর কিতাবসমূহে আলোচিত হয়েছে।

'সায়ী' করা ইমাম আহমদ (র)-এর মতে সুন্নত, ইমাম মালিক (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে ফরয, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ওয়াজিব। যদি কোন কারণে তা ছুটে যায়, তবে একটা ছাগল জবাই করে কাফ্ফারা দিতে হবে।

উপরোক্ত আয়াতের শব্দবিন্যাস থেকে এরূপ ধারণা ঠিক হবে না যে, আয়াতে তো 'সাফা এবং 'মারওয়ার' মধ্যে সায়ী করাতে গোনাহ্ হবে না' বলা হয়েছে। এর দ্বারা বড়জোর এটা একটা মোস্তাহাব কাজ বলে সাব্যস্ত হতে পারে, ওয়াজিব হওয়ার কারণ কি ?

এখানে বোঝা দরকার যে, لَا جُنَاحَ (অর্থাৎ, গোনাহ হবে না) কথাটা প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বলা হয়েছে। কেননা, প্রশ্ন ছিল, যেহেতু সাফা ও মারওয়াতে মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল এবং জাহিলিয়ত যুগের লোকেরা সায়ীর মাধ্যমে সে মূর্তিরই পূজা-অর্চনা করতো, সেহেতু এ কাজটি হারাম হওয়া উচিত। এরূপ প্রশ্নের জবাবেই বলা হয়েছে যে, এতে কোন গোনাহ নেই। আর যেহেতু এটা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রবর্তিত সুন্নত, কাজেই কারো কোন বর্বরসুলভ আমল দ্বারা এটা গোনাহ্র কাজ বলে সাব্যস্ত হতে পারে না। প্রশ্নের জবাবে এরূপ বলাতে এ আমলটি ওয়াজিব হওয়ারও পরিপন্থী বোঝা যায় না।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي

الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ

أَجْمَعِيْنَ ﴿١٦١﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿١٦٢﴾

(১৫৯) নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য; কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারিগণেরও। (১৬০) তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে ও মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমিই তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (১৬১) নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণের এবং সমগ্র মানুষের লা'নত। (১৬২) এরা চিরকাল এ লা'নতের মাঝেই থাকবে। তাদের উপর থেকে আযাব কখনও হালকা করা হবে না এবং এরা বিরামও পাবে না।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে কেবলার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে যার কারণে বায়তুল্লাহ্ শরীফকে কেবলা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, তার সম্পর্কে আহলে-কিতাবদের সত্য গোপন করার কথা আলোচিত হয়েছিল। এখানে اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ থেকে لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ পর্যন্ত সে প্রসঙ্গটিরই পরিপূরক হিসাবে সত্য গোপনকারী এবং এ ব্যাপারে যারা বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিচ্ছে, তাদের শাস্তি ও তওবা করলে তা ক্ষমা করার ওয়াদার বিষয় বর্ণিত হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যেসব লোক সে সমস্ত তথ্য গোপন করে, যা আমি নাযিল করেছি (এবং) যেগুলো (নিজে নিজেই) অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং (অন্যদের জন্যও) পথপ্রদর্শক (এবং এ গোপন করাও এমন অবস্থায়) যখন আমি (এ সব তথ্য) কিতাবে (তওরাত ও ইঞ্জীলে নাযিল করে) সাধারণ লোকদের জন্য প্রকাশ করে দিয়েছে, এ সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অভিসম্পাত করেন (খাস রহমত থেকে তাদের বঞ্চিত করে দেন) এবং (অন্যান্য অনেক) অভিসম্পাতকারীও (যারা এরূপে ঘৃণ্য কাজ অপছন্দ করে) তাদের প্রতি অভিশাপ প্রেরণ করে (তাদের প্রতি বদ-দোয়া করে।) কিন্তু (এসব গোপনকারীদের মধ্য থেকে) যেসব লোক (তাদের সে সমস্ত ঘৃণ্য কাজ থেকে) তওবা করে (আল্লাহ্‌র সামনে অতীতের সেসব ক্রিয়া-কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে) এবং যা কিছু করেছে (এবং তাদের সে দুষ্কর্মের দ্বারা যে সব অনাচার হয়ে গেছে, পরবর্তী সময়ের জন্য সে সবের) সংশোধন করে (সে সংশোধনের পন্থা হচ্ছে গোপন করা সেসব তথ্য) প্রকাশ করে দেয় (যেন সবাই তা জানতে পারে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার

দায়িত্ব অবশিষ্ট না থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ প্রকাশ করা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। কেননা, ইসলাম কবুল না করা পর্যন্ত সর্বসাধারণের নিকট প্রকৃত সত্য গোপনই থেকে যাবে। তারা মনে করবে যে, যদি মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত সত্যই হতো, তবে এসব আহ্‌লে-কিতাব, (যারা তাদের কিতাবসমূহে তাঁর আবির্ভাবের সুসংবাদ পাঠ করেছে, তারা) অবশ্যই ইসলাম কবূল করত। (মোটকথা, যে পর্যন্ত তারা মুসলমান না হয়, সে পর্যন্ত তওবা কবূল হবে না) তবে এসব লোকের প্রতি আমি (অনুগ্রহ করে) মনোযোগ প্রদান করি (এবং তাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেই)। আমার নিয়মই হচ্ছে তওবা কবূল করা ও অনুগ্রহ করা। (তবে সত্যিকার অর্থে তওবাকারী হওয়া চাই)। অবশ্য (এদের মধ্য থেকে) যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করবে না এবং ইসলাম গ্রহণ না করা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করবে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানুষের লা'নত (এমনভাবে বর্ষিত হবে যে) ওরা চিরকালই এতে (অভিশাপে পতিত) থাকবে। (মোটকথা, এরা চিরকালের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যারা চির-জাহান্নামী তারা সব সময়ের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে। চিরঅভিশপ্ত থাকার অর্থই তা-ই। উপরন্তু জাহান্নামে প্রবেশ করার পর কোন সময়ই) তাদের উপর থেকে (জাহান্নামের) আযাব হালকা হবে না এবং (প্রবেশ করার আগেও) তাদেরকে সামান্য সময়ের জন্যও বিরাম দেওয়া হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইলমে-দীনের প্রকাশ ও প্রচার করা ওয়াজিব এবং গোপন করা হারাম ঃ উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র যে সমস্ত প্রকৃষ্ট হেদায়েত অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে গোপন করা এত কঠিন হারাম ও মহাপাপ, যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও লা'নত বা অভিসম্পাত করে থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও অভিসম্পাত করে। এতে কয়েকটি বিষয় জানা যায় ঃ প্রথমত, যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বিশেষ জরুরী, তা গোপন করা হারাম। রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من النار .

—"যে লোক দীনের কোন বিধানের ইল্‌ম জানা সত্ত্বেও তা জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।" —হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা ও আমর ইবনে আস (রা) থেকে ইবনে মাজাহ রেওয়ায়েত করেছেন।

ফিক্‌হবিদগণ বলেছেন, এ অভিসম্পাত আরোপিত হবে তখনই, যখন অন্য কোন লোক সেখানে উপস্থিত থাকবে না। যদি অন্যান্য আলিম লোকও সেখানে উপস্থিত থাকেন, তবে একথা বলে দেওয়া যেতে পারে যে, অন্য কোন আলিমকে জিজ্ঞেস করে নাও (কুরতুবী, জাস্‌সাস)

দ্বিতীয়ত, এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন বিষয়ে যার যথাযথ ও বিশুদ্ধ জ্ঞান নেই, তার পক্ষে মাসআলা-মাসায়েল ও হুকুম-আহ্‌কাম বলার দুঃসাহস করা উচিত নয়। তৃতীয়ত, জানা যায় যে 'জ্ঞানকে গোপন করার' অভিসম্পাত সে সমস্ত জ্ঞান ও মাসআলা গোপন করার ব্যাপারেই

প্রযোজ্য, যা কোরআন ও সুন্নাহ্য় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা কর্তব্য। পক্ষান্তরে এমন সূক্ষ্ম ও জটিল মাসআলা সাধারণ্যে প্রকাশ না করাই উত্তম, যদ্দ্বারা সাধারণ লোকদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। তখন তা كتمان علم বা জ্ঞানকে গোপন করার হুকুমের আওতায় পড়বে না। উল্লিখিত আয়াতে مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى বাক্যের দ্বারাও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তেমনিভাবে মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, তোমরা যদি সাধারণ মানুষকে এমন সব হাদীস শোনাও যা তারা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবে তাদেরকে ফেতনা-ফাসাদেরই সম্মুখীন করবে। (কুরতুবী)

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আলী (রা) থেকে উদ্ধৃত রয়েছে। তিনি বলেছেন যে, "সাধারণ মানুষের সামনে ইলমের শুধুমাত্র ততটুকু প্রকাশই করবে, যতটুকু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বরদাশত করতে পারে। মানুষ আল্লাহ্ ও রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক; তোমরা কি এমন কামনা কর? কারণ, যে কথা তাদের বোধগম্য নয়, তাতে তাদের মনে নানারকম সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবে এবং তাতে করে তারা আল্লাহ্ ও রসূলকে অস্বীকারও করে বসতে পারে।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, যাদের উদ্দেশ্যে কোন বক্তব্য উপস্থাপন করা হবে, তাদের অবস্থার অনুপাতে কথা বলাও আলেমের একটি অন্যতম দায়িত্ব। যাদের পক্ষে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ার আশংকা রয়েছে, তাদের সামনে এমন মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করবে না। সে জন্যই বিজ্ঞ ফিক্হবিদগণ বহু বিষয় বর্ণনাশেষে লিখে থাকেন هٰذَا مِمَّا يُعْرَفُ وَلَا يُعَرَّفُ অর্থাৎ—'এ বিষয়টি এমন যা আলেমগণ জেনে নেবেন, কিন্তু সাধারণ্যে প্রচার করবেন না। অর্থাৎ তা উচিত হবে না।

এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

لاتمنعوا اهلها فتظلموهم ولاتضعوها فى غير اهلها فتظلموها

অর্থাৎ—নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয়সমূহ এমন লোকদের কাছে গোপন করবে না, যারা তার পূর্ণ যোগ্য। যদি তোমরা এমন কর, তাহলে তা মানুষের উপর জুলুম হবে। পক্ষান্তরে যারা যোগ্য নয়, তাদের সামনে হেকমত বা সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করবে না। কারণ, এটাই হবে সে বিষয়ের উপর জুলুম।

ইমাম কুরতুবী বলেন, এই বিশ্লেষণে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, কোন কাফির যদি মুসলমানের বিরুদ্ধে তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হয় কিংবা কোন বিদ'আতপন্থী যদি মানুষকে নিজের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার প্রতি আমন্ত্রণ জানায়, তবে তাদেরকে দীনের ইল্ম শেখানো ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয়, যতক্ষণ না স্থির বিশ্বাস হয়ে যায় যে, ইল্ম শিক্ষা করার পর তাদের ধ্যান-ধারণা বিশুদ্ধ হবে।

তেমনিভাবে কোন বাদশাহ কিংবা শাসককে এমন বিষয়াদি বাতলে দেওয়া জায়েয নয়, যেগুলোর মাধ্যমে সে প্রজা-সাধারণের উপর উৎপীড়নের পন্থা উদ্ভাবন করতে পারে। তেমনিভাবে সাধারণ লোকদের সামনে ধর্মীয় বিধি-বিধানের 'হিলা' বা বিকল্প পন্থাসমূহের দিকগুলো বিনা কারণে বর্ণনা করাও বাঞ্ছনীয় নয়! কারণ, তাতে মানুষ দীনী হুকুম-আহ্কামের ব্যাপারে নানা রকম ছল-ছুঁতার অন্বেষণে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। (কুরতুবী)

রসূলে করীম (সা)-এর হাদীসও কোরআনের হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, 'যদি কোরআনের 'আয়াত' না থাকত, তবে আমি তোমাদের কাছে কোন হাদীস বর্ণনা করতাম না।' এখানে আয়াত বলতে সে সমস্ত আয়াতকে বোঝানো হয়েছে, যাতে ইল্‌ম গোপন করার ব্যাপারে কঠোর অভিসম্পাত করা হয়েছে। এমনিভাবে অন্যান্য সাহাবীর মধ্যেও অনেকে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে এমনি ধরনের কথা বলেছেন যে, ইল্‌ম গোপন করার ব্যাপারে যদি কোরআনের এ আয়াতটি না থাকত, তাহলে আমি এ হাদীস বর্ণনা করতাম না।

কাজেই এসব রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের নিকট রসূলে করীম (সা)-এর হাদীসও কোরআনের হুকুমেরই অনুরূপ ছিল। কারণ, আয়াতে গোপন করার ব্যাপারে সে সমস্ত লোকের প্রতিই অভিসম্পাত করা হয়েছে, যারা অবতীর্ণ সুস্পষ্ট ও প্রকৃষ্ট হেদায়েতসমূহ গোপন করবে। হাদীসে তার পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু সাহাবাগণ রসূলে করীম (সা)-এর হাদীসসমূহকেও কোরআনের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, তা গোপন করাকেও অভিসম্পাতযোগ্য বলে ধারণা করেছেন।

কোন্ কোন্ পাপের জন্য সমগ্র সৃষ্টি লা'নত করে ঃ

وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ আয়াতে কোরআনে-করীম লা'নত বা অভিসম্পাতকারীদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেনি, কারা লা'নত করে! তফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) বলেছেন, এভাবে বিষয়টি অনির্ধারিত রাখাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের উপর অভিসম্পাত করে থাকে। এমনকি জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। কারণ, তাদের অপকর্মের দরুন সে সব সৃষ্টিরও ক্ষতি সাধিত হয়। হযরত বারা' ইবনে আযেব (রা) বর্ণিত এক হাদীসেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে রসূলে করীম (সা) বলেছেন, اَللّٰعِنُوْنَ-এর অর্থ হলো সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণশীল সমস্ত জীব। (কুরতুবী)

কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি লা'নত করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয়, যতক্ষণ না তার কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণের বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায় ঃ

وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ বাক্যাংশের দ্বারা জাস্‌সাস ও কুরতুবী প্রমুখ উদ্ভাবন করছেন যে, যে কাফির কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে বলে নিশ্চিত নয়, তার প্রতি লা'নত করা বৈধ নয়। আর আমাদের পক্ষে যেহেতু কারও শেষ পরিণতির (মৃত্যুর) নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোন উপায় নেই, সেহেতু কোন কাফিরের নাম নিয়ে, তার প্রতি লা'নত বা অভিসম্পাত করাও জায়েয নয়। বস্তুত রসূলে করীম (সা) যে সমস্ত কাফিরের নামোল্লেখ করে লা'নত করেছেন, কুফর অবস্থায় তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি অবহিত হয়েছিলেন। অবশ্য সাধারণ কাফির ও জালিমদের প্রতি অনির্দিষ্টভাবে লা'নত করা জায়েয।

এতে একথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, লা'নতের ব্যাপারটি যখন এতই কঠিন ও নাজুক যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোন কাফিরের প্রতিও লা'নত করা বৈধ নয়, তখন কোন মুসলমান কিংবা কোন জীব-জন্তুর উপর কেমন করে লা'নত করা যেতে পারে? পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ, বিশেষত আমাদের নারী সম্প্রদায় একান্ত গাফলতিতে পড়ে আছে।

তারা কথায় কথায় নিজেদের আপনজনদের প্রতিও অভিসম্পাত বাক্য ব্যবহার করতে থাকে এবং শুধু লা'নত বাক্য ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট হয় না ; বরং তার সমার্থক যে সমস্ত শব্দ জানা থাকে সেগুলোও ব্যবহার করতে কসুর করে না। লা'নতের প্রকৃত অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। কাজেই কাউকে 'মরদুদ', 'আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত' প্রভৃতি শব্দে গালি দেওয়াও লা'নতেরই সমপর্যায়ভুক্ত।

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾

(১৬৩) আর তোমাদের উপাস্য, একই মাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা-করুণাময় দয়ালু কেউ নেই! (১৬৪) নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীবজন্তু। আর আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং মেঘমালায় যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে—নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।

যোগ্যসূত্র ঃ আরবের মুশরিকরা যখন নিজেদের বিশ্বাসের পরিপন্থী আয়াত وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ শুনল, তখন বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, সারা বিশ্বেরই কি একজন মাত্র উপাস্য হতে পারে? যদি এ দাবি যথার্থ হয়ে থাকে, তবে তার কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তারই প্রমাণ পেশ করেছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যে (সত্তা) তোমাদের সবার উপাস্য হওয়ার যোগ্য, তিনিই তো একমাত্র (ও প্রকৃত) উপাস্য। তাঁকে ছাড়া উপাসনার যোগ্য কেউ নেই। তিনিই মহান করুণাময় দয়ালু। (তাছাড়া আর কেউই এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ নেই। আর গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরাকাষ্ঠা ব্যতীত উপাস্য হওয়ার অধিকারও বাতিল হয়ে যায়। কাজেই, একমাত্র ও প্রকৃত উপাস্য আল্লাহ্ ব্যতীত আর

কেউ উপাসনার যোগ্য নয়)। নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে একের পর এক করে রাত-দিনের আগমনে এবং সাগর-সমুদ্রের বুকে (মানুষের জন্য কল্যাণকর বিষয় নিয়ে) জাহাজসমূহের চলাচল, মেঘের পানিতে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে বর্ষণ করে থাকেন এবং অতঃপর সে (পানির) দ্বারা যমীনকে উর্বর করেন, তার শুকিয়ে যাওয়ার পর (অর্থাৎ তাতে শস্যরাজি উৎপন্ন করেন) এবং (সে শস্যের দ্বারা) সর্বপ্রকার জীবকে এই (যমীনে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। (কারণ, জীব-জন্তুর জীবন ও বংশবৃদ্ধি এই খাদ্যশস্যের দৌলতে বাস্তবায়িত হয়) আর আবহাওয়ার (দিক ও অবস্থার) বিবর্তন (অর্থাৎ কখনও পুবাল কখনও পশ্চিমা) মেঘমালার অস্তিত্বে যা আসমান-যমীনের মাঝে বিদ্যমান থাকে, এ সমস্ত বিষয়েই (তওহীদ বা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের) প্রমাণ রয়েছে সে সমস্ত লোকের জন্য যারা (কোন বিষয় প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের) সুষ্ঠু বিবেকের অধিকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তওহীদের মর্মার্থ ঃ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ বিভিন্নভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদ বা একত্ববাদ সপ্রমাণিত রয়েছে। উদাহরণত তিনি একক, সমগ্র বিশ্বের বুকে তাঁর না কোন তুলনা আছে, না তাঁর কোন সমকক্ষ আছে। সুতরাং একক উপাস্য হওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।

দ্বিতীয়ত--উপাস্য হওয়ার অধিকারেও তিনি একক। অর্থাৎ তাঁকে ছাড়া অন্য আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়।

তৃতীয়ত--সত্তার দিক দিয়ে তিনি একক। অর্থাৎ অংশ-বিশিষ্ট নন। তিনি অংশ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র। তাঁর বিভক্তি কিংবা ব্যবচ্ছেদ হতে পারে না।

চতুর্থত--তিনি তাঁর আদি ও অনন্ত সত্তার দিক দিয়েও একক। তিনি তখনও বিদ্যমান ছিলেন, যখন অন্য কোন কিছুই ছিল না এবং তখনও বিদ্যমান থাকবেন, যখন কোন কিছুই থাকবে না। অতএব, তিনিই একমাত্র সত্তা যাঁকে واحد বা 'এক' বলা যেতে পারে। وَاحِدٌ শব্দটিতে উল্লিখিত যাবতীয় দিকের একত্বই বিদ্যমান রয়েছে। --(জাসৃসাস)

তারপর আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে, যা জ্ঞানী-নির্জ্ঞান নির্বিশেষে যে কেউই বুঝতে পারে। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের চিরাচরিত বিবর্তন তাঁরই ক্ষমতার পরিপূর্ণতার এবং একত্ববাদের প্রকৃত প্রমাণ। এসব বিষয়ের সৃষ্টি ও অবস্থিতিতে অপর কারও হাত নেই।

তেমনিভাবে পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ। পানিকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক তরল পদার্থ করে সৃষ্টি করেছেন যে, এমন তরল ও প্রবহমান হওয়া সত্ত্বেও তার পিঠের উপর লক্ষ লক্ষ মণ ওজনবিশিষ্ট বিশালকায় জাহাজ বিরাট ওজনের চাপ নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করে। তদুপরি এগুলোকে গতিশীল করে তোলার জন্য বাতাসের গতি ও নিতান্ত রহস্যপূর্ণভাবে সে গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভৃতি বিষয়ও এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পিছনে এক মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ সত্তা বিদ্যমান। পানীয় পদার্থগুলো তরল না হলে যেমন এ কাজটি সম্ভব হতো না, তেমনি বাতাসের মাঝে গতি সৃষ্টি না হলেও জাহাজ চলতে পারতো না; এগুলোর পক্ষে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করাও সম্ভব হতো না। এ বিষয়টিই কোরআনে হাকীম এভাবে উল্লেখ করেছে ঃ

اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ·

অর্থাৎ "আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে বাতাসের গতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন এবং তখন এ সমস্ত জাহাজ সাগরপৃষ্ঠে 'ঠাঁয়' দাঁড়িয়ে যাবে।"

بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এক দেশের মালামাল অন্য দেশে আমদানী-রফতানী করার মাঝেও মানুষের জন্য এত বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে, যা গণনাও করা যায় না। আর এ উপকারিতার ভিত্তিতেই যুগে যুগে, দেশে দেশে নতুন নতুন বাণিজ্য পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে।

এমনিভাবে আকাশ থেকে এভাবে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা, যাতে কোন কিছুর ক্ষতি সাধিত না হয়। যদি এ পানি প্লাবনের আকারে আসত, তাহলে কোন মানুষ, জীবজন্তু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই থাকত না। অতঃপর পানি বর্ষণের পর ভূ-পৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার ছিল না। যদি তাদেরকে বলা হতো, তোমাদের সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমত ছ'মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে রাখ, তাহলে তারা পৃথক পৃথকভাবে কি সে ব্যবস্থা করতে পারত ? আর কোনক্রমে রেখে দিলেও সেগুলোকে পচন কিংবা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে কেমন করে রক্ষা করত ? কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজেই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۭ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ·

অর্থাৎ—"আমি পানিকে ভূমিতে ধারণ করিয়েছি যদিও বৃষ্টির পানি পড়ার পর তাকে প্রবাহিত করেই নিঃশেষ করে দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল।"

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পানিকে বিশ্বাসী মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য কোথাও উন্মুক্ত খাদ-খন্দে সংরক্ষিত করেছেন, আবার কোথাও ভূমিতে বিস্তৃত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির ভেতরে পৌঁছে দিয়েছেন। তারপর এমন এক ফল্গুধারা সমগ্র যমীনে বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ যে কোন খানে খনন করে পানি বের করে নিতে পারে। আবার এই পানিরই একটা অংশকে জমাট বাঁধা সাগর বানিয়ে তুষার আকারে পাহাড়ের চূড়ায় চাপিয়ে দিয়েছেন যা পতিত কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একান্ত সংরক্ষিত। অথচ ধীরে ধীরে গলে প্রাকৃতিক ঝরনাধারার নহরের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সারকথা– উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার কয়েকটি বিকাশস্থলের বর্ণনার মাধ্যমে তওহীদ বা একত্ববাদ প্রমাণ করা হয়েছে। তফসীরকারক আলেমগণ এ সমস্ত বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। (জাস্সাস, কুরতুবী প্রভৃতি তফসীরগ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

যোগসূত্র ঃ উল্লিখিত আয়াতে তওহীদের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছিল। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্তি এবং তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

(১৬৫) আর কোন লোক এমনও রয়েছে, যারা অন্যান্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশি। আর কতই না উত্তম হত যদি এ জালিমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধু আল্লাহ্রই জন্য এবং আল্লাহ্র আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অনেক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্কে ছাড়াও তাঁর খোদায়িত্বে অন্যদের শরীক সাব্যস্ত করে (এবং তাদেরকে নিজের নিয়ন্তা মনে করে)। আর তাদের সাথেও তেমনিভাবে ভালবাসা পোষণ করে, যেমন ভালবাসা (শুধুমাত্র) আল্লাহ্র সাথেই (পোষণ করা) কর্তব্য। (এ তো গেল মুশরিকদের অবস্থা) আর যারা ঈমানদার (একমাত্র) আল্লাহ্র সাথেই রয়েছে,তাদের গভীর ভালবাসা এবং সে ভালবাসা ওদের ভালবাসার তুলনায় বহুগুণ বেশি। (কারণ, কোন মুশরিকের কাছে যদি একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আমার উপাস্যের পক্ষ থেকে আমার কোন ক্ষতি বা অকল্যাণ সাধিত হবে, তাহলে সাথে সাথেই তার সে ভালবাসা রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মু'মিনরা আল্লাহ্কেই কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু তথাপি তার ভালবাসা ও সন্তুষ্টিতে কোন পরিবর্তন দেখা দেয় না। এছাড়া অধিকাংশ মুশরিক কঠিন বিপদাপদের সময় নিজেদের কাল্পনিক উপাস্যদের পরিহার করে বসে। কিন্তু কোন মু'মিন কখনও কোন বিপদে আল্লাহ্কে পরিহার করে না। (আর পরীক্ষিতভাবেও এ ধরনের পরিস্থিতিতে এ অবস্থার সত্যতা প্রমাণিত)। আর কতইনা উত্তম হতো! যদি এই জালিমরা (অর্থাৎ মুশরিকরা এ পৃথিবীতেই) কোন কোন বিপদাপদ (ও তার ভয়াবহতা) দেখে (এবং সেগুলোর সংঘটনের বিষয়ে গভীরভাবে লক্ষ্য করে একথা) উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধু আল্লাহ্র হাতে। (আর অন্যান্য সবকিছুই তাঁর সামনে অক্ষম। কাজেই এ বিপদাপদকে না অপর কেউ বাধা দিতে পেরেছে, না দূর করতে পেরেছে, আর নাইবা এমন বিপদাপদের সময় অন্য কারো কথা স্মরণ থাকে)। আর তারা যদি এহেন কঠিন বিপদের বিষয় উপলব্ধি করে (একথা বুঝে নিত, তাহলে কতইনা উত্তম ছিল যে) আল্লাহ্ তা'আলার আযাব আখিরাতের বিচার দিনে আরও কঠিন হবে। (এভাবে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করলে তাদের সামনে স্বহস্তে নির্মিত উপাস্যদের অক্ষমতা এবং আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও মাহাত্ম্য প্রতিভাত হয়ে যেত এবং তাতে করে তারা ঈমান গ্রহণ করে নিত)।

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

(১৬৬) অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক (১৬৭) এবং অনুসারীরা বলবে, কতইনা ভাল হতো, যদি আমাদিগকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেওয়া হত। তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি। এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্য। অথচ, তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না।

যোগসূত্র ঃ উপরে আখিরাতের আযাবকে অতি কঠিন বলা হয়েছে। আর এখানে সেই কঠোরতার প্রকৃতি বর্ণনা করা হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আযাবের সেই কঠোরতা তখন অনুভূত হবে) যখন (মুশরিকদের) সে সমস্ত (প্রভাবশালী) লোকেরা সাধারণ লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে, যাদের কথামত সাধারণ লোকেরা চলত এবং (সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে) যখন সবাই আযাবের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে নেবে আর তাদের মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক ছিল, তাও ছিন্ন হয়ে যাবে (যেমনটি পৃথিবীতেও দেখা যায় যে, কোন অপরাধে সবাই সমানভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও মামলার বিচার ক্ষেত্রে সবাই পৃথক পৃথকভাবে আত্মরক্ষা করতে চায়। এমনকি একে অপরের সাথে পরিচিত বলেও অস্বীকার করে বসে)। আর (যখন এ সমস্ত অনুগামী লোকেরা নেতৃবর্গের এহেন বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠবে। কিন্তু তাতে আর কিছু না হলেও তারা উত্তেজিত হয়ে) বলতে আরম্ভ করবে, (কোনক্রমে) আমাদের (সবাইকে একটিবার) যদি পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে আমরাও তাদের থেকে (অন্তত এটুকু প্রতিশোধ তো অবশ্যই নিয়ে ছাড়ব যে, তারা যদি আবার আমাদেরকে তাদের আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করে, তবে আমরাও পরিষ্কার কাটা উত্তর দিয়ে) তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাব, যেমন করে তারা (এখন) আমাদের থেকে পরিষ্কারভাবে পৃথক হয়ে গেছে। (আর বলে দেব যে, তুমিই তো সে লোক, যে যথাসময়ে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিলে। কাজেই এখন আমাদের এখানে আর কোন্ মতলবে?)

(আল্লাহ্ বলেন, এসব চিন্তা-ভাবনা আর প্রস্তাবনায় কি হবে!) আল্লাহ্ তা'আলা এমনি করে তাদের অসৎ কর্মগুলোকে অপার আকাঙ্খার (আকারে) দেখিয়ে দেবেন এবং তাদের (নেতৃবর্গ ও অনুসারী) কারোই দোযখের আগুন থেকে পরিত্রাণ ভাগ্যে জুটবে না (কারণ শিরকের শাস্তিই হলো অনন্তকাল দোযখ ভোগ)।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

(১৬৮) হে মানবমণ্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৬৯) সে তো এ নির্দেশই তোমাদিগকে দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন সব বিষয়ে মিথ্যারোপ কর, যা তোমরা জান না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কোন কোন মুশরিক দেব-দেবীর নামে গৃহপালিত পশু ছেড়ে দিয়ে এবং তাতে কল্যাণ সাধিত হবে বলে বিশ্বাস করে সেগুলোর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করত। তারা নিজেদের এহেন কাজকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ, তাঁর সন্তুষ্টির কারণ এবং সমস্ত দেব-দেবীর সুপারিশক্রমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ হবে বলে বিশ্বাস করত। এ প্রসঙ্গেই এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলছেন) হে মানবমণ্ডলী। যা কিছু পৃথিবীতে রয়েছে সেগুলোর মধ্যে (শরীয়তের বিধান মতে) হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর (এবং ব্যবহার কর। তোমাদের প্রতি এ অনুমতি রয়েছে)। আর (এসব হালাল বস্তু-সামগ্রীর মধ্যে কোনটি থেকে এই মনে করে বিরত থাকা যে, তাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন, তাও শয়তানী ধারণা। কাজেই তোমরা) শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না। প্রকৃতপক্ষে সে (অর্থাৎ শয়তান) তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সে তোমাদেরকে এমনি সমস্ত কু-ধারণা, অলীক কল্পনা ও মূর্খতার মাধ্যমে অন্তহীন ক্ষতির আবর্তে বন্দী করে রাখে। আর শত্রু হওয়ার কারণে) সে তোমাদিগকে সে সমস্ত বিষয়ই শিক্ষা দেবে, যা (শরীয়তের দৃষ্টিতে) মন্দ ও অপবিত্র। তদুপরি এমন শিক্ষাও দেবে যে, আল্লাহ্‌র ওপর এমন বিষয়েও মিথ্যা আরোপ কর, যার সনদ পর্যন্ত তোমাদের জানা নেই। (যেমন, মনে করে নেওয়া যে, আমাদের প্রতি উল্লিখিত ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হুকুম রয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ حَلَالًا طَيِّبًا — حَلَّ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো গিট খোলা। যেসব বস্তু-সামগ্রীকে মানুষের জন্য হালাল বা বৈধ করে দেওয়া হয়েছে, তাতে যেমন একটা গিটই খুলে

দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোর উপর থেকে বাধ্যবাধকতা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। হযরত সাহ্ল ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। (১) হালাল খাওয়া, (২) ফরয আদায় করা এবং (৩) রাসূলে করীম (সা)-এর সুন্নতসমূহের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। طَيِّبٌ শব্দের অর্থ পবিত্র। শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল এবং মানসিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় সমস্ত বস্তু-সামগ্রীও এরই অন্তর্ভুক্ত।

خُطُوَاتٌ (খুতুওয়াত) خُطْوَةٌ (খুত্ওয়াতুন)-এর বহুবচন। خُطْوَةٌ বলা হয় পায়ের দুই ধাপের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে। সুতরাং خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ-এর অর্থ হচ্ছে শয়তানী কাজকর্ম।

اَلسُّوْءُ وَالْفَحْشَاءُ — سُوْءٌ বলা হয় এমন বস্তু বা বিষয়কে যা দেখে রুচিজ্ঞানসম্পন্ন যে কোন বুদ্ধিমান লোক দুঃখ বোধ করে। فَحْشَاءُ অর্থ অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ। আবার অনেকে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে سُوْء এবং فَحْشَاء-এর মর্ম যথাক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাপ। অর্থাৎ—অসাধারণ গোনাহ এবং কবীরা গোনাহ্। اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ -এখানে শয়তানের নির্দেশ দান অর্থ হচ্ছে মনের মাঝে ওয়াস্ওয়াসা বা সন্দেহের উদ্ভব করা। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্উদ (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন– আদম সন্তানদের অন্তরে একাধারে শয়তানী প্রভাব এবং ফেরেশতার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। শয়তানী ওয়াস্ওয়াসার প্রভাবে অসৎ কাজের কল্যাণ এবং উপকারিতাগুলো সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং তাতে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথগুলো উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের ইলহামের প্রভাবে সৎ ও নেক কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে কল্যাণ ও পুরস্কার দানের ওয়াদা করেছেন, সেগুলোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সত্য ও সঠিক পথে চলত গিয়ে অন্তরে শান্তি লাভ হয়।

মাস'আলা ঃ দেব-দেবীর নামে ষাঁড় বা অন্য কোন জীবজন্তু, মোরগ-মুরগী, ভেড়া-বকরী ছাড়া কিংবা কোন বুযুর্গ ব্যক্তি অথবা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা যে হারাম তাই পরবর্তী চার আয়াতের পর وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ-এর আওতায় বর্ণনা করা হবে। বর্তমান يَاأَيُّهَا النَّاسُ আয়াতে এ ধরনের জীব-জন্তুর হারাম হওয়ার বিষয়টিকে নিষিদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়, যেমন অনেকেরই সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। বরং এখানে এ ধরনের কার্যকলাপ হারাম হওয়ার বিষয়ে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণী মুক্ত করা এবং এ কাজকে নৈকট্য ও বরকতের বিষয় বলে ধারণা করা আর এ সমস্ত জীবজন্তুকে নিজের জন্য হারাম বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং এগুলোকে চিরস্থায়ী মনে করা প্রভৃতি কাজ নাজায়েয এবং এমন কাজ করা পাপ।

সুতরাং আয়াতের সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, যেমন জীব-জন্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেছেন, সেগুলোকে দেব-দেবীর নাম করে হারাম সাব্যস্ত করো না। বরং সেগুলোকে যথারীতি ভক্ষণ কর। অবশ্য অজ্ঞানতার দরুন যদি এমন কোন কাজ সংঘটিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে নিয়ত সংশোধনের সাথে সাথে ঈমানও নবায়ন করবে এবং তওবা করে নিয়ে এই অবৈধতাকে নষ্ট করে দেবে। এভাবে এ সমস্ত জীব-জন্তুকে পবিত্র কিছু মনে করে হারাম সাব্যস্ত করাও পাপ, কিন্তু এগুলোকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করার দরুন বিধানগতভাবে, যেহেতু নাপাক বলে গণ্য হয়ে যায়, তাই সেগুলোর হারাম হওয়াও প্রমাণিত হয়ে যায়।

মাস'আলা ঃ এতে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি অজ্ঞতা কিংবা অসতর্কতার দরুন কোন জীবকে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কোন কিছুর নামে মুক্ত করে দেয়, তাহলে এই হারাম ধারণা বর্জন করে এহেন কাজ থেকে তওবা করে নেবে। তাহলেই সে জীবের মাংস হালাল হয়ে যাবে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

(১৭০) আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর, যা আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে—কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও। (১৭১) বস্তুত এহেন কাফিরদের উদাহরণ এমন, যেন কেউ এমন কোন জীবকে আহ্বান করছে যা কোন কিছুই শোনে না, হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া—বধির, মূক এবং অন্ধ। সুতরাং তারা কিছুই বুঝে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যখন কেউ সেসব (মুশরিক) লোককে বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে নির্দেশ (স্বীয় পয়গম্বরের প্রতি) নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী চলে, তখন (তারা উত্তরে) বলে, (তা হতে পারে না) আমরা তো বরং সে পথেই চলব, যে পথে আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। (কারণ, তারাও সে পথ অবলম্বনের ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত ছিলেন। এ দাবির খণ্ডনে আল্লাহ্ বলেন) তারা কি সর্ববিষয়েই স্বীয় বাপ-দাদাদের পন্থায় চলবে। তাদের বাপ-দাদারা ধর্মীয় ব্যাপারে কোন কিছু না জানলেও কি এবং তাদের প্রতি কোন আসমানী গ্রন্থের হেদায়েত না থাকলেও কি ?

বস্তুত (অজ্ঞানতার ক্ষেত্রে) এ সমস্ত কাফিরের তুলনা সে সমস্ত জীব-জন্তুর অবস্থারই মত (যার কথা এ উদাহরণে বর্ণনা করা হচ্ছে) যে, এক লোক এমন এক জীবের পেছনে চিৎকার করে যাচ্ছে যে, হাঁক-ডাক আর চিৎকার (-এর শব্দ) ছাড়া তার কোন মর্মই শোনে না। (তেমনিভাবে) এ কাফিররাও (বাহ্যিক কথাবার্তা শোনে বটে, কিন্তু কাজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ) বধির (যেন কিছুই শোনে না), মূক (যেন এমন কোন কথাই তাদের মুখে সরে না), অন্ধ (কারণ, লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোন কিছুই তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না)। কাজেই (তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই যখন বিকল, তখন) তারা কোন কিছুই বুঝে না, উপলব্ধি করে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতের দ্বারা বাপ-দাদা, পূর্ব পুরুষের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের যেমন নিন্দা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি বৈধ অনুসরণের জন্য কতিপয় শর্ত এবং একটা নীতিও জানা যাচ্ছে। যেমন, দু'টি শব্দে বলা হয়েছে لَا يَعْقِلُوْنَ এবং لَا يَهْتَدُوْنَ এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের আনুগত্য ও অনুসরণ এ জন্য নিষিদ্ধ যে, তাদের মধ্যে না ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি, না ছিল কোন খোদায়ী হেদায়েত। হেদায়েত বলতে সে সমস্ত বিধি-বিধানকে বোঝায়, যা পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে। আর জ্ঞানবুদ্ধি বলতে সে সমস্ত বিষয়কে বোঝানো হয়েছে, যা শরীয়তের প্রকৃষ্ট 'নস' বা নির্দেশ থেকে গবেষণা করে বের করা হয়।

অতএব, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণটি সাব্যস্ত হলো এই যে, তাদের কাছে না আছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কোন বিধি-বিধান, না আছে তাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর-পর্যালোচনা গবেষণা করে তা থেকে বিধি-বিধান বের করে নেওয়ার মত কোন যোগ্যতা। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কোন আলেমের ব্যাপারে এমন নিশ্চিত বিশ্বাস হলে যে কোরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞানের সাথে সাথে তাঁর মধ্যে ইজতিহাদ (উদ্ভাবন)-এর যোগ্যতাও রয়েছে, তবে এমন-মুজতাহিদ আলেমের আনুগত্য অনুসরণ করা জায়েয। অবশ্য এ আনুগত্য তাঁর ব্যক্তিগত হুকুম মানার জন্য নয়, বরং আল্লাহ্ এবং তাঁর হুকুম-আহ্কাম মানার জন্যই হবে। যেহেতু আমরা সরাসরি আল্লাহ্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারি না, সেহেতু কোন মুজতাহিদ আলেমের অনুসরণ করি, যাতে আল্লাহ্র বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করা যায়।

অন্ধ অনুসরণ এবং মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণের মধ্যে পার্থক্য ঃ উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা বোঝা যায় যে, যারা সাধারণভাবে মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি উদ্ধৃত করেন, তারা নিজেরাই এ আয়াতের আসল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন।

এ আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, এ আয়াতে যে পূর্ব-পুরুষের আনুগত্য ও অনুসরণের কথা নিষেধ করা হয়েছে, তার প্রকৃত মর্ম হলো ভ্রান্ত ও মিথ্যা বিশ্বাস ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাপ-দাদা পূর্ব-পুরুষের অনুসরণ। যথার্থ ও সঠিক বিশ্বাস ও সৎকর্মে তাদের অনুসরণ করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সংলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ দু'টি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে ঃ

اِنِّىْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ .

—"আমি সে জাতির ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করেছি, যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করে না এবং যারা আখিরাতকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে আমি অনুসরণ করেছি আমাদের পিতা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-এর ধর্মবিশ্বাসের।"

এ আয়াতের দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয়ে বাপ-দাদাদের অনুসরণ করা হারাম, কিন্তু বৈধ ও সৎকর্মের বেলায় তা জায়েয। বরং প্রশংসনীয়।

ইমাম কুরতুবী এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজতাহিদ ইমামগণের আনুগত্য ও অনুসরণ সম্পর্কিত মাস'আলা-মাসায়েল এবং অন্যান্য বিধি-বিধানের উল্লেখও করেছেন।

তিনি বলেন ঃ

تعلق قوم بهذه الاية فى ذم التقليد (الى) وهذا فى الباطل صحيح – اما التقليد فى الحق فاصل من اصول الدين وعصمة من عصم المسلمين يلجاء اليها الجاهل المقصر عن درك النظر ۔

অর্থাৎ—"কিছু লোক এ আয়াতটিকে তকলীদ বা অনুসরণের নিন্দাবাদ প্রসঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। তবে এরূপ অনুসরণ করা কেবল অবৈধ ও বাতিল বিষয়ের ক্ষেত্রেই যথার্থ। কিন্তু সত্য-সঠিক বিষয়ে কারও অনুসরণের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সত্য-সঠিক বিষয়ে (অন্যের) অনুসরণ করা তো বরং ধর্মীয় নীতিমালার একটা স্বতন্ত্র ভিত্তি এবং মুসলমানদের জন্য ধর্মের হেদায়েত লাভের একটা বড় উপায়। কারণ, যারা নিজেরা ইজতিহাদ বা উদ্ভাবনের যোগ্যতা রাখে না, ধর্মীয় ব্যাপারে অন্যের অনুসরণের উপরই তাদের নির্ভর করতে হয়।"

—(কুরতুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৪)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

(১৭২) হে ঈমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহ্র, যদি তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর। (১৭৩) তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শূকর মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালংঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন গোনাহ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরের আয়াতে পবিত্র বস্তু-সামগ্রী খাবার ব্যাপারে মুশরিকদের ভুল ধারণা বাতলে দিয়ে তাদের সংশোধন করা উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীতে ঈমানদারদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে, যেন তারা সে ভুল ধারণার ক্ষেত্রে মুশরিকদের মতই আচরণ আরম্ভ না করে। প্রসঙ্গক্রমে ঈমানদারদের প্রতি স্বীয় নিয়ামতের উল্লেখ করে তাদেরকে শুকরিয়া আদায় করার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে) ঃ

হে ঈমানদারগণ (আমার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি এ অনুমতি রয়েছে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে) যেসব পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আমি তোমাদেরকে দান করেছি, সেগুলোর মধ্য থেকে তোমরা (যা খুশি) আহার কর, (ভোগ কর) এবং (এ অনুমতির সাথে সাথে এ নির্দেশও বলবৎ রয়েছে যে, মুখ, হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকলাপে এবং এ সমস্ত নেয়ামত যে একান্তই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রদত্ত সে বিষয়ে অন্তরে বিশ্বাস রাখার মাধ্যমে) আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা বাস্তবিকপক্ষেই তাঁর দাসত্বের সাথে যুক্ত থেকে থাক। (বস্তুত এ সম্পর্ক একান্তই স্বীকৃত প্রকাশ্য। সুতরাং শুকরিয়া আদায় করাও যে ওয়াজিব তাও সুপ্রমাণিত)।

যোগসূত্র ঃ উপরের আলোচনায় বলা হচ্ছিল যে, হালাল বা বৈধ বস্তু-সামগ্রীকে হারাম বা অবৈধ সাব্যস্ত করো না। তারপর বলা হচ্ছে যে, মুশরিকদের মত তোমরাও হারামকে হালাল মনে করো না। এখানে মৃত বা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করা জীব-জন্তু যা মুশরিকরা খেত—তা থেকে বারণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিকট অমুক অমুক জীব হারাম। এগুলো ছাড়া অন্যান্য জীব-জন্তুকে নিজের পক্ষ থেকে হারাম সাব্যস্ত করা ভুল। এতে পূর্ববর্তী বিষয়েরও সমর্থন হয়ে গেল।

(অতঃপর বলা হচ্ছে) আল্লাহ্ তা'আলা (শুধু) তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত জীব, (যা জবাই করা ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও জবাই করা ছাড়া মরে যায়)। আর রক্ত (যা প্রবাহিত হয়) এবং শূকর মাংস (তেমনি তার অন্যান্য অংশগুলোও) আর এমন সব জীবজন্তু যা (আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মানসে) আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। (এ সমস্ত আল্লাহ্ হারাম করেছেন, কিন্তু সেসব বস্তু হারাম করেন নি, যা তোমরা নিজের পক্ষ থেকে হারাম করে নিচ্ছ। যেমন, উপরে উল্লেখ করা হয়েছে)। তবে অবশ্য (এতে এতটুকু অবকাশ রয়েছে যে,) যে লোক (ক্ষুধার জ্বালায়) অনন্যোপায় হয়ে পড়ে (তার পক্ষে তা খাওয়ায়) কোন পাপ নেই। অবশ্য শর্ত হলো এই যে, খেতে গিয়ে সে যেন স্বাদ গ্রহণে আগ্রহী না হয় (প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেতে গিয়ে) যেন সীমালংঘন না করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু (তিনি এমন চরম সময়ে রহমত করে গোনাহ্‌র বস্তু থেকেও গোনাহ্ রহিত করে দিয়েছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হালাল খাওয়ার বরকত ও হারাম খাদ্যের অকল্যাণ ঃ আলোচ্য আয়াতে যেমন হারাম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কারণ, হারাম খেলে যেমন মন্দ অভ্যাস ও অসচ্চরিত্রতা সৃষ্টি হয়, ইবাদতের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে এবং দোয়া কবুল হয় না, তেমনিভাবে হালাল খাওয়ায় অন্তরে এক প্রকার নূর সৃষ্টি হয়। তদ্দ্বারা অন্যায়-অসচ্চরিত্রতার প্রতি ঘৃণাবোধ এবং সততা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ আসে, পাপের কাজে মনে ভয় আসে এবং দোয়া কবুল হয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি হেদায়েত করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا .

"হে আমার রসূলগণ ! তোমরা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর।"

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দোয়া কবূল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবূল না হওয়ার অশঙ্কাই থাকে বেশি। রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন, বহু লোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে দুহাত তুলে আল্লাহ্র দরবারে বলতে থাকে, ইয়া পরওয়ারদিগার! ইয়া রব !!' কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় তার দোয়া কি করে কবূল হতে পারে ? (মুসলিম, তিরমিযী, —ইবনে-কাসীর-এর বরাতে)

انَّمَا حَرَّمَ... । বাক্যের মধ্যে انَّمَا । শব্দটি বাক্যের অর্থ সীমিতকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা শুধুমাত্র সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রী হারাম করেছেন, যেগুলো পরে উল্লিখিত হচ্ছে এমনি, পরবর্তী অন্য এক আয়াতে বিষয়টির আরো একটু ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা ঃ

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ .

অর্থাৎ—হুযূর (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে—আপনি ঘোষণা করে দিন, "ইতিপূর্বে আমি ওহী মারফত যেসব বস্তু হারাম করেছি, আহার্য গ্রহণকারীদের পক্ষে সেগুলো ছাড়া অন্য কোন কিছুই হারাম নয়।"

এ দু'টি আয়াতের মর্ম অনুযায়ী প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, খোদ কোরআনেরই অন্যান্য আয়াত এবং বিভিন্ন হাদীসে অন্যান্য যে বস্তু হারাম হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, এ দু'আয়াতের দ্বারা কি সেসব বস্তু হারাম হওয়া রহিত করা হয়েছে?

উত্তর এই যে, প্রথম আয়াতে হালাল-হারামের সামগ্রিক নির্দেশ আসেনি কিংবা সম্পূরক আয়াতেও এমন কথা বলা হয়নি যে, পূর্ববর্তী আয়াতে যেসব বস্তুর নামোল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো ছাড়া অন্যান্য কোন কিছুই হারাম নয়। বরং প্রথম আয়াতে জোর দিয়ে শুধু এ কথাই বলা হয়েছে যে, যে বস্তু সামগ্রীর নাম এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে, এগুলো সম্পূর্ণ হারাম। কেননা, মুশরিকরা এমন কিছু বস্তুকে হালাল মনে করতো, যেগুলো আল্লাহ্র বিধানে হারাম। পক্ষান্তরে নিজেদের পূর্বসংস্কার এবং অভ্যাসের দরুন এমন কিছু বস্তুকে হারাম বলে গণ্য করতো, যেগুলো আল্লাহ্র বিধানে হালাল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কতকগুলো বস্তুর নাম উল্লেখ করে জোর দিয়ে দিচ্ছেন যে, এসব বস্তু সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যাই থাক না কেন, এগুলো নিশ্চিতরূপেই হারাম। এ ছাড়া, হারাম বস্তু আল্লাহ্ তা'আলাই যেহেতু ওহীর মাধ্যমে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, সুতরাং তোমাদের ধারণা কিংবা সংস্কারের কারণে অন্য কোন কিছু হারাম হবে না।

আলোচ্য আয়াতে যে বস্তু-সামগ্রীকে হারাম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলোর সংখ্যা চার। যেমন—মৃত পশু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যেসব জানোয়ার আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয়। উপরোক্ত চিহ্নিত চারটি বস্তুর সাথে স্বয়ং কোরআনেরই অন্য আয়াতে এবং হাদীস শরীফে আরো কতিপয় বস্তুর উল্লেখ এসেছে। সুতরাং সেসব নির্দেশ একত্র করে চিহ্নিত হারাম বস্তুগুলো সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

মৃত ঃ এর অর্থ যেসব প্রাণী হালাল করার জন্য শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যবেহ করা জরুরী, সেসব প্রাণীই যদি যবেহ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যেমন আঘাত প্রাপ্ত হয়ে, অসুস্থ হয়ে কিংবা দম বন্ধ হয়ে মারা যায়, তবে সেগুলোকে মৃত বলে গণ্য করা হবে এবং সেগুলোর গোশত খাওয়া হারাম হবে।

তবে কোরআন শরীফে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ 'তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হলো।'

এ আয়াতের মর্মানুযায়ী সামুদ্রিক জীব-জন্তুর বেলায় যবেহ করার শর্ত আরোপিত হয়নি। ফলে এগুলো যবেহ ছাড়াই খাওয়া হালাল। অনুরূপ এক হাদীসে মাছ এবং টিড্ডি নামক পতঙ্গকে মৃত প্রাণীর তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এ দু'টির মৃতকে হালাল করা হয়েছে। রসূল (সা) ইরশাদ করেছেন—আমাদের জন্য দু'টি মৃত হালাল করা হয়েছে—মাছ এবং টিড্ডি। অনুরূপ দু'প্রকার রক্তও হালাল করা হয়েছে। যেমন যকৃৎ ও কলিজা। (ইবনে-কাসীর, আহমদ, ইবনে-মাজাহ, দার-কুত্‌নী) সুতরাং বোঝা গেল যে, জীব-জন্তুর মধ্যে মাছ এবং টিড্ডি নামক পতঙ্গ মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে না, এ দু'টি যবেহ না করেও খাওয়া হালাল হবে। এগুলো ধরা পড়ে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কিংবা স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই মরুক না কেন, তাতে কিছু যায়-আসে না। তবে মাছ পানিতে মরে যদি পঁচে যায় এবং পানির উপরে ভেসে ওঠে, তবে তা খাওয়া যাবে না। (জাসসাস) অনুরূপ যেসব বন্য জীব-জন্তু ধরে যবেহ করা সম্ভব নয়, সেগুলোকে বিসমিল্লাহ্ বলে তীর কিংবা অন্য কোন ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে যদি মারা হয়, তবে সেগুলোও হালাল হবে। তবে এমতাবস্থায়ও শুধু আঘাত দিয়ে মারলে চলবে না, কোন ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা শর্ত।

মাস'আলা ঃ বন্দুকের গুলীতে আহত কোন জন্তু যদি যবেহ করার আগেই মরে যায়, তবে সেগুলোও লাঠি বা পাথরের আঘাতে মরা জন্তুর পর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হবে। কোরআনের অন্য এক আয়াতে যাকে مَوْقُوْذَةٌ (মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত) বলা হয়েছে। অর্থাৎ খাওয়া হালাল হবে না। মৃত্যুর আগেই যদি যবেহ করা হয়, তবে তা হালাল হবে।

মাস'আলা ঃ ইদানীং এক রকম চোখা গুলী ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের গুলী সম্পর্কে কোন কোন আলেম মনে করেন যে, এসব ধারালো গুলীর আঘাতে মৃত জন্তুর হুকুম তীরের আঘাতে মৃত্যুর পর্যায়ভুক্ত হবে। কিন্তু আলেমগণের সম্মিলিত অভিমত অনুযায়ী বন্দুকের গুলী চোখা এবং ধারালো হলেও তা তীরের পর্যায়ভুক্ত হয় না। কেননা, তীরের আঘাত ছুরির আঘাতের ন্যায়, অপরপক্ষে বন্দুকের গুলী চোখা হলেও গায়ে বিদ্ধ হয়ে বারুদের বিস্ফোরণ ও দাহিকাশক্তির প্রভাবে জন্তুর মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং এরূপ গুলীর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত জানোয়ারও যবেহ করার আগে মারা গেলে তা খাওয়া হালাল হবে না।

মাস'আলা ঃ আলোচ্য আয়াতে "তোমাদের জন্য মৃত হারাম" বলাতে মৃত জানোয়ারের গোশত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম হিসেবে বিবেচিত হবে। যাবতীয় অপবিত্র বস্তু সম্পর্কেও সে একই বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ এগুলোর ব্যবহার যেমন হারাম, তেমনি এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা কিংবা অন্য কোন উপায়ে এগুলো থেকে যে কোনভাবে লাভবান হওয়াও হারাম। এমনকি মৃত জীবজন্তুর গোশত নিজ হাতে কোন গৃহপালিত জন্তুকে খাওয়ানোও জায়েয নয়। বরং সেগুলো এমন কোন স্থানে ফেলে দিতে হবে, যেন কুকুর-বিড়ালে

খেয়ে ফেলে। নিজ হাতে উঠিয়ে কুকুর-বিড়ালকে খাওয়ানোও জায়েয হবে না। —(জাস্সাস, কুরতুবী)

মাস'আলা ঃ 'মৃত' শব্দটি অন্য কোন বিশেষণ ছাড়া সাধারণভাবে ব্যবহার করাতে প্রতীয়মান হয় যে, হারামের হুকুমও ব্যাপক এবং তন্মধ্যে মৃত জন্তুর সমুদয় অংশই শামিল। কিন্তু অন্য এক আয়াতে عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ শব্দ দ্বারা এ বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। তাতে বোঝা যায় যে, মৃত জন্তুর শুধু সে অংশই হারাম যেটুকু খাওয়ার যোগ্য। সুতরাং মৃত জন্তুর হাড়, পশম প্রভৃতি যে সব অংশ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না সেগুলো ব্যবহার করা হারাম নয়, সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা, কোরআনের অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ۔

এতে হালাল জানোয়ারসমূহের পশম প্রভৃতির দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে যবেহ করার শর্ত আরোপ করা হয়নি। (জাস্সাস)

চামড়ার মধ্যে যেহেতু রক্ত প্রভৃতি নাপাকীর সংমিশ্রণ থাকে, সেজন্য মৃত জানোয়ারের চামড়া শুকিয়ে পাকা না করা পর্যন্ত নাপাক এবং ব্যবহার হারাম। কিন্তু পাকা করে নেওয়ার পর ব্যবহার করা সম্পূর্ণ জায়েয। সহীহ্ হাদীসে এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। (জাস্সাস)

মাস'আলা ঃ মৃত জানোয়ারের চর্বি এবং তদ্দ্বারা তৈরি যাবতীয় সামগ্রীই হারাম। এসবের ব্যবহার কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। এমনকি এসবের ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম।

মাস'আলা ঃ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানীকৃত সাবান এবং অনুরূপ যেসব সামগ্রীতে জন্তুর চর্বি ব্যবহৃত হয়, সেগুলো ব্যবহার না করাই উত্তম। তবে সেগুলোতে মৃত জন্তুর চর্বি ব্যবহৃত হয় কিনা—এ সম্পর্কিত নিশ্চিত তথ্য অবগত না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করা হারাম হবে না। কেননা, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর, হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী মৃত জানোয়ারের চর্বি শুধু খাওয়া হারাম বলেছেন, তবে অন্য কাজে ব্যবহার করা জায়েয বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সে কারণে এ সবের ক্রয়-বিক্রয় তাঁরা হালাল বলেছেন। (জাস্সাস)

মাস'আলা ঃ দুধের দ্বারা পনির তৈরি করার জন্য জন্তুর পেট থেকে সংগৃহীত এমন একটা উপাদান ব্যবহার করা হয়, আরবীতে যাকে 'নাফ্হা' বলা হয়। এটি দুধের সাথে মেশানোর সাথে সাথেই দুধ জমে যায়। সংশ্লিষ্ট জানোয়ারটি যদি হালাল এবং আল্লাহ্র নামে যবেহকৃত হয় তবে তার নাফ্হা ব্যবহার করায়ও কোন দোষ নেই। কারণ, যবেহকৃত হালাল জন্তুর গোশ্ত-চর্বি সবই হালাল। কিন্তু সে অংশটুকু যদি অযবেহকৃত অথবা কোন হারাম জন্তু থেকে নেওয়া হয়ে থাকে তবে তা দ্বারা প্রস্তুত পনির খাওয়া সম্পর্কে ফিকহ্শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম মালেক (র) সে পনির ব্যবহার করা যাবে বলে মত প্রকাশ করলেও ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ এবং সুফিয়ান সওরী (র) প্রমুখ একে নাজায়েয বলেছেন। (জাস্সাস, কুরতুবী)

ইউরোপ ও অন্যান্য অ-মুসলিম দেশে তৈরি যেসব পনির আসে , সেগুলোতে হারাম এবং যবেহ না করা জন্তুর চর্বি বা 'নাফহা' ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে

অধিকাংশ ফকীহ্র মতে এসব ব্যবহার না করাই উত্তম। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (র)-এর অভিমতের ভিত্তিতে তা ব্যবহারের অবকাশ রয়েছে। তবে যেসব পনিরে শূকরের চর্বি ব্যবহৃত হয় যে কোন উপায়ে জানা যায়, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নাপাক।

রক্ত ঃ আলোচ্য আয়াতে যেসব বস্তুসামগ্রীকে হারাম করা হয়েছে, তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে রক্ত। এ আয়াতে শুধু রক্ত উল্লিখিত হলেও সূরা আন'আমের এক আয়াতে أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا অর্থাৎ 'প্রবহমান রক্ত' উল্লিখিত হয়েছে। রক্তের সাথে 'প্রবহমান' শব্দ সংযুক্ত করার ফলে শুধু সে রক্তকেই হারাম করা হয়েছে, যা যবেহ্ করলে বা কেটে গেলে প্রবাহিত হয়। এ কারণেই কলিজা-যকৃৎ প্রভৃতি জমাট বাঁধা রক্তে গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফিক্হবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী পাক ও হালাল।

মাসআলা ঃ যেহেতু শুধু প্রবহমান রক্তই হারাম ও নাপাক, কাজেই যবেহ করা জন্তুর গোশ্তের সাথে রক্তের যে অংশ জমাট বেঁধে থেকে যায়, সেটুকুও হালাল ও পাক। ফিক্হবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীসহ সমগ্র আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একমত। একই কারণে মশা, মাছি ও ছারপোকার রক্ত নাপাক নয়। তবে রক্ত যদি বেশি হয় এবং ছড়িয়ে যায়, তবে তা ধুয়ে ফেলা উচিত। (জাস্সাস)

মাস'আলা ঃ রক্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করাও হারাম। অন্যান্য নাপাক রক্তের ন্যায় রক্তের ক্রয়-বিক্রয় এবং তদ্দ্বারা অর্জিত লাভালাভ হারাম। কেননা, কোরআনের আয়াতে 'রক্ত' শব্দটি অন্য কোন বিশেষণ ব্যতীতই ব্যবহৃত হওয়ার কারণে রক্ত বলতে যা বোঝায়, তার সম্পূর্ণটাই হারাম প্রতিপন্ন হয়ে গেছে, ফলে রক্তের দ্বারা উপকার গ্রহণ করার সবগুলো দিকই হারাম সাব্যস্ত হয়েছে।

রোগীর গায়ে অন্যের রক্ত দেওয়ার মাস'আলা ঃ এই মাস'আলার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ রক্ত মানুষের শরীরের অংশ। শরীর থেকে বের করে নেওয়ার পর তা নাপাক। তদনুসারে প্রকৃত প্রস্তাবে একজনের রক্ত অন্যজনের শরীরে প্রবেশ করানো দু'কারণে হারাম হওয়া উচিত—প্রথমত, মানুষের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্মানিত এবং আল্লাহ্ কর্তৃক সংরক্ষিত। শরীর থেকে পৃথক করে নিয়ে তা অন্যত্র সংযোজন করা সে সম্মান ও সংরক্ষণ বিধানের পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত এ কারণে যে, রক্ত 'নাজাসাতে-গলীযা' বা জঘন্য ধরনের নাপাকী, আর নাপাক বস্তুর ব্যবহার জায়েয নয়।

তবে নিরুপায় অবস্থায় এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

প্রথমত, রক্ত যদিও মানুষের শরীরেরই অংশ, তথাপি এটা অন্য মানুষের শরীরে স্থানান্তরিত করার জন্য যার রক্ত, তার শরীরে কোন প্রকার কাটা-ছেঁড়ার প্রয়োজন হয় না, কোন অঙ্গ কেটে পৃথক করতে হয় না। সুঁই-এর মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে রক্ত বের করে অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। তদনুসারে রক্তকে দুধের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যা অঙ্গ কর্তন ব্যতিরেকেই একজনের শরীর থেকে বের হয়ে অন্যের শরীরের অংশে পরিণত হতে থাকে। শিশুর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করেই ইসলামী শরীয়ত মানুষের দুধকে মানবশক্তির খাদ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে এবং স্বীয় সন্তানকে দুধ-পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত করে দিয়েছে। সন্তানদের পিতা কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হলে পর অবশ্য শিশুকে দুধ পান করানো

মায়ের উপর ওয়াজিব থাকে না। কেননা, সন্তানদের খাদ্য সংস্থানের দায়িত্ব পিতার, মায়ের নয়। তাই পিতা তখন সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য অন্য স্ত্রীলোক নিয়োগ করবে অথবা অর্থের বিনিময়ে সন্তানের মাতাকেই দুধ পান করানোর জন্য নিয়োগ করবে।

কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে ঃ

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ .

—"যদি তোমাদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তোমাদের সন্তানদের দুধ পান করায়, তবে তার বিনিময় পরিশোধ করে দেবে।"

মোটকথা, মায়ের দুধ মানবদেহের অংশ হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনের খাতিরে শিশুদের জন্য তা ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এমনকি ঔষধরূপে বড়দের জন্যও। যথা ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে ঃ

ولا بئس بان يسعط الرجل بلبن المراة ويشربه للدواء .

—অর্থাৎ ঔষধ হিসাবে স্ত্রীলোকের দুধ পুরুষের পক্ষে নাকে প্রবেশ করানো কিংবা পান করায় দোষ নেই। (আলমগীরী)

ইবনে কুদামাহ্ রচিত 'মুগ্নী' গ্রন্থে এ মাস'আলা সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। (মুগনী, কিতাবুস সাইদ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২০৬)

রক্তকে যদি দুধের সাথে 'কেয়াস' তথা তুলনা করা হয়, তবে তা সামঞ্জস্যহীন হবে না। কেননা, দুধ রক্তেরই পরিবর্তিত রূপ এবং মানবদেহের অংশ হওয়ার ব্যাপারেও একই পর্যায়ভুক্ত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, দুধ পাক এবং রক্ত নাপাক। সুতরাং হারাম হওয়ার প্রথম কারণ অর্থাৎ মানবদেহের অংশ হওয়ার ক্ষেত্রে তো নিষিদ্ধ হওয়ার ধারণা যুক্তিতে টেকে না। অবশিষ্ট থাকে দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ নাপাক হওয়া। এক্ষেত্রেও চিকিৎসার বেলায় অনেক ফিক্হবিদ রক্ত ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় মানুষের রক্ত অন্যের দেহে স্থানান্তর করার প্রশ্নে শরীয়তের নির্দেশ দাঁড়ায় এই যে, সাধারণ অবস্থায় এটা জায়েয নয়। তবে চিকিৎসার্থে, নিরুপায় অবস্থায় ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে জায়েয। 'নিরুপায় অবস্থায়' অর্থ হচ্ছে, রোগীর যদি জীবন-সংশয় দেখা দেয় এবং অন্য কোন ঔষধ যদি তার জীবন রক্ষার জন্য কার্যকর বলে বিবেচিত না হয়, আর রক্ত দেওয়ার ফলে তার জীবন-রক্ষার সম্ভাবনা যদি প্রবল থাকে, তবে সে অবস্থায় তার দেহে অন্যের রক্ত দেওয়া কোরআন শরীফের সে আয়াতের মর্মানুযায়ীও জায়েয হবে, যে আয়াতে অনন্যোপায় অবস্থায় মৃত জন্তুর গোশ্ত খেয়ে জীবন বাঁচানোর সরাসরি অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আর যদি অনন্যোপায় না হয় এবং অন্য ঔষধ ব্যবহারে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়, তবে সে অবস্থায় রক্ত ব্যবহারের প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফিক্হবিদ একে জায়েয বলেছেন এবং কেউ কেউ না-জায়েয বলেছেন। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ ফিক্হর কিতাবসমূহে 'হারাম বস্তুর দ্বারা চিকিৎসা' শীর্ষক আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে।

শূকর হারাম হওয়ার বিবরণ ঃ আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় যে বস্তুটি হারাম করা হয়েছে, সেটি হলো শূকরের মাংস। এখানে শূকরের সাথে 'লাহ্ম' বা মাংস শব্দ সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এর দ্বারা শুধু মাংস হারাম—একথা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়।

বরং শূকরের সমগ্র অংশ অর্থাৎ হাড়, মাংস, চামড়া, চর্বি, রগ, পশম প্রভৃতি সবকিছুই সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে 'লাহ্‌ম' শব্দ যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শূকর অন্যান্য হারাম জন্তুর ন্যায় নয়, তাই এটি যবেহ করলেও পাক হয় না। কেননা, গোশ্‌ত খাওয়া হারাম এমন অনেক জন্তু রয়েছে যাদের যবেহ করার পর সেগুলোর হাড়, চামড়া প্রভৃতি পাক হতে পারে, যদিও সেগুলো খাওয়া হারাম। কিন্তু যবেহ করার পরও শূকরের মাংস হারাম তো বটেই, নাপাকও থেকে যায়। কেননা, এটি একাধারে যেমনি হারাম তেমনি 'নাজাসে-আইন' বা সম্পূর্ণ নাপাক। শুধু চামড়া সেলাই করার কাজে শূকরের পশম দ্বারা তৈরি সূতা ব্যবহার করা জায়েয বলে হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। (জাস্‌সাস, কুরতুবী)

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে যা যবেহ করা হয় ঃ আয়াতে উল্লিখিত চতুর্থ হারাম বস্তু হচ্ছে জীবজন্তু, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ অথবা উৎসর্গ করা হয়। সাধারণত এর তিনটি উপায় প্রচলিত রয়েছে।

প্রথমত, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয় এবং যবেহ করার সময়ও সে নাম নিয়েই যবেহ করা হয়, যে নামে তা উৎসর্গিত। এ সুরতে যবেহকৃত জন্তু সমস্ত মত-পথের আলেম ও ফিক্‌হবিদগণের দৃষ্টিতেই হারাম ও নাপাক। এটি মৃত এবং এর কোন অংশ দ্বারাই ফায়দা গ্রহণ জায়েয হবে না। কেননা وَمَا أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ। আয়াতে যে সুরতের কথা বোঝানো হয়েছে এ সুরতটি এর সরাসরি নমুনা, যে ব্যাপারে কারো কোন মতভেদ নেই।

দ্বিতীয় সুরত হচ্ছে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা যবেহ করা হয়। তবে যবেহ করার সময় তা আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই যবেহ করা হয়। যেমন, অনেক অজ্ঞ মুসলমান পীর-বুযুর্গগণের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি মানত করে তা যবেহ করে থাকে। তবে যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই তা যবেহ করা হয়। এ সুরতটিও ফকীহ্‌গণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী হারাম এবং যবেহকৃত জন্তু মৃতের শামিল।

তবে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে এ সুরতটি সম্পর্কে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। কোন কোন মুফাস্‌সির এবং ফিক্‌হবিদ এ সুরতটিকেও আয়াতে উল্লিখিত 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে যবেহকৃত' জীবের বিধানের অনুরূপ বিবেচনা করেছেন। যেমন, তফসীরে বায়যাবীর টীকায় বলা হয়েছে ঃ

فكل ما نودى عليه بغير اسم الله فهو حرام وان ذبح باسم الله تعالى حيث اجمع العلماء لو ان مسلما ذبح ذبيحة وقصد بذبحه التقرب الى غير الله صار مرتدا وذبيحته ذبيحة مرتد .

—অর্থাৎ "সে সমস্ত জন্তুই হারাম, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয়। যবেহ করার সময় তা আল্লাহ্‌র নামেই যবেহ করা হোক না কেন। কেননা, আলেম ও ফকীহ্‌গণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোন জন্তুকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নৈকট্য হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোন মুসলমানও যবেহ করে, তবে সে ব্যক্তি 'মুরতাদ' বা ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে এবং তার যবেহকৃত পশুটি মুরতাদের যবেহকৃত পশু বলে বিবেচিত হবে।"

দুররে-মুখতার কিতাবুয-যাবায়েহ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

لو ذبح لقدوم الامير ونحوه كواحد من العظماء يحرم لانه اهل به لغير الله ولو ذكر اسم الله واقره الشامي ۔

—যদি কোন আমীরের আগমন উপলক্ষে তাঁরই সম্মানার্থে কোন পশু যবেহ্ করা হয়, তবে যবেহকৃত সে পশুটি হারাম হয়ে যাবে। কেননা, এটাও "আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে যা যবেহ করা হয়"—এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত, যদিও যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম নিয়েই তা যবেহ্ করা হয়। শামীও এ অভিমত সমর্থন করেছেন। —(দুররে-মুখতার, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৪)

কেউ কেউ অবশ্য উপরোক্ত সুরতটিকে مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ আয়াতের সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন না। কেননা, আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি অনুসারে একেবারে সরাসরি তা বোঝায় না। তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নৈকট্য বা সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত দ্বারা 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয়' সে আয়াতের প্রতি যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় এ সুরতটিকেও হারাম করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এ যুক্তিই সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ ও সাবধানতাপ্রসূত।

উপরোক্ত সুরতটি হারাম হওয়ার সমর্থনে কোরআনের অন্য আর একটি আয়াতও দলীল হিসেবে পেশ করা যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ বাতিলপন্থীরা যেসব বস্তুর পূজা করে থাকে, সেই সবকিছুকে نُصُب বলা হয়। সে মতে আয়াতের অর্থ হয় ঃ সে সমস্ত পশু যেগুলোকে বাতিল উপাস্যের উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ উল্লিখিত রয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, وما اهل به আয়াতের সরাসরি প্রতিপাদ্য সে সমস্ত পশু, যেগুলো যবেহ করার সময় অন্য কোন কিছুর নামে যবেহ করা হয়। এরপরই ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ আয়াত এসেছে। এ আয়াতে যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নাম নেওয়ার কথা উল্লেখ নেই, শুধু মূর্তি বা বাতিল উপাস্যের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যবেহ করার কথা এসেছে। এতে এখানে সে সমস্ত জন্তুও এ সুরতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে, যেগুলো যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম নিয়ে যবেহ করা হলেও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি অর্জন করার লক্ষ্যে যবেহ করা হয়েছে। —(মাওলানা থানবীর ব্যাখ্যা)।

ইমাম কুরতুবীও তাঁর তফসীরে উপরোক্ত মতই সমর্থন করেছেন। তাঁর অভিমত হচ্ছে ঃ

وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة وغلب ذالك فى استعمالهم حتى عبربه عن النية التى هى علة التحريم ۔

অর্থাৎ আরবদের স্বভাব ছিল যে, যার উদ্দেশ্যে যবেহ করা হতো, যবেহ করার সময় তার স্বরে সে নামই উচ্চারণ করতে থাকতো। ব্যাপকভাবে তাদের মধ্যে এ রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য প্রত্যাশা—যা সংশ্লিষ্ট পশু হারাম হওয়ার মূল কারণ, সেটাকে 'এহলাল' অর্থাৎ 'তার স্বরে নামোচ্চারণ' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী দু'জন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আলী (রা) এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকার ফতওয়ার উপর ভিত্তি করেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

হযরত আলী (রা)-এর শাসনামলে বিখ্যাত কবি ফরাযদাক-এর পিতা গালেব একটি উট যবেহ করেছিল। যবেহ করার সময় তাতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নাম উচ্চারণ করা হয়েছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এতদসত্ত্বেও হযরত আলী (রা) সে উটের গোশ্ত وما اهل به لغير الله আয়াতের মর্মানুযায়ী হারাম বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং সাহাবীগণও হযরত আলী (রা)-এর এ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

অনুরূপ ইমাম মুসলিম তাঁর ওস্তাদ ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়ার সনদে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসের শেষভাগে রয়েছে যে, একজন স্ত্রীলোক হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, হে উম্মুল মু'মিনীন ! আজমী লোকদের মধ্যে আমাদের কিছুসংখ্যক দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তাদের মধ্যে সব সময় কোন-না-কোন উৎসব লেগেই থাকে। উৎসবের দিনে কিছু হাদিয়া-তোহ্ফা তারা আমাদের কাছেও পাঠিয়ে থাকে। আমরা তাদের পাঠানো সেসব সামগ্রী খাবো কিনা ? জবাবে হযরত আয়েশা (রা) বলেছিলেন ঃ

واما ما ذبح لذالك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من اشجارهم .

অর্থাৎ—সে উৎসব দিবসের জন্য যেসব পশু যবেহ করা হয়, সেগুলো খেয়ো না, তবে তাদের ফলমূল খেতে পার। —(তফসীরে কুরতুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৭)।

মোটকথা, দ্বিতীয় সুরতটি, যাতে নিয়ত থাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভ, কিন্তু যবেহ করা হয় আল্লাহ্র নামেই, সেটিও হারাম হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য অর্জন, এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার দরুন وما اهل به لغير الله আয়াতের হুকুম। দ্বিতীয় আয়াত وما ذبح على النصب এরও প্রতিপাদ্য সাব্যস্ত হওয়ার এ শ্রেণীর পশুর মাংসও হারাম হবে।

তৃতীয় সুরত হচ্ছে পশুর কান কেটে অথবা শরীরের অন্য কোথাও কোন চিহ্ন অঙ্কিত করে কোন দেব-দেবী বা পীর-ফকীরের নামে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেগুলো দ্বারা কোন কাজ নেওয়া হয় না, যবেহ করাও উদ্দেশ্য থাকে না। বরং যবেহ করাকে হারাম মনে করে। এ শ্রেণীর পশু আলোচ্য দু' আয়াতের কোনটিরই আওতায় পড়ে না, এ শ্রেণীর পশুকে কোরআনের ভাষায় 'বাহীরা' বা সায়েবা নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের পশু সম্পর্কে হুকুম হচ্ছে যে, এ ধরনের কাজ অর্থাৎ কারো নামে কোন পশু প্রভৃতি জীবন্ত উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া কোরআনের সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী হারাম, যেমন বলা হয়েছে ঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ .

অর্থাৎ—আল্লাহ্ তা'আলা বাহীরা বা সায়েবা সম্পর্ক কোন বিধান দেননি। তবে এ ধরনের হারাম আমল কিংবা সংশ্লিষ্ট পশুটিকে হারাম মনে করার ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই সেটি হারাম হয়ে যাবে না। বরং হারাম মনে করাতেই তাদের একটা বাতিল মতবাদকে সমর্থন এবং শক্তি প্রদান করা হয়। তাই এরূপ উৎসর্গিত পশু অন্যান্য সাধারণ পশুর মতই হালাল।

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পশুর উপর তার মালিকের মালিকানা বিনষ্ট হয় না, যদিও সে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে এরূপ মনে করে যে, এটি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে যে নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, তারই মালিকানাতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শরীয়তের বিধানমতে যেহেতু তার সে উৎসর্গীকরণই বাতিল, সুতরাং সে পশুর উপর তার পরিপূর্ণ মালিকানা কায়েম থাকে। সেমতে উৎসর্গকারী যদি সেই পশু কারো নিকট বিক্রয় করে কিংবা অন্য কাউকে দান করে দেয়, তবে ক্রেতা ও দানগ্রহীতার জন্য সেটি হালাল হবে। পৌত্তলিক সমাজের অনেকেই মন্দির বা দেব-দেবীর নামে পশু-পাখি উৎসর্গ করে সেগুলো পূজারী বা সেবায়েতদের হাতে তুলে দেয়। সেবায়েতরা সেসব পশু বিক্রয় করে থাকে। এরূপ পশু ক্রয় করা সম্পূর্ণ হালাল।

এক শ্রেণীর কুসংস্কারগ্রস্ত মুসলমানকেও পীর-বুযুর্গের মাযারে ছাগল-মুরগী ইত্যাদি ছেড়ে আসতে দেখা যায়। মাযারের খাদেমরাই সাধারণত উৎসর্গিত সেসব জন্তু ভোগ-দখল করে থাকে। যেহেতু মূল মালিক খাদেমগণের হাতে এগুলো ছেড়ে যায় এবং এগুলোর ব্যাপারে খাদেমদের পূর্ণ ইখতিয়ার থাকে, সেহেতু এ শ্রেণীর জীবজন্তু ক্রয় করা, যবেহ করে খাওয়া, বিক্রয় করে লাভবান হওয়া সম্পূর্ণ হালাল।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে মানত সম্পর্কিত মাস'আলা ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে কোন কিছুর নামে জীব-জানোয়ার উৎসর্গ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো একটি মাস'আলা হচ্ছে পৌত্তলিকদের দেব-দেবী এবং কোন কোন অজ্ঞ মুসলমান কর্তৃক পীর-বুযুর্গদের মাযার-দরগায় যেসব মিষ্টান্ন বা খাদ্যবস্তু মানত করা হয় বা সেসবের নামে উৎসর্গ করা হয়, সেগুলোতেও মূল কারণ—'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা সান্নিধ্য অর্জনের লক্ষ্য থাকে বলেই অধিকাংশ ফিক্‌হবিদ হারাম বলেছেন। আর এগুলো খাওয়া-পরা, অন্যকে খাওয়ানো এবং বেচাকেনা করাকেও হারাম বলা হয়েছে। বাহ্‌রুর-রায়েক প্রভৃতি ফিক্‌হর কিতাবে এ ব্যাপারে সবিস্তার বিবরণ রয়েছে। এই মাস'আলাটি উৎসর্গিত পশু-সংক্রান্ত মাস'আলার উপর কেয়াস করে গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্ষুধার আতিশয্যে নিরুপায় অবস্থার বিধি-বিধান ঃ উল্লিখিত আয়াতে চারটি বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর এর ব্যতিক্রমী বিধানও বর্ণনা করা হয়েছে। যথা—

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ - اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٠

এই হুকুমে এতটুকু অবকাশ রাখা হয়েছে যে, ক্ষুধার আতিশয্যে যে ব্যক্তি নিতান্তই অনন্যোপায় হয়ে পড়বে, সে যদি উল্লিখিত হারাম বস্তু থেকে কিছুটা খেয়েও নেয়, তবে তার কোন পাপ হবে না। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো এই যে, সে (১) স্বাদ গ্রহণের প্রতি আগ্রহী হবে না এবং (২) প্রয়োজনের পরিমাণ অতিক্রম করবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাকারী, মহা দয়ালু।

এখানে ক্ষুধার তাড়নায় মরণোন্মুখ ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার জন্য দু'টি শর্তে উল্লিখিত হারাম বস্তু নিতান্ত প্রয়োজন পরিমাণে খাওয়ার পাপকে তুলে দেওয়া হয়েছে।

শরীয়তের পরিভাষায় ক্ষুধার আতিশয্যে ব্যাকুল সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। সাধারণ কষ্ট কিংবা প্রয়োজনকে ব্যাকুলতা বলা হয় না। কাজেই যে লোক ক্ষুধার এমন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, তখন কোন কিছু না খেতে পারলে জীবন বিপন্ন হয়ে

পড়বে, তখন সে ক্ষেত্রে তার পক্ষে দু'টি শর্তে—এসব হারাম বস্তু খেয়ে নেওয়ার অবকাশ রয়েছে। একটি শর্ত হলো যে, উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র জান বাঁচানো বা প্রাণ রক্ষা করা, খাবার স্বাদ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য হবে না। দ্বিতীয়ত, সে খাবারের পরিমাণ এতটুকুতে সীমিত রাখবে, যাতে শুধু প্রাণটুকুই রক্ষা পেতে পারে, পেট ভরে খাওয়া কিংবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া তখনও হারাম হবে।

গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ এ ক্ষেত্রে কোরআন করীম মরণাপন্ন অবস্থায়ও হারাম বস্তু খাওয়াকে হালাল বা বৈধ বলেনি, বলেছে لا جناح عليه (তাতে তার কোন পাপ নেই)। এর মর্ম এই যে, এসব বস্তু তখনও যথারীতি হারামই রয়ে গেছে, কিন্তু যে লোক খাচ্ছে তার অনন্যোপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে হারাম খাদ্য গ্রহণের পাপ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কোন বস্তুর হালাল হওয়া আর গোনাহ মাফ হয়ে যাওয়া এক কথা নয়, এ দু'য়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ক্ষুধার তাড়নায় অনন্যোপায় লোকদের জন্য যদি এসব বস্তু হালাল করে দেওয়া উদ্দেশ্য হতো, তাহলে হারাম বা অবৈধতাকে রহিত করে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখানে 'তার কোন পাপ নেই' কথাটি যোগ করে দেওয়া হয়েছে। এতে এই তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হারাম হওয়ার বিষয়টি যথাস্থানে বহাল রয়েছে এবং সেটি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার যে পাপ তাও পূর্বের মতোই বলবৎ রয়েছে। তবে অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য হারাম বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে মাত্র।

অনন্যোপায় অবস্থায় ঔষধ হিসাবে হারাম বস্তুর ব্যবহার ঃ উপরোক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, কারো জীবন বিপন্ন হয়ে পড়লে সে ঔষধ হিসাবে হারাম বস্তু ব্যবহার করতে পারে। তবে আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ীই এ ব্যাপারেও কিছু শর্ত রয়েছে বলে মনে হয়। প্রথমত, প্রকৃতই অনন্যোপায় এবং জীবন-সংশয়ের মত অবস্থা হতে হবে। সাধারণ কষ্ট বা রোগব্যাধির ক্ষেত্রে এ নির্দেশ কার্যকর হবে না। দ্বিতীয়ত, হারাম বস্তু ছাড়া অন্য কোন কিছুই যদি এ রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে কার্যকর না হয় কিংবা যদি পাওয়া না যায়। কঠিন ক্ষুধার সময়ও অবকাশ এমন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যখন প্রাণ রক্ষা করার মত আর অন্য কোন হালাল খাবার না থাকে কিংবা সংগ্রহ করার কোন ক্ষমতা না থাকে। তৃতীয়ত, সে হারাম বস্তু গ্রহণে যদি প্রাণ রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত হয়। ক্ষুধার তাড়নায় অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য যেমন এক লোকমা হারাম মাংস খেয়ে নেওয়া সাধারণত তার প্রাণ রক্ষার নিশ্চিত উপায়। যদিও কোন ঔষধ এমন হয় যে, তার ব্যবহার উপকারী বলে মনে হয় বটে, কিন্তু তাতে তার সুস্থতা নিশ্চিত নয়, তাহলে এমতাবস্থায় সে হারাম ঔষধের ব্যবহার উল্লিখিত আয়াতের ব্যতিক্রমী হুকুমের আওতায় জায়েয হবে না। এছাড়া এতে আরও দু'টি শর্ত কোরআনের আয়াতে উল্লিখিত রয়েছে যে, তার ব্যবহারে কোন উপভোগ যেন উদ্দেশ্য না হয় এবং যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করা না হয়।

উল্লিখিত আয়াতের পরিষ্কার বর্ণনা ও ইঙ্গিতসমূহের দ্বারা যেসব শর্ত ও বাধ্যবাধকতার বিষয়ে জানা যায়, সে সমস্ত শর্তসাপেক্ষে যাবতীয় হারাম ও নাপাক ঔষধের ব্যবহার তা খাবারই হোক কিংবা বাহ্যিক ব্যবহারেরই হোক সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ফিক্‌হবিদগণের ঐকমত্যে জায়েয। এ সমস্ত শর্তের সারমর্ম হলো পাঁচটি বিষয় ঃ

(১) অবস্থা হবে অনন্যোপায়। অর্থাৎ প্রাণনাশের আশংকা সৃষ্টি হলে, (২) অন্য কোন হালাল ঔষধ যদি কার্যকর না হয় কিংবা পাওয়া না যায়, (৩) এই ঔষধের ব্যবহারে আরোগ্য লাভ যদি নিশ্চিত হয়, (৪) এর ব্যবহারে যদি কোন আনন্দ উদ্দেশ্য না হয়, এবং (৫) প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করা না হয়।

অনন্যোপায় অবস্থা ব্যতীত সাধারণ চিকিৎসা ও ঔষধে হারাম বস্তুর ব্যবহার ঃ অনন্যোপায় অবস্থা সংক্রান্ত মাস'আলাটি তো উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে কোরআনের স্পষ্ট আয়াত ও ওলামাগণের ঐকমত্যে প্রমাণিত হয়ে গেল, কিন্তু সাধারণ রোগ-ব্যাধিতেও না-পাক ও হারাম ঔষধ ব্যবহার করা জায়েয কিনা, এ মাস'আলার ব্যাপারে ফকীহ্গণের মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ ফকীহ্র মতে অনন্যোপায় অবস্থা এবং উল্লিখিত শর্তাশর্তের অবর্তমানে কোন হারাম বস্তু ঔষধরূপে ব্যবহার জায়েজ নয়। কারণ, হাদীসে রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্ ঈমানদারদের জন্য কোন হারামের মধ্যে আরোগ্য রাখেন নি।" —(বুখারী)

অপরাপর কোন কোন ফকীহ্ হাদীসে উদ্ধৃত এক বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে একে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনাটি হলো ওরায়নাবাসিগণের, যা সমস্ত হাদীস গ্রন্থেই উদ্ধৃত রয়েছে। তা হলো এই যে, এক সময় কিছু সংখ্যক গ্রাম্য লোক মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তারা ছিল বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। মহানবী (সা) তাদেরকে উষ্ট্রীর দুধ ও মূত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন, যাতে তারা আরোগ্য লাভ করেছিল।

কিন্তু এ ঘটনায় এমন কতিপয় সম্ভাব্যতা বিদ্যমান, যাতে হারাম বস্তুর ব্যবহারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। কাজেই সাধারণ রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে অনন্যোপায় অবস্থা এবং শর্তসমূহের উপস্থিতি ছাড়া হারাম ঔষধ ব্যবহার না করাই হচ্ছে আসল হুকুম।

কিন্তু পরবর্তী যুগের ফকীহ্গণ বর্তমান যুগে হারাম ও নাপাক ঔষধপত্রের আধিক্য এবং সাধারণ অভ্যাস ও জনগণের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে অন্য কোন হালাল ও পবিত্র ঔষধ এ রোগের জন্য কার্যকর নয় কিংবা পাওয়া না যাওয়ার শর্তে তা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

كما فى الدر المختار قبيل فصل البير اختلف فى التداوى بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما فى رضاع البحر ولكن نقل المصنف ثم وههنا عن الحاوى قيل يرخص اذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء اخر كما رخص فى الخمر للعطشان وعليه الفتوى . ومثله فى العالمگيريه .

অর্থাৎ—দুররে-মুখতার গ্রন্থের 'বি'র' বা কূপ-সংক্রান্ত পরিচ্ছদের পূর্বে উল্লেখ রয়েছে যে, হারাম বস্তু-সামগ্রী ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করার প্রশ্নে মতবিরোধ রয়েছে। সাধারণভাবে শরীয়ত অনুযায়ী উহা নিষিদ্ধ। যেমন, 'বাহ্রোর-রায়েক' গ্রন্থের স্তন্যদান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদেও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু 'তানবীর' রচয়িতা এক্ষেত্রে স্তন্যদান সম্পর্কেও 'হাবী কুদসী' থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, কোন কোন ওলামা ঔষধ ও চিকিৎসার জন্য হারাম বস্তু সামগ্রীর ব্যবহারকে এই শর্তে জায়েয বলেছেন যে, সে ঔষধের ব্যবহারে আরোগ্য লাভ সাধারণ ধারণায় নিশ্চিত হতে হবে এবং কোন হালাল ঔষধও তার বিকল্প হিসাবে যদি না থাকে। যেমন, একান্ত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির জন্য মদের এক ঘোট পান করে জীবন রক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একই অভিমত আলমগিরিতেও ব্যক্ত করা হয়েছে।

মাসআলা ঃ উল্লিখিত বিশ্লেষণে সে সমস্ত বিলেতী ঔষধপত্রের হুকুমও জানা গেল, যা ইউরোপ প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানী হয়ে আসে এবং যাতে শরাব, এ্যালকোহল কিংবা অপবিত্র বস্তুর উপস্থিতি জানাও নিশ্চিত। বস্তুত যেসব ঔষধে হারাম ও নাপাক বস্তুর উপস্থিতি সন্দিগ্ধ, তার ব্যবহারে আরও অধিকতর অবকাশ রয়েছে। অবশ্য সতর্কতা উত্তম। বিশেষত যখন কোন কঠিন প্রয়োজন থাকে না তখন সতর্কতা অবলম্বন করাই কর্তব্য।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

(১৭৪) নিশ্চয় যারা গোপন করে, কিতাবে যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন এবং সেজন্য গ্রহণ করে অল্প মূল্য, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (১৭৫) এরাই হলো সে সমস্ত লোক, যারা খরিদ করেছে হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী এবং (খরিদ করেছে) ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে আযাব। অতএব, তারা দোযখের উপর কেমন ধৈর্য ধারণকারী! (১৭৬) আর এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন। আর যারা কিতাবের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে, নিশ্চিতই তারা জেদের বশবর্তী হয়ে অনেক দূরে গেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এর পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব হারাম বস্তু-সামগ্রীর আলোচনা করা হয়েছিল, যেগুলো ছিল স্থূল বস্তু সম্পর্কিত যা ধরা-ছোঁয়া বা অনুভব করা যায়। পরবর্তীতে এমন কতকগুলো হারাম বিষয়ের আলোচনা করা হচ্ছে, যেগুলো ধরা-ছোঁয়ার মত স্থূল বস্তু নয়। সেগুলো হচ্ছে কতকগুলো গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কিত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য মন্দ কাজ। যেমন, ইহুদী আলেমদের মাঝে একটি রোগ ছিল যে, তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে তাদের মনমত ভুল ফতোয়া দিত, এমনকি তাওরাতের আয়াতসমূহকেও বিকৃত করে তাদের মতলবমত বানিয়ে দিয়ে দিত। এ ক্ষেত্রে উম্মতে-মুহাম্মদীর আলেমদের জন্যও সতর্কতা বিদ্যমান, তারা যেন এহেন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকেন। রিপুর কামনা-বাসনা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে যেন সত্য বিধি-বিধান প্রকাশে ত্রুটি না করেন।

ধর্মকে বিক্রি করার শাস্তি ঃ এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত কিতাবের বিষয়বস্তুকে যেসব লোক গোপন করে এবং এহেন খেয়ানতের বিনিময়ে সামান্য (পার্থিব) সম্পদ আদায় করে, তারা নিজেদের উদরকে আগুনের দ্বারাই ভর্তি করে চলছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন না তাদের সাথে (সদয়ভাবে) কথা বলবেন, আর নাইবা (তাদের পাপ মোচন করে) তাদেরকে পবিত্রতা দান করবেন। বস্তুত তাদের শাস্তি হবে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এরা এমন সব লোক, যারা (দুনিয়াতে তো) হেদায়েত পরিহার করে পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করছেই, (তদুপরি আখেরাতের) মাগফেরাত পরিত্যাগ করে (নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে) আযাব। অতএব, (তাদের দোযখে গমনের সৎসাহসকে ধন্যবাদ) কতই না সাহসী এরা। বস্তুত (উল্লিখিত সমস্ত) আযাব (তাদের উপর এজন্য এসেছে) যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ কিতাবকে সঠিকভাবেই পাঠিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে যেসব লোক (এমন যথার্থভাবে প্রেরিত গ্রন্থে) পথভ্রষ্টতা (আরোপ) করে, (তারা যে,) অতি সুদূরপ্রসারী বিরোধিতায় লিপ্ত (হবে, তা বলাই বাহুল্য। আর এমন বিরোধিতার দরুন অবশ্যই তারা কঠিন শাস্তির যোগ্য হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মাস'আলা ঃ আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের লোভে শরীয়তের হুকুম-আহ্কামকে পরিবর্তিত করে এবং তার বিনিময়ে যে হারাম ধন-সম্পদ খায়, তা যেন সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরছে। কারণ, এ কাজের পরিণতি তা-ই। কোন কোন বিজ্ঞ আলেমের মতে প্রকৃতপক্ষে হারাম মাল বা ধন-সম্পদ সবই দোযখের আগুন। অবশ্য তা যে আগুন, সেকথা পার্থিব জীবনে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু মৃত্যুর পর তার সে কর্মই আগুনের রূপ ধরে উপস্থিত হবে।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ
عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ
وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ
بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ
الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

(১৭৭) সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ্র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশ্তাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলদের উপর, আর ব্যয় করবে সম্পদ তাঁরই মুহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিস্কীন মুসাফির এবং ভিক্ষুকদের জন্য এবং মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং বিপদাপদে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণকারী, তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার।

বয়ানুল কোরআন থেকে উদ্ধৃত যোগসূত্র ঃ শুরু থেকে এ পর্যন্ত সূরা বাকারার প্রায় অর্ধেক। এ পর্যন্ত আলোচনার বেশীর ভাগেরই লক্ষ্য ছিল 'মুনকের' সম্প্রদায়। কারণ, সর্বাগ্রে কোরআন-করীমের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে তার মান্যকারী ও অমান্যকারী সম্প্রদায়ের আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর 'তওহীদ' বা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ প্রমাণ করা হয়েছে। তারপর وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهٖمَ আয়াত পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তানদের প্রতি যে অনুগ্রহ ও নিয়ামতসমূহ দেওয়া হয়েছে তা বিবৃত করা হয়েছে। সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে কেবলা সংক্রান্ত আলোচনা। আর তার সমাপ্তি টানা হয়েছে 'সাফা' ও 'মারওয়ার' আলোচনার মাধ্যমে।

অতঃপর তওহীদ প্রমাণ করার পর শিরকের মূল ও শাখা-প্রশাখাগুলোর খণ্ডন করা হয়। বলা বাহুল্য, এ সমস্ত বিষয় মুনকেরীনদের প্রতিই তাম্বীহ ছিল অধিক। আর প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন ব্যাপারে মুসলমানদেরও সম্বোধন করা হয়েছে।

এখন সূরা বাক্বারার প্রায় মধ্যবর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানগণকে মৌলিক সৎকর্মসমূহ ও আনুষঙ্গিক নীতিমালার শিক্ষা দানই মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে অমুসলিমদের প্রতিও সম্বোধন থাকতে পারে। আর এ বিষয়টি সূরার শেষ পর্যন্তই ব্যাপ্ত। বিষয়টি আরম্ভ করা হয়েছে بِرّ (বির্‌রুন) সংক্ষিপ্ত শিরোনামে। তা' হলো 'বা' বর্ণের মধ্যে 'যের' স্বরচিহ্নক্রমে بِرّ (বির্‌রুন) শব্দের সাধারণ অর্থ হয় মঙ্গল, যা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় ইবাদত ও সৎকাজেই ব্যাপক। বস্তুত এভাবে প্রাথমিক আয়াতগুলোতে একটি শব্দের মাধ্যমে সামগ্রিক ও নীতিগত বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন, কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, ধন-সম্পদ দান করা, ওয়াদা পালন, বিপদে ধৈর্যধারণ প্রভৃতি। এতে সমগ্র কোরআনী বিধি-বিধানের মৌলিক নীতিগুলো এসে গেছে। কারণ, শরীয়তের সমগ্র আহ্কাম বা বিধি-বিধানের সারনির্যাস হলো তিনটি ঃ (১) আকায়েদ বা বিশ্বাস, (২) 'আমাল বা আচার-আচরণ ও কাজকর্ম, (৩) চরিত্র। আর বাকি যা কিছু, সবই হলো এগুলোর শাখা-প্রশাখা এবং এই তিনটির অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের বিশেষ বিশেষ দিকগুলোও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

পরবর্তীতে بِرّ-এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাতে প্রসঙ্গক্রমে স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদানুযায়ী শরীয়তের বহু বিধি-বিধান যথা—কিসাস, ওসীয়ত, রোযা, নামায, জিহাদ, হজ্জ, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, ঋতুস্রাব, ঈলা, কসম খাওয়া, তালাক, বিয়ে-শাদী, ইদ্দত, মোহরানা, জিহাদের পুনরালোচনা, আল্লাহ্র কাজে ব্যয় করা, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কোন কোন বিষয় এবং সাক্ষ্যদান প্রভৃতি বিষয় প্রয়োজনানুযায়ী আলোচনা করে ওয়াদা, সুসংবাদ, রহমত ও ক্ষমা সংক্রান্ত আলোচনায় সমাপ্তি টানা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ্! কি চমৎকার সুবিন্যস্ত ধারাবাহিকতা !

যা হোক, যেহেতু এ সমস্ত বিষয়ের মুখ্যই হলো بـر বা কল্যাণ,কাজেই সামগ্রিকভাবে এ আলোচ্য বিষয়টিকে ابـواب الـبر বা কল্যাণ-পরিচ্ছেদ নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কল্যাণ পরিচ্ছেদ ঃ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়ানোতেই সকল পুণ্য সীমিত নয়। আসল পুণ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি (সত্তা ও সকল গুণাবলীসহ) ঈমান (দৃঢ় আস্থা) পোষণ করা এবং (একইভাবে) কিয়ামতের (আগমন) সম্পর্কে এবং ফেরেশ্তাগণের প্রতি (যে, তাঁরা আল্লাহ্র অনুগত বান্দা, নূরের সৃষ্টি, নিষ্পাপ মাসুম, খাদ্য-পানীয় এবং মানবীয় কাম প্রভৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত) এবং (সমগ্র আসমানী) কিতাবের প্রতি এবং (সমগ্র) পয়গম্বরগণের প্রতিও। এবং (পুণ্যবান সেই ব্যক্তি যে মাল-সম্পদ দেয় আল্লাহ্র মহব্বতে (অভাবী) আত্মীয়-স্বজন এবং (অসহায়) ইয়াতীমদেরকে (অর্থাৎ যেসব শিশুকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক রেখে পিতার মৃত্যু হয়েছে) এবং (অন্যান্য দরিদ্র) মুখাপেক্ষীগণকেও এবং (পাথেয়হীন) মুসাফিরকে আর (অনন্যোপায়) সাহায্যপ্রার্থীদেরকে এবং (কয়েদী ও ক্রিতদাসদের) মুক্ত করার জন্য। এবং (সে ব্যক্তি) নিয়মিত নামায পড়ে এবং (নির্ধারিত পরিমাণ) যাকাতও প্রদান করে। এবং যেসব লোক (উপরোক্ত আমল ও আখলাকের সাথে সাথে) স্ব স্ব অঙ্গীকারও পূরণ করে থাকে, যখন কোন (বৈধ ব্যাপারে) অঙ্গীকার করে। আর (এসব গুণের পর বিশেষভাবে) যেসব লোক ধীরচিত্ত হয় অভাবে পতিত হলে, (দ্বিতীয়ত) রোগাক্রান্ত হলে (তৃতীয়ত) (কাফিরদের মোকাবেলায়) তুমুল যুদ্ধেও (অর্থাৎ এমতাবস্থাতেও যারা অস্থিরচিত্ত কিংবা হিম্মতহারা হয় না) সেসব লোকই (পরিপূর্ণতার গুণে গুণান্বিত) সত্যপন্থী এবং এসব লোকই (প্রকৃত) মোত্তাকী (নামে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য। মোটকথা দীনের প্রকৃত লক্ষ্য এবং পরিপূর্ণতা হচ্ছে উপরোক্ত আমলসমূহ। নামাযের মধ্যে বিশেষ একদিকে মুখ করে দাঁড়ানোও সে সমস্ত মহত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে বিশেষ একটি। কেননা, কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো নামায কায়েম করার শর্তাবলীর অন্তর্গত। সুতরাং সুষ্ঠুভাবে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানোর দ্বারা নামাযে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। অন্যথায়, যদি নামাযই না হতো তবে কোন বিশেষ দিকের প্রতি রুখ করে দাঁড়ানো ইবাদত বলেই গণ্য হতো না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমানদের কিবলা যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে পরিবর্তিত করে বায়তুল্লাহ্র দিকে নির্ধারণ করা হলো, তখন ইহুদী, খৃষ্টান, পৌত্তলিক প্রভৃতি যারা সর্বদা মুসলমানদের মধ্যে ত্রুটি তালাশ করার ফিকিরে থাকতো, তারা তৎপর হয়ে উঠলো এবং নানাভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও ইসলামের প্রতি অবিরামভাবে নানা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতে শুরু করল। এসব প্রশ্নের জবাব পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

আলোচ্য একটি আয়াতে একটা বিশেষ বর্ণনাভঙ্গীর মাধ্যমে এ বিতর্কের মধ্যে যতি টেনে দেওয়া হয়েছে, যার সারমর্ম হচ্ছে, নামাযে পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে কি পশ্চিম দিকে—এ বিষয়টা নির্ধারণ করাই যেন তোমরা দীনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছ এবং এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই তোমাদের সকল আলোচনা-সমালোচনা আবর্তিত হতে শুরু করেছে। মনে হয়, তোমাদের ধারণায় শরীয়তের অন্য কোন হুকুম-আহকামই যেন আর নেই।

অন্য অর্থে এ আয়াতের লক্ষ্য মুসলমান, ইহুদী, নাসারা নির্বিশেষে সবাই হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, প্রকৃত পুণ্য বা নেকী আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের মধ্যে নিহিত। যে দিকে রুখ করে তিনি নামাযে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন সেটাই শুদ্ধ ও পুণ্যের কাজে পরিণত হয়ে যায়। অন্যথায়, দিক হিসাবে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের কোনই বৈশিষ্ট্য নেই। দিক বিশেষের সাথে কোন পুণ্যও সংশ্লিষ্ট নয়। পুণ্য একান্তভাবেই আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য করার সাথে সম্পৃক্ত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যতদিন বায়তুল-মুকাদ্দাসের প্রতি রুখ করে নামায পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন, ততদিন সেদিকে রুখ করাতেই পুণ্য ছিল। আবার যখন মসজিদুল হারামের দিকে রুখ করে দাঁড়ানোর হুকুম হয়েছে, তখন এ হুকুমের আনুগত্য করাই পুণ্যে পরিণত হয়েছে।

আয়াতের যোগসূত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতটি থেকে সূরা বাক্বারার একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এ অধ্যায়ে মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে তালীম ও হেদায়েত প্রদানই মুখ্য লক্ষ্য। প্রসঙ্গত বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবও দেওয়া হয়েছে। সেমতে আলোচ্য এ আয়াতটিকে ইসলামের বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবহ আয়াত বলে অভিহিত করা যায়।

অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আলোচ্য এ আয়াতে ই'তিকাদ বা বিশ্বাস, ইবাদত, মোয়ামালাত বা লেনদেন এবং আখলাক সম্পর্কিত বিধি-বিধানের মূল নীতিসমূহের আলোচনা মোটামুটিভাবে এসে গেছে। প্রথম বিষয় ঃ ইতিকাদ বা মৌল বিশ্বাস সম্পর্কিত আলোচনা مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ শীর্ষক আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইবাদত এবং মোয়ামালাত সম্পর্কিত। তার মধ্যে ইবাদত সম্পর্কিত আলোচনা وَاٰتَى الزَّكٰوةَ পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে। অতঃপর মোয়ামালাতের আলোচনা وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ শীর্ষক আয়াতে করা হয়েছে। এরপর আখলাক সম্পর্কিত আলোচনা وَالصّٰبِرِيْنَ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

সবশেষে বলা হয়েছে যে, সত্যিকার মু'মিন ঐ সমস্ত লোক, যারা সে সমস্ত নির্দেশাবলীর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে এবং এ সমস্ত লোককেই প্রকৃত মোত্তাকী বলা যেতে পারে।

এ সমস্ত নির্দেশ বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক উন্নত বর্ণনাভঙ্গী এবং সালঙ্কার ইশারা-ইঙ্গিত ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, সম্পদ ব্যয় সম্পর্কিত নির্দেশটির সঙ্গে عَلٰى حُبِّهٖ অর্থাৎ তাঁর মহব্বতে কথাটি শর্ত হিসেবে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এতে তিন ধরনের অর্থ হওয়া সম্ভব। প্রথমত حُبِّهٖ শব্দের শেষে সংযুক্ত ه সর্বনামটি যদি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ধরা যায়, তবে অর্থ দাঁড়াবে, তার সেই সম্পদ ব্যয় করার পেছনে কোন আত্মস্বার্থ, নাম-যশ অর্জন প্রভৃতির উদ্দেশ্যের লেশমাত্রও থাকে না। বরং পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতই হয় এ ব্যয়ের পেছনে মূল প্রেরণা।

দ্বিতীয়ত, সর্বনামটি যদি ধন-সম্পদের প্রতি সম্পর্কযুক্ত ধরা হয়, তবে অর্থ হবে—আল্লাহ্র রাস্তায় ঐ সম্পদ ব্যয় করাই পুণ্যের কাজ, যে ধন-সম্পদ তার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। ফেলে দেওয়ার মত বেকার বস্তু কাউকে দিয়ে সে দানকে সাদকা মনে করা প্রকৃত প্রস্তাবে 'সাদকা'

নয়, যদিও ফেলে দেওয়ার চাইতে অন্যের কাজে লাগতে পারে—এ ধারণায় কাউকে দিয়ে দেওয়াই উত্তম।

তৃতীয়ত, যদি সর্বনামকে اٰتٰى শব্দের দিকে সম্পর্কযুক্ত ধরা হয়, তবে অর্থ হবে, সম্পদ ব্যয় করার সময় মানসিক সন্তুষ্টি ও আন্তরিকতার সাথে তা ব্যয় করে ; ব্যয় করার সময় অন্তরে কষ্ট অনুভূত হয় না।

ইমাম জাস্সাস বলেন, আয়াতের উপরোক্ত তিনটি অর্থই নেওয়া যেতে পারে। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে প্রথম ধন-সম্পদ ব্যয় করার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ খাত বর্ণনা করে পরে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এ দু'টি খাত যাকাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথমেই এ দু'টি খাতের কথা বর্ণনা করার পরে যাকাতের কথা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, সাধারণত মানুষ আলোচ্য দু'টি খাতে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কুণ্ঠাবোধ করে, কিন্তু তা উচিত নয়। শুধু যাকাত প্রদান করেই সম্পদের যাবতীয় হক পূরণ হয়ে গেল বলে ধারণা করে।

মাস'আলা ঃ এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গীর দ্বারাই এ তথ্যও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, ধন-সম্পদের ফরয শুধু যাকাত প্রদানের মাধ্যমেই পূর্ণ হয় না, যাকাত ছাড়া আরও বহু ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা ফরয ও ওয়াজিব হয়ে থাকে। (জাস্সাস, কুরতুবী)

যেমন, রুযী-রোযগারে অক্ষম আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কারো সামনে যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়, তবে যাকাত প্রদান করার পরেও সে দরিদ্রের জীবন রক্ষার্থে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ফরয হয়ে পড়ে।

অনুরূপ, যেসব স্থানে প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মসজিদ তৈরি করা এবং দীনি শিক্ষার জন্য মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করাও আর্থিক ফরযের অন্তর্গত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যাকাতের একটা বিশেষ বিধান রয়েছে, সে বিধান অনুযায়ী যে কোন অবস্থায় যাকাত প্রদান করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য খরচের বেলায় প্রয়োজন দেখা দেওয়া শর্ত। যেখানে প্রয়োজন রয়েছে সেখানে খরচ করা ফরয, যদি প্রয়োজন দেখা না দেয়, তবে খরচ করাও ফরয হবে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ নিকটাত্মীয়, মিসকীন, মুসাফির, দরিদ্র প্রার্থী প্রভৃতি সম্পর্কে যাদের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে, তাদের কথা একসাথে বর্ণনা করার পর— وَفِى الرِّقَابِ-এর মধ্যে فِى শব্দটি যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অন্যের মালিকানাভুক্ত ক্রীতদাসদেরকে সম্পদের মালিক বানানো উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করাই এখানে লক্ষ্য।

এরপর اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ অর্থাৎ—নামায কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করার কথা পূর্ববর্তী অন্যান্য বিধান সম্পর্কিত বর্ণনার মতই বলা হয়েছে।

অতঃপর পূর্ববর্তী বর্ণনাভঙ্গী পরিবর্তন করে অতীতকাল বাচক শব্দের স্থলে وَالْمُوْفُوْنَ بِالْعَهْدِ বাক্যটি ইসমে ফায়েল (কারক পদ) ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মু'মিন ব্যক্তির মধ্যে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার অভ্যাস সব সময়ের জন্য থাকতে হবে, ঘটনাচক্রে কখনো কখনো অঙ্গীকার পূরণ করলে চলবে না। কেননা, এরূপ মাঝে-মধ্যে কাফির-গোনাহ্গাররাও ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরণ করে থাকে। সুতরাং এটা ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না।

তেমনিভাবে মোয়ামালাতের বর্ণনায় শুধু অঙ্গীকার পূরণ করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়, অংশীদারিত্ব, ভাড়া-ইজারা প্রভৃতি বৈষয়িক দিকের সুষ্ঠুতা ও পবিত্রতাই অঙ্গীকার পূরণের উপর নির্ভরশীল।

এরপরই আখলাক বা মন-মানসিকতার সুস্থতা বিধান সম্পর্কিত বিধি-বিধানের আলোচনায় একমাত্র 'সবর'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, সবর-এর অর্থ হচ্ছে মন-মানসিকতা তথা নফসকে বশীভূত করে অন্যায়-অনাচার থেকে সর্বতোভাবে সুরক্ষিত রাখা। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, মানুষের হৃদয়-বৃত্তিসহ অভ্যন্তরীণ যত আমল রয়েছে, সবরই সেসবের প্রাণস্বরূপ। এরই মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায় ও কদাচার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়।

বর্ণনাভঙ্গীর আরো একটি পরিবর্তন এখানে লক্ষণীয়। পূর্ববর্তী বাক্যে وَالْمُوْفُوْنَ বলার পর এখানে وَالصّٰبِرُوْنَ না বলে وَالصّٰبِرِيْنَ বলা হয়েছে। মুফাস্সিরগণ বলেন, এখানে مدح বা প্রশংসা কথাটা উহ্য রাখার ফলেই এ'রাবে এ পরিবর্তন এসেছে। তাঁদের পরিভাষায় একে বলা হয় نصب على المدح এখানে صٰبِرِيْنَ কথাটা মফঊল বা কর্ম হয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়ায় যে, যাঁরা উপরোক্ত সৎকর্ম সম্পাদন করেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রশংসার যোগ্য হলেন সবরকারীগণ। কেননা, সবরই এমন এক শক্তি ও যোগ্যতা, যদ্দ্বারা উপরোক্ত সব সৎ কাজেই সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

এমনিভাবে আলোচ্য আয়াত ক'টিতে যেমন দীনের গুরুত্বপূর্ণ সব বিধানের মূলনীতি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, তেমনিভাবে অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রত্যেকটি বিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও স্তরবিন্যাস করে দেওয়া হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢ
بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ
فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۸﴾ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ
يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۹﴾

(১৭৮) হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে 'কিসাস' গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেওয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি

বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (১৭৯) হে বুদ্ধিমানগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে উত্তম চরিত্র ও সৎকর্মাবলীর মূলনীতি আলোচনা করা হয়েছে। এরপর সে সমস্ত সৎ কার্যাবলীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে। অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে একেকটি বিষয়ের স্বতন্ত্র বর্ণনাও দেওয়া হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি কিসাস (আইন)-এর ফরয করা হয়েছে (ইচ্ছাকৃতভাবে) যাদের হত্যা করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে। (প্রত্যেক) স্বাধীন ব্যক্তি (মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে) নিহত স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, (এমনিভাবে প্রত্যেক) দাস (নিহত) দাসের বিনিময়ে এবং (অনুরূপভাবে প্রতিটি) স্ত্রীলোক (নিহত) স্ত্রীলোকের বদলায়। (হত্যাকারী যদি বড় পদমর্যাদাসম্পন্ন এবং নিহত ব্যক্তি যদি ছোটও হয়, তবুও প্রত্যেকের তরফ থেকে সমান কিসাস বা বদলা নেওয়া হবে। অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যার দণ্ডস্বরূপ হত্যা হরা হবে) অবশ্য যদি (হত্যাকারীকে) তার প্রতিপক্ষের তরফ থেকে কিছুটা মাফ করে দেওয়া হয় (কিন্তু পুরোপুরিভাবে মাফ করা না হয়) তবে (সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেতে পারে। কিন্তু রক্তের বদলাস্বরূপ 'দিয়াত' অর্থাৎ নির্ধারিত পরিমাণ আর্থিক জরিমানা হত্যাকারীর উপর ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় উভয় পক্ষের উপরই দু'টি বিষয় লক্ষ্য রাখা জরুরী। প্রথমত নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের পক্ষে সঙ্গত উপায়ে (সে মালের) দাবি পূরণ করবে (অর্থাৎ ক্ষমার পর আর হত্যাকারীকে অতিরিক্ত বিব্রত করবে না) এবং (ভালভাবে নির্ধারিত অর্থ) তার (বাদীর নিকট পৌঁছে দেবে অর্থাৎ পরিমাণে যেন কম না দাও কিংবা অনর্থক যেন টালবাহানা না কর।) এটা (ক্ষমা ও ক্ষতিপূরণ দানের বিধান—) তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে (শাস্তির ক্ষেত্রে) সহজ পন্থা এবং (বিশেষ) অনুগ্রহ। (অন্যথায়, মৃত্যুদণ্ড ভোগ করা ছাড়া আর কোন পন্থাই থাকতো না)। অতঃপর যে ব্যক্তি এর (এ বিধানের) পর সীমালংঘনের অপরাধে অপরাধী হয় (যেমন কারো প্রতি হত্যার মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে অথবা ক্ষমা করে দেওয়ার পরও প্রতিশোধ গ্রহণ করার চেষ্টা করে, আখিরাতে) সে লোকের অত্যন্ত কঠিন শাস্তি হবে। জেনে রেখ, কিসাসের (এই বিধানের) মাঝে তোমাদের জীবনের বিশেষ নিরাপত্তা রয়েছে। (কেননা, এই কঠোর আইনের ভয়ে হত্যার অপরাধ সংঘটন করতে গিয়ে মানুষ ভয় পাবে। এতে বহু জীবন রক্ষা পাবে)। আশা করা যায়, তোমরা (এমন শাস্তির আইন লংঘন করার ব্যাপারে) সাবধানতা অবলম্বন করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قِصَاصٌ (কিসাসুন)-এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ অন্যের প্রতি যতটুকু জুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ তার পক্ষে জায়েয। এর চাইতে বেশি কিছু করা জায়েয নয়। এ সূরারই পরবর্তী এক আয়াতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ٠

অনুরূপ সূরা নাহ্‌লের শেষ আয়াতে রয়েছে ঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۔

এতে আলোচ্য বিষয়েই আরো বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। সেমতে শরীয়তের পরিভাষায় 'কিসাস' বলা হয় হত্যা এবং আঘাতের সে শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান করা হয়।

মাস'আলা ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয় কোন অস্ত্র কিংবা এমন কোন কিছুর দ্বারা হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করা, যার দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা হত্যা সংঘটিত হয়। 'কিসাস' অর্থাৎ 'জানের বদলায় জান' এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মাস'আলা ঃ এ ধরনের হত্যার অপরাধে যেমন স্বাধীন ব্যক্তির হত্যাকারী অন্য স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে, তেমনি কোন ক্রীতদাসের বদলায়ও স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। অনুরূপ স্ত্রীলোক হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ হত্যার অপরাধে স্ত্রীলোককেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

এ আয়াতে স্বাধীন ব্যক্তির বদলায় স্বাধীন ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকের বদলায় স্ত্রী লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার যে কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা সেই একটা বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, যে ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামী যমানার কিছু আগে দু'টি আরব গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী এক সংঘর্ষ ঘটে। এতে নারী-পুরুষ এবং স্বাধীন ও ক্রীতদাসসহ বহু লোক নিহত হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে এ বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই ইসলামী যমানা শুরু হয়ে যায় এবং এ দু'টি গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলাম গ্রহণ করার পর উভয় গোত্রের লোকেরা স্ব স্ব গোত্রের নিহত ব্যক্তিদের কিসাস গ্রহণ করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা শুরু করে। উভয়ের মধ্যে যে গোত্রটি প্রবল ছিল, তারা দাবি করে বসে, যে পর্যন্ত আমাদের নিহত নারী, পুরুষ ও ক্রীতদাসদের বদলায় তোমাদের এক একজন স্বাধীন পুরুষকে হত্যা করা না হবে, সে পর্যন্ত আমরা কোন মীমাংসায় সম্মত হব না। ওদের সে জাহিলিয়তসুলভ দাবির অসারতা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই এ আয়াত নাযিল হয়। —"স্বাধীন পুরুষের বদলায় স্বাধীন পুরুষ, গোলামের বদলায় গোলাম এবং নারীর বদলায় নারী" —এ বিধান দিয়ে ওদের সে দাবিকেই খণ্ডন করা হয়েছে যে, হত্যাকারী হোক আর নাই হোক একজন গোলামের বদলায় স্বাধীন পুরুষকে এবং একজন নারীর বদলায় পুরুষকে হত্যা করার এ দাবি গ্রহণীয় হতে পারে না। ইসলাম যে ন্যায়নীতির প্রবর্তন করেছে তাতে একমাত্র হত্যাকারীকে হত্যার বদলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। হত্যাকারী যদি নারী হয়ে থাকে, তবে তার বদলায় কোন নিরপরাধ পুরুষকে হত্যা করা কিংবা হত্যাকারী যদি গোলাম হয়ে থাকে, তবে তার বদলায় কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা এক বিরাট জুলুম ছাড়া আর কিছু নয়। এটা ইসলামী সমাজে কোন অবস্থাতেই সহ্য করা হবে না।

আয়াতের মর্মার্থ এটাই সাব্যস্ত হয় যে, যে ব্যক্তি হত্যা করেছে, কেবল সে-ই কিসাসে দণ্ডিত হবে। হত্যাকারী গোলাম বা স্ত্রীলোকের স্থলে নিরপরাধ স্বাধীন পুরুষকে দণ্ডিত করা জায়েয নয়।

অনুরূপ এটাও আয়াতের অর্থ নয় যে, যদি কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করে কিংবা কোন স্বাধীন ব্যক্তি কোন ক্রীতদাসকে হত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তবে কিসাসস্বরূপ তাকে হত্যা করা যাবে না। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে 'মৃতের ব্যাপারে কিসাস' শব্দের ব্যবহার এবং অন্য আয়াতে اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ। অর্থাৎ 'জানের বদলা জান' —বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

মাস'আলা ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেওয়া হয়— যেমন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস মাত্র দুই পুত্র, সে দু'জনেই যদি মাফ করে দেয়, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পূর্ণ মাফ না হয় অর্থাৎ উপরোক্ত ক্ষেত্রে এক পুত্র মাফ করে, কিন্তু অপর পুত্র তা না করে, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারী কিসাস-এর দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবে সত্য, কিন্তু এক পুত্রের দাবীর বদলায় অর্ধেক দিয়াত প্রদান করতে হবে।

শরীয়তের বিধানে হত্যার বদলায় যে দিয়াত বা অর্থদণ্ড প্রদান করতে হয়, তার পরিমাণ হচ্ছে মধ্যম আকৃতির একশ' উট অথবা এক হাজার দীনার কিংবা দশ হাজার দিরহাম। বর্তমানকালের প্রচলিত ওজন অনুপাতে এক দিরহাম—সাড়ে তিন মাসা রৌপ্যের পরিমাণ। সেমতে পূর্ণ দিয়াত-এর পরিমাণ হবে দু'হাজার নয়শ' তোলা আট মাসা রৌপ্য।

মাস'আলা ঃ কিসাস-এর আংশিক দাবি মাফ হয়ে গেলে যেমন মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হয়ে দিয়াত ওয়াজিব হয়, তেমনি উভয় পক্ষ যদি কোন নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে আপস-নিষ্পত্তি করে ফেলে, তবে সে অবস্থাতেও 'কিসাস' মওকুফ হয়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে, যা ফিকাহ্র কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

মাস'আলা ঃ নিহত ব্যক্তির যে ক'জন ওয়ারিস থাকবে, তাদের প্রত্যেকেই 'মীরাস'-এর অংশ অনুপাতে 'কিসাস' ও দিয়াত-এর মালিক হবে এবং দিয়াত হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ 'মীরাস'-এর অংশ অনুপাতে বন্টিত হবে। তবে কিসাস যেহেতু বন্টনযোগ্য নয়, সেহেতু ওয়ারিসগণের মধ্য থেকে যে কোন একজনও যদি কিসাস-এর দাবি ত্যাগ করে তবে আর তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না, বরং দিয়াত ওয়াজিব হবে এবং প্রত্যেকেই অংশ অনুযায়ী দিয়াতের ভাগ পাবে।

মাস'আলা ঃ 'কিসাস' গ্রহণ করার অধিকার যদিও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের, তথাপি নিজেরা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির বদলায় হত্যাকারীকে তারা নিজেরা হত্যা করতে পারবে না। এ অধিকার আদায় করার জন্য শাসন কর্তৃপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা, কোন্ অবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হয় এবং কোন্ অবস্থায় হয় না— এ সম্পর্কিত অনেক সূক্ষ্ম দিকও রয়েছে যা সবার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রাগের মাথায় বাড়াবাড়িও করে ফেলতে পারে, এজন্য আলেম ও ফিক্হবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী 'কিসাস'-এর হক আদায় করার জন্য ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে। —(কুরতুবী)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

(১৮০) তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধনসম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য ওসীয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে। পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু শোনেন ও জানেন। (১৮১) যদি কেউ ওসীয়ত শোনার পর তাতে কোন রকম পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করে তাদের উপর এর গোনাহ্ পতিত হবে। (১৮২) যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে আশঙ্কা করে পক্ষপাতিত্বের অথবা কোন অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন গোনাহ্ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

وصيت—শাব্দিক অর্থে যে কোন কাজ করার নির্দেশ প্রদানকে ওসীয়ত বলা হয়। পরিভাষায়, ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর পরে সম্পাদন করার জন্য মৃত্যুকালে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, তাকেই ওসীয়ত বলা হয়।

خير—শব্দের অনেকগুলো অর্থের মধ্যে এক অর্থ ধন-সম্পদ। যেমন, কোরআনে উল্লিখিত হয়েছে ঃ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ এখানে মুফাসসিরগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী خير অর্থ ধন-সম্পদ।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যতদিন পর্যন্ত ওয়ারিসগণের অংশ কোরআনের আয়াত দ্বারা নির্ধারিত হয়নি, ততদিন পর্যন্ত নিয়ম ছিল মৃত্যুপথযাত্রী তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসীয়ত করে যেতেন। অবশিষ্ট সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে বণ্টিত হতো। সে নির্দেশটিই এ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন ঃ

তোমাদের উপর ফরয করা হচ্ছে, যখন কারো (লক্ষণাদির দ্বারা) মৃত্যু নিকটবর্তী বলে মনে হয়, অবশ্য যদি সে কিছু সম্পদ পরিত্যক্ত হিসাবে রেখে যায় (নিজের) পিতামাতা ও (অন্যান্য) নিকট আত্মীয়ের জন্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে (মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশী যেন না হয়) কিছু যেন বলে যায় (এরই নাম ওসীয়ত) যাদের মধ্যে আল্লাহ্র ভয় রয়েছে তাদের

পক্ষে এটা জরুরী (করা হচ্ছে)। অতঃপর (যেসব লোক ওসীয়ত শুনেছে, তাদের মধ্য থেকে) যে কেউ সেটা (ওসীয়তের বিষয়বস্তু) পরিবর্তন করবে (এবং বন্টনের সময় মিথ্যা যবানবন্দী করে এবং তার সে যবানবন্দী অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতে যদি কারো কোন হক নষ্ট হয়) তবে সে (হক বিনষ্ট হওয়ার) গোনাহ্ তাদের উপরই পতিত হবে, যারা (বিষয়বস্তু) পরিবর্তন করবে (বিচারক, সালিস কিংবা মৃত ব্যক্তির কোন গোনাহ্ হবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তো নিশ্চিতই সবকিছু জানেন, শোনেন। (তিনি পরিবর্তনকারীর কারসাজি সম্পর্কেও জানেন, সালিস বিচারকগণ যে নির্দোষ একথাও জানেন।) তবে হ্যাঁ, (এক ধরনের পরিবর্তনের অনুমতি রয়েছে, তা হচ্ছে) যে ব্যক্তি ওসীয়তকারীর তরফ থেকে (ওসীয়তের ব্যাপারে) কোন ভুল সিদ্ধান্ত অথবা (ইচ্ছাকৃতভাবে ওসীয়ত সম্পর্কিত কোন বিধানের খেলাফ) কোন অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়, (আর বিধানের খেলাফ করার কারণে যদি ওসীয়তকারীর ওয়ারিসদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয় কিংবা আশংকা দেখা দেয়) আর সে ব্যক্তি যদি তাদের মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি করে দেয়, তবে বাহ্যত তা ওসীয়ত পরিবর্তন বলে মনে হলেও, সে ব্যক্তির উপর কোন গোনাহ্ হবে না (এবং) সুনিশ্চিতরূপেই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারী এবং (গোনাহগারদের প্রতিও) অনুগ্রহশীল। (বস্তুত সে ব্যক্তি তো কোন গোনাহ করেনি। ওসীয়তের পরিবর্তন মীমাংসার উদ্দেশ্যেই করেছে, সুতরাং তার প্রতি অনুগ্রহ কেন হবে না ?)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াত মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি (যদি সে কিছু ধন-সম্পদ রেখে যায়,) যে ওসীয়ত ফরয করা হয়েছে, সে নির্দেশের তিনটি অংশ রয়েছে ঃ

(এক) মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের কোন অংশ যেহেতু নির্ধারিত নেই, সুতরাং তাদের হক মৃত ব্যক্তির ওসীয়তের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

(দুই) এ ধরনের নিকটাত্মীয়দের জন্য ওসীয়ত করা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির উপর ফরয।

(তিন) এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির বেশি ওসীয়ত করা জায়েয নয়।

উপরোক্ত তিনটি নির্দেশের মধ্যে প্রথম নির্দেশটি অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে 'মীরাস'-এর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর 'মনসূখ' বা রহিত হয়ে গেছে। ইবনে কাসীর ও হাকেম প্রমুখ সহীহ্ সনদের সাথে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে ওসীয়ত সম্পর্কিত এ নির্দেশটি মীরাস-এর আয়াত দ্বারা রহিত করে দেওয়া হয়েছে। মীরাস সম্পর্কিত আয়াতটি হচ্ছে ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ . وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا .

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মীরাসের আয়াত সে সমস্ত আত্মীয়দের জন্য ওসীয়ত করা রহিত করে দিয়েছে, যাদের মীরাস নির্ধারিত হয়েছিল। এ ছাড়া অন্য যেসব আত্মীয়ের অংশ মীরাসের আয়াতে নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য ওসীয়ত করার হুকুম এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। —(জাস্সাস, কুরতুবী)

তবে আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, যেসব আত্মীয়ের জন্য মীরাসের আয়াতে কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য ওসীয়ত করা মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে ফরয বা জরুরী নয়। সে ফরয রহিত হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন বিশেষে এটা মুস্তাহাবে পরিণত হয়েছে। —(জাস্‌সাস, কুরতুবী)

দ্বিতীয় নির্দেশ

ওসীয়ত ফরয হওয়া প্রসঙ্গে ঃ ওসীয়ত সম্পর্কিত এ আয়াতের নির্দেশ একাধারে যেমন কোরআনের মীরাস সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে, তেমনি বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশের মাধ্যমেও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। বিদায় হজ্জের বিখ্যাত খোতবায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছিলেন ঃ

ان الله اعطى لكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث . اخرجه الترمذى وقال هذا حديث حسن .

অর্থাৎ—আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে কোন ওয়ারিসের পক্ষে ওসীয়ত করা জায়েয নয়। —(তিরমিযী)

একই হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় একথাও যুক্ত হয়েছে ঃ

لا وصية لوارث الا ان تجيزه الورثة .

"কোন ওয়ারিসের জন্য সে পর্যন্ত ওসীয়ত জায়েয হবে না, যে পর্যন্ত অন্য ওয়ারিসগণ অনুমতি না দেয়।" —(জাস্‌সাস)

হাদীসের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই যেহেতু প্রত্যেক ওয়ারিসের হিস্‌সা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সুতরাং এখন আর ওসীয়ত করার অনুমতি নেই। তবে যদি অন্য ওয়ারিসগণ ওসীয়ত করার অনুমতি দেন, তবে যে কোন ওয়ারিসের জন্য বিশেষভাবে কোন ওসীয়ত করা জায়েয হবে।

ইমাম জাস্‌সাস বলেন, এ হাদীসটি বহু সংখ্যক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত এবং উম্মতের ফকীহ্‌গণ সর্বসম্মতিক্রমে এটি গ্রহণ করেছেন। ফলে এটি 'মুতাওয়াতের' বা বহুল বর্ণিত হাদীসের পর্যায়ভুক্ত, যে হাদীস দ্বারা কোরআনের আয়াতের হুকুম রহিত করাও জায়েয।

ইমাম কুরতুবী বলেন, উম্মতের আলেমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস, যথা ঃ মুতাওয়াতের ও মশহুর বর্ণনা, কোরআনেরই সমপর্যায়ের। কেননা সেটিও আল্লাহ্ তা'আলারই ফরমান। এ ধরনের হাদীস দ্বারা কোরআনের কোন নির্দেশ রহিত হওয়াতে কোন দ্বিধা-সংশয়ের অবকাশ নেই।

অতঃপর বলেন, সংশ্লিষ্ট হাদীস যদি আমাদের নিকট 'খবরে-ওয়াহেদ' বা এক ব্যক্তির বর্ণনার মাধ্যমেও পৌঁছে, তবু তাতে সংশয়ের কারণ নেই। পক্ষান্তরে বিদায় হজ্জের বিরাট সমাবেশে এক লাখেরও বেশি সাহাবীর উপস্থিতিতে সে সম্পর্কে হুযূর (সা)-এর ঘোষণা প্রদানের ফলে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হাদীসে বর্ণিত বিষয়টি সম্পর্কে সাহাবী এবং পরবর্তী পর্যায়ে উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে এ হাদীস তাদের নিকট অকাট্য দলীল হিসাবে গৃহীত হয়েছে বলে

প্রমাণিত হয়েছে। অন্যথায় কোরআনের আয়াতের মোকাবেলায় এ সম্পর্কে তাঁদের পক্ষে ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভবপর হতো না।

তৃতীয় নির্দেশ

এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের ওসীয়ত সম্পর্কে ঃ আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিগণের পক্ষে এখনো তার মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ওসীয়ত করা জায়েয। এমনকি উত্তরাধিকারিগণের অনুমতিক্রমে সমগ্র সম্পত্তিও ওসীয়ত করা জায়েয এবং গ্রহণযোগ্য।

মাস'আলা ঃ উরোক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হচ্ছে যে, যেসব আত্মীয়ের হিস্সা কোরআনে করীম নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের জন্য ওসীয়ত করা ওয়াজিব নয়। এমন কি ওয়ারিসগণের অনুমতি ব্যতীত এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের অতিরিক্ত ওসীয়ত করা জায়েযই নয়। তবে যেসব আত্মীয়ের হিস্সা কোরআন নির্ধারণ করেনি, তাদের জন্য মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণের মধ্যে ওসীয়ত করার অনুমতি রয়েছে।

মাস'আলা ঃ আলোচ্য আয়াতে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির পক্ষে সাধারণভাবে তার সম্পত্তির ব্যাপারে ওসীয়ত করার বিষয় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির উপর অন্যের ঋণ বা আমানত থাকে এবং তা পরিশোধ করার জন্য তার সমগ্র সম্পত্তিও ওসীয়ত করতে হয়, তবুও তার পক্ষে তা করতে হবে এবং সমস্ত সম্পত্তির ওসীয়তই বৈধ হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন— কারো উপর অন্যের হক থাকলে তার পক্ষে সে সম্পর্কে লিখিত ওসীয়ত করা ব্যতীত তিনটি রাতও কাটানো উচিত নয়।

মাস'আলা ঃ এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসীয়ত করার যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেরূপ ওসীয়ত করার পর জীবিতাবস্থায় তা পরিবর্তন কিংবা বাতিল করে দেওয়ারও অধিকার রয়েছে। —(জাস্সাস)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ
وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

(১৮৩) হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার। (১৮৪) গণনার কয়েকটি দিনের জন্য। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে

অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোযা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। যে ব্যক্তি খুশির সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি রোযা রাখ তবে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তী (জাতিসমূহের) লোকদের উপর ফরয করা হয়েছিল, এই আশায় যেন তোমরা (রোযার কল্যাণে ধীরে ধীরে) পরহেযগার হতে পারে। (কেননা রোযা রাখার ফলে নফ্সকে তার বিভিন্নমুখী প্রবণতা থেকে সংযত রাখার অভ্যাস গড়ে উঠবে, আর এ অভ্যাসের দৃঢ়তাই হবে পরহেযগারীর ভিত্তি। সুতরাং) গণনার কয়েকটা দিন রোযা রাখ। (এ অল্প কয়টি দিনের অর্থ—রমযান মাস, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।) অতঃপর (এর মধ্যেও এমন সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে,) তোমাদের মধ্যে যারা (এমন) অসুস্থ হয়, (যার পক্ষে রোযা রাখা কঠিন কিংবা ক্ষতিকর হতে পারে) অথবা (শরীয়তসম্মত) সফরে থাকে, (তার পক্ষে রমযান মাসে রোযা না রাখারও অনুমতি রয়েছে এবং রমযান ছাড়া) অন্যান্য সময়ে (ততগুলো দিন) গণনা করে রোযা রাখা (তার উপর ওয়াজিব)। আর (দ্বিতীয় সহজ পদ্ধতিটি, যা পরে রহিত হয়ে গেছে, তা এরূপ যে,) এ রোযা যাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর মনে হয় তারা এর পরিবর্তে (শুধু রোযার) 'ফিদইয়া' (অর্থাৎ বদলা) হিসাবে একজন দরিদ্রকে খাদ্য খাওয়াবে (অথবা দিয়ে দেবে)। তবে যে ব্যক্তি খুশির সাথে (আরো বেশি) খয়রাত করে (অর্থাৎ আরো বেশি ফিদইয়া দিয়ে দেয়) তবে তা তার জন্য আরো বেশি মঙ্গলকর হবে এবং (যদিও আমি এরূপ অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি দিয়েছি,কিন্তু এ অবস্থাতেও) তোমাদের পক্ষে রোযা রাখা অনেক বেশি কল্যাণকর, যদি তোমরা (রোযার ফযীলত সম্পর্কে) জানতে পার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

صوم-এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা বা বেঁচে থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় খাওয়া, পান করা এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম 'সওম'। তবে সুবেহ্ সাদিক হওয়ার পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে একাধারে এভাবে বিরত থাকলেই তা রোযা বলে গণ্য হবে। সূর্যাস্তের এক মিনিট আগেও যদি কোন কিছু খেয়ে ফেলে, পান করে কিংবা সহবাস করে, তবে রোযা হবে না। অনুরূপ উপায়ে সব কিছু থেকে পূর্ণ দিবস বিরত থাকার পরও যদি রোযার নিয়ত না থাকে তবে তা রোযা হবে না।

সওম বা রোযা ইসলামের মূল ভিত্তি বা আরকানের অন্যতম। রোযার অপরিসীম ফযীলত রয়েছে, যা এখানে বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক।

পূর্ববর্তী উম্মতের উপর রোযার হুকুম ঃ মুসলমানদের প্রতি রোযা ফরয হওয়ার নির্দেশটি একটি বিশেষ নযীর উল্লেখসহ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশের সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোযা শুধু তোমাদের প্রতিই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল। এর দ্বারা যেমন রোযার বিশেষ গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে, তেমনি মুসলমানদের এ মর্মে একটি সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে যে, রোযা একটি কষ্টকর ইবাদত সত্য,

তবে তা শুধু তোমাদের উপরই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপরও ফরয করা হয়েছিল। কেননা সাধারণত দেখা যায়, কোন একটা ক্লেশকর কাজে অনেক লোক একই সাথে জড়িত হয়ে পড়লে তা অনেকটা স্বাভাবিক এবং সাধারণ বলে মনে হয়।—(রূহুল মা'আনী)

কোরআনের বাক্য اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ অর্থাৎ যারা তোমাদের পূর্বে ছিল ব্যাপক অর্থবোধক। এর দ্বারা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সকল উম্মত এবং শরীয়তকেই বোঝায়। এতে বোঝা যায় যে, নামাযের ইবাদত থেকে যেমন কোন উম্মত বা শরীয়তই বাদ ছিল না, তেমনি রোযাও সবার জন্যই ফরয ছিল।

যাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, مِنْ قَبْلِكُمْ বাক্য দ্বারা পূর্ববর্তী উম্মত 'নাসারা'দের বোঝানো হয়েছে, তাঁরা বলেন—এটা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে; অন্যান্য উম্মতের উপর রোযা ফরয ছিল না, তাদের কথায় এ তথ্য বোঝায় না। —(রূহুল মা'আনী)

আয়াতের মধ্যে শুধু বলা হয়েছে যে, "রোযা যেমন মুসলমানদের উপর ফরয করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল; একথা দ্বারা এ তথ্য বোঝায় না যে, আগেকার উম্মতগণের রোযা সমগ্র শর্ত ও প্রকৃতির দিক দিয়ে মুসলমানদের উপর ফরযকৃত রোযারই অনুরূপ ছিল। যেমন রোযার সময়সীমা, সংখ্যা এবং কখন তা রাখা হবে এসব ব্যাপারে আগেকার উম্মতদের রোযার সাথে মুসলমানদের রোযার পার্থক্য হতে পারে, বাস্তব ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। বিভিন্ন সময়ে রোযার সময়সীমা এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়েছে। —(রূহুল মা'আনী)

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ বাক্যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, 'তাকওয়া' বা পরহেযগারীর শক্তি অর্জন করার ব্যাপারে রোযার একটা বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। কেননা রোযার মাধ্যমে প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে বিশেষ শক্তি অর্জিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সেটাই 'তাকওয়া' বা পরহেযগারীর ভিত্তি।

রুগ্ন ব্যক্তির রোযা ঃ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا বাক্যে উল্লিখিত 'রুগ্ন' সে ব্যক্তিকে বোঝায়, রোযা রাখতে যার কঠিন কষ্ট হয় অথবা রোগ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। পরবর্তী আয়াত وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -এর মধ্যে সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে। ফিক্‌হবিদ আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত তা-ই।

মুসাফিরের রোযা ঃ আয়াতের অংশ اَوْ عَلٰى سَفَرٍ-এর মধ্যে مُسَافِرٍ না বলে عَلٰى سَفَرٍ শব্দ ব্যবহার করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রথমত শুধু অভিধানিক অর্থের সফর, যথা ঃ বাড়িঘর থেকে বের হয়ে কোথাও গেলেই রোযার ব্যাপারে সফরজনিত 'রুখসত' (অব্যাহতি) পাওয়া যাবে না, সফর দীর্ঘ হতে হবে। কেননা عَلٰى سَفَرٍ শব্দের মর্মার্থ হচ্ছে, যে সফরের উপরে থাকে। এতে বোঝা যায় যে, বাড়িঘর থেকে পাঁচ-দশ মাইল দূরে গেলেই তা সফর বলে গণ্য হবে না। তবে সফর কতটুকু দীর্ঘ হতে হবে, সে সীমারেখা কোরআনে উল্লিখিত হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস এবং সাহাবীগণের আমলের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং অন্যান্য কিছুসংখ্যক ফিক্‌হবিদের মতে এ সফর কমপক্ষে তিন মন্‌যিল দূরত্বের হতে হবে। অর্থাৎ একজন লোক স্বাভাবিকভাবে পায়ে হেঁটে তিনদিন যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে ততটুকু দূরত্বের

সফরকে সফর বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগের আলেমগণ 'মাইল'-এর হিসাবে এ দূরত্ব আটচল্লিশ মাইল নির্ধারণ করেছেন।

দ্বিতীয় মাস'আলা ঃ عَلٰى سَفَرٍ শব্দ দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, মুসাফির-এর প্রতি রোযার ব্যাপারে সফরজনিত 'রুখসত' ততক্ষণই প্রযোজ্য হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সফরের মধ্যে থাকে। তবে স্বভাবতই সফর চলো অবস্থায় কোথাও সাময়িক যাত্রাবিরতি সফরের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটায় না। নবী করীম (সা)-এর হাদীস মতে এ যাত্রাবিরতির মেয়াদ উর্ধ্বপক্ষে পনের দিনের কম সময় হতে হবে। কেউ যদি সফরের মধ্যেই কোথাও পনের দিন অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে সে আর 'সফরের মধ্যে' থাকে না। ফলে সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে সফরজনিত 'রুখসত' প্রযোজ্য হবে না।

মাস'আলা ঃ একই বাক্যাংশ দ্বারা এ কথাও বোঝায় যে, কেউ যদি সফরের মধ্যে কোন এক জায়গায় নয়, বরং বিভিন্ন জায়গায় মোট পনের দিনের যাত্রাবিরতি করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তার সফরের ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে না। সে সফরজনিত রুখসত পাওয়ার অধিকারী হবে।

রোযার কাযা ঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ অর্থাৎ রুগ্ন বা মুসাফির ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় কিংবা সফরে যে কয়টি রোযা রাখতে পারবে না, সেগুলো অন্য সময় হিসাব করে কাযা করা ওয়াজিব। এতে বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের অসুবিধায় পতিত হয়ে যে ক'টি রোযা ছাড়তে হয়েছে, সে ক'টি রোযা অন্য সময় পূরণ করে দেওয়া তাদের উপর ওয়াজিব। এ কথাটি বোঝানোর জন্য فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ (তার উপর কাযা ওয়াজিব,) এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তা না বলে فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রুগ্ন এবং মুসাফিরদের অপরিহার্য রোযার মধ্যে শুধু সে পরিমাণ রোযার কাযা করাই ওয়াজিব, রোগী সুস্থ হওয়ার পর এবং মুসাফির বাড়ি ফেরার পর যে কয়দিনের সুযোগ পাবে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি এতটুকু সময় না পায় এবং এর আগেই মৃত্যুবরণ করে, তবে তার উপর কাযা কিংবা 'ফিদ্ইয়া'র জন্য ওসীয়ত করা জরুরী নয়।

মাস'আলা ঃ عِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ বাক্যে যেহেতু এমন কোন শর্তের উল্লেখ নেই, যদ্দ্বারা বোঝা যেতে পারে যে, এ রোযা একই সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে, না মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে রাখলেও চলবে সুতরাং যার রমযানের প্রথম দশ দিনের রোযা ফউত হয়েছে সে যদি প্রথমে দশ তারিখের কাযা করে, পরে নয় তারিখের তারপর আট তারিখের কাযা হিসাবে করতে থাকে, তবে তাতে কোন অসুবিধা হবে না। অনুরূপভাবে দশটি রোযার মধ্যে দু'-চারটি করার পর বিরতি দিয়ে অবশিষ্টগুলো কাযা করলেও কোন অসুবিধা হবে না। কেননা আয়াতের মধ্যে এরূপভাবে কাযা করার ব্যাপারেও কোন নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত হয়নি।

রোযার ফিদ্ইয়া ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ আয়াতের স্বাভাবিক অর্থ দাঁড়ায় যেসব লোক রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের দরুন নয়, বরং রোযা রাখার পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না, তাদের জন্যও রোযা না রেখে রোযার বদলায় 'ফিদ্ইয়া' দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই এতটুকু বলে দেওয়া হয়েছে যে, وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ রোযা রাখাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

উপরোক্ত নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের, যখন লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে লোকজনকে রোযায় অভ্যস্ত করে তোলা। এরপর অবতীর্ণ আয়াত مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -এর দ্বারা প্রাথমিক এ নির্দেশ সুস্থ-সবল লোকদের ক্ষেত্রে রহিত করা হয়েছে। তবে যেসব লোক অতিরিক্ত বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অপারগ কিংবা দীর্ঘকাল রোগভোগের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছে অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে সেসব লোকের বেলায় উপরোক্ত নির্দেশটি এখনো প্রযোজ্য রয়েছে। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সর্বসম্মত অভিমত তা-ই। —(জাস্‌সাস, মাযহারী)

বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী প্রভৃতি হাদীসের সমস্ত ইমামগণই সাহাবী হযরত সালামা-ইবনুল আকওয়া (রা)-এর সে বিখ্যাত হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে, যখন وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ শীর্ষক আয়াতটি নাযিল হয়, তখন আমাদেরকে এ মর্মে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, যার ইচ্ছা হয় সে রোযা রাখতে পারে এবং যে রোযা রাখতে না চায়, সে 'ফিদইয়া' দিয়ে দেবে। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ নাযিল হলো, তখন রোযা অথবা 'ফিদইয়া' দেওয়ার ইখতিয়ার রহিত হয়ে সুস্থ-সমর্থ লোকদের উপর শুধুমাত্র রোযা রাখাই জরুরী সাব্যস্ত হয়ে গেল।

মসনদে আহমদে উদ্ধৃত হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইসলামের প্রথম অবস্থায় নামাযের নির্দেশের বেলায় তিনটি স্তর অতিক্রান্ত হয়েছে; রোযার ব্যাপারেও অনুরূপ তিনটি স্তর অতিক্রান্ত হয়। রোযার নির্দেশ-সংক্রান্ত তিনটি স্তর হচ্ছে এরূপ ঃ

—"হুযূর (সা) যখন মদীনায় আসেন তখন প্রতি মাসে তিনটি এবং আশুরার দিনে একটি রোযা রাখতেন। এরপর রোযা ফরয হওয়া সংক্রান্ত আয়াত كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ নাযিল হয়। এ অবস্থায় সবারই ইখতিয়ার ছিল যে, কেউ রোযাও রাখতে পারত অথবা তাঁর বদলায় 'ফিদইয়া'ও প্রদান করতে পারত। তবে তখনো রোযা রাখাই উত্তম বিবেচিত হতো। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা দ্বিতীয় আয়াত فمن شهد منكم الشهر নাযিল করলেন। এ আয়াতে সুস্থ-সবল লোকদের এ ইখতিয়ার 'রহিত করে' তাদের জন্য শুধু রোযার বিধানই প্রবর্তন করে। তবে অতি বৃদ্ধ লোকদের বেলায় সে ইখতিয়ার অবশিষ্ট রাখা হয়েছে তারা ইচ্ছা করলে এখনো রোযা না রেখে 'ফিদইয়া' দিয়ে দিতে পারে।

তৃতীয় পরিবর্তন হয়েছে যে, প্রথমাবস্থায় ইফতারের পর থেকে শয্যা গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা এবং যৌনক্ষুধা মেটানোর অনুমতি ছিল। কিন্তু বিছানায় গিয়ে একবার ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথে দ্বিতীয় দিনের রোযা শুরু হয়ে যেতো। এরপর ঘুম ভাঙলে রাত থাকা সত্ত্বেও খানাপিনা কিংবা স্ত্রী সম্ভোগের অনুমতি ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ। শীর্ষক আয়াত নাযিল করে সুবেহ সাদিক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানাপিনা প্রভৃতি সবকিছুই চলতে পারে—এরূপ অনুমতি দিয়েছেন। এমনকি এরপর থেকে শেষ রাত্রে উঠে সেহ্‌রী খাওয়া সুন্নত করে দিয়েছেন। বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ প্রভৃতিতে একই মর্মে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। —(ইবনে কাসীর)

ফিদ্ইয়ার পরিমাণ এবং আনুষঙ্গিক মাস'আলা ঃ একটি রোযার ফিদইয়া অর্ধ সা' গম অথবা তার মূল্য। আমাদের দেশে প্রচলিত আশি তোলার সের হিসাবে অর্ধ সা' পৌনে

দু'সেরের কাছাকাছি হয়। এই পরিমাণ গম অথবা নিকটবর্তী প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী তার মূল্য কোন মিসকিনকে দান করে দিলেই একটি রোযার 'ফিদইয়া' আদায় হয়ে যায়। ফিদইয়া কোন মসজিদ বা মাদ্রাসায় কার্যরত কোন লোকের খেদমতের পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া জায়েয নয়।

মাস'আলা ঃ এক রোযার ফিদইয়া একাধিক মিসকিনকে দেওয়া অথবা একাধিক রোযার ফিদইয়া একই সাথে এক ব্যক্তিকে দেওয়া দুরস্ত নয়। শামী, বাহ্রুর রায়েক-এর হাওয়ালায় এমনই বর্ণনা করেছেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) বয়ানুল-কোরআনেও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে এমদাদুল ফতওয়াতে থানবী (র) লিখেছেন যে, ফতওয়া হচ্ছে এক রোযার ফিদইয়া একাধিক মিসকিনকে দেওয়া এবং একাধিক রোযার ফিদইয়া এক মিসকিনকে দেওয়া— এ উভয় সুরতই জায়েয। শামীতেও অনুরূপ ফতওয়া রয়েছে। এমদাদুল ফতওয়াতে অবশ্য বলা হয়েছে যে, একাধিক রোযার ফিদইয়া একই সময়ে এক ব্যক্তিকে না দেওয়াই উত্তম। তবে কেউ বলেছেন, দিয়ে দিলে তা আদায় হয়ে যাবে।

মাস'আলা ঃ যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে 'ফিদইয়া' প্রদান করার সামর্থ্য না থাকে, তবে সে ব্যক্তি ইস্তেগফার পড়তে থাকবে এবং মনে মনে নিয়ত করবে যে, সমর্থ হলে পরই তা আদায় করে দেবে। —(বয়ানুল-কোরআন)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيٓ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا
أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۘ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

(১৮৫) রমযান মাসই হলো সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না—যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

রোযার দিন নির্দিষ্টকরণ ঃ উপরে বলা হয়েছিল যে, সামান্য কয়েক দিন তোমাদের রোযা রাখতে হবে। সে সামান্য কয়েক দিনের বিষয়ই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

(সে সামান্য কয়েক দিন যাতে রোযা রাখার হুকুম করা হয়েছে, তা হলো) রমযান মাস, যাতে এমন বরকত বিদ্যমান রয়েছে যে, এরই এক বিশেষ অংশে (অর্থাৎ শবে-কদরে) কোরআন মজীদ (লওহে মাহফুয থেকে দুনিয়ার আকাশে) পাঠানো হয়েছে। তার (একটি) বৈশিষ্ট্য এই যে, (এটা) মানুষের জন্য হেদায়েতের উপায় এবং (অপর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, হেদায়েতের পন্থা বাতলাবার জন্যও এর প্রতিটি অংশ) প্রমাণস্বরূপ। (আর এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে এটাও মূলত সেসব আসমানী কিতাবেরই অনুরূপ, যেগুলো এসব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত অর্থাৎ) হেদায়েত তো বটেই তৎসঙ্গে (যে কোন বিষয়ের উপর প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপস্থাপনকারী হওয়ার দরুন) সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য বিধানকারীও বটে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যেসব লোক এ মাসে বিদ্যমান থাকবে, তাদের জন্য রোযা রাখা অপরিহার্য কর্তব্য। (এতে 'ফিদইয়া' বা বদলার যে অনুমতির কথা উপরে বলা হয়েছিল তা রহিত হয়ে গেল। তবে অসুস্থ ও মুসাফিরের জন্য যে আইন ছিল অবশ্য এখনও তেমনিভাবে তা বলবৎ রয়েছে যে) যে লোক (এমন) রোগাক্রান্ত (বা অসুস্থ) হবে, (যাতে রোযা রাখা কঠিন কিংবা ক্ষতিকর) অথবা (যে লোক শরীয়তসম্মত) সফরে থাকবে, (তার জন্য রমযান মাসে রোযা না রাখারও অনুমতি রয়েছে এবং রমযানের দিনসমূহের পরিবর্তে অন্য মাসের (তত দিন) গুণে রোযা রাখা ওয়াজিব। আল্লাহ্ তা'আলা (হুকুম আহকামের ব্যাপারে) তোমাদের সাথে সহজ ব্যবহার করতে চান। (কাজেই তিনি এমন আহ্কামই নির্ধারণ করেছেন, যা তোমরা সহজভাবে সম্পাদন করতে পার। সুতরাং সফর ও অসুস্থতার সময়ের জন্য এমন সহজ আইন সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া) তিনি তোমাদের সাথে (হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুনের ব্যাপারে কোন রকম) জটিলতা সৃষ্টি করতে চান না। বস্তুত (উল্লিখিত হুকুম–আহকামও আমি বিভিন্ন তাৎপর্যের ভিত্তিতেই নির্ধারণ করেছি। কাজেই প্রথমত নির্ধারিত সময়ে রোযা রাখার এবং কোন বিশেষ ওযর থাকলে সে রোযাগুলো অন্য দিনে কাযা করে নেওয়ার হুকুমও সে ভিত্তিতেই দেওয়া হয়েছে,) যাতে তোমরা (নির্ধারিত দিনের কিংবা কাযার) দিনের গণনা সম্পূর্ণ করে নিতে পার (এবং যাতে সওয়াবের কোন কমতি না থাকে)। আর কাযার হুকুমও এজন্য করা হয়েছে, যাতে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব (কীর্তন) কর (এ কারণে যে, তিনি তোমাদিগকে এমন এক পন্থা বাতলে দিয়েছেন, যাতে তোমরা রোযার দিনের বরকত ও ফল লাভে বঞ্চিত না হও। পক্ষান্তরে কাযা করা যদি ওয়াজিব না হতো, তবে কে এসব রোযা রেখে পরিপূর্ণ সওয়াব অর্জন করতে পারত ?) আর (ওযরের কারণে বিশেষভাবে রমযানে রোযা না রাখার অনুমতি এজন্য দেওয়া হয়েছে) যাতে তোমরা (এই সহজ করে দেওয়ার কারণে) আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় কর (এ অনুমতি যদি না হতো, তবে সে বিষয়টি আদায় করা অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে পড়ত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে পূর্ববর্তী সংক্ষিপ্ত আয়াতের বিশ্লেষণও করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে রমযান মাসের উচ্চতর ফযীলতও বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে أَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ বাক্যটি ছিল সংক্ষিপ্ত। তারই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ আয়াতে যে, সে কতিপয় দিন হলো রমযান মাসের দিনগুলো। আর এর ফযীলত হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ মাসটিকে স্বীয় ওহী এবং আসমানী কিতাব নাযিল করার জন্য নির্বাচন করেছেন। সুতরাং কোরআনও (প্রথম) এ মাসেই

অবতীর্ণ হয়েছে। মসনদে আহ্‌মদ গ্রন্থে হযরত ওয়াসেলাহ্ ইবনে আসকা থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা রমযান মাসের ১লা তারিখে নাযিল হয়েছিল। আর রমযানের ৬ তারিখে তওরাত, ১৩ তারিখে ইঞ্জীল এবং ২৪ তারিখে কোরআন নাযিল হয়েছে। হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, 'যবুর' রমযানের ১২ তারিখে এবং ইঞ্জীল ১৮ তারিখে নাযিল হয়েছে। (ইবনে কাসীর)

উল্লিখিত হাদীসে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অবতরণ সম্পর্কিত যেসব তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব তারিখে সেসব কিতাব গোটাই নাযিল করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোরআনের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা সম্পূর্ণভাবে রমযানের কোন এক রাতে লওহে মাহফুয থেকে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ করে দেওয়া হলেও হুযূর আকরাম (সা)-এর উপর ধীরে ধীরে তেইশ বছরে তা অবতীর্ণ হয়।

রমযানের যে রাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল কোরআনেরই ব্যাখ্যা অনুযায়ী তা ছিল শবে কদর। বলা হয়েছে। اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (অবশ্যই আমি তা নাযিল করেছি কদরের রাতে)। উল্লিখিত হাদীসে এ রাতটি ২৪শে রমযানের রাত ছিল বলে বলা হয়েছে। আর হযরত হাসান (রা)-এর মতে ২৪তম রাতটি হলো শবেকদর। এভাবে এ হাদীসটিও কোরআনের আয়াতের অনুরূপ। পক্ষান্তরে যদি এই সামঞ্জস্যকে সমর্থন করা না হয়, তবে কোরআনের ব্যাখ্যাই এ ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য অর্থাৎ যে রাতে কোরআন নাযিল করা হয়েছিল, সে রাতই শবে কদর হবে। এ আয়াতের মর্মও তাই। فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এই একটি মাত্র বাক্যে রোযা সম্পর্কিত বহু হুকুম-আহকাম ও মাস'আলা-মাসায়েলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। شَهِدَ শব্দটি شُهُوْدٌ থেকে গঠিত-এর অর্থ উপস্থিতি ও বর্তমান থাকা। আরবী অভিধানে اَلشَّهْر। অর্থ মাস। এখানে অর্থ হলো রমযান মাস। কাজেই বাক্যটির অর্থ দাঁড়াল এই যে, 'তোমাদের মধ্য থেকে যে লোক রমযান মাসে উপস্থিত থাকবে অর্থাৎ বর্তমান থাকবে, তার উপর গোটা রমযান মাসের রোযা রাখা কর্তব্য। ইতিপূর্বে রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া দেওয়ার যে সাধারণ অনুমতি ছিল, এ বাক্যের দ্বারা তা মনসূখ বা রহিত করে দিয়ে রোযা রাখাকেই ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য করে দেওয়া হয়েছে।

রমযান মাসে উপস্থিত বা বর্তমান থাকার মর্ম হলো রমযান মাসটিকে এমন অবস্থায় পাওয়া যাতে রোযা রাখার সামর্থ্য থাকে। অর্থাৎ মুসলমান, বুদ্ধিমান, সাবালক, মুকীম এবং হায়েজ-নেফাস থেকে পবিত্র অবস্থায় রমযান মাসে বর্তমান থাকা।

সে জন্যই পূর্ণ রমযান মাসটিই যার এমন অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যায়, যাতে তার রোযা রাখার আদৌ যোগ্যতা থাকে না— যেমন কাফির, নাবালক, উন্মাদ প্রভৃতি, তখন সে লোক এই নির্দেশের আওতাভুক্ত হয় না। তাদের উপর রমযানের রোযা ফরয হয় না। পক্ষান্তরে যাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে রোযা রাখার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোন বিশেষ ওযরবশত বাধ্য হয়ে রোযা পরিহার করতে হয়, যেমন—স্ত্রীলোকের হায়েয-নেফাসের অবস্থা কিংবা রোগ-শোক অথবা সফর অবস্থা প্রভৃতি। তখনও তাদের রোযা রাখার যোগ্যতার ক্ষেত্রে রমযান মাসে বর্তমান বলেই গণ্য হবে। কাজেই তাদের উপর আয়াতে বর্ণিত হুকুম বর্তাবে। কিন্তু সাময়িক ওযরবশত সে সময়ের জন্য রোযা মাফ বলে গণ্য হবে। অবশ্য পরে তা কাযা করতে হবে।

মাস'আলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার জন্য রোযার যোগ্য অবস্থায় রমযান মাসের উপস্থিতি একটা শর্ত। এমতাবস্থায় যে লোক পূর্ণ রমযান মাসকে পাবে, তার উপর গোটা রমযান মাসের রোযা ফরয হয়ে যাবে—যে লোক এ অবস্থায় কিছু কম সময় পাবে, তার উপর ততদিনই ফরয হবে। কাজেই রমযান মাসের মাঝে যদি কোন কাফির ব্যক্তি মুসলমান হয়, কিংবা কোন নাবালেগ যদি বালেগ হয়, তবে তার উপর পরবর্তী রোযাগুলোই ফরয হবে। বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা করার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য উন্মাদ ব্যক্তি মুসলমান ও বালেগ হওয়ার প্রেক্ষিতে যেহেতু ব্যক্তিগত যোগ্যতার অধিকারী হয়, সেহেতু সে যদি রমযানের কোন অংশে সুস্থ হয়ে ওঠে, তবে এ রমযানের বিগত দিনগুলোর কাযা করাও তার উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়বে। তেমনিভাবে হায়েয-নেফাসগ্রস্ত স্ত্রীলোক যদি রমযানের মাঝে পাক হয়ে যায় অথবা কোন অসুস্থ লোক যদি সুস্থ হয়ে ওঠে কিংবা কোন মুসাফির যদি মুকীম হয়ে যায়, তবে বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা করা তার পক্ষে জরুরী হবে।

মাস'আলা ঃ রমযান মাসের উপস্থিতি তিন পন্থায় প্রমাণিত হয় ঃ (১) রমযানের চাঁদ নিজের চোখে দেখা, (২) বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীর মাধ্যমে চাঁদ প্রমাণিত হওয়া এবং (৩) এতদুভয় পন্থায় প্রমাণিত না হলে শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর রমযান মাস আরম্ভ হয়ে যাবে।

মাস'আলা ঃ শা'বান মাসের ২৯ তারিখের সন্ধ্যায় যদি মেঘ প্রভৃতির দরুন চাঁদ দেখা না যায় এবং শরীয়তসম্মত কোন সাক্ষীও উপস্থিত না হয়, তাহলে পরবর্তী দিনটিকে বলা হয় يوم الشك। (ইয়াওমুশ্ শক) বা সন্দেহজনক দিন। কারণ এতে প্রকৃতই চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনাও থাকে, কিন্তু চাঁদ দেখার স্থানটি পরিষ্কার না থাকায় তা হয়তো দেখা যায় না। তাছাড়া এদিন চাঁদ আদৌ উদয় না হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। এ দিনে যেহেতু চন্দ্রোদয় প্রমাণিত হয় না, কাজেই সেদিনের রোযা রাখাও ওয়াজিব হয় না, বরং তা মকরূহ হয়। ফরয ও নফলের মাঝে যাতে সংমিশ্রণ ঘটতে না পারে সেজন্য হাদীসে এর নিষিদ্ধতা রয়েছে। —(জাস্সাস)

মাস'আলা ঃ যেসব দেশে রাত ও দিন কয়েক মাস দীর্ঘ হয়ে থাকে সেসব দেশে বাহ্যত মাসের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় না অর্থাৎ রমযান মাসের প্রকাশ্য আগমন ঘটে না, কাজেই সে দেশের অধিবাসীদের উপর রোযা ফরয হওয়াই উচিত। হানাফী মাযহাব অবলম্বী ফিকহ্‌বিদগণের মধ্যে হালওয়ানী, কেবালী প্রমুখ নামাযের ব্যাপারেও এমনি ফতোয়া দিয়েছেন যে, তাদের উপর নিজেদের দিন-রাত অনুযায়ী নামাযের হুকুম বর্তাবে অর্থাৎ যে দেশে মাগরিবের সাথে সাথেই সুবহে সাদিক হয়ে যায়, সে দেশে এশার নামায ফরয হয় না। —(শামী)

এর তাগাদা হলো এই যে, যে দেশে ছয় মাসে দিন হয়, সেখানে শুধু পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয হবে। রমযান আদৌ আসবে না। হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী (র)-ও 'এমদাদুল-ফাতাওয়া' গ্রন্থে রোযা সম্পর্কে এ মতই গ্রহণ করেছেন।

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ –আয়াতে রুগ্ন কিংবা মুসাফিরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে যে, সে তখন রোযা না রেখে বরং সুস্থ হওয়ার পর অথবা সফর শেষ হওয়ার পর ততদিনের রোযা কাযা করে নেবে। এ হুকুমটি যদিও পূর্ববর্তী

আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু রোযার পরিবর্তে ফিদ্ইয়া দেওয়ার ঐচ্ছিকতাকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে, কাজেই সন্দেহ হতে পারে যে, হয়তো রুগ্ন কিংবা মুসাফিরের বেলায়ও হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

(১৮৬) আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে —বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবূল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে রমযানের হুকুম-আহ্কাম ও ফযীলতের বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর একটি সুদীর্ঘ আয়াতে রোযা ও ই'তিকাফের বিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মাঝখানে বর্তমান সংক্ষিপ্ত আয়াতটিকে বান্দাদের অবস্থার প্রতি মহান পরওয়ারদেগারের অনুগ্রহ এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ ও কবূল করার বিষয় আলোচনা করে নির্দেশ পালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কারণ রোযা-সংক্রান্ত ইবাদতে অবস্থা বিশেষে অব্যাহতি দান এবং বিভিন্ন সহজতা সত্ত্বেও কিছু কষ্ট বিদ্যমান রয়েছে। এ কষ্টকে সহজ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি আমার বান্দাদের সন্নিকটে রয়েছি, যখনই তারা আমার কাছে কোন বিষয় প্রার্থনা বা দোয়া করে, আমি তাদের সে দোয়া কবূল করে নেই এবং তাদের বাসনা পূরণ করে দেই।

এমতাবস্থায় আমার হুকুম-আহ্কাম মেনে চলা বান্দাদেরও একান্ত কর্তব্য—তাতে কিছুটা কষ্ট হলেও তা সহ্য করা উচিত। ইমাম ইবনে কাসীর দোয়ার প্রতি উৎসাহ দান সংক্রান্ত এই মধ্যবর্তী বাক্যটির তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতের দ্বারা রোযা রাখার পর দোয়া কবূল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে জন্যই রোযার ইফতারের পর দোয়ার ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা উচিত। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

للصائم عند فطره دعوة مستجابة

অর্থাৎ রোযার ইফতার করার সময় রোযাদারের দোয়া কবূল হয়ে থাকে। (আবু দাউদ)

সেজন্যই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) ইফতারের সময় বাড়ির সবাইকে সমবেত করে দোয়া করতেন।

আয়াতের তফসীর হলো এই

আর [হে মুহাম্মদ (সা)]। যখন আপনার কাছে আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (যে, আমি তাদের নিকটে কি দূরে,) তখন (আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলে দিন,)

আমি তো নিকটেই রয়েছি। (আর অসঙ্গত প্রার্থনা ছাড়া সমস্ত) প্রার্থনাকারীর প্রার্থনাই গ্রহণ করে নেই, যখন সে নিবেদন করে আমার দরবারে। সুতরাং (যেভাবে আমি তাদের আবেদন-নিবেদন মঞ্জুর করে নেই, তেমনিভাবে) আমার হুকুম-আহ্কামগুলো (আনুগত্য সহকারে) মেনে নেওয়াও তাদের কর্তব্য। আর যেহেতু আমার সে সমস্ত হুকুম-আহ্কামের কোনটিই অসঙ্গত নয়, সেহেতু তাতে কোন একটিও বাদ দেওয়ার মত নেই। আর (তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন) আমার উপর নিঃসংশয়ে বিশ্বাস রাখে। (অর্থাৎ আমার সত্তাই যে একচ্ছত্র হাকেম সে ব্যাপারেও।) আশা করা যায়, (এভাবে) তারা হেদায়েত ও সরল পথ লাভে সমর্থ হবে।

মাস'আলা ঃ এ আয়াতে اِنِّیْ قَرِیْبٌ (আমি নিকটেই রয়েছি) বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ধীরে-সুস্থে ও নীরবে দোয়া করাই উত্তম, উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করা পছন্দনীয় নয়। ইমাম ইবনে কাসীর (রা) এ আয়াতের শানে-নুযুল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, কোন গ্রামের কিছু অধিবাসী রসূলে-করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিল, "যদি আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের নিকটেই থেকে থাকেন, তবে আমরা আস্তে আস্তে দোয়া করব। আর যদি দূরে থেকে থাকেন, তবে উচ্চৈঃস্বরে ডাকব।" এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ
لَكُمْ ۚ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ
وَأَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِي الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾

(১৮৭) রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ্ দান করেছেন, তা আহরণ কর। আর পানাহার কর, যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর,

ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না। এই হলো আল্লাহ্ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ আয়াতে রোযার অন্যান্য আহ্কামের কিছুটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

তোমাদের জন্য রোযার রাতে নিজেদের স্ত্রী-সহবাসে লিপ্ত হওয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছে। (আর ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা রহিত হয়ে গেছে)। কারণ (তাদের সাথে তোমাদের ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্যের দরুন) তারা তোমাদের পরিধেয় পোশাকের ন্যায় এবং তোমরাও তাদের পোশাকের ন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলা জানতেন যে, তোমরা (এই খোদায়ী হুকুমটির ব্যাপারে) খেয়ানত করে নিজেদেরকে গোনাহে লিপ্ত করেছিলে। (তবে যখন তোমরা লজ্জিত হয়েছ, তখন) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তোমাদের থেকে সে গোনাহ্ ধুইয়ে দিয়েছেন। সুতরাং (যখন অনুমতি দেওয়া হলো, তখন) এখন তাদের সাথে মেলামেশা করা এবং (এ অনুমতি সম্পর্কিত বিধানের প্রেক্ষিতে) যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, (বিনা দ্বিধায় এজন্য ব্যবস্থা কর এবং যেভাবে রমযানের রাতে স্ত্রী-সহবাসের অনুমতি রয়েছে, তেমনিভাবে সমগ্র রাত্রির মধ্যে যখন ইচ্ছা তখনই লিপ্ত হওয়ারও অনুমতি রয়েছে।) খেতেও পার (এবং) পানও করতে পার সে সময় পর্যন্ত, যে পর্যন্ত না তোমাদের সামনে প্রভাতের সাদা রেখা (সুবহে-সাদেকের আলোকচ্ছটা) স্পষ্ট হয়ে উঠবে কালো রেখা থেকে (অর্থাৎ রাতের অন্ধকার থেকে)। অতঃপর (সুবহে-সাদেক থেকে) রাত (আসা পর্যন্ত) রোযা পূর্ণ কর।

(রাতের কালো রেখা থেকে প্রভাতের সাদা রেখা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠার অর্থ, সুবহে-সাদেকের উদয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।)

পঞ্চম হুকুম-ই'তিকাফ ঃ এবং এ সময় স্ত্রীদের (দেহ) থেকে নিজেদের দেহকেও (কামভাবের সাথে) একত্র হতে দিও না, যে সময় তোমরা ই'তিকাফ অবস্থায় থাক (যা) মসজিদে (হয়ে থাকে)। (উল্লিখিত) এসব (নির্দেশসমূহ) আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান। সুতরাং এসব (বিধান) থেকে (বের হয়ে যাওয়া তো দূরের কথা) বের হয়ে আসার নিকটবর্তীও হয়ো না। (এবং যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা এসব নির্দেশ বর্ণনা করেছেন ঠিক) তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর (আরো) নির্দেশ লোকদের (সংশোধনের) জন্য বর্ণনা করে থাকেন এ আশায় যে, এসব লোক (বিধানসমূহের প্রতি অনুগত হয়ে এসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে) বিরত থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أُحِلَّ لَكُمْ বাক্যাংশটি দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, যে বিষয়টিকে এ আয়াত দ্বারা হালাল করা হয়েছে, তা ইতিপূর্বে হারাম ছিল। বোখারী এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাবে সাহাবী হযরত বারা ইবনে আ'যেবের বর্ণনায় উল্লিখিত যে, প্রথম যখন রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছিল, তখন ইফতারের পর থেকে শয্যা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত খানাপিনা ও স্ত্রী-সহবাসের অনুমতি ছিল। একবার শয্যা গ্রহণ করে ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথেই এ সবকিছু হারাম হয়ে যেতো। কোন কোন সাহাবী এ ব্যাপারে অসুবিধায় পড়েন। কায়স-ইবনে-সারমাহ্ আনসারী নামক জনৈক

সাহাবী একবার সমগ্র দিন কঠোর পরিশ্রম করে ইফতারের সময় ঘরে এসে দেখেন, ঘরে খাওয়ার মত কোন কিছুই নেই। স্ত্রী বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি কোনখান থেকে কিছু সংগ্রহ করে আনার চেষ্টা করি। স্ত্রী যখন কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে ফিরে এলেন ততক্ষণে সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়ার দরুন খানাপিনা তাঁর জন্য হারাম হয়ে যায়। ফলে পরদিন তিনি এ অবস্থাতেই রোযা রাখেন। কিন্তু দুপুর বেলায় শরীর দুর্বল হয়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান।–(ইবনে-কাসীর)

অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবী গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর স্ত্রীদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে মানসিক কষ্টে পতিত হন। এসব ঘটনার পর এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে পূর্ববর্তী হুকুম রহিত করে সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে সুবহে-সাদেক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র রাতেই খানাপিনা ও স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। ঘুমাবার পূর্বে কিংবা ঘুম থেকে ওঠার পর সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতাই এতে আর অবশিষ্ট রাখা হয়নি। এমনকি হাদীস অনুযায়ী শেষ রাতে সেহ্রী খাওয়া সুন্নত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কিত নির্দেশই প্রদান করা হয়েছে।

رفث–এর শাব্দিক অর্থ সেসব কথা বা কর্ম, যা কিছু একজন পুরুষ স্ত্রী-সহবাসের উদ্দেশ্যে করে বা বলে। সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী, আয়াতে উল্লিখিত رفث শব্দ দ্বারা সহবাসই বোঝানো হয়েছে।

শরীয়তের হুকুম নির্ণয়ে হাদীসও কোরআনেরই সমপর্যায়ভুক্ত ঃ এ আয়াত দ্বারা যে নির্দেশটি রহিত করা হয়েছে অর্থাৎ ইফতারের পর একবার ঘুমিয়ে পড়লে খানাপিনা ইত্যাদি সবকিছু অবৈধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি কোরআনের কোন আয়াতে উল্লিখিত হয়নি, বরং সাহাবীগণ হুযূর (সা)-এর নির্দেশেই এরূপ আমল করতেন। –(মসনদে-আহ্মদ)

কোরআনের এ আয়াত রাসূল (সা)-এর সে নির্দেশটিকেই আল্লাহর হুকুম-রূপে স্বীকৃতি দিয়ে এর উপর আমল রহিত করেছে। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গীই প্রমাণ করছে যে, নির্দেশটিকে কোরআন প্রথমে আল্লাহ্র নির্দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পরে উম্মতের জন্য এ নিয়মের কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল করার উদ্দেশ্যে একে মনসূখ বা রহিত করেছে। এর দ্বারা এ তথ্যও প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠিত সুন্নতকেও কোরআনের আয়াত দ্বারা মনসূখ বা রহিত করা যেতে পারে।—(জাস্সাস)

সেহ্রী খাওয়ার শেষ সময়সীমা ঃ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ আয়াতে রাতের অন্ধকারকে কালো রেখা এবং ভোরের আলো ফোটাকে সাদা রেখার সাথে তুলনা করে রোযার শুরু এবং খানাপিনা হারাম হওয়ার সঠিক সময়টি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু এ সময়সীমার মধ্যে বেশ-কম হওয়ার সম্ভাবনা যাতে না থাকে সেজন্য حَتّٰى يَتَبَيَّنَ শব্দটিও যোগ করে দেওয়া হয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সন্দেহপ্রবণ লোকদের ন্যায় সুব্হে-সাদেক দেখা দেওয়ার আগেই খানাপিনা হারাম মনে করো না অথবা এমন অসাবধানতাও অবলম্বন করো না যে, সুব্হে-সাদেকের আলো ফুটে ওঠার পরও খানাপিনা করতে থাকবে। বরং খানাপিনা এবং রোযার মধ্যে সুব্হে-সাদেকের সঠিকভাবে নির্ণয়ই হচ্ছে সীমারেখা। এ সীমারেখা উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানাপিনা বন্ধ করা জরুরী মনে করা যেমন জায়েয নয়, তেমনি সুব্হে-সাদেক হওয়ার ব্যাপারে একীন হয়ে যাওয়ার পর খানাপিনা করাও

হারাম এবং রোযা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ, তা এক মিনিটের জন্য হলেও। সুব্হে-সাদেক সম্পর্কে একীন হওয়া পর্যন্তই সেহ্রীর শেষ সময়। এক শ্রেণীর লোক কোন কোন সাহাবীর আমল উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, তাঁদের সেহ্রী খাওয়া অবস্থাতেই ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা গেছে। তাদের সে বর্ণনা যথার্থ নয়। সাহাবীগণের কারো কারো বেলায় এরূপ ঘটনা ঘটা সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত করা হয়, সেগুলো সুব্হে-সাদেক হওয়ার একীন না হওয়ার কারণেই ঘটেছে। সুতরাং যারা এ ধরনের কথা বলে তাদের সেসব দায়িত্বহীন মন্তব্যে প্রভাবান্বিত হওয়া সঙ্গত হবে না।

এক হাদীসে রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন যে, বেলালের আযান শুনতেই তোমরা সেহ্রী খাওয়া বন্ধ করে দিও না, কেননা, সে কিছুটা রাত থাকতেই আযান দিয়ে ফেলে। সুতরাং তোমরা বেলালের আযান শোনার পরেও খেতে পার, যে পর্যন্ত না ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান শুরু হয়। কেননা, সে ঠিক সুব্হে-সাদেক হওয়ার পরই আযান দিয়ে থাকে।-(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির অসম্পূর্ণ বিবরণের মাধ্যমে সমসাময়িক কোন কোন লেখকের এরূপ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, ফজরের আযান হয়ে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ সেহ্রী খেতে কোন অসুবিধা নেই। তাছাড়া যদি কারো দেরিতে ঘুম ভাঙ্গে এবং ততক্ষণে ফজরের আযান হতে থাকে, তবুও তার পক্ষে তাড়াহুড়া করে কিছু খেয়ে নেওয়া উচিত। অথচ এ হাদীসেই ঠিক ফজরের সময় হওয়ার সাথে সাথেই যেহেতু হযরত ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান যা সুব্হে-সাদেক হওয়ার সাথে সাথে দেওয়া হতো, সে আযান শুরু হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খানাপিনা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি, কোরআন শরীফের সুস্পষ্ট নির্দেশে যে সর্বশেষ সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, তা নিশ্চিতরূপেই সুব্হে-সাদেক হওয়া সম্পর্কে একীন হওয়া। এরপর এক মিনিটের জন্যও খানাপিনা করার অনুমতি দেওয়া কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া আর কিছু নয়।

সাহাবায়ে কেরাম এবং পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের মধ্যে কারো কারো সেহ্রী এবং ইফতারের ব্যাপারে সময়ের কড়াকড়ি না করা সম্পর্কিত যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়, সেগুলোর অর্থ এই হতে পারে যে, কোরআনের নির্দেশ অনুসারে সুবহে-সাদেক হওয়া সম্পর্কে একীন না হওয়া পর্যন্ত অতিসাবধানী ভূমিকা গ্রহণ করে যতটুকু সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সে সময়সীমার ব্যাপারেও বেশি বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। তাঁরা তা করতেন না। ইমাম ইবনে কাসীরও সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলোকে এ অর্থেই গ্রহণ করেছেন। অন্যথায়, কোরআনের সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ কোন মুসলমানই যে চোখ বুঁজে মেনে নিতে রাযী হবে না, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা। কাজেই সাহাবায়ে কেরাম ইচ্ছাকৃতভাবে এ সময়সীমা লঙ্ঘন করবেন, এমনটা কল্পনাও করা যায় না। বিশেষত কোরআন শরীফে বিশেষভাবে এ আয়াতের শেষভাগেই যেখানে বলা হয়েছে যে, تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا অর্থাৎ এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, সুতরাং এর নিকটবর্তীও হয়ো না।

মাস'আলা ঃ উপরোক্ত আলোচনাগুলো শুধু সেসব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের নিজের চোখে 'সুবহে-সাদেক' দেখে সময় নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে। যেমন, আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে সময় সম্পর্কেও যদি তাদের সঠিক জ্ঞান থেকে থাকে। কিন্তু যাদের তেমন

সুযোগ নেই অর্থাৎ আকাশ ঠিকমত দেখবার সুযোগ নেই, সুব্হে-সাদেক সম্পর্কে ধারণাও নেই কিংবা আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে সেসব লোকের পক্ষে অন্যান্য লক্ষণ কিংবা জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য নিয়ে সেহ্রী-ইফতারের সময় নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্য এসব হিসাবের মধ্যেও এমন সময় আসতে পারে, যে সময়সীমার মধ্যে সুব্হে-সাদেক হওয়ার ব্যাপারে একীন বা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। এমতাবস্থায় সন্দেহযুক্ত সময়ে কি করা উচিত, এ সম্পর্কে ইমাম জাস্সাস 'আহ্কামুল-কোরআন' গ্রন্থে বলেন—এরূপ ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে খানাপিনা না করাই কর্তব্য, তবে এরূপ সন্দেহপূর্ণ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ সুব্হে-সাদেক হওয়ার পূর্বক্ষণে যদি কেউ প্রয়োজনবশত খানাপিনা করে ফেলে, তবে সে গোনাহ্গার হবে না। কিন্তু পরে তাহকীক বা যাচাই করে যদি দেখা যায়, যে সময় সে খানাপিনা করেছে সে সময়ের মধ্যে সুব্হে-সাদেক হয়ে গিয়েছিল, তবে তার পক্ষে সেদিনের রোযার কাযা করা ওয়াজিব হবে। যেমন রমযানের এক তারিখে চাঁদ না দেখার কারণে লোকেরা রোযা রাখল না, কিন্তু পরে জানা গেল যে, ২৯শে শাবানই রমযানের চাঁদ উদিত হয়েছিল। তবে এমতাবস্থায় যারা সে দিনটিকে ৩০শে শাবান মনে করে রোযা রাখেনি, তারা গোনাহ্গার হবে না, তবে তাদের এ দিনের রোযা সকল ইমামের মতেই কাযা করতে হবে। অনুরূপভাবে মেঘলা দিনে কেউ সূর্য অস্ত গেছে মনে করে ইফতার করে ফেললো, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল—এমতাবস্থায় এ ব্যক্তিও গোনাহ্গার হবে না সত্য, তবে তার উপর ঐ রোযা কাযা করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম জাস্সাসের উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা বোঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি ঘুম ভাঙার পর শুনতে পায় যে, ফজরের আযান হচ্ছে, তখন তার পক্ষে সুব্হে-সাদেক হওয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহ একীন হয়ে যায়। এরপরও যদি সে জেনেশুনে কিছু খেয়ে নেয় তবে সে গোনাহ্গারও হবে এবং তার উপর সেই রোযা কাযা করাও ওয়াজিব হবে। অপরপক্ষে যদি সে সন্দেহযুক্ত সময়ে খায় এবং পরে সুব্হে-সাদেক এ সময়েই হয়েছিল বলে জানতে পারে, তবে তার উপর থেকে গোনাহ্ রহিত হয়ে যাবে বটে, কিন্তু রোযার কাযা করতে হবে।

ই'তিকাফ ঃ ই'তিকাফ-এর শাব্দিক অর্থ কোন এক স্থানে অবস্থান করা। কোরআন-সুন্নাহ্র পরিভাষায় কতকগুলো বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয়। فِى الْمَسَاجِد বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, ই'তিকাফ যে কোন মসজিদেই হতে পারে। কেননা, এখানে মসজিদ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শুধুমাত্র যেসব মসজিদে নিয়মিত জামাত হয়, সেসব মসজিদেই ই'তিকাফ করা দুরস্ত। অন্যান্য মসজিদ যেখানে নিয়মিত জামাত হয় না, সেগুলোতে ই'তিকাফ না হওয়ার ব্যাপারে ফিকহ্বিদগণ যে শর্ত আরোপ করে থাকেন, তা 'মসজিদ' শব্দের সংজ্ঞা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা, যেখানে নিয়মিত জামাতে নামায হয়, তাকেই কেবল মসজিদ বলা যেতে পারে। বাসস্থান বা দোকান-পাট সর্বত্রই বিচ্ছিন্নভাবে নামায পড়া জায়েয এবং তা হয়েও থাকে, কিন্তু তাই বলে সেগুলোকে মসজিদ বলা হয় না।

মাস'আলা ঃ রমযানের রাতে খানাপিনা, স্ত্রী-সহবাস প্রভৃতি হালাল হওয়ার বিষয় ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ই'তিকাফ অবস্থায় খানা-পিনার হুকুম সাধারণ রোযাদারদের প্রতি প্রযোজ্য

নির্দেশেরই অনুরূপ। তবে স্ত্রী-সহবাসের ব্যাপারে এ অবস্থায় পৃথক নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে—ই'তিকাফ অবস্থায় এটা রাতের বেলায়ও জায়েয নয়। এ আয়াতে সে নির্দেশই ব্যক্ত হয়েছে।

মাস'আলা ঃ ই'তিকাফের অন্যান্য মাস'আলা—যথা এর সাথে রোযার শর্ত, শরীয়তসম্মত কোন প্রয়োজন অথবা প্রকৃতিগত প্রয়োজন ব্যতীত ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয না হওয়া প্রভৃতি বিষয়ের কোন কোনটি ই'তিকাফ শব্দ থেকে নির্ণয় করা হয়েছে। আর অবশিষ্ট অংশ রাসূল (সা)-এর কওল ও আমল থেকে গৃহীত হয়েছে।

রোযার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশ ঃ সর্বশেষ আয়াত تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا। বলে ইশারা করা হয়েছে যে, রোযার মধ্যে খানাপিনা এবং স্ত্রী-সহবাস সম্পর্কিত যেসব নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এগুলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, এর ধারে-কাছেও যেয়ো না। কেননা, কাছে গেলেই সীমা লংঘনের আশংকা দেখা দিতে পারে। একই কারণে রোযা অবস্থায় কুলি করতে বাড়াবাড়ি করা, যদ্দরুন গলার ভিতরে পানি প্রবেশ করতে পারে; মুখের ভিতর কোন ঔষধ ব্যবহার করা, স্ত্রীর অতিরিক্ত নিকটবর্তী হওয়া প্রভৃতি মকরূহ্। তেমনিভাবে সময় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য সময়ের কিছুটা আগেই সেহ্‌রী খাওয়া শেষ করে দেওয়া এবং ইফতার গ্রহণে দু'চার মিনিট দেরি করা উত্তম। এসব ব্যাপারে অসাবধানতা এবং শৈথিল্য প্রদর্শন আল্লাহ্‌র এই নির্দেশের পরিপন্থী।

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

---

(১৮৮) তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রোযার বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছিল, যার মধ্যে হালাল বস্তু-সামগ্রীর ব্যবহারও একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এরপর প্রাসঙ্গিকভাবেই হারাম সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নিষিদ্ধতা বর্ণিত হচ্ছে। কেননা, ইবাদতে-সওম বা রোযার আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই যে, এতে মানুষ একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হালাল বস্তু-সামগ্রীর ব্যবহারের ব্যাপারে সবর ইখতিয়ার করার অনুশীলন করার ফলে হারাম বস্তু বর্জনের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই একটা অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং সর্বপ্রকার হারাম বস্তু থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে নৈতিক বল অর্জন করতে সক্ষম হবে।

একই সঙ্গে রোযা রাখার পর ইফতারের জন্য হালাল পথে অর্জিত সামগ্রী সংগ্রহ করা জরুরী। কেননা, কেউ যদি সারা দিন রোযা রেখে সন্ধ্যায় হারাম পথে অর্জিত বস্তুর দ্বারা ইফতার করে, তবে আল্লাহ্‌র নিকট তার এ রোযা গ্রহণযোগ্য হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর নিজেদের মধ্যে একে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করো না এবং তাদের বিপক্ষে শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট এ উদ্দেশ্যে (মিথ্যা নালিশ) করো না যে, (এর দ্বারা) জনগণের সম্পদের একাংশ অন্যায় পন্থায় (অর্থাৎ জুলুমের আশ্রয়ে) গ্রাস করবে, যখন তোমরা (তোমাদের মিথ্যাচার এবং জুলুম সম্পর্কে) নিজেরাই জান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইতিপূর্বে সূরা বাকারারই ১৬৮-তম আয়াতে হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পূর্ববর্তী সে আয়াতে বলা হয়েছিল ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ . اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ .

অর্থাৎ "হে মানবমণ্ডলী! জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুসমূহ খাও, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"

অনুরূপ সূরা নাহ্‌লে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَّاشْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ .

অর্থাৎ "তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যে পবিত্র ও হালাল রুযী দান করেছেন, তা থেকে খাও এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক।"

সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে ভাল-মন্দ পন্থা এবং ভাল-মন্দের মাপকাঠি ঃ জীবনযাত্রা পরিচালনার ক্ষেত্রে ধন-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা এবং অপরিহার্যতা সম্পর্কে যেমন দুনিয়ার সকল মানুষই একমত, তেমনি সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রেও ভাল ও মন্দ তথা বৈধ-অবৈধ—দু'টি ব্যবস্থার ব্যাপারেও দুনিয়ার সবাই একমত। চুরি, ডাকাতি, ধোঁকা, ফেরেব প্রভৃতিকে দুনিয়ার সবাই মন্দ বলে মনে করে। তবে পন্থাগুলোর মধ্যে বৈধ ও অবৈধের কোন মানদণ্ড সাধারণ মানুষের কাছে নেই। বস্তুত তা থাকতেও পারে না। কেননা, যে বিষয়টির সম্পর্ক সমগ্র দুনিয়ার মানুষের সাথে এবং যে নীতিমালার অনুসরণ করে সমগ্র দুনিয়ার মানুষ সমভাবে পরিচালিত ও পথপ্রাপ্ত হতে পারে, সেরূপ একটা নিখুঁত এবং সকলের জন্য সমভাবে গ্রহণযোগ্য নীতিমালা একমাত্র বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই নির্ধারিত হতে পারে, যা ওহীর মাধ্যমে মানবজাতির পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে। যদি মানুষকে এই নীতিমালা নির্ধারণের অধিকার দেওয়া হতো, তবে সংশ্লিষ্ট লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় এবং শ্রেণী-স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সকল যুগের সকল দেশের মানব সমাজের জন্য সমভাবে কল্যাণকর একটা নীতিমালা প্রণয়ন করতে কোন অবস্থাতেই সমর্থ হতো না।

অপরপক্ষে কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে যদি এ ব্যাপারে কোন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হতো, তবুও শ্রেণী ও গোষ্ঠী-স্বার্থ নিরপেক্ষ হয়ে যে একটা

সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হতো না, বহু অভিজ্ঞতা এ সত্যই প্রমাণ করে। সুতরাং এসব উদ্যোগ-আয়োজনের ফলও যে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং হানাহানি ছাড়া আর কিছুই হতো না, একথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে।

একমাত্র ইসলামী বিধানই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে ঃ শরীয়তে-ইসলাম হালাল ও হারাম এবং জায়েয ও না-জায়েয-এর যে নীতিমালা তৈরি করেছে তা সরাসরি আল্লাহ্র তরফ থেকে নাযিলকৃত ওহী অথবা ওহীর জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে। বস্তুত এটা এমনই এক সার্বজনীন আইন, যা দেশ-কাল ও গোত্র-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের নিকটই সমভাবে গ্রহণযোগ্য এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্-প্রদত্ত এ আইনের বিধানেই যৌথ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে যৌথ মালিকানায় সকলের জন্য সম-অধিকারের আওতায় রাখা হয়েছে। যেমন—বায়ু, পানি, জমিনের ঘাস, আগুনের উষ্ণতা, অনাবাদী বনভূমি, পাহাড়-পর্বত এবং বনভূমির উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রভৃতিতে সকল মানুষেরই সম-অধিকার রয়েছে। কারো পক্ষে এসব বস্তুর মালিকানা স্বত্বের দখলী জায়েয নয়।

অপরদিকে যেসব বিষয়ের মধ্যে যৌথ মালিকানা বা সকলের সম-অধিকার স্বীকৃত হলে ফলস্বরূপ সমাজে নানারকম বিরোধ-বিপত্তির সৃষ্টি হয়ে শান্তি বিনষ্ট হওয়ার কারণ ঘটতে পারে, সেগুলোর মধ্যে ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠার বিধান প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ কোন ভূমিখণ্ড কিংবা তার উৎপন্ন দ্রব্যের মালিকানা প্রতিষ্ঠার আইন থেকে শুরু করে মালিকানা হস্তান্তর প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যেন কোন মানুষই যথার্থ শ্রম নিয়োগের সুযোগ এবং শ্রম নিয়োগের পর জীবনযাত্রার মৌলিক প্রয়োজনাদি থেকে বঞ্চিত না থাকে। অন্যদিকে কারো পক্ষেই যেন অন্যের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে কিংবা অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে একটা বিশেষ শ্রেণীর হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করারও সুযোগ না থাকে।

সম্পদের হস্তান্তর মৃতের উত্তরাধিকার বন্টনের খোদায়ী আইনের মাধ্যমেই হোক অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে উভয়ের সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই হোক, শ্রমের বিনিময়ে হোক অথবা অন্য কোন বিনিময়ের মাধ্যমেই হোক, সর্বক্ষেত্রেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন লেন-দেনের মধ্যে কোন প্রকার ধোঁকা-ফেরেব বা ফটকাবাজির সুযোগ বিদ্যমান না থাকে। বিশেষত এমন কোন দুর্বোধ্যতা যা কথার মারপ্যাঁচও যেন না থাকে, যদ্দ্বারা পরে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে।

তদুপরি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, লেন-দেনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ যে সম্মতি দিচ্ছে তা যেন প্রকৃত সম্মতি হয়। কোন মানুষের উপর চাপ প্রয়োগ করে যেন সম্মতি আদায় করা না হয়। ইসলামী শরীয়তে সে সমস্ত বৈষয়িক লেন-দেনকে অবৈধ ও বাতিল বলে গণ্য করা হয়, যেগুলোতে মূলত উল্লিখিত কারণসমূহের যে কোন একটি অন্তরায় দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও থাকে ধোঁকা-প্রতারণা, কোথাও থাকে অজ্ঞাত কর্ম, বিষয় বা বস্তুর বিনিময়, কোথাও অপরের অধিকার আত্মসাৎ করা হয়, কোথাও অন্যের ক্ষতি করে নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধার করা হয়, আবার কোথাও বা থাকে সাধারণের স্বার্থে অবৈধ হস্তক্ষেপ। বস্তুত সুদ, জুয়া প্রভৃতিকে হারাম সাব্যস্ত করার পিছনেও কারণ হলো এই যে, এতে জনসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে। এর ফলে কতিপয় ব্যক্তি ফুলে-ফেঁপে উঠলেও সমগ্র সমাজ দারিদ্র্য কবলিত হয়ে পড়ে। কাজেই এহেন

কর্ম উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমেও হালাল নয়। তার কারণ, এটা কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়; বরং গোটা সমাজের বিরুদ্ধে এক জটিল অপরাধ। উল্লিখিত আয়াতটি এ সমস্ত অবৈধ দিকের প্রতিই ব্যাপক ইঙ্গিত করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ —অর্থাৎ তোমরা একে অপরের সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না। এতে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআনের ভাষায় أَمْوَالَكُمْ বলা হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ হলো নিজ সম্পদ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যখন অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে তসরুফ কর, তখন চিন্তা কর যে, অন্যেরও নিজ সম্পদের প্রতি তেমনি ভালবাসা রয়েছে যেমন তোমাদের নিজেদের ধন-সম্পদের জন্য তোমাদের রয়েছে। তারা যদি তোমাদের সম্পদে এমনি অবৈধ হস্তক্ষেপ করে, তাহলে তোমাদের যেমন কষ্ট হবে, তেমনিভাবে তাদের বেলায়ও একই রকম অনুভব কর যেন এটাও তোমাদেরই সম্পদ।

এছাড়া এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, একজন যখন অন্যজনের সম্পদ কোন রকম অবৈধ তসরুফ করে, তখন তার স্বাভাবিক পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, এই প্রথাই যদি প্রচলিত হয়ে যায় তবে অন্যজনও তার সম্পদ এমনিভাবে তসরুফ আরম্ভ করবে। এই প্রেক্ষিতে কারও সম্পদে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করা বা তাতে কোন রকম তসরুফ করা প্রকৃতপক্ষে নিজ সম্পদে অবৈধ তসরুফের পথই উন্মুক্ত করে দেওয়ার শামিল। লক্ষ্য করার বিষয়, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে ভেজাল মেশানোর প্রথা যদি প্রচলিত হয়ে যায় ; একজন যদি ঘিয়ের সাথে তেল কিংবা চর্বি মিশিয়ে অতিরিক্ত লাভ করে, তখন তার যখন দুধ কেনার প্রয়োজন পড়বে তখন দুধওয়ালাও তাতে পানি মেশাবে। মসলার প্রয়োজন হলে, তাতেও ভেজাল হবে। ঔষধের দরকার হলে তাতেও একই ব্যাপার ঘটবে। সুতরাং একজন ভেজাল মিশিয়ে সে অতিরিক্ত পয়সা আয় করে, অন্যজনও আবার তার পকেট থেকে একই পন্থায় তা বের করে নিয়ে যায়। এমনিভাবে দ্বিতীয়জনের পয়সা তৃতীয়জন এবং তৃতীয়জনের পয়সা চতুর্থ জন বের করে নেয়। এসব বোকার দল পয়সার প্রাচুর্য দেখে আনন্দিত হয় সত্য, কিন্তু তার পরিণতির দিকে মোটেই লক্ষ্য করে না যে, শেষ পর্যন্ত তার কাছে রইল কি ? কাজেই যে কেউ অন্যের সম্পদ ভুল এবং অবৈধ পন্থায় হস্তগত করে সে মূলত নিজের সম্পদে অবৈধ তসরুফের দরজাই খুলে দেয়।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আল্লাহ্‌র এই কালামে সাধারণ ও ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ভ্রান্ত ও অবৈধ পন্থায় কারও সম্পদ ভক্ষণ করো না।' এতে কারও সম্পদ কেড়ে নেওয়া এবং চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে নেওয়াও অন্তর্ভুক্ত; যাতে অন্যের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের মাধ্যমে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সুদ, জুয়া, ঘুষ প্রভৃতি এবং যাবতীয় অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যে লেন-দেন এরই আওতাভুক্ত, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়; যদিও তাতে উভয় পক্ষের সম্মতি থাকে। মিথ্যা কথা বলে কিংবা কসম খেয়ে কোন মাল হস্তগত করে নেওয়া অথবা এমন রোযগার, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা পরিশ্রমের বিনিময়ে হলেও হারাম বলেই গণ্য হবে। কোরআনের বাণীতে যদিও সরাসরিভাবে 'খাবার' বা 'ভক্ষণ' করার কথা উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে এর মর্ম শুধু খাওয়াই নয়, বরং যে কোনভাবে ভোগ বা ব্যবহার করা বোঝায়—তা পানাহার, পরিধান কিংবা অন্য যে কোন প্রকারেই হোক না কেন। প্রচলিত পরিভাষায়ও এসব ব্যবহারকে 'খাওয়াই' বলা হয়। যেমন, অমুক লোক অমুক মালটি খেয়ে ফেলেছে। বাস্তব ক্ষেত্রে সে মালটি খাওয়ার যোগ্য নাও হতে পারে।

শানে-নুযুল ঃ এ আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, দু'জন সাহাবীর মধ্যে এক টুকরা জমি নিয়ে বিবাদ হয়, পরে বিষয়টি মীমাংসার জন্য রাসূলে করীম (সা)-এর দরবারে পেশ করা হয়। বাদীর কোন সাক্ষী ছিল না। সুতরাং হুযূর (সা) শরীয়তের নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী বিবাদীর প্রতি শপথ গ্রহণের নির্দেশ দেন। তাতে বিবাদী শপথ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হলে মহানবী (সা) উপদেশ হিসাবে তাঁকে اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً আয়াতটি পাঠ করে শোনান। এতে মিথ্যা কসম খেয়ে কোন সম্পদ অর্জন করার বিষয়ে অভিশাপের উল্লেখ রয়েছে। বিবাদী সাহাবী এ আয়াত শোনার পর কসম থেকে বিরত হয়ে যান এবং জমিনটি বাদীকেই দিয়ে দেন।-(রূহুল-মা'আনী)

এ ঘটনার ভিত্তিতেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, যাতে না-জায়েয পন্থায় কারও ধন-সম্পদ খাওয়া-পরা অথবা লাভ করাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তদুপরি এর শেষাংশে বিশেষভাবে মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা তৈরি করা, মিথ্যা কসম খাওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য নিজে দেওয়ানোর ব্যাপারেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে ঃ

وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

অর্থাৎ শাসকদের নিকট ধন-সম্পদের বিষয়ে এমন কোন মামলা-মোকদ্দমা রুজু করো না, যাতে করে মানুষের সম্পদের কোন অংশ পাপ পন্থায় ভক্ষণ করে নিতে পার অথচ তোমরা একথা জান যে, তাতে তোমাদের কোন অধিকার নেই।

তোমরা মিথ্যা মোকদ্দমা তৈরি করো না وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (অথচ তোমরা জান)। এতে বোঝা যাচ্ছে—যদি কোন লোক ভুলক্রমে কোন বস্তু বা ধন-সম্পদকে নিজের মনে করে তা লাভ করার জন্য আদালতে মামলা দায়ের করে দেয়, তবে সে লোক উক্ত ভর্ৎসনার অন্তর্ভুক্ত হবে না। এমনি ধরনের একটি ঘটনা সম্পর্কে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

انما انا بشر وانتم تختصمون الى ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض - فاقضى له على نحو ما اسمع منه- فمن قضيت له بشئ من حق اخيه فلا ياخذنه فانما اقطع له قطعة من النار .

-'আমি একজন মানুষ, আর তোমরা আমার নিকট নিজেদের মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে আস। এক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, কেউ হয়তো নিজের বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে উত্থাপন করে, অথচ আমি তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে তার পক্ষে মীমাংসা করে দেই। তাহলে মনে রেখো (প্রকৃত বিষয়টি তো ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তি অবশ্যই জানবে) যদি এটা আসলেই তার প্রাপ্য না হয়, তাহলে তার পক্ষে তা গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ, এমতাবস্থায় আমি (মীমাংসার মাধ্যমে) যা তাকে দিয়ে দেব, তা হবে জাহান্নামের একটা অংশ।'

উল্লিখিত বক্তব্যে মহানবী (সা) বলেছেন যে, ইমাম বা কাযী (বিচারক) অথবা মুসলমানদের নেতা যদি কোন রকম ভুলবশত এমন কোন মীমাংসা করে দেন, যার দরুন একজনের হক অন্যজন অবৈধভাবে পেয়ে যায়, সেক্ষেত্রে এই আদালতী বিচারের কারণে তার জন্য সে জিনিস হালাল হয়ে যাবে না। পক্ষান্তরে যার জন্য সেটি হালাল তার জন্য হারামও হয়ে যাবে না। সারকথা, আদালতী সিদ্ধান্ত কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করে না। কোন লোক যদি

প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, মিথ্যা সাক্ষ্য কিংবা মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কোন মাল বা ধন-সম্পদ আদালতের আশ্রয়ে হস্তগত করে, তবে তার দায়-দায়িত্ব তারই থেকে যাবে। এমতাবস্থায় আখেরাতের হিসাব-কিতাব এবং সব কিছু যিনি জানেন, সব কিছুর যিনি খবর রাখেন, সে আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের আদালতের কথা চিন্তা করে সে মাল ন্যায্য হকদারকে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যেসব ব্যাপারে বাঁধন-বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন রয়েছে এবং যেসব বিষয়ে কাযী বা বিচারকের শরীয়তসম্মত অধিকার রয়েছে, সে সমস্ত ব্যাপারে যদি তাঁরা মিথ্যা কসম কিংবা মিথ্যা সাক্ষীর ভিত্তিতেই কোন ফয়সালা করে দেন, তবে শরীয়তের দৃষ্টিতেও সে বাঁধন বা বিচ্ছিন্নতা বৈধ বলে গণ্য হবে এবং হালাল-হারামের বিধি-বিধানও তাতে প্রযোজ্য হয়ে যাবে। অবশ্য মিথ্যা বলার এবং সাক্ষ্যদানের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাঁধে থেকে যাবে।

হালাল সম্পদের বরকত এবং হারামের অপকারিতা ঃ হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং হালাল বর্জন করার জন্য কোরআনে করীম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিরোনামে তাকীদ করেছে। এক আয়াতে এ ইঙ্গিতও করা হয়েছে যে, মানুষের কর্ম ও চরিত্রে হালাল খাওয়ার একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে। কারো পানাহার যদি হালাল না হয়, তবে তার পক্ষে সচ্চরিত্রতা এবং সৎকর্ম সম্পাদন একান্তই দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

—"হে রাসূলগণ! তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী খাও এবং সৎকাজ কর। আমি তোমাদের কাজ-কর্মের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক অবগত।"

এ আয়াতে হালাল খাবারের সাথে সৎকাজ করার নির্দেশ দান করে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, সৎকর্ম সম্পাদন করা তখনই সম্ভব হতে পারে, যখন মানুষের আহার্য ও পানীয়-বস্তুসামগ্রী হালাল হবে। মহানবী (সা) এক হাদীসে একথাও পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, এ আয়াতে যদিও নবী-রাসূলগণকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু এ নির্দেশ শুধু তাঁদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমস্ত মুসলমানই এ নির্দেশের আওতাভুক্ত। আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে তিনি একথাও বলেছেন যে, যারা হারাম মাল খায়, তাদের দোয়া কবূল হয় না। অনেকেই ইবাদত-বন্দেগীতে যথেষ্ট পরিশ্রম করে এবং তারপর আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করার জন্য হাত প্রসারিত করে, আর—'হে পরওয়ারদেগার, হে পরওয়ারদেগার' বলে ডাকে, কিন্তু যখন তাদের খানাপিনা হারাম, তাদের লেবাস-পরিচ্ছদ হারাম, তখন কেমন করে তাদের সে দোয়া কবূল হতে পারে? সেজন্যই মহানবী (সা)-এর শিক্ষার একটা বিরাট অংশ উম্মতকে হারাম থেকে বাঁচানো এবং হালাল ব্যবহারের প্রতি উৎসাহিত করার কাজে উৎসর্গিত ছিল।

এক হাদীসে বলা হয়েছে—"যে লোক হালাল খেয়েছে, সুন্নাহ্ মোতাবেক আমল করেছে এবং মানুষকে কষ্ট দান থেকে বিরত রয়েছে, সে জান্নাতে যাবে।" উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইদানিং এটা তো আপনার উম্মতের সাধারণ অবস্থা। অধিকাংশ মুসলমানই তো এভাবে জীবন যাপন করে থাকেন।" হুযূর (সা) বললেন—হ্যাঁ, তাই। পরবর্তী প্রত্যেক যুগেই এ ধরনের লোক থাকবে, যারা এ সমস্ত বিধি-বিধানের অনুবর্তী হবে।—(তিরমিযী)

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, মহানবী (সা) একবার সাহাবায়ে-কেরামকে বললেন, চারটি চরিত্র এমন রয়েছে, যদি সেগুলো তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকে, তবে দুনিয়াতে অন্য কোন কিছু যদি তোমরা নাও পাও, তবুও তোমাদের জন্য যথেষ্ট। সে চারটি অভ্যাস হলো এই–(১) আমানতের হেফাজত করা, (২) সত্য কথা বলা, (৩) সদাচার, (৪) পানাহারের ব্যাপারে হারাম-হালালের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) একবার মহানবী (সা)-এর দরবারে নিবেদন করলেন, 'আমার জন্য দোয়া করে দিন, আমি যাতে মকবূলুদ্দোয়া (যার দোয়া কবূল হয়) হয়ে যেতে পারি। আমি যে দোয়াই করব, তা-ই যেন কবূল হয়ে যায়।' হুযূর (সা) বললেন, 'সা'দ! নিজের খাবারকে হালাল ও পবিত্র করে নাও, তাহলেই 'মুস্তাজাবুদ্দা'ওয়াত' হয়ে যাবে। আর সে সত্তার কসম করে বলছি, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ—বান্দা যখন নিজের পেটে হারাম লোকমা ঢোকায়, তখন চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন আমল কবূল হয় না। আর যার শরীরের মাংস হারাম মাল দ্বারা গঠিত হয়, সে মাংসের জন্য তো জাহান্নামের আগুনই যোগ্য স্থান।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন, রসূলে করীম (সা) বলেছেন, সে সত্তার কসম, যাঁর কব্জায় মুহাম্মদের জান, কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হয় না, যতক্ষণ না তার অন্তর ও জিহবা মুসলমান হয় এবং যতক্ষণ না তার প্রতিবেশী তার কষ্টদানের ব্যাপারে হেফাযতে থাকে। আর যখন কোন বান্দা হারাম মাল খায় এবং সদকা-খয়রাত করে, তা কবূল হয় না। যদি তা থেকে ব্যয় করে, তবে তাতে বরকত হয় না। যদি তা নিজের উত্তরাধিকারী ওয়ারিশানের জন্য রেখে যায়, তবে তা জাহান্নামে যাওয়ার পক্ষে তার জন্য পাথেয় হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মন্দ বস্তুর দ্বারা মন্দ আমলকে বিধৌত করেন না। অবশ্য সৎকর্মের দ্বারা অসৎ কর্মকে ধুয়ে দেন।"

হাশরের ময়দানে প্রতিটি মানুষকে চারটি প্রশ্ন করা হবে ঃ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) বলেন যে, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

ما تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن اربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ما ذا عمل فيه .

–"কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে কোন মানুষই নিজের জায়গা থেকে সরতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে চারটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে নেওয়া হবে ঃ (১) সে নিজের জীবনকে কি কাজে নিঃশেষ করেছে ? (২) নিজের যৌবনকে কোন্ কাজে বরবাদ করেছে ? (৩) নিজের ধন-সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে ? (৪) নিজের ইলমের উপর ক'টা আমল করেছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন, একবার রাসূলে-করীম (সা) এক ভাষণে ইরশাদ করেছেন, হে মুহাজেরিন দল, পাঁচটি অভ্যাসের ব্যাপারে আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পানাহ্ চাই, সেগুলো যেন তোমাদের মধ্যেও সৃষ্টি না হয়ে যায়। তার একটি হলো অশ্লীলতা। কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে, তখন তাদের

মধ্যে প্লেগ ও মহামারীর মত এমন নতুন নতুন ব্যাধি চাপিয়ে দেওয়া হয়, যা তাদের বাপ-দাদারা কখনও শোনেনি। দ্বিতীয়ত, যখন কোন জাতির মধ্যে মাপ-জোঁকে কারচুপি করার রোগ সৃষ্টি হয়, তখন তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ, মূল্যবৃদ্ধি, কষ্ট-পরিশ্রম এবং কর্তৃপক্ষের অত্যাচার-উৎপীড়ন চাপিয়ে দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, যখন কোন জাতি যাকাত প্রদানে বিরত থাকে, তখন বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেওয়া হয়। চতুর্থত, যখন কোন জাতি আল্লাহ্ ও রাসূল (সা)-এর সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ্ তাদের উপর অজ্ঞাত শত্রু চাপিয়ে দেন। সে তাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়। আর পঞ্চমত, কোন জাতির শাসকবর্গ যখন আল্লাহ্র কিতাবের আইন অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নাযিলকৃত হুকুম-আহ্কাম তাদের মনঃপূত হয় না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করে দেন।–(ইবনে-মাজাহ্, বায়হাকী, হাকেম)

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ؕ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ
اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۸۹﴾ وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۱۹۰﴾ وَاقْتُلُوْهُمْ
حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ
وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ
كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۹۱﴾

(১৮৯) তোমার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদের বিষয়ে। বলে দাও যে, এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম। আর পেছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোন নেকী বা কল্যাণ নেই। অবশ্য নেকী হলো আল্লাহ্কে

ভয় করার মধ্যে। আর তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা নিজেদের বাসনায় কৃতকার্য হতে পার। (১৯০) আর লড়াই কর আল্লাহ্র ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (১৯১) আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে, যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুত ধর্মীয় ব্যাপারে ফেতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এই হলো কাফিরদের শাস্তি।

যোগসূত্র ঃ لَيْسَ الْبِرُّ আয়াতের আওতায় বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর সূরা বাকারার শেষ পর্যন্ত 'বির' বা সৎকাজ বিষয় আলোচিত হচ্ছে, যা শরীয়তের একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলোর মধ্যে প্রথম হুকুমটি ছিল 'কিসাস' বা খুনের বদলে মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে। দ্বিতীয়টি ওসীয়ত সম্পর্কে, তৃতীয় ও চতুর্থটি রোযা এবং তৎসম্পর্কিত মাস্আলা-মাসায়েল সংক্রান্ত, পঞ্চমটি ই'তিকাফ এবং ষষ্ঠটি হারাম মাল ভোগ থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কিত। অতঃপর আলোচ্য এ দু'টি আয়াতে হজ্জ ও জিহাদের আহ্কাম বর্ণনা করা হয়েছে। আর হজ্জ সংক্রান্ত বিধি-বিধান আলোচনার পূর্বে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, রোযা ও হজ্জ প্রভৃতি বিষয়ে চান্দ্র-মাস ও চান্দ্র-দিবসের হিসাব ধরা হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ اَهِلَّةٌ (আহিল্লাতুন) হলো هِلَالٌ -এর বহুবচন। চান্দ্র-মাসের প্রাথমিক কয়েকটি রাতকে هلال (হিলাল) বলা হয়। مَوَاقِيْتُ হলো مِيْقَاتُ -এর বহুবচন। এর অর্থ সময় বা অন্তিম সময়।-(কুরতুবী)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সপ্তম নির্দেশ ঃ চান্দ্র-মাসের হিসাব ও হজ্জ প্রভৃতি ঃ (হে রাসূল)। কেউ কেউ আপনার কাছ থেকে (প্রতি মাসে) চন্দ্রের (হ্রাস-বৃদ্ধির) অবস্থা (এবং এই হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্যে যেসব উপকারিতা রয়েছে, সেসব উপকারিতা সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্য) জানতে চাচ্ছে। আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, (এর উপকারিতা হলো) চন্দ্র (তার হ্রাস-বৃদ্ধি হিসাবে ঐচ্ছিক অথবা বাধ্যতামূলকভাবে) মানুষের (স্বেচ্ছামূলক ব্যাপারে যেমন ইদ্দত), প্রাপ্য আদায় এবং বাধ্যতামূলক বিষয়ে যেমন হজ্জ, রোযা ও যাকাত ইত্যাদির জন্য সময় নির্ধারণের মাধ্যম।

অষ্টম নির্দেশ ঃ অন্ধকার যুগের কুসংস্কারের সংস্কার সাধন ঃ (প্রাক-ইসলাম-যুগের কিছু সংখ্যক লোক হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার পর কোন প্রয়োজনে যদি গৃহে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করতো, তখন ঘরের দরজা দিয়ে ঢোকাকে নিষিদ্ধ বলে মনে করতো। কাজেই পিছনের দেয়াল ভেঙ্গে অতে ছিদ্র করে ঘরে প্রবেশ করতো। এই কাজটিকে তারা ফযীলতপূর্ণ কাজ বলে মনে করতো। আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জের আলোচনা শেষে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন ঃ) এবং এতে কোন ফযীলত নেই যে, পিছন দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর। তবে এতে ফযীলত আছে, যে কেউ হারাম (বস্তু বা কর্ম) হতে আত্মরক্ষা করবে। (যেহেতু দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকা হারাম নয়,

সেহেতু তা থেকে আত্মরক্ষা করার আবশ্যকতাও নেই। কাজেই যদি গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হয়, তবে) ঘরের দরজা দিয়েই প্রবেশ কর। (প্রকৃত মূলনীতি হলো এই যে,) আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক (তাতে অবশ্যই আশা করা যায় যে,) তোমরা (ইহকাল ও পরকালে) সফলকাম হবে।

নবম নির্দেশ ঃ কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ ঃ হিজরী ষষ্ঠ সনের যিলকদ মাসে রসূলুল্লাহ্ (সা) ওমরাহ্ আদায়ের নিয়তে মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা হলেন। সে সময় মক্কা নগরী মুশরিকদের অধীনে ও মুশরিক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুশরিকগণ রসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সহযাত্রীগণকে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতে বাধা দিল। ফলে ওমরাহ্ স্থগিত রয়ে গেল। পরিশেষে অনেক আলাপ-আলোচনার পর এই মর্মে এক সাময়িক সন্ধি-চুক্তি হলো যে আগামী বছর এসে ওমরাহ্ সম্পাদন করবেন। সে হিসাবে হিজরী সপ্তম সনের যিল্কদ মাসে পুনরায় তিনি এতদুদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। কিন্তু হযরত (সা)-এর সঙ্গী মুসলমানগণের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হলো যে, সম্ভবত মুশরিকরা তাদের সন্ধিচুক্তি লংঘন করে সংঘাত ও যুদ্ধে লিপ্ত হবে। যদি মুশরিকরা আক্রমণ করে, তবে তাঁরা তো চুপ করে বসে থাকতে পারবেন না বা বসে থাকা সমীচীনও হবে না। কিন্তু যদি মুশরিকদের মুকাবিলা ও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তবে সে যুদ্ধ সংঘটিত হবে যিল্কদ মাসে। এই মাসটি তো সে চার মাসের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোকে 'আশ্হুরে হারাম' বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এই চার মাসে তখনও পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ও নিষিদ্ধ ছিল। এই চারটি সম্মানিত (হারাম) মাস ছিল যিল্কদ, যিল্হজ্জ, মুহররম ও রজব। যা হোক, মুসলমানগণ এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অত্যন্ত পেরেশান ছিলেন। এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতগুলো নাযিল করলেন যে, সন্ধি চুক্তিকারীদের সঙ্গে পারস্পরিক চুক্তির কারণে তোমাদের পক্ষ থেকে প্রথমে হামলা করার অনুমতি নেই। কিন্তু তারা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে তোমাদের উপর আক্রমণ চালায় (তখন তোমরা অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের স্থান দিও না) এবং (নিঃশঙ্কচিত্তে) তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। অর্থাৎ এই নিয়তে যে, এরা দীন-ইসলামের বিরোধিতা করছে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে। (কিন্তু নিজেরা চুক্তির) সীমা অতিক্রম করো না, (চুক্তি ভঙ্গ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ো না)। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ (শরীয়তের আইনের) সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর (যে অবস্থায় তারা নিজেরাই চুক্তি ভঙ্গ করে, সে অবস্থায় তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে) তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর, আর (না হয়) তাদেরকে (মক্কা থেকে) বহিষ্কার কর, যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে (নানারূপ দুঃখ-কষ্ট দিয়ে) বহিষ্কৃত হতে (এবং হিজরত করতে) বাধ্য করছে। আর (তোমাদের এই হত্যা ও বহিষ্কারের পরেও বিবেকের বিচারে অপরাধের বোঝা তাদেরই কাঁধে থেকে যাবে। কেননা, তাদের তরফ থেকে যে চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আর এরূপ) গর্হিত কাজ (অনিষ্টের দিক দিয়ে) হত্যা (ও বহিষ্কার) অপেক্ষাও মারাত্মক। (কারণ, সে হত্যা ও বহিষ্কারের সুযোগ সে অপকর্মের কারণেই ঘটে থাকে)। আর (সন্ধিচুক্তি ছাড়াও তাদের সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মাঝে আরও একটি অন্তরায় রয়েছে। আর তা হলো এই যে, হরম শরীফ অর্থাৎ মক্কা ও মক্কার পার্শ্ববর্তী এমন একটি এলাকা রয়েছে, যার সম্মান করা অপরিহার্য। সেখানে যুদ্ধ করা এ স্থানের সম্মানের পক্ষে হানিকর। কাজেই নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে,) তাদের সঙ্গে মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী (যা হারাম বলে নির্ধারিত) এলাকায়

যুদ্ধ করো না, যে পর্যন্ত না তারা স্বয়ং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তবে যদি তারা (কাফিররা) যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে, তখন (তোমাদের প্রতিও তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে) তোমরাও তাদেরকে আঘাত কর। যারা এহেন কাফির (যারা হরমের ভিতরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়) তাদের এমন শাস্তিই প্রাপ্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তার জওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাস্সিরকুল-শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সম্ভ্রম ও সমীহ বোধের কারণে খুব কমই প্রশ্ন করতেন। তাঁরা এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যমানার উম্মতদের ব্যতিক্রম ছিলেন। পূর্ববর্তী উম্মতগণ এ আদবের প্রতি সচেতন ছিল না। তারা সব সময় নানা অবান্তর প্রশ্ন করতো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সাহাবীগণের যেসব প্রশ্নের উল্লেখ কোরআন মজীদে বিদ্যমান রয়েছে, তা সংখ্যায় মাত্র চৌদ্দটি। এই চৌদ্দটি প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ (যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমার কাছে প্রশ্ন করে) দ্বিতীয় প্রশ্নটি আলোচ্য চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত প্রশ্ন। এই দু'টি প্রশ্ন ছাড়া সূরা বাকারায় আরও ছয়টি প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে। বাকি ছয়টি প্রশ্ন পরবর্তী বিভিন্ন সূরায় বিদ্যমান।

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 'আহিল্লা' বা নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ, চাঁদের আকৃতি-প্রকৃতি সূর্য থেকে ভিন্নতর। সেটা এক সময় সরু বাঁকা রেখার আকৃতি ধারণ করে এবং অতঃপর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে; অবশেষে সম্পূর্ণ গোলকের মত হয়ে যায়। এরপর পুনরায় ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে। এই হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ অথবা এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন। এই দুই প্রকার প্রশ্নেরই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যে উত্তর প্রদান করা হয়েছে, তাতে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে। যদি প্রশ্নই এই হয়ে থাকে যে, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ? তবে তো প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর হয়েই গেছে। আর যদি প্রশ্নে এই হ্রাস-বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত মূল তত্ত্ব জানবার উদ্দেশ্য থেকে থাকে, যা ছিল সাহাবায়ে কেরামের স্বভাব-বিরুদ্ধ, তবে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মৌলতত্ত্ব বর্ণনার পরিবর্তে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনার দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আকাশের গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলী মৌলিক উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে। আর মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন বিষয়ই এই জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা ও জবাব এই যে, চন্দ্রের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি এবং উদয়াস্তের মধ্যে আমাদের কোন্ কোন্ মঙ্গল নিহিত ? সেজন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, চাঁদের সঙ্গে তোমাদের যেসব মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পৃক্ত তা এই যে, এতে তোমাদের কাজ-কর্ম ও চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ এবং হজ্জের দিনগুলোর হিসাব জেনে রাখা সহজতর হবে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে চন্দ্র ও সৌর হিসাবের গুরুত্ব ঃ এ আয়াতে এতটুকু বোঝা গেল যে, চন্দ্রের দ্বারা তোমরা তারিখ ও মাসের হিসাব জানতে পারবে যার উপর তোমাদের লেন-দেন, আদান-প্রদান এবং হজ্জ প্রভৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গটি সূরা ইউনুসে বিবৃত হয়েছে ঃ

وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ (يونس)

এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, বিভিন্ন পর্যায় ও বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে চন্দ্রের পরিক্রমণের উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা বর্ষ, মাস ও তারিখের হিসাব জানা যায়। কিন্তু সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াতে বর্ষ, মাস ও দিন-ক্ষণের হিসাব যে সূর্যের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত তাও বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فَمَحَوْنَا اٰيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ

অর্থাৎ "অতঃপর আমি রাতের চিহ্ন তিরোহিত করে দিনের চিহ্নকে দর্শনযোগ্য করলাম, যাতে তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহের দান রুযী-রোযগারের অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষপঞ্জী ও দিন-ক্ষণের হিসাব অবগত হতে পার।"–(বনী ইসরাঈল, বারো আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা যদিও প্রমাণিত হলো যে বর্ষ, মাস ইত্যাদির হিসাব সূর্যের আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি দ্বারাও নির্ণয় করা যায়, (রূহুল-মাআনী) কিন্তু চন্দ্রের ক্ষেত্রে কোরআন যে ভাষা প্রয়োগ করেছে, তাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরীয়তে চান্দ্রমাসের হিসাবই নির্ধারিত। রমযানের রোযা, হজ্জের মাস ও দিনসমূহ, মহররম, ঈদ, শবে-বরাত ইত্যাদির সঙ্গে যেসব বিধি-নিষেধ সম্পৃক্ত, সেগুলো সবই 'রুইয়াতে-হেলাল' বা নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। কেননা, এই আয়াতে هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ –(এটি মানুষের হজ্জ ও সময় নির্ধারণের উপায়)–বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যদিও এই হিসাব সূর্যের দ্বারাও অবগত হওয়া যায়, তবুও আল্লাহ্র নিকট চান্দ্রমাসের হিসাবই নির্ভরযোগ্য।

ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক চান্দ্রমাসের হিসাব গ্রহণ করার কারণ এই যে, প্রত্যেক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই আকাশে চাঁদ দেখে চান্দ্রমাসের হিসাব অবগত হতে পারে। পণ্ডিত, মূর্খ, গ্রামবাসী, মরুবাসী, পার্বত্য উপজাতি ও সভ্য-অসভ্য জনগণ নির্বিশেষে সবার জন্যই চান্দ্রমাসের হিসাব সহজতর। কিন্তু সৌরমাস ও সৌরবছর এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এর হিসাব জ্যোতির্বিদদের ব্যবহার্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং ভৌগোলিক, জ্যামিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যার সূত্র ও নিয়ম-কানুনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এই হিসাব প্রত্যেকের পক্ষে সহজে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসের হিসাব বাধ্যতামূলক করা হলেও সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ হিসাবেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। চাঁদ ইসলামী ইবাদতের অবলম্বন। চাঁদ এক হিসাবে ইসলামের প্রতীক বা শি'আরে ইসলাম। ইসলাম যদিও সৌরপঞ্জী ও সৌর হিসাবকে এই শর্তে না-জায়েয বলেনি, তবুও এতটুকু সাবধান অবশ্যই করেছে, যেন সৌর হিসাব এত প্রাধান্য লাভ না করে যাতে লোকেরা চন্দ্রপঞ্জী ও চান্দ্রমাসের হিসাব ভুলেই যায়। কারণ এরূপ করাতে রোযা, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদতে ত্রুটি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অধুনা যেভাবে সাধারণ অফিস-আদালতে ব্যবসায়-বাণিজ্যে এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয় চিঠিপত্রে পর্যন্ত সৌরপঞ্জীর এমন বহুল প্রচলন ঘটেছে যে, অনেকেরই ইসলামী মাসগুলো পর্যন্ত

স্মরণ থাকে না। এই অবস্থা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ ছাড়াও জাতীয় মর্যাদায় এবং সম্মানের ক্ষেত্রে বিরাট অবক্ষয়ের পরিচায়ক। আমরা যদি কেবল সে সমস্ত অফিস ও দফতরের কাজ সৌরপঞ্জী হিসাবে চালাই যেগুলোর সঙ্গে অমুসলিমদের সম্পর্ক বিদ্যমান, আর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং দৈনন্দিন আচার-অনুষ্ঠানে ইসলামী চন্দ্রপঞ্জীর তারিখ ব্যবহার করি, তবে তাতে একটা ফরযে কেফায়া আদায়ের সওয়াবও হবে এবং ইসলামের প্রতীক বা শি'আরে ইসলামেরও হেফাজত হবে।

মাস'আলা ঃ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا –(ঘরের পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করাতে তোমাদের জন্য কোন পুণ্য নেই) এই আয়াত দ্বারা এই মাস'আলা জানা গেল যে, যে বিষয়কে ইসলামী শরীয়ত প্রয়োজনীয় বা ইবাদত বলে মনে করে না, তাকে নিজের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় বা ইবাদত মনে করা জায়েয নয়। এমনিভাবে যে বিষয় শরীয়তে জায়েয রয়েছে, তাকে পাপ মনে করাও গোনাহ্। মক্কার কাফিররা তাই করছিল। তারা ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা শরীয়তসম্মতভাবে জায়েয থাকা সত্ত্বেও দরজা দিয়ে প্রবেশ করা না-জায়েয মনে করতো। তারা শরীয়তসম্মতভাবে ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করাকে পাপ বলে গণ্য করতো এবং ঘরের পিছন দিক দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে বা বেড়া কেটে বা সিঁধ কেটে ঘরে প্রবেশ করাকে (শরীয়তে যার কোন আবশ্যকতাই ছিল না) নিজেদের জন্য অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করেছিল। এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। 'বেদ'আত'-এর না-জায়েয হওয়ার বড় কারণও তাই যে, এতে অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে ফরয-ওয়াজিবের মতই অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয় অথবা কোন কোন জায়েয বস্তুকে না-জায়েয ও হারাম বলে গণ্য করা হয়। আলোচ্য আয়াতে এরূপ শরীয়ত-বহির্ভূত নিয়মে জায়েযকে না-জায়েয মনে করা অথবা হারামকে হালাল মনে করা বা 'বেদাআত'-এর প্রচলন করার নিষেধাজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে আয়াতের দ্বারা বেশ কিছু সংখ্যক হুকুম-আহকামও জানা গেছে।

দশম নির্দেশ ঃ জিহাদ বা ন্যায়ের সংগ্রাম ঃ গোটা মুসলিম উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, মদীনায় হিজরতের পূর্বে কাফিরদের সঙ্গে 'জিহাদ' ও 'কেতাল' (যুদ্ধ-বিগ্রহ) নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে অবতীর্ণ কোরআন মজীদের সব আয়াতেই কাফিরদের অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়। রবী' ইবনে আনাস প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর উক্তি অনুসারে মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় তবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর এক বর্ণনা অনুযায়ী কাফিরদের বিপক্ষে যুদ্ধের নির্দেশ সম্পর্কিত এটিই সর্বপ্রথম আয়াত যথা ঃ اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী (রা) এবং তাবেয়ীন (র)-এর মতে এ প্রসঙ্গে সূরা বাকারার উপরোল্লিখিত আয়াতই প্রথম আয়াত। তবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যে আয়াতটিকে এ প্রসঙ্গে নাযিলকৃত প্রথম আয়াত বলে মত প্রকাশ করেছেন, সে আয়াতটিকেও এ প্রসঙ্গে প্রথম দিকে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে প্রথম আয়াত বলা চলে।

এই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ কেবল সে সব কাফিরের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ-সমরে উপস্থিত হবে। এর অর্থ এই যে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ ধর্মীয় কাজে সংসার ত্যাগী উপাসনারত সন্ন্যাসী-পাদ্রী প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু,

অসমর্থ অথবা যারা কাফিরদের অধীনে মেহনতী মজদুরী করে, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক না হয়—সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়েয নয়। কেননা, আয়াতের নির্দেশে কেবল তাদেরই সঙ্গে যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু উল্লিখিত শ্রেণীর লোকদের কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয়। এজন্য ফিক্‌হ-শাস্ত্রবিদ ইমামগণ বলেন, যদি কোন নারী, বৃদ্ধ অথবা ধর্মপ্রচারক বা ধর্মীয় মিশনারীর লোক কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অথবা কোন প্রকারে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা জায়েয। কারণ, তারা اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ "যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে"–এই আয়াতের আওতাভুক্ত–(মাযহারী, কুরতুবী ও জাস্‌সাস)। যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরফ থেকে মুজাহিদদেরকে যেসব উপদেশ দেওয়া হতো, সেগুলোর মধ্যে এ নির্দেশের বিস্তারিত ব্যাখ্যার উল্লেখ রয়েছে। সহীহ্-বুখারী ও সহীহ্-মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত এক হাদীসে আছে ঃ

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان .

–রাসূলুল্লাহ্ (সা) নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

অনুরূপভাবে সহীহ আবূ দাউদ গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত এক হাদীসে যুদ্ধযাত্রী সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিম্নলিখিত উপদেশাবলী উদ্ধৃত রয়েছে ঃ

–"তোমরা আল্লাহ্‌র নামে এবং রাসূলের মিল্লাতের উপর জিহাদে যাও! কোন দুর্বল, বৃদ্ধ এবং শিশুকে অথবা কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করো না।" –(মাযহারী)

হযরত আবূ বকর (রা) যখন ইয়াযীদ ইবনে আবূ সুফিয়ানকে সিরিয়া অভিযানে প্রেরণ করেন, তখন যুদ্ধ সম্পর্কিত বিধি-বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে হুবহু এ উপদেশগুলোর কথাই উল্লেখ করেছিলেন। এতদসঙ্গে তিনি আরও উপদেশ দিয়েছিলেন যে, "উপাসনারত রাহেব বা সন্ন্যাসী, কাফিরদের শ্রমিক এবং চাকরদেরকেও হত্যা করো না, যদি না তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।"–(কুরতুবী)

আয়াতের শেষাংশে وَلَا تَعْتَدُوْا (এবং সীমা অতিক্রম করো না)–বাক্যটির অর্থ অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই যে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করে সীমা অতিক্রম করো না।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ .

–(আর তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর এবং যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও।)

সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত মোতাবেক হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রা)-সহ সেই ওমরাহ্‌র কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রার নিয়ত করেন, আগের বছর মক্কার কাফিররা যে ওমরাহ্ উদযাপনে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, কাফিররা হয়তো তাদের সন্ধি ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে না। যদি তারা এ বছরও তাঁদেরকে বাধা দেয়, তবে তাঁরা কি করবেন ? এ প্রসঙ্গেই উল্লিখিত আয়াতে অনুমতি প্রদান করা হলো যে, যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তোমাদেরও তার সমুচিত জবাব দেওয়ার অনুমতি থাকলো—"তোমরা

যেখানে তাদেরকে পাবে, হত্যা করবে এবং যদি সম্ভব হয়, তাহলে তারা যেমন তোমাদেরকে মক্কা নগরী থেকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও অনুরূপভাবে তাদেরকে বহিষ্কার করবে।"

পুরো মক্কী যিন্দেগীতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বাধা দান করা হয়েছিল এবং সর্বদা ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। কাজেই এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবীগণের ধারণা হয়েছিল যে, হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে কাফিরদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ও দূষণীয় হয়ে থাকবে। এ ধারণার অপনোদনকল্পে ইরশাদ হলো ঃ

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ –(এবং ফিতনা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা কঠিন অপরাধ)। অর্থাৎ একথা তো অবশ্যই সত্য ও সর্বজনবিদিত যে, নরহত্যা নিকৃষ্ট কর্ম, কিন্তু মক্কার কাফিরদের কুফরী ও শিরকের উপর অটল থাকা এবং মুসলমানদেরকে ওমরাহ্ ও হজ্জের মত ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ। এরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করা হলো। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত فِتْنَةٌ (ফিতনাহ্) শব্দটির দ্বারা কুফর, শিরক এবং মুসলমানদের ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই বোঝানো হয়েছে।–(জাস্সাস, কুরতুবী প্রমুখ)

অবশ্য এ আয়াতের ব্যাপকতার দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফিররা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে হত্যা করা শরীয়তসিদ্ধ। আয়াতের এই ব্যাপকতাকে পরবর্তী বাক্যে এই বলে সীমিত করা হয়েছে ঃ

وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۔

অর্থাৎ "মসজিদুল-হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকা তথা পুরো হরমে মক্কায় তোমরা তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হয়।

মাস'আলা ঃ হরমে-মক্কায় বা সম্মানিত এলাকায় মানুষ তো দূরের কথা, কোন হিংস্র পশু হত্যা করাও জায়েয নয়। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে,যদি কেউ অপরকে হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তখন তার প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা জায়েয। এ মর্মে সমস্ত ফিকহ্‌বিদ একমত।

মাস'আলা ঃ এ আয়াত দ্বারা আরও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রথম অভিযান আক্রমণ বা আগ্রাসন কেবল মসজিদুল-হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা 'হরমে-মক্কায়'ই নিষিদ্ধ। অপরাপর এলাকায় যেমন প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ অপরিহার্য তেমনি প্রথম আক্রমণ বা অভিযানও জায়েয।

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ

فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۭ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا

عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾ اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾ وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾

(১৯২) আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়ালু। (১৯৩) আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালিম (তাদের ব্যাপার আলাদা)। (১৯৪) সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুত যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেযগার, আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন। (১৯৫) আর ব্যয় কর আল্লাহ্র পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (যুদ্ধ শুরু করার পরেও) যদি তারা (অর্থাৎ মক্কার মুশরিকরা নিজেদের কুফরী থেকে) বিরত হয়ে যায় (এবং ইসলাম গ্রহণ করে নেয়), তবে (তাদের এই ইসলাম গ্রহণকে অমর্যাদার চোখে দেখা যাবে না। বরং) আল্লাহ্ (তাদের অতীত কুফরীর অপরাধ) ক্ষমা করে দিবেন (এবং ক্ষমা ছাড়াও অশেষ নেয়ামত প্রদান করে, তাদের প্রতি অনুগ্রহও করবেন। [আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে যদিও অপরাপর কাফিরদের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন এই যে, তারা স্বধর্মে বহাল থাকা সত্ত্বেও যদি ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার এবং জিযিয়া (যুদ্ধকর) প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, তবে তাদের হত্যা করা জায়েয নয়; বরং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের উপর অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এই বিশেষ ধরনের কাফিররা যেহেতু আরবের অধিবাসী, সেহেতু তাদের জন্য জিযিয়া প্রদানের কোন আইন নেই। বরং তাদের জন্যে কেবল দু'টি পথই বিদ্যমান (ক) ইসলাম গ্রহণ অথবা (খ) হত্যা। সুতরাং হে মুসলমানগণ, তোমরা] তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না বিশ্বাসের বিভ্রান্তি (অর্থাৎ শিরক তাদের মধ্য থেকে) তিরোহিত হয়ে যায়। আর (তাদের) দীন (একান্তভাবেই) আল্লাহ্র হয়ে যায়। (কারণ, কারও দীন ও ধর্মমত বা জীবন বিধান একান্তভাবে আল্লাহ্র জন্য হয়ে যাওয়ার অর্থই ইসলাম গ্রহণ করা)। আর যদি তারা (কুফরী থেকে) ফিরে যায়, তবে

(তারা পরকালে ক্ষমা ও রহমতের অধিকারী তো হবেই, তৎসঙ্গে পৃথিবীতে তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে এই আইন বলে দেওয়া হচ্ছে যে, যারা অন্যায়ভাবে আল্লাহ্‌র দান ভুলে কুফরী ও শিরক করতে থাকে, তারা ব্যতীত তাদের কেউ শাস্তি ও দুরবস্থার কবলে নিপতিত হবে না এবং এ সমস্ত লোক যখন ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন আর তাদের অন্যায় থাকলো না। অতএব, তার উপর তখন আর মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি বর্তাবে না। হে মুসলমানগণ! মক্কার কাফিররা যদি তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তবে হারাম মাসে অর্থাৎ যিলকদ মাসে যুদ্ধ করতে হবে বলে তোমরা যে আশঙ্কা করছ সে সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত থাক। কারণ,) হারাম মাসে কেবল সে ক্ষেত্রেই তোমাদের জন্য যুদ্ধ নিষিদ্ধ, যে ক্ষেত্রে কাফিররা তোমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। (কারণ, মূলত হারাম মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়া তো শোধ-প্রতিশোধের ব্যাপার। অতএব, যারা তোমাদের সঙ্গে এই নিষিদ্ধতা মেনে চলে, তোমরাও তাদের বিপক্ষে এই নিষেধাজ্ঞা মেনে চল। আর যদি তারা তোমাদের সঙ্গে এই নিষিদ্ধতা মেনে না চলে, তোমাদের বিপক্ষে সীমাতিক্রম করে, তবে তোমরাও তাদের প্রতি অতটুকুই সীমাতিক্রম কর, যতটুকু তারা করেছে। আর এসব নির্দেশাবলী পালনে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে কোন ক্ষেত্রে আইনের আওতা-বহির্ভূত কোন কিছু না ঘটে যায়। অনন্তর দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে,) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দান ও রহমতসহ ঐসব আল্লাহ্‌ভীরুদের সঙ্গে থাকেন, যারা কোন ক্ষেত্রেই আইনের সীমা অতিক্রম করে না।

একাদশ নির্দেশ ঃ জিহাদে অর্থ ব্যয় ঃ আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জিহাদে জীবন উৎসর্গ করার সঙ্গে সঙ্গে) অর্থ ব্যয় কর এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। (কারণ, যদি এসব ক্ষেত্রে জান-মাল উৎসর্গ করতে কাপুরুষতা ও কৃপণতা প্রদর্শন করতে আরম্ভ কর, তবে তার ফলে তোমাদের প্রতি যারা অনুগত তারা দুর্বল এবং তোমাদের শত্রুরা সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী হয়ে যাবে, যার পরিণতি তোমাদেরকে অনিবার্য ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবে)। আর (যে) কাজই (কর) তা সুষ্ঠু সুন্দরভাবে (সম্পন্ন) করবে, (যেমন যুদ্ধের ক্ষেত্রে যদি খরচ করতে হয়, তবে অন্তর খুলে হৃষ্টচিত্তে সৎ নিয়তে খরচ কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা উৎকৃষ্টভাবে কার্য সম্পাদনকারীদেরকে ভালবাসেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সপ্তম হিজরী সনে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিগত বছরের ওমরাহ্‌র কাযা আদায় করার নিয়তে সাহাবীগণ (রা)-সহ মক্কা অভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন হযরত (সা)-এর সাহাবীগণ জানতেন যে, সেসব কাফিরদের কাছে চুক্তি ও সন্ধির কোনই মর্যাদা নেই। এমনও হতে পারে, তারা সন্ধির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। তখন সে ক্ষেত্রে সাহাবীগণের মনে এই আশংকার উদ্ভব হয় যে, এতে করে হরম-শরীফেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। উপরের আয়াতে সাহাবীগণের এ আশংকার জবাব দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মক্কার হরম-শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মুসলমানদের অবশ্যই অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু যদি কাফিররা হরম-শরীফের এলাকায় মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার মোকাবিলায় মুসলমানদের পক্ষেও যুদ্ধ করা জায়েয।

সাহাবীগণের মনে দ্বিতীয় সন্দেহ এই ছিল যে, এটা যিলকদ মাস এবং সে চার মাসেরই অন্তর্ভুক্ত যেগুলোকে 'আশহুরে-হারাম' বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এই মাসসমূহে কোথাও কারও সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তবে আমরা এই মাসে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করবো। তাঁদের এই দ্বিধা দূর করার জন্যই আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে অর্থাৎ মক্কার হরম-শরীফের সম্মানার্থে শত্রুর হামলা প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা যেমন শরীয়তসিদ্ধ, তেমনিভাবে হারাম মাসে (সম্মানিত মাসেও) যদি কাফিররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার প্রতিরোধকল্পে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জায়েয।

মাস'আলা ঃ আশহুরে-হারাম বা সম্মানিত মাস চারটি-(১) যিলকদ, (২) যিলহজ্জ (৩) মহররম ও (৪) রজব। তন্মধ্যে যিলকদ, যিলহজ্জ ও মহররম আনুক্রমিক ও পরস্পর সংলগ্ন মাস। রজব মাস বিচ্ছিন্ন একটি আলাদা মাস। ইসলাম-পূর্ব যুগে এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহকে হারাম মনে করা হতো। মক্কার মুশরিকরাও এ বিধি মেনে চলতো। ইসলামের প্রাথমিক যুগে হিজরী সপ্তম সন পর্যন্ত এ রীতি-নীতিই বলবৎ ছিল। সেজন্যই সাহাবায়ে কেরামের মনে এই সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়ার এই নির্দেশ 'মনসূখ' (বাতিল) করে ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত ইজমা' মতে যুদ্ধের সাধারণ অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু এখনও এ চার মাসে প্রথমে আক্রমণ না করাই উত্তম। এই মাসগুলোতে কেবল শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করা উচিত। এ হিসাবে একথা বলা একান্তই যথার্থ যে, এ চার মাসের সম্মান এখনও পূর্বের মতই বলবৎ রয়েছে। মক্কার হরম-শরীফে প্রয়োজনবোধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়ায় তার সম্মান ব্যাহত হয়নি; বরং এতে একটা ব্যতিক্রমী অবস্থার উপর আমল করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে মাত্র।

জিহাদে অর্থ ব্যয় ঃ وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (এবং তোমরা আল্লাহ্র পথে খরচ কর)-এই আয়াতে স্বীয় অর্থ সম্পদ থেকে প্রয়োজনমত ব্যয় করা মুসলমানদের প্রতি ফরয হয়েছে, এই আয়াত থেকে ফিকহশাস্ত্রবিদ আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুসলমানদের উপর ফরয যাকাত ব্যতীত আরও এমন কিছু দায়-দায়িত্ব ও খরচের খাত রয়েছে, যেগুলো ফরয। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোন খাত নয় বা সেগুলোর জন্য কোন নির্ধারিত নেসাব বা পরিমাণ নেই, বরং যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকুই খরচ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। আর যদি প্রয়োজন না হয় তবে কিছুই খরচ করা ফরয নয়। জিহাদে অর্থ ব্যয়ও এই পর্যায়ভুক্ত।

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ (এবং স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না)। আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট। এতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে। এখন কথা হলো যে, "ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা" বলতে এক্ষেত্রে কি বোঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের ব্যাখ্যাতাগণের অভিমত বিভিন্ন প্রকার। ইমাম জাস্সাস্ ও ইমাম রাযী (র) বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিভিন্ন উক্তির মাঝে কোন বিরোধ নেই। প্রতিটি উক্তিই গৃহীত হতে পারে। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী

(রা) বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপে জানি। কথা হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন ? এখন আমরা আপন আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখাশোনা করি। এ প্রসঙ্গেই এই আয়াতটি নাযিল হলো, যাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, 'ধ্বংসে'র দ্বারা এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে; জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসেরই কারণ। সেজন্যই হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) সারা জীবনই জিহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা), হুযায়ফা (রা), কাতাদাহ্ (রা) এবং মুজাহিদ ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ তফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের কাছ থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত বারা' ইবনে আযেব (রা) বলেছেন—পাপের কারণে আল্লাহ্র রহমত ও মাগফেরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর। এজন্যই মাগফেরাত সম্পর্কে নিরাশ হওয়া হারাম।

কোন কোন অপরিপক্ব তফসীরকার বলেছেন, বিবি-বাচ্চার হক বিনষ্ট করে আল্লাহ্র রাস্তায় মাত্রাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করাও নিজের হাতে নিজের ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর। এরূপ ব্যাখ্যা অবশ্য জায়েয নয়।

কোন কোন মহাত্মা বলেছেন—এমন সময় যুদ্ধাভিযানে যাওয়াকে নিজের হাতে নিজের ধ্বংস ডেকে আনা বলা যেতে পারে, যখন স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শত্রুর কোন ক্ষতি সাধন করা সম্ভব হবে না, বরং নিজেরাই ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হবো। এরূপ ক্ষেত্রে এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী যুদ্ধাভিযান না-জায়েয।

ইমাম জাস্সাস (র)-এর ভাষ্য অনুযায়ী উপরিউক্ত সমস্ত নির্দেশই এই আয়াত থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ—এই বাক্যে প্রতিটি কাজই সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে। সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করাকে কোরআন 'ইহসান' (احسان) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছে। এ ইহ্সান দু'রকম (১) ইবাদতে ইহ্সান ও (২) দৈনন্দিন কাজকর্মে এবং পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহ্সান। ইবাদতের ইহ্সান সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) 'হাদীসে-জিবরাঈল'-এ ব্যখ্যা দিয়েছেন যে, এমনভাবে ইবাদত কর, যেন তুমি আল্লাহ্কে স্বচক্ষে দেখছ। আর যদি সে পর্যায় পৌঁছতে না পার, তবে এ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন।

এছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে (মু'আমিলাত ও মু'আশারাতে) ইহ্সানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা) বর্ণিত মসনদে আহমদের এক হাদীসে হযরত রসূলে-করীম (সা) বলেছেন ঃ "তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু পছন্দ কর, অন্য লোকদের জন্যও তাই পছন্দ কর। আর যা তোমরা নিজেদের জন্য না-পছন্দ কর, অন্যের জন্যও তা না-পছন্দ করবে।"—(মাযহারী)

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا

تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا

اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ

فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ

ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا

اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ

الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ

اللّٰهُ ؕ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَاۤ

اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪

وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ

الضَّآلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا

اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٩﴾ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ

يَّقُوْلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ

خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً

وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ
مِّمَّا كَسَبُوْا ۚ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ
اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ
وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

(১৯৬) আর তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ্ পরিপূর্ণভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না কোরবানী যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোযা করবে কিংবা খয়রাত দেবে অথবা কোরবানী করবে। আর তোমাদের মধ্যে হজ্জ ও ওমরাহ্ একত্রে একই সাথে পালন করতে চাও তবে যা কিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কোরবানী করাই তার উপর কর্তব্য। বস্তুত যারা কোরবানীর পশু পাবে না, তারা হজ্জের দিনগুলোর মধ্যে রোযা রাখবে তিনটি, আর সাতটি রোযা রাখবে ফিরে যাবার পর। এভাবে দশটি রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ নির্দেশটি তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদুল-হারামের আশেপাশে বসবাস করে না। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। সন্দেহাতীতভাবে জেনো যে, আল্লাহ্‌র আযাব বড়ই কঠিন। (১৯৭) হজ্জের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীর সাথে নিরাভরণ হওয়া জায়েয নয়। না অশোভন কোন কাজ করা, না ঝগড়া-বিবাদ করা হজ্জের সেই সময় জায়েয। আর তোমরা যা কিছু সৎকাজ কর, আল্লাহ্ তা জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাক; হে বুদ্ধিমানগণ! তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন পাপ নেই। (১৯৮) অতঃপর যখন তওয়াফের জন্য ফিরে আসবে আরাফাত থেকে, তখন মাশআরে-হারামের নিকটে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। আর তাঁকে স্মরণ কর তেমনি করে, যেমন তোমাদেরকে হেদায়েত করা হয়েছে আর নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে অজ্ঞ। (১৯৯) অতঃপর তওয়াফের জন্যে দ্রুতগতিতে সেখান থেকে ফিরে আস, যেখান থেকে সবাই ফেরে। আর আল্লাহ্‌র কাছেই মাগফেরাত কামনা

কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, করুণাময়। (২০০) আর অতঃপর যখন হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান-ক্রিয়াদি সমাপ্ত করে সারবে, তখন স্মরণ করবে আল্লাহ্‌কে, যেমন করে তোমরা স্মরণ করতে নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে; বরং তার চেয়েও বেশি স্মরণ করবে। তারপর অনেকে তো বলে যে, হে পরওয়ারদেগার, আমাদেরক দুনিয়াতে দান কর। অথচ তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। (২০১) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (২০২) এদেরই জন্য অংশ রয়েছে নিজেদের উপার্জিত সম্পদের। আর আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (২০৩) আর স্মরণ কর আল্লাহ্‌কে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিনে। অতঃপর যে লোক তাড়াহুড়া করে চলে যাবে, শুধু দু'দিনের মধ্যে, তার জন্যে কোন গোনাহ নেই, আর যে লোক থেকে যাবে তার উপর কোন গোনাহ নেই, অবশ্য যারা ভয় করে। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক এবং নিশ্চিত জেনে রাখ, তোমরা সবাই তাঁর সামনে সমবেত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

দ্বাদশ নির্দেশ ঃ হজ্জ ও ওমরাহ্ প্রভৃতি ঃ আর (যখন হজ্জ ও ওমরাহ্ করতে হয়, তখন) হজ্জ ও ওমরাহ্‌কে আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) জন্য পূর্ণরূপে আদায় কর। (হজ্জের আমলসমূহ ও নিয়ম-কানুন যথাযথ পালনের সঙ্গে সঙ্গে যেন নিয়তও খাঁটি সওয়াব অর্জনেরই থাকে।) অনন্তর যদি (কোন শত্রুর তরফ থেকে অথবা কোন রোগ-ব্যাধির কারণে হজ্জ ও ওমরাহ্ পালনে) বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে (সে ক্ষেত্রে নির্দেশ এই যে,) সামর্থ্যানুযায়ী কুরবানী (-এর পশু জবাই) করবে (এবং হজ্জ ও ওমরাহ্'র যে পরিচ্ছদ ধারণ করেছিলে তা খুলে ফেলবে। একে বলা হয় 'ইহ্‌রাম' খোলা। 'ইহ্‌রাম, খোলার শরীয়তসম্মত পন্থা হলো মাথা মোড়ানো বা চুল কেটে ফেলা। আর চুল ছোট করার হুকুমও তাই।.আর বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহ্‌রাম খোলা শুদ্ধ নয়। বরং) ইহ্‌রাম খোলার উদ্দেশ্যে এমন সময় পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করাবে না, যে পর্যন্ত না (ঐ অবস্থায় যেসব) কুরবানী (-এর পশু জবাই করার নির্দেশ ছিল, সেসব পশু) যথাস্থানে না পৌঁছে যায়! (পশু কুরবানীর এই স্থান হলো সম্মানিত 'হরম' এলাকাভুক্ত। কারণ এসব কুরবানীর পশু হরমের চৌহদ্দির মধ্যেই জবাই করা হয়। সেখানে যদি নিজে না যাওয়া যায়, তবে কারও মাধ্যমে পাঠিয়ে দিতে হবে। যখন কুরবানীর পশু জবাই করার জন্য নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছে জবাই হয়ে যায়, তখন ইহ্‌রাম খোলা জায়েয হবে।) অবশ্য যদি তোমাদের মধ্যে কোন লোক অসুখে পড়ে অথবা মাথায় বেদনা অথবা উকুন ইত্যাদি কারণে কষ্ট পায় (এবং ঐ অসুখ বা কষ্টের কারণে পূর্বেই মাথা মোড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়,) তবে (তার জন্য মাথা মুড়িয়ে) ফিদ্‌ইয়া (অর্থাৎ শরীয়ত নির্ধারিত পরিপূরক) দিয়ে দেওয়ার অনুমতি রয়েছে। সে ব্যক্তি তার এই ফিদ্‌ইয়াটি তিনটি রোযা রেখে (কিংবা ছয়জন মিস্‌কীনকে ফিতরা পরিমাণ অর্থাৎ অর্ধসা' গম) খয়রাত করলে অথবা (একটা ছাগল) জবাই করে দিলেই (ফিদ্‌ইয়া আদায় হয়ে যায়)। অতঃপর যখন তোমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থায় থাকবে (অর্থাৎ পূর্ব

থেকেই যদি কোন ভয়ভীতি বা সংঘর্ষ হওয়ার পর তা তিরোহিত হয়ে যায়, তবে সে ক্ষেত্রে হজ্জ ও ওমরাহ্ সম্পর্কিত কুরবানী প্রত্যেকের কর্তব্য নয়, বরং ঐ ব্যক্তির কর্তব্য) যে লোক ওমরাহ্র সঙ্গে হজ্জ মিলিয়ে লাভবান হয়েছে (অর্থাৎ হজ্জের সময় ওমরাহও করেছে, কেবল তারই উপর সামর্থ্য অনুযায়ী) কুরবানী (পশু জবাই করা) ওয়াজিব (আর যে ব্যক্তি কেবল হজ্জ করেছে বা শুধু ওমরাহ্ করেছে, তার জন্য কুরবানী ওয়াজিব নয়।) অতঃপর (হজ্জের নির্ধারিত দিনে যারা এক সঙ্গে হজ্জ ও ওমরাহ্ করে) যাদের কুরবানীর পশু সংগৃহীত না হয় যেমন দরিদ্র ব্যক্তি তাহলে (তাদের পক্ষে কুরবানীর পরিবর্তে) তিন দিনের রোযা রাখা কর্তব্য, হজ্জের দিনগুলোর মধ্যেই (শেষের দিনটি হচ্ছে যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখ) এছাড়া সাত দিনের (রোযা কর্তব্য) যখন হজ্জ সমাপনান্তে তোমাদের ফিরে যাওয়ার সময় হবে (অর্থাৎ তোমরা যখন হজ্জের যাবতীয় কাজ শেষ করে ফেলবে, তা তোমরা ফিরে যাও কিংবা সেখানেই থাক।) এভাবে পূর্ণ দশ (দিনের রোযা) হয়ে গেল। (আর একথাও মনে রেখো, এইমাত্র হজ্জ ও ওমরাহ্ একত্রে পালন করার যে নির্দেশ এসেছে) তা (সবার জন্য জায়েয নয়, বরং বিশেষভাবে) সে ব্যক্তির জন্য (জায়েয) যার পরিবার (পরিজন) মসজিদুল হারামের (অর্থাৎ কা'বা ঘরের) নিকটে (আশেপাশে) থাকে না (অর্থাৎ মক্কার জন্য ইহ্রাম বাঁধার যে সীমানা নির্ধারিত রয়েছে, তার ভেতরে যাদের বাড়ি নয়।) আর (সেসব নির্দেশ সম্পাদন করতে গিয়ে) আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক (যাতে কোন বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম ঘটতে না পারে) এবং (নিশ্চিত করে) জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা (বিরুদ্ধাচারীদিগকে) কঠিন শাস্তি দান করে থাকেন।

হজ্জের (অনুষ্ঠান পালনের) জন্য কতিপয় মাস রয়েছে, যা (প্রসিদ্ধ এবং সবারই কাছে) সুবিদিত। (তার একটি হলো শাওয়াল মাস, দ্বিতীয়টি যিলকদ মাস এবং তৃতীয়টি যিলহজ্জ মাসের দশটি দিন)। সুতরাং যে সব লোক এসব (দিন)-এর মধ্যে (নিজের উপর) হজ্জের দায়িত্ব আরোপ করে নেয় (অর্থাৎ হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে নেয়) তখন (তার জন্য) না কোন অশালীন কথা বলা (জায়েয) হবে, না কোন প্রকার নির্দেশ লংঘন করা চলবে। আর (তার পক্ষে) না কোন প্রকার ঝগড়া (বিবাদ) করা সমীচীন হবে। (বরং তার কর্তব্য হবে সর্বক্ষণ সৎ কাজে মনোনিবেশ করা।) আর (তোমাদের মধ্যে) যারা যে সৎ কাজ করবে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত থাকেন। (কাজেই তোমরা তার যথার্থ প্রতিদান পাবে।) আর (তোমরা যখন হজ্জের জন্য রওনা হবে তখন প্রয়োজনীয়) খরচ অবশ্যই (সাথে) নিয়ে নেবে। সবচেয়ে বড় কথা (এবং সৌন্দর্য) হচ্ছে, খরচের বেলায় (দারিদ্র্য প্রদর্শন থেকে) বেঁচে থাকা। আর তোমরা যারা বুদ্ধিমান, (এ সব নির্দেশ পালনের বেলায়) আমাকে ভয় করতে থাক (এবং কোন নির্দেশের ব্যতিক্রম করো না)।

(হজ্জের সফরে যাবার সময় যদি তোমরা কিছু বাণিজ্যিক সামগ্রী সাথে নিয়ে নেওয়া ভাল মনে কর, তাহলে) তাতে তোমাদের (হজ্জের মাঝে) সেটুকু জীবিকার অন্বেষণ করার কোনই পাপ হবে না, যা আল্লাহ্ তা'আলা (তোমাদের ভাগ্যে লিখে) রেখেছেন। অতঃপর তোমরা যখন আরাফাতে অবস্থানের পর সেখান থেকে ফেরার পথে মাশআরে হারাম-এর নিকটে (অর্থাৎ মুযদালিফায় এসে রাত্রি যাপন কর এবং) আল্লাহ্কে স্মরণ কর (কিন্তু এই স্মরণ করার যে

নিয়ম তাতে নিজের কোন মতামত আরোপ করো না, বরং) তেমনিভাবে স্মরণ করবে, যেমন করে (আল্লাহ্ স্বয়ং) বাতলে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে (আল্লাহ্ কর্তৃক বাতলে দেওয়ার) পূর্বে তোমরা ছিলে নির্বোধ, অজ্ঞ। এছাড়া (এখানে আরও কতিপয় বিষয় স্মরণ রেখো—ইতিপূর্বে কোরাইশরা যেমন নিয়ম করে রেখেছিল যে, সমস্ত হাজী আরাফাত হয়ে সেখান থেকে মুযদালিফায় ফিরে যেতেন, আর) তারা সেখানেই রয়ে যেত; আরাফাতে যেতো না। কিন্তু তা জায়েয নয়, বরং তোমাদের সবাই (কোরাইশ কিংবা অ-কোরাইশ) সে স্থানটি হয়েই আসা কর্তব্য, যেখানে গিয়ে অন্যান্য সবাই ফিরে আসেন। আর (হজ্জের নির্দেশাবলীর ব্যাপারে পুরাতন রীতিনীতির উপর আমল করে থাকলে) আল্লাহ্র দরবারে তওবা কর। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা করে দেবেন এবং অনুগ্রহ করবেন।

(জাহিলিয়াত আমলে কারও কারও অভ্যাস ছিল যে, হজ্জ সমাপনান্তে তারা মিনা'তে সমবেত হয়ে নিজেদের পিতা-পিতামহের গৌরব-বৈশিষ্ট্য বিবৃত করত; বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা এসব নিরর্থক কার্যকলাপের পরিবর্তে স্বীয় আলোচনার শিক্ষা দানকল্পে বলেন,) অতঃপর তোমরা যখন নিজেদের হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করে নেবে, তখন (কৃতজ্ঞতা ও মাহাত্ম্যের সঙ্গে) আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করো, যেমন করে তোমরা নিজেদের পিতৃ-পুরুষের স্মরণ করে থাক, বরং এই যিকির তার চেয়েও (বহু গুণ) গভীর হবে। (এবং তাই কর্তব্য। এ ছাড়া আরো কিছু লোকের অভ্যাস ছিল, হজ্জের মাঝে তারা আল্লাহ্রই যিকির করত, কিন্তু যেহেতু তারা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না, তাই তাদের যাবতীয় যিকির পার্থিব কল্যাণ কামনায় ব্যয়িত হতো। আল্লাহ্ তা'আলা শুধু দুনিয়ার সম্পদ লাভের বাসনার নিন্দা করে তদস্থলে দুনিয়া ও আখিরাত—এ উভয় জাহানের কল্যাণ প্রার্থনার প্রতি উৎসাহ দান প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন ঃ) অতএব, কোন কোন লোক (অর্থাৎ কাফির) এমনও রয়েছে যারা (প্রার্থনা করতে গিয়ে বলে ঃ) হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে (যা কিছু দান করবে) এ দুনিয়াতেই দিয়ে দাও (এ-ই যথেষ্ট। সুতরাং তাদের যা কিছু প্রাপ্য, তা তারা দুনিয়াতেই পাবে)। আর এহেন ব্যক্তি আখেরাতে (তার প্রতি অবিশ্বাস হেতু) কোন অংশই পাবে না। আবার কেউ কেউ (অর্থাৎ ঈমানদার) এমনও রয়েছে, যারা প্রার্থনা করতে গিয়ে বলে, ইয়া পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (বস্তুত এরা উপরোক্ত লোকদের মত হতভাগ্য নয়। বরং) এমন সব ব্যক্তিকে (উভয় জাহানের) বিরাট অংশ দেওয়া হবে, তাদের এই আমল (অর্থাৎ উভয় জাহানের কল্যাণ কামনার কারণে।) আর আল্লাহ্ শীঘ্রই হিসাব গ্রহণ করবেন। (কারণ কিয়ামতে হিসাব-নিকাশ হবে, আর কিয়ামত ক্রমাগতই ঘনিয়ে আসছে। শীঘ্রই যখন হিসাব গৃহীত হতে যাচ্ছে, তখন সেখানকার মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে যেয়ো না।) আর ('মিনা'তে বিশেষ প্রক্রিয়ায়) আল্লাহ্কে স্মরণ কর কয়েকদিন পর্যন্ত। (বিশেষত সে প্রক্রিয়া হচ্ছে নির্দিষ্ট পাথরের প্রতি কাঁকর নিক্ষেপ করা। আর সে কয়েকটি দিন হচ্ছে, যিলহজ্জ মাসের দশ, এগার ও বার তারিখ কিংবা তের তারিখও বটে, যাতে কাঁকর নিক্ষেপ করা হয়)। তারপর যে লোক কাঁকর নিক্ষেপ করে (দশই তারিখের পর) দু'দিনের মধ্যে (মক্কায় ফিরে আসার ব্যাপারে) তাড়াহুড়া

করে, তার কোন পাপ হবে না। আর যে লোক (উল্লিখিত) দু'দিনের মাঝে (মক্কায়) ফিরে আসার ব্যাপারে দেরি করে (অর্থাৎ ১২ তারিখে না এসে বরং ১৩ তারিখে আসে) তারও কোন পাপ হবে না। (আর এসব বিষয়) তার জন্যই (নির্ধারিত) যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে (এবং যে ভয় করে না, তার তো পাপ-পুণ্যের কোন বালাই নেই)। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস রেখো, তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যেতে হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হজ্জ ও ওমরার আহ্‌কাম ঃ 'বির্' বা প্রকৃত সৎকর্ম সংক্রান্ত পরিচ্ছেদসমূহ, যার ধারা সূরা বাকারার মাঝামাঝি থেকে চলছে, তাতে ১১তম নির্দেশ হচ্ছে হজ্জ সংক্রান্ত। আর হজ্জের সম্পর্ক যেহেতু মক্কা-মোকাররমা ও বায়তুল্লাহ অর্থাৎ কা'বা গৃহের সাথে জড়িত, সুতরাং এর সাথে সম্পৃক্ত কিছু মাস'আলা-মাসায়েল প্রসঙ্গক্রমে কেবলার বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা বাকারার ১২৫তম আয়াত থেকে ১২৮তম আয়াত পর্যন্ত (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً থেকে وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا পর্যন্ত) আলোচিত হয়েছে। অতঃপর কেবলার প্রসঙ্গান্তে إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ আয়াতে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী করার নির্দেশও প্রসঙ্গত বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে আয়াত ১৯৬ থেকে ২০৩ পর্যন্ত (অর্থাৎ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ থেকে শুরু করে فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ পর্যন্ত) ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও ওমরাহ্‌র আহ্‌কাম ও মাসায়েলের সাথে সম্পৃক্ত।

হজ্জ সর্বসম্মতভাবে ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে একটি রুক্‌ন এবং ইসলামের ফরায়েয বা অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কোরআনের বহু আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে এর প্রতি তাকীদ করা হয়েছে এবং এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অধিকাংশ ওলামায়ে-কেরামের মতে হিজরী তৃতীয় বছর, যে বছর ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সে বছরই সূরা আলে-ইমরানের একটি (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) আয়াতের মাধ্যমে হজ্জ ফরয করা হয়েছে। (ইবনে কাসীর) এ আয়াতেই হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ এবং মর্মার্থ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উপরোল্লিখিত আটটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াত أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ-মুফাসসিরীনের ঐকমত্য অনুযায়ী হুদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যা ৬ষ্ঠ হিজরী সালে সংঘটিত হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয় বাতলানো নয়, তা পূর্বেই বাতলে দেওয়া হয়েছে, বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো হজ্জ ও ওমরাহ্‌র কিছু বিশেষ নির্দেশ বর্ণনা করা।

ওমরার আহ্‌কাম ঃ সূরা আলে-ইমরানের যে আয়াতের মাধ্যমে হজ্জ ফরয করা হয়েছে তাতে যেহেতু শুধু হজ্জের কথাই বলা হয়েছে, ওমরার কোন আলোচনাই করা হয়নি, আর এই আয়াতে যাতে শুধু ওমরার কথাই আলোচনা করা হয়েছে, এর ফরয কিংবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন কথাই বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে যে, কোন লোক যদি ইহরামের মাধ্যমে হজ্জ

অথবা ওমরাহ আরম্ভ করে, তাহলে তার পক্ষে তা সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন সাধারণ নফল নামায-রোযার ব্যাপারে এই হুকুম যে, তা আরম্ভ করলে সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। কাজেই এই আয়াতের দ্বারা ওমরাহ ওয়াজিব কি না তা বোঝায় না। বরং আরম্ভ করলে শেষ করতে হবে, তাই বোঝায়।

ইবনে কাসীর হযরত জাবিরের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ তিনি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। হুযূর ! ওমরাহ কি ওয়াজিব ? তিনি বলেছিলেন ঃ ওয়াজিব নয়, তবে যদি কর, খুবই ভাল। তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীস সহীহ ও হাসান। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মালেক (র) প্রমুখ ওমরাহকে ওয়াজিব বলেননি, সুন্নত বলে গণ্য করেছেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্জ অথবা ওমরাহ্ শুরু করলে তা আদায় করা ওয়াজিব। তবে প্রশ্ন উঠে, যদি কোন ব্যক্তি ওমরাহ্ শুরু করার পর কোন অসুবিধায় পড়ে তা আদায় করতে না পারে তাহলে কি হবে ? এর উত্তর পরবর্তী فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ –বাক্যে দেওয়া হয়েছে।

ইহ্‌রাম বাঁধার পর কোন অসুবিধার জন্য হজ্জ অথবা ওমরাহ্ আদায় করতে না পারলে কি করতে হবে ? ঃ এ আয়াত হুদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন রাসূল (সা) এবং সাহাবীগণ ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু মক্কার কাফিররা তাঁদেরকে হেরেমের সীমায় প্রবেশ করতে দেয়নি। ফলে তাঁরা ওমরাহ্ আদায় করতে পারলেন না। তখন আদেশ হলো ইহ্‌রামের ফিদইয়া স্বরূপ একটি করে কুরবানী কর। কুরবানী করে ইহ্‌রাম ভেংগে ফেল। কিন্তু সাথে সাথে পরবর্তী আয়াত– وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُسَكُمْ -এ বলে দেওয়া হয়েছে যে, ইহ্‌রাম খোলার শরীয়তসম্মত ব্যবস্থা মাথার চুল কাটা বা ছাঁটা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয়, যতক্ষণ না ইহ্‌রামকারীর কুরবানী নির্ধারিত স্থানে পৌছবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে নির্ধারিত স্থানের সীমানা হচ্ছে হেরেমের এলাকায় পৌছে কুরবানীর পশু জবেহ করা। তা নিজে না পারলে অন্যের দ্বারা জবাই করাতে হবে। এ আয়াতে অপারকতা অর্থ হচ্ছে, রাস্তায় কোন শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া বা প্রাণনাশের আশংকা থাকা। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) ও অন্যান্য কোন কোন ইমাম অসুস্থতাকেও অপারকতার আওতাভুক্ত করেছেন। তবে রাসূল (সা)-এর আমল দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরবানী করেই ইহ্‌রাম ছাড়তে হবে। কিন্তু বাতিলকৃত হজ্জ বা ওমরাহ্ কাযা করা ওয়াজিব। যেমন হুযূর (সা) এবং সাহাবায়ে কেরাম হুদায়বিয়া সন্ধির পরবর্তী বছর উল্লিখিত ওমরাহ্‌র কাযা আদায় করেছিলেন।

এ আয়াতে মাথা মুণ্ডনকে ইহ্‌রাম ভঙ্গ করার নিদর্শন বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাঁটা অথবা কাটা নিষিদ্ধ। এ হিসাবে পরবর্তী নির্দেশে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি হজ্জ ও ওমরাহ্ আদায় করতে গিয়ে কোন অসুবিধার সম্মুখীন নাও হয়, কিন্তু অন্য কোন অসুবিধার দরুন মাথা মুণ্ডন করতে বা মাথার চুল কাটাতে বাধ্য হয়, তবে তাকে কি করতে হবে ?

ইহ্‌রাম অবস্থায় কোন কারণে মাথা মুণ্ডন করলে কি করতে হবে ? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি কোন অসুস্থতার দরুন

মাথা বা শরীরের অন্য কোন স্থানের চুল কাটতে হয় অথবা মাথায় উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট পায়, তবে এমতাবস্থায় মাথার চুল বা শরীরের অন্য কোন স্থানের লোম কাটা জায়েয। কিন্তু এর ফিদইয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, আর তা হচ্ছে রোযা রাখা বা সদকা দেওয়া বা কুরবানী করা। কুরবানীর জন্য হেরেমের সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু রোযা রাখা বা সদকা দেওয়ার জন্য কোন বিশেষ স্থান নির্ধারিত নেই। তা যে কোন স্থানে আদায় করা চলে। কোরআনের শব্দের মধ্যে রোযার কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকারও কোন পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু রাসূলে করীম (সা) সাহাবী কা'আব ইবনে 'উজরাহ্র এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেছেন, তিনটি রোযা এবং ছয়জন মিসকীনকে মাথা পিছু অর্ধ সা' গম দিতে হবে। (বোখারী)

অর্ধ সা' আমাদের দেশে প্রচলিত ৮০ তোলার সের হিসাবে প্রায় পৌনে দু-সের গমের সমান। এ পরিমাণ গমের মূল্য দিয়ে দিলেও চলবে।

হজ্জ মৌসুমে হজ্জ ও ওমরাহ্ একত্রে আদায় করার নিয়ম ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে আরববাসীদের ধারণা ছিল হজ্জের মাস আরম্ভ হয়ে গেলে অর্থাৎ শাওয়াল মাস এসে গেলে হজ্জ ও ওমরাহ্ একত্রে আদায় করা অত্যন্ত পাপ।

এ আয়াতে তাদের এ ধারণার নিরসন করে বলা হয়েছে যে, মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্য এ সময়ের মধ্যে হজ্জ ও ওমরাহ্ একত্রে সমাধা করা নিষেধ। কারণ তাদের পক্ষে হজ্জের মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ওমরাহ্র জন্য দ্বিতীয়বার মীকাতে গমন করা তেমন অসুবিধার ব্যাপার নয়। কিন্তু এ সীমারেখার বাইরে থেকে যারা হজ্জ করতে আসে, তাদের জন্যে দু'টিকেই একত্রে আদায় করা জায়েয করে দেওয়া হয়েছে। কেননা এত দূর-দূরান্ত থেকে ওমরার জন্য পৃথকভাবে ভ্রমণ করা খুবই কঠিন ও অসুবিধাজনক। সে সমস্ত নির্ধারিত স্থানকে মীকাত বলা হয়, যা সারা বিশ্বের হজ্জযাত্রীগণ যিনি যে দিক হতে আগমন করেন, যেসব রাস্তার প্রত্যেকটিতে একটি স্থান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। যখনই মক্কায় আগমনকারীরা এ স্থানে আসবে, তখন হজ্জ অথবা ওমরাহ্র নিয়তে ইহ্রাম করা আবশ্যক। ইহ্রাম ব্যতীত এ স্থান হতে সামনে অগ্রসর হওয়া গোনাহের কাজ। যেমন বলা হয়েছে لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ-এর অর্থ তাই। অর্থাৎ যাদের পরিবার-পরিজন মীকাতের সীমারেখার অভ্যন্তরে বসবাস করে না, তাদের জন্য হজ্জ ও ওমরাহ্ হজ্জের মাসে একত্রে করা জায়েয।

অবশ্যই যারা হজ্জের মৌসুমে হজ্জ ও ওমরাহ্কে একত্রে আদায় করে, তাদের উপর এ দু'টি ইবাদতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। তা হচ্ছে, কুরবানী করার সামর্থ্য যাদের রয়েছে তারা বকরী, গাভী, উট প্রভৃতি যা তাদের জন্য সহজলভ্য হয় তা থেকে কোন একটি পশু কুরবানী করবে। কিন্তু যাদের কুরবানী করার মত আর্থিক সঙ্গতি নেই তারা দশটি রোযা রাখবে। হজ্জের ৯ তারিখ পর্যন্ত তিনটি আর হজ্জ সমাপনের পর সাতটি রোযা রাখতে হবে। এ সাতটি রোযা যেখানে এবং যখন সুবিধা, তখনই আদায় করতে পারে। হজ্জের মধ্যে যে ব্যক্তি তিনটি রোযা পালন করতে না পারে, ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীর

মতে তাদের জন্য কুরবানী করাই ওয়াজিব। যখন সামর্থ্য হয়, তখন কারো দ্বারা হেরেম শরীফে কুরবানী আদায় করবে।

তামাত্তু ও কেরান ঃ হজ্জের মাসে হজ্জের সাথে ওমরাহ্কে একত্রিকরণের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে—মীকাত হতে হজ্জ ও ওমরাহ্র জন্য একত্রে ইহ্রাম করা। শরীয়তের পরিভাষায় একে 'হজ্জে-কেরান' বলা হয়। এর ইহ্রাম হজ্জের ইহ্রামের সাথেই ছাড়তে হয়, হজ্জের শেষ দিন পর্যন্ত তাকে ইহ্রাম অবস্থায়ই কাটাতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, মীকাত হতে শুধু ওমরাহ্র ইহ্রাম করবে। মক্কা আগমনের পর ওমরাহ্র কাজকর্ম শেষ করে ইহ্রাম খুলবে এবং ৮ই যিলহজ্জ তারিখে মিনা যাবার প্রাক্কালে হারাম শরীফের মধ্যেই হজ্জের জন্য ইহ্রাম বেঁধে নেবে। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় তামাত্তু কিন্তু فَمَنْ تَمَتَّعَ এ সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

হজ্জ ও ওমরার আহ্কামের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাতে গাফলতি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধঃ শেষ আয়াতটিতে প্রথমে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে; যার অর্থ এসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত, সাবধান ও ভীত থাকা বোঝায়। অতঃপর বলা হয়েছে— وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি জেনেশুনে আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আজকাল হজ্জ ও ওমরাহ্কারীগণের অধিকাংশই এ সম্পর্কে অসতর্ক। তারা প্রথমত হজ্জ ও ওমরাহ্র নিয়মাবলী জানতেই চেষ্টা করে না। আর যদিও বা জেনে নেয়, অনেকেই তা যথাযথভাবে পালন করে না। অনেকেই দায়িত্ব-জ্ঞানহীন মোয়াল্লেম ও সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে অনেক ওয়াজিবও পরিত্যাগ করে। আর সুন্নত ও মুস্তাহাবের তো কথাই নেই। আল্লাহ্ সবাইকে নিজ নিজ আমল যথাযথভাবে পালন করার তওফীক দান করুন।

হজ্জ সংক্রান্ত ৮টি আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় আয়াত ও তার মাস'আলাসমূহ ঃ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ 'আশহুরুন' শব্দটি 'শাহরুন' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ—মাস। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, যারা হজ্জ অথবা ওমরাহ্ করার নিয়তে ইহ্রাম বাঁধে, তাদের উপর এর সকল অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এ দু'টির মধ্যে ওমরাহ্র জন্য কোন সময় নির্ধারিত নেই। বছরের যে কোন সময় তা আদায় করা যায়। কিন্তু হজ্জের মাস এবং এর অনুষ্ঠানাদি আদায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই এ আয়াতের শুরুতেই বলে দেওয়া হয়েছে যে, হজ্জের ব্যাপারটি ওমরাহ্র মত নয়। এর জন্য কয়েকটি মাস নির্ধারিত রয়েছে—সেগুলি প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। জাহিলিয়তের যুগ থেকে ইসলামের আবির্ভাবের যুগ পর্যন্ত এ মাসগুলোই হজ্জের মাসরূপে গণ্য হয়ে আসছে। আর তা হচ্ছে শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জের দশ দিন। আবু উমামাহ্ ও ইবনে উমর (রা) হতে তা-ই বর্ণিত হয়েছে।-(মাযহারী)

হজ্জের মাস শাওয়াল হতে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা জায়েয নয়। কোন কোন ইমামের মতে শাওয়ালের পূর্বে হজ্জের ইহ্রাম করলে হজ্জ আদায়ই হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে হজ্জ অবশ্য আদায় হবে, কিন্তু মাকরূহ হবে। -(মাযহারী)

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ .

–এ আয়াতে হজ্জের ইহ্‌রামকারীদের জন্য নিষিদ্ধ কাজ-কর্মের কিছুটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ইহ্‌রাম অবস্থায় যেসব বিষয় থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য ও ওয়াজিব। আর তা হচ্ছে 'রাফাস', 'ফুসূক' ও 'জিদাল'। رفث 'রাফাস' একটি ব্যাপক শব্দ, যাতে স্ত্রী-সহবাস ও তার আনুষঙ্গিক কর্ম, স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাও এর অন্তর্ভুক্ত। ইহ্‌রাম অবস্থায় এ সবই হারাম। অবশ্য আকার-ইঙ্গিত দূষণীয় নয়।

فسوق 'ফুসূক'-এর শাব্দিক অর্থ বাহির হওয়া। কোরআনের ভাষায় নির্দেশ লংঘন বা নাফরমানী করাকে 'ফুসূক' বলা হয়। সাধারণ অর্থে যাবতীয় পাপকেই 'ফুসূক' বলে। তাই অনেকে এস্থলে সাধারণ অর্থই নিয়েছেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) এস্থলে 'ফুসূক' শব্দের অর্থ করেছেন—সে সকল কাজ-কর্ম, যা ইহ্‌রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। স্থান অনুসারে এই ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। কারণ সাধারণ পাপ ইহ্‌রামের অবস্থাতেই শুধু নয়, বরং সব সময়ই নিষিদ্ধ।

যে সমস্ত বিষয় প্রকৃতপক্ষে নাজায়েয ও নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু ইহ্‌রামের জন্য নিষিদ্ধ ও না-জায়েয তা হচ্ছে ছয়টি ঃ

(১) স্ত্রী-সহবাস ও এর আনুষঙ্গিক যাবতীয় আচরণ, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা। (২) স্থলভাগের জীবজন্তু শিকার করা বা শিকারীকে বলে দেওয়া (৩) নখ বা চুল কাটা। (৪) সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার। এ চারটি বিষয় স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই ইহ্‌রাম অবস্থায় হারাম বা নিষিদ্ধ।

অবশিষ্ট দু'টি বিষয় পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত। (৫) সেলাই করা কাপড় পরিধান করা (৬) মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা। অবশ্য মুখমণ্ডল আবৃত করা স্ত্রীলোকদের জন্যও না-জায়েয।

আলোচ্য ছ'টি বিষয়ের মধ্যে স্ত্রী-সহবাস যদিও 'ফুসূক' শব্দের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি একে 'রাফাস' শব্দের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে এজন্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় এ কাজ হতে বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এর কোন ক্ষতিপূরণ বা বদলা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। কোন কোন অবস্থায় এটা এত মারাত্মক যে, এতে হজ্জই বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য অন্য কাজগুলোর কাফ্‌ফারা বা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আরাফাতে অবস্থান শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রী-সহবাস করলে হজ্জ ফাসেদ হয়ে যাবে। গাভী বা উট দ্বারা এর কাফ্‌ফারা দিয়েও পর বছর পুনরায় হজ্জ করতেই হবে। এজন্যই فَلَا رَفَثَ শব্দ ব্যবহার করে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

جدال শব্দের অর্থে একে অপরকে পরাস্ত করার চেষ্টা করা। এজন্যই বড় রকমের বিবাদকে جدال বলা হয়। এ শব্দটিও অতি ব্যাপক। কোন কোন মুফাস্‌সির এ শব্দের ব্যাপক অর্থই গ্রহণ করেছেন। আবার অনেকে হজ্জ ও ইহ্‌রামের সম্পর্ক হেতু এখানে 'জিদাল'-এর অর্থ করেছেন যে, জাহিলিয়তের যুগে আরববাসিগণ অবস্থানের স্থান নিয়ে মতানৈক্য করতো; কেউ কেউ আরাফাতে অবস্থান করাকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করতো, আবার কেউ কেউ মুযদালিফাতে অবস্থানকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করতো। তারা আরাফাতে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করতো না। পথিমধ্যে অবস্থিত একটি স্থানকেই ইবরাহীম (আ)-এর নির্ধারিত অবস্থানস্থল বলে মনে

করতো। এমনিভাবে হজ্জের সময় সম্পর্কেও তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতো। কেউ কেউ যিলহজ্জ মাসে হজ্জ করতো, আবার কেউ কেউ যিলকদ মাসে। এসব ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হতে থাকতো এবং এজন্য একে অপরকে পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত করতো। তাই কোরআনে করীম لَا جِدَالَ বলে এসব বিবাদের মূলোৎপাটন করেছে। আর আরাফাতে অবস্থানকে ফরয এবং মুযদালিফাতে অবস্থানকে ওয়াজিব করা হয়েছে। এটাই হক ও সঠিক। উপরন্তু যিলহজ্জ মাসের নির্ধারিত দিনগুলোতেই হজ্জ আদায় করতে হবে—এ ঘোষণা করে এর বিরুদ্ধে ঝগড়া করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ এ স্থলে 'ফুসূক' ও 'জিদাল' শব্দদ্বয়কে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করে এ অর্থ নিয়েছেন যে, 'ফুসূক' ও 'জিদাল' সবক্ষেত্রেই পাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু ইহ্‌রামের অবস্থায় এর পাপ আরো অধিক। পবিত্র দিনসমূহে এবং পবিত্র স্থানে, যেখানে কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য আগমন করা হয়েছে এবং 'লাব্বাইকা লাব্বাইকা' বলা হচ্ছে, ইহ্‌রামের পোশাক তাদেরকে সব সময় একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা এখন ইবাদতে ব্যস্ত, এমতাবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি অত্যন্ত অন্যায় ও চরমতম নাফরমানীর কাজ।

সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে 'ফুসূক', 'রাফাস' ও 'জিদাল' থেকে বিরত করা এবং এসব বিষয়কে হারাম গণ্য করার একটা কারণ এও হতে পারে যে, হজ্জের স্থান ও সময় মানুষের অবস্থা এমনি দাঁড়ায় যে, তার ফলে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার বহু আশংকা সৃষ্টি হয়। ইহ্‌রামের সময় প্রায়ই দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজের পরিবার-পরিজন থেকে বহু দূরে অবস্থান করতে হয়। তাছাড়া তওয়াফ, সায়ী, আরাফাত, মুযদালিফা ও মিনার সমাবেশে যতই সতর্কতা অবলম্বন করা হোক, স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা হয়েই থাকে। এমতাবস্থায় পূর্ণ সংযম অবলম্বন করা সহজ ব্যাপার নয়। কাজেই সর্বপ্রথম রাফাস-এর হারামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এমনিভাবে এ সমাবেশে চুরি ও অন্যান্য পাপ বা অপরাধও সাধারণত হওয়ার আশংকা থাকে প্রচুর। সেজন্য وَلَا فُسُوْقَ বলে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে হজ্জব্রত পালনের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এমন বহু সময় আসে, যাতে সফরসঙ্গী ও অন্যান্য মানুষের সাথে জায়গা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া বাধার খুবই আশংকা থাকে। কাজেই وَلَا جِدَالَ (কোন বিবাদ-বিসংবাদ নয়) বলে এ সবকিছু থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কোরআনের ভাষালঙ্কার ঃ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ আয়াতের শব্দগুলো 'না'-বাচক। হজ্জের মধ্যে এসব বিষয় নেই, অথচ উদ্দেশ্য হচ্ছে এ সকল বিষয়ের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা; যার জন্য لَا تَرْفُثُوْا وَلَا تَفْسُقُوْا وَلَا تُجَادِلُوْا শব্দ ব্যবহার করা উচিত ছিল। কিন্তু এখানে না-সূচক শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হজ্জের মধ্যে এসব বিষয়ের কোন অবকাশ নেই। এমনকি এ সবের কল্পনাও হতে পারে না। وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ইহ্‌রামকালে নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্ণনা করার পর উল্লিখিত বাক্যে হেদায়েত করা হচ্ছে যে, হজ্জের পবিত্র সময়ে ও পূতঃ স্থানগুলোতে শুধু নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আল্লাহ্‌র যিকির ও ইবাদত এবং সৎ কাজে সদা আত্মনিয়োগ কর। তুমি যে কাজই কর না কেন, তা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন; আর এতে তোমাদেরকে অতি উত্তম বখশিশও দেওয়া হবে।

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى –এ আয়াতে ঐ সমস্ত ব্যক্তির সংশোধনী পেশ করা হয়েছে, যাঁরা হজ্জ ও ওমরাহ্ করার জন্য নিঃস্ব অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে। অথচ দাবি করে যে, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করছি। পক্ষান্তরে পথে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। নিজেও কষ্ট করে এবং অন্যকেও পেরেশান করে বলে, তাদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, হজ্জের উদ্দেশ্যে সফর করার আগে প্রয়োজনীয় পাথেয় সাথে নেওয়া বাঞ্ছনীয়, এটা তাওয়াক্কুলের অন্তরায় নয়। বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার প্রকৃত অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্‌প্রদত্ত আসবাবপত্র নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ ও জমা করে নিয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। হুযূর (সা) হতে তাওয়াক্কুলের এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। নিঃস্বতার নাম তাওয়াক্কুল বলা মূর্খতারই নামান্তর।

হজ্জের সফরে ব্যবসা করা বা অন্যের কাজ করে রোজগার করা ঃ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ –অর্থাৎ 'হজ্জের উদ্দেশ্যে সফরকালে ব্যবসায় বা মজ্‌দুরী করে কিছু রোজগার করে নিলে কিংবা আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিকের অন্বেষণ করলে তা তোমাদের জন্য দূষণীয় নয়।'

এ আয়াতের শানে-নুযুলের ঘটনা হচ্ছে এই যে, জাহিলিয়তের যুগে আরববাসিগণ যাবতীয় ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠানকে বিকৃত করে তাতে নানারকম অর্থহীন বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল এবং ইবাদতকেও একেকটা তামাশার বস্তুতে পরিণত করে দিয়েছিল। এমনিভাবে হজ্জের আচার-অনুষ্ঠানেও তারা নানারকম গর্হিত কার্যকলাপে লিপ্ত হতো। মিনার সমাবেশ উপলক্ষে তাদের বিশেষ আড়ং বসত। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হতো। ব্যবসা সম্প্রসারণের নানারকম ব্যবস্থা নেওয়া হতো। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পরে যখন মুসলমানদের উপর হজ্জ ফরয এবং এসব বেহুদা প্রথা রহিত করে দেওয়া হয়, তখন সাহাবীগণ (রা) যাঁরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও রাসূল (সা)-এর শিক্ষার পিছনে স্বীয় জানমাল কুরবান করতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁরা ভাবলেন, হজ্জের মওসুমে ব্যবসা বা কাজকর্ম করে কিছু উপার্জন করাও তো অন্ধকার যুগেরই উদ্ভাবন। ইসলাম হয়তো একে সম্পূর্ণ নিষেধ ও হারাম বলেই ঘোষণা করে দেবে। এমনকি এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর নিকট এসে প্রশ্ন করলেন, উট ভাড়া দেওয়া পূর্ব থেকেই আমার ব্যবসা। হজ্জের মওসুমে কেউ কেউ আমার উট ভাড়ায় নেয়, আমিও তাদের সাথে যাই এবং হজ্জ করে আসি। তাতে কি আমার হজ্জ সিদ্ধ হবে না ? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বললেন, রাসূল (সা)-এর নিকটও এমনি এক ব্যক্তি এসেছিল এবং এমনি প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু তিনি لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে কোন উত্তর দেন নি। আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর তিনি তাকে ডেকে বলেন, হ্যাঁ তোমার হজ্জ শুদ্ধ হবে।

যা হোক, এ আয়াতে একথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, হজ্জের সফরকালে কোন ব্যক্তি যদি কিছু ব্যবসা বা পরিশ্রম করে কিছু উপার্জন করে নেয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। তবে আরবের কাফিররা হজ্জকে যেরূপ ব্যবসার বাজার ও তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছিল, কোরআন দু'টি বাক্যের দ্বারা তার সংশোধন করে দিয়েছে। তার একটি হলো এই যে, তোমরা

যা কিছু উপার্জন করবে তা আল্লাহ্র অনুগ্রহ বিবেচনা করে সেজন্য কৃতজ্ঞ থাকবে। তাতে শুধু মুনাফা সংগ্রহই যেন উদ্দেশ্য না হয়।

فضلا من ربكم বাক্যটিতে ঐদিকই ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, لاجناح عليكم বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ উপার্জনে তোমাদের কোন পাপ হবে না। এতে আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ উপার্জন থেকেও যদি বেঁচে থাকতে পার, তবে আরো উত্তম। কেননা এতে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা বা ইখলাসের মাঝে কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে। তবে প্রকৃত বিষয়টি নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যদি কারো মুখ্য উদ্দেশ্য পার্থিব মুনাফা অর্জন হয়, আর হজ্জের নিয়তটি প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে অথবা হজ্জ ও ব্যবসা—উভয় নিয়ত সমান সমান হয়, তবে তা হবে ইখলাসের পরিপন্থী। এতে হজ্জের সওয়াব কম হবে। আর হজ্জের যে উপকারিতা ও বরকত হওয়া বিধেয় ছিল, তাও কম হবে। আর যদি প্রকৃত নিয়ত হজ্জই হয় এবং এ উদ্দেশ্যেই বের হয়ে থাকে, কিন্তু রাস্তা বা ঘরের খরচাদির অভাব পূরণ করার জন্য সামান্য ব্যবসা বা কাজকর্ম করে কিছু উপার্জন করে নেয়, তাহলে তা ইখলাসের পরিপন্থী নয়। এ ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে এই, যে পাঁচদিন একান্তভাবে হজ্জের কাজগুলি করা হয় সে পাঁচদিন ব্যবসা বা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে শুধু ইবাদতে ও যিকিরে ব্যস্ত থাকা। তাই কোন কোন আলেম এই পাঁচদিন ব্যবসা বা উপার্জনের কাজকর্ম নিষেধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আরাফাতে অবস্থানের পর মুযদালিফাতে অবস্থান ঃ অতঃপর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ۔

অর্থাৎ যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন কর, তখন মাশ্আরে-হারামের নিকট যেভাবে আল্লাহ্কে স্মরণ করার নিয়ম বলে দেওয়া হয়েছে, সে নিয়মে তাঁকে স্মরণ কর। তোমাদেরকে নিয়ম বলে দেওয়ার পূর্বে যেভাবে তাঁকে স্মরণ করতে, তা ছিল ভুল আর তোমরা ছিলে অজ্ঞ। এতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মুযদালিফায় রাত কাটানো এবং বিশেষ নিয়মে যিকির করা ওয়াজিব।

'আরাফাত' শব্দটি শাব্দিকভাবে বহুবচন। এটি একটি বিশেষ ময়দানের নাম, চৌহদ্দি সুপ্রসিদ্ধ। এ ময়দান হেরেমের সীমানার বাইরে অবস্থিত। হাজীদের জন্য ৯ই যিলহজ্জ এ ময়দানে সমবেত হওয়া এবং দুপুরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করা হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয, যার কোন বিকল্প বা ক্ষতিপূরণ নেই।

আরাফাতকে 'আরাফাত' বলার পিছনে অনেকগুলো কারণ ব্যাখ্যা করা হয়। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, এ ময়দানে স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত ও যিকির দ্বারা তাঁর নৈকট্য ও পরিচয় লাভে সমর্থ হওয়া যায়।

তাছাড়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল এলাকার মুসলমানগণও এখানে পারস্পরিক পরিচয় লাভের সুযোগ পান। কোরআনে যথেষ্ট তাকীদের সাথে বলা হয়েছে যে, আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মাশ'আরে-হারামের নিকট অবস্থান করা কর্তব্য। মাশ'আরে-হারাম

একটি পাহাড়ের নাম, যা মুযদালিফাতে অবস্থিত। 'মাশ'আর' অর্থ নিদর্শন এবং হারাম অর্থ সম্মানিত ও পবিত্র। সারমর্ম হচ্ছে যে, এ পাহাড়টি ইসলামী নিদর্শন প্রকাশের একটি পবিত্র স্থান, এর আশপাশের ময়দানসমূহকে মুযদালিফা বলা হয়। এ ময়দানে রাত যাপন করা এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে মিলিয়ে পড়া ওয়াজিব। মাশ'আরে-হারামের নিকট আল্লাহ্কে স্মরণ করা বলতে যদিও সর্বপ্রকার যিকির-আযকারই এর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু মাগরিব ও এশার নামায একত্রে এশার সময় আদায় করাই মূলত এখানকার বিশেষ ইবাদত। আয়াতে বর্ণিত- واذكروه كما هدٰكم-বাক্যটি সম্ভবত এ দিকেই ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য তিনি যে নিয়ম বাতলে দিয়েছেন, সে নিয়মেই তাঁকে স্মরণ কর। এতে স্বীয় মতামত ও কিয়াসকে প্রশ্রয় দিও না। কেননা, কিয়াস অনুযায়ী তো মাগরিবের নামায মাগরিবের সময় এবং এশার নামায এশার সময় পড়া উচিত। কিন্তু সে দিনের জন্যে আল্লাহ্র পছন্দ এই যে, মাগরিবের নামায দেরি করে এশার সময় এশার নামাযের সাথে পড়া হবে।

وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ-এ দ্বারা আরো একটি মৌলিক মাস'আলার উদ্ভব হয় যে, আল্লাহ্কে স্মরণ করা ও তাঁর ইবাদত করার ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন নয় যে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই তা করবে। বরং আল্লাহ্র যিকির ও ইবাদতের নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে। নিয়ম মতে আদায় করলেই তা ইবাদত হবে, নিয়মের খেলাফ করা জায়েয নয়। এতে কম বা বেশি করা কিংবা আগে-পরে করা, যদিও এতে যিকির বা ইবাদত বেশি হয়, তবু তা আল্লাহ্র পছন্দ নয়। নফল ইবাদত-বন্দেগী বা খয়রাতে যারা কিছু বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতি সংযোজন করে এবং এ নিয়ম অবশ্য পালনীয় মনে করে অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) এসব নিয়মকে অবশ্য পালনীয় বলেননি কিন্তু তারা এগুলোকে পালন না করাকে ভুল মনে করে, এ আয়াত সেসব ভ্রান্তিরই সংশোধন করে দিয়েছে যে, তা হচ্ছে জাহিলিয়ত যুগের এমন কতকগুলো প্রথা বা কুসংস্কার, যা স্ব স্ব রায় ও কিয়াসের দ্বারা তারা তৈরি করেছিল এবং এসব প্রথাকেই ইবাদত বলে ঘোষণা করেছিল।

অতঃপর তৃতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ . اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

অর্থাৎ অতঃপর তোমাদের উচিত যে, অন্যান্য লোক যেস্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন করছে, তোমরাও সেস্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন কর। আল্লাহ্র দরবারে তওবা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন এবং অনুগ্রহ করবেন।

এ বাক্যটির শানে নুযুল হচ্ছে এই যে, আরবের কুরাইশগণ যারা কা'বা ঘরের হেফাজতে নিয়োজিত ছিল, আর সে কারণে সমগ্র আরব দেশে তাদের মানসম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল সকল মহলে স্বীকৃত, তারা তাদের এক বিশেষ মর্যাদা রক্ষাকল্পে হজ্জের ব্যাপারেও কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে নিয়েছিল। সকল মানুষ আরাফাতে যেতো এবং সেখানে অবস্থান করার পর প্রত্যাবর্তন করতো, কিন্তু তারা রাস্তায় মুযদালিফাতে অবস্থান করতো আর বলতো ঃ

যেহেতু আমরা কা'বা ঘরের রক্ষক ও সেবায়েত, এজন্য হেরেমের সীমারেখার বাইরে যাওয়া আমাদের জন্য উচিত নয়। মুযদালিফা হেরেমের সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত এবং আরাফাতের বাইরে অবস্থিত। এ অজুহাতে মুযদালিফাতেই তারা অবস্থান করতো এবং সেখান থেকেই প্রত্যাবর্তন করতো। বাস্তবপক্ষে এসব ছল-ছুঁতার উদ্দেশ্য ছিল অহংকার ও অহমিকা প্রকাশ করা এবং সাধারণ মানুষ থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা। আল্লাহ্ তা'আলা এ আদেশ দ্বারা তাদের সে অহমিকার সংশোধন করে দিয়েছেন এবং তাদের নির্দেশ করেছেন যে, তোমরাও সেখানেই যাও, যেখানে অন্যান্য লোক যাচ্ছে অর্থাৎ আরাফাতে এবং অন্যান্য লোকের সাথেই তোমরা ফিরে এসো। একে তো সাধারণ মানুষ হতে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখা একটি অহংকারজনিত কাজ, যা থেকে সর্বদা বিরত থাকা আবশ্যক। বিশেষ করে হজ্জের সময়ে পোশাক, ইহ্রামের স্থান ও অন্যান্য কাজ-কর্মের মাঝে একটা সমন্বয় সাধন করে যেখানে এ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, সকল মানুষই সমান, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বড়-ছোট, রাজা-প্রজার কোন ভেদাভেদ নেই; তখন ইহ্রাম অবস্থায় এ পার্থক্য প্রদর্শন অনেক বড় অপরাধ।

মানবিক সমতার সুবর্ণ শিক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা ঃ কোরআনে-হাকীমের এ বাণীর দ্বারা সমাজনীতির একটি পরিচ্ছেদ সামনে এসেছে যে, সামাজিক বসবাস ও অবস্থানের বেলায় বড়দের পক্ষে ছোটদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে স্বাতন্ত্র্য বিধান করা উচিত নয় বরং মিলেমিশে থাকা কর্তব্য। তাতে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি, ভালবাসা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয়, আমীর ও গরীবের পার্থক্য মিটে যায় এবং মজুর ও মালিকের মধ্যকার বিরোধের সমাধান হয়ে যায়। তাই রাসূলে করীম (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছেন ঃ অনারবের উপর আরবদের এবং কালোর উপর সাদার কোন বৈশিষ্ট্য নেই। বৈশিষ্ট্যের বুনিয়াদ হলো পরহেজগারী বা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই যারা মুযদালিফায় অবস্থান করে অন্যান্য লোকের তুলনায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইতো, তাদের সে আচরণ কোন অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

জাহিলিয়ত আমলের রেওয়াজসমূহের সংশোধন এবং মিনাতে অর্থহীন সমাবেশের প্রতি নিষেধাজ্ঞা ঃ ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ আয়াতে জাহিলিয়ত যুগের কিছু প্রথার সংশোধন করা হয়েছে। (১) জাহিলিয়ত যুগে আরবরা যখন আরাফাত, মুযদালিফা, তওয়াফ, কুরবানী ইত্যাদি কাজ শেষ করে মিনাতে অবস্থান করতো, তখন সেখানকার সমাবেশগুলোতে শুধু কবিতা প্রতিযোগিতা, নিজেদের ও পিতৃপুরুষদের গৌরবময় ইতিহাসের আলোচনা ইত্যাদি বাজে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। তাদের সে মজলিসগুলো আল্লাহ্ তা'আলার যিকির-আযকার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতো। এ মূল্যবান দিনগুলোকে তারা নানা অর্থহীন কাজকর্মে নষ্ট করতো। তাই ইরশাদ হয়েছে ঃ যখন তোমরা ইহ্রামের কাজ শেষ করবে এবং মিনাতে সমবেত হবে, তখন তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ কর এবং নিজেদের ও পূর্বপুরুষদের সত্য-মিথ্যা গৌরব বর্ণনা থেকে বিরত থাক। তাদেরকে তোমরা যেভাবে স্মরণ করতে, সেস্থানে এর চাইতেও অধিক মাত্রায় আল্লাহ্কে স্মরণ কর। কোরআনের এই আয়াত আরববাসীদের সেই মূর্খজনোচিত কাজকে রহিত করে মুসলমানদেরকে হেদায়েত করেছে যে, এ দিনগুলো এবং সে

স্থানটি আল্লাহ্র ইবাদত ও যিকিরের জন্য নির্ধারিত। এসব জায়গায় আল্লাহ্র ইবাদত ও যিকিরের যে ফযীলত তা আর কোথাও হতে পারে না; তাই একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করা উচিত।

তাছাড়া হজ্জ এমন একটি ইবাদত, যা দীর্ঘ প্রবাসের কষ্ট সহ্য করা, পরিবার-পরিজন হতে দীর্ঘদিন দূরে থাকা, ব্যবসা-বাণিজ্য বর্জন করা এবং হাজার হাজার টাকা ব্যয় করার পর লাভ করা যায়। এতে নানারকম দুর্বিপাকের সম্মুখীন হওয়াও অসম্ভব নয়, যার ফলে মানুষ শত চেষ্টা সত্ত্বেও হজ্জ সম্পাদনে কৃতকার্য হতে পারে না।

যখন আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূরীভূত করে তোমাকে তোমার উদ্দেশ্য সফল হবার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং তুমি হজ্জের ফরয কাজ শেষ করেছ, তখন নিঃসন্দেহে এটা শুকরিয়া আদায় করারই ব্যাপার। তাই এখন অধিক মাত্রায় আল্লাহ্র যিকিরে আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য। এই মূল্যবান সময়কে বাজে কাজ এবং বেহুদা কথাবার্তায় নষ্ট করো না। জাহিলিয়ত আমলে লোকেরা এ মূল্যবান সময় তাদের পূর্বপুরুষদের আলোচনায় ব্যয় করতো, দীন-দুনিয়ার কোথাও যার কোন সুফল ছিল না। সেস্থলে তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করে এ মূল্যবান সময়টুকু ব্যয় কর। যার মধ্যে কেবল উপকারই উপকার। এতে দুনিয়ার জন্যও উপকার, আখেরাতের জন্যও উপকার বিদ্যমান। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে কবিতার আসর জমিয়ে তাতে পূর্বপুরুষদের গৌরব ও দাম্ভিকতা প্রচারের রেওয়াজ অবশ্য নেই, কিন্তু এখনও হাজার হাজার মুসলমান রয়েছে, যারা এ সুবর্ণ সুযোগকে বেহুদা সমাবেশ, বেহুদা দাওয়াত ও অন্যান্য বাজে কাজে ব্যয় করে। এসব ব্যাপারে সতর্কীকরণের জন্য এ আয়াতটিই যথেষ্ট।

কোন কোন মুফাসসির এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্কে তেমনিভাবে স্মরণ কর, শিশুরা যেমন স্মরণ করে তার মাতা-পিতাকে। তখন তাদের প্রথম বাক্য এবং সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দটি হয় 'আব্বা বাবা'। এখন তোমরা সাবালক ও বুদ্ধিমান, সুতরাং 'আব' শব্দের পরিবর্তে 'রব' শব্দ বলতে থাক। চিন্তা কর শিশু পিতাকে এজন্যই ডাকে যে, সে তার যাবতীয় কাজের জন্য তার পিতার মুখাপেক্ষী। মানুষ সামান্য চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সে সব সময় সব কাজের জন্য আল্লাহ্র প্রতি আরও বেশি মুখাপেক্ষী। তাছাড়া অনেক সময় মানুষ গর্বভরে নিজ পিতাকে স্মরণ করে। যেমন জাহিলিয়ত যুগের লোকেরা করতো। তবে এ আয়াতের দ্বারা এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, গৌরব ও সম্মানের জন্যও আল্লাহ্কে স্মরণ করার চাইতে অন্য কোন যিকির বেশি কার্যকর নয়।

জাহিলিয়ত যুগের আর একটি প্রথার সংশোধনে ইসলামী ভারসাম্য ঃ জাহিলিয়ত যুগে এ গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোতে পূর্ব পুরুষদের স্মরণ এবং কবিতা প্রতিযোগিতায় অতিবাহিত করার রীতিটি যেমন নিষ্প্রয়োজন ছিল, তেমনিভাবে হজ্জের মধ্যে আল্লাহ্র যিকির করাও কিছু কিছু লোকের অভ্যাস ছিল। কিন্তু তাদের সে যিকিরের উদ্দেশ্য থাকত একমাত্র দুনিয়ার মান-ইযযত ও ধন-দৌলত হাসিল করা। এতে আখেরাতের প্রতি কোন কল্পনাও তাদের মনে জাগতো না। এ ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে এ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে—কোন কোন লোক হজ্জের সময় দোয়া করে বটে, কিন্তু তা একান্তই দুনিয়ার উন্নতির জন্য, পরকালের কোন চিন্তাই তাদের থাকে না। তারা পরকালে কিছুই পাবে না। কেননা, তাদের এ কার্যপদ্ধতিতে বোঝা

যায় যে, তারা হজ্জের ফরয শুধু প্রথাগতভাবে আদায় করতো অথবা দুনিয়াতে প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তারের জন্য করতো ; আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করা বা পরকালে মুক্তি পাওয়ার কোন ধ্যান-ধারণাই তাদের ছিল না। এখানে একথাও চিন্তা করার বিষয় যে, পার্থিব বিষয়ে প্রার্থনাকারীদের কথা এ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে যে, তারা বলে ঃ

ربنا اتنا فى الدنيا এর সাথে حسنة শব্দ ব্যবহারের উল্লেখ নেই। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জাগতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা এমনিভাবে নিমগ্ন যে, কোন প্রকারে শুধু নিজের চাহিদা পূরণ হোক, এটাই তাদের কাম্য—চাই তা ভাল হোক বা মন্দ, সৎ পথে অর্জিত হোক বা অসৎ পথে, মানুষ একে পছন্দ করুক বা নাই করুক।

এ আয়াতে সেসব মুসলমানকেও সতর্ক করা হয়েছে, যারা হজ্জব্রত পালনকালে এবং এ পবিত্র স্থানে কৃত দোয়াসমূহে পার্থিব উদ্দেশ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে এবং অধিকাংশ সময় সেজন্য ব্যয় করে। আমাদের অবস্থাও একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, অনেক মুসলমান ধনী ব্যক্তি যেসব দোয়া-কালাম পাঠ করে বা বুযুর্গ লোকদের দ্বারা করায়, তাতেও দুনিয়ার সমৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি-অগ্রগতির জন্যই করে বা করায়। তারা অনেক দোয়া-কালাম পাঠ করে এবং নফল ইবাদত করে ভাবে যে, আমরা অনেক ইবাদত করে ফেলেছি। কিন্তু বাস্তবে এটা এক প্রকার দুনিয়াদারী পূজায় পরিণত হয়। অনেক লোক জীবিত বুযুর্গান এবং মৃত বুযুর্গানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। এতেও তাদের উদ্দেশ্য থাকে তাদের দোয়া-তাবিজ দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সফল করা, দুনিয়ার বিপদাপদ হতে নিরাপদ থাকা। এসব লোকের জন্যও এ আয়াতে উপদেশ রয়েছে। যাবতীয় বিষয়ই আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত যিনি সর্বজ্ঞ। স্বীয় কাজ-কর্মে একটা হিসাব-নিকাশ করা সবারই কর্তব্য। যিকির-আযকার, ইবাদত-বন্দেগী এবং হজ্জ ও যিয়ারতে তাদের নিয়ত কি ? এ আয়াতের শেষে হতভাগ্য বঞ্চিত সেসব লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তারপর নেক ও ভাগ্যবান লোকদের কথা আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

অর্থাৎ তাদের মধ্যে এমনও কিছু লোক রয়েছে, যারা তাদের প্রার্থনায় আল্লাহ্র নিকট দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করে এবং পরকালের কল্যাণও কামনা করে এবং জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে।

এতে حسنة শব্দটি প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় কল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক। দুনিয়ার কল্যাণ–যেমন শারীরিক সুস্থতা, পরিবার-পরিজনের সুস্থতা, হালাল রুযীর প্রাচুর্য, পার্থিব যাবতীয় প্রয়োজনের পূর্ণতা, নেক আমল, সচ্চরিত্র উপকারী বিদ্যা, মান-সম্মান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি, আকীদার সংশোধন, সিরাতে-মুস্তাকীমের হিদায়েত, ইবাদতে একাগ্রতা প্রভৃতিসহ অসংখ্য স্থায়ী নিয়ামত এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও সাক্ষাত লাভ প্রভৃতি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, এটি এমন এক পূর্ণাঙ্গ দোয়া, যাতে ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের শান্তি ও আরাম-আয়েশও এর আওতাভুক্ত। অবশেষে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হুযূর (সা) এ দোয়াটি খুব বেশি পরিমাণে পাঠ করতেন ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

কা'বাঘরের তওয়াফের সময় বিশেষভাবে এ দোয়া করা সুন্নত। এ আয়াতে ঐ সমস্ত মূর্খ দরবেশদেরও সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে, যারা কেবল পরকালের জন্য প্রার্থনাকেই ইবাদত মনে করে এবং বলে থাকে যে, আমাদের দুনিয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাদের এ দাবি ভুল এবং তাদের ধারণা অপরিপক্ব। কেননা, মানুষ তার অস্তিত্ব ও ইবাদত সব প্রয়োজনেই দুনিয়ার মুখাপেক্ষী। তা না হলে ধর্মীয় কাজকর্ম করাও সম্ভব হতো না। সেজন্যই যেভাবে পরকালের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে দুনিয়ার মঙ্গলামঙ্গল ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের প্রার্থনা করা আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নত। যে ব্যক্তি প্রার্থনার মাঝে দুনিয়ার মঙ্গল-অমঙ্গল প্রার্থনা করাকে তাকওয়ার পরিপন্থী বলে মনে করে, সে নবীগণের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ। তবে শুধু দুনিয়ার প্রয়োজনকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যে পরিণত করাও চলবে না। বরং দুনিয়ার চিন্তা ও ফিকিরের চাইতে অধিক পরিমাণে পরকালের চিন্তা ও ফিকির করতে হবে ও দোয়া করতে হবে।

আয়াতের শেষাংশে সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের প্রতিদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা প্রার্থনাকালে ইহ ও পরকালের মঙ্গলামঙ্গল কামনা করেন। তাদের পরিণাম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের সঠিক নেক আমল ও দোয়ার প্রতিদান তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে দেওয়া হবে। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে ঃ

والله سريع الحساب —অর্থাৎ আল্লাহ্ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। কেননা, তাঁর ব্যাপক জ্ঞান এবং কুদরতের দ্বারা সমস্ত সৃষ্ট জগতের সারা জীবনের হিসাব গ্রহণের জন্য মানুষের যে সমস্ত বস্তুর প্রয়োজন হয়, আল্লাহ্ তা'আলার এ সবের প্রয়োজন হয় না। কাজেই তিনি সারা মাখলুকাতের সমস্ত হিসাব অতি অল্প সময়ে বরং মুহূর্তে গ্রহণ করবেন।

দিনের বেলায় মিনাতে অবস্থান এবং আল্লাহ্‌র স্মরণের তাকীদ ঃ অষ্টম আয়াতটি হজ্জ সংক্রান্ত শেষ আয়াত। এতে হাজীগণকে আল্লাহ্‌র যিকিরের প্রতি অনুপ্রাণিত করে তাদের হজ্জের উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতা এবং পরবর্তী জীবনে সংশোধনের জন্য হেদায়েত দান করা হয়েছে।

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِى اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ —অর্থাৎ তোমরা নির্ধারিত কয়েকটি দিনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। এই কয়েকদিন হচ্ছে তাশ্‌রীকের দিনসমূহ, যাতে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তকবীর বলা ওয়াজিব। অতঃপর একটি মাস'আলার আলোচনা করা হয়েছে যে, মিনায় অবস্থান এবং জমরাতে পাথর নিক্ষেপ করা কতদিন পর্যন্ত আবশ্যক। জাহিলিয়্যত যুগের লোকেরা এতে মতানৈক্য করেছে। কেউ কেউ ১৩ই যিলহজ্জের সূর্যাস্ত পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা ও জমরাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করাকে জরুরী বিবেচনা করত। আর যারা ১২ তারিখে সেখান থেকে ফিরে

আসত, তাদেরকে পাপী বলে ধারণা করত এবং এই কাজকে অবৈধ বলে আখ্যায়িত করা হতো। আবার একদল ছিল, যারা ১২ তারিখে প্রত্যাবর্তন করাকে জরুরী মনে করতো এবং ১৩ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করাকে পাপ বলে মনে করতো। এ আয়াতে এ দু'টি বিষয়েরই মীমাংসা করে দেওয়া হয়েছে।

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ .

অর্থাৎ যারা ঈদের পর মাত্র দু'দিন মিনাতে অবস্থান করেই প্রত্যাবর্তন করে, তাদেরও কোন পাপ নেই, আর যারা তৃতীয় দিন পর্যন্ত অবস্থান করার পর প্রত্যাবর্তন করে তাদেরও কোন পাপ নেই। পক্ষান্তরে এ দু'টি দল যে একে অপরকে পাপী বলে থাকে, তারা উভয়েই ভুল পথে রয়েছে।

সঠিক কথা হচ্ছে এই যে, হাজীগণ উভয় ব্যাপারেই স্বাধীন। তাঁরা যে কোন একটিতে আমল করতে পারেন। তবে তৃতীয় দিন পর্যন্ত অবস্থান করাই উত্তম। ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, যে ব্যক্তি দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করে, তার জন্য তৃতীয় দিনের প্রস্তর নিক্ষেপ ওয়াজিব নয়। কিন্তু মিনাতে থাকা অবস্থায় সূর্যাস্ত হয়ে গেলে তৃতীয় দিনের প্রস্তর নিক্ষেপ ওয়াজিব। তবে তৃতীয় দিনের প্রস্তর নিক্ষেপ পরদিন সকালেও করা যায়।

মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে হাজীগণকে স্বাধীন বলার পর যা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, দ্বিতীয় দিন প্রত্যাবর্তন করলেও কোন পাপ নেই, আর তৃতীয় দিন প্রত্যাবর্তন করলেও কোন পাপ নেই; এসব কাজ তাদের জন্য যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তাঁর আহকাম মান্য করে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে হজ্জ তাদেরই জন্য। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ইবাদতই গ্রহণ করেন, যাঁরা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং যারা আল্লাহ্‌র অনুগত ও প্রিয় বান্দা। আর যারা হজ্জের পূর্বে পাপ কাজে লিপ্ত ছিল এবং হজ্জের মধ্যেও নির্ভয়ে বেপরোয়াভাবে পাপ কাজ করেছে এবং হজ্জের পরেও পাপ কাজে লিপ্ত রয়েছে তাদের জন্য হজ্জ কোন উপকারেই আসবে না। অবশ্য তাদের ফরয আদায় হয়ে যাবে এবং হজ্জ সম্পাদন না করার পাপে পাপী হবে না। সবশেষে বলা হয়েছে ঃ

اِتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ .

অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌র দরবারে সমবেত হবেই। তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসাব গ্রহণ করবেন এবং পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন। ইতিপূর্বে হজ্জের যত আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে এ বাক্যটি সে সবগুলোর প্রায় সমতুল্য। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, হজ্জের দিনে যখন হজ্জের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাক, তখনও আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং পরে হজ্জ করেছ বলে অহংকার করো না, তখনও আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাক। কারণ আমলসমূহের ওজন করার সময় মানুষের পাপ তাদের নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। নেক আমলের প্রভাব ও ওজন প্রকাশ হতে দেয় না। হজ্জ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, মানুষ যখন হজ্জ করে ফিরে আসে, তখন সে তার পূর্ব-কৃত পাপ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়, যেন সে সদ্য জন্মগ্রহণ করেছে।

এখানে তাই হাজীগণকে পরবর্তী জীবনের জন্য পরহেযগারী অবলম্বন করতে বিশেষভাবে তাকীদ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা পূর্বের পাপ থেকে মুক্ত হয়েছ। পরের জন্য সতর্ক হও। তবেই ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল তোমাদের জন্য নির্ধারিত থাকবে। পক্ষান্তরে হজ্জ সমাপনের পর পুনরায় পাপ কাজে লিপ্ত হলে পূর্বের পাপ মোচনের কোন ফল লাভ করা যাবে না। এ ব্যাপারে আলিমগণ মন্তব্য করেছেন যে, হজ্জ কবূল হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে এই যে, হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পার্থিব মায়া কাটিয়ে যারা পরকালের প্রতি আকৃষ্ট হবে, এমন ব্যক্তির হজ্জ কবূল হয় এবং তাদের পাপও মোচন হয়। তাদেরই দোয়া কবূল হয়। হজ্জ সম্পাদনকালে মানুষ বারবার আল্লাহ্‌র ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর প্রতিজ্ঞা করে। কোন হাজী যদি তার সে প্রতিজ্ঞার কথা সর্বদা স্মরণ রাখে, তবেই পরবর্তীকালে তা রক্ষা করার যথাবিহিত ব্যবস্থা করতে পারে।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, আমি হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর আমার মনে একটি পাপের ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয়, এমতাবস্থায় এক গায়েবী শব্দে আমাকে বলা হয় ঃ তুমি কি হজ্জ করনি ?

এ শব্দ আমার এবং সে পাপের মধ্যে একটি দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রক্ষা করেন। আল্লামা জামীর শিষ্য জনৈক তুরস্কবাসী মনীষী সব সময় নিজের মাথার উপরে একটি আলো লক্ষ্য করতেন, তিনি হজ্জে গিয়ে হজ্জ সমাপনের পর এ অবস্থা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা না হয়ে একেবারে রহিত হয়ে গেল। পরে মাওলানা জামী (র)-এর সাথে আলোচনা করলে তিনি বললেন, হজ্জ করার পূর্বে তোমার মধ্যে নম্রতা ও দীনতা ছিল, নিজেকে পাপী মনে করে আল্লাহ্‌র দরবারে আরাধনা করতে। হজ্জ করার পর তুমি নিজেকে নেক ও বুযুর্গ মনে করছ, কাজেই এই হজ্জ তোমার অহংকারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্যই তোমার অবস্থার এহেন পরিবর্তন।

আহকামে-হজ্জের বর্ণনা শেষে তাকওয়া ও পরহেযগারী সম্পর্কে তাকীদ দেওয়ার এও একটি কারণ যে, হজ্জ একটি অতি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আদায় করার পর শয়তান সাধারণত মানুষের মনে বড়ত্ব ও বুযুর্গীর ভাব জাগিয়ে তোলে, যা তার যাবতীয় আমলকে বরবাদ করে দেয়। কাজেই আয়াতের শেষাংশে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যেভাবে হজ্জের পূর্বে ও হজ্জের মধ্যে আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য তেমনি হজ্জের পরে আরো বেশি করে আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার অনুশীলন করতে থাক, যাতে করে ইবাদত বিনষ্ট হয়ে না যায়।

اللّٰهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية .

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا

فِىْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا

وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ

اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ

الْمِهَادُ ۝٢٠٦ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ

وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ۝٢٠٧

(২০৪) আর এমন কিছু লোক রয়েছে, যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহ্‌কে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক। (২০৫) যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণ নাশ করতে পারে। আল্লাহ্ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না। (২০৬) আর যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহংকারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্য দোযখই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা। (২০৭) আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে—যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ্ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে প্রার্থনাকারীদেরকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ এক শ্রেণী হচ্ছে কাফের ও পরকালে অবিশ্বাসী। এদের প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হচ্ছে দুনিয়া। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে মুমিন; পরকালের প্রতি বিশ্বাসে অটল। এরা পার্থিব কল্যাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের কল্যাণও সমভাবে কামনা করে। পরবর্তী আয়াতসমূহে 'নেফাক' বা কপটতা ও 'ইখলাস' বা আন্তরিকতার ভিত্তিতে বিভক্ত মানবশ্রেণী সম্পর্কে বলা হচ্ছে, কেউ মুনাফেক বা কপট আর কেউ মুখলেছ বা আন্তরিকতাপূর্ণ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মহানবী [সা]-এর সময়ে আখনাস ইবনে শুরাইক নামক এক ব্যক্তি অত্যন্ত বাক্‌পটু ছিল। সে নবী করীম [সা]-এর দরবারে হাযির হয়ে কসম খেয়ে খেয়ে নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত, কিন্তু দরবার থেকে উঠে গিয়েই নানারকম বিবাদ-বিসংবাদ, অন্যায়-অনাচার এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের কষ্ট দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করত। এই কপট মুনাফেক লোকটি সম্পর্কেই বলা হচ্ছে যে,)–আর এমনও কিছু লোক রয়েছে, যাদের একান্ত পার্থিব উদ্দেশ্যপূর্ণ কথাবার্তা (যে, 'ইসলাম প্রকাশের মাধ্যমে মুসলমানদের মতই নৈকট্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে থাকতে পারব'—তাদের বাকপটুতা ও সালঙ্কার বাগ্মিতা হয়ত আপনার কাছে যথেষ্ট) ভাল লাগে এবং তারা (নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য ও মনের কথা গোপন করার উদ্দেশ্যে) আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করে। অথচ (তাদের সমস্ত কথাই সর্বৈব মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে) তারা আপনার বিরুদ্ধাচরণে

(অত্যন্ত) কঠোর এবং (তারা যেমন আপনার বিরোধী, তেমনি অন্যান্য মুসলমানকেও কষ্ট দিয়ে থাকে। অতএব,) যখন (আপনার) দরবার থেকে উঠে দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে শহরে গিয়ে একটা বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টির জন্য এবং কারও শস্যক্ষেত্র কিংবা গৃহপালিত পশুর অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে দৌড়ঝাপ আরম্ভ করে দেয় (এভাবে কোন মুসলমানের ক্ষতি সাধন করাও হয়েছে)। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ (বিবাদ-বিসংবাদের বিষয়) পছন্দ করেন না। বস্তুত (তারা এ ধরনের বিরুদ্ধাচরণে ও ক্ষতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে এতই অহংকারী যে,) যদি তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তাহলে তারা অধিকতর অহংকারজনিত পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং এ ধরনের লোকদের উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আশ্রয়। আবার কিছু লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্র রেযামন্দী ও সন্তুষ্টির অন্বেষণে নিজেদের মনপ্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করে দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা এহেন বান্দাদের ব্যাপারে অত্যন্ত মেহেরবান, একান্ত করুণাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের শেষাংশ, যাতে নিষ্ঠাবান মু'মিনগণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আত্মবিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না, তা সে সমস্ত নিষ্ঠাবান সাহাবায়ে কেরামের শানে নাযিল হয়েছে, যাঁরা আল্লাহ্র রাস্তায় অনুক্ষণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। মুস্তাদরাক হাকেম, ইবনে-জরীর, মসনদে ইবনে আবী-হাতেম প্রভৃতি গ্রন্থে সহীহ্ সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ আয়াতটি হযরত সোহাইব রুমী (রা)-এর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল কোরাইশ তাঁকে বাধা দিতে উদ্যত হলে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং তাঁর তূনীরে রক্ষিত সবগুলো তীর বের করে দেখালেন এবং কোরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, হে কোরাইশগণ! তোমরা জান, আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তূনীরে একটি তীরও থাকবে, ততক্ষণ তোমরা আমার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার চালাব। যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি তলোয়ার চালিয়ে যাব। তারপর তোমরা যা চাও করতে পারবে। আর যদি তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ কামনা কর, তাহলে শোন, আমি তোমাদেরকে মক্কায় রক্ষিত আমার ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা তা নিয়ে নাও এবং আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। তাতে কোরাইশদল রাজী হয়ে গেল এবং হযরত সোহাইব (রা) রুমী নিরাপদে রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূল (সা) দু'বার ইরশাদ করলেন ঃ

ربح البيع ابا يحى - ربح البيع ابا يحى

"হে আবূ ইয়াহ্ইয়া, তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।" এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হলে রাসূল (সা)-এর ইরশাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়, যা তাঁর পবিত্র মুখ হতে বের হয়েছিল।

কোন কোন তফসীরকার অন্যান্য কতিপয় সাহাবীর বেলায় সংঘটিত একই ধরনের কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন।-(মাযহারী)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾

(২০৮) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না—নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২০৯) অতঃপর তোমাদের মাঝে পরিষ্কার নির্দেশ এসে গেছে বলে জানার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হও, তাহলে নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (২১০) তারা কি সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে যে, মেঘের আড়ালে তাদের সামনে আসবেন আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণ ? আর তাতেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে। বস্তুত সব কার্যকলাপই আল্লাহ্র নিকট গিয়ে পৌঁছবে।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে নিষ্ঠাবানদের প্রশংসা করা হয়েছিল। অনেক সময় এই নিষ্ঠার মধ্যেও ভুলবশত বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। যদিও উদ্দেশ্য থাকে অধিক আনুগত্য, কিন্তু সে আনুগত্য শরীয়ত ও সুন্নতের সীমারেখা অতিক্রম করে বিদ'আতে পরিণত হয়। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ প্রথমে ইহুদী আলেম ছিলেন এবং সে ধর্মমত অনুযায়ী শনিবার ছিল সপ্তাহের পবিত্র দিন, আর উটের গোশ্ত ছিল হারাম। ইসলাম গ্রহণের পর সে সাহাবীর ধারণা হয় যে, হযরত মূসা (আ)-এর ধর্মে শনিবারকে পবিত্র দিন হিসাবে সম্মান করা ছিল ওয়াজিব। কিন্তু মুহাম্মদী শরীয়তে তার অসম্মান করা ওয়াজিব নয়। তেমনিভাবে মূসা (আ)-এর শরীয়তে উটের গোশ্ত ছিল হারাম, কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়তে তা ভক্ষণ করা ফরয নয়। সুতরাং আমরা যদি যথারীতি শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে থাকি এবং উটের গোশ্ত হালাল জেনেও কার্যত তা বর্জন করি, তা'হলে তো দু'কূলই রক্ষা পায়-মূসা (আ)-এর শরীয়তের প্রতিও আস্থা রইল, অথচ মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়তেরও কোন বিরোধিতা হলো না। পক্ষান্তরে এতে আল্লাহ্র অধিকতর আনুগত্য এবং ধর্মের ব্যাপারে বেশি বিনয় প্রকাশ পাবে বলে মনে হয়। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই এ ধারণার সংশোধনী

উচ্চারণ করেছেন। তারই সার-সংক্ষেপ হচ্ছে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান! আর ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা তখনই সাধিত হবে, যখন এমন কোন বিষয়কে ধর্ম হিসেবে পালন করা না হবে, যা ইসলামে পালনযোগ্য নয়। বস্তুত এমন সব বিষয়কে ধর্ম হিসেবে গণ্য করা হলো একটি শয়তানী প্রতারণাজনিত পদস্খলন। আর পাপ হিসেবে তার শাস্তি কঠোরতর হওয়ার আশংকাই বেশি।

হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হও। (ইহুদী ধর্মেরও কিছুটা পক্ষপাতিত্ব করবে এমন নয়) এবং (এমন কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে) শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সে মনের উপর এমনই পট্টি পরিয়ে দেয়, যাতে কোন কোন বিষয় আপাতদৃষ্টিতে যথার্থ ধর্ম বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সম্পূর্ণ ধর্মবিরোধী হয়ে থাকে। বস্তুত তোমাদের কাছে ইসলামী সংবিধানের প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি উপস্থিত হওয়ার পরে যদিও সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথ থেকে) তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তাহলে নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ্ তা'আলা (বড়ই) পরাক্রমশালী, (তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন, অবশ্য সে শাস্তি যদি কিছুকাল নাও দেন, তাতে তোমরা ধোঁকায় পড়ো না। কারণ) তিনি বিজ্ঞ বটে। (বিশেষ কারণেও অনেক সময় শাস্তি দানে বিলম্ব করেন। মনে হয়) এরা (যারা প্রকৃষ্ট দলীল-প্রমাণ সত্ত্বেও সত্য পথ থেকে বিমুখতা অবলম্বন করে) শুধু সেই নির্দেশেরই অপেক্ষা করে আছে যে, আল্লাহ্ এবং ফেরেশতাগণ মেঘের শামিয়ানায় করে (তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য) তাদের কাছে আসবেন এবং গোটা বিষয়টির যবনিকাপাত ঘটে যাবে। (অর্থাৎ তারা এমন সময়ে সত্য বিষয়টি গ্রহণ করতে চায়, যখন তাদের সেই গ্রহণ করা গ্রাহ্যই হবে না ?) আর (শাস্তি ও প্রতিদানের) সমস্ত বিচার আল্লাহ্র দরবারে শেষ করা হবে। (অন্য কোন ক্ষমতাবান তখন থাকবে না। কাজেই এহেন পরাক্রমশালীর বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি অকল্যাণ ছাড়া আর কি হতে পারে ?)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً — سِلْم শব্দটি যের ও যবরসহযোগে (সিল্‌ম ও সাল্‌ম') দুটি পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটির অর্থ হচ্ছে 'শান্তি', অপরটি 'ইসলাম'। এখানে অধিকাংশ সাহাবায়ে-কেরামের মতে ইসলাম অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।—(ইবনে-কাসীর)। كَافَّةً শব্দটি 'পরিপূর্ণভাবে এবং সাধারণভাবে' এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী এখানে বাক্যটির গঠন হচ্ছে অবস্থাজ্ঞাপক। এতে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে, একটি হচ্ছে اُدْخُلُوْا (তোমরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও) শব্দে যে সর্বনাম রয়েছে, তার অবস্থা জ্ঞাপন করছে অথবা ইসলাম অর্থে سِلْم শব্দটির অবস্থা জ্ঞাপন করছে। প্রথম ক্ষেত্রে অনুবাদ দাঁড়াবে এই যে– তোমরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও অর্থাৎ তোমাদের হাত-পা, চোখ-কান, মন-মস্তিষ্ক সব কিছুই যেন ইসলামের আওতায় এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়, এমন যেন না হয় যে, হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইসলামের বিধানসমূহ পালন করে যাচ্ছে, অথচ তোমাদের মন-মস্তিষ্ক তাতে সন্তুষ্ট নয় কিংবা মন-মস্তিষ্ক ইসলামের অনুশাসনে সন্তুষ্ট বটে, কিন্তু হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ তার বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আয়াতটির অনুবাদ এই যে, তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও অর্থাৎ এমন যাতে না হয় যে, ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে

গড়িমসি করতে থাকলে। তাছাড়া কোরআন ও সুন্নাহ্য় বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও ইবাদতের সাথেই হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের সাথেই হোক কিংবা রাজনীতির সাথে হোক, এর সম্পর্ক বাণিজ্যের সাথেই হোক কিংবা শিল্পের সাথে—ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দিয়েছে, তোমরা তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

এতদুভয় দিকের মূল প্রতিপাদ্যই মোটামুটিভাবে এই যে, ইসলামের বিধানসমূহ তা মানব জীবনের যে কোন বিভাগের সাথেই সম্পৃক্ত হোক না কেন, যে পর্যন্ত তার সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রতি সত্যিকারভাবে স্বীকৃতি না দেবে, সে পর্যন্ত মুসলমান যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না।

এ আয়াতের যে শানে-নুযুল উপরে বলা হয়েছে, মূলত তার মূল বক্তব্য এই যে, শুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষাই তোমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে। একে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিলে সে তোমাদেরকে অন্য সমস্ত ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেবে।

সতর্কতা ঃ যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামী সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না, তাদের জন্য এই আয়াতে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তথাকথিত দীনদারদের মধ্যেই ত্রুটি বেশির ভাগ দেখা যায়। এর দৈনন্দিন আচার-আচরণ, বিশেষত সামাজিকতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক যে অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে হয় এরা যেন এসব রীতিনীতিকে ইসলামের নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করে না। তাই এগুলো জানতে-শিখতেও যেমন এদের কোন আগ্রহ নেই, তেমনিভাবে এর অনুশীলনেও তাদের কোন আগ্রহ নেই। নাউযুবিল্লাহ! অন্ততপক্ষে হাকীমুল-উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (র) রচিত 'আদাবে মো'আশিরাত' পুস্তিকাটি পড়ে নেওয়া প্রতিটি মুসলমানের উচিত।

আল্লাহ্ ও ফেরেশতা মেঘের আড়ালে করে তাদের নিকট আগমন করবেন, এমন ঘটনা কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। এমনিভাবে আল্লাহ্র আগমন দ্ব্যর্থবোধক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও বুযুর্গানে দীনের রীতি হচ্ছে, বিষয়টিকে সঠিক ও সত্য বলে বিশ্বাস করে নেওয়া, কিন্তু কিভাবে তা সংঘটিত হবে, তা জানার প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাঁর সমস্ত গুণাবলী ও অবস্থা জানা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে।

سَلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

(২১১) বনী-ইসরাঈলদিগকে জিজ্ঞেস কর, তাদেরকে আমি কত স্পষ্ট নির্দেশাবলী দান করেছি। আর আল্লাহ্র নেয়ামত পৌঁছে যাওয়ার পর যদি কেউ সে নিয়ামতকে পরিবর্তিত করে দেয়, তবে আল্লাহ্র আযাব অতি কঠিন ! (২১২) পার্থিব জীবনের উপর কাফিরদিগকে উন্মত্ত করে দেওয়া হয়েছে। আর তারা ঈমানদারদের প্রতি লক্ষ্য করে হাসা-হাসি করে। পক্ষান্তরে যারা পরহেযগার তারা সেই কাফিরদের তুলনায় কিয়ামতের দিন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় থাকবে। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সীমাহীন রুযী দান করেন।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পর তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। প্রথম আয়াতে এরই যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে—যেভাবে বনী-ইসরাঈলের অনেককেই এ ধরনের অবজ্ঞা প্রদর্শন ও বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বনী-ইসরাঈলের (আলেমদের) কাছে (একবার) জিজ্ঞেস করুন, আমি তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুষদেরকে) কত প্রকৃষ্ট দলীল (প্রমাণ) দিয়েছিলাম । (কিন্তু তারা তদ্দ্বারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হওয়ার পরিবর্তে বিভ্রান্তির পথকে বেছে নিয়েছে এবং তার ফলে যথেষ্ট শাস্তিও ভোগ করেছে। উদাহরণত বলা যায়, তাদেরকে যে তওরাত দেওয়া হয়েছিল, তা গ্রহণ করা ছিল তাদের কর্তব্য। কিন্তু তারা সেটিকে অস্বীকার করেছে, ফলে তূর পাহাড়কে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়েছে। তাদের উচিত ছিল আল্লাহ্র কালাম শ্রবণ করা এবং একে মাথা পেতে মেনে নেওয়া, কিন্তু তারা তার প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছে। ফলে তাদেরকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ধ্বংস হতে হয়েছে। সাগরের পানি ফাঁক করে দিয়ে তাদেরকে ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্র প্রতি শুকরিয়া আদায় করা ছিল তাদের কর্তব্য, কিন্তু তারা বাছুরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। যার ফলে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। তাদেরকে 'মান্না' ও 'সালওয়া' নামক সুস্বাদু খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছিল, এতে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত ছিল, কিন্তু তারা প্রদর্শন করেছে অবাধ্যতা। ফলে সেগুলো পচতে শুরু করে আর তাতে তারা সেগুলোর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। ফলে তা বন্ধ করে দিয়ে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় কৃষিকর্মের ঝামেলা। তাদের মাঝে নবী-রাসূলগণের আবির্ভাব হচ্ছিল। উচিত ছিল একে সুবর্ণ-সুযোগ মনে করা। কিন্তু তা না করে তারা তাদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করেছিল। ফলে শাস্তিস্বরূপ তাদের হাত থেকে রাজ্য ও শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হলো। এমনি বহু ঘটনা সূরা বাকারার প্রথম দিকেও আলোচিত হয়েছে) এবং (আমার রীতিই এমন,) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র (প্রকৃষ্ট প্রমাণসমূহের মত এত বড়) নেয়ামতকে বিকৃত করে নিজেদের কাছে পৌঁছার পর হিদায়েত প্রাপ্তির পরিবর্তে অধিকতর গোমরাহ হয়ে পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেন।

(দ্বিতীয় আয়াতে) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুনিয়ার প্রতি আসক্তিকে সত্যের প্রতি অনীহার প্রকৃত কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যার নিদর্শন হলো, ধর্মভীরুদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন। কারণ, মানুষ যখন দুনিয়ার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তখন ধর্মকে ভুলে লাভের পথে অন্তরায় মনে করে পরিহার করে এবং অন্যান্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির প্রতি উপহাস করে। তাই বনী-ইসরাঈলের কিছু সরদার এবং মুশরিকদের কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি দরিদ্র মুসলমানদের প্রতি

উপহাসের সাথে আলাপ-আলোচনা করত। তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবন ও জীবিকা কাফিরদের নিকট সাজানো মনে হয় এবং (সে জন্যেই) তারা মুসলমানদের বিদ্রূপ করে। অথচ এই মুসলমানগণ যারা কুফরী ও শিরক হতে দূরে থাকে ঐসব কাফিরদের চেয়ে (সর্ববিষয়ে) কিয়ামতের দিন উচ্চস্তরে থাকবে। (কেননা, কাফিররা জাহান্নামে থাকবে আর মুসলমান বেহেশতে থাকবেন)। এবং (মানুষের পক্ষে শুধু) পার্থিব জীবনের উন্নতিতে অহংকারী হওয়া উচিত নয়। (কেননা) রিযিক আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা প্রচুর মাত্রায় দিয়ে থাকেন। (বস্তুত এটা ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল ; কোন বিশেষ যোগ্যতার উপর নয়। সুতরাং এটা জরুরী নয় যে, যার ধন-সম্পদ বেশি আল্লাহর নিকট তার মানও বেশি হবে। আল্লাহ্র নিকট যে নির্ভরযোগ্য, সম্মান তারই বেশি। তাই শুধু ধন-সম্পদের ভিত্তিতে নিজেকে সম্মানিত আর অন্যাকে নিকৃষ্ট মনে করা একান্তই বোকামি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের উপর নির্ভর করে অহংকার করা এবং দরিদ্র লোকের প্রতি উপহাস করার পরিণতি কিয়ামতের দিন চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন মু'মিন স্ত্রী বা পুরুষকে তার দারিদ্র্যের জন্য উপহাস করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সমগ্র উম্মতের সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মু'মিন স্ত্রী বা পুরুষের উপর এমন অপবাদ আরোপ করবে, যে দোষী নয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে একটি উঁচু অগ্নিকুণ্ডের উপর দাঁড় করাবেন ; যতক্ষণ না সে তার মিথ্যার স্বীকারোক্তি করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে রাখা হবে।—(যিকরুল-হাদীস, কুরতুবী)

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۚ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪
وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا
فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ
الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ
الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾

(২১৩) সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অপঃপর আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সু-সংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুত কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি ; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশত তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল ! অতঃপর

আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে হিদায়েত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী বর্ণনায় সত্য ধর্মের বিরুদ্ধাচরণই দুনিয়াতে অশান্তির কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়ের সমর্থনে বলা হয়েছে, পূর্বকাল হতেই এই রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, আমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রকাশ্য দলীল ও প্রমাণ উপস্থাপন করে আসছি। আর দুনিয়াদারগণ স্বীয় পার্থিব স্বার্থে এর বিরুদ্ধাচরণ করে আসছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এককালে) সকল মানুষ একই মত ও পথের অনুসারী ছিল। [কারণ, সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ) বিবি হাওয়াসহ দুনিয়াতে তশরিফ আনেন এবং যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাদেরকে সত্য ধর্মের শিক্ষা দিতে থাকেন, আর তারা সে শিক্ষানুযায়ী আমল করতে থাকে। এমনিভাবে অতিবাহিত হয়ে যায় সুদীর্ঘ সময়। অতঃপর মানুষের স্বভাবগত পার্থক্যের দরুন তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে আরম্ভ করে। তারপর দীর্ঘকাল পরে কর্মধারা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও পার্থক্য ও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়]। অতঃপর (এই মতবিরোধ সমাধানকল্পে) আল্লাহ্ তা'আলা (বিভিন্ন) নবী (আ)-গণকে প্রেরণ করেন। তাঁরা (সত্যের সমর্থকদিগকে) পুরস্কার লাভের সু-সংবাদ দিতে থাকেন এবং অমান্যকারীদিগকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করতে থাকেন এবং নবীগণের (অর্থাৎ নবীগণের সামগ্রিক দলের) সাথে (আসমানী) গ্রন্থও নিয়মিত অবতীর্ণ করা হয়েছে। (নবীগণকে প্রেরণ করা এবং আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করার পেছনে) উদ্দেশ্য (ছিল এই) যে, আল্লাহ্ তা'আলা (সেই রসূলগণ এবং আসমানী গ্রন্থরাজির মাধ্যমে মতানৈক্যকারী) লোকদের মাঝে তাদের বিরোধীয় বিষয়সমূহের মীমাংসা করে দেখেন। (কারণ, রসূলগণ এবং কিতাবসমূহ প্রকৃত বিষয়ই প্রকাশ করে থাকে। আর প্রকৃত বিষয় সাব্যস্ত হয়ে গেলে তার বিপরীত বিষয়টি যে ভুল, তা স্বাভাবিকভাবেই সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর একটা হচ্ছে সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা। কাজেই রাসূলগণের সাথে গ্রন্থ প্রেরিত হওয়ার পর তাদের এটাই উচিত ছিল তাকে গ্রহণ করা এবং এরই ভিত্তিতে নিজেদের বিরোধীয় বিষয়গুলোর সমাধান করে নেওয়া, কিন্তু তারা তা না করে বরং কেউ কেউ সে গ্রন্থকে অমান্য করে বসে এবং তাতে নিজেরাই মতানৈক্য আরম্ভ করে দেয় এবং) এ গ্রন্থে (এই) মতানৈক্য অন্য কেউ করেনি–(করেছে) একমাত্র ঐ সমস্ত লোকই যারা এ গ্রন্থ লাভ করেছিল (অর্থাৎ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান জ্ঞানী মানুষগণ। কারণ এ গ্রন্থে প্রথম তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়। অন্যান্য সাধারণ মানুষ তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। আর মতানৈক্যও কেমন সময় করেছে অর্থাৎ) তাদের নিকট প্রমাণ পৌঁছবার পরে (অর্থাৎ তাদের মধ্যে একথা গাঢ়ভাবে প্রমাণিত হওয়ার পর) এবং মতানৈক্য করেছে শুধু পারস্পরিক জেদের বশবর্তী হয়ে। (জেদাজেদির প্রকৃত কারণ, দুনিয়ার লোভ, ধন-সম্পদের মোহ এবং মনের অভিলাষ পূর্বেও একথা বলা হয়েছে।) পরে কাফিরদের এ মতানৈক্য মু'মিনদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। বরং আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারগণকে (রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে) সে সমস্ত সত্য বিষয় বাতলে দিয়েছেন, যাতে বিরুদ্ধবাদীরা মতানৈক্য করতো। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সৎ ও সরল পথ দেখান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন এককালে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই মতাদর্শ ও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবাই একই ধরনের বিশ্বাস ও আকীদা পোষণ করত। তা ছিল প্রকৃতির ধর্ম। অতঃপর তাদের মধ্যে আকীদা, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা বা পরিচয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ও সঠিক মতবাদকে প্রকাশ করার জন্য এবং সঠিক পথ দেখাবার লক্ষ্যে নবী ও রসূলগণকে প্রেরণ করেন, তাঁদের প্রতি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেন। নবীগণের চেষ্টা, পরিশ্রম ও তবলীগের ফলে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল এবং তাঁদের প্রদর্শিত সত্য-সঠিক পথ ও মতকে গ্রহণ করে নেয়। আর একদল তা প্রত্যাখ্যান করে নবীগণকে মিথ্যা বলেছে। প্রথমোক্ত দল নবীগণের অনুসারী এবং মু'মিন বলে পরিচিত, আর শেষোক্ত দলটি নবীগণের অবাধ্য ও অবিশ্বাসী এবং কাফির বলে পরিচিত। এ আয়াতের প্রথম বাক্যে ইরশাদ হয়েছে ঃ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۔

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল কোরআন'-এ বলেছেন, আরবী অভিধান অনুযায়ী এমন মানবগোষ্ঠীকে উম্মত বলা হয়, যাদের মধ্যে কোন বিশেষ কারণে সংযোগ, ঐক্য ও একতা বিদ্যমান থাকবে। সে ঐক্য মতাদর্শ ও বিশ্বাসজনিতই হোক অথবা একই যুগে একই এলাকা বা দেশের অধিবাসী হওয়ার দরুনই হোক অথবা অন্য কোন অঞ্চলের বংশ, বর্ণ ও ভাষার সমতার কারণেই হোক, তাতে কিছুই আসে যায় না।

'কোন এককালে সকল মানুষ পরস্পর একতাবদ্ধ ছিল' এতে দু'টি কথা প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত 'একতা' বলতে কোন্ ধরনের একতাকে বোঝানো হয়েছে ? দ্বিতীয়ত এই একতা কখন ছিল ? প্রথম বিষয়ের মীমাংসা এ আয়াতের শেষ বাক্যটির দ্বারা হয়ে যায়। এতে একতার মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার এবং বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে হক ও সত্য মতবাদ নির্ধারণের ব্যাপারে নবী ও রাসূল প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এ মতাদর্শের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য নবী ও রাসূলগণের প্রেরণ এবং আসমানী কিতাব অবতরণ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, সে মতবিরোধ বংশ, ভাষা, বর্ণ বা অঞ্চল অথবা যুগের মতানৈক্য ছিল না, বরং মতাদর্শ, আকায়েদ ও ধ্যান-ধারণার পার্থক্য ছিল। এতেই বোঝা যায় যে, এ আয়াতে একত্ব বলতে ধ্যান-ধারণা, চিন্তা এবং আকীদার একত্বকেই বোঝানো হয়েছে।

সুতরাং এ আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় যে, এমন এক সময় ছিল, যখন প্রতিটি মানুষ একই মত ও আদর্শ এবং একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রশ্ন উঠে, সে মত ও বিশ্বাসটি কি ছিল ? এতে দু'টি সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল। (১) হয় তখনকার সব মানুষই তওহীদ ও ঈমানের বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ ছিল। নতুবা (২) সবাই মিথ্যা ও কুফরীতে ঐক্যবদ্ধ ছিল। অধিকাংশ তফসীরকারের সমর্থিত মত হচ্ছে যে, সে আকীদাটি ছিল সঠিক ও যথার্থতাভিত্তিক অর্থাৎ তওহীদ ও ঈমানের উপর ঐকমত্য। এ মর্মে সূরা ইউনুসের এক আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ

لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ .

অর্থাৎ সকল মানুষ একই উম্মত ছিল। তারপর তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। যদি আল্লাহ্ তা'আলার এটাই স্থায়ী সিদ্ধান্ত হতো (যে এ জগতে সত্য ও মিথ্যা একত্রিত হয়ে চলবে, তবে) এসব বিবাদের এমন মীমাংসা তিনিই করে দিতেন, যাতে মতানৈক্যকারীদের নাম-নিশানাই বিলুপ্ত হয়ে যেত।

সূরা আম্বিয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ .

"তোমাদের এই জাতি একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা, এজন্য তোমরা সবাই আমারই ইবাদত কর।"

সূরা মু'মিনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ .

"তোমাদের এই জাতি একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা ; কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় কর।"

এ আয়াতগুলোর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, 'একত্ব' শব্দটি দ্বারা আকীদা ও তরীকার একত্ব এবং সত্য-ধর্ম, আল্লাহ্র একত্ববাদ ও ঈমানের ব্যাপারে ঐকমত্যের কথাই বলা হয়েছে।

এখন দেখতে হবে, এ সত্য দীন ও ঈমানের উপর সমস্ত মানুষের ঐকমত্য কোন্ যুগে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তা কোন্ যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল ? তফসীরকার সাহাবীগণের মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'আব এবং ইবনে যায়েদ (রা) বলেছেন যে, এ ঘটনাটি 'আলমে-আযল' বা আত্মার জগতের ব্যাপার। অর্থাৎ সমস্ত মানুষের আত্মাকে সৃষ্টি করে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই ?) তখন একবাক্যে সব আত্মাই উত্তর দিয়েছিল, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের পালনকর্তা। সে সময় সকল মানুষ একই আকীদাতে বিশ্বাসী ছিল, যাকে ঈমান ও ইসলাম বলা হয়।-(কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন যে, এই একত্বের বিশ্বাস তখনকার যখন হযরত আদম (আ) সস্ত্রীক দুনিয়াতে আগমন করলেন এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি জন্মাতে আরম্ভ করল আর মানবগোষ্ঠী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে শুরু করলো। তাঁরা সবাই হযরত আদম (আ)-এর ধর্ম, তাঁর শিক্ষা ও শরীয়তের অনুগত ছিল। একমাত্র কাবীল ছাড়া সবাই তওহীদের সমর্থক ছিলেন।

'মস্নাদে বায্যার' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতির সাথে সাথে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, একত্বের ধারণা হযরত আদম (আ) হতে আরম্ভ হয়ে হযরত ইদ্রিস (আ) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সে সময় সবাই মুসলমান এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এতদুভয় নবীর মধ্যবর্তী সময় হলো দশ 'করন'। বাহ্যত এক 'করন' দ্বারা এক শতাব্দী বোঝা যায়। সুতরাং মোট সময় ছিল এক হাজার বছর।

কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, এই একক বিশ্বাসের যুগ ছিল হযরত নূহ (আ)-এর তুফান পর্যন্ত। নূহ (আ)-এর সাথে যারা নৌকায় আরোহণ করেছিলেন, তারা ব্যতীত সমগ্র

বিশ্ববাসী এতে ডুবে মরেছিল। তুফান বন্ধ হওয়ার পর যারা জীবিত ছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান ; সত্য ধর্ম ও একত্ববাদে বিশ্বাসী।

বাস্তব পক্ষে এ তিনটি মতামতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তিনটি যুগই এমন ছিল, যেগুলোতে সমস্ত মানুষ একই মতবাদ ও একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সত্য ধর্মের ওপর কায়েম ছিল।

এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ .

অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে প্রেরণ করলেন যারা সুসংবাদ শোনাতেন এবং ভীতি প্রদর্শন করতেন। আর তাদের নিকট যথাযথভাবেই আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মানুষের মতানৈক্যের বিষয়সমূহের মীমাংসা দান করা। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আলোচ্য বাক্যটিতে সমস্ত মানব জাতিকে একই মত ও ধর্মের অনুসারী বলে উল্লেখ করার পর মতবিরোধের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"আমি নবী-রাসূলগণ ও কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে মতবিরোধের মীমাংসা করা যায়।"

এ দু'টি বাক্যে আপাতদৃষ্টিতে গরমিল মনে হয়। কারণ, নবীগণ এবং কিতাবসমূহ প্রেরণের কারণ ছিল মানুষের মতানৈক্য। পক্ষান্তরে সে সময় কোন মতপার্থক্য ছিলই না।

অবশ্য এর অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। মূলত আয়াতটির অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রথমে সমস্ত মানুষ একই বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার দরুনই নবী ও কিতাব প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এখানে আরো একটি বিষয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ যে, আয়াতে একই উম্মত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মতানৈক্য সৃষ্টির কোন কারণ বলা হয়নি। যারা কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে একটু চিন্তা করেন, তাদের জন্য এর মর্ম উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয়। কারণ, কোরআন কখনও অতীতের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্প, কাহিনী এবং ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত যাবতীয় কাহিনীরই অবতারণা করেনি। বরং মধ্য থেকে সেসব অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছে, যা এই কালামের প্রেক্ষাপটের দ্বারা বোঝা যায়। যেমন ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে যে, যে কয়েদি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিল সে বাদশাহ্র স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার উদ্দেশ্যে বাদশাহ্কে বলেছিল যে, আমাকে ইউসুফের নিকট প্রেরণ করুন। কোরআন এ কয়েদির কথা উল্লেখ করার পর পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করেছে يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ অর্থাৎ বলুন, হে সত্যবাদী ইউসুফ ! কিন্তু একথা বর্ণনা করেনি যে, হযরত ইউসুফের ব্যাখ্যা বাদশাহ্র পছন্দ হয়েছে এবং তাকে জেলখানায় হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট প্রেরণ করেছে এবং সে সেখানে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছে। কেননা, অগ্র-পশ্চাতের বাক্যদ্বয়ে এসব কথা এমনিতেই বোঝা যায়। সুতরাং একত্বের কথা বলার পরে এখানে মতানৈক্যের কথা বলার কোন প্রয়োজনই মনে করা হয়নি। তার কারণ হচ্ছে যে, মতানৈক্যর বিষয় তো বিশ্ববাসী এমনিতেই জানে ; সব সময়ই দেখা যায়। বরং প্রয়োজন হচ্ছে একথা জানা যে, মতানৈক্যর পূর্বে এমন এক যুগ ছিল, যাতে সব মানুষ একই উম্মত একই মতাদর্শের অনুসারী ছিল। ফলে তা-ই বর্মনা করা হয়েছে। অতঃপর যে মতানৈক্য

দেখা দিয়েছে তা বিশ্ববাসী স্বচক্ষে দেখেছে। তাই এর পুনরালোচনা ছিল নিষ্প্রয়োজন। তবে এতটুকু বলা হয়েছে যে, এসব মতানৈক্যের মীমাংসা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কি ব্যবস্থা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ –অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে প্রেরণ করলেন।" তাঁরা সত্য ধর্মের অনুসারীদেরকে স্থায়ী আরাম ও সুখ-শান্তির সুসংবাদ দিতেন আর তা থেকে যারা বিমুখ হয়েছিল, তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখাতেন। আর তাদের নিকট ওহী ও আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন, যা বিভিন্ন মতাদর্শের নিরসন করে সত্য ও সঠিক মতাদর্শ জানিয়ে দেয়। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে, নবী-রাসূল এবং আসমানী গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ্য ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করার পরেও বিশ্ববাসী দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। কিছু লোক এ হেদায়েতকে গ্রহণ করেনি। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, যাদের কাছে নবীগণ ও দলীলসমূহ এসেছে, তাদেরই একদল তা অগ্রাহ্য করেছে ; অর্থাৎ ইহুদী ও নাসারাগণ। আরো বিস্ময়কর বিষয়, আসমানী কিতাবে কোন সন্দেহ-সংশয়ের আশংকা ছিল না যে, তা বোঝা যায় না বা বুঝতে ভুল হয়। বরং প্রকৃতপক্ষে জেনে-বুঝেও শুধু গোঁড়ামি ও জেদবশত তারা এসবের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

দ্বিতীয় দল হচ্ছে তাদের, যারা আল্লাহ্র দেয়া হেদায়েতকে গ্রহণ করেছে এবং নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবসমূহের মীমাংসাকে সর্বান্তকরণে মেনে নিয়েছে। এই দু'দলের কথাই কোরআনের সূরা 'তাগাবুন'-এর এক আয়াতে এভাবে ইরশাদ হয়েছে ঃ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কিছু কাফির আর কিছু মু'মিন হয়েছে।

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً এর সারমর্ম হচ্ছে এই যে, প্রথমে বিশ্বের সমস্ত মানুষ সত্য ও সঠিক ধর্মের মধ্যে ছিল। অতঃপর মতের পার্থক্য ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার দরুন মতানৈক্য আরম্ভ হয়। দীর্ঘদিন পর আমল ও বিশ্বাসের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হতে থাকে, এমনকি সত্য-মিথ্যার মধ্যেও সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। সবাইকে সঠিক ধর্মের ওপর পুনর্বহাল করার জন্য প্রকাশ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ তা মেনে নিয়েছে আবার কেউ কেউ জেদবশত অস্বীকার করেছে এবং বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে।

মাস'আলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা যায়। প্রথমত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে অসংখ্য নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব প্রেরণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল 'মিল্লাতে-ওয়াহেদা' ত্যাগ করে যে মানব সমাজ বিভিন্ন দল ও ফেরকাতে বিভক্ত হয়েছে, তাদেরকে পুনরায় পূর্ববর্তী ধর্মের আওতায় ফিরিয়ে আনা। নবীগণের আগমনের ধারাটিও এভাবেই চলেছে। যখনই মানুষ সৎপথ থেকে দূরে সরে থেকেছে, তখনই হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কোন না কোন নবী প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন, যেন তাঁর অনুসরণ করা হয়। আবার যখন তারা পথ হারিয়েছে, তখন অন্য আর একজন নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এর উদাহরণ হচ্ছে এই যে, শারীরিক সুস্থতা একটি আর রোগ অসংখ্য। কখনও একটি রোগ দেখা দিলে সে রোগের ঔষধ ও পথ্য নির্ধারণ করা হয়, অতঃপর আর একটি রোগ দেখা দিলে সে রোগের ঔষধ ও পথ্য নির্ধারণ করা হয়। সবশেষে এমন এক ব্যবস্থা দেওয়া হয়, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত রোগ হতে নিরাপদ থাকা যায়। এ ব্যবস্থাটি

স্থায়ী বা চিকিৎসা জগতে পূর্ববর্তী সমস্ত ব্যবস্থার স্থলাভিষিক্ত এবং পরবর্তী কালের জন্য নিশ্চিত্ত করে দেয়। তা-ই হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা, যার জন্য শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে এবং শেষ কিতাব কোরআন পাঠানো হয়েছে।

আর যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যমে সেসব নবী-রাসূলের শিক্ষাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল বলেই আরো নবী-রাসূল এবং কিতাব প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সেহেতু কোরআনকে পরিবর্তন হতে হেফাজতে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং কোরআনের শিক্ষাকে কিয়ামত পর্যন্ত এর প্রকৃতরূপে বহাল রাখার জন্য উম্মতে-মুহাম্মদীর মধ্য হতে এমন এক দলকে সঠিক পথে কায়েম রাখার ওয়াদা করেছেন, যে সব দল সব সময় সত্য ধর্মে অটল থেকে মুসলমানদের মধ্যে কোরআন ও সুন্নাহ্র সঠিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসার করতে থাকবে। কারো শত্রুতা বা বিরোধিতা তাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এজন্যই তাঁর পরে নবুয়ত ও ওহীর দ্বার বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী বিষয়। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই সর্বোপরি খত্মে-নবুয়ত ঘোষণা করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন নবী ও রসূল এবং তাঁদের উপর বিভিন্ন কিতাব অবতীর্ণ করার ফলে কেউ যেন এমন ধোঁকায় না পড়ে যে, নবী এবং কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করা। বরং বারবার নবী ও কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল যেভাবে প্রথম মানুষ একই সত্য ধর্মের অনুসারী হয়ে একই জাতিভুক্ত ছিল, তেমনিভাবে যেন আবার সবাই সত্য ধর্মে একত্রিত হয়ে যায়।

মাসা'আলা ঃ দ্বিতীয়ত বোঝা গেল যে, ধর্মের ভিত্তিতেই জাতীয়তা নির্ধারিত হয়। মুসলমান ও অমুসলমানকে দু'টি জাতিতে চিহ্নিত করাই এর উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ আয়াতটিও একটি প্রমাণ। এতদসঙ্গে একথাও পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে, ইসলামের মধ্যে এ দু'টি জাতীয়তা সৃষ্টির ব্যবস্থাও একটি একক জাতীয়তা সৃষ্টি করার জন্যই যা সৃষ্টির আদিতে ছিল। যার বুনিয়াদ দেশ ও ভৌগোলিক সীমার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না, বরং একক বিশ্বাস ও একক ধর্মের অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইরশাদ হয়েছে ঃ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً সৃষ্টির আদিতে সঠিক বিশ্বাস এবং সত্যধর্মের অনুসারীরূপে একক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরে মানুষ বিভেদ সৃষ্টি করেছে। নবীগণ মানুষকে এ প্রকৃত একক জাতীয়তার দিকে আহবান করেছেন। যারা তাঁদের এ আহবানে সাড়া দেয়নি, তারা এই জাতীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্বতন্ত্র জাতি গঠন করেছে।

মাস'আলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, মন্দ লোকেরা প্রেরিত নবীগণের এবং আল্লাহ্র কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং ঈমানদারদের পক্ষে তাদের এহেন দুরাচারের জন্য মনোকষ্ট নেওয়া উচিত নয়। যেভাবে কাফিররা তাদের পূর্ব-পুরুষদের পথ অবলম্বন করে নবীগণের বিরুদ্ধাচরণের পথ ধরেছে, তেমনিভাবে মু'মিন ও সালেহীনগণের উচিত নবীগণের শিক্ষা অনুসরণ করা, তাঁদের অনুসরণে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা এবং যুক্তিগ্রাহ্য মনোমুগ্ধকর ওয়াজ এবং নম্রতার মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদেরকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করতে থাকা। আর সে জন্যই মুসলমানগণকে পূর্ববর্তী আয়াতে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

(২১৪) তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহ্‌র সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে নবী-রাসূল ও মু'মিনগণের সাথে কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তাতে মুসলমানগণকে অনেকটা সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে, যাদের মনে কাফিরদের উপহাসে কষ্ট হতো। বলা হয়েছে যে, এ বিরুদ্ধাচরণ তোমাদের সাথে নতুন নয় ; সব সময়ই চলে আসছে। পরবর্তী আয়াতে কাফিরদের দ্বারা নবী-রাসূল ও মু'মিনগণকে কষ্ট দেওয়ার কাহিনী যেভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে এতেও তেমনিভাবে মুসলমানগণকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফিররা তোমাদেরকে নানাভাবে উৎপীড়ন করবে, তাতে তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। কেননা, পূর্ণ ও স্থায়ী শান্তি তো পরকালের জন্যই নির্ধারিত থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(দ্বিতীয় কথা হচ্ছে) তোমাদের কি এ ধারণা যে, (সাধ্য-সাধনা ছাড়াই) বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে ? অথচ (এখন পর্যন্ত তো কোন সাধনাই করনি। কেননা) এখনও তোমরা সে সমস্ত (মুসলমান) লোকের মত সমস্যার সম্মুখীন হওনি, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকগণ যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। তাদের উপর (বিরুদ্ধাচারীদের দ্বারা) এমন সব সমস্যা ও বিপদ আপতিত হতো। (যে বিপদের কারণে) তারা এমনকি নবী-রাসূলগণ পর্যন্ত আতংকে কম্পমান হয়ে উঠতেন এবং বলাবলি করতেন যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে! (প্রতি-উত্তরে তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হতো) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সাহায্য (অতি) নিকটে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং বিপদ-আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই বেহেশ্‌ত লাভ করতে পারবে না। অথচ কোরআন ও হাদীসের বর্ণনায় প্রমাণ রয়েছে যে, অনেক পাপী ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র দয়া ও ক্ষমার দৌলতে জান্নাত লাভ করবে ; এতে কোন কষ্ট সহ্যের প্রয়োজনই হবে না। কারণ, কষ্ট ও পরিশ্রমের স্তর বিভিন্ন। নিম্নস্তরের পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছে স্বীয় জৈবিক কামনা-বাসনা ও শয়তানের তাড়না থেকে

নিজেকে রক্ষা করে কিংবা সত্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের বিশ্বাস ও আকীদাকে ঠিক করা। এ স্তর প্রত্যেক মু'মিনেরই অর্জন করতে হয়। অতঃপর মধ্যম ও উচ্চ স্তরের বর্ণনা—যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম হবে, সে স্তরেরই জান্নাত লাভ হবে। এভাবে কষ্ট ও পরিশ্রম হতে কেউই রেহাই পায়নি। এক হাদীসে রসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل .

অর্থাৎ—সবচাইতে অধিক বালা-মুসিবতে পতিত হয়েছেন নবী-রাসূলগণ। তারপর তাঁদের নিকটতম ব্যক্তিবর্গ।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, নবীগণ ও তাঁদের সাথীগণের প্রার্থনা যে, "আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে" তা কোন সন্দেহের কারণে নয় যা তাঁদের শানের বিরুদ্ধ। বরং এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদিও আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, এর সময় ও স্থান নির্ধারণ করেননি। অতএব এ অশান্ত অবস্থায় এ ধরনের প্রার্থনার অর্থ ছিল এই যে, সাহায্য তাড়াতাড়ি অবতীর্ণ হোক। এমন প্রার্থনা আল্লাহ্র প্রতি ভরসা ও শানে নবুয়তের খেলাফ নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। বস্তুত নবী এবং সালেহীনগণই এরূপ প্রার্থনার অধিক উপযুক্ত।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۖ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾

(২১৫) আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে ? বলে দিন—যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-আপনজনের জন্য, এতিম অনাথদের জন্য, অসহায়দের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যে কোন সৎ কাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহ্র জানা রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মানুষ আপনার কাছে জানতে চায়, (সওয়াবের জন্য) কি জিনিস ব্যয় করবে (এবং কিভাবে ব্যয় করবে ?) আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, যেসব বস্তু তোমরা খরচ করতে চাও, (তার নির্ধারণের বিষয়টি তো তোমাদের সৎ সাহসের ওপরেই নির্ভরশীল। তবে খরচ করার স্থানগুলো আমি বলে দিচ্ছি। তা হলো এই যে) তাতে অধিকার রয়েছে মাতা-পিতার, আত্মীয়-স্বজনের, পিতৃহারা এতীম শিশুদের, অনাথ-অসহায় ও মুসাফিরদের, আর তোমরা যা কিছু নেক কাজ করবে (চাই তা আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্য কোন স্থানে) সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণ অবগত (এতে তিনি নেকী দান করবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথমোক্ত আয়াতগুলোতে স্বাভাবিকভাবে বিষয়টি একান্ত গুরুত্ব ও তাকীদের সাথে বলা হয়েছে যে, কুফরী ও মোনাফেকী ত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আল্লাহ্‌র আদর্শের পরিপন্থী হলে কারো কথাই মানবে না। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য জানমাল কোরবান করে দাও এবং যাবতীয় দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ কর। এখান থেকে সে নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জানমাল কোরবান করার ছোট-খাটো বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে, যা জানমাল এবং বিয়ে-তালাক প্রভৃতিসহ জীবনের অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পূর্ব থেকে যে বর্ণনাপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে এখানেও সে রীতিই রক্ষা করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক এ বিষয়গুলোর আলোচনাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং এরও একটা বিশেষ রীতি রয়েছে। এসব বিষয়ের অধিকাংশই হচ্ছে এমন, যার সম্পর্কে সাহাবীগণ রাসূলে করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং সেগুলোর উত্তর রাসূল (সা)-এর মাধ্যমে সরাসরি আরশে মোয়াল্লা থেকে আল্লাহ্ তা'আলাই দিয়েছেন। সেমতে এসব ফতোয়া বা প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং আল্লাহ্‌ই দিয়েছেন বলেও যদি মনে করা হয়, তাও ভুল হবে না। কোরআন শরীফে রয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ —এতে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ফতোয়া দেওয়ার কাজটিকে নিজেরই সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কাজেই এতে কোন প্রকার রূপক বিশ্লেষণ চলে না। তাছাড়া বলা যেতে পারে যে, এ ফতোয়া রাসূল (সা) দিয়েছেন, যা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে শেখানো হয়েছে। এ রুকূতে শরীয়তের যেসব হুকুম-আহকাম সাহাবীগণের প্রশ্নের উত্তরে বর্ণনা করা হয়েছে, তা একান্তই গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র কোরআনে এমনিভাবে প্রশ্নোত্তরের আকারে বিশেষ বিধানের বর্ণনা প্রায় সতেরটি জায়গায় রয়েছে। তন্মধ্যে সাতটি হচ্ছে সূরা বাকারায়, একটি সূরা মায়েদায়, একটি সূরা আনফালে। এ নয়টি স্থানে প্রশ্ন করা হয়েছে সাহাবায়ে-কেরামের পক্ষ থেকে। এ ছাড়া সূরা আ'রাফে দু'টি এবং সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা কাহাফ, সূরা তা-হা ও সূরা নাযেআতে একটি করে ছয়টি স্থানে কাফিরদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল—যার উত্তরে কোরআনে করীমে উত্তরের আকারেই দেওয়া হয়েছে। মুফাসসির হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণের চাইতে কোন উত্তম দল আমি দেখিনি ; ধর্মের প্রতি তাঁদের অনুরাগ ছিল অত্যন্ত গভীর আর হুযুরে আকরাম (সা)-এর প্রতি তাঁদের এহেন ভালবাসা ও সম্পর্ক সত্ত্বেও তাঁরা প্রশ্ন করতেন খুব অল্প। তাঁরা সর্বমোট তেরটি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করেছিলেন। সেগুলোর উত্তর কোরআন করীমে দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁরা প্রয়োজন ছাড়া কোন প্রশ্ন করতেন না। (কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথমটিতে সাহাবীগণের প্রশ্নের বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ—অর্থাৎ মানুষ কি ব্যয় করবে এ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে। এ প্রশ্নই রুকূতে দু'টি আয়াতের পর পুনরায় একই বাক্যের মাধ্যমে করা হয়েছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ —কিন্তু প্রথমবার এই প্রশ্নের যে উত্তর উল্লিখিত আয়াতে দেওয়া হয়েছে, দু'আয়াতের পর এর উত্তর অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। এজন্য বুঝতে হবে যে, একই রকম প্রশ্নের দু'টি উত্তরের একটি তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে। আর সে তাৎপর্যটি সে সমস্ত

অবস্থা ও ঘটনার বিষয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, যেগুলোর প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল। যেমন, আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযুল হচ্ছে এই যে, আমর ইবনে নূহ রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন : مَا نُنْفِقُ مِنْ اَمْوَالِنَا وَاَيْنَ نَضَعُهَا অর্থাৎ আমাদের সম্পদ হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোথায় ব্যয় করব ? ইবনে জরীরের বর্ণনা মতে এ প্রশ্নটির দু'টি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে, অর্থ-সম্পদের মধ্য থেকে কি বস্তু এবং কত পরিমাণ খরচ করা হবে ? দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই দানের পাত্র কারা ?

দু'আয়াত পরে যে একই প্রশ্ন করা হয়েছে, তার শানে-নুযুল ইবনে হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এই যে, মুসলমানগণকে যখন বলা হলো যে, তোমরা স্বীয় সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর, তখন কয়েকজন সাহাবী রসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার যে আদেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা শুনতে চাই। কি বস্তু কি পরিমাণে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করব ? এ প্রশ্নের একটি মাত্র অংশ বিদ্যমান। অর্থাৎ কি ব্যয় করা হবে। এভাবে এ দু'টি প্রশ্নের ধারা ও রূপের কিছুটা বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। প্রথম প্রশ্নে কি ব্যয় করবে এবং কোথায় ব্যয় করবে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে কি ব্যয় করবে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কোরআন মজীদ যা বলেছে, তাতে বোঝা যায় যে, প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ 'কোথায় ব্যয় করবে' একে অধিক গুরুত্ব দিয়ে পরিষ্কারভাবে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম অংশ 'কি খরচ করব'—এর উত্তর দ্বিতীয় উত্তরের আওতায় বর্ণনা করা যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। এখন কোরআন মজীদে বর্ণিত দু'টি অংশের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রথম অংশে অর্থাৎ কোথায় ব্যয় করবে সে সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে :

مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ‐

অর্থাৎ আল্লাহ্র রাস্তায় তোমরা যা-ই ব্যয় কর,তার হকদার হচ্ছে তোমাদের পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকিন ও মুসাফিরগণ।

আর দ্বিতীয় অংশের জবাব অর্থাৎ কি ব্যয় করবে ? এ প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে ইরশাদ করা হয়েছে : وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ অর্থাৎ 'তোমরা যেসব কাজ করবে তা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন।' বাক্যটিতে ভাল ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি যে, এতটুকু বাধ্যতামূলকভাবেই তোমাদের ব্যয় করতে হবে এবং স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ্র নিকট এর প্রতিদান পাবে।

মোটকথা, প্রথম আয়াতে হয়তো প্রশ্নকারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই প্রশ্নের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, আমরা যা ব্যয় করবো তা কাকে দেব ? কাজেই উত্তর দিতে গিয়ে দানের 'মাসরাফ' বা পাত্র সম্পর্কে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া দানের বস্তু ও পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যাপারটিকে প্রাসঙ্গিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্নে শুধু জিজ্ঞাসা ছিল যে, কি খরচ করব ? এর উত্তরে বলা হয়েছে : قُلِ الْعَفْوَ—অর্থাৎ "আপনি বলে দিন যে, যা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তা-ই খরচ কর।" এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ্র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করা সম্পর্কিত কয়েকটি মাস'আলা অবহিত হওয়া গেল।

মাস'আলা ১ ঃ এ 'দু'টি আয়াত ফরয যাকাত সম্পর্কিত নয়। কেননা, ফরয যাকাতের বেলায় নেসাব বা পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এবং কি পরিমাণ ব্যয় করতে হবে তাও নির্ধারিত রয়েছে। রাসূল (সা)-এর মাধ্যমেই পরিপূর্ণভাবে সেই হিসাব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই আয়াতে নেসাব ও ব্যয়ের পরিমাণ কোনটিরই উল্লেখ নেই। তবে বোঝা যায় যে, আয়াত দু'টি নফল সাদকা সম্পর্কিত। এতে আরো বোঝা যাচ্ছে যে, হিসাবে পিতা-মাতাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে অথচ মাতা-পিতাকে যাকাতের মাল দেওয়া রাসূল (সা)-এর শিক্ষা মতে জায়েয নয়। এ কারণেই এ আয়াতের সম্পর্ক ফরয যাকাতের সঙ্গে নয়।

মাসা'আলা ২ ঃ এতে আরো বোঝা গেল যে, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে যা দেওয়া হয় বা আহার করানো হয় তাতেও যদি আল্লাহ্র আদেশ পালনেরই উদ্দেশ্য থাকে, তবে সওয়াব তো পাওয়া যাবেই, তদুপরি তা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করার শামিল হবে।

মাস'আলা ৩ ঃ এতে আরো বোঝা গেল যে, নফল সাদকার বেলায় নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে, তা-ই ব্যয় করতে হবে। নিজের সন্তানদিগকে কষ্টে ফেলে, তাদেরকে অধিকার হতে বঞ্চিত করে সাদকা করার কোন বিধান নেই। এতে সওয়াব পাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, ঋণ পরিশোধ না করে তার পক্ষে নফল সদকা করাও আল্লাহ্র পছন্দ নয়। অবশ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল সাদকা করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাকে হযরত আবূ যর গিফারী (রা) ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী ওয়াজিব বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে স্বীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালের যাকাত ইত্যাদি প্রদান করার পর যা থাকবে, তা নিজের হাতে জমা করে রাখা জায়েয নয়, সব দান করে দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী ইমামগণের মতে কোরআনের আলোচ্য এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্র রাস্তায় যা ব্যয় করতে হয়, তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। পক্ষান্তরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছুই থাকবে, তার সবই দান করে ফেলা ওয়াজিব নয়। সাহাবীগণের আমল দ্বারাও তা-ই প্রমাণিত হয়।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ
كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ
أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ
يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ

مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

(২১৬) তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না! (২১৭) সম্মানিত মাস সম্পর্কে আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? আপনি বলে দিন, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় গোনাহ্! আর আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্র নিকট তার চেয়েও বড় গোনাহ্। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্তুত তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদেরকে দীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তা সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। (২১৮) আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহ্র পথে লড়াই (জিহাদ) করেছে, তারা আল্লাহ্র রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ত্রয়োদশ নির্দেশ ঃ জিহাদ ফরয হওয়া সংক্রান্ত ঃ জিহাদ করা তোমাদের উপর ফরয করা হলো এবং তা তোমাদের জন্য (স্বভাবত) ভারী (মনে) হবে। (পক্ষান্তরে) তোমাদের কাছে যা ভারী মনে হয়, তাই তোমাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে। আর এমনও (তো) সম্ভব যে, তোমরা কোন বিষয়কে ভাল মনে কর (অথচ প্রকৃতপক্ষে) তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর এবং (প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত অবস্থা) আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কিন্তু তোমরা (পুরোপুরি) জান না। (সুতরাং ভালমন্দের মীমাংসা তোমরা স্বীয় পছন্দমত করো না। যা আল্লাহ্র আদেশ তাতেই মঙ্গল মনে করে কাজ করতে থাক)।

চতুর্দশ নির্দেশ ঃ সম্মানিত মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে ঃ রাসূল (সা)-এর কয়েকজন সাহাবা কোন এক সফরে ঘটনাচক্রে কাফিরদের সাথে একটি খণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সে যুদ্ধে একজন কাফির নিহত হয়। দিনটি ছিল রজব চাঁদের পহেলা তারিখ। কিন্তু সাহাবীগণ মনে করেছিলেন যে, সেদিন জমাদিউস্ সানীর ত্রিশ তারিখ। যেহেতু ঘটনাটি নিষিদ্ধ মাসে সংঘটিত হয়েছিল, তাই কাফিররা মুসলমানদেরকে দোষারোপ করতে লাগল যে, মুসলমানরা নিষিদ্ধ মাসের সম্মান পর্যন্ত করে না। তাতে মুসলমানগণ চিন্তিত হয়ে রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন। কোন কোন বর্ণনামতে আছে যে, কাফিররা উপস্থিত হয়ে এর প্রতিবাদ জানালে তারই উত্তরে ইরশাদ হয়েছে ঃ মানুষ আপনার নিকট নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে থাকে। আপনি উত্তরে বলে দিন যে, এ মাসে (বিশেষভাবে ইচ্ছাপূর্বকভাবে) লড়াই করা বড়ই অন্যায়। (কিন্তু মুসলমানগণ এ কাজ ইচ্ছাপূর্বক করেনি, তারিখ সম্পর্কে খোঁজ-খবর না রাখার দরুনই তা হয়েছে। এটি হচ্ছে যুক্তিগ্রাহ্য জবাব। অভিযোগাত্মক উত্তর হচ্ছে এই যে, কাফির ও মুশরিকদের পক্ষে মুসলমানগণের উপর প্রশ্ন করার কোন সুযোগই ছিল না, যদিও নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা মারাত্মক অপরাধ কিন্তু কাফিরদের সে কার্যপদ্ধতি) আল্লাহ্র পথ (ধর্ম) হতে (মানুষকে) বিরত রাখা (ইসলাম গ্রহণের অভিযোগে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া, যাতে ভয়ে কেউ ইসলাম গ্রহণ না করে ;) আল্লাহ্র সাথে নাফরমানী করা এবং মসজিদুল হারাম যিয়ারত থেকে বঞ্চিত রাখা, (এর সাথে বেআদবী করা, সেখানে তখন মূর্তিপূজা ও সে সবের তওয়াফ করা হতো।) আর যারা মসজিদুল হারামের যোগ্য পাত্র ছিল (অর্থাৎ রাসূল এবং অন্যান্য মু'মিন) তাদেরকে (উত্যক্ত করে) সেই মসজিদুল হারামের প্রতিবেশ থেকে বের হতে বাধ্য করা (যার ফলে হিজরত বা দেশত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিল ; এসব কাজ নিষিদ্ধ মাসে নরহত্যার চাইতেও জঘন্য,) আল্লাহ্র নিকট মহা অন্যায়। (কেননা, এসব কাজ সত্য ধর্মে ফেতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্যই করা হয়। এবং এরূপ) বিভেদ সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও (যা মুসলমানদের দ্বারা হয়ে গেছে) অনেক বেশি (এবং মন্দ-কর্মের দিক দিয়ে) বড় দোষ ও পাপ। (কেননা, এ হত্যা দ্বারা সত্য ধর্মের কোন ক্ষতি হয়নি। বেশির চাইতে বেশি জেনে-শুনে এমন কাজ করলে সে নিজে পাপী হবে। কিন্তু কাফিরদের কার্যকলাপে সত্য ধর্মের অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়ে যায়। কাফিররা সর্বদা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে। এই উদ্দেশ্যে যে, যদি (আল্লাহ্ না করুন) তোমাদের উপর কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারে, তবে (তোমাদেরকে) এই ধর্ম (ইসলাম) থেকে ফিরে যেতে বাধ্য করবে (তাদের এ কার্যকলাপে ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপই প্রকাশ পায়)।

মুরতাদ হওয়ার পরিণাম ঃ আর তোমাদের মধ্যে যে নিজের ধর্ম (ইসলাম) থেকে ফিরে যাবে এবং পরে কাফির অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে, এসব মানুষের (নেক) আমল ইহকাল ও পরকাল সম্পূর্ণ বরবাদ হয়ে যাবে। (এবং) তারা চিরদিন জাহান্নামেই অবস্থান করবে।

(নিষিদ্ধ মাসে হত্যার দরুন মুসলমানগণের গোনাহ না হওয়ার কথা শুনে স্বস্তিবোধ করলেও তাঁরা এই ভেবে ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন যে, সওয়াব তো হলো না। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে সান্ত্বনা দেওয়া হলো)।

নিয়তের অকৃত্রিমতার জন্যে সওয়াব দানের প্রতিশ্রুতি ঃ প্রকৃতপক্ষে যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় দেশ ত্যাগ করেছে এবং জিহাদ করেছে, তারা তো আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ পাওয়ার আশা রাখে। (তোমাদের মধ্যেও তো এ আশা রয়েছে। ঈমান এবং হিজরতের সওয়াব তো সুনির্দিষ্ট, তবে এই বিশেষ জিহাদের বেলায় সন্দেহ্ হতে পারে। সুতরাং তোমাদের নিয়ত যেহেতু জিহাদেরই ছিল, তাই আমার নিকট তাও জিহাদের মধ্যেই শামিল। তাহলে এই বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তোমাদের নৈরাশ্য কেন ?) আর আল্লাহ্ তা'আলা (এ ভুল) ক্ষমা করবেন এবং (ঈমান, জিহাদ ও হিজরতের দরুন তোমাদের উপর) রহমত করবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জিহাদের কয়েকটি বিধান

মাস'আলা ঃ উল্লিখিত আয়াতের প্রথমটিতে জিহাদ ফরয হওয়ার আদেশ নিম্নলিখিত শব্দগুলো দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ "তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হলো।" এ শব্দগুলোর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর সব সময়ই জিহাদ করা ফরয। তবে কোরআনের কোন কোন আয়াত ও রাসূল (সা)-এর হাদীসের বর্ণনাতে বোঝা যায় যে, জিহাদের এ ফরয, ফরযে আইন-রূপে প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাব্যস্ত হয় না ; বরং এটা ফরযে কিফায়াহ্। যদি মুসলমানদের কোন দল তা আদায় করে, তবে সমস্ত মুসলমানই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পায়। তবে যদি কোন দেশে বা কোন যুগে কোন দলই জিহাদের ফরয আদায় না করে, তবে ঐ দেশের বা ঐ যুগের সমস্ত মুসলমানই ফরয থেকে বিমুখতার দায়ে গোনাহগার হবে। রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

الجهاد ماض الى يوم القيامة-এর মর্ম হচ্ছে এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকা আবশ্যক, যারা জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে। কোরআনের অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى .

অর্থাৎ—'আল্লাহ্ তা'আলা জানমাল দ্বারা জিহাদকারিগণকে জিহাদ বর্জনকারীদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং উভয়কে পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।'

এতে যেসব ব্যক্তি কোন অসুবিধার জন্য বা অন্য কোন ধর্মীয় খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'আলা সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ যদি ফরযে-আইন হতো তবে তা বর্জনকারীদেরকে সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো না।'

এমনিভাবে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ .

অর্থাৎ—"কেন তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি ছোট দল ধর্মীয় ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য বেরিয়ে গেলো না।" এ আয়াতে কোরআন নিজেই ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়ে বলছে যে, কিছুসংখ্যক মুসলমান জিহাদের ফরয আদায় করবে, আর কিছুসংখ্যক মুসলমান মানুষকে ধর্মীয় তা'লীম দানে নিয়োজিত থাকবে। আর এটা তখনই সম্ভব যখন জিহাদ ফরযে-আইন না হয়ে ফরযে-কিফায়াহ্ হবে।

তাছাড়া বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট জিহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার পিতা-মাতা কি বেঁচে আছেন ? উত্তরে সে বললো, জী, বেঁচে আছেন। তখন রাসূল (সা) তাকে উপদেশ দিলেন তুমি পিতা-মাতার খেদমত করেই জিহাদের সওয়াব হাসিল কর। এতেও বোঝা যায় যে, জিহাদ ফরযে-কিফায়াহ। যখন মুসলমানদের একটি দল জিহাদের ফরয আদায় করে, তখন অন্যান্য মুসলমান অন্য খেদমতে নিয়োজিত হতে পারে। তবে যদি মুসলমানদের নেতা প্রয়োজনে সবাইকে জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান করেন, তখন জিহাদ ফরযে-আইন হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কোরআন হাকীমের সূরা তওবায় ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَا لَكُمۡ اِذَا قِيۡلَ لَكُمُ انۡفِرُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اثَّاقَلۡتُمۡ .

অর্থাৎ—"হে মুসলমানগণ ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে বেরিয়ে যাও, তখনই তোমরা মনমরা হয়ে পড়।"

এ আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সার্বজনীন আদেশ দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ্ না করুন, যদি কোন ইসলামী দেশ অমুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সেদেশের লোকের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশবাসীর উপরেও সে ফরয আপতিত হয়। তারাও যদি প্রতিহত করতে না পারে, তবে এর নিকটবর্তী মুসলিম দেশের উপর, এমনি সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের উপর এ ফরয পরিব্যাপ্ত হয় এবং ফরযে-আইন হয়ে যায়। কোরআনের আলোচ্য আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জিহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে ফরযে-কিফায়াহ্।

মাস'আলা ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ ফরযে-কিফায়াহ্ পর্যায়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তানদের পক্ষে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়।

মাস'আলা ঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঋণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত এ ফরযে-কিফায়াহতে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়। আর যখন এ জিহাদ প্রয়োজনের তাকীদে ফরযে-আইনে পরিণত হয়, তখন পিতা-মাতা, স্বামী বা স্ত্রী অথবা ঋণদাতা কারোরই অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

আলোচ্য আয়াতের শেষে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দানের জন্য ইরশাদ হয়েছে যে, "যদিও জিহাদ স্বাভাবিকভাবে বোঝা মনে হয় কিন্তু স্মরণ রেখো, মানুষের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেষ্টা পরিণামে অনেক সময় অকৃতকার্য হয়। ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করা বিজ্ঞ ও বড় বুদ্ধিমানের পক্ষেও আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রতিটি মানুষই তার জীবনের যাবতীয় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, তার জীবনেই অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে সে কোন কাজকে

অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী মনে করেছিল, কিন্তু পরিণামে তা অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়েছে। অথবা কোন বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেছিল এবং তা থেকে দূরে সরেছিল, কিন্তু পরিণামে দেখা গেল, তা অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী ছিল। মানুষের বুদ্ধি ও চেষ্টার অশুভ পরিণাম অনেক ব্যাপারেই ধরা পড়ে। তাই বলা হয়েছে ঃ

خویش را دیدم در رسوائ خویش .

"অনেক সময় নিজেকে আত্ম-অবমাননায় নিয়োজিত দেখেছি।" কাজেই বলা হয়েছে—জিহাদ ও ধর্মযুদ্ধে যদিও আপাতদৃষ্টিতে জান ও মালের ক্ষতির আশংকা মনে হয়, কিন্তু যখন পরিণাম সামনে আসবে, তখন বোঝা যাবে যে, এ ক্ষতি বাস্তবে মোটেও ক্ষতি ছিল না ; বরং সোজাসুজি লাভ, উপকার এবং চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা ছিল।

নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী ঃ আলোচ্য আয়াতের দ্বারা দ্বিতীয় যে বিষয়টি প্রমাণিত হচ্ছে, তা হলো নিষিদ্ধ মাস অর্থাৎ রজব, যিল্‌কদ, যিলহজ্জ এবং মুহাররম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম। এমনিভাবে কোরআনের অনেকগুলো আয়াতেই এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষেধ করা হয়েছে। যথা–منها اربعة حرم ذلك الدين القيم এবং বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে হুযূর (সা) ঘোষণা করেছেন ঃ منها اربعة حرم ثلاث متواليات ورجب এসব আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, উল্লিখিত চারটি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের এ নিষেধাজ্ঞা সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য।

ইমামে-তফসীর আতা ইবনে আবী রাবাহ্ কসম খেয়ে বলেছেন যে, এ আদেশ সর্বযুগের জন্য। তাবেয়ীগণের অনেকেও এ আদেশকে স্থায়ী আদেশ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ্ এবং ইমাম জাস্‌সাসের মতে এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে। ফলে এখন কোন মাসেই প্রয়োজনীয় যুদ্ধ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ আয়াত দ্বারা এ আদেশ রহিত করা হয়েছে ? এ সম্পর্কে ফকীহ্গণের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন ঃ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً। আয়াতটি উল্লিখিত আয়াতের নির্দেশ রহিতকারী। আবার অধিকাংশের মতে রহিতকারী সেই আয়াত হচ্ছে ঃ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ

حيث শব্দটি এ স্থলে কালবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ মুশরিকদের যে মাসে এবং যে কালেই পাও, হত্যা কর। কারো কারো মতে, এ আদেশ রাসূল (সা)-এর কর্ম দ্বারা রহিত হয়েছে। তিনি নিষিদ্ধ মাসেই তায়েফ অবরোধ করেছিলেন এবং নিষিদ্ধ মাসেই হযরত 'আমের আশ'আরী (রা)-কে আউতাসের যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ ফকীহ্গণ এ আদেশকে রহিত বলে উল্লেখ করেছেন। জাস্‌সাস বলেছেন ঃ وهو قول فقهاء الامصار অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের ফকীহ্গণেরই সম্মিলিত অভিমত।

রূহুল-মা'আনী এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এবং বায়যাবী সূরায়ে বরা'আতের প্রথম রুকূর তফসীর প্রসঙ্গে এ আদেশ রহিত হওয়ার ব্যাপারে এজমায়ে উম্মতের কথা উল্লেখ করেছেন।–(বয়ানুল-কোরআন)

কিন্তু তফসীরে মাযহারী এসব দলীলের জবাবে বলেছেন যে, নিষিদ্ধ মাসের বিস্তারিত আলোচনা এ আয়াতে রয়েছে। একে বলা হয় 'আয়াতুস-সাইফ' অর্থাৎ—

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ .

পরন্তু এ আয়াতটি জিহাদ বা যুদ্ধ-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর মধ্যে সর্বশেষে অবতীর্ণ হয়েছে। হুযূর (সা)-এর ওফাতের মাত্র আশি দিন পূর্বে প্রদত্ত বিদায় হজ্জের ভাষণেও নিষিদ্ধ মাসের বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিদ্যমান। কাজেই এর দ্বারা আলোচ্য আয়াতকে রহিত বলা চলে না। তাছাড়া রাসূল (সা)-এর তায়েফ অবরোধ যিলকদ মাসে নয়, বরং শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এ অভিযানের দ্বারাও উল্লিখিত আয়াতকে মনসূখ বলা যায় না। অবশ্য একথা বলা যায় যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের নিষেধাজ্ঞা থেকে এ ব্যাপারটি স্বতন্ত্র যে, যদি কাফিররা এসব মাসেই আক্রমণ করে, তবে প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণ মুসলমানদের জন্যও বৈধ হবে। কাজেই আয়াতের শুধুমাত্র এ অংশটুকুকেই রহিত বলা যেতে পারে, যার ব্যাখ্যা রয়েছে– اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ আয়াতটিতে।

মোটকথা, এসব মাসে নিজে থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করা সর্বকালের জন্যই নিষিদ্ধ। তবে কাফিররা যদি এসব মাসে আক্রমণ করে, প্রতিরক্ষামূলক প্রতি-আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্যও জায়েয। যেমন, ইমাম জাস্‌সাস হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, রাসূল (সা) নিষিদ্ধ মাসে যতক্ষণ পর্যন্ত কাফিরদের দ্বারা আক্রান্ত না হতেন, ততক্ষণ আক্রমণ করতেন না।

মুরতাদের পরিণাম ঃ উল্লিখিত আয়াত– يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ -এর শেষে মুসলমান হওয়ার পর তা ত্যাগ করা বা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হুকুম বলা হয়েছে।

حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

অর্থাৎ—'তাদের আমল দুনিয়া ও আখিরাতে বা ইহ ও পরকালে বরবাদ হয়ে গেছে।' এ বরবাদ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, পার্থিব জীবনে তাদের স্ত্রী তাদের বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদি তার কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু হয় তাহলে সে ব্যক্তির উত্তরাধিকার বা মিরাসের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, ইসলামে থাকাকালীন নামায-রোযা যত কিছু করেছে সব বাতিল হয়ে যায়, মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া হয় না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফনও করা হবে না।

আর পরকাল বরবাদ হওয়ার অর্থ হচ্ছে ইবাদতের সওয়াব না পাওয়া এবং চিরকালের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

মাস'আলা ঃ যদি এ ব্যক্তি পুনরায় মুসলমান হয়, তবে পরকালে দোযখ থেকে রেহাই পাওয়া এবং দুনিয়াতে তার উপর পুনরায় শরীয়তের হুকুম জারি হওয়া নিশ্চিত। তবে যদি সে প্রথম মুসলমান থাকা অবস্থায় হজ্জ করে থাকে, তবে সামর্থ্যবান হয়ে থাকলে দ্বিতীয়বার তা ফরয হওয়া না হওয়া, পূর্বের নামায-রোযার পরকালে প্রত্যাবর্তন হওয়া না হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে ইমামগণ মতানৈক্য পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) দ্বিতীয়বার হজ্জকে ফরয বলেন এবং পূর্বের নামায-রোযার সওয়াব পাবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র) দু'টি বিষয়েই মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন।

মাস'আলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রথম থেকেই কাফির হয়ে থাকে এবং সে অবস্থায় কোন কাজ করে থাকে, কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বকৃত যাবতীয় সৎকর্মের সওয়াবই সে পাবে। আর যদি সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে সবই বরবাদ হয়ে যাবে।

اسلمت على ما اسلفت من خير হাদীসটি এ অর্থেই এসেছে।

মাস'আলা ঃ মোটকথা, মুরতাদের অবস্থা কাফিরদের অবস্থা হতেও নিকৃষ্টতর। এজন্য কাফিরদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করা যায়, কিন্তু পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করলে মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আর যদি মুরতাদ স্ত্রীলোক হয়, তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কেননা, মুরতাদের কার্যকলাপের দরুন সরাসরিভাবে ইসলামের অবমাননা করা হবে। কাজেই তারা সরকার অবমাননার শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ؗ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ

---

(২১৯) তারা আপনাকে মদ জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মস্ত বড় গোনাহ্। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পঞ্চদশ আদেশ ঃ শরাব ও জুয়া সম্পর্কে ঃ মানুষ আপনার কাছে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি তাদেরকে বলে দিন এ দু'টি (বস্তুর ব্যবহার)-এর মধ্যে মহাপাপের বিষয় (সৃষ্টি হয়) এবং এতে মানুষের (কিছু) উপকারিতাও রয়েছে তবে পাপের বিষয়গুলো সেই উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বেশি (কাজেই উভয়টিই পরিত্যাজ্য)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সাহাবীগণের প্রশ্নসমূহ এবং সেসব প্রশ্নের উত্তর যে পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে এ আয়াতও অন্তর্ভুক্ত। এতে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে সাহাবীগণের প্রশ্ন এবং আল্লাহ্র তরফ থেকে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। এ দু'টি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, বিস্তারিতভাবে এ দু'টির তাৎপর্য ও বিধানগুলোর মধ্যে লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

শরাব হারাম হওয়া এবং এতদসংক্রান্ত বিধান ঃ ইসলামের প্রথম যুগে জাহিলিয়ত আমলের সাধারণ রীতিনীতির মত মদ্যপানও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অতঃপর রাসূলে করীম (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন, তখনও মদীনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ এ দু'টি বস্তুর শুধু বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করেই এতে মত্ত ছিল। কিন্তু এগুলোর অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তবে আল্লাহ্র নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রতিটি জাতি ও প্রতিটি অঞ্চলে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও

থাকেন, যারা বিবেক-বুদ্ধিকে অভ্যাসের উর্ধ্বে স্থান দেন। যদি কোন অভ্যাস বুদ্ধির বা যুক্তির পরিপন্থী হয়, তবে সে অভ্যাসের ধারে-কাছেও তাঁরা যান না। এ ব্যাপারে নবী করীম (সা)-এর স্থান ছিল সবচেয়ে উর্ধ্বে। কেননা যেসব বস্তু কোন কালে হারাম হবে, এমন সব বস্তু হতেও তাঁর অন্তরে পূর্ব থেকেই একটা সহজাত ঘৃণা ছিল। সাহাবীগণের মধ্যেও এমন কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন, যাঁরা হালাল থাকা কালেও মদ্যপান তো দূরের কথা, স্পর্শও করেন নি।

মদীনায় পৌঁছার পর কতিপয় সাহাবী এমন বিষয়ের অকল্যাণগুলো অনুভব করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ফারুকে-আযম, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল এবং কিছু সংখ্যক আনসার রাসূলে করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন-সম্পদও ধ্বংস করে দেয় ; এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি ? এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ হচ্ছে প্রথম আয়াত, যা মুসলমানদেরকে মদ ও জুয়া হতে দূরে রাখার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, মদ ও জুয়াতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু এ দু'টির মাধ্যমেই অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত হয়, যা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বড় ও ক্ষতিকর। পাপ অর্থে এখানে সে সব বিষয়ও বোঝানো হয়েছে, যা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন মদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দোষ হচ্ছে এই যে, এতে মানুষের সবচাইতে বড় গুণ, বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ বুদ্ধি এমন একটি গুণ, যা মানুষের মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে যখন তা থাকে না, তখন প্রতিটি মন্দ কাজের পথই সুগম হয়ে যায়।

এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় মদকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু এর অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকগুলোকে তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, মদ্যপানের দরুন মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। বলতে গেলে আয়াতটিতে মদ্যপান ত্যাগ করার জন্য এক প্রকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কোন সাহাবী এ পরামর্শ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন, এ আয়াতে মদকে তো হারাম করা হয়নি, বরং এটা ধর্মের পক্ষে ক্ষতিকর কাজে ধাবিত করে বলে একে গোনাহের কারণ বলে স্থির করা হয়েছে। যাতে ফেতনায় পড়তে না হয়, সেজন্য পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মদের ব্যাপারে পরবর্তী আয়াতটি নাযিল হওয়ার ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ একদিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) সাহাবীগণের মধ্য হতে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে আহারের পর প্রথা অনুযায়ী মদ্যপানের ব্যবস্থা করলেন এবং সবাই মদ্যপান করলেন। এমতাবস্থায় মাগরিবের নামাযের সময় হলে সবাই নামাযে দাঁড়ালেন এবং একজনকে ইমামতি করতে আগে বাড়িয়ে দিলেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন তিনি قُلْ يَاَيُّهَا الْكُفِرُوْنَ সূরাটি ভুল পড়তে লাগলেন, তখনই মদ্যপান হতে বিরত রাখার জন্যে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। ইরশাদ হলো ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى .

অর্থাৎ—'হে ঈমানদারগণ ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যেও না।' এতে নামাযের সময় মদ্যপানকে হারাম করা হয়েছে। তবে অন্যান্য সময় তা পান করার অনুমতি

তখনও পর্যন্ত বহাল। পরবর্তীতে বহু সংখ্যক সাহাবী এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরই মদ্যপান সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। ভেবেছিলেন, যে বস্তু মানুষকে নামায থেকে বিরত রাখে, তাতে কোন কল্যাণই থাকতে পারে না। যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, তখন এমন বস্তুর ধারে-কাছে যাওয়া উচিত নয়, যা মানুষকে নামায থেকে বঞ্চিত করে। যেহেতু নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ের জন্য মদ্যপানকে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়নি, সেহেতু কেউ কেউ নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে মদ্যপান করতে থাকেন। ইতিমধ্যে আরো একটি ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। হযরত আতবান ইবনে মালেক (রা) কয়েকজন সাহাবীকে নিমন্ত্রণ করেন, যাঁদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর মদ্যপান করার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। আরবদের প্রথা অনুযায়ী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কবিতা প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের বংশ ও পূর্বপুরুষদের অহংকারমূলক বর্ণনা আরম্ভ হয়। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন, যাতে আনসারদের দোষারোপ করে নিজেদের প্রশংসা কীর্তন করা হয়। ফলে একজন আনসার যুবক রাগান্বিত হয়ে উটের গণ্ডদেশের একটি হাড় সা'দ-এর মাথায় ছুঁড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে সা'দ (রা) রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে উক্ত আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন হুযূর (সা) দোয়া করলেন ঃ

اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا .

অর্থাৎ—"হে আল্লাহ্ ! শরাব সম্পর্কে আমাদেরকে একটি পরিষ্কার বর্ণনা ও বিধান দান কর।" তখনই সূরা মায়েদার উদ্ধৃত মদ ও মদ্যপানের বিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ .

অর্থাৎ—"হে ঈমানদারগণ ! নিশ্চিত জেনো, মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ধারণের জন্য তীর নিক্ষেপ এসবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে থাক, যাতে তোমরা মুক্তি লাভ ও কল্যাণ পেতে পার। শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা-তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে আর আল্লাহ্র স্মরণ এবং নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখাই হলো শয়তানের একান্ত কাম্য, তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না ?"

মদের অবৈধতা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক নির্দেশ ঃ আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর তাৎপর্য তিনিই জানেন। তবে শরীয়তের নির্দেশসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, ইসলামী শরীয়ত কোন বিষয়ে কোন হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ-অনুভূতিসমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে, যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ কষ্টের সম্মুখীন না হয়। যেমন কোরআন নিজেই ঘোষণা করেছে ঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ্ তা'আলা কোন মানুষকেই এমন আদেশ দেন না, যা তার শক্তি ও ক্ষমতার ঊর্ধ্বে।" এই দয়া ও রহস্যের চাহিদা ছিল ইসলামী শরীয়তেও মদ্যপানকে হারাম করার ব্যাপারে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

মদ্য পানকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কোরআনের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম হচ্ছে এই যে, মদ্যপান সম্পর্কে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে আলোচ্য এ আয়াতটিই সর্বপ্রথম নির্দেশ। এতে মদ্যপানের দরুন যেসব পাপ ও ফাসাদ সৃষ্টি হয়, তার বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়েছে। মদ্যপান হারাম করা হয়নি, বরং এ আয়াতটিকে এই মর্মে একটা পরামর্শ বলা যেতে পারে যে, এটা বর্জনীয় বস্তু। কিন্তু বর্জন করার কোন নির্দেশ এতে দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয় আয়াত সূরা নিসা'য় বলা হয়েছে ঃ

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى–এতে বিশেষভাবে নামাযের সময় মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য সময়ের জন্য অনুমতি রয়ে গেছে। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াত রয়েছে সূরা মায়েদায়, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে পরিষ্কার ও কঠোরভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ ও হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয় শরীয়তের এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ছিল এই যে, আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা, বিশেষত নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হতো।

আলেমগণ বলেছেন ঃ فطام العادة اشد من فطام الرضاعة অর্থাৎ 'যেভাবে শিশুদেরকে মাতৃস্তনের দুধ ছাড়ানো কঠিন ও কষ্টকর, তেমনি মানুষের কোন অভ্যাসগত কাজ ত্যাগ করা এর চাইতেও কষ্টকর।" এজন্য ইসলাম একান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথম শরাবের মন্দ দিকগুলো মানবমনে বদ্ধমূল করেছে। অতঃপর নামাযের সময়ে একে নিষিদ্ধ করেছে এবং সবশেষে বিশেষ বিশেষ সময়ের পরিবর্তে কঠোরভাবে সর্বকালের জন্যই একে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে।

তবে শরাব হারাম করার ব্যাপারে প্রথমত ধীরমন্থর গতিতে এগিয়ে যাওয়াটাই ছিল বৈজ্ঞানিক পন্থা। তেমনিভাবে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করার পর এর নিষিদ্ধতার আইন-কানুন শক্তভাবে জারি করাও বিজ্ঞতারই পরিচায়ক। এ জন্য রাসূল (সা) শরাব সম্পর্কে কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ "সর্বপ্রকার অপকর্ম এবং অশ্লীলতার জন্মদাতা হচ্ছে শরাব। এটি পান করে মানুষ নিকৃষ্টতর পাপে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে।"

নাসায়ী শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, "শরাব ও ঈমান একত্র হতে পারে না।" তিরমিযীতে হযরত আনাস (রা) হুযুর (সা)-এর নিকট হতে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর (সা) মদের সাথে সম্পর্ক রাখে—এমন দশ শ্রেণীর ব্যক্তির উপর লা'নত করেছেন।

(১) যে লোক নির্যাস বের করে, (২) প্রস্তুতকারক, (৩) পানকারী, (৪) যে পান করায়, (৫) আমদানীকারক, (৬) যার জন্য আমদানী করা হয়, (৭) বিক্রেতা, (৮) ক্রেতা, (৯) সরবরাহকারী, (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী।

অতঃপর শুধু মৌলিক শিক্ষা ও প্রচারের উপরই ক্ষান্ত হননি, বরং যথাযথ আইনের মাধ্যমেও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যার নিকট কোন প্রকার মদ থেকে থাকে, তা অমুক স্থানে উপস্থিত কর।

সাহাবীগণের মধ্যে আদেশ পালনের অনুপম আগ্রহ : আদেশ পাওয়ামাত্র অনুগত সাহাবীগণ নিজ নিজ ঘরে ব্যবহারের জন্য রক্ষিত মদ তৎক্ষণাৎ ফেলে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূলে করীম (সা)-এর প্রেরিত এক ব্যক্তি মদীনার অলি-গলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, মদ্যপান হারাম করা হয়েছে, তখন যার হাতে শরাবের যে পাত্র ছিল, তা তিনি সেখানেই ফেলে দিয়েছিলেন। যার কাছে মদের কলস বা মটকা ছিল, তা ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বের করে ভেঙে ফেলেছেন। হযরত আনাস (রা) তখন এক মজলিসে মদ্যপানের সাকীর কাজ সম্পাদন করছিলেন। আবূ তালহা, আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্, উবাই ইবনে কা'ব, সোহাইল (রা) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সাহাবী সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকের ঘোষণা কানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন—এবার সমস্ত শরাব ফেলে দাও। এর পেয়ালা, মটকা, হাঁড়ি ভেঙে ফেল। অন্য বর্ণনায় আছে—হারাম ঘোষণার সময় যার হাতে শরাবের পেয়ালা ছিল এবং তা ঠোঁট স্পর্শ করেছিল, তাও তৎক্ষণাৎ সে অবস্থাতেই দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সেদিন মদীনায় এ পরিমাণ শরাব নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, বৃষ্টির পানির মত শরাব প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদীনার অলি-গলির অবস্থা ছিল যে, যখনই বৃষ্টি হতো তখন শরাবের গন্ধ ও রং মাটির উপর ফুটে উঠত।

যখন আদেশ হলো যে, যার কাছে যে রকম মদ রয়েছে, তা অমুক স্থানে একত্র কর। তখন মাত্র সেসব মদই বাজারে ছিল, যা ব্যবসার জন্য রাখা হয়েছিল। এ আদেশ পালনকল্পে সাহাবীগণ বিনাদ্বিধায় নির্ধারিত স্থানে সব মদ একত্র করেছিলেন।

হুযূর (সা) স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে শরাবের অনেক পাত্র ভেঙে ফেললেন এবং অবশিষ্টগুলো সাহাবীগণের দ্বারা ভাঙিয়ে দিলেন। জনৈক সাহাবী মদের ব্যবসা করতেন এবং সিরিয়া থেকে মদ আমদানী করতেন। ঘটনাচক্রে তখন তিনি মদ আনার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গিয়েছিলেন। যখন তিনি ব্যবসায়ের এ পণ্য নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মদীনায় প্রবেশ করার পূর্বেই যখন মদ হারাম হওয়ার সংবাদ তাঁর কানে পৌঁছলো তখন সেই সাহাবীও তাঁর সমুদয় মাল, যা অনেক মুনাফার আশায় আনা হয়েছিল, এক পাহাড়ের পাদদেশে রেখে এসে হুযূরে আকরাম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এসব সম্পদের ব্যাপারে কি করতে হবে তৎসম্পর্কে নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। মহানবী (সা) হুকুম করলেন, মটকাগুলো ভেঙে সমস্ত শরাব ভাসিয়ে দাও। অতঃপর বিনা আপত্তিতে তিনি তাঁর সমস্ত পুঁজির বিনিময়ে সংগৃহীত এ পণ্যসম্ভার স্বহস্তে মাটিতে ঢেলে দিলেন। এটাও ইসলামের মু'জেযা এবং সাহাবীগণের বিস্ময়কর আনুগত্যের নিদর্শন, যা এ ঘটনায় প্রমাণিত হলো। যে জিনিসের অভ্যাস হয়ে যায় সবাই জানে যে, তা ত্যাগ করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। মদ্যপানে তাঁরা এমন অভ্যস্ত ছিলেন যে, অল্পদিন তা থেকে বিরত থাকাও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর একটি মাত্র নির্দেশই তাঁদের অভ্যাসে এমন অপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করল যে, তারপর থেকে তাঁরা শরাবের প্রতি ততটুকুই ঘৃণা পোষণ করতে লাগলেন, যতটুকু পূর্বে তাঁরা এর প্রতি আসক্ত ছিলেন।

ইসলামী রাজনীতি এবং সাধারণ রাজনীতির পার্থক্য : আলোচ্য আয়াতে ও ঘটনাসমূহের মধ্যে শরাব হারাম হওয়ার আদেশের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্যের একটা নমুনা দেখা গেল।

একে ইসলামের মু'জেযা বা নবী করীম (সা)-এর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অথবা ইসলামী রাজনীতির অপরিহার্য পরিণতিও বলা যেতে পারে। বস্তুত নেশার অভ্যাস ত্যাগ করা যে অত্যন্ত কঠিন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তদুপরি আরব দেশের কথা তো স্বতন্ত্র, সেখানে এর প্রচলন এত বেশি ছিল যে, মদ ছাড়া কয়েক ঘণ্টা কাটানোও তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় তা কি পরশ পাথর ছিল যে, মাত্র একটি ঘোষণার শব্দ কানে পৌঁছামাত্র তাঁদের স্বভাবে এ আমূল পরিবর্তন সাধিত হলো ! সে একটি মাত্র ঘোষণাই তাঁদের অভ্যাসে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল যে, কয়েক মিনিট পূর্বে যে জিনিস এত প্রিয় এবং এত লোভনীয় ছিল, অল্প কয়েক মিনিট পরে তাই অত্যন্ত ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য বলে পরিগণিত হয়ে গেল !

অপরদিকে বর্তমান যুগের তথাকথিত উন্নতমানের রাজনীতির একটি উদাহরণ সামনে রেখে দেখা যাক। আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বে আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং সমাজ সংস্কারকগণ মদ্যপানের সংখ্যাতীত মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলো অনুধাবন করে দেশে মদ্যপানকে আইন করে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আর এজন্য জনমত গঠনের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসাবে অভিহিত প্রচারের সে আধুনিকতম যন্ত্রগুলোও ব্যবহার করা হয়েছিল। সবগুলো প্রচার-মাধ্যমই মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। শত শত সংবাদপত্রে নিবন্ধ প্রকাশিত হলো, পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হলো, লক্ষ লক্ষ পুস্তক ছেপে প্রচার ও বিতরণ করা হলো। তাছাড়া আমেরিকার সংসদেও এজন্য আইন পাস করা হলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমেরিকার যে অবস্থা, মানুষের সামনে এবং সেখানকার সরকারী প্রতিবেদনের মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে এসেছে তা হলো এই যে, এই আধুনিক উন্নত ও শিক্ষিত জাতি সেই আইনগত নিষেধাজ্ঞার সময়টিতে সাধারণ সময়ের চাইতেও অধিক মাত্রায় মদ্যপান করেছে। এমনকি অবশেষে সরকার এ আইন বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

তদানীন্তন আরবের মুসলমান এবং আধুনিক আমেরিকার উন্নত জাতির মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, বিরাট পার্থক্যের প্রকৃত কারণ ও রহস্য কি ?

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, ইসলামী শরীয়ত মানুষের সংশোধনের জন্য শুধু আইনকেই পর্যাপ্ত মনে করেনি, বরং আইনের পূর্বে তাদের মন-মস্তিষ্ককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, ইবাদত-আরাধনা এবং পরকালের চিন্তা নামক পরশমনির পরশে মনোজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, যার ফলে রাসূল (সা)-এর একটি মাত্র আহবানেই তারা স্বীয় জানমাল, শান-শওকত সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। মক্কী জীবনে এই মানুষ তৈরির কাজই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলতে থাকে। এভাবে আত্মত্যাগীদের একটা বিরাট দল তৈরি হয়ে গেল ; তারপর প্রণয়ন করা হলো আইন। পক্ষান্তরে মানুষের মনের পরিবর্তনের জন্য আমেরিকার সরকার অসংখ্য উপায় অবলম্বন করেছে। তাদের নিকট সব কিছুই ছিল, কিন্তু ছিল না পরকালের চিন্তা। অপরদিকে মুসলমানদের প্রতিটি শিরা-উপশিরাও ছিল পরকালের চিন্তায় পরিপূর্ণ।

আজও যদি সমস্যাকাতর দুনিয়ার মানুষ সে পরশমনি ব্যবহার করে দেখেন, তবে অবশ্যই তাঁরা দেখতে পাবেন যে, অতি সহজেই সারা বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।

মদ্যপানের অপকারিতা ও উপকারিতার তুলনা ঃ এ আয়াতে মদ ও জুয়া উভয় বস্তু সম্পর্কেই কোরআন বলেছে যে, এতে কিছু উপকারিতাও রয়েছে, তবে বেশ কিছু অপকারিতাও বর্তমান—কিন্তু এর উপকারিতার তুলনায় অপকারিতার মাত্রা অনেক বেশি। তাই একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, এর উপকারিতা ও অপকারিতাগুলো কি কি ? অতঃপর দেখতে হবে, উপকারিতার তুলনায় অপকারিতা বেশি হওয়ার কারণ কি ? সবশেষে ফিকাহ্র কয়েকটি মূলনীতি বর্ণনা করা হবে, যেগুলো এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়।

প্রথমে শরাব সম্পর্কে আলোচনা করা যাক ঃ এর উপকারিতার কথা বলতে গেলে –শরাব পানে আনন্দ লাভ হয়, সাময়িকভাবে শক্তিও কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে কিছুটা লাবণ্যও সৃষ্টি হয়, কিন্তু এ নগণ্য উপকারিতার তুলনায় এর ক্ষতির দিকটা এত বিস্তৃত ও গভীর যে, অন্য কোন বস্তুতেই সচরাচর এতটা ক্ষতি দেখা যায় না। শরাবের প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মানুষের হজমশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, খাদ্যস্পৃহা কমে যায়, চেহারা বিকৃত হয়ে পড়ে, স্নায়ু দুর্বল হয়ে আসে। সামগ্রিকভাবে শারীরিক সক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একজন জার্মান ডাক্তার বলেছেন—যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত তারা চল্লিশ বছর বয়সে ষাট বছরের বৃদ্ধ মানুষের মত অকর্মণ্য হয়ে পড়ে এবং তাদের শরীরের গঠন এত হালকা হয়ে যায় যে, ষাট বছরের বৃদ্ধেরও তেমনটি হয় না। শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে অল্প বয়সে বৃদ্ধের মত বেকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া শরাব লিভার এবং কিডনীকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে ফেলে। যক্ষ্মা রোগটি মদ্যপানেরই একটা বিশেষ পরিণতি। ইউরোপের শহরাঞ্চলে যক্ষ্মার আধিক্যের কারণও অতিমাত্রায় মদ্যপান। সেখানকার কোন কোন ডাক্তার বলেছেন, ইউরোপে অধিক মৃত্যুর কারণই হচ্ছে যক্ষ্মা। যখন থেকে ইউরোপে মদ্যপানের আধিক্য দেখা দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে যক্ষ্মারও প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে।

এগুলো হচ্ছে মানবদেহে সাধারণ প্রতিক্রিয়া। বস্তুত মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবাই অবগত। সবাই জানেন যে, মানুষ যতক্ষণ নেশাগ্রস্ত থাকে, ততক্ষণ তার জ্ঞানবুদ্ধি কোন কাজই করতে পারে না। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে এই যে, নেশার অভ্যাস মানুষের বোধশক্তিকেও দুর্বল করে দেয়, যার প্রভাব চৈতন্য ফিরে পাবার পরেও ক্রিয়াশীল থাকে। অনেক সময় এতে মানুষ পাগলও হয়ে যায়। চিকিৎসাবিদগণের সবাই এতে একমত যে, শরাব কখনও শরীরের অংশে পরিণত হয় না, এতে শরীরে রক্তও সৃষ্টি হয় না ; রক্তের মধ্যে একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মাত্র। ফলে সাময়িকভাবে শক্তির সামান্য আধিক্য অনুভূত হয়। কিন্তু হঠাৎ রক্তের এ উত্তেজনা অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যে সব শিরা ও ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে, মদ্যপানের দরুন সেগুলো শক্ত ও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে দ্রুতগতিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসতে থাকে। শরাবের দ্বারা মানুষের গলদেশ এবং শ্বাসনালীরও প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে স্বর মোটা হয়ে যায় এবং স্থায়ী কফ হয়ে থাকে, তারই ফলে শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি হয়। শরাবের প্রতিক্রিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে সন্তানদের উপরও পড়ে। মদ্যপায়ীদের সন্তান দুর্বল হয় এবং অনেকে তাতে বংশহীনও হয়ে পড়ে।

একথাও স্মরণযোগ্য মদ্যপানের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ নিজের মধ্যে চঞ্চলতা ও স্ফূর্তি এবং কিছুটা শক্তি অনুভব করে থাকে। ফলে তারা ডাক্তার-হাকীমদের মতামতকে পাত্তা দিতে চায় না। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, শরাব এমন একটি বিষাক্ত দ্রব্য, যার বিষক্রিয়া পর্যায়ক্রমিকভাবে দৃশ্যমান হতে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলো প্রকাশ পায়।

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এটা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে এবং শত্রুতা ও বিরোধ মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এই অনিষ্টকারিতাই সবচাইতে গুরুতর। সুতরাং কোরআন সূরা মায়েদার এক আয়াতে বলছে ঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ .

অর্থাৎ—"শয়তান শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায়।"

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, মদ্যপান করে যখন মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন সে নিজের গোপন কথাও প্রকাশ করে দেয়, যার পরিণাম অনেক সময় অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়, বিশেষ করে সে ব্যক্তি যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে থাকে, তবে তার দ্বারা বেফাঁসভাবে কোন গোপন তথ্য প্রকাশিত হওয়ার ফলে সারা দেশেই পরিবর্তন ও বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। দেশের রাজনীতি ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের কৌশলগত গোপন তথ্য শত্রুর হাতে চলে যেতে পারে। বিচক্ষণ গুপ্তচরেরা এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে।

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, সে মানুষকে পুতুলে পরিণত করে দেয়, যাকে দেখলে বাচ্চারা পর্যন্ত উপহাস করতে থাকে। কেননা তার কাজ ও চালচলন সবই তখন অস্বাভাবিক হয়ে যায়। শরাবের আরও একটি মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে এই যে, এটি খেয়ানতের মতো।

শরাব মানুষকে সকল মন্দ থেকে মন্দকর কাজে ধাবিত করে। ব্যভিচার ও নর-হত্যার অধিকাংশই এর পরিণাম। আর এজন্য অধিকাংশ শরাবখানাই ব্যভিচার, যিনা ও হত্যাকাণ্ডের আখড়ায় পরিণত হয়। এসব হচ্ছে মানুষের শারীরিক ক্ষতি, আর রূহানী ক্ষতি তো সুপরিজ্ঞাত যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া চলে না। অন্য কোন ইবাদত অথবা আল্লাহ্র কোন যিকির করাও সম্ভব হয় না। সে জন্যই কোরআন-করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة। অর্থাৎ শরাব তোমাদিগকে আল্লাহ্র স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখে।

এখন রইল আর্থিক ক্ষতির দিকটা। যদি কোন এলাকায় একটি শরাবখানা খোলা হয়, তবে তা সমস্ত এলাকার টাকা-পয়সা লুটে নেয়—একথা সর্বজনবিদিত। এ ব্যয়ের পরিমাণ ও পর্যায় বহু রকমের। একজন বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদের সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী শুধু একটি শহরে শরাবের মোট ব্যয় সামগ্রিক জীবনযাত্রার অন্যান্য সকল ব্যয়ের সমান।

এই হলো শরাবের ধর্মীয়, পার্থিব, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা, যা রসূল (সা) একটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন ঃ ام الفواحش وام الخبائث

অর্থাৎ—"শরাব সকল মন্দ ও অশ্লীলতার জননী।" এ প্রসঙ্গে জনৈক জার্মান ডাক্তারের মন্তব্য প্রবাদ বাক্যের মতই প্রসিদ্ধ। তিনি বলেছেন, যদি অর্ধেক শরাবখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, অর্ধেক হাসপাতাল ও অর্ধেক জেলখানা আপনা থেকেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।–(তফসীরে আল-মানার ঃ মুফতী আবদুহু–পৃ. ২২৬, জি ঃ ২)

আল্লামা তানতাবী (র) স্বীয় গ্রন্থ আল-জাওহারে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ ফ্রান্সের জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত হেনরী তাঁর গ্রন্থ 'খাওয়াতির ও সাওয়ানিহ্ ফিল ইসলাম'-এ লিখেছেন, "প্রাচ্যবাসীকে সমূলে উৎখাত করার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এবং মুসলমানকে খতম করার জন্য নির্মিত দু'ধারী তলোয়ার ছিল এই 'শরাব'। আমরা আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত আমাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের ব্যবহৃত অস্ত্রে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়নি ; ফলে তাদের বংশ বেড়েই চলেছে। এরাও যদি আমাদের সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিত, যেভাবে তাদের একটি বিশ্বাসঘাতক গোষ্ঠী তা গ্রহণ করে নিয়েছে, তাহলে তারাও আমাদের কাছে পদানত ও অপদস্থ হয়ে পড়ত। আজ যাদের ঘরে আমাদের সরবরাহকৃত শরাবের প্রবাহ বইছে, তারা আমাদের কাছে এতই নিকৃষ্ট ও পদদলিত হয়ে গেছে যে, তারা মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারছে না।'

জনৈক বৃটিশ আইনজ্ঞ ব্যান্টাম লেখেন, "ইসলামী শরীয়তের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এও একটি বৈশিষ্ট্য যে, এতে মদ্যপান নিষিদ্ধ। আমরা দেখেছি, আফ্রিকার লোকেরা যখন এর ব্যবহার শুরু করে, তখন থেকেই তাদের বংশে 'উন্মাদনা' সংক্রমিত হতে শুরু করেছে। আর ইউরোপের যেসব লোক এই পদার্থটিতে চুমুক দিতে শুরু করেছে, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিরও বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। কাজেই আফ্রিকার লোকদের জন্য যেমন এর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন, তেমনি ইউরোপের লোকদের জন্য এ কারণে কঠিন শাস্তির বিধান করা দরকার।"

সারকথা, যে কোন সৎ লোক যখনই শীতল মস্তিষ্কে এ ব্যাপারে চিন্তা করেছেন, তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে উঠেছেন। "এটি অপবিত্র বস্তু, এ যে শয়তানী কাজ, এ যে হলাহল—ধ্বংসের উপকরণ ! এই 'উম্মুল-খাবায়েস' বা সকল অকল্যাণের মাতার ধারে-কাছেও যেয়ো না ; ফিরে এসো–فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত কোরআনের চারটি আয়াত উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা নাহলের আরো এক জায়গায় নেশাকর দ্রব্যাদির আলোচনা অন্য ভঙ্গিতে করা হয়েছে। সে বিষয়টিও এখানেই আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে বলে মনে হয় ; যাতে শরাব ও অন্যান্য যাবতীয় নেশাকর দ্রব্য সম্পর্কে কোরআনী বর্ণনাগুলো মোটামুটিভাবে সামনে এসে যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে এই ঃ

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۔

অর্থাৎ—আর খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা তোমরা নেশাকর দ্রব্য এবং উত্তম আহার্য প্রস্তুত করে থাক ; নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য বড় প্রমাণ রয়েছে।

তফসীর ও ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার ঐ সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষের খাদ্যরূপে দান করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি মহিমার পরিচয় দিয়েছেন। এতে প্রথমে দুধের কথা বলা হয়েছে। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা জন্তুর পেটের মধ্যে রক্ত ও মলমূত্রের সংমিশ্রণ থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন খাদ্য হিসাবে দান করেছেন। ফলে মানুষকে কোন কিছুই করতে হয় না। এজন্য এখানে نسقيكم শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমি তোমাদিগকে দুধ পান করিয়ে থাকি। অতঃপর বলা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের দ্বারা মানুষ কিছু খাদ্যবস্তু তৈরি করে থাকে যাতে তাদের উপকার হয়। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা নিজেদের জন্য লাভজনক খাদ্য প্রস্তুতে মানুষের শিল্পজ্ঞানের কিছুটা হাত রয়েছে। আর এই দক্ষতার ফলে দু'রকমের খাদ্য তৈরি হয়েছে। একটি হলো নেশাজাত দ্রব্য, যাকে মদ বা শরাব বলা হয় ; দ্বিতীয়টি হলো উৎকৃষ্ট খাদ্য অর্থাৎ খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা অবস্থায় আহার করা অথবা শুকিয়ে ব্যবহার করা। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পূর্ণ কুদরতের মাধ্যমে মানুষকে খেজুর ও আঙ্গুর দান করেছেন এবং তার দ্বারা নিজেদের খাদ্যদ্রব্য তৈরির কিছুটা অধিকারও তিনি মানুষকে প্রদান করেছেন। এখন তাদের অভিপ্রায় ও ইচ্ছা, তারা কি প্রস্তুত করবে ; নেশাজাত দ্রব্য তৈরি করে নিজেদের বুদ্ধিকে বিকল করবে, না উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে শক্তি অর্জন করবে ?

এ তফসীরের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত দ্বারা নেশাজাত দ্রব্যকে হালাল বলার দলীল দেওয়া যাবে না। এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ তা'আলার দানসমূহ এবং তার ব্যবহারের বিভিন্ন দিক ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা, যা যে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্র নিয়ামত। যথা ঃ সমস্ত আহার্য এবং মানুষের জন্য উপকারী বস্তুকে অনেকে না-জায়েয পথে ব্যবহার করে। কিন্তু কারো ভুলের জন্য আল্লাহ্র নিয়ামত তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে পারে না। অতঃপর এখানে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন—কোন্ পথে ব্যবহার হালাল এবং কোন্ পথে ব্যবহার হারাম। তবু আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, নেশার বিপরীত 'উৎকৃষ্ট খাদ্য' বলা হয়েছে যাতে বোঝা যায় যে, নেশা ভাল বিষয় নয়। অধিকাংশ মুফাস্সির নেশাযুক্ত বস্তুকেও 'সুক্র' (سكر) বলেছেন। (রূহুল-মা'আনী, কুরতুবী, জাস্সাস)

গোটা মুসলিম উম্মতের মতে এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মদ্যপান হারাম হওয়ার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত পরবর্তী সময়ে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যদিও শরাব হালাল ছিল এবং মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই তা পান করতেন, কিন্তু তখনও এ আয়াতে এদিকে ইশারা করা হয়েছিল যে, এটি পান করা ভাল নয়। তারপর অত্যন্ত কঠোরতার সাথে শরাবকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।—(জাস্সাস ও কুরতুবী)

জুয়ার অবৈধতা ঃ ميسر একটি ধাতু। এর আভিধানিক অর্থ বণ্টন করা। ياسر বলা হয় বণ্টনকারীকে। জাহিলিয়্যত আমলে নানারকম জুয়ার প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে এক প্রকার জুয়া ছিল এই যে, উট জবাই করে তার অংশ বণ্টন করতে গিয়ে জুয়ার আশ্রয় নেওয়া হতো। কেউ

একাধিক অংশ পেত, আবার কেউ বঞ্চিত হতো। বঞ্চিত ব্যক্তিকে উটের পূর্ণ মূল্য দিতে হতো, আর মাংস দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হতো ; নিজেরা ব্যবহার করতো না।

এ বিশেষ ধরনের জুয়ায় যেহেতু দরিদ্রের উপকার ছিল এবং খেলোয়াড়দের দানশীলতা প্রকাশ পেত, তাই এ খেলাতে গর্ববোধ করা হতো। আর যারা খেলায় অংশগ্রহণ না করত, তাদেরকে কৃপণ ও হতভাগা বলে মনে করা হতো। বন্টনের সাথে সম্পর্কের কারণেই এরূপ জুয়াকে 'মায়সার' বলা হতো। সমস্ত সাহাবী ও তাবেয়ী এ ব্যাপারে একমত যে, সব রকমের জুয়াই 'মায়সার' শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরে এবং জাস্সাস 'আহ্কামুল-কোরআন'-এ লিখেছেন যে, মুফাস্সিরে কোরআন হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, কাতাদাহ্, মুয়াবিয়া ইবনে সালেহ্, আতা ও তাউস (রা) বলেছেন ঃ

الميسر القمار حتى لعب الصبيان بالكعب والجوز .

অর্থাৎ সব রকমের জুয়াই 'মায়সার'। এমনকি কাঠের গুটি এবং আখরোট দ্বারা বাচ্চাদের এ ধরনের খেলাও। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ المخاطرة من القمار। "লটারীও জুয়ারই অন্তর্ভুক্ত।" জাস্সাস ও ইবনে-সিরীন বলেছেন ঃ যে কাজে লটারীর ব্যবস্থা রয়েছে, তাও মায়সারের অন্তর্ভুক্ত।-(রূহুল-বয়ান)

مخاطرة -'মুখাতিরা' বলা হয় এমন লেনদেনকে, যার মাধ্যমে কেউ কেউ প্রচুর সম্পদ পেয়ে যায় এবং অনেকে কিছুই পায় না। আজকাল প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লটারীর সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে।

আজকাল নানা প্রকারের লটারী দেখা যায়। এসবই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত ও হারাম। মোটকথা, মায়সার ও কেমারের সঠিক সংজ্ঞা এই যে, যে ব্যাপারে কোন মালের মালিকানায় এমন সব শর্ত নির্ভর করে, যাতে মালিক হওয়া-না-হওয়া উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে। আর এরই ফলে পূর্ণ লাভ কিংবা লোকসান উভয় দিকই বজায় থাকবে। -(শামী, পৃ. ৩৫৫, ৫ম খণ্ড)

উদাহরণত এতে যায়েদ অথবা ওমরের যে কোন একজনকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। এ সবের যত প্রকার ও শ্রেণী অতীতে ছিল, বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টি হতে পারে, তার সবগুলোকে মায়সার, কেমার এবং জুয়া বলা যেতে পারে। বর্তমান প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের শব্দ-প্রতিযোগিতা এবং ব্যবসায়ী স্বার্থে লটারীর যতগুলো পদ্ধতি রয়েছে, এ সবই কেমার ও মায়সার-এর অন্তর্ভুক্ত।

তবে যদি শুধু একদিক থেকে পুরস্কার নির্ধারণ করা হয়, যেমন যে ব্যক্তি অমুক কাজ করবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে, আর এতে যদি কোন চাঁদা নেওয়া না হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। কেননা এটা লাভ ও লোকসানের মাঝে পরিক্রমশীল নয়, বরং লাভ হওয়া ও লাভ না হওয়ার মধ্যেই সীমিত।

এ জন্য সহীহ্ হাদীসে দাবা ও ছক্কা-পাঞ্জা জাতীয় খেলাকেও হারাম বলা হয়েছে। কেননা, এসবেও অনেক ক্ষেত্রেই টাকা-পয়সার বাজি ধরা হয়ে থাকে। তাস খেলায় যদি টাকা-পয়সার হার-জিত শর্ত থাকে, তবে তাও হারাম।

মুসলিম শরীফে বারীদা (রা)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলে আকরাম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছক্কা-পাঞ্জা খেলে সে যেন শূকরের মাংস ও রক্তে স্বীয় হস্ত রঞ্জিত

করে। হযরত আলী (রা) বলেছেন—ছক্কা-পাঞ্জাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেছেন—দাবা ছক্কা-পাঞ্জা খেলা থেকেও খারাপ।-(ইবনে-কাসীর)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে শরাবের ন্যায় জুয়াও হালাল ছিল। মক্কায় যখন সূরা রোমের غُلِبَتِ الرُّوْمُ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং কোরআন ঘোষণা করে যে, এখন রোম যদিও তাদের প্রতিপক্ষ কিস্‌রার কাছে পরাজিত হয়েছে, তারা কয়েক বছরের মধ্যেই বিজয় লাভ করবে। তখন মক্কার মুশরিকরা তা অবিশ্বাস করে। সে সময় হযরত আবূ বকর (রা) মুশরিকদের সাথে বাজি ধরলেন যে, যদি কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসী জয়লাভ করে, তবে তোমাদেরকে এই পরিমাণ এই মাল পরিশোধ করে দিতে হবে। এ বাজি মুশরিকরা গ্রহণ করল। ঠিক কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসী জয়লাভ করল। শর্তানুযায়ী হযরত আবূ বকর (রা) তাদের নিকট থেকে মাল আদায় করে রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। হুযূর (সা) ঘটনা শুনে খুশি হলেন, কিন্তু মালগুলো সদকা করে দিতে আদেশ দিলেন।

কেননা, যে বস্তু আগত দিনে হারাম হবে, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো হালাল থাকা কালেও স্বীয় রাসূল (সা)-কে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এজন্যই তিনি শরাব ও জুয়া থেকে সর্বদা বেঁচে রয়েছেন এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীও তা থেকে সর্বদা নিরাপদে রয়েছেন। এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূল (সা)-কে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, হযরত জাফর (রা)-এর চারটি অভ্যাস আল্লাহ্‌র নিকট অতি প্রিয়। হুযূর (সা) জাফর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার চারটি অভ্যাস কি কি ? তিনি উত্তর দিলেন—আজ পর্যন্ত আমার এ চারটি অভ্যাস কাউকেই বলিনি। আল্লাহ্ যখন আপনাকে জানিয়েই দিলেন, তখন বলতেই হয়। তা হচ্ছে এই—আমি দেখেছি যে, শরাব মানুষের বুদ্ধি বিলুপ্ত করে দেয়, তাই আমি কোন দিনও শরাব পান করিনি। মূর্তির মধ্যে মানুষের ভাল-মন্দ কোনটাই করার ক্ষমতা নেই বলে জাহিলিয়ত আমলেও আমি কোনদিন মূর্তি পূজা করিনি। আমার স্ত্রী ও মেয়েদের ব্যাপারে আমার মধ্যে সম্ভ্রমবোধ অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে, তাই আমি কোন দিনও যেনা করিনি। আমি দেখেছি যে, মিথ্যা বলা অত্যন্ত মন্দ কাজ, তাই আমি কোনদিনও মিথ্যা কথা বলিনি।-(রূহুল-বয়ান)

জুয়ার সামাজিক ও সামগ্রিক ক্ষতি ঃ জুয়া সম্পর্কে কোরআন মজীদ শরাব বিষয়ে প্রদত্ত আদেশেরই অনুরূপ বিধান প্রদান করেছে যে, এতে কিছুটা উপকারও আছে, কিন্তু উপকার লাভের চাইতে এর ক্ষতি অনেক বেশি : এর লাভ সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। যদি খেলায় জয়লাভ করে, তবে একজন দরিদ্র লোক একদিনেই ধনী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এর আর্থিক, সামাজিক এবং আত্মিক ক্ষতি সম্পর্কে অনেক কম মানুষই অবগত। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া হচ্ছে। জুয়া খেলা একজনের লাভ এবং অপরজনের ক্ষতির উপর পরিক্রমশীল। জয়লাভকারীর কেবল লাভই লাভ ; আর পরাজিত ব্যক্তির ক্ষতিই ক্ষতি। কেননা, এ খেলায় একজনের মাল অন্যজনের হাতে চলে যায়। এজন্য জুয়া সামগ্রিকভাবে জাতির ধ্বংস এবং মানব চরিত্রের অধঃপতন ঘটায়। যে ব্যক্তি এতে লাভবান হয়, সে পরোপকারের ব্রত থেকে দূরে সরে রক্তপিপাসুতে পরিণত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তির মৃত্যুর পথ এগিয়ে আসে, অথচ প্রথম ব্যক্তি আয়েশ বোধ করতে থাকে এবং নিজের পূর্ণ সামর্থ্য এতে ব্যয় করে।

ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য এর বিপরীত। কেননা, এতে উভয় পক্ষের লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা থাকে। ব্যবসা দ্বারা মাল হস্তান্তরে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং উভয় পক্ষই এতে লাভবান হয়ে থাকে।

জুয়ার একটি বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, জুয়াড়ী প্রকৃত উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকে। কেননা, তার একমাত্র চিন্তা থাকে যে, বসে বসে একটি বাজির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যেই অন্যের মাল হস্তগত করবে যাতে কোন পরিশ্রমের প্রয়োজনই নেই। কোন কোন মনীষী সর্বপ্রকার জুয়াকেই 'মায়সার' বলেছেন। কারণস্বরূপ বলেছেন যে, এতে অতি সহজে অন্যের মাল হস্তগত হয়। জুয়া খেলা যদি দু'-চারজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাতেও আলোচ্য ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বর্তমান যুগ, যাকে অনভিজ্ঞ দূরদর্শিতাবিহীন মানুষ উন্নতির যুগ বলে অভিহিত করে থাকে, নতুন নতুন ও রকমারি প্রকার শরাব বের করে নতুন নতুন নাম দিচ্ছে, স্বাদেরও নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে নানা পদ্ধতিতে তার প্রচলন ঘটাচ্ছে। অনুরূপভাবে জুয়ারও নানা প্রকার পন্থা বের করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেক দিক রয়েছে যা সামগ্রিক। এসব নতুন পদ্ধতিতে সম্মিলিতভাবে গোটা জাতির কাছ থেকে কিছু কিছু করে টাকা নেওয়া হয় এবং ক্ষতিটা সকলের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ফলে তা দেখার মত কিছু হয় না। আর যে ব্যক্তি এ অর্থ পায়, তা সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ফলে অনেকেই তার ব্যক্তিগত লাভ লক্ষ্য করে জাতির সমষ্টিগত ক্ষতির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। এ জন্য অনেকেই এ নতুন প্রকারের জুয়া জায়েয বলে মনে করে। অথচ এতেও সেসব ক্ষতিই নিহিত, যা সীমিত জুয়ার মধ্যে বিদ্যমান। একদিক দিয়ে জুয়ার এই নতুন পদ্ধতি প্রাচীন পদ্ধতির জুয়া থেকে অধিক ক্ষতিকর এবং এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী ও সমগ্র জাতির পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এর ফলে জাতির সাধারণ মানুষের সম্পদ দিন দিন কমতে থাকে আর কয়েকজন পুঁজিপতির মাল বাড়তে থাকে। এতে সমগ্র জাতির সম্পদ কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পথ খুলে যায়।

পক্ষান্তরে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিধান হচ্ছে এই যে, যেসব ব্যবস্থায় সমগ্র জাতির সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে জমা হওয়ার পথ খোলে, সে সবগুলো পন্থাই হারাম। এ প্রসঙ্গে কোরআন ঘোষণা করেছে ঃ

كَيْلَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ –অর্থাৎ সম্পদ বণ্টন করার যে নিয়ম কোরআন নির্ধারণ করেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, ধন-দৌলত যেন কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে।

তাছাড়া জুয়ার আরো একটা ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, জুয়াও শরাবের মত পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। পরাজিত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই জয়ী ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং জুয়া সমাজ ও সভ্যতার জন্য অত্যন্ত মারাত্মক বিষয়। কাজেই, কোরআন শরীফ বিশেষভাবে এ ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছে ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ .

অর্থাৎ—শয়তান শরাব ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা ও ঘৃণার সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়।

এমনিভাবে জুয়ার আর একটি অনিবার্য ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, মানুষ শরাবের ন্যায় জুয়ায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্‌র যিকির ও নামায থেকে বেখবর হয়ে পড়ে। আর এজন্যই কোরআন শরাব ও জুয়ার কথা একই স্থানে একই ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, অতি গোপনভাবে জুয়ায়ও একটি নেশা হয়, যা মানুষকে ভাল-মন্দ চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আলোচ্য আয়াতেও এ দু'টি বস্তুকে একত্রে বর্ণনা করে এ ক্ষতির কথাই বলা হয়েছে যে, এটা পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও ঝগড়া-বিবাদের কারণ এবং আল্লাহ্‌র যিকির ও নামাযে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

জুয়ার আর একটি নীতিগত ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এ অবৈধ পথে অন্যের মাল-সম্পদ আত্মসাৎ করার একটি পন্থা। এতে কোন উপযুক্ত বিনিময় ব্যতীত অন্য ভাইয়ের সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়। এসব পন্থাকেও কোরআনে করীম এভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে ঃ

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ—অর্থাৎ—"মানুষের ধন-সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভোগ করো না।" জুয়ার আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, হঠাৎ ক্ষণিকের মধ্যে গোটা একটা পরিবার ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়। লক্ষপতি ফকীর হয়ে যায় এবং গোটা পরিবার বিপদের সম্মুখীন হয়। পরোক্ষভাবে এতে সমগ্র জাতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা, যারা সেই হেরে যাওয়া ব্যক্তির আর্থিক সচ্ছলতা দেখে তার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাকে ঋণ-কর্জ দিত, এখন সে দেউলিয়া হওয়াতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হবে এবং ঋণ আদায় করতে অক্ষম হবে, সুতরাং সকলের উপরই এর প্রতিক্রিয়া হবে।

জুয়ার আরো একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এটা মানুষের কর্মক্ষমতাকে শিথিল করে দেয় এবং মানুষ কাল্পনিক উপার্জনের পথ বেছে নেয়। আর সর্বদা এ চিন্তায় ব্যস্ত থাকে যে, অন্যের উপার্জিত সম্পদে কিভাবে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নেবে।

এ সংক্ষিপ্ত তালিকা অনুযায়ী দেখা যায় যে, জুয়া সমগ্র জাতিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। কোরআন ঘোষণা করেছে ঃ اِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا।—অর্থাৎ শরাব ও জুয়ার ক্ষতি উপকার থেকেও অধিক।

ফিকাহ্‌ শাস্ত্রের কয়েকটি নিয়ম ও কায়দা ঃ এ আয়াতে শরাব ও জুয়ার কিছু আপাত উপকারের কথা স্বীকার করেও তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বোঝা গেল যে, কোন বস্তু কিংবা কোন কাজে দুনিয়ার সাময়িক উপকার বা লাভ থাকলেই শরীয়ত একে হারাম করতে পারে না, এমন কথা নয়। কেননা, যে খাদ্য বা ঔষধে উপকারের চাইতে ক্ষতি বেশি, তাকে কোন অবস্থাতেই প্রকৃত উপকারী বলে স্বীকার করা যায় না। অন্যথায় পৃথিবীর সবচাইতে খারাপ বস্তুতেও কিছু না কিছু উপকার নিহিত থাকা মোটেও বিচিত্র নয়। প্রাণ সংহারক বিষ, সাপ-বিচ্ছু বা হিংস্র জন্তুর মধ্যেও কিছু-না-কিছু উপকারিতার দিক অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এগুলোকে ক্ষতিকর বলা হয় এবং এসব থেকে

দূরে থাকার উপদেশ দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে যেসব বস্তুতে উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশি, শরীয়ত সেগুলোকেও হারাম সাব্যস্ত করেছে। চুরি-ডাকাতি, যিনা-প্রতারণা এমন কি ব্যাপার আছে, যাতে উপকার কিছুই নেই ? কেননা, কিছু-না-কিছু উপকার না থাকলে কোন বুদ্ধিমান মানুষই এর ধারে-কাছেও যেতো না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এসব কাজে তারাই বেশি লিপ্ত, যারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলে বিবেচিত। তাতেই বোঝা যায় যে, প্রতিটি অন্যায় কাজেও কিছু-না-কিছু উপকার অবশ্যই আছে। তবে যেহেতু এ সবের উপকারের চাইতে ক্ষতি মারাত্মক, এজন্য কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক এসবকে উপকারী বা হালাল বলবে না। ইসলামী শরীয়ত শরাব ও জুয়াকে এই ভিত্তিতেই হারাম বলে ঘোষণা করেছে। কেননা, এগুলোর মধ্যে উপকারের চাইতে দীন-দুনিয়ার ক্ষতিই বেশি।

ফিকাহ্‌র আর একটি আইন ঃ এ আয়াতের দ্বারা এও বোঝা গেল যে, উপকার হাসিল করার চাইতে ক্ষতি রোধ করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া বিধেয়। অর্থাৎ কোন একটি কাজে কিছু উপকারও হয় আবার ক্ষতিও হয়, এক্ষেত্রে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লাভ ত্যাগ করতে হবে। এমন উপকার সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য, যা ক্ষতি বহন করে।

وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾ وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

(২১৯) আর আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে—কি তারা ব্যয় করবে ? বলে দিন, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে তাই খরচ করবে। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার, (২২০) দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে। আর আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে এতীম সংক্রান্ত হুকুম। বলে দিন, তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেওয়া উত্তম. আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। বস্তুত অমঙ্গলকামী ও মঙ্গলকামীদেরকে আল্লাহ্ জানেন। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের উপর জটিলতা আরোপ করতে পারতেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, মহাপ্রাজ্ঞ। (২২১) আর তোমাদের মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম ; যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে এবং তোমরা (নারীরা) কোন মুশরিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরিকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা দোযখের দিকে আহবান করে ; আর আল্লাহ্ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহবান করেন জান্নাত ও ক্ষমার প্রতি। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ষোড়শ নির্দেশ ঃ দানের পরিমাণ ঃ এবং মানুষ আপনার কাছে দান সম্পর্কে জানতে চায় যে, কি পরিমাণ ব্যয় করবে। আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন–যা সহজ হয়, (যা খরচ করলে পেরেশান হয়ে দুনিয়াতে কষ্টে পড়তে হবে বা অন্যের অধিকার নষ্ট করে পরকালের ক্ষতিতে পতিত হতে হবে, এ পরিমাণ নয়)। আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে নির্দেশসমূহকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা (এ সম্পর্কে অবগত হতে পার এবং এ জ্ঞানের দ্বারা প্রতিটি আমল করার পূর্বে) দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে (সে সব আদেশ সম্পর্কে) চিন্তা কর। (এবং চিন্তা করে প্রতিটি ব্যাপারে সে আদেশমত আমল করতে পার)।

সপ্তদশ নির্দেশ ঃ এতীমের মালের সংমিশ্রণ ঃ (যেহেতু প্রাথমিক যুগে সাধারণত এতীমের হক সম্পর্কে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা হতো না, তাই এখানে ভীতি-প্রদর্শন করা হয়েছে যে, এতীমের মাল আত্মসাৎ করা দোযখের অগ্নিশিখা নিজের পেটে ভর্তি করারই নামান্তর। এ বাণী যাঁরা শুনলেন, তাঁরা ভয়ে এমনই সতর্কতা অবলম্বন করতে শুরু করলেন যে, পরিবারস্থ এতীমদের খাদ্যও আলাদা পাক করতেন এবং আলাদাভাবে রাখতেন। আর যদি সেই এতীম শিশু আহার কম করতো এবং আহার্য অবশিষ্ট থাকতো তবে সে খাবার নষ্ট হয়ে যেত। কেননা, সে খাদ্য তাঁরা নিজেরা ব্যবহার করাও জায়েয মনে করতেন না। এতীমের মাল সদকা করারও অনুমতি ছিল না। এভাবে তাদেরও কষ্ট হতো, এতীমেরও ক্ষতি হতো। তাই শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টি হুযূর (সা)-এর দরবারে পেশ করা হলো। এ সম্পর্কেই আয়াতে এর ফয়সালা দেওয়া হয়েছে যে)–এবং মানুষ আপনার নিকট এতীম শিশুদের (ব্যয় আলাদা বা একত্রে রাখার)

ব্যাপারে জানতে চাইবে। আপনি বলে দিন যে, (তাদের মাল খাওয়া নিষেধ করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তাদের সম্পদ যেন নষ্ট করা না হয়। আর যদি ব্যয় যৌথ রাখলে তাদের মঙ্গল হয়, তবে তাদের মঙ্গলের খেয়াল করা (খরচ ভিন্ন রাখলে যদি তাদের অমঙ্গল হয়) অতি উত্তম এবং তোমরা যদি তাদের সাথে খরচ যৌথ রাখ, তবুও ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা, সে (ক্ষেত্রে) তোমাদের (ধর্মীয়) ভাই। আর ভাই ভাই তো একত্রেই থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলা স্বার্থ নষ্টকারীকে এবং সুবিধা রক্ষাকারীকে (ভিন্ন ভিন্ন) জানেন। (কাজেই আহার্যে একত্রিকরণ এমন হওয়া উচিত নয়, যাতে এতীমের ক্ষতি হয়। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কমবেশি হলে যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিয়ত সম্পর্কে অবগত, তাই এতে শাস্তি হবে না) আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে (এ সম্পর্কে কঠোর আইন জারি করে) তোমাদেরকে বিপদে ফেলতেন। (কেননা) আল্লাহ অত্যন্ত পরাক্রমশালী (কিন্তু সহজ আইন এজন্য জারি করেছেন যে, তিনি) হেকমতওয়ালাও বটে। (এমন আদেশ তিনি দেন না, যা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়)।

অষ্টাদশ আদেশ ঃ কাফিরদের সাথে বিয়ে ঃ এবং মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত কাফির নারীকে বিবাহ করো না এবং মুসলমান নারী (চাই) বাঁদীই (হোক না কেন, সে) কাফির নারী অপেক্ষা (শতগুণে) উত্তম (চাই সে স্বাধীনই হোক না কেন) ; যদি সে কাফির (মেয়ে মাল-দৌলত বা সৌন্দর্যের দিক দিয়ে তোমার নিকট ভাল মনে হয়, তবুও বাস্তবে মুসলমান নারী তার চাইতে উত্তম এবং এমনিভাবে নিজের অধীনস্থ মুসলমান) নারীকে কাফির পুরুষের নিকট বিয়ে দেবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান না হয় এবং মুসলমান পুরুষ (সে) যদি ক্রীতদাস (ও হয়, তবু শতগুণে) উত্তম কাফির পুরুষ হতে (সে চাই স্বাধীনই হোক না কেন,) যদি সে কাফির ব্যক্তি (মাল-দৌলত ও মান-সম্মানে) তোমাদের নিকট ভাল মনে হয়। (কিন্তু তবুও) বাস্তবে মুসলমানই তার চাইতে ভাল। কারণ, সে কাফির নিকৃষ্ট হওয়ার কারণেই এর সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ হয়েছে। এ সব (কাফির) মানুষ দোযখে (যাওয়ার) ইন্ধন যোগায়। (কেননা, তারা কুফরীর আন্দোলন করে ; আর এর পরিণাম দোযখ।) আর আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশত এবং ক্ষমার (অর্জনের) পথ দেখান। নিজের আদেশে (এবং সে আদেশের বিস্তার এভাবে হয়েছে যে, কাফিরদের সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন, তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না। তা হলেই তাদের আন্দোলনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকা যাবে এবং তাদের সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থেকে বেহেশত এবং মাগফেরাত লাভ করা যাবে) এবং আল্লাহ্ তা'আলা এ জন্য স্বীয় হুকুম বলে দেন, যাতে তারা তাঁর উপদেশমত আমল করে (এবং বেহেশত ও মাগফেরাতের অধিকারী হয়)।

বয়ানুল কোরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ মাস'আলা ঃ যে জাতিকে তাদের প্রথাপদ্ধতিতে আসমানী কিতাবের অনুসারী মনে হয়, কিন্তু বিশ্বাস ও আকীদার দিক দিয়ে খুঁজে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, তারা আহলে-কিতাব নয়, সে জাতির স্ত্রীলোক বিয়ে করা জায়েয নয়। যেমন, আজকাল ইংরেজদেরকে সাধারণ মানুষ খৃষ্টান বা নাসারা মনে করে ; অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের কোন কোন আকীদা সম্পূর্ণ মুশরিকদের অনুরূপ। তাদের অনেকেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বও স্বীকার করে না, ঈসা (আ)-এর নবুয়ত কিংবা আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জীলকেও আসমানী

গ্রন্থ বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এমন ব্যক্তিগণ আহলে-কিতাব ঈসায়ী নয়। এ সব দলে যে সমস্ত স্ত্রীলোক রয়েছে, তাদের বিয়ে করা বৈধ নয়। মানুষ অত্যন্ত ভুল করে যে, খোঁজ-খবর না নিয়েই পাশ্চাত্যের মেয়েদেরকে বিয়ে করে বসে।

মাস'আলা ঃ এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে প্রকাশ্যভাবে মুসলমান মনে করা হয়, কিন্তু তার আকীদা কুফর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, তার সাথে মুসলমান নারীর বিয়ে জায়েয নয়। আর যদি বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার আকীদা এমনি বিকৃত হয়ে পড়ে তবে তাদের বিয়ে ছিন্ন হয়ে যাবে। আজকাল অনেকেই নিজের ধর্ম সম্পর্কে অন্ধ ও অজ্ঞ এবং সামান্য কিছুটা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেই স্বীয় ধর্মীয় আকীদা নষ্ট করে বসে। কাজেই প্রথমে ছেলের আকীদা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর বিয়ে সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা দেওয়া মেয়েদের অভিভাবকদের উপর ওয়াজিব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমান ও কাফিরের পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ ঃ আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুসলমান পুরুষের বিয়ে কাফির নারীর সাথে এবং কাফির পুরুষদের বিয়ে মুসলমান নারীর সাথে হতে পারে না। কারণ, কাফির স্ত্রী পুরুষ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কেননা বৈবাহিক সম্পর্ক পরস্পরের ভালবাসা, নির্ভরশীলতা এবং একাত্মতায় পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তা ব্যতীত এ সম্পর্কের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। আর মুশরিকদের সাথে এ জাতীয় সম্পর্কের ফলে ভালবাসা ও নির্ভরশীলতার অপরিহার্য পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, তাদের অন্তরে কুফর ও শিরকের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় অথবা কমপক্ষে কুফর ও শিরকের প্রতি ঘৃণা তাদের অন্তর থেকে উঠে যায়। এর পরিণামে শেষ পর্যন্ত সেও কুফর ও শিরকে জড়িয়ে পড়ে, যার পরিণতি জাহান্নাম। এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক জাহান্নামের দিকে আহবান করে। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত ও মাগফেরাতের দিকে আহবান করেন এবং পরিষ্কারভাবে নিজের আদেশ বর্ণনা করেন, যাতে মানুষ উপদেশ মত চলে। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে চিন্তা প্রয়োজন ঃ

প্রথমত, 'মুশরিক' শব্দ দ্বারা সাধারণ অমুসলমানকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত কিতাবে বিশ্বাসী নারীরা এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ .

তাই এখানে মুশরিক বলতে ঐসব বিশেষ অমুসলমানকেই বোঝানো হয়েছে, যারা কোন নবী কিংবা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয়ত, মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, তাদের সাথে এরূপ সম্পর্কের ফলে কুফর ও শিরকের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে। কারণটি তো আপাতদৃষ্টিতে সমস্ত মুসলমানের বেলায়ই খাটে, এতদসত্ত্বেও কিতাবীদেরকে এ আদেশের আওতামুক্ত রাখার কারণ কি ? উত্তর

অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কিতাবীদের সাথে মুসলমানদের মতপার্থক্য অন্যান্য অমুসলমানের তুলনায় ভিন্ন ধরনের। কেননা, ইসলামের আকীদার তিনটি দিক রয়েছে ঃ তওহীদ, পরকাল ও রিসালাত। তন্মধ্যে পরকালের আকীদার বেলায় কিতাবী নাসারা ও ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে একমত। তাছাড়া আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করাও তাদের প্রকৃত ধর্মমতে কুফর। অবশ্য তারা হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি মহব্বত ও মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে যে শিরক পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা ভিন্ন কথা।

এখন মৌলিক মতপার্থক্য শুধু এই যে, তারা হুযূর (সা)-কে রাসূল বলে স্বীকার করে না। অথচ ইসলাম ধর্মে এটি একটি মৌলিক আকীদা। এ আকীদা ব্যতীত কোন মানুষ মুসলমান হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও অন্যান্য অমুসলমানের তুলনায় কিতাবীদের মতপার্থক্য মুসলমানদের সাথে অনেকটা কম। কাজেই তাদের সংস্পর্শে পথভ্রষ্টতার ভয়ও তুলনামূলকভাবে কম।

তৃতীয়ত, কিতাবীদের সাথে মতপার্থক্য তুলনামূলকভাবে কম বলে তাদের মেয়েদের সাথে মুসলমান পুরুষের বিয়েকে জায়েয করা হলে তার বিপরীত দিকে মুসলিম নারীদের সাথে কিতাবী অমুসলমানদের বিয়ের ব্যাপারটিও জায়েয হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একটু চিন্তা করলে পার্থক্যটা বোঝা যাবে। মেয়েরা প্রকৃতিগতভাবে কিছুটা দুর্বল। তাছাড়া স্বামীকে তার হাকেম বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে। তার আকীদা ও পরিকল্পনা দ্বারা মেয়েদের আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কাজেই মুসলমান নারী যদি অমুসলমান কিতাবীদের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে এতে তার বিশ্বাস ও আকীদা নষ্ট হয়ে যাওয়া খুবই সহজ। অপরদিকে অমুসলমান কিতাবী মেয়ের মুসলমান পুরুষের সাথে বিয়ে হলে তার প্রভাবে স্বামী প্রভাবিত না হয়ে বরং স্বামীর প্রভাবে স্ত্রীর প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে কোন অনিময় বা আতিশয্যে যদি লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তা তার নিজস্ব ত্রুটি।

চতুর্থত, বৈবাহিক সম্পর্ক যে প্রভাব বিস্তার করে তা উভয় পক্ষে একই রকম হয়ে থাকে। সুতরাং এতে যদি এরূপও আশা পোষণ করা হয় যে, মুসলমানদের আকীদায় অমুসলমানদের আকীদা প্রভাবিত হয়ে সেই মুসলমান হয়ে যাবে, তবে এর চাহিদা হচ্ছে এই যে, মুসলমান এবং অন্যান্য অমুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক জায়েয হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু এ স্থলে বিশেষ বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, যখন কোন কিছুতে লাভের একটি দিকের পাশাপাশি ক্ষতির কারণ থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সুস্থ বুদ্ধির চাহিদা অনুযায়ী ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা এবং সফলতা লাভের কাল্পনিক সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলাই উত্তম। হয়তো সে অমুসলমান প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, তবে সতর্কতার বিষয় হলো, মুসলমান প্রভাবিত হয়ে যেন কাফির না হয়ে যায়।

পঞ্চমত, কিতাবী ইহুদী ও নাসারা নারীদের সাথে মুসলমান পুরুষদের বিবাহের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি তাদেরকে বিবাহ করা হয়, তবে বিবাহ ঠিক হবে এবং স্বামীর পরিচয়েই সন্তানদের বংশ সাব্যস্ত করবে। কিন্তু হাদীসে রয়েছে, এ বিবাহও পছন্দনীয় নয়। হুযুর (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ মুসলমান বিবাহের জন্য দীনদার ও সৎ স্ত্রীর অনুসন্ধান করবে, যাতে করে সে তার ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্যকারিণীর ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে করে তাদের

সন্তানদেরও দীনদার হওয়ার সুযোগ মিলবে। যখন কোন অধার্মিক মুসলমান মেয়ের সাথে বিবাহ পছন্দ করা হয়নি, সেক্ষেত্রে অমুসলমান মেয়েদের সাথে কিভাবে বিবাহ পছন্দ করা হবে? এ কারণেই হযরত উমর ফারূক (রা) যখন সংবাদ পেলেন যে, ইরাক ও শাম দেশের মুসলমানদের এমন কিছু স্ত্রী রয়েছে এবং দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তখন তিনি আদেশ জারি করলেন যে, তা হতে পারে না। তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হলো যে, এটা বৈবাহিক জীবন তথা ধর্মীয় জীবনের জন্য যেমন অকল্যাণকর, তেমনি রাজনৈতিক দিক দিয়েও ক্ষতির কারণ।-(কিতাবুল-আসার, ইমাম মুহাম্মদ)

বর্তমান যুগের অমুসলমান কিতাবী ইহুদী ও নাসারা এবং তাদের রাজনৈতিক ধোঁকা-প্রতারণা, বিশেষত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবাহ এবং মুসলমান সংসারে প্রবেশ করে তাদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করা এবং মুসলমানদের গোপন তথ্য জানার প্রচেষ্টা আজ স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে। তাদের রচিত অনেক গ্রন্থেও যার স্বীকারোক্তির উল্লেখ রয়েছে। মেজর জেনারেল আকবারের লেখা 'হাদীসে-দেফা' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা উদ্ধৃতিসহ করা হয়েছে। মনে হয় হযরত উমর ফারূকের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিশক্তি বৈবাহিক ব্যাপার সংক্রান্ত এ বিষয়টির সর্বনাশা দিক উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। বিশেষত বর্তমানে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে যারা ইহুদী ও নাসারা নামে পরিচিত এবং আদমশুমারীর খাতায় যাদেরকে ধর্মীয় দিক দিয়ে ইহুদী কিংবা নাসারা বলে লেখা হয়, যদি তাদের প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, খৃস্টান ও ইহুদীমতের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা সম্পূর্ণতই ধর্ম বিবর্জিত। তারা ঈসা (আ)-কেও মানে না, তওরাতকেও মানে না, এমনকি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বও মানে না, পরকালকেও মানে না। বলা বাহুল্য, বিবাহ হালাল হওয়ার কোরআনী আদেশ এমন সব ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে না। তাদের মেয়েদের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে হারাম। বিশেষত وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ -আয়াতে যাদের বোঝানো হয়েছে আজকালকার ইহুদী-নাসারারা তার আওতায় পড়ে না। সে হিসাবে সাধারণ অমুসলমানদের মত তাদের মেয়েদের সাথেও বিবাহ করা হারাম।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۖ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿۲۲۲﴾ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۪ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۫ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۲۳﴾

(২২২) আর আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। বলে দিন, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন। (২২৩) তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্র সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাত করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হায়েয বা ঋতুকালে স্ত্রী-সহবাসের অবৈধতা এবং পবিত্রতার শর্তসমূহ :

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ.... وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ এবং মানুষ আপনার নিকট হায়েয (অবস্থায় স্ত্রী-সহবাসের বিষয়) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন যে, তা (হায়েয) অপবিত্রতার বস্তু। সুতরাং হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে (সহবাস থেকে) বিরত থাক এবং (এ অবস্থায়) তাদের সাথে সহবাস করো না, যতক্ষণ না তারা (হায়েয থেকে) পবিত্র হয়ে যায়। পরে যখন সে (স্ত্রী) ভালভাবে পবিত্র হয়ে যায় (অপবিত্রতার সন্দেহ না থাকে) তখন তার কাছে এস। (তার সাথে সহবাস কর) যে স্থান দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অনুমতি দান করেছেন (অর্থাৎ সামনে দিয়ে।) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তওবাকারীদেরকে (অর্থাৎ ঘটনাচক্রে অথবা অসতর্ক মুহূর্তে হায়েয অবস্থায় সহবাস করে ফেললে পরে অনুতপ্ত হয়ে যারা তওবা করে) এবং যারা পাক-পবিত্র ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসেন। (হায়েয অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করা এবং অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং পবিত্রাবস্থায় সঙ্গমের অনুমতি দান, আবার সামনের রাস্তায় এ জন্য যে) তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য জমিনতুল্য। (যাতে শুক্র বীজস্বরূপ এবং সন্তান তার ফসলতুল্য) সুতরাং স্বীয় জমি যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার কর। (যেভাবে জমি ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে তেমনিভাবে স্ত্রীগণকে পবিত্রাবস্থায় সর্বভাবে ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে) এবং আগত দিনের জন্য কিছু (নেক আমল সঞ্চয়) করতে থাক এবং আল্লাহ্কে (সর্বাবস্থায়) ভয় করতে থাক। আর এ বিশ্বাস রেখো যে, তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্র দরবারে নীত হবে এবং [হে মুহাম্মদ (সা) ! এ জন্য] ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে (যারা নেক কাজ করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহ্র নিকট উপনীত হওয়ার কথা বিশ্বাস করে) সুসংবাদ দিয়ে দিন (যে, পরকালে তারা বিভিন্ন রকমের নেয়ামত পাবে)।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾

---

(২২৪) আর নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহ্‌র নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিও না মানুষের সাথে কোন আচার-আচরণ থেকে, পরহেযগারী থেকে এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ সবকিছুই শুনেন, জানেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আল্লাহ্‌র নামকে (নিজেদের কসমের দ্বারা) সেসব কাজের যবনিকায় পরিণত করো না যে, তোমরা নেকী ও পরহেযগারী এবং মানুষের মধ্যে সংশোধনের কাজ করবে না। (আল্লাহ্‌র নামে শপথ এমন করবে না যে, আমি নেক কাজ করবো না) এবং আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু শুনেন ও জানেন। (সুতরাং কথা বলতে সাবধানে বল এবং অন্তরে মন্দ চিন্তার স্থান দিও না)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ
قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾

---

(২২৫) তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধরবেন না, কিন্তু সেসব কসমের ব্যাপারে ধরবেন, তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করেছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, ধৈর্যশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শপথের জন্য প্রশ্ন করবেন না, তবে সে সব মিথ্যা শপথের জন্য যাতে তোমাদের অন্তর মিথ্যা বলার ইচ্ছা করছে (এসব বেহুদা শপথের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন)। এবং তিনি ধৈর্যশীল ক্ষমাকারী (যে, ইচ্ছাকৃত মিথ্যা শপথকারীকে পরকাল পর্যন্ত অবকাশ দান করেন)।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ
اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾

---

(২২৬) যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবে না বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর যদি মিলমিশ করে নেয়, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাকারী দয়ালু। (২২৭) আর যদি বর্জন করার সংকল্প করে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ঈলার হুকুম ঃ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ থেকে سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ পর্যন্ত। অর্থাৎ যারা (কোন সময়সীমা নির্ধারণ ছাড়া অথবা চার মাস কিংবা তারও বেশি সময়ের জন্য) নিজেদের স্ত্রীগমন ব্যাপারে শপথ করে বসে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। সুতরাং যদি (চার মাসের মধ্যে) এরা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করে স্ত্রীগণের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে তো বিয়ে যথারীতি বজায় থাকবে এবং) আল্লাহ্ তা'আলা (এমন ধরনের কসম ভঙ্গ করার পাপ কাফ্ফারার মাধ্যমে) ক্ষমা করে দেবেন (এবং যেহেতু এ সময় স্ত্রীর হকসমূহ আদায়ে ব্যস্ত হবে, সেহেতু তার প্রতি) রহমতও করবেন। আর যদি স্ত্রীকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করারই দৃঢ় সংকল্প করে নিয়ে থাকে (এবং সে জন্যই চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙে স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নেয়,) তখন (চার মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার তালাক হয়ে যাবে। আর) আল্লাহ্ তা'আলা (তাদের কসমও) শুনেন (আর তাদের দৃঢ় সংকল্পও) জানেন (আর সেজন্যই এ ব্যাপারে যথার্থ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে)।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۲۸﴾

(২২৮) আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহ্র প্রতি এবং আখিরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েয নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত এবং প্রত্যাহারের সময়সীমার বর্ণনা ঃ وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ...... اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা (যাদের মধ্যে এ গুণগুলো

থাকবে যে, তাদের সাথে তাদের স্বামী সহাবস্থান কিংবা সহবাস করে থাকবে, তাদের ঋতুস্রাব হয়ে থাকবে, তারা স্বাধীন হবে অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তের নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী তারা ক্রীতদাসী হবে না)। নিজেকে (বৈবাহিক বন্ধন থেকে) বিরত রাখবে তিন ঋতু (শেষ হওয়া) পর্যন্ত (একেই বলা হয় ইদ্দত)। আর এসব স্ত্রীর পক্ষে একথা বৈধ নয় যে, আল্লাহ্ যা কিছু তাদের জরায়ুতে সৃষ্টি করে থাকবেন (তা গর্ভই হোক অথবা ঋতুস্রাব) সেগুলোকে গোপন করবে–(কারণ, এসব বিষয় গোপন করতে গেলে ইদ্দতের হিসাব ভুল হয়ে যাবে)। যদি সেসব স্ত্রী আল্লাহ্ এবং আখিরাতের বিচার দিনের প্রতি বিশ্বাসী হয়। (এ কারণে যে, এ বিশ্বাসের তাগাদা হচ্ছে, আল্লাহ্র প্রতি ভীত থাকা যে, নাফরমানীর ফলে না জানি আবার শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়)। আর যে স্ত্রীদের স্বামীগণ (তাদের সে তালাক যদি 'রাজঈ' হয়ে থাকে—যার আলোচনা পরে করা হবে—পুনর্বিবাহ ছাড়াই) তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার সংরক্ষণ করে (অবশ্য তা সে ইদ্দতের মধ্যেই হতে হবে। আর এ ফিরিয়ে নেওয়া বা প্রত্যাহারকেই 'রাজ'আত বলা হয়) তার শর্ত হচ্ছে যে, (স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে গিয়ে) সংশোধনের উদ্দেশ্য রাখবে। (আর জ্বালাতন করা বা কষ্ট দেওয়ার জন্য রাজ'আত করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। অবশ্য তাতে রাজ'আত বা প্রত্যাহার কার্যত হয়ে যাবে) আর (সংশোধনের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার কারণ হচ্ছে যে,) স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে (পুরুষদের উপর) যেমন (ওয়াজিব হিসাবে) তাদেরই অধিকারের অনুরূপ, সেই স্ত্রীদের উপর পুরুষদের রয়েছে (যা শরীয়তের রীতি অনুযায়ী পালন করতে হবে)। আর (এটুকু কথা অবশ্যই আছে যে,) তাদের তুলনায় পুরুষদের মর্যাদা সামান্য বেশি (তার কারণ, তাদের অধিকারের প্রকৃতি স্ত্রীদের অধিকারের প্রকৃতির তুলনায় কিছুটা অগ্রবর্তী)। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী (শাসক), মহাজ্ঞানী।

আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মাস'আলা ঃ (১) চরম যৌন উত্তেজনাবশত ঋতুকালীন অবস্থায় সহবাস অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে খুব ভাল করে তওবা করে নেওয়া ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে সাথে কিছু দান-খয়রাত করে দিলে তা উত্তম।

(২)পশ্চাৎ পথে (অর্থাৎ—যোনিপথ ছাড়া গুহ্যদ্বার দিয়ে) নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হারাম।

(৩) 'লাগভ্-কসম'-এর দু'টি অর্থ—একটি হচ্ছে এই যে, কোন অতীত বিষয়ে মিথ্যা শপথ অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা বিষয়টিকে নিজের ধারণামত সঠিক বলেই মনে করে না। উদাহরণত– নিজের জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী কসম করে বসল যে, 'যায়েদ এসেছে'। কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি। অথবা কোন ভবিষ্যত বিষয়ে এভাবে কসম করে বসলো যে, উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু, অথচ অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'কসম' বেরিয়ে গেছে এরকম—এতে কোন পাপ হবে না। আর সে জন্যই একে 'লাগভ্' বা 'অহেতুক' বলা হয়েছে। আখিরাতে এজন্য কোন জবাবদিহি করতে হবে না। যেসব কসমের জন্য জবাবদিহির কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সেই সব কসম যা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা জেনেই করা হয়। একে বলা হয় 'গমূস'। এতে পাপ হয়। তবে ইমাম আজম আবূ হানীফা (র)-এর মতের প্রেক্ষিতে কোন কাফ্ফারা দিতে হয় না। আর উল্লিখিত অর্থে 'লাগভ্' কসমের জন্যেও কোন কাফ্ফারা নেই। এ আয়াতে এ দু'রকমের কসম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

'লাগভ্'-এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যাতে কাফ্ফারা দিতে হয় না। আর একে 'লাগভ্' (অহেতুক) এজন্য বলা হয় যে, এতে পার্থিব কোন কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। এ অর্থে 'গমূস' কসমও এরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাতে পাপ হলেও কোন রকম কাফ্ফারা দিতে হয় না। এতদুভয়ের তুলনায় যে কসমের প্রেক্ষিতে কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তাকে বলা হয় 'মুনআকেদাহ'। এর তাৎপর্য হলো যে, কেউ যদি–'আমি অমুক কাজটি করব' কিংবা 'অমুক বিষয়টি সম্পাদন করব' বলে কসম খেয়ে তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে তাতে তাকে কাফ্ফারা দিতেই হবে।

(৪) যদি কসম খেয়ে বলে যে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করব না, তবে তার চারটি দিক রয়েছে।

প্রথমত, কোন সময় নির্ধারণ করলো না।

দ্বিতীয়ত, চার মাস সময়ের শর্ত রাখলো।

তৃতীয়ত, চার মাসের বেশি সময়ের শর্ত আরোপ করলো। অথবা

চতুর্থত, চার মাসের কম সময়ের শর্ত রাখল। বস্তুত ১ম, ২য় ও ৩য় দিকগুলোকে শরীয়তে 'ঈলা' বলা হয়। আর তার বিধান হচ্ছে, যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙে স্ত্রীর কাছে চলে আসে, তাহলে তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে, কিন্তু বিয়ে যথাস্থানে বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও কসম না ভাঙে, তাহলে সে স্ত্রীর উপর 'তালাকে-কাত্য়ী' বা নিশ্চিত তালাক পতিত হবে অর্থাৎ পুনর্বার বিয়ে ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া জায়েয থাকবে না। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ঐকমত্যে পুনরায় বিয়ে করে নিলেই জায়েয হয়ে যাবে। আর চতুর্থ অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে এই যে, যদি কসম ভঙ্গ করে, তাহলে কাফ্ফারা দেওয়া ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে কসম পূর্ণ করলেও বিয়ে যথাযথভাবে অটুট থাকবে।–(বয়ানুল-কোরআন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

স্ত্রী ও পুরুষের পার্থক্য এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও মর্যাদা ঃ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ।–আয়াতটি নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং সেগুলোর স্তর নির্ণয় সম্পর্কে একটি শরীয়তী মূলনীতি হিসাবে গণ্য। এ আয়াতে পূর্বাপর কয়েকটি রুকূতে এ মূলনীতিরই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা ঃ ইসলাম নারী জাতিকে যে মর্যাদা প্রদান করেছে এখানে প্রথমেই তার যৎসামান্য বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। যা অনুধাবন করে নেওয়ার পর নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি ন্যায়ানুগ ও মধ্যপন্থী জীবন-ব্যবস্থার চাহিদাও ছিল তা-ই এবং এটাই হচ্ছে সে স্থান বা মর্যাদা, যার কম-বেশি করা কিংবা যাকে অস্বীকার করা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টির জন্যই বিরাট আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দু'টি বস্তু রয়েছে যা গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব, সংগঠন এবং উন্নয়নের স্তম্ভস্বরূপ। তার একটি হচ্ছে নারী, অপরটি সম্পদ। কিন্তু চিত্রের অপর দিকটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ দু'টো বস্তুই পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত এবং নানারকম অনিষ্ট ও অকল্যাণেরও কারণ। আরও একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ সিদ্ধান্তে

উপনীত হওয়াও কঠিন নয় যে, এ দু'টো বস্তুই আপন প্রকৃতিতে পৃথিবীর গঠন, নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং তার উৎকর্ষের অবলম্বন। কিন্তু যখন এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, স্থান ও উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন এগুলোই দুনিয়ার সবচাইতে ভয়াবহ ধ্বংসকারিতার রূপ পরিগ্রহ করে।

কোরআন মানুষকে একটা জীবন বিধান দিয়েছে। তাতে উল্লিখিত দু'টো বস্তুকেই নিজ নিজ যথার্থ স্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাদের দ্বারা সর্বাধিক উপকারিতা ও ফল লাভ হতে পারে এবং যাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিহ্নটিও না থাকে। সম্পদের যথার্থ স্থান, তা অর্জনের পন্থা, ব্যয় করার নিয়ম-পদ্ধতি এবং সম্পদ বণ্টনের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা এসব একটা পৃথক বিষয় যাকে ইসলামের সমাজব্যবস্থা বলা যেতে পারে। এ বিষয়ে ইন্‌শাআল্লাহ্ যথাস্থানে আলোচনা হবে। তবে এ বিষয়ে আমার প্রণীত 'তাক্‌সীমে দৌলত' বইটিও প্রয়োজনীয় ইশারা-ইঙ্গিতের জন্য কাজে লাগতে পারে।

এখন নারী সমাজ এবং তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এ সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে—নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরী, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশি।

প্রায় একই রকম বক্তব্য সূরা নিসার এক আয়াতে এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ঃ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ .

অর্থাৎ—যেহেতু আল্লাহ্ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কাজেই পুরুষেরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। আর এজন্য যে, তারা তাদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে থাকে।

ইসলাম-পূর্ব সমাজে নারীর স্থান ঃ ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়ত আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালি আসবাবপত্রের চেয়ে বেশি ছিল না। তখন চতুষ্পদ জীব-জন্তুর মত তাদেরও বিক্রয় করা চলত। নিজের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোন রকম মূল্য ছিল না; অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হতো। নারী তার আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ বা মীরাসের অধিকারিণী হতো না, বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হতো। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধীন; কোন জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোন স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হতো, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখল করার কোনই অধিকার ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীরূপী নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে খুশি, যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারবে। তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিল না। এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়, সেগুলোতেও কোন কোন লোক এমনও ছিল, যারা নারীর মানব-সত্তাকেই স্বীকার করতো না।

ধর্ম-কর্মেও নারীদের জন্য কোন অংশ ছিল না, তাদেরকে ইবাদত-উপাসনা কিংবা বেহেশতের যোগ্যও মনে করা হতো না। এমনকি রোমের কোন কোন সংসদে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, এরা হলো অপবিত্র এক জানোয়ার, যাতে আত্মার অস্তিত্ব নাই। সাধারণভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর দিয়ে দেওয়াকে বৈধ জ্ঞান করা হতো। বরং এ কাজটিকে একজন পিতার পক্ষে একান্ত সম্মানজনক এবং কৌলীণ্যের নিরিখ বলে মনে করা হতো। অনেকের ধারণা ছিল, নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুক, তাতে হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড কিংবা খুনের বদলা কোনটাই আরোপ করা ওয়াজিব হবে না। কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও তার চিতায় আরোহণ করে জ্বলে মরতে হতো। মহানবী (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছিল যে, বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা এ প্রস্তাব পাস করে যে, নারী প্রাণী হিসাবে মানুষই বটে, কিন্তু শুধু পুরুষের সেবার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোটকথা, সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে ব্যবহার করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ অংশ ছিল অত্যন্ত অসহায়। তাদের ব্যাপারে বুদ্ধি ও যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হতো না।

'হযরত রাহ্মাতুল্লিল আলামীন' ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্ববাসীর চক্ষু খুলে দিয়েছে—মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছে। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছে এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরয করেছে। বিবাহ-শাদী ও ধন-সম্পদে তাদেরকে স্বত্বাধিকার দেওয়া হয়েছে, কোন ব্যক্তি তিনি পিতা হলেও কোন প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না, এমনকি স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোন পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষরা। তাদের সন্তুষ্টি বিধানকেও শরীয়তে মোহাম্মদী ইবাদতের মর্যাদা দান করেছে। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে।

বর্তমান ফেতনা-ফাসাদের মূল কারণ ঃ স্ত্রীলোককে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জঘন্য অন্যায়, ইসলাম এ অন্যায় প্রতিরোধ করেছে। আবার তাদেরকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেওয়াও নিরাপদ নয়। সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও ঘরের কাজকর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়াও নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফেত্না-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এজন্য কোরআনে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ অর্থাৎ পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর ঊর্ধ্বে। অন্য কথায় বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার।

যেভাবে ইসলাম-পূর্ব জাহিলিয়তের যুগে দুনিয়ার মানুষ স্ত্রীলোককে ঘরের আসবাবপত্র ও চতুষ্পদ জন্তুতুল্য বলে গণ্য করার ভুলে নিমগ্ন ছিল, অনুরূপভাবে মুসলমানদের বর্তমান পতনের পর জাহিলিয়তের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। এতে প্রথম ভুলের সংশোধন আর একটি ভুলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র বিশ্ব ঝগড়া-বিবাদ ও ফেত্‌না-ফাসাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন এত বেড়ে গেছে যে, তা আজ সেই বর্বর যুগকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। আরবদের মধ্যে একটা প্রবাদ রয়েছে ঃ

اَلْجَاهِلُ اِمَّا مُفْرِطٌ اَوْ مُفَرِّطٌ অর্থাৎ মূর্খ লোক কখনও মধ্যপন্থা অবলম্বন করে না। যদি সীমালংঘন থেকে বিরত থাকে, তবে হীনমন্যতা ও সংকীর্ণতার পর্যায়ে চলে আসে। বর্তমানে এমনি অবস্থা চলছে যে, যে নারীকে এক সময় তারা মানুষ বলে গণ্য করতেও রাজি ছিল না, সেই জাতিগুলিই এখন এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, পুরুষদের যে কর্তৃত্ব নারী সমাজ তথা গোটা দুনিয়ার জন্যই একান্ত কল্যাণকর ছিল, সে কর্তৃত্ব বা তত্ত্বাবধায়কের ধারণাটুকুও একেবারে ঝেড়ে-মুছে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যার অশুভ পরিণতি প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, যতদিন পর্যন্ত আল-কোরআনের এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ফেত্‌না দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। বর্তমান বিশ্বের মানুষ শান্তির অন্বেষায় নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন করে চলছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, অগণিত অর্থ ব্যয় করছে, কিন্তু যে উৎস হতে ফেত্‌না-ফাসাদ ছড়াচ্ছে সেদিকে কারো লক্ষ্য নেই।

যদি আজ ফেত্‌না-ফাসাদের কারণ উদ্‌ঘাটনের জন্য কোন নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করা হয়, তবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি সামাজিক অশান্তির কারণই দাঁড়াবে স্ত্রীলোকের বেপরোয়া চালচলন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে অহংপূজার প্রভাব বড় বড় বুদ্ধিমান দার্শনিকের চক্ষুকেও ধাঁধিয়ে দিয়েছে। আত্ম-অভিলাষের বিরুদ্ধে যে কোন কল্যাণকর চিন্তা বা পন্থাকেও সহ্য করা হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের অন্তরকে ঈমানের আলোতে আলোকিত করে রাসূল (সা)-এর উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন!

মাস'আলা ঃ এ আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করার পথনির্দেশ করা হয়েছে। অপরদিকে নিজের অধিকার আদায় করার চাইতে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্নবান হবার জন্যও উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তা যদি হয়, তবে বিনা তাকিদেই প্রত্যেকের অধিকার রক্ষিত হবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেকেই স্বীয় অধিকার আদায় করতে চায় অথচ নিজের দায়িত্বের প্রতি আদৌ সচেতন নয়। ফলে ঝগড়া-বিবাদই শুধু সৃষ্টি হতে থাকে।

যদি কোরআনের এ শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তবে ঘরে-বাইরে অর্থাৎ সারা বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করবে এবং ঝগড়া-বিবাদ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

নারী ও পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য ঃ সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা মানবচরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, সর্বোপরি স্ত্রীলোকদের সুবিধার্থেই পুরুষকে স্ত্রীলোকদের উপর শুধু কিছুটা প্রাধান্যই

দেওয়া হয়নি বরং তা পালন করাও ফরয করে দেওয়া হয়েছে। এরই বর্ণনা اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ আয়াতে দেওয়া হয়েছে। তাই বলে সকল পুরুষই সকল স্ত্রীলোকের উপর মর্যাদার অধিকারী নয়। কেননা আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদার নিরিখ হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। সেখানে মর্যাদার তারতম্য ঈমান ও নেক আমলের তারতম্যের উপর হয়ে থাকে। তাই, পরকালের ব্যাপারে দুনিয়ার মত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। এক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, কোন কোন স্ত্রীলোক অনেক পুরুষের চাইতেও অধিক মর্যাদা লাভ করার যোগ্য।

কোরআনে শরীয়তের নির্দেশ এবং কর্মফলের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের বর্ণনায় যদিও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি এবং যেটুকু পার্থক্য রয়েছে তা অন্য আয়াতে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; তথাপি সাধারণভাবে পুরুষকে সম্বোধন করেই সব কথা বলা হয়েছে এবং সম্বোধনের ভাষায় ব্যবহার করা হয়েছে। এটা অবশ্য শুধু কোরআনের বেলায়ই নয়, বরং অন্যান্য আইনের বেলায়ও সাধারণত পুংলিঙ্গবাচক শব্দই ব্যবহার করা হয়ে থাকে, অথচ আইনের দৃষ্টিতে স্ত্রী-পুরুষ সবাই সমান। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, যে পার্থক্যের কথা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুরুষকে স্ত্রীলোকের উপর এক প্রকার অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হয়ত এই যে, স্ত্রীলোকের বর্ণনাতেও গোপনীয়তা রক্ষা করার দরকার। কিন্তু কোরআনের স্থানে স্থানে পুরুষের মত স্ত্রীলোকদের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ না করাতেই হযরত উম্মে সালমা (রা) হুযূর (সা)-কে এর কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখনই সূরা আহ্‌যাবের এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ .

এতে পুরুষদের সাথে সাথে স্ত্রীলোকদের কথাও স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ, বেহেশতে স্থান লাভ ইত্যাদিতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নাসায়ী, মসনদে-আহমদ, তফসীরে ইবনে জরীর প্রভৃতি গ্রন্থে এর বর্ণনা রয়েছে।

তফসীরে ইবনে কাসীরের এক বর্ণনাতে আছে যে, জনৈক মুসলমান স্ত্রীলোক রাসূল (সা)-এর স্ত্রীগণের নিকট এসে প্রশ্ন করেন—কোরআনের স্থানে স্থানে কোথাও কোথাও স্বতন্ত্রভাবে আপনাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ স্ত্রীলোকের তো কোন উল্লেখ নেই ? তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

মোটকথা দুনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং স্ত্রীলোকের নিরাপত্তার জন্য পুরুষকে স্ত্রীলোকের উপর স্থান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরকালের শুভাশুভ কর্মফলের বেলায় কোন পার্থক্যই নেই। কোরআনের অন্যত্র এ ব্যাপারটি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যথা ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

অর্থাৎ—'যে পুরুষ ও স্ত্রী ঈমানদার অবস্থায় নেক আমল করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে পবিত্র জীবন দান করব।'

উল্লিখিত ভূমিকার পরে আয়াতের শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা করা যাক। ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ –অর্থাৎ তাদের অধিকার পুরুষের দায়িত্বে, যেভাবে পুরুষের অধিকার তাদের দায়িত্বে। এতে স্ত্রীলোকের অধিকারের কথা পুরুষের অধিকারের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, পুরুষ তো নিজের বাহুবলে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত মর্যাদার বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করেই নেয়, কিন্তু নারীদের অধিকারের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা সাধারণত তারা শক্তি দ্বারা তা আদায় করতে পারে না।

এতে আরো একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পুরুষের পক্ষে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নারীদের অধিকার প্রদান করা উচিত। এস্থলে مِثْل শব্দ ব্যবহার করে উভয়ের অধিকার ও কর্তব্যের সমতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক হতে হবে। কেননা, প্রকৃতিগতভাবেই তা ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে যে, উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য পালন সমভাবে ওয়াজিব। এ কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে অবহেলা করলে সমভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

এস্থলে লক্ষণীয় যে, কোরআনের ছোট একটি বাক্যে দায়িত্ব, কর্তব্য অধিকারের মত বিরাট বিষয়কে ভরে দেওয়া হয়েছে। কেননা এ আয়াতেই নারীর সমস্ত অধিকার পুরুষের উপর এবং পুরুষের সমস্ত অধিকার নারীর উপর অর্পণ করা হয়েছে।–(বাহরে মুহীত) এ বাক্যটি শেষে بالمعروف –শব্দ ব্যবহার করে পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে এমন সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। বলা হচ্ছে যে, অধিকার আদায় প্রচলিত ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে হতে হবে। কারণ 'মারুফ' শব্দের অর্থ এমন বিষয়, যা শরীয়ত অনুযায়ী নাজায়েয নয় এবং সাধারণ নিয়ম ও প্রচলিত প্রথানুযায়ীও যাতে কোন রকম জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই। সারকথা হচ্ছে এই যে, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য শুধু নিয়ম জারি করাই যথেষ্ট নয়, বরং প্রচলিত সাধারণ প্রথার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথা অনুযায়ীও কারো আচরণ অন্যের পক্ষে কষ্টের কারণ হলে তা জায়েয হবে না। যথা–বদমেজাজী, অনুকম্পাহীনতা ইত্যাদি। এসব ব্যাপার আইনের আওতায় আসতে পারে না। কিন্তু–بِالْمَعْرُوْفِ শব্দটি দ্বারা এই সব ব্যাপারই বোঝানো হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ –এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, উভয় পক্ষের অধিকার ও কর্তব্য সমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের উপর এক স্তর বেশি মর্যাদা দান করেছেন। এতে একটি বিরাট দর্শন রয়েছে, যার প্রতি আয়াতের শেষ বাক্য وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ –বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের তুলনায় কিছুটা উচ্চমর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই তাদের অতি সতর্কভাবে ধৈর্যের সাথে কাজ করা আবশ্যক। যদি স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনের ব্যাপারে কিছুটা গাফলতিও হয়ে যায়, তবে তারা তা সহ্য করে নেবে এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে মোটেই অবহেলা করবে না। (কুরতুবী)

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ
اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا
تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾
فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ
فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يَّتَرَاجَعَاۤ اِنْ ظَنَّاۤ اَنْ يُّقِيْمَا
حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾

(২২৯) তালাকে-'রাজঈ' হলো দু'বার পর্যন্ত—তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয় তাদের কাছ থেকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহ্র নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহ্র নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন গোনাহ নাই। এই হলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুত যারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে, তারাই হলো জালেম। (২৩০) তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেওয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন গোনাহ্ নেই, যদি আল্লাহ্র হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। আর এই হলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তালাক দু'বারে দিতে হয়। অতঃপর (দু'বার তালাক দেওয়ার পর দু'টি অধিকার রয়েছে–) ইচ্ছা করলে তা ফিরিয়ে নিয়ে নিয়মানুযাযী পুনরায় স্ত্রীকে গ্রহণ করবে, অথবা (ইচ্ছা করলে

ফিরিয়ে না নিয়ে ইদ্দত অতিক্রান্ত হতে দিতে দেবে এবং এভাবে) ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে তাকে ছেড়ে দেবে এবং (তালাক দানকালে) স্ত্রীর কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয় (যদিও গৃহীত সে বস্তু মোহরের বিনিময়ে দেওয়া বস্তু থেকেও হয়ে থাকে। তবে এক অবস্থায় গ্রহণ করা জায়েয। তা হচ্ছে এই যে,) যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমন দাঁড়িয়ে যায়, যাতে উভয়ের ভয় হয় যে, (এ সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে) আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম-কানুন রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে (অর্থ-সম্পদের আদান-প্রদানে) উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন গোনাহ হবে না। স্ত্রী স্বামীকে কিছু অর্থ-সম্পদ দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে পারে (তবে এ সম্পদের পরিমাণ মোহরের চাইতে বেশি হতে পারবে না)। এসবই আল্লাহ্র বিধান। (তোমরা) এর সীমালংঘন করো না। আর যারা এ সীমা অতিক্রম করে, তারা নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনে।

অতঃপর যদি (দু'তালাকের পরে) তৃতীয় তালাকও দিয়ে বসে, তবে সে স্ত্রীলোক তৃতীয় তালাকের পর, অন্যত্র বিয়ে করার পূর্বে সে ব্যক্তির জন্য হালাল হবে না। (তবে দ্বিতীয় বিয়েও ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর করতে পারবে।) এবং (দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস করার পর) যদি সে কোন কারণে তালাক দিয়ে দেয় (এবং ইদ্দত শেষ হয়ে যায়) তখন তারা পুনরায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এতে তারা গোনাহগার হবে না। যদি তাদের এ আত্মবিশ্বাস থাকে যে, তারা এতে আল্লাহ্র আদেশ যথাযথভাবে পালন করতে পারবে। আল্লাহ্ তা'আলা বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য তাঁর এ কানুন বর্ণনা করে থাকেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত আদেশ বা হুকুম কোরআনের অনেক আয়াতেই এসেছে। তবে এ কয়টি আয়াতে তালাক সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর তা বুঝবার জন্য প্রথমে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের তাৎপর্য বোঝাতে হবে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে ও তালাক ঃ বিয়ের একটি দিক হচ্ছে এই যে, এটি পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত একটি চুক্তি মাত্র। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে, অনেকটা তেমনি। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, এটি একটি সুন্নত বা প্রথা ও ইবাদত। তবে সমগ্র উম্মত এতে একমত যে, বিবাহ্ সাধারণ লেনদেন ও চুক্তির উর্ধ্বে একটা পবিত্র বন্ধনও বটে। যেহেতু এতে একটি সুন্নত ইবাদতের গুরুত্ব রয়েছে, সেহেতু বিয়ের ব্যাপারে এমন কতিপয় শর্ত রাখা হয়, যা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে রাখা হয় না।

প্রথমত যে কোন স্ত্রীলোকের সাথে যে-কোন পুরুষের বিয়ে হতে পারে না। এক্ষেত্রে শরীয়তের একটি বিধান রয়েছে। সে বিধানের ভিত্তিতে কোন কোন স্ত্রীলোকের বিয়ে কোন কোন পুরুষের সাথে হওয়া নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়ত বিয়ে ব্যতীত অন্য সব ব্যাপারে সমাধা করার জন্য সাক্ষী শর্ত নয়। একমাত্র মতবিরোধের সময়েই সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে এর সম্পাদনকালেই সাক্ষীর প্রয়োজন। যদি দু'জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক সাক্ষী ব্যতীত কোন নারী এবং পুরুষ পরস্পর বিয়ের কাজ সম্পাদন করে এবং উভয় পক্ষের কেউ তা অস্বীকারও না করে, তবুও শরীয়তের বিধান মতে এ বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে—যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তত দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে

'ইজাব-কবূল' না হয়। বিয়ের সুন্নত নিয়ম হলো, সাধারণ প্রচারের মাধ্যমে সম্বন্ধ স্থির করা। এমনিভাবে এতে আরো অনেক শর্ত ও নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-সহ অন্যান্য ইমামের মতে, বিয়ের ক্ষেত্রে লেনদেন চুক্তির গুরুত্ব অপেক্ষা ইবাদত ও সুন্নতের গুরুত্ব অনেক বেশি। এ মতের সমর্থনে তাঁরা কোরআন ও হাদীসের অনেক দলীল উদ্ধৃত করেছেন।

বিয়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তালাক সম্পর্কে কিছু জ্ঞানলাভ করা দরকার। তালাক বিয়ের চুক্তি ও লেনদেন বাতিল করাকে বোঝায়। ইসলামী শরীয়ত বিয়ের বেলায় চুক্তির চাইতে ইবাদতের গুরুত্ব বেশি দিয়ে একে সাধারণ বৈষয়িক চুক্তি অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। তাই এ চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারটিও সাধারণ ব্যাপারের চাইতে কিছুটা জটিল। যখন খুশি, যেভাবে খুশি তা বাতিল করে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না; বরং এর জন্য একটি সুষ্ঠু আইন রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের শিক্ষা এই যে, বিয়ের চুক্তি সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়, তা ভঙ্গ করার মত কোন অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা, এ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এতে বংশ ও সন্তানদের জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এজন্যই এ সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে যেসব কারণের উদ্ভব হয়, কোরআন ও হাদীসের শিক্ষায় সে সমস্ত কারণ নিরসনের জন্য পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকটি বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে যে উপদেশ রয়েছে সেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে, যাতে এ সম্পর্ক দিন দিন গাঢ় হতে থাকে এবং কখনো ছিন্ন হতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। অসহযোগিতার অবস্থায় প্রথমে বোঝাবার চেষ্টা অতঃপর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যদি এতেও সমস্যার সমাধান না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে সালিস সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا –আয়াতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পরিবার থেকে সালিস সাব্যস্ত করার নির্দেশটিও একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বিষয়টিকে যদি পরিবারের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তিক্ততা এবং মনের দূরত্ব আরো বেশি বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। কিন্তু অনেক সময় ব্যাপার এমন রূপ ধারণ করে যে, সংশোধনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভের স্থলে উভয়ের একত্রে মিলেমিশে থাকাও মস্ত আযাবে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়াই উভয় পক্ষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। আর এ জন্যই ইসলামে তালাক ও বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত অন্যান্য ধর্মের মত বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করার পথ বন্ধ করে দেয়নি। যেহেতু চিন্তাশক্তি ও ধৈর্যের সামর্থ্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অনেক বেশি, তাই তালাকের অধিকারও পুরুষকেই দেওয়া হয়েছে; এ স্বাধীন ক্ষমতা স্ত্রীলোককে দেওয়া হয়নি। যাতে করে সাময়িক বিরক্তির প্রভাবে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক বেশি তালাকের কারণ হতে না পারে।

তবে স্ত্রীজাতিকেও এ অধিকার হতে একেবারে বঞ্চিত করা হয়নি। স্বামীর জুলুম-অত্যাচার হতে আত্মরক্ষা করার ব্যবস্থা তাদের জন্যও রয়েছে। তারা কাযীর দরবারে নিজেদের অসুবিধার বিষয় উপস্থাপন করে স্বামীর দোষ প্রমাণ করে বিবাহবিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে। যদিও পুরুষকে তালাক দেওয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, এ ক্ষমতার ব্যবহার আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার। একমাত্র অপারক অবস্থাতেই এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ ابغض الحلال الى الله الطلاق। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্টতম হালাল বিষয় হচ্ছে তালাক।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে এই যে, রাগান্বিত অবস্থায় কিংবা সাময়িক বিরক্তি ও গরমিলের সময় এ ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না। এ হিকমতের পরিপ্রেক্ষিতে ঋতু অবস্থায় তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র অবস্থায়ও যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়ে থাকে, তবে এমতাবস্থায় এজন্য তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, এতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ হবে এবং তাতে তার কষ্ট হবে। কাজেই কোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ যদি তালাক দিতেই হয়, তবে এমন সময় তালাক দাও, যাতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ না হয়। ঋতু অবস্থায়ও তালাক দিলে চল্তি ঋতু ইদ্দতে গণ্য হবে না। চল্তি ঋতুর অন্তে পবিত্রতা লাভের পর পুনরায় যে ঋতু শুরু হয়, সে ঋতু থেকে ইদ্দত গণনা করা হবে। আর যে তহুর বা শুচিতায় সহবাস করা হয়েছে, যেহেতু সে তহুরে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, তাই তাতে ইদ্দত আরো দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। তালাক দেওয়ার জন্য এ নির্ধারিত তহুর ঠিক করার আরো একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এ সময়ের মধ্যে রাগ কমেও যেতে পারে এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ফিরে আসলে তালাক দেওয়ার ইচ্ছাও শেষ হয়ে যেতে পারে।

তৃতীয় শর্ত রাখা হয়েছে যে, বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার বিষয়টি সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় ও চুক্তি ছিন্ন করার মত নয়। বৈষয়িক চুক্তির মত বিবাহের চুক্তি একবার ছিন্ন করাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। উভয় পক্ষ অন্যত্র দ্বিতীয় চুক্তি করার ব্যাপারে স্বাধীনও নয়। বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তালাকের তিনটি স্তর ও পর্যায় রাখা হয়েছে এবং এতে ইদ্দতের শর্ত রাখা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহের অনেক সম্পর্কই বাকি থাকে। যেমন স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করতে পারে না। তবে পুরুষের জন্য অবশ্য বাধা-নিষেধ থাকে না।

চতুর্থ শর্ত এই যে, যদি পরিষ্কার কথায় এক বা দুই তালাক দেওয়া হয়, তবে তালাক প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না। বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে পূর্বের বিবাহই অক্ষুণ্ন থাকে।

তবে এ প্রত্যাহারের অধিকার শুধু এক অথবা দুই তালাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, যাতে কোন অত্যাচারী স্বামী এমন করতে না পারে যে, কথায় কথায় তালাক দেবে এবং তা প্রত্যাহার করে পুনরায় স্বীয় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। এ জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, যদি কেউ তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার আর প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে না। এমনকি যদি উভয়ে রাজি হয়েও নিজেরা পুনরায় বিবাহ করতে চায় তবুও বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতীত তা করতে পারবে না।

আলোচ্য আয়াতে তালাক-ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আলোচ্য আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রথমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ অর্থাৎ তালাক হয় দু'বার। অতঃপর এ দু'তালাকের মধ্যে শর্ত রাখা হয়েছে যে, এতে বিবাহ বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায় না, বরং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা স্বামীর থাকে। বস্তুত ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যদি তালাক প্রত্যাহার করা না হয়, তবেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়। এ বিষয়কে فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ হয় শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তালাক প্রত্যাহার করা হবে অথবা সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে তার ইদ্দত শেষ হতে দেওয়া হবে, যাতে সে (স্ত্রী) মুক্তি পেতে পারে।

এখনও তৃতীয় তালাকের আলোচনা আসেনি। মধ্যখানে একটি মাস'আলা বর্ণনা করা হয়েছে, যা এ অবস্থায় আলোচনায় আসতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, কোন কোন অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীকে রাখতেও চায় না, আবার তার অধিকার আদায় করারও কোন চিন্তা করে না, আবার তালাকও দেয় না। এতে স্ত্রী যখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেই সুযোগ নিয়ে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু অর্থকড়ি আদায় করার বা মোহর মাফ করিয়ে নেওয়ার বা ফেরত নেওয়ার দাবি করে বসে। কোরআন মজীদ এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا .

অর্থাৎ—"তালাকের পরিবর্তে তোমাদের দেয়া অর্থ-সম্পদ বা মোহর ফেরত লওয়া হালাল নয়।"

অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে মোহর ফেরত নেওয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রী এমন অনুভব করে যে, মনের গরমিলের দরুন আমি স্বামীর হক আদায় করতে পারিনি এবং স্বামী যদি তাই বুঝে, তবে এমতাবস্থায় মোহর ফেরত নেওয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া এবং এর পরিবর্তে তালাক নেওয়া জায়েয হবে। এই মাস'আলা বর্ণনা করার পর ইরশাদ হয়েছে ঃ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ অর্থাৎ—এ ব্যক্তি যদি তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তবে তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোন অধিকার থাকবে না। কেননা, এমতাবস্থায় এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সব দিক বুঝে-শুনেই সে স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে এই যে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়েও পুনঃবিবাহ করতে চায়, তবে তাও তারা করতে পারে না। তাদের পুনর্বিবাহের জন্য শর্ত হচ্ছে স্ত্রী ইদ্দতের পরে অন্য কাউকে বিয়ে করবে এবং সে স্বামীর সাথে সহবাসের পর কোন কারণে যদি এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয় অথবা মৃত্যুবরণ করে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا—এ আয়াতে এরূপ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে।

তিন তালাক ও তার বিধান ঃ এ ক্ষেত্রে কোরআন মজীদের বর্ণনাভঙ্গী লক্ষ্য করলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, তালাক দেওয়ার শরীয়তসম্মত বিধান হচ্ছে বড়জোর দুই তালাক পর্যন্ত দেওয়া যাবে; তৃতীয় তালাক দেওয়া উচিত হবে না। আয়াতের শব্দ اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ

-এর পর তৃতীয় তালাককে فَاِنْ (যদি) শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে- طلقها এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। নতুবা বলা উচিত ছিল যে, الطلاق ثلث। অর্থাৎ তালাক তিনটি। তাই এর অর্থ হচ্ছে যে, তৃতীয় তালাক পর্যন্ত পৌঁছা উচিত নয়। আর এ জন্যই ইমাম মালেক এবং অনেক ফকীহ্ তৃতীয় তালাক দেওয়ার অনুমতি দেননি। তাঁরা একে তালাকে-বিদ'আত বলেন। আর অন্য ফকীহ্‌গণ তিন তুহুরে আলাদা আলাদাভাবে তিন তালাক দেওয়াও জায়েয বলেন। এসব ফকীহ্ একেই সুন্নত তালাক বলেছেন। কিন্তু কেউই একথা বলেননি যে, এটাই তালাকের সুন্নত বা উত্তম পন্থা। বরং বিদ'আত তালাক-এর স্থলে সুন্নত তালাক শুধু এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কোরআন ও হাদীসের ইরশাদসমূহ এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কার্যপদ্ধতিতে প্রমাণিত হয় যে, যখন তালাক দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না, তখন তালাক দেওয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে যে, এমন এক তুহুরে এক তালাক দেবে, যাতে সহবাস করা হয়নি। এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে। ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ্ সম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। ফকীহ্‌গণ একে আহ্‌সান বা উত্তম তালাক পদ্ধতি বলেছেন। সাহাবীগণও একেই তালাকের সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করেছেন।

ইবনে আবি শায়বা তাঁর গ্রন্থে হযরত ইব্রাহীম নাখ্‌য়ী (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাবীগণ তালাকের ব্যাপারে এ পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন যে, মাত্র এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে এবং এতেই ইদ্দত শেষ হলে বিবাহ বন্ধন স্বাভাবিকভাবে ছিন্ন হয়ে যাবে।

কোরআনের শব্দের দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, দুই তালাক পর্যন্ত দেওয়া যায়। তবে مرتان শব্দ দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, এক শব্দে দুই তালাক দেওয়া উচিত নয়; বরং দুই তুহুরে পৃথক পৃথকভাবে দুই তালাক দিতে হবে। الطلاق طلاقان। -এর দ্বারাই দুই তালাক প্রমাণিত হয়, কিন্তু مرتان শব্দটি এ নিয়মের দিকে ইঙ্গিত করে যে, দুই তালাক পৃথক পৃথক শব্দে হওয়াই উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে একবারে দু'টি টাকা দেয়, তবে তাকে দু'বার দিয়েছে বলা যায় না। তেমনি কোরআনের শব্দে দুই বারের অর্থই হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে দেওয়া।-(রূহুল-মা'আনী)

যা হোক, কোরআন মজীদের শব্দের দ্বারা যেহেতু দুই তালাক পর্যন্ত প্রমাণিত হয়, এজন্য ইমাম ও ফকীহ্‌গণ একে সুন্নত তরীকা বলে অভিহিত করেছেন। তৃতীয় তালাক উত্তম না হওয়াও কোরআনের বর্ণনাভঙ্গিতেই বোঝা যায় এবং এতে কোন মতানৈক্য নেই। রসূলে আকরাম (সা)-এর হাদীস দ্বারাও তৃতীয় তালাক নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বলে প্রমাণিত হয়। ইমাম নাসায়ী মুহাম্মদ ইবনে লাবীদের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ

اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امراته ثلاث تطليقات جميعا - فقام غضبانا ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله الا اقتله (نسائى كتاب الطلاق - ج ٢ ص ٩٨)

অর্থাৎ—এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক একসাথে দিয়েছে—এ সংবাদ রাসূল (সা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি উপহাস করছ ? অথচ আমি এখনও তোমাদের মধ্যেই রয়েছি! এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলতে লাগল–হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি তাকে হত্যা করব ?

ইবনে কাইয়্যেম এ হাদীসের সনদকে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে সঠিক বলেছেন। (যাদুল-মা'আদ) আল্লামা মা-ওয়ারদী, ইবনে-কাসীর, ইবনে হাজার প্রমুখ এ হাদীসের সনদকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য ইমাম মালেক এবং অন্যান্য ফকীহ্ তৃতীয় তালাককে নাজায়েয ও বিদ'আত বলেন। অন্যান্য ইমাম তিন তুহ্রে তিন তালাক দেওয়াকে সুন্নত তরীকা বলে যদিও একে বিদ'আত থেকে দূরে রেখেছেন, কিন্তু এটা যে তালাকের উত্তম পন্থা নয়, তাতে কারো দ্বিমত নেই।

মোটকথা, ইসলামী শরীয়ত তালাকের তিনটি পর্যায়কে তিন তালাকের আকারে স্থির করেছে। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, তালাকের ব্যাপারে এ তিনটি পর্যায়ই পূর্ণ করতে হবে। বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে–প্রথমত তালাকের দিকে অগ্রসর হওয়াই অপছন্দনীয় কাজ। কিন্তু অপারকতাবশত যদি এদিকে অগ্রসর হতেই হয়, তবে এর নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ এক তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ করার সুযোগ দেওয়াই উত্তম, যাতে ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ বন্ধন আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যায়। একেই তালাকের উত্তম পদ্ধতি বলা হয়। এতে আরো অসুবিধা হচ্ছে এই যে, পরিষ্কার শব্দে এক তালাক দিলে পক্ষদ্বয় ইদ্দতের মধ্যে ভালমন্দ বিবেচনা করার সুযোগ পায়। যদি তারা ভাল মনে করে, তবে তালাক প্রত্যাহার করলেই চলবে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে যদিও বিবাহ্ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং স্ত্রী স্বাধীন হয়ে যায়, তবুও সুযোগ থাকে যে, উভয়েই যদি ভাল মনে করে, তবে বিয়ের নবায়নই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি তালাকের উত্তম পন্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এবং ইদ্দতের মধ্যেই আরো এক তালাক দিয়ে বসে তবে সে বিবাহ্ ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে গেল, যদিও এর প্রয়োজন ছিল না। আর এ পদক্ষেপ শরীয়তও পছন্দ করে না। তবে এ দু'টি স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিষয়টি পূর্বের মতই রয়ে যায় অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে। আর ইদ্দত শেষ হলে উভয় পক্ষের ঐকমত্যে বিয়ের নবায়ন হতে পারে। পার্থক্য শুধু এই যে, দুই তালাক দেওয়াতে স্বামী তার অধিকারের একাংশ হাতছাড়া করে ফেলে এবং এমন সীমারেখায় পদার্পণ করে যে, যদি আর এক তালাক দেয়, তবে চিরতরে এ পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি তালাকের দু'টি পর্যায় অতিক্রম করে ফেলে তার জন্য পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে ঃ فَامْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ এতে দু'টি আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে এই যে, ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে বিয়ে নবায়নের প্রয়োজন নেই বরং তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়াই যথেষ্ট। এতে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিয়ের নবায়নের প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, স্বামী যদি মিল-মহব্বতের সাথে সংসার জীবন-যাপন করতে চায়, তবে তালাক প্রত্যাহার করবে। অন্যথায় স্ত্রীকে ইদ্দত অতিক্রম করে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি

লাভের সুযোগ করে দেবে, যাতে বিবাহ বন্ধন এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যায়। আর তা যদি না হয়, তবে স্ত্রীকে অযথা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেন তালাক প্রত্যাহার না করে। সেজন্যই تسريح باحسان বলা হয়েছে। تسريح অর্থ খুলে দেওয়া বা ছেড়ে দেওয়া। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দ্বিতীয় তালাক দেওয়া বা অন্য কোন কাজ করার প্রয়োজন নেই। তালাক প্রত্যাহার ব্যতীত ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়াই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

হাদীসশাস্ত্রের ইমাম আবূ দাউদ (র) আবূ রজিন আসাদী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর এক ব্যক্তি রাসূলে-করীম (সা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, কোরআন مرتان –বলেছে, তারপর তৃতীয় তালাকের কথা বলেনি কেন ? তিনি উত্তর দিলেন যে, পরে যে تسريح باحسان বলা হয়েছে সেটিই তৃতীয় তালাক।–(রূহুল-মা'আনী) অধিকাংশ আলেমের মতে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তৃতীয় তালাক যে কাজ করে, এ কর্মপদ্ধতিও তা-ই করে যা ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার না করলেই হয়। আর যেভাবে امساك -এর সাথে بمعروف শব্দের শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে ফিরিয়েই রাখতে হয়, তবে উত্তম পন্থায়ই ফিরিয়ে রাখা হোক। তেমনিভাবে تسريح –এর সাথে احسان শব্দের শর্ত আরোপের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তালাক হচ্ছে একটি বন্ধনকে ছিন্ন করা। আর সৎ লোকের কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, কোন কাজ বা চুক্তি করতে হলে তারা তা উত্তম পন্থায়ই করে থাকেন। এমনিভাবে যদি বিবাহ-বন্ধনও ছিন্ন করার পর্যায়ে এসে যায় তবে তা রাগান্বিত হয়ে বা ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে করা উচিত নয়; ইহ্সান ও ভদ্রতার সাথেই তা সম্পন্ন করা উচিত। বিদায়ের সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে উপহার-উপঢৌকন হিসাবে কিছু কাপড়-চোপড়, কিছু টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিয়ে বিদায় করবে।

এ ব্যাপারে কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ مَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে আর্থিক ক্ষমতানুযায়ী কিছু উপঢৌকন ও কাপড়-পোশাক দিয়ে বিদায় করা উচিত।

আর যদি সে এরূপ না করেই তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে সে শরীয়ত-প্রদত্ত তার সমস্ত ক্ষমতা বিনা প্রয়োজনে হাতছাড়া করে দিল। ফলে তার শাস্তি হচ্ছে এই যে, এখন আর সে তালাকও প্রত্যাহার করতে পারবে না এবং স্ত্রীর অন্যত্র বিয়ে হওয়া ব্যতীত উভয়ের মধ্যে আর কখনো বিয়ে হতে পারবে না।

একত্রে তিন তালাকের প্রশ্ন ঃ এ প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক উত্তর এই যে, কোন কাজের পাপ কাজ হওয়া তার প্রতিক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে না। অন্যায়ভাবে হত্যা করা পাপ হলেও যাকে গুলী করে বা কোন অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়, সে নিহত হয়েই যায়। এই গুলী বৈধভাবে করা হলো, কি অবৈধভাবে করা হয়েছে, সে জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে না। চুরি সব ধর্মমতেই পাপ, কিন্তু যে অর্থ-সম্পদ চোরাই পথে পাচার করা হয়, তা তো হাতছাড়া হয়েই গিয়েছে। এমনিভাবে যাবতীয় অন্যায় ও পাপের একই অবস্থা যে, এর অন্যায় ও পাপ হওয়া এর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করে না।

এই মূলনীতির ভিত্তিতে শরীয়ত-প্রদত্ত উত্তম নীতি-নিয়মের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে প্রয়োজন ব্যতীত স্বীয় সমস্ত ক্ষমতাকে শেষ করে দেওয়া এবং একই সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যদিও রাসূল (সা)-এর অসন্তুষ্টির কারণ, যা পূর্ববর্তী বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, এজন্য সমগ্র উম্মত একবাক্যে একে নিকৃষ্ট পন্থা বলে উল্লেখ করেছে এবং কেউ কেউ নাজায়েযও বলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ এ পদক্ষেপ নেয় তবে এর ফলাফলও তাই হবে, বৈধ পথে অগ্রসর হলে যা হয় অর্থাৎ তিন তালাক হয়ে যাবে এবং শুধু প্রত্যাহার নয়, বিবাহ-বন্ধন নবায়নের সুযোগও আর থাকবে না।

হুযূর (সা)-এর মীমাংসাই এ ব্যাপারে বড় প্রমাণ যে, তিনি অসন্তুষ্ট হয়েও তিন তালাককে কার্যকরী করেছেন। হাদীস গ্রন্থে অনুরূপ বহু ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। আর যারা এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতেও তাঁরা হাদীসের সেসব ঘটনা সংগ্রহ করেই একত্র করেছেন। সম্প্রতি জনাব মাওলানা আবু যাহেদ সরফরাজ তাঁর 'উমদাতুল আসার' গ্রন্থে এ মাস'আলা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। এখানে এ সম্পর্কিত মাত্র দু'-তিনটি হাদীস উদ্ধৃত হলো।

মাহমুদ ইবনে লাবীদের ঘটনা সম্পর্কে নাসায়ীর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে যে, তিন তালাক এক সঙ্গে দেওয়াতে হুযূর (সা) অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এমনকি কোন কোন সাহাবী তাকে হত্যার যোগ্য বলেও মনে করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ তালাককে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক বলে হুযূর (সা) ঘোষণা করেছেন—এমন বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না।

পরবর্তী বর্ণনা যা সামনে আসছে তাতে এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত উয়াইমেরের এক সাথে তিন তালাক দেওয়াকে অত্যন্ত না-পছন্দ করা সত্ত্বেও হুযূর (সা) তা কার্যকর করেছেন। এমনিভাবে আলোচ্য হাদীসে মাহমুদ ইবনে লাবীদ সম্পর্কে কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী এ বাক্যটিতে লিখেছেন যে, হুযূর (সা) তার এ তিন তালাকও কার্যকর করেছেন। হাদীসের বাক্য এরূপ ঃ

فلم يرده النبى صلى الله عليه وسلم بل امضاه كما فى حديث عويمر- العجلانى فى اللعان حيث امضى طلاقه الثلاث ولم يرده (تهذيب سنن ابى داؤد)

দ্বিতীয় হাদীসটি বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ان رجلا طلق امراته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبى صلى الله عليه وسلم اتحل للاول قال النبى (صلعم) لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاقها الاول . (صحيح بخارى ج ٢ ص ٧٩١ صحيح مسلم ص ٤٦٣)

অর্থাৎ "এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে, অতঃপর সে স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করেছে এবং সেও তালাক দিয়েছে। তখন হুযূর (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এ স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য কি হালাল হবে ? তিনি উত্তর দিলেন—না যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাসের স্বাদ গ্রহণ না করবে, যেভাবে প্রথম স্বামী স্বাদ গ্রহণ করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে স্ত্রী

প্রথম স্বামীর জন্য হালাল নয়।" হাদীসের শব্দে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, এই তিনটি তালাকই এক সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। ফত্হুল-বারী, ওমদাতুল ক্বারী, কোসতুলানী প্রমুখ এ ব্যাপারে একমত যে, এ ঘটনায় তিন তালাক একই সাথে দেওয়া হয়েছিল এবং হাদীসে এর মীমাংসাও রয়েছে যে, রাসূল (সা) এ তিন তালাক কার্যকর করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিয়েছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যত্র বিয়ে করে সে স্বামীর সঙ্গে সহবাস না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিলেও প্রথম স্বামীর পক্ষে তাকে গ্রহণ করা হালাল হবে না। তৃতীয় ঘটনাটি হযরত উয়াইমের (রা)-এর। তিনি হুযূর আকরাম (সা)-এর সামনে নিজের স্ত্রীর প্রতি খেয়ানতের অভিযোগ আরোপ করে 'লিআন' করলেন এবং অতঃপর আরয করলেন ঃ

فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره النبى صلى الله عليه وسلم (صحيح بخارى مع فتح البارى ص ٣٠١ ج ٩ صحيح مسلم ص ٢٨٩ ج ١)

—অতঃপর যখন দু'জনই লিআন করে নিলেন তখন উয়াইমের বললেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি তার ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হব, যদি আমি তাকে আমার নিকট রেখে দিই। তখন উয়াইমের (রা) তাকে রাসূলের আদেশের পূর্বেই তিন তালাক দিয়ে দিলেন। আবূ যর এ ঘটনাকে হযরত সা'দ ইবনে সহল-এর যবানে নিম্নলিখিত শব্দে বর্ণনা করেছেন ঃ

فانفذه رسول الله (صلعم) وكان ما صنع عند رسول الله (صلعم) سنة قال سعد حضرت هذا عند رسول الله (صلعم) فمضت السنة بعد فى المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لايجتمعان ابدا . (ابوداؤد ص ٣٠٦ - طبع اصح المطابع)

অর্থাৎ—রাসূল (সা) এটি কার্যকর করেছেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সামনে যা সংঘটিত হয়েছে, তা সুন্নত বলে গৃহীত হয়েছে। হযরত সা'দ বলেছেন, এ ঘটনার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এরপর থেকে লিআনকারীদেরকে ভিন্ন করে দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে, যার ফলে আর কোন দিন তারা একত্রিত হতে পারবে না।

এ হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উয়াইমেরের একসঙ্গে প্রদত্ত এ তিন তালাককে তিন গণ্য করেই রাসূলে করীম (সা) তা কার্যকর করেছেন।

মাহমুদ ইবনে লাবীদের পূর্ববর্তী বর্ণনায় ও আবু বকর ইবনে আরাবীর বর্ণনানুযায়ী একত্রে তিন তালাককে তিন তালাক হিসাবে কার্যকর করার কথা উল্লেখ রয়েছে। তা যদি নাও হতো তবু কোথাও এমন প্রমাণ নেই যে, তিন তালাককে প্রত্যাহারযোগ্য এক তালাকরূপে গণ্য করে স্ত্রী ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মোটকথা আলোচ্য তিনটি হাদীসেই প্রমাণিত হয়েছে যে, যদিও একত্রে তিন তালাক প্রদান রাসূল (সা)-এর অসন্তুষ্টির কারণ ছিল, কিন্তু উক্ত তিন তালাককে তিনি তিন তালাকরূপেই গণ্য করেছেন।

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর ঘটনা ঃ পূর্ববর্তী বিবরণে প্রমাণিত হয়েছে যে, একত্রে তিন তালাক দেওয়াকে তিন তালাকরূপে গণ্য করা রাসূল (সা)-এরই সিদ্ধান্ত। কিন্তু হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত যে প্রশ্নটির উদ্ভব হয়েছে মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত সেই ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله (صلعم) وابى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فى امر كانت لهم فيه اناة فلو امضينا عليهم فامضاه عليهم . (صحيح مسلم ج ١ ص ٤٧٧)

অর্থাৎ—"হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা)-এর যুগে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে এবং হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দুই বছর তিন তালাককে এক তালাক রূপেই গণ্য করা হতো। তখন হযরত উমর (রা) বললেন, মানুষ এমন একটি ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছে, যাতে তাদেরকে সময় দেওয়া হয়েছিল। তাই তা কার্যকর করাই উত্তম। তখন তিনি তা কার্যকর করে দিলেন।" ফারূকে আযমের এ নির্দেশ ফকীহ্ সাহাবীগণের পরামর্শে সাহাবী ও তাবেয়ীনদের সাধারণ সভায় ঘোষণা করা হয়; এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। এজন্য হাফেযে-হাদীস ইমাম ইবনে আব্দুল বার মালেকী (র) এ বিষয়ে ইজমার কথাও উল্লেখ করেছেন। যুরকানী ও শরহে-মোয়াত্তায় এভাবে বলা হয়েছে ঃ

والجمهور على وقوع الثلاث بل حكى ابن عبد البر الاجماع قائلا ان خلافة لا يلتفت اليه (زرقانى شرح مؤطاء ص ١٦٧ ج ٣)

অর্থাৎ—অধিকাংশ ওলামায়ে উম্মত একই সঙ্গে প্রদত্ত তালাক হুবহু কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে একমত। বরং ইবনে আবদুল বার্র এর উপর ইজমার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, এর বিরুদ্ধে নগণ্যসংখ্যক লোক রয়েছে, যা ভ্রূক্ষেপের যোগ্য নয়।

শায়খুল-ইসলাম নববী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

قال الشافعى ومالك وابو حنيفة واحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث وقال طاؤس وبعض اهل الظاهر لايقع بذلك الا واحدة . (شرح مسلم ص ٤٧٨ ج ١)

অর্থাৎ—ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আহমদ এবং অধিকাংশ আলেম বলেছেন, একত্রে তিন তালাক দিলে তা তিন তালাকই হবে। তবে তাউস প্রমুখ কোন কোন আহলে-যাহের বলেছেন যে, এতে এক তালাক হবে।

ইমাম ত্বাহাভী শরহে-মাআনিল-আসারে বলেছেন ঃ

فخاطب عمر (رض) بذالك الناس جميعا وفيهم اصحاب رسول الله صلعم الذين قد علموا ما تقدم من ذالك فى زمن رسول الله صلعم فلم

ينكر عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع. (شرح معانى الاثار ص ٢٩ ج ٢)

অর্থাৎ—হযরত উমর (রা) এ প্রসঙ্গে সকল স্তরের জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, যাদের মধ্যে এমন সব সাহাবীও ছিলেন, যাঁরা নবী-যুগের তরীকা সম্পর্কে অবগত ছিলেন, কিন্তু তাদের কেউই এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেননি অথবা তা খণ্ডনও করেননি।

আলোচ্য ঘটনাটিতে যদিও সাহাবী ও তাবেয়ীগণের ঐকমত্যে উম্মতের জন্য নীতি হিসাবে নির্ধারিত হয়েছিল যে, একত্রে তিন তালাক দেওয়া যদিও নিকৃষ্টতম পন্থা এবং রাসূল (সা)-এর অসন্তুষ্টির কারণ বলে প্রমাণিত, কিন্তু তথাপি যদি কোন ব্যক্তি এ ভুল পন্থায় তালাক দেয় তাহলে তার স্ত্রী হারাম হয়েই যাবে। এবং অন্যত্র বিয়ে করে পুনরায় তালাকাপ্রাপ্তা না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে পুনর্বিবাহ হতে পারবে না। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এখানে দু'টি প্রশ্ন উঠে। প্রথমত এই যে, পূর্ববর্তী আলোচনায় বহু হাদীসের উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে হুযূর (সা) কার্যকর করেছেন, এর প্রত্যাহার বা পুনর্বিবাহের অনুমতি দেননি। এমতাবস্থায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ কথার অর্থ কি যে, রাসূল (সা)-এর যুগে এবং আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে এবং ফারূকে আযমের খিলাফতের প্রথম দু'বছর পর্যন্ত একত্রে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক বলেই গণ্য করা হতো এবং হযরত ফারূকে-আযমই তিন তালাক হিসাবে এর মীমংসা দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, যদি এ ঘটনা মেনেও নেওয়া হয় যে, রাসূল (সা)-এর যুগে এবং আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে তিন তালাককে এক তালাক ধরে নেওয়া হতো, তবে ফারূকে-আযম (রা) এরূপ একটা পরিবর্তন কি করে করলেন? আর যদি একথা মনে করা না হয় যে, এতে তিনি ভুলই করেছেন, তবে প্রশ্ন উঠে যে, অন্যান্য সাহাবী কি করে এ মীমাংসা মেনে নিয়েছিলেন?

প্রশ্ন দু'টির উত্তর দিতে গিয়ে মুহাদ্দেসীন ও ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে ইমাম নববী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে যে উত্তরটিকে সবচাইতে সঠিক বলে উদ্ধৃত করেছেন এবং যা অত্যন্ত পরিষ্কার তা এই যে, উমর ফারূক (রা)-এর এ মীমাংসা এবং তার প্রতি সাহাবীগণের অনুমোদন একটি বিশেষ ক্ষেত্রের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আর তা এই যে, যদি কোন ব্যক্তি তিনবার বলে যে, তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে তালাক দিলাম, তোমাকে তালাক দিলাম, অথবা বলে যে, আমি তালাক দিলাম, আমি তালাক দিলাম, আমি তালাক দিলাম;—এ অবস্থায় দু'টি অর্থ হতে পারে—হয়তো সে ব্যক্তি তিন তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তা বলে থাকবে অথবা শুধু তাকীদ করার উদ্দেশ্যে তিনবার বলে থাকবে, তিন তালাকের উদ্দেশ্যে নয়। নিয়তের ব্যাপার তো সে ব্যক্তির স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই নির্ধারিত হতে পারে। হুযূর (সা)-এর যুগে সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার প্রভাব ছিল বেশি। এমন শব্দ বলার পর যদি কেউ বলতো যে, আমার তিন তালাকের নিয়ত ছিল না, মাত্র তাকীদের জন্য শব্দটি বারবার উচ্চারণ করা হয়েছে, তবে তিনি তার শপথকৃত বর্ণনাকে সত্য বলে মেনে নিতেন এবং তাকে এক তালাকই ধরে নেওয়া হতো।

এর প্রমাণ হযরত রুকানা (রা)-র হাদীস দ্বারা হয়। যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে "البتة" শব্দ সহযোগে তালাক দিয়েছিল। আর এ শব্দটি আরবের প্রচলিত নিয়মে তিন তালাকের জন্যই বলা হতো। কিন্তু এর অর্থ পরিষ্কার 'তিন' ছিল না এবং হযরত রুকানা (রা) বলেছেন যে, এতে আমার নিয়ত তিন তালাক ছিল না। বরং এক তালাক দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। রাসূল (সা) তাকে কসম দিলে সে তাতে কসমও করেছে। তখন তিনি তাকে এক তালাকই ধরে নেন। এ হাদীস তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্, দারেমী প্রভৃতি গ্রন্থে বিভিন্ন সনদ ও বিভিন্ন শব্দ সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে।

কোন কোন ভাষ্যে অবশ্য এ কথা বলা হয়েছে যে, হযরত রুকানা (রা) তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। কিন্তু আবূ দাউদে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত রুকানা البتة। –শব্দ সহকারে তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন; এ শব্দ যেহেতু তিন তালাকের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হতো, এজন্য কোন কোন বর্ণনাকারী একে তিন তালাক বলেই উল্লেখ করেছেন।

যা হোক, এ হাদীস দ্বারা সবার ঐকমত্যে প্রমাণিত হয় যে, হযরত রুকানার তালাককে হুযূর (সা) তখনই এক তালাক বলে গণ্য করেছেন, যখন তিনি কসম করে বর্ণনা করেছেন যে, এতে আমার উদ্দেশ্য তিন তালাক ছিল না। আরো প্রমাণ হয় যে, তিনি পরিষ্কার ভাষায় তিন তালাক বলেননি, নতুবা তিন-এর নিয়তের প্রশ্নই উঠতো না এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করারও প্রয়োজন ছিল না।

এ ঘটনা একথা পরিষ্কার করে দেয় যে, যে সব শব্দ তিন তালাকের নিয়ত করা হয়েছিল, না এক তালাকের নিয়ত বর্তমান ছিল–একথা সুস্পষ্ট করে দেয় না; সেস্থলে তিনি শপথের মাধ্যমে মীমাংসা প্রদান করেন। কেননা, সেই যুগ ছিল সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার যুগ। কেউ মিথ্যা শপথ করবে, তা ছিল অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত আমলে এবং হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দু'বছর পর্যন্ত এ নিয়মই প্রচলিত ছিল। অতঃপর হযরত উমর ফারুক (রা) অনুভব করলেন যে, দিন দিন সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার অবনতি ঘটছে এবং হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আরো অবনতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। অপরদিকে এরূপ ঘটনার আধিক্য দেখা দিয়েছে যে, 'তালাক' শব্দ তিনবার বলেও অনেকে এক তালাকের নিয়তের কথা বলছে। ফলে এতে অনুভব করা যাচ্ছিল যে, এমনিভাবে যদি তালাকদাতার নিয়তের সত্যতা মেনে নেওয়া হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে মানুষের পক্ষে শরীয়ত-প্রদত্ত এ সুবিধার যথেচ্ছ ব্যবহারও অসম্ভব নয়। এমনকি স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য কেউ কেউ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণেরও সূচনা করতে পারে। অতএব, হযরত উমর ফারুক (রা)-এর বিচক্ষণতা ও শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কিত প্রজ্ঞা সম্পর্কে যেহেতু সবাই অবগত ছিলেন, তাই তখন সবাই একবাক্যে তাঁর এ সিদ্ধান্তকে অনুমোদন দান করলেন। পক্ষান্তরে তাঁরা রাসূল (সা)-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, হুযূর (সা) যদি এ যুগে বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনিও অন্তরের নিয়ত ও ব্যক্তির বর্ণনার উপর নির্ভর করে এ সম্পর্কে কোন ফয়সালা

দিতেন না। কাজেই আইন করে দেওয়া হলো যে, এখন থেকে যে ব্যক্তি একসঙ্গে তিন তালাক দেবে, তাহলে তা তিন তালাক রূপেই গণ্য হবে। সে যদি শপথ গ্রহণ করে থাকে যে, আমার নিয়ত ছিল এক তালাক, তবুও তার এ শপথ গ্রহণযোগ্য হবে না। হযরত ফারূকে-আযম (রা) উক্ত বিষয় সম্পর্কে যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন, সেগুলোও এ কথারই সাক্ষ্য দেয়। তিনি বলেছেন ঃ

ان الناس قد استعجلوا فى امر كانت لهم فيه اناة فلو امضينا عليهم ·

অর্থাৎ—"এমন এক ব্যাপারে মানুষ তাড়াহুড়া করতে আরম্ভ করেছে, যাতে তাদের জন্য সময় ও সুযোগ ছিল। সুতরাং তাদের উপর তা কার্যকর করাই শ্রেয়।"

একসঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাক তিন তালাকরূপেই গণ্য হবে; এক তালাক নয়। হযরত উমর ফারূক (রা) কর্তৃক জারিকৃত এ ফরমান এবং তৎপ্রতি সাহাবীগণের ঐকমত্য সম্পর্কিত যে ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, এর সমর্থন হাদীসের বর্ণনা থেকেও পাওয়া যায়। এতদসঙ্গে সে প্রশ্নটিরও মীমাংসা হয়ে যায় যে, হাদীসের বর্ণনায় যেখানে খোদ হুযূর (সা) কর্তৃক একসাথে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাকরূপেই গণ্য করে তা কার্যকর করার একাধিক ঘটনা প্রমাণিত রয়েছে, সেখানে হযরত ইবনে আব্বাসের এ বর্ণনা যে রসূল (সা)-এর যমানায় একত্রে প্রদত্ত তিন তালাককেও এক তালাকরূপেই গণ্য করা হতো কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে ?

এ প্রশ্নের মীমাংসা এই যে, রাসূল (সা)-এর যমানায় 'তিন' শব্দের দ্বারা তিন তালাকের নিয়তে একসঙ্গে যেসব তালাক দেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে তিন তালাকই গণ্য করা হতো। অপর পক্ষে তিন তিনবার বলার পরও এক তালাক গণ্য হতো শুধুমাত্র সে সমস্ত ঘটনায়, যেগুলোতে তিন তালাকই দেওয়া হয়েছে এরূপ কোন স্বীকারোক্তি পাওয়া যেতো না, বরং এক তালাকের নিয়তেই তাকীদের জন্য 'তালাক' শব্দটি তিনবার উচ্চারণের দাবি করা হতো।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায় যে, একসঙ্গে তিন তালাক উচ্চারণ করার একাধিক ঘটনায় রাসূল (সা) কর্তৃক এক তালাক গণ্য করার পরও হযরত উমর (রা) তাঁর ব্যতিক্রমী বিধান কিসের ভিত্তিতে জারি করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামই বা সে বিধান কেন মেনে নিয়েছিলেন ? বলা বাহুল্য, এমতাবস্থায় হযরত উমর ফারূক (রা) রাসূল (সা) কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগের অপব্যবহার রোধ করারই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন মাত্র, কোন অবস্থাতেই আল্লাহর রাসূল (সা) কর্তৃক নির্ধারিত বিধানের বিরুদ্ধাচরণ তিনি করেন নি। বস্তুত এরূপ চিন্তাও করা যায় না।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ
اللّٰهِ هُزُوًا ز وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ
الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٣١﴾ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا
تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ
يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٢﴾

(২৩১) আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, অতঃপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও অথবা সহানুভূতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। আর যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আর আল্লাহ্র নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করো না। আল্লাহ্র সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের উপর রয়েছে এবং তাও স্মরণ কর, যে কিতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে যার দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়। আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়েই জ্ঞানময়। (২৩২) আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান করো না। এ উপদেশ তাকেই দেওয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। আর আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিবে আর সে ইদ্দত অতিক্রম করার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে, তখন তোমরা তাকে নিয়মানুযায়ী (প্রত্যাহার করে) বিয়ে অবস্থায় থাকতে দাও অথবা নিয়মানুযায়ী তাকে বিদায় করে দাও। আর তাকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। এমন উদ্দেশ্য (করো না) যে, তার প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার করবে। আর যে ব্যক্তি এমন করবে, সে বাস্তবে নিজেরই ক্ষতি সাধন করবে। আর আল্লাহ্‌র বিধানকে খেলায় পরিণত করো না। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তা স্মরণ কর এবং বিশেষ করে কিতাব ও হেকমতের বিষয়গুলো যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি (এই উদ্দেশ্যে) নাযিল করেছেন যে, তদ্দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করবেন। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত ভালভাবে অবগত। তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতের সময় অতিক্রান্ত করে ফেলে, তখন তোমরা তাদেরকে তাদের (নির্বাচিত) স্বামী গ্রহণের ব্যাপারে বাধা দেবে না, যখন তারা নিয়মানুযায়ী পরস্পর রাজি হয়। এ ব্যাপারে যারা তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ এবং কিয়ামতে বিশ্বাস করে, এ উপদেশ গ্রহণ করা তাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্রতা ও অত্যন্ত মঙ্গলজনক এবং আল্লাহ্ তা'আলা (তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল) ভালভাবে জানেন অথচ তোমরা তা জান না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইতিপূর্বেও দু'তালাক সংক্রান্ত আইন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ইসলামে তালাকের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থাসমূহ কোরআনের দার্শনিক বর্ণনা সহকারে বিবৃত হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে আরো কিছু বিষয় এবং তার আহ্‌কাম বর্ণিত হয়েছে।

তালাকের পর তা প্রত্যাহার ও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা ঃ প্রথম আয়াতে বর্ণিত প্রথম মাস'আলাটি হচ্ছে এই যে, যখন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক তার ইদ্দত অতিক্রম করার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছে, তখন স্বামীর দু'টি অধিকার থাকে। একটি হচ্ছে তালাক প্রত্যাহার করে তাকে স্বীয় বিবাহেই রেখে দেওয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে তালাক প্রত্যাহার না করে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা।

এ দু'টি অধিকার সম্পর্কে কোরআন শর্ত আরোপ করেছে যে, রাখতে হলে কিংবা ছিন্ন করতে হলে নিয়মানুযায়ী করতে হবে। এতে بالمعروف শব্দটি দু'জায়গায়ই পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রত্যাহারের জন্যও কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন রয়েছে এবং ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারেও কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন বর্তমান। উভয় অবস্থায় যেটাই গ্রহণ করা হোক, শরীয়তের নিয়মানুযায়ী করতে হবে। শুধু সাময়িক খেয়াল-খুশি বা আবেগের তাকীদে কোন কিছু করা চলবে না। উভয় দিক সম্পর্কেই শরীয়তের কিছু বিধান কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। আর তারই বিশ্লেষণ করেছেন মহানবী (সা) তাঁর হাদীসে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তালাক দেওয়ার পর এই বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহ অবস্থা ও পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে যদি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিয়েতে বহাল রাখার

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে এ জন্য শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে মনোমালিন্যকে অন্তর থেকে দূর করে সুন্দর ও সুখী জীবন যাপন এবং পরস্পর অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে আদায় করার মানসে করতে হবে, স্ত্রীকে যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তা করা চলবে না। এজন্য আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلاَ تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا—অর্থাৎ স্ত্রীকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্বীয় বিবাহ্ বন্ধনে আটকে রেখো না।

দ্বিতীয় নিয়মটি সূরা তালাকে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَاَشْهِدُوْا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ অর্থাৎ পরস্পরের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে নাও, যাতে সাক্ষীর প্রয়োজন হলে যথাযথভাবে আল্লাহ্র ওয়াস্তে কোন রকম পক্ষপাতিত্ব না করে সাক্ষ্যদান করে। অর্থাৎ যখন 'রাজ'আত' বা প্রত্যাহারের ইচ্ছা কর, তখন দু'জন নির্ভরযোগ্য মুসলমানকে সাক্ষী রাখ। এতে কয়েকটি উপকারিতা রয়েছে—এক হচ্ছে এই যে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে যদি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে কোন দাবি থাকে, তবে সে সাক্ষীর দ্বারা তা নিষ্পত্তি করা যাবে।

দ্বিতীয়ত, নিজের উপরও মানুষের নির্ভর করা উচিত নয়। যদি প্রত্যাহার প্রক্রিয়ায় সাক্ষী নিযুক্ত করা না হয়, তবে এমনও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরেও শয়তানী উদ্দেশ্যে দাবি করতে পারে যে, আমি ইদ্দতের মধ্যেই তালাক প্রত্যাহার করে নিয়েছিলাম।

এসব দুষ্কর্মের প্রতিরোধকল্পেই কোরআন এ নিয়ম প্রবর্তন করেছে যে, প্রত্যাহারের জন্যও দু'জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী নিযুক্ত করতে হবে।

বিষয়টির দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার সময় দেওয়া এবং চিন্তা-ভাবনার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি অন্তরের কালিমা দূর না হয় এবং সম্পর্ক ছিন্ন করাই স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে এতে মনের ক্রোধ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের অভিপ্রায় সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থেকে যায়। ফলে ব্যাপারটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সীমিত না থেকে দু'টি পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে উভয় পক্ষের দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ করে দিতে পারে। কাজেই সে আশংকার পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কোরআন সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়েছে ঃ اَوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ছেড়ে দেওয়া বা সম্পর্ক ছিন্ন করাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তবে তাও নিয়মানুযায়ী করতে হবে। এ নিয়মের কিছু বর্ণনা কোরআন মজীদে রয়েছে এবং অবশিষ্ট বিশদ বিবরণ হাদীসের মাধ্যমে রাসূল (সা) দিয়ে গেছেন।

যেমন, এর পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا শরীয়ত বিষয়ক অসুবিধা ছাড়া তালাকের বিনিময়ে স্ত্রীর কাছ থেকে নিজের দেয়া মাল-সামান কিংবা মোহরানা ফেরত নিও না কিংবা অন্য কোন বিনিময় দাবি করো না।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ। অর্থাৎ—"সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য কিছু উপকার করা নিয়মানুযায়ী স্থির করা

হয়েছে যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাদের উপর।" এ উপকারের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, বিদায়কালে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু উপহার-উপঢৌকন, নগদ কিছু অর্থ অথবা ন্যূনপক্ষে একজোড়া কাপড় প্রদান করা এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর অধিকার যা তালাকদাতা স্বামীর উপর ওয়াজিব বা অবশ্য করণীয় হিসাবে রয়েছে এবং কিছু সহানুভূতি ও অনুগ্রহ হিসাবে আরোপ করা হয়েছে, যা বলিষ্ঠ চরিত্র এবং সুসভ্য সামাজিকতারই পবিত্র শিক্ষা। আর এতে এ হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, যেমনিভাবে বিয়ে একটি পারিবারিক চুক্তি, অনুরূপভাবে তালাকও একটি সম্পর্কের সমাপ্তি। এই সম্পর্কছেদকে শত্রুতা ও ঝগড়া-বিবাদের উৎসে পরিণত করার কোন প্রয়োজনই নেই। সম্পর্কছেদও ভদ্রোচিত উপায়ে হওয়া উচিত, যাতে তালাকের পর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর কিছু উপকার হতে পারে।

এই উপকারিতার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইদ্দতের দিনগুলোতে স্ত্রীকে নিজ বাড়িতে রেখে তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হবে এবং তখনও স্ত্রীর মোহর আদায় করা না হয়ে থাকলে এবং তার সাথে সহবাস করা হয়ে থাকলে তাকে পূর্ণ মোহর দিয়ে দিতে হবে। আর যদি সে স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে থাকে এবং এরই মধ্যে তালাক দেওয়ার উপক্রম হয়ে থাকে, তবে তাকে অর্ধেক মোহর দিয়ে দিতে হবে। এটা স্বামীর উপর ওয়াজিব। তা আদায় করতেই হবে। আর বিদায়কালে সহানুভূতিস্বরূপ তাকে কিছু নগদ টাকা অথবা ন্যূনতম পক্ষে এক জোড়া কাপড় দিয়ে দেওয়া বলিষ্ঠ মানসিকতার পরিচায়ক। সুবহানাল্লাহ্। কত উত্তম ও পবিত্রতম শিক্ষা! যে বিষয়টি সাধারণভাবে দু'টি পরিবারের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ ও দু'টি পরিবারের ধ্বংসের কারণ হতে যাচ্ছিল, এভাবে সেটিকে স্থায়ী ভালবাসা ও বন্ধুত্বে পরিণত করা হয়েছে।

এসব নির্দেশের পর ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ অর্থাৎ—'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ প্রদত্ত এই সীমারেখা লংঘন করবে, সে যেন প্রকৃতপক্ষে নিজেরই ক্ষতিসাধন করল। বলা বাহুল্য, পরকালে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রতিটি অন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচার হবে। অত্যাচারিতের পক্ষে অত্যাচারীর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাকে ছাড়া হবে না।

এ পৃথিবীতেও চিন্তা করলে দেখা যায়, কোন অত্যাচারী ব্যক্তি কারো প্রতি অত্যাচার করে সাময়িকভাবে আত্মতুষ্টি লাভ করে বটে, কিন্তু তার অশুভ পরিণতিতে তাকে অধিকাংশ সময় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়। সে অনুধাবন করুক বা নাই করুক, অনেক সময় এমন বিপদে পতিত হয় যে, অত্যাচারের ফলাফল দুনিয়াতেই তাকে কিছু-না-কিছু ভোগ করতে হয়।

پنداشت ستمگیر که جفا بر ما کرد

بر گردن وے بماند وبر ما بگزشت

কোরআনে-হাকীমের নিজস্ব একটা দার্শনিক বর্ণনাভঙ্গি রয়েছে। দুনিয়ার আইন-কানুন ও শাস্তির বর্ণনার ন্যায় কোরআন শুধু আইন-কানুন ও শাস্তির কথাই বর্ণনা করে না বরং একান্ত গুরুগম্ভীরভাবে তার বিধি-বিধানের দার্শনিক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং তার বিরোধিতার দরুন মানুষের যে অকল্যাণ হতে পারে, তার এমন ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়, যা দেখে যে লোক

মানবতার আবরণ সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলেনি সে কখনো এসবের দিকে অগ্রসরই হতে পারে না। কেননা, প্রত্যেকটি আইন-কানুনের সঙ্গে আল্লাহ্‌র ভয় ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

বিয়ে ও তালাককে খেলায় পরিণত করো না : দ্বিতীয় মাস'আলা হচ্ছে এই—এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আয়াতকে খেলায় পরিণত করো না।

وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا—খেলায় পরিণত করার একটি তফসীর হচ্ছে এই যে, বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যে সীমারেখা ও শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করা। আর দ্বিতীয় তফসীর হযরত আবুদ্‌দারদা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহিলিয়ত যুগে কোন কোন লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বা বাঁদীকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বলতো যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দেওয়া বা মুক্তি দিয়ে দেওয়ার কোন উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়। এতে ফয়সালা দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাককে যদি কেউ খেলা বা তামাশা হিসেবেও সম্পাদন করে, তবুও তা কার্যকরী হয়ে যাবে। এতে নিয়তের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন—তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যে, তা হাসি-তামাশার মাধ্যমে করা এবং বাস্তবে করা দুই-ই সমান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তালাক, দ্বিতীয়টি দাসমুক্তি এবং তৃতীয়টি বিয়ে। হাদীসটি ইবনে মার্দুবিয়্যাহ্ উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আব্বাস (রা) থেকে, আর ইবনুল-মুনযির বর্ণনা করেছেন ওবাদাহ ইবনে সামেত (রা) থেকে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এই হাদীসটি নিম্নরূপ :

ثلث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة .

অর্থাৎ—তিনটি বিষয় রয়েছে, যেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে বলা আর হাসি-তামাশাচ্ছলে বলা একই সমান। (এক) বিবাহ, (দুই) তালাক, (তিন) রাজ'আত বা তালাক প্রত্যাহার।

এ তিনটি বিষয়ে শরীয়তের আদেশ হচ্ছে এই যে, যদি দু'জন (স্ত্রী ও পুরুষ) বিয়ের ইচ্ছা ব্যতীতও সাক্ষীর সামনে হাসতে হাসতে বিয়ের ইজাব ও কবূল করে নেয়, তবুও বিবাহ হয়ে যাবে। তেমনি তালাক প্রত্যাহার এবং দাসকে মুক্তিদানের ব্যাপারেও শরীয়তের এই বিধান। এসব ক্ষেত্রে হাসি-তামাশা কোন ওজররূপে গণ্য হবে না।

এ আদেশ বর্ণনা করার পর কোরআনে করীম নিজস্ব ভঙ্গিতে মানুষকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও পরকালের ভয় প্রদর্শন করার পর উপদেশ দিয়েছে :

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ . وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

অর্থাৎ—"স্মরণ কর আল্লাহ্ তা'আলার সেই নিয়ামতের কথা, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন এবং বিশেষভাবে স্মরণ কর সেই নিয়ামত, যা কিতাব ও হেকমতরূপে তোমাদেরকে দান করেছেন। জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানসম্পন্ন। তিনি

তোমাদের নিয়ত, ইচ্ছা এবং অন্তর্নিহিত গোপন তথ্য সম্পর্কেও সবিশেষ অবগত।" সুতরাং স্ত্রীকে যদি তালাক দিয়ে বিদায়ই করতে হয়, তবে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ, একে অপরের অধিকার হরণ এবং পারস্পরিক অন্যায়-অত্যাচার থেকে বিরত থাক। প্রতিশোধ গ্রহণ বা স্ত্রীকে অযথা দুর্ভোগের শিকারে পরিণত করার উদ্দেশ্যে এমন কাজ করো না।

তালাকের উত্তম পন্থা ঃ তৃতীয়ত, শরীয়ত বা সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে তালাক দেওয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়, তবে সুস্পষ্ট শব্দে প্রত্যাহারযোগ্য এক তালাক দেবে, যাতে ইদ্দত অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তালাক প্রত্যাহার করার সুযোগ থাকে। এমন শব্দ বলতে নেই, যাতে তৎক্ষণাৎ বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়; যাকে 'বায়েন' তালাক বলা হয়। আর তিন তালাকও দেবে না, যার ফলে উভয়ের মধ্যে পুনর্বিবাহও হারাম হয়ে যায়। طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ শব্দটির নিঃশর্ত উল্লেখই এদিকে ইঙ্গিত করছে। কারণ, এ আয়াতে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা যদিও প্রত্যাহারযোগ্য এক বা দুই তালাক সম্পর্কিত, জায়েয বা তিন তালাক সম্পর্কে নয়, কিন্তু কোরআন কোন শর্ত আরোপ না করে একথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছে যে, তালাকের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হচ্ছে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দেওয়া। তালাকের অন্যান্য উপায় তাঁর পছন্দনীয় নয়।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনর্বিবাহে বাধা দেওয়া হারাম ঃ দ্বিতীয় আয়াতে সেই সমস্ত উৎপীড়নমূলক ব্যবহারের প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা সাধারণত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের সাথে করা হয়। তাদেরকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে বাধা দেওয়া হয়। প্রথম স্বামীও তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়াতে নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা মনে করে। আবার কোন কোন পরিবারে মেয়ের অভিভাবকগণও দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখে। আবার কেউ কেউ এসব মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে কিছু মালামাল হাসিল করার উদ্দেশ্যে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু স্ত্রীলোকের অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজন তালাক দেওয়ার ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতাবশত উভয়ের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাধার সৃষ্টি করে। স্বাধীন স্ত্রীলোককে তার মর্জিমত শরীয়ত বিরোধী কার্য ব্যতীত বিয়ে হতে বাধা দেওয়া একান্তই অন্যায়, তা তার প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকেই হোক অথবা তার অভিভাবকদের পক্ষ থেকেই হোক। এরূপ অন্যায়কেই এ আয়াত দ্বারা প্রতিরোধ করা হয়েছে।

এ আয়াতের শানে-নুযূলও এমনি এক ঘটনা। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) তাঁর বোনকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি তাকে তালাক দেয় এবং পরে কৃতকর্মের দরুন অনুতপ্ত হয়ে তাকে পুনরায় বিয়ে করতে মনস্থ করে এবং তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীও এতে সম্মত হয়। যখন সেই ব্যক্তি এ ব্যাপারে হযরত মা'কালের নিকট প্রস্তাব করে, তখন তিনি যেহেতু তালাক দেওয়াতে তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন তাই উত্তর দেন যে, আমি তোমাকে সম্মান করেই আমার বোনকে তোমার নিকট বিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি সে সম্মানের মূল্য দিয়েছ তাকে তালাক দিয়ে। এখন পুনরায় তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছ, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, সে আর তোমার বিবাহাধীনে

যাবে না।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-এর এক চাচাত বোনের ব্যাপারেও অনুরূপ এক ঘটনা ঘটেছিল। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যাতে মা'কাল ও জাবেরের এ কাজকে অপছন্দ করা হয়েছে এবং একে না-জায়েয বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

সাহাবীগণ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সত্যিকার ভক্ত ছিলেন। এ আয়াত শোনামাত্র মা'কালের সমস্ত ক্রোধ পড়ে যায় এবং তিনি স্বয়ং সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে বোনের পুনর্বিবাহ তারই সাথে দিয়ে দেন। আর কসমের কাফ্ফারাও আদায় করেন। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ও তাই করেন। স্ত্রীকে তালাক প্রদানকারী স্বামী এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের অভিভাবকবৃন্দ—এ উভয় শ্রেণীর প্রতিই কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ঃ

فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ .

অর্থাৎ—তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদিগকে তাদের পছন্দ করা স্বামীর সাথে বিয়ে করা থেকে বিরত রেখ না। তা সে প্রথম স্বামীই হউক না কেন, যে তাকে তালাক দিয়েছে বা অন্য কেউ। কিন্তু শর্ত হচ্ছে ঃ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ তবে এ হুকুম তখন বর্তাবে, যখন উভয়ে শরীয়তের নিয়মানুযায়ী রাজি হবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি উভয়ে রাজি না হয়, তবে কোন এক পক্ষের উপর জোর বা চাপ সৃষ্টি করা বৈধ হবে না। যদি উভয়ে রাজিও হয় আর তা শরীয়তের আইন মোতাবেক না হয়, যথা বিয়ে না করেই পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করতে আরম্ভ করে অথবা তিন তালাকের পর অন্যত্র বিয়ে না করেই যদি পুনর্বিবাহ করতে চায় অথবা ইদ্দতের মধ্যেই অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন সকল মুসলমানের এবং বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকের, যারা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে বাধা দিতে হবে, এমনকি শক্তি প্রয়োগ করতে হলেও তা করতে হবে।

এমনিভাবে কোন মেয়ে যদি স্বীয় অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত পারিবারিক 'কুফু' বা সামঞ্জস্যহীন স্থানে বা বংশের প্রচলিত মোহরের কম মোহরে বিয়ে করতে চায়, যার পরিণাম বা কু-প্রভাব বংশের উপর পতিত হতে পারে, তবে এমন ক্ষেত্রে তারা তাকে বাধা দিতে পারেন। তবে اِذَا تَرَاضَوْا বলে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেওয়া যায় না।

আয়াতের শেষে তিনটি বাক্যের প্রথমটিতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ .

অর্থাৎ—"এ আদেশ সেসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করে।" এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদের জন্য এসব আহকাম যথাযথভাবে পালন করা অবশ্য কর্তব্য। আর যারা এ আদেশ পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করে, তাদের বোঝা উচিত যে, তাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে।

ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ –"এসব হুকুমের আনুগত্য তোমাদের জন্য পবিত্রতার কারণ।"–এতে ইশারা করা হয়েছে যে, এর ব্যতিক্রম করা পাপ-মগ্নতা এবং ফেতনা-ফাসাদের কারণ। কেননা, বয়ঃপ্রাপ্তা বুদ্ধিমতী যুবতী মেয়েকে সাধারণভাবে বিয়ে থেকে বিরত রাখা একদিকে তার প্রতি অত্যাচার, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং অপরদিকে তার সতিত্ব, পবিত্রতা ও মান-ইজ্জতকে আশংকায় ফেলারই নামান্তর। তৃতীয়ত সে যদি এই বাধার ফলে কোন পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার সেই পাপের অংশীদার তারাও হবে, যারা তাকে বিয়ে থেকে বিরত রেখেছে। আর এই দুষ্কর্মের পরিণতি পরকালের শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার আগেই হয়তো বাধাদানকারীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও খুনাখুনির আকারে পতিত হতে পারে। দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহই এর প্রমাণ। অনুরূপ যদি বিয়ে করতে বাধাদান করা হয় অথবা তার পছন্দ ব্যতীত তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধ্য করা সাধারণভাবে করা হয়, তবে এর পরিণামও স্থায়ী শত্রুতা , ফেতনা-ফাসাদ বা তালাকের পথ উন্মুক্ত করবে। আর এসবের অশুভ পরিণতি সবার জানা। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, তার পছন্দসই ব্যক্তির সাথে বিয়ে করা থেকে তাকে বিরত না করাই তোমাদের জন্য পবিত্রতার বাহক ও কল্যাণকর।

তৃতীয় বাক্যে বলা হচ্ছে ঃ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ অর্থাৎ—"তোমাদের ভালমন্দ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন, তোমরা জান না।" এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যারা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোককে বিয়ে হতে বিরত রাখে তারা নিজেদের ধারণা মতে এতে কিছু উপকারিতা ও কল্যাণ অনুভব করে। যেমন, স্বীয় ইজ্জত-সম্মান, মান-অভিমান অথবা কিছু আর্থিক সুবিধা, এসব শয়তানী ধারণা ও অপাত্রে সুবিধার সন্ধান বন্ধ করার জন্যই ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ভালমন্দ সম্পর্কে জানেন, কিন্তু তোমরা তা জান না। কাজেই যে নির্দেশ তিনি দেন, তা সেদিক লক্ষ্য রেখেই দেন। আর যেহেতু তোমরা কর্মের তাৎপর্য এবং পরিণাম সম্পর্কে অবগত নও, তাই তোমরা নিজেদের সম্পূর্ণ ধ্যান-ধারণা দ্বারা এমন সব বিষয়েও নিজের উপকার চিন্তা কর, যাতে তোমাদের জন্য সমূহ বিপদ ও ধ্বংসের কারণ রয়েছে। তোমরা যে মান-ইজ্জত রক্ষা করতে চাও, যদি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক আত্মসংযম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তবে সমস্ত মান-ইজ্জত মাটিতে মিশে যাবে। আর অবৈধ পন্থায় অর্থ হাসিল করার যে ধারণা পোষণ কর এতে এমনও হতে পারে যে, তোমরা এমন ফাসাদে জড়িয়ে পড়বে যাতে অর্থের বদলে জানও যেতে পারে।

আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে কোরআনের অনুপম দার্শনিক নীতি ঃ কোরআন করীম এখানে একটি বিধান উপস্থাপন করেছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছামত বিয়ে করতে বাধা দেওয়া অন্যায়। এ বিধান স্থির করার পর তার বাস্তবায়নকে সহজ করার জন্য এর প্রতি সাধারণ মানুষের মন-মস্তিষ্ককে তৈরি করার উদ্দেশ্যে তিনটি বাক্য উল্লেখ করেছে। প্রথম বাক্যে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং পরকালের শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষকে সেই বিধান বাস্তবায়নের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে এ আইন অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে এ আইনের আনুগত্যের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তৃতীয় বাক্যে বলে দিয়েছে যে, এই আনুগত্যের মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। এর বিরুদ্ধাচরণের মাঝে কোন কল্যাণ

আছে বলে যদিও তোমরা কখনও ধারণা কর, কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং পরিণতি সম্পর্কে তোমাদের অজ্ঞতারই ফল।

কোরআন করীমের এহেন বর্ণনারীতি শুধু এ ক্ষেত্রেই নয়, বরং যাবতীয় বিধান বর্ণনাতেই রয়েছে। একটি বিধান বর্ণনা করার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। প্রত্যেক আইনের বর্ণনার আগে পরে ঃ

اِتَّقُوا اللّٰهَ. اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

ইত্যাদি বাক্য যোগ করা হয়। কোরআন সমগ্র বিশ্ব এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব গোষ্ঠীর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায় ও স্তরের জন্য ব্যাপক একটি আইনগ্রন্থ। এতে শাস্তি-সাজার বর্ণনাও রয়েছে, কিন্তু তার বর্ণনাভঙ্গি সমগ্র বিশ্বের আইনগ্রন্থ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর বর্ণনারীতি যতটা শাসকসুলভ তার চাইতে বেশি অভিভাবকসুলভ। এতে প্রতিটি বিধান বর্ণনার সাথে সাথে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যাতে এই বিধানের লংঘন কিংবা বিরুদ্ধাচরণ করে কেউ শাস্তিযোগ্য না হয়। আল্লাহ্র বিধান কোন অবস্থাতেই পার্থিব সরকারসমূহের মত নয় যে, একটি বিধান তৈরি করে তা প্রচার করেই ছেড়ে দিয়েছে। বস্তুত এহেন বিধানের অমান্যকারীকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

তাছাড়া কোরআনের এই স্বতন্ত্র বর্ণনারীতির ধারা এবং বিশেষ বর্ণনারীতির সুদূরপ্রসারী উপকারিতা হচ্ছে এই যে, একে দেখে মানুষ শুধু এজন্যই এর বিধানের অনুসরণ করে না যে, এর বিরুদ্ধাচরণ বা একে অমান্য করলে দুনিয়াতেই তাকে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে, বরং তখন তার মনে দুনিয়ার শাস্তির চাইতে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি ও পরকালের শাস্তির চিন্তাই প্রবল হয়ে ওঠে। আর সে চিন্তার কারণেই তার ভিতর ও বাহির এবং গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুকে সমান করে দেখে। তখন সে এমন কোন স্থানেও এ বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না, যেখানে কোন প্রকাশ্য কিংবা গুপ্ত পুলিশেরও পৌঁছা সম্ভব নয়। কারণ, তার বিশ্বাস রয়েছে যে, মহান পরওয়ারদেগার সর্বত্রই বিদ্যমান। তিনি সবকিছু দেখেন এবং প্রতিটি বিন্দু-বিসর্গ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। এ কারণেই কোরআনী শিক্ষা যে সামাজিক মূলনীতি নির্ধারণ করেছে, প্রতিটি মুসলমান তার অনুসরণ করাকে জীবনের সর্ববৃহৎ উদ্দেশ্য বলে মনে করেন।

কোরআনী রাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্যও তা-ই। এতে একদিকে থাকে আইনের সীমারেখার বর্ণনা, অপরদিকে ভীতি-প্রদর্শন ও অনুপ্রেরণা। এতে করে মানব চরিত্রকে এমন উচ্চস্তরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় যে, তখন এ আইনের সীমারেখা বা গণ্ডির মধ্যে থাকাই তার স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। ফলে সে তার যাবতীয় আবেগ-অনুরাগ ও রিপুজনিত কামনা-বাসনা পরিহার করতে বাধ্য হয়। পৃথিবীর রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তাতে উল্লিখিত অপরাধ ও শাস্তির ঘটনাবলীর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, শুধু বিধান প্রবর্তন করেই কখনও কোন জাতি কিংবা ব্যক্তির সংশোধন সম্ভব হয়নি। পুলিশ ও সৈন্যের দ্বারা কখনও অপরাধ দমন করা যায়নি, যতক্ষণ না আইনের সাথে সাথে আল্লাহ্র ভয় ও মাহাত্ম্যের ছাপ মানুষের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। অপরাধ থেকে বিরত রাখার জন্য প্রকৃত প্রেরণা হচ্ছে আল্লাহ্র

ভয় ও পরকালীন হিসাব-নিকাশের চিন্তা! তা না হলে অপরাধ থেকে কেউ কাউকে বিরত রাখতে পারে না।

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْۤا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (২৩৩)

(২৩৩) আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ পিতার উপর হলো সে সমস্ত নারীর খোরপোশের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী। কাউকে তার সামর্থ্যাতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না। আর মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং যার সন্তান তাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না। আর ওয়ারিসদের উপরও দায়িত্ব এই। তারপর যদি পিতা-মাতা ইচ্ছা করে, তাহলে দু'বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে তাদের কোন গোনাহ নেই, আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোন গোনাহ নেই। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ অত্যন্ত ভাল করেই দেখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মায়েরা নিজের সন্তানদিগকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্যদান করবে। (এ সময়টি তার জন্য) যে স্তন্যদানের সময় পূর্ণ করতে চায়। আর সন্তান যার, তার দায়িত্ব রয়েছে সেই মাতার ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ (ইত্যাদি), প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এবং কোন ব্যক্তিকে কোন আদেশ

দেওয়া হয় না, কিন্তু তার ক্ষমতানুযায়ী, কোন মাতাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না তার বাচ্চার জন্য। (যদি পিতা জীবিত না থাকে) বর্ণিত পন্থানুযায়ী (তাহলে বাচ্চার লালন-পালনের ব্যবস্থা) তার নিকটবর্তী আত্মীয়ের দায়িত্ব। (শরীয়তানুযায়ী যে ব্যক্তি বাচ্চার উত্তরাধিকারী হয়। অতঃপর বুঝে নাও যে,) যদি পিতা-মাতা দু'বছর পূর্ণ হবার আগেই বাচ্চার দুগ্ধপান বন্ধ করতে চায় পরস্পর সন্তুষ্টি ও পরামর্শক্রমে, তবে তাতেও তাদের কোন গোনাহ হবে না। আর যদি তোমরা (মাতা-পিতা থাকা সত্ত্বেও কোন উপকারের জন্য যেমন, মায়ের দুধ যদি এমন হয় যে, এতে বাচ্চার ক্ষতি হয় তবে) বাচ্চাকে অন্য কোন ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন গোনাহ হবে না। যদি তাকে সে ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে দিতে চাও, তাকে যা দেওয়ার চুক্তি হবে তা নিয়মানুযায়ী দিতে হবে। বস্তুত আল্লাহ্কে ভয় কর এবং স্মরণ রেখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাজকর্মের সব খবরই রাখেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে স্তন্যদান সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতে তালাক সংক্রান্ত আদেশাবলীর আলোচনা হয়েছে। এরই মধ্যে শিশুকে স্তন্যদান সংক্রান্ত আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যে, সাধারণত তালাকের পরে শিশুর লালন-পালন ও দুধপান নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। কাজেই এ আয়াতে এমন ন্যায়সঙ্গত নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে যা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। বিয়ে বহাল থাকাকালে স্তন্যদান বা দুধ ছাড়ানোর বিষয় উপস্থিত হোক অথবা তালাক দেওয়ার পর, উভয় অবস্থাতেই এমন এক ব্যবস্থা বাতলে দেওয়া হয়েছে, যাতে কোন ঝগড়া-বিবাদ বা কোন পক্ষের উপরই অন্যায় ও জুলুম হওয়ার পথ না থাকে। আয়াতের প্রথম বাক্যে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ .

অর্থাৎ—মাতাগণ নিজেদের বাচ্চাদেরকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্যপান করাবে যদি কোন বিশেষ অসুবিধা এ সময়ের পূর্বে স্তন্যদানে বিরত থাকতে বাধ্য না করে।

এ আয়াত দ্বারা স্তন্যদানের সব কয়টি মাস'আলা বোঝা গেল।

শিশুদের স্তন্যদান মায়ের উপর ওয়াজিব ঃ প্রথমত এই যে, শিশুকে স্তন্যদান মাতার উপর ওয়াজিব। কোন অসুবিধা ব্যতীত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা অসন্তুষ্টির দরুন স্তন্যদান বন্ধ করলে গোনাহ্ হবে এবং স্তন্যদানের জন্য স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে কোন প্রকার বেতন বা বিনিময় নিতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন বিদ্যমান থাকে। কেননা, এটা স্ত্রীরই দায়িত্ব।

দ্বিতীয়ত, পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, স্তন্যদানের পূর্ণ সময় দু'বছর। যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয়, তবে তা বাচ্চার অধিকার।

এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, স্তন্যদানের সময়সীমা দু'বছর ঠিক করা হয়েছে। এরপর মাতৃস্তনের দুধ পান করানো চলবে না। তবে কোরআনের কোন কোন আয়াত এবং হাদীসের আলোকে ইমাম আবূ হানীফা (র) শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ত্রিশ মাস বা আড়াই বছর পর্যন্ত এ

সময়সীমাকে বর্ধিত করেছেন। আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিশুকে মাতৃস্তন্যের দুধপান করানো সকলের ঐকমত্যে হারাম।

এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ . لاَتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا .

অর্থাৎ—"নিয়মানুযায়ী মাতার খাওয়া-পরা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সন্তানের পিতার দায়িত্ব। কাকেও সামর্থ্যের উর্ধ্বে কোন আদেশ দেওয়া হয় না।"

এতে প্রথমত লক্ষণীয় এই যে, মাতাগণের উদ্দেশ্যে কোরআন-মজীদে والدات শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, পিতার জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ والد কে বাদ দিয়ে المولود له ব্যবহার করা হয়েছে অথচ কোরআনের অন্যত্র والد শব্দের ব্যবহারও রয়েছে। যেমন لاَ يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ অবশ্য এক্ষেত্রে والد এর পরিবর্তে مَوْلُوْدٌ لَّهٗ ব্যবহার করার একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, সমগ্র কোরআনেরই এক বিশেষ বর্ণনাভঙ্গি রয়েছে যে, কোরআন কোন বিধানকে দুনিয়ার আইনের বর্ণনা পদ্ধতি অনুযায়ী বিবৃত করে না; বরং অভিভাবকসুলভ সহানুভূতির ভঙ্গিতে এমনভাবে বর্ণনা করে, যাকে গ্রহণ করা এবং সেমতে কাজ করা মানুষের পক্ষে সহজ হবে।

এখানেও বাচ্চার খোরাক পিতার দায়িত্বে রাখা হয়েছে, অথচ সে পিতা-মাতার যৌথ সম্পদ। এতে পিতার পক্ষে এ আদেশকে বোঝা মনে না করা সম্ভব ছিল। তাই والد শব্দের স্থলে مولود له শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই শিশু যার জাত। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শিশুর লালন-পালন পিতা-মাতা উভয়েরই দায়িত্ব, কিন্তু শিশু পিতার বলেই অভিহিত হয়ে থাকে, পিতার বংশেই শিশুর বংশ পরিচয় হয়ে থাকে। যেহেতু শিশু পিতার, সুতরাং খরচের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করা মানুষের পক্ষে সহজ হবে।

শিশুকে স্তন্যদান মাতার দায়িত্ব আর মাতার ভরণ-পোষণ পিতার দায়িত্ব ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, শিশুকে স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্ব; আর মাতার ভরণ-পোষণ ও জীবন ধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর মাতা স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা তালাক-পরবর্তী ইদ্দতের মধ্যে থাকে। তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসাবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু শিশুকে স্তন্যদানের পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে।-(মাযহারী)

স্ত্রীর খরচ স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী হবে, না স্ত্রীর মর্যাদা অনুসারে হবে ঃ শিশুর পিতা-মাতা উভয়ই যদি ধনী হয়, তবে ভরণ-পোষণও ধনী ব্যক্তিদের মত হওয়া ওয়াজিব। আর দু'জনই গরীব হলে গরীবের মতই ভরণ-পোষণ দিতে হবে। দু'জনের আর্থিক অবস্থা যদি ভিন্ন ধরনের হয়, তবে এক্ষেত্রে ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। হেদায়া প্রণেতা বলেছেন, যদি স্বামী ধনী হয় এবং স্ত্রী দরিদ্র হয়, তবে এমন মানের খোরপোশ দিতে হবে, যা দরিদ্রদের চাইতে বেশি এবং ধনীদের চাইতে কম।

ইমাম কারখী বলেছেন যে, স্বামীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোরপোশ নির্ধারণ করতে হবে। ফতহুল-কাদীরে এ মতের সমর্থনে বহু ফকীহ্‌র ফতোয়া উদ্ধৃত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে স্তন্যদান সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনার পর ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُوْدٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ‌.

অর্থাৎ—"কোন মাতাকে তার শিশুর জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না। আর কোন পিতাকেও এর জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না।" অর্থাৎ শিশুর পিতা-মাতা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করবে না। যেমন, মাতা যদি স্তন্যদান করতে অপারক হয়, আর যদি পিতা মনে করে, যেহেতু শিশু তারও বটে, কাজেই তার উপর চাপ সৃষ্টি করা চলে। কিন্তু না, অপারক অবস্থায় মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা যাবে না। অথবা পিতা দরিদ্র এবং মাতার কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্তন্যদানে অস্বীকার করে যে, শিশু যেহেতু পিতার, কাজেই অন্য কারো দ্বারা দুধ পান করানোর ব্যবস্থা করা হোক, এমন মানসিকতা প্রদর্শন করাও সঙ্গত হবে না।

মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা না করার বিবরণ ঃ পঞ্চম মাস'আলা وَلاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا এতে বোঝা যায় যে, মা যদি কোন অসুবিধার কারণে শিশুকে স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে শিশুর পিতা তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য শিশু যদি অন্য কোন স্ত্রীলোকের বা কোন জীবের দুধ পান না করে, তবে মাতাকে বাধ্য করা চলে।

বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকা পর্যন্ত হুকুম ঃ ষষ্ঠ মাস'আলা মাতা শিশুকে স্তন্যদানের জন্য বিবাহ-বন্ধন বহাল থাকাকালে এবং তালাক-পরবর্তী ইদ্দতের সময়ে কোন পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবে না। এক্ষেত্রে তার খোরপোশ যা শিশুর পিতা স্বাভাবিকভাবে বহন করে তা-ই যথেষ্ট; অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দাবি করা পিতাকে কষ্ট দেওয়া বৈ কিছু নয়। আর তালাকের ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবার পরেও যদি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী শিশুকে স্তন্যদান করতে থাকে, তবে সে এজন্য শিশুর পিতার কাছে পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে এবং পিতাকে তা দিতে বাধ্য করা হবে। কেননা, এ দায়িত্ব বহন না করায় মায়ের ক্ষতি হয়। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, এ পারিশ্রমিক অন্যান্য স্ত্রীলোক সাধারণত যা পেয়ে থাকে, তা-ই পাবে। যদি এর চাইতে বেশি দাবি করে, তবে পিতা অন্য ধাত্রী দ্বারা দুধ পান করানোর কাজ সমাধা করার অধিকারী হবে।

এতীম শিশুদের দুধ পান করানোর দায়িত্ব কার ? ইরশাদ হয়েছে ঃ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ–অর্থাৎ যদি শিশুর পিতা জীবিত না থাকে তখন যে ব্যক্তি শিশুর প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তিনি তার দুধ পান করানোর দায়িত্ব বহন করবেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পিতৃহীন শিশুর সঠিক উত্তরাধিকারী, তিনিই দুগ্ধ, ধাত্রীমাতা বা ধাত্রীদের খোরপোশ বা পারিশ্রমিকের দায়িত্ব নেবেন। এমন উত্তরাধিকারী যদি একাধিক থাকে, তবে প্রত্যেকে তার মীরাসের অংশের অনুপাতে খরচ বহন করবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন যে, এতীম শিশুর দুধ পানের ব্যয় বহনের দায়িত্ব উত্তরাধিকারীদের উপর অর্পণ করাতে একথাও বোঝা গেল যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের ব্যয়ভার দুধ পান শেষ হওয়ার পরেও তাদের উপরেই বর্তাবে। কেননা, এখানে দুধের কোন বিশেষত্ব

নেই, উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর ভরণ-পোষণ। যদি এতীম শিশুর মা ও দাদা জীবিত থাকেন, তবে তারাই শিশুর মোহরেম ও উত্তরাধিকারী। অতএব, তার ভরণ-পোষণ মীরাসের অংশের অনুপাতে তাদের উপরই ন্যস্ত হবে। অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ খরচ মাতা এবং দুই-তৃতীয়াংশ খরচ দাদা বহন করবেন। এতে এ কথাও বোঝা গেল যে, এতীম নাতির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দাদার উপর দাদার অন্যান্য সন্তানের চাইতেও বেশি। কেননা, প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ভরণ-পোষণ তার উপর ওয়াজিব নয়। কিন্তু না-বালেগ এতীম নাতির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার উপর ওয়াজিব। তবে সম্পত্তিতে পুত্রদের জীবিত থাকাকালে নাতিকে অংশীদার করা মীরাসের আইনের পরিপন্থী। কারণ নিকটবর্তী সন্তান থাকা অবস্থায় দূরবর্তী সন্তানকে মীরাস দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে যদি প্রয়োজন মনে করেন, তবে দাদা এতীম নাতির জন্য কিছু ওসীয়ত করবেন এবং সে অধিকার তাঁর আছে। এ ওসীয়তের পরিমাণ সন্তানদের অংশ হতে বেশিও হতে পারে। এভাবে এতীম নাতির প্রয়োজনও পূর্ণ করা হবে এবং মীরাস আইন মোতাবেক নিকটতম ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও দূরবর্তীকে অংশ না দেওয়ার বিধানটিও রক্ষা হবে।

স্তন্যদান বন্ধ করার আদেশ ঃ অতঃপর আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِنْ اَرَادَ فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا .

অর্থাৎ—যদি শিশুর পিতা-মাতা পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে স্তন্যপানের সময়সীমার মধ্যেই স্তন্যপান বন্ধ করা সাব্যস্ত করে এবং তা মায়ের কোন অসুবিধার জন্যই হোক বা শিশুর কোন রোগের জন্যই হোক, তাতে কোন পাপ নেই। এখানে 'পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের' শর্ত আরোপ করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, স্তন্যদান বন্ধ করার ব্যাপারটিও সন্তানের মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই হতে হবে, পরস্পরের ঝগড়া-বিবাদের কারণে শিশুর ক্ষতি করা যাবে না।

মা ছাড়া অন্য স্ত্রীলোকের দ্বারা স্তন্যপান করানোর হুকুম ঃ ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ .

অর্থাৎ—যদি তোমরা কোন মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শিশুকে মা ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করাতে চাও, তবে তাতে কোন গোনাহ নেই। তবে এর শর্ত হচ্ছে এই যে, স্তন্যদানকারিণী ধাত্রীর যে পারিশ্রমিক সাব্যস্ত করা হবে তা পুরোপুরিভাবে প্রদান করতে হবে। যদি তাকে নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেওয়া না হয়, তবে সে অপরাধের গোনাহ তার উপর থাকবে।

এতে আরো একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, সে স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিকের কথা পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে ঠিক করে দিতে হবে, যাতে পরে কোন রকম বিবাদ সৃষ্টি না হয় এবং নির্ধারিত সময়ে তার এ পারিশ্রমিকও আদায় করে দিতে হবে। এতে টালবাহানা করা চলবে না।

দুধ পানের ব্যাপারে এসব আহ্কাম বর্ণনা করার পর কোরআনের নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গি অনুযায়ী বিধি-বিধানের উপর আমল করার জন্য এবং সর্বাবস্থায় এর উপর অটল থাকার জন্য আল্লাহ্র ভয় এবং তিনি যে সর্বজ্ঞানের অধিকারী এ ধারণা পেশ করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ .

অর্থাৎ—আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং মনে রেখ, তিনি তোমাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত এবং প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। যদি কেউ দুধ পান বা দুধ ত্যাগের ব্যাপারে আলোচ্য নিয়মের পরিপন্থী কিছু করে অথবা শিশুর মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য না রেখে এ সম্পর্কে মনগড়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তবে সে সাজা ভোগ করবে।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي
أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

(২৩৪) আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সেই স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন গোনাহ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহ্‌র অবগতি রয়েছে। (২৩৫) আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে সে নারীর বিয়ের পয়গাম দাও কিংবা নিজেদের মনে গোপন রাখ, তবে তাতেও তোমাদের কোন গোনাহ নেই, আল্লাহ জানেন যে, তোমরা অবশ্যই সে নারীদের কথা উল্লেখ করবে। কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখ না। অবশ্য শরীয়তের নির্ধারিত প্রথা অনুযায়ী কোন কথা সাব্যস্ত করে নেবে। আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোন ইচ্ছা করো না। আর একথা জেনে রেখ যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহ্‌র তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাক। আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দতের বর্ণনা : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ... وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ আর যারা মারা যায় এবং তাদের স্ত্রীরা জীবিত থাকে, সেসব স্ত্রী (বিয়ে

ইত্যাদি থেকে) বিরত থাকবে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত। অতঃপর নিজেদের (ইদ্দতের) মেয়াদ যখন অতিক্রান্ত করে ফেলবে, তখন এসব কাজ করলে তোমাদের কোন গোনাহ্ হবে না। তবে তা করতে হবে নিয়মানুযায়ী। (যদি কেউ কোন কাজ নিয়মের ব্যতিক্রম করে, আর তোমাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাধা না দাও, তবে তোমরাও সে গোনাহর অংশীদার হবে) এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন। আর সেসব স্ত্রীলোককে (যারা স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত পালন করছে)। ইশারা-ইঙ্গিতে তাদের (বিয়ের) প্রস্তাব করলে তোমাদের কোন গোনাহ্ হবে না। (যেমন—এরূপ বলা হয় যে, আমার একজন নেক স্ত্রীলোকের প্রয়োজন) অথবা নিজ মনে (তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা) গোপনে পোষণ কর (তবুও গোনাহ্ হবে না)। এ অনুমতির কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা একথা জানেন যে, তোমরা এ স্ত্রীলোক সম্পর্কে এ ধরনের আলোচনা করবে পরিষ্কার ভাষায়। কিন্তু তার (বিয়ের আলোচনাই) করবে না যদি না তা নিয়মানুযায়ী হয়। আর যদি তা নিয়মানুযায়ী হয় তাতে কোন দোষ হবে না। (আর নিয়মানুযায়ী অর্থ হচ্ছে ইশারায় বলা) এবং তোমরা (উপস্থিত ক্ষেত্রে) বিবাহ সম্বন্ধের ইচ্ছাও করবে না। যতদিন পর্যন্ত ইদ্দতের নির্ধারিত সময় শেষ না হয়। আর স্মরণ রেখ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরের কথাও জানেন। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় করবে। (এবং অন্তরে লজ্জাকর কাজের ইচ্ছা করবে না) এবং (এও) দৃঢ় বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইদ্দত সংক্রান্ত কিছু হুকুম ঃ (১) স্বামী মারা গেলে ইদ্দতের মধ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করা, সাজসজ্জা করা, সুরমা, তৈল ব্যবহার করা, প্রয়োজন ব্যতীত ঔষধ সেবন করা, অলংকার ব্যবহার করা এবং রঙিন কাপড় পরা জায়েয নয়। বিয়ের জন্য প্রকাশ্য আলোচনা করাও দুরস্ত নয়। যেমন, পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। রাতে অন্য ঘরে থাকাও দুরস্ত নয়। অন্য বিয়ের আলোচনার সঙ্গে যে وغيره শব্দ বলা হয়েছে এই তার অর্থ এবং আদেশও তা-ই। যে স্ত্রীলোক বায়েন তালাকপ্রাপ্তা অর্থাৎ যার তালাক প্রত্যাহারযোগ্য নয়, তাদের ক্ষেত্রে স্বামীগৃহে ইদ্দত পালনকালে দিনের বেলায় অতি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়াও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

(২) চাঁদের শুক্লপক্ষে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, তবে এ মাসটি ত্রিশ দিনেরই হোক অথবা উনত্রিশ দিনের, অবশিষ্ট চাঁদের হিসাবেই ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে। আর যদি শুক্লপক্ষের পরে মৃত্যু হয়, তবে প্রত্যেক ত্রিশ দিনে একমাস ধরে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন হবে। তাতে মোট ১৩০ দিন পূর্ণ হবে। এ মাস'আলা সম্পর্কে অনেকেই অবগত নয়। এ সময় অতিবাহিত হয়ে যখন মৃত্যুর সে সময়টি ঘুরে আসবে তখনই ইদ্দত শেষ হবে। আর যে বলা হয়েছে, যদি স্ত্রীলোক নিয়মানুযায়ী কিছু করে, তবে তাতে তোমাদেরও কোন গোনাহ হবে না, এতে বোঝা গেল যে, যদি কেউ শরীয়ত-বিরোধী কোন কাজ করে, তবে অন্যের উপরও সাধ্যানুযায়ী বাধা দেওয়া ওয়াজিব। তারা যদি বাধা না দেয়, তবে তারাও গোনাহ্গার হবে। আর 'নিয়মানুযায়ী' অর্থ হচ্ছে যে, প্রস্তাবিত বিয়েটি শরীয়তানুযায়ীও শুদ্ধ এবং জায়েয হতে হবে। আর হালাল হওয়ার যাবতীয় শর্ত উপস্থিত থাকতে হবে।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

(২৩৬) স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও তবে তাতেও তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী। যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব। (২৩৭) আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে সে (অর্থাৎ স্বামী) যদি ক্ষমা করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ সেসবই অত্যন্ত ভাল করে দেখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

স্ত্রী গমনের পূর্বে তালাক অনুষ্ঠিত হলে ঃ স্ত্রী গমনের পূর্বে অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীর সাথে একত্রিত হওয়ার পূর্বে। পক্ষান্তরে স্ত্রী সহবাসের সুযোগ আসার পূর্বেই যদি তালাক অনুষ্ঠিত হয়, তবে এর দু'টি দিক রয়েছে। হয় বিয়ের সময় মোহর নির্ধারণ করা হবে না কিংবা মোহর নির্ধারিত হয়ে থাকবে। প্রথম অবস্থাটির বিধান বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ.... حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ .

অর্থাৎ—তোমাদের উপর (মোহরের) কোন প্রশ্ন উঠবে না যদি স্ত্রীকে এমন অবস্থায় তালাক দিয়ে থাক যে, তাকে তুমি স্পর্শ করনি, আর তার জন্য কোন মোহরও ধার্য করনি। (এমতাবস্থায় তোমার উপর মোহরের দায়িত্ব আছে বলে মনে করো না) আর (মাত্র) তাকে

(একটুই) উপকার করা সামর্থ্যশীল ব্যক্তির আর্থিক সচ্ছলতানুযায়ী দায়িত্ব এবং অভাবীর পক্ষেও তার সামর্থ্যানুযায়ী (দায়িত্ব এক বিশেষ প্রকারে উপকার করা) প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ওয়াজিব। উত্তম শিষ্টাচারীদের জন্য। (নির্দেশটি সবার জন্য। আর তার অর্থ হচ্ছে যে, তাকে অন্তত এক জোড়া কাপড় দিয়ে দেবে।)

আর দ্বিতীয় অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে ঃ وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْا...... اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۔

–আর যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও তাদের স্পর্শ করার পূর্বে এবং তাদের জন্য কোন মোহর ধার্য করে থাক, তবে তার অর্ধেক পরিশোধ করা ওয়াজিব। (এবং বাকি অর্ধেক মাফ হয়ে যাবে।) কিন্তু (দু'টি অবস্থা এসব অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র। তার একটি হচ্ছে এই যে,) যদি সেসব স্ত্রীগণ তাদের প্রাপ্য অর্ধেকও মাফ করে দেয়, (তবে এমতাবস্থায় এ অর্ধেকও ওয়াজিব নয়) অথবা (দ্বিতীয় অবস্থাটি হচ্ছে এই যে,) বিয়ে (বহাল রাখা বা ভঙ্গ করার) অধিকার যে ব্যক্তির ক্ষমতায় সে যদি ক্ষমা করে। (অর্থাৎ স্বামী যদি পূর্ণ মোহরই তাকে দিয়ে দেয়, তবে এ অবস্থায় স্বামী ইচ্ছা করলে পূর্ণ মোহরই তাকে দিতে পারে) আর যদি (ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ) তোমাদের (পক্ষে প্রাপ্য হক) ক্ষমা করে দেয়, (তবে তা আদায় করা অপেক্ষা) পরহেযগারীর পক্ষে বেশি অনুকূল। (কেননা, ক্ষমা করে দিলে সওয়াব পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, সওয়াবের কাজ করাই হলো পরহেযগারী) এবং পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি প্রদর্শনকে অবহেলা করো না। (বরং প্রত্যেকেই অন্যের সাথে রেয়ায়েত করতে চেষ্টা করবে) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কাজ খুব ভালভাবেই দেখেন। (সুতরাং তোমরা যদি কারো সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তার ভাল প্রতিদান দেবেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ .... اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۔

মোহর ও স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাসের প্রেক্ষিতে তালাকের চারটি অবস্থা নির্ধারিত হয়েছে। তন্মধ্যে এ আয়াতে দুটি অবস্থার হুকুম বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে যদি মোহর ধার্য করা না হয়। দ্বিতীয়টি, মোহর ধার্য করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস বা সহবাস হয়নি। তৃতীয়ত, মোহর ধার্য হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে। এক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহর সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে হবে। কোরআন করীমের অন্য জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। চতুর্থত, মোহর ধার্য করা হয়নি, অথচ সহবাসের পর তালাক দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারে প্রচলিত মোহর পরিশোধ করতে হবে। এর বর্ণনাও অন্য এক আয়াতে এসেছে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথম দুই অবস্থার আলোচনা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থার নির্দেশ হচ্ছে, মোহর কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। ন্যূনপক্ষে তাকে একজোড়া কাপড় দিয়ে দেবে। কোরআন মজীদ প্রকৃতপক্ষে এর কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। অবশ্য একথা বলেছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের মর্যাদানুযায়ী দেওয়া উচিত, যাতে অন্যেরাও অনুপ্রাণিত হয় যে, সামর্থ্যবান লোক এহেন

ব্যাপারে কার্পণ্য না করে। হযরত হাসান (রা) এমনি এক ব্যাপারে বিশ হাজারের উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আর কাজী শোরাইহ্ পাঁচশ' দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে এক জোড়া কাপড়।–(কুরতুবী)

দ্বিতীয় অবস্থায় হুকুম হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রীর মোহর বিয়ের সময় ধার্য করা হয়ে থাকে এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়া হয়, তবে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক তাকে দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী তা ক্ষমা করে দেয় কিংবা স্বামী পুরো মোহরই দিয়ে দেয়, তবে তা হচ্ছে তাদের ঐচ্ছিক ব্যাপার। যেমন, আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِلَّآ أَنْ يَّعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ–পুরুষের পূর্ণ মোহর দিয়ে দেওয়াকেও হয়তো এজন্য মাফ করা বলা হয়েছে যে, আরব দেশের সাধারণ প্রথা অনুযায়ী বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মোহরের অর্থ দিয়ে দেওয়া হতো। সুতরাং সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক স্বামীর প্রাপ্য হয়ে যেত। যদি সে বদান্যতার প্রেক্ষিতে অর্ধেক না নেয়, তবে তাও ক্ষমার পর্যায়ে পড়ে এবং ক্ষমা করাকে উত্তম ও তাকওয়ার পক্ষে অনুকূল বলা হয়েছে। কেননা, তালাকটি যে ভদ্রোচিত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ক্ষমা তারই নিদর্শন—যা শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম এবং সওয়াবের কাজ। তাই ক্ষমা স্ত্রীর পক্ষ হতেও হতে পারে, স্বামীর পক্ষ হতেও হতে পারে।

الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ–এর তফসীর রাসূল (সা) নিজে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَلِىُّ عُقْدِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ বিবাহ বন্ধনের মালিক হচ্ছে স্বামী। এ হাদীসটি দারুকুতনী গ্রন্থে আমর ইবনে শো'আইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আলী (রা) এবং ইবনে আব্বাস (রা) হতেও উদ্ধৃত করেছেন। –(কুরতুবী)

এতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে সমাধা হওয়ার পর তা বহাল রাখা বা ভঙ্গ করার মালিক স্বামী। সে-ই তালাক দিতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে তালাক দেওয়ার সুযোগ সীমিত।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ج فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٩﴾

---

(২৩৮) সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহ্‌র সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও। (২৩৯) অতঃপর যদি তোমাদের কারো ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই পড়ে নাও অথবা সওয়ারীর উপরে। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নামাযের হেফাজত ঃ আগে ও পরে তালাক সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে নামাযের হুকুম বর্ণনা করার ইঙ্গিত করে যে, সত্যের আনুগত্যই হচ্ছে প্রকৃত উদ্দেশ্য। সামাজিকতা ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা অন্যান্য কল্যাণ লাভ ছাড়াও সেই লক্ষ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন একটা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং যখন এগুলোকে আল্লাহ্র বিধান মনে করে বাস্তবায়ন করা হবে, তখন এদিকে মনোনিবেশ করাও কর্তব্য। তাছাড়া ঐসব বিধানের বাস্তবায়নে বান্দার হকও আদায় হয় বটে। পক্ষান্তরে বান্দার হক নষ্ট করা আল্লাহ্র দরবার থেকে বিমুখতারই নামান্তর। যার অপরিহার্য পরিণতি হলো আল্লাহ্ ও বান্দা উভয়ের প্রতিই অমনোযোগিতা। অধিকন্তু, আল্লাহ্র হক সম্পর্কে যারা সজাগ-সতর্ক থাকে, তাদের দ্বারা বান্দার হক নষ্ট হওয়ার আশংকা কমই থাকে। যেহেতু নামাযে এ মনোযোগ অধিক মাত্রায় দিতে হয় এজন্য এ আলোচনা মধ্যখানে আনা হয়েছে, যাতে বান্দা এ মনোযোগিতার কথা সর্বদা স্মরণ রাখে।

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى.... مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ‌.

—সতর্ক থাক সব নামায সম্পর্কে (বিশেষভাবে) মধ্যবর্তী (আসরের) নামায সম্পর্কে এবং (নামাযে) দাঁড়াও আল্লাহ্ তা'আলার সামনে অনুগত রূপে। তারপর যদি তোমাদের (নিয়মিত নামায পড়তে কোন শত্রুর) ভয় থাকে, তবে দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা সওয়ার অবস্থায় নামায পড়। (তাতে তোমাদের মুখ যেদিকেই থাক, চাই তা কেবলার দিকে হোক কিংবা অন্য দিকেই হোক। আর রুকূ-সিজদা যদি শুধু ইশারা দ্বারাই করতে হয় তবুও) পড়তে হবে (এমতাবস্থায়ও এর উপর পাবন্দ থাক, ছেড়ে দিও না)। পরে যখন তোমরা (সম্পূর্ণ) নিরাপদ হবে (এবং সন্দেহ-সংশয়ও) থাকবে না, তখন তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ কর। এভাবে তোমাদেরকে নামায আদায় করতে হবে যা তোমরা (শান্তিপূর্ণ অবস্থায় করতে)। তোমরা যা জানতে না, তা তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কতিপয় হাদীসের প্রমাণ অনুসারে অধিকাংশ আলেমের মত হচ্ছে এই যে, মধ্যবর্তী নামায অর্থ হচ্ছে আসরের নামায। কেননা, এর একদিকে দিনের দু'টি নামায—ফজর ও জোহর এবং অপরদিকে রাতের দু'টি নামায—মাগরিব ও এশা রয়েছে। এ নামাযের প্রতি তাকীদ এজন্য করা হয়েছে যে, অনেক লোকেরই এ সময় কাজ-কর্মের ব্যস্ততা থাকে। আর হাদীসে 'কানেতীন বা আনুগত্যের' সাথে বাক্যটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'নীরবতার সাথে'।

এ আয়াতের দ্বারা নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে জায়েয ছিল। আর এ নামায দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইশারার দ্বারা পড়া তখনই শুদ্ধ হবে, যখন একই স্থানে দাঁড়িয়ে পড়া সম্ভব। ইশারার ক্ষেত্রে সিজদার ইশারা রুকূর ইশারার চেয়ে একটু বেশি নিচু করবে। চলতে চলতে নামায হবে না। যখন এমনভাবে পড়াও সম্ভব হবে না (যেমন যুদ্ধ চলাকালে) তখন নামায কাযা করতে হবে এবং অন্য সময় আদায় করবে।—(বয়ানুল-কোরআন)

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِىْ مَا فَعَلْنَ فِىْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٢﴾

(২৪০) আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসীয়ত করে যাবে। অতঃপর যদি সে স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করে তবে তাতে তোমাদের উপর কোন গোনাহ্ নেই। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞতাসম্পন্ন। (২৪১) আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেওয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য। (২৪২) এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তা বুঝতে পার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

বিধবা স্ত্রীলোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ঃ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ... وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

—আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায় (তোমাদের পক্ষে) ওসীয়ত করে যাওয়া কর্তব্য নিজেদের স্ত্রীদের ব্যাপারে এক বছরের (খাওয়া, পরা ও থাকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারে এমনভাবে) যাতে তাদের ঘর থেকে বের হতে না হয়। অবশ্য যদি (চার মাস দশ দিন অথবা প্রসবান্তে ইদ্দত অতিক্রম করে) নিজেই বেরিয়ে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ্ হবে না। সেই প্রচলিত রীতি অনুযায়ী (বিয়ে ইত্যাদি) যা নিজের ব্যাপারে স্থির করে আর আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত মহান। (তাঁর বিরুদ্ধে আদেশ করো না) এবং তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ (প্রতিটি কাজে তোমাদের কল্যাণ সংরক্ষিত করে রেখেছেন। যদিও তা তোমরা বুঝতে পার না)।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ..... لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ . —এবং সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের কিছু কিছু উপকার করা (যার কোন পরিমাণ নির্ধারণ করা নেই) প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী (এবং তা) নির্ধারিত করা হয়েছে তাদের (স্বামীদের) উপর যারা (শিরক ও কুফর

থেকে) বিরত থাকে (অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি। চাই এ নির্ধারণ ওয়াজিবের পর্যায়ে হোক বা মোস্তাহাবের পর্যায়ে হোক)। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের (আমল করার জন্য) স্বীয় আদেশ বর্ণনা করেন সম্ভাবনার ভিত্তিতে যে, তোমরা (তা) বুঝতে (এবং সে মতে আমল করতে) পার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ... وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ . – (১) জাহিলিয়্যত আমলে স্বামীর মৃত্যুর দরুন ইদ্দত ছিল এক বছর। কিন্তু ইসলামে এক বছরের স্থলে চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন—পূর্ববর্তী আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে ঃ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا –কিন্তু এতে স্ত্রীকে এতটুকু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যে, যেহেতু তখনও পর্যন্ত মীরাসের বিধান নাযিল হয়নি এবং মীরাসের কোন অংশ স্ত্রীলোকের জন্য নির্ধারণ করা হয়নি, বরং তাদের ভাগ্য পুরুষের ওসীয়তের উপর নির্ভরশীল ছিল না পূর্ববর্তী আয়াত– كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ এর তফসীরে বোঝা গেছে। কাজেই নির্দেশ হয়েছিল যে, যদি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজের সুবিধার জন্য স্বামীর পরিত্যক্ত বাড়িতে থাকতে চায়, তবে এক বছর পর্যন্ত থাকার অধিকার রয়েছে এবং তারই পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ইদ্দতের সময় পর্যন্ত দিতে হবে।

এ আয়াতে সেই নির্দেশটিই বর্ণনা করা হয়েছে আর স্বামীদেরকে সেভাবেই ওসীয়ত করতে বলা হয়েছে। আর যেহেতু এ অধিকারটি ছিল স্ত্রীর, তাই তা আদায় করা না করার অধিকার ছিল তারই। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য তাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া জায়েয ছিল না। তবে মৃত স্বামীর বাড়িতে থাকা না থাকা ছিল স্ত্রীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে তার অংশ ছেড়েও দিতে পারতো। আর অন্যত্র বিয়ে করাও জায়েয ছিল। 'নিয়মানুযায়ী' শব্দের অর্থ এ স্থলে তা-ই। কিন্তু ইদ্দতের মধ্যে ঘর থেকে বের হওয়া বা বিয়ে করা ইত্যাদি ছিল গোনাহের কাজ। স্ত্রীলোকের জন্যও এবং বাধা দিতে পারা সত্ত্বেও যারা বাধা না দেয় তাদের জন্যও। পরে যখন মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন বাড়ি-ঘর এবং অন্য সব কিছুর মধ্যেই যেহেতু স্ত্রীকেও অংশ দেওয়া হয়েছে; কাজেই সে তার নিজের অংশে থাকার এবং নিজের অংশ থেকে ব্যয় করার পূর্ণ অধিকার রয়ে গেছে। ফলে এ আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে।

(২) وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ –তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের উপকার করার কথা এর পূর্ববর্তী আয়াতেও এসেছে। তবে তা ছিল শুধু দু'রকম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য। সহবাস কিংবা নির্জনবাসের পূর্বে যাদেরকে তালাক দেওয়া হয়েছে, তাদের একটি উপকার ছিল কমপক্ষে একজোড়া কাপড় দেওয়া। আর দ্বিতীয় উপকার হচ্ছে অর্ধেক মোহর দেওয়া। বাকি রইল সে সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী, যাদের সাথে স্বামী নির্জনবাস কিংবা সহবাস করেছে। তাদের মধ্যে যাদের মোহর ধার্য করা হয়েছে, তাদের উপকার করা অর্থ তার সমস্ত ধার্যকৃত মোহর দিয়ে দেওয়া। আর যার মোহর ধার্য করা হয়নি তার জন্য মোহরে মিসাল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর যদি مَتَاع শব্দের দ্বারা 'বিশেষ ফায়দা' বলতে একজোড়া কাপড় বোঝানো হয়, তবে একজনকে তা দেওয়া ওয়াজিব, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর অন্যদের বেলায় তা

মোস্তাহাব। আর যদি متاع শব্দের দ্বারা খোরপোশ বোঝানো হয়ে থাকে, তবে যে তালাকের পর ইদ্দত অতিক্রান্ত করতে হয়, তাতে ইদ্দত পর্যন্ত তা দেওয়া ওয়াজিব তালাকে রাজ'ঈ হোক আর তালাকে-বায়েনই হোক ব্যাপক অর্থে সব ধরনের তালাকই এর অন্তর্ভুক্ত।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾

(২৪৩) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে বললেন, মরে যাও। তারপর তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া প্রকাশ করে না। (২৪৪) আল্লাহ্র পথে লড়াই কর এবং জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সবকিছু শোনেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মানবকুল) তোমরা কি তাদের সম্পর্কে অবগত নও, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে ? অথচ তারা সংখ্যায় ছিল হাজার হাজার; মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচার জন্য। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য (নির্দেশ) বলে দিলেন (তোমরা) মরে যাও, (তারা মরে গেল) অতঃপর তাদেরকে জীবিত করা হলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের (প্রতি) রহমতকারী। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকরিয়া আদায় করে না (এবং এ ঘটনার উপর চিন্তা করে না)। আল্লাহ্ তা'আলা শ্রবণশীল ও জ্ঞানী। যারা জিহাদ করে এবং যারা করে না তাদের সবার কথাই (তিনি) শোনেন, (প্রত্যেকের নিয়তের কথাই) জানেন (এবং প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গিতে আল্লাহ্র পথে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি হেদায়েত করেছেন। জিহাদের বিধান বর্ণনার পূর্ব ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হায়াত-মউত বা জীবন-মরণ একান্তভাবেই আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তির অধীন। যুদ্ধ বা জিহাদে অংশ নেওয়াই মৃত্যুর কারণ নয়। তেমনি ভীরুতার সাথে আত্মগোপন করা মৃত্যু থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নয়। তফসীরে ইবনে-কাসীরে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর উদ্ধৃতিসহ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কোন এক শহরে বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাস করতো। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিল। তারা ভীত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দু'টি

পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে একথা অবগত করাবার জন্য যে মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না—তাদের কাছে দু'জন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা দু'জন সে ময়দানের দু'ধারে দাঁড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই একসাথে মরে গেল, একটি লোকও জীবিত রইল না। পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন এ সংবাদ জানতে পারল তখন সেখানে গিয়ে দশ হাজার মানুষের দাফন-কাফন করার ব্যবস্থা করা যেহেতু খুব সহজ ব্যাপার ছিল না, তাই তাদের চারদিকে দেয়াল দিয়ে একটি বন্ধন কূপের মত করে ছিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মৃতদেহগুলো পচে-গলে এবং হাড়-গোড় তেমনি পড়ে রইল। দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলের হিযকীল (আ) নামক একজন নবী সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে সেই বন্ধ জায়গায় বিক্ষিপ্তাবস্থায় হাড়-গোড় পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এ লোকদের সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হলো। তিনি দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদেগার, তাদের সবাইকে পুনর্জীবিত করে দাও। আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবূল করলেন এবং বিক্ষিপ্ত সেই হাড়গুলোকে আদেশ দিলেন ঃ

ايتها العظام البالية ان الله يأمرك ان تجتمعى .

অর্থাৎ—ওহে পুরাতন হাড়সমূহ ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নিজ নিজ স্থানে একত্রিত হতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ্র নবীর যবানীতে এসব হাড় আল্লাহ্র আদেশ শ্রবণ করলো। অনেক জড় বস্তুকে হয়তো মানুষ অনুভূতিহীন মনে করে, কিন্তু দুনিয়ার প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু ও আল্লাহ্র অনুগত ও ফরমাবরদার এবং নিজ নিজ অস্তিত্ব অনুযায়ী বুদ্ধি ও অনুভূতির অধিকারী ও আল্লাহ্র অনুগত। কোরআন করীম أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى –বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে তার উপযুক্ত হেদায়েত দান করেছেন। মাওলানা রুমী (র) এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

خاك وباد وآب وآتش بنده اند + با من وتو مرده باحق زنده اند

অর্থাৎ—"মাটি, বায়ু, পানি ও আগুন—সবই আল্লাহ্র দাস , আমার-তোমার দৃষ্টিতে সেগুলো মৃত, কিন্তু আল্লাহ্র কাছে জীবিত।"

মোটকথা, একটিমাত্র শব্দে প্রত্যেকটি হাড় নিজ নিজ স্থানে পুনঃ স্থাপিত হলো। অতঃপর সে নবীর প্রতি আদেশ হলো, সেগুলোকে বল ঃ

ايتها العظام ان الله يأمرك ان تكتسى لحما وعصبا وجلدا.

অর্থাৎ—ওহে হাড়সমূহ ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা মাংস পরিধান কর এবং রগ চামড়া দ্বারা সজ্জিত হও।

এ কথার সাথে সাথে হাড়ের প্রতিটি কঙ্কাল একেকটি পরিপূর্ণ লাশ হয়ে গেল। অতঃপর রূহকে আদেশ দেওয়া হলো ঃ

ايتها الارواح ان الله يأمرك ان ترجع كل روح الى الجسد الذى كانت

تعمره .

অর্থাৎ—ওহে আত্মাসমূহ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে যার যার শরীরে ফিরে আসতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ শব্দ উচ্চারিত হতেই সে নবীর সামনে সমস্ত লাশ জীবিত হয়ে দাঁড়ালো এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে চারদিকে তাকাতে আরম্ভ করলো। আর সবাই বলতে লাগল ঃ سبحانك لا اله الا انت –তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ্ ! তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।

এ ঘটনাটি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীর সামনে সৃষ্টিবলয় সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তদুপরি এটা কিয়ামত ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য একটা অকাট্য প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক হয় যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে থাকা—তা জিহাদ হোক কিংবা প্লেগ মহামারীই হোক আল্লাহ্ এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়তির প্রতি যারা বিশ্বাসী তাদের পক্ষে সমীচীন নয়। যার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে, নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্ত পূর্বেও তা হবে না এবং এক মুহূর্ত পরেও তা আসবে না, তাদের পক্ষে এরূপ পলায়ন অর্থহীন এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ।

এখন ঘটনাটি কোরআনের ভাষায় লক্ষ্য করুন! কোরআন-মজীদ ইরশাদ করেছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ –অর্থাৎ আপনি কি সেসব লোকের ঘটনা লক্ষ্য করেন নি, যারা মৃত্যুর ভয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল ?

লক্ষণীয় যে, এ ঘটনা হুযূর (সা)-এর যুগের হাজার হাজার বছর পূর্বেকার। হুযূর (সা)-এর পক্ষে এ ঘটনা দেখার প্রশ্নই ওঠে না। তাই এখানে اَلَمْ تَرَ বলার উদ্দেশ্য ? মুফাসসিরগণ বলেছেন, এমনিভাবে যেসব ঘটনা সম্পর্কে الم تر। দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে অথচ ঘটনা হুযূর (সা)-এর যুগের বহু পূর্বেকার, যা হুযূর (সা)-এর দেখার কথা কল্পনাও করা যায় না, সেসব ক্ষেত্রে দেখা দ্বারা উদ্দেশ্য আত্মার দর্শন। এসব ক্ষেত্রে الم تر। দ্বারা الم تعلم। অর্থাৎ আপনি কি জানেন না ? বোঝানো হয়। তবুও الم تر। শব্দে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ ঘটনা যে সবারই জানা, সুপ্রসিদ্ধ একটি ব্যাপার, এদিকে ইশারা করা। বোঝানো হচ্ছে যে, ঘটনাটি এমনি সুপ্রসিদ্ধ এবং বহুল আলোচিত যেন এখনও ইচ্ছা করলে তা দেখা যেতে পারে কিংবা দেখার যোগ্য। الم تر–র পরে الى। শব্দ যোগ করায় ভাষাগত দিক দিয়ে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অতঃপর কোরআন করীম তারা সংখ্যায় অনেক ছিল বলে উল্লেখ করেছে। وَهُمْ اُلُوْفٌ অর্থাৎ সংখ্যায় ছিল তারা হাজার হাজার। এ সংখ্যা নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী এ শব্দটি অধিকতা বাচক বহুবচন। এতে বোঝা যায় যে, তাদের সংখ্যা দশ হাজারের কম ছিল না।

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে ঃ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا –অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বললেন—তোমরা মরে যাও। আল্লাহ্র এ আদেশ প্রত্যক্ষও হতে পারে আবার কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। যেমন, আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ .

অতঃপর বলেছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়। এতে সে করুণাও অন্তর্ভুক্ত, যা বনী ইসরাঈলদের উল্লিখিত দলটির প্রতি পুনর্জীবন দানের মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল এবং সে দয়াও শামিল যাতে উম্মতে-মুহাম্মদীকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন।

অতঃপর পথভোলা মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শত-সহস্র দয়া ও করুণার নিদর্শন মানুষের সামনে অহর্নিশ উপস্থিত হতে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

প্রাসঙ্গিকভাবে এ আয়াত অন্য কয়েকটি বিষয়ের সমাধান করে দিয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ্র নির্ধারিত তকদীরের উপর কোন তদবীর কার্যকর হতে পারে না। জিহাদ অথবা মহামারীর ভয়ে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচানো যায় না, আর মহামারীগ্রস্ত স্থানে অবস্থান করাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। কেননা মৃত্যুর একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যার কোন ব্যতিক্রম হওয়ার নয়।

দ্বিতীয়ত, কোনখানে মহামারী কিংবা কোন মারাত্মক রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে সেখান থেকে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেওয়া জায়েয নয়। রাসূল (সা)-এর ইরশাদ মোতাবেক অন্য এলাকার লোকের পক্ষেও মহামারীগ্রস্ত এলাকায় যাওয়া দুরস্ত নয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ان هذا السقم عذب به الامم قبلكم فاذا سمعتم به فى الارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارًا (بخارى ومسلم وابن كثير)

অর্থাৎ—"সে রোগের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতের উপর আযাব নাযিল করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, কোন শহরে প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা দিয়েছে, তখন সেখানে যেও না। আর যদি কোন এলাকাতে এ রোগ দেখা দেয় এবং তুমি সেখানেই থাক, তবে সেখান থেকে পলায়ন করবে না।"

তফসীরে-কুরতুবীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর ফারূক (রা) একবার শাম দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। শাম সীমান্তে তবুকের নিকটে 'সারাগ' নামক স্থানে পৌঁছার পর জানতে পারলেন যে, শাম দেশে প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। এ মহামারী শাম দেশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ মহামারীই 'আমওয়াস' নামে অভিহিত। কারণ, এ রোগ প্রথমে 'আমওয়াস' নামক গ্রামে আরম্ভ হয়েছিল, গ্রামটি বায়তুল মোকাদ্দাসের নিকটে অবস্থিত। পরে সেখান থেকে সমগ্র দেশে বিস্তার লাভ করে। হাজার হাজার মানুষ যাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবী এবং তাবেয়ীও ছিলেন, যাঁরা এ মহামারীতে মারা যান।

ফারূকে-আযম (রা) যখন মহামারীর ভয়াবহ সংবাদ শোনেন, তখন সেখানে অবস্থান করে সাহাবীগণের সাথে সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হওয়া সমীচীন হবে কিনা—এ সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। সে পরামর্শের মধ্যে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকেই এরূপ পরিস্থিতি সম্পর্কে রাসূলে করীম (সা)-এর বাণী শুনেছিলেন। সবশেষে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বললেন—এ সম্পর্কে হুযূর (সা)-এর নির্দেশ এরূপ ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجز وعذاب عذب به الامم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتى الاخرى فمن سمع به بارض فلا يقدمن عليه ومن كان بارض وقع بها فلا يخرج فرارا منه . رواه البخارى عن اسامة بن زيد واخرجه الائمة بمثله .

অর্থাৎ—"রাসূল (সা) প্লেগ মহামারীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ইরশাদ করেছেন যে, এটা একটা আযাব, যদ্দ্বারা পূর্ববর্তী কোন কোন উম্মতকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এর কিছু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। এখন তা কখনো চলে যায় আবার কখনো চলে আসে। তাই যদি কেউ শুনে যে, অমুক জায়গায় এ রোগ দেখা দিয়েছে, তবে সেখানে কোন অবস্থাতেই তার যাওয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি পূর্ব থেকে সেখানে রয়েছে, সে যেন সে স্থান ত্যাগ না করে। (বুখারী)

হযরত ফারূকে আযম (রা) এ হাদীস শোনার পর সঙ্গীদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে আদেশ দিলেন। শামের তদানীন্তন প্রশাসক হযরত আবূ ওবায়দা (রা)-ও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। ফারূকে আযম (রা)-এর এ আদেশ শুনে তিনি বলতে লাগলেন ঃ

افرارا من قدر الله অর্থাৎ আপনি কি আল্লাহ্র নির্ধারিত তকদীর থেকে পালাতে চান! উত্তরে ফারূকে আযম (রা) বললেন, আবূ ওবায়দা! যদি অন্য কেউ একথা বলত! তোমার মুখে এমন কথা বিস্ময়কর! অতঃপর বললেন ঃ

نعم، نفر من قدر الله الى قدر الله "হ্যাঁ, আল্লাহ্র নির্ধারিত তকদীর থেকে আল্লাহ্র নির্ধারিত তকদীরের দিকেই আমরা পলায়ন করছি।"

উদ্দেশ্য ছিল যে, আমরা যা করছি তা আল্লাহ্র আদেশেই করছি, যা রাসূল (সা)-এর যবানীতে আমরা জানতে পেরেছি।

প্লেগ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর উক্তির দর্শন ঃ রাসূল (সা)-এর উল্লিখিত উক্তিতে বোঝা যাচ্ছে, কোন শহরে বা বিশেষ কোন এলাকায় যদি মহামারী দেখা দেয়, তবে অন্য স্থানের লোকদের পক্ষে সে স্থানে যাওয়া নিষেধ এবং সে স্থানের লোকদের মৃত্যুর ভয়ে সে স্থান ত্যাগ করাও নিষেধ। এ সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, 'কোথাও যাওয়া মৃত্যুর কারণ হতে পারে না, আবার কোনখান থেকে পালিয়ে যাওয়াও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নয়।' এ মৌলিক বিশ্বাসের পাশাপাশি আলোচ্য নির্দেশটি নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমত, মহামারীগ্রস্ত এলাকায় বাইরের লোককে আসতে নিষেধ করার একটি তাৎপর্য এই যে, এমনও হতে পারে যে, সেখানে গমন করার পর তার হায়াত শেষ হওয়ার দরুনই এ রোগে আক্রান্ত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করলো; এতদসত্ত্বেও আক্রান্ত ব্যক্তির মনে এমন ধারণা হতে পারে যে, সেখানে না গেলে হয়তো সে মারা যেতো না। তাছাড়া অন্যান্য লোকেরও হয়তো এ ধারণাই হবে যে, এখানে না এলে মৃত্যু হতো না। অথচ যা ঘটেছে তা পূর্বেই লিখিত ছিল; তার হায়াত এতটুকুই ছিল। যেখানেই থাকতো তার মৃত্যু এ সময়েই হতো। এ আদেশের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা হয়েছে, যাতে করে তারা কোন ভুল বোঝাবুঝির শিকার না হয়।

দ্বিতীয় তাৎপর্য হলো এই যে, এতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন যে, যেখানে কষ্ট হওয়ার বা মৃত্যুর আশংকা থাকে, সেখানে যাওয়া উচিত নয়, বরং সাধ্যমত ঐ সব

বস্তু থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করা কর্তব্য, যা তার জন্য ধ্বংস বা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া নিজের জানের হেফাজত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব ঘোষণা করা হয়েছে।

এ নিয়মের চাহিদাও তা-ই যে, আল্লাহ্‌র দেয়া তকদীরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যথাসাধ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যেসব স্থানে প্রাণনাশের আশংকা থাকে, সেসব স্থানে না যাওয়াও এক প্রকার সতর্কতামূলক তদবীর।

এমনিভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদেরকে সে স্থান থেকে পলায়ন করতে নিষেধ করার মাঝেও বহু তাৎপর্য নিহিত। একটি হচ্ছে এই যে, যদি এ পলায়নের প্রথা চলতে থাকে, তবে সাধারণভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা সক্ষম ও সবল তারা তো সহজেই পালাতে পারে, কিন্তু যারা দুর্বল তাদের অবস্থা কি হবে ? তারা তো একা থেকে ভয়েই মারা যাবে। আর যারা রোগাক্রান্ত তাদের সেবা-শুশ্রূষাই বা কিভাবে চলবে ? যারা মারা যাবে, তাদের দাফন-কাফনেরই বা কি ব্যবস্থা হবে ?

দ্বিতীয়ত, যারা সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে হয়তো রোগের জীবাণু প্রবেশ করে থাকবে। এমতাবস্থায় তারা যদি বাড়িঘর ছেড়ে বের হয়ে থাকে, তবে তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরো বেড়ে যাবে। কারণ, প্রবাস জীবনে রোগাক্রান্ত হলে যে কি অবস্থা হয় তা সবারই জানা। প্রসঙ্গক্রমে ইবনুল-মাদয়িনী মনীষীদের এ কথার উল্লেখ করেছেন ঃ ما فر احد من الوباء فسلم –অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহামারী থেকে পলায়ন করে, সে কখনো অক্ষত থাকতে পারে না।–(কুরতুবী)

তৃতীয়ত, যদি তাদের মধ্যে রোগের জীবাণু ক্রিয়া করে থাকে, তবে তা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। আর যদি নিজের জায়গায় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে পড়ে থাকে, তবে হয়তো নাজাত পেতে পারে। আর যদি এ রোগে মারা যাওয়াই তার ভাগ্যে থাকে, তবে ধৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করার বদলায় শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। যেমন, হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

روى البخارى عن يحى بن يعمر عن عائشة انها اخبرته انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فاخبرها النبى صلى الله عليه وسلم انه كان عذابًا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث فى بلده صابرًا يعلم انّه لن يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر شهيد . وهذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة والمطعون شهيد . (قرطبى ص ٢٣٥ ج ٣) .

অর্থাৎ—ইমাম বুখারী (র) ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়া'মার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি রাসূল (সা)-কে প্লেগ মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল (সা) তাঁকে বলেছেন, এ রোগটি আসলে শাস্তিরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যে জাতিকে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য হতো তাদের ভেতরে পাঠানো হতো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একে মু'মিনদের জন্য রহমতে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্র যে সব বান্দা এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়া সত্ত্বেও নিজ এলাকায়ই ধৈর্য সহকারে বসবাস করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তার শুধু সে বিপদই হতে পারে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য লিখে রেখেছেন, তবে এমন ব্যক্তি শহীদের মত সওয়াব পাবে। হুযূর (সা)-এর বাণী—'প্লেগ শাহাদত এবং প্লেগে আক্রান্ত ব্যক্তি শহীদ'-এর ব্যাখ্যাও তা-ই।

বিশেষ বিশেষ অবস্থার ব্যতিক্রম ঃ হাদীস শরীফে فلا تخرجوا فرارا منه বলা হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যুর ভয়ে নয়, বরং অন্য কোন প্রয়োজনে সে জায়গা থেকে অন্যত্র চলে যায় তবে সে এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারব না, আমার সময় শেষ হলে যেখানেই যাব মৃত্যু সেখানেই হবে। আর মৃত্যুর সময় না হলে এখানে থেকেও মৃত্যু হবে না—এ দৃঢ় বিশ্বাস রেখে শুধু আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য যদি অন্যত্র চলে যায়, তবে সেও এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

অনুরূপভাবে যদি কোন বহিরাগত ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অঞ্চলে কোন প্রয়োজনে প্রবেশ করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, এখানে এসেছি বলেই মৃত্যু হবে না; বরং মৃত্যু আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীন, তবে এমতাবস্থায় তার পক্ষেও সেখানে গমন করা জায়েয।

তৃতীয় মাস'আলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথা বোঝা যায় যে, মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে পলায়ন করা হারাম। এ বিষয়টি কোরআনের অন্যত্র অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য কোন কোন বিশেষ অবস্থাকে নির্দেশের আওতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

এ আয়াতে যে বিষয়বস্তু রয়েছে, প্রায় একই রকম বিষয়বস্তু আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا - قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ .

অর্থাৎ যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি, উপরন্তু জিহাদের ময়দানে শাহাদত বরণকারীদের সম্পর্কে মানুষের নিকট বলাবলি করে যে, তারা যদি আমাদের কথা শুনতো, তবে নিহত হতো না। (হুযূর [সা]-কে আদেশ দেওয়া হলো) আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, যদি মৃত্যু হতে রেহাই পাওয়া তোমাদের ক্ষমতাধীন হয়ে থাকে, তাহলে বরং নিজের জন্য চিন্তা এবং নিজেকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর অর্থাৎ মৃত্যু জিহাদে যাওয়া-না যাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়, ঘরে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তোমাদের মৃত্যু আসবেই।

এটা একান্তই আল্লাহ্র কুদরত যে, সাহাবীগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় সিপাহসালার আল্লাহ্র অসি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা), যার সমগ্র ইসলামী জীবনই জিহাদে অতিবাহিত হয়েছে; তিনি কোন জিহাদে শহীদ হন নি; বরং রোগাক্রান্ত হয়ে বাড়িতে ইন্তিকাল করেছেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করার আক্ষেপে তিনি অনুতাপ করেছিলেন এবং পরিবারের লোকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ আমি অমুক অমুক বিরাট বিরাট জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি। আমার শরীরের এমন কোন জায়গা নেই, যা তীর-বল্লম অথবা অন্য কোন মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে যখম হয়নি। কিন্তু অনুতাপের বিষয় এই যে, আজ আমি গাধার মত

বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করছি। আল্লাহ্ যেন আমাকে ভীরু-কাপুরুষের প্রাপ্য শাস্তি না দেন। মৃত্যু ভয়ে যারা জিহাদ থেকে সরে থাকতে চায়, তাদেরকে আমার জীবনের এ উপদেশমূলক ঘটনাটি শুনিয়ে দিও।

এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের এ ঘটনাটি ভূমিকাস্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনা বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তোমরা জিহাদে যাওয়াকে মৃত্যু এবং পলায়নকে মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়ার পন্থা মনে করো না, বরং আল্লাহ্র আদেশ পালন করে উভয় জাহানের নেকী হাসিল কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় বিষয়ই জানেন।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে।

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۪ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٥﴾

---

(২৪৫) এমন কে আছে যে আল্লাহ্কে করজ দেবে উত্তম করজ ; অতঃপর আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহ্ই সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

জিহাদ প্রভৃতি সৎকাজে দানের প্রতি অনুপ্রেরণা ঃ (এমন) কোন ব্যক্তি আছে কি, যে আল্লাহ্কে ঋণ দেবে উত্তম পন্থায় (অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে)। অতঃপর আল্লাহ্ সেই (ঋণের বিনিময়ে নেকী এবং ধনমান) বৃদ্ধি করে দেবেন অনেক বেশি গুণে। (এবং এমন কোন সন্দেহ করবে না যে, ব্যয় করলে ধন-সম্পদ কমে যাবে। কেননা এ তো) আল্লাহ্ তা'আলারই ইচ্ছাধীন। তিনিই কমী ও বেশি করেন। (ব্যয় করা না করার মধ্যে তা নির্ভরশীল নয়) এবং তোমরা তাঁরই দিকে (মৃত্যুর পর) নীত হবে। (সুতরাং এখন সৎপথে ব্যয় করার প্রতিদান এবং ওয়াজিব কাজে ব্যয় না করার শাস্তি তোমরা পাবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا — করজ বা ঋণ অর্থ নেক আমল ও আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা। এখানে 'করজ' বা 'ঋণ' শব্দটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। অন্যথায় সবকিছুরই তো একমাত্র মালিক তিনিই। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব এমনিভাবে তোমাদের সদ্ব্যয়ের প্রতিদান অবশ্যই দেওয়া হবে।

বৃদ্ধি করার কথা এক হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ্র পথে একটি খেজুর দান করলে, আল্লাহ্ তা'আলা একে এমনভাবে বৃদ্ধি করে দেবেন যে, তা পরিমাণে ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি হবে।

আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে ঋণ দেওয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। তাই হাদীসে অভাবীদেরকে ঋণ দেওয়ারও অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرّة الا كان كصدقته مرتين ۰

(مظهري بحواله ابن ماجه)

অর্থাৎ কোন একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে একবার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহ্র পথে সে পরিমাণ সম্পদ দু'বার সদ্‌কা করার সমতুল্য।

(২) ইবনে আরাবী (র) বলেন, এ আয়াত শুনে মানুষের মধ্যে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে একদল দুর্ভাগা বলাবলি করতো যে, মুহাম্মদের রব্ অভাবী এবং আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে; আর আমরা অভাবমুক্ত। এর উত্তরে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاءُ ۰

দ্বিতীয় দল হচ্ছে সে সমস্ত লোকের, যারা এ আয়াত শুনে এর বিরুদ্ধাচরণ এবং কার্পণ্য অবলম্বন করেছে। ধন-সম্পদের লোভ তাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার তৌফিক তাদের হয়নি।

তৃতীয় দল হচ্ছে সেসব নিষ্ঠাবান মুসলমানদের, যাঁরা শোনার সাথে সাথেই এ আয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন এবং নিজেদের পছন্দ করা সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দিয়েছিলেন। যেমন—আবুদ-দাহ্‌দাহ্ (রা) প্রমুখ। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবুদ দাহ্‌দাহ্ রাসূল (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আল্লাহ্ তা'আলা কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন? তাঁর তো ঋণের প্রয়োজন পড়ে না! আল্লাহ্র রাসূল (সা) উত্তর দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এর বদলে তোমাদেরকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাতে চাচ্ছেন। আবুদ দাহ্‌দাহ্ একথা শুনে বললেন—হে আল্লাহ্র রাসূল (সা), হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। আবুদ দাহ্‌দাহ্ বলতে লাগলেন, "আমি আমার দু'টি বাগানই আল্লাহ্কে ঋণ দিলাম। রাসূল (সা) বললেন, একটি আল্লাহ্র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দাও এবং অন্যটি নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে দাও। আবুদ দাহ্‌দাহ্ বললেন যে, আপনি সাক্ষী থাকুন, এ দু'টি বাগানের মধ্যে যেটি উত্তম—যাতে খেজুরের ছয়শ ফলন্ত বৃক্ষ রয়েছে, সেটা আমি আল্লাহ্র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করলাম। আল্লাহ্র রাসূল (সা) বললেন, এর বদলে আল্লাহ্ তোমাকে বেহেশত দান করবেন।

আবুদ দাহ্‌দাহ্ (রা) বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বিষয়টি জানালেন। স্ত্রীও তাঁর এ সৎকর্মের কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন। রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

كم من عذق رداح ودار فياح لابى الدحداح (قرطبى)

অর্থাৎ খেজুরে পরিপূর্ণ অসংখ্য বৃক্ষ এবং প্রশস্ত অট্টালিকা আবুদ দাহ্‌দাহ্র জন্য তৈরি হয়েছে।

(৩) ঋণ দেওয়ার বেলায় তা ফেরত দেওয়ার সময় যদি কিছু অতিরিক্ত দেওয়ার কোন শর্ত করা না থাকে এবং নিজের পক্ষ থেকে যদি কিছু বেশি দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য। রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً —তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে তার (ঋণের) হককে উত্তমরূপে পরিশোধ করে।

তবে, যদি অতিরিক্ত দেওয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম বলে গণ্য হবে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ
ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا
قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (২৪৬) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ
قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ
أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ
عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ۚ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (২৪৭) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ
وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (২৪৮)
فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ
شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً
بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو
اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ

الصّٰبِرِيْنَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا

صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ

اللّٰهِ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا

يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٥١﴾

(২৪৬) মূসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে আমাদের জন্য একজন বাদশাহ্ নির্ধারিত করে দিন, যাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইয়ের হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না ! তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করব না ? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। আর আল্লাহ্ তা'আলা জালিমদের ভাল করে জানেন। (২৪৭) আর তাদেরকে তাদের নবী বললেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ্ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল, তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর! অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশি। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ্ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত। (২৪৮) বনী ইসরাঈলদেরকে তাদের নবী আরো বললেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। আর তাতে থাকবে মূসা, হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। (২৪৯) অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয় ! আর যে লোক তার স্বাদ

গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সেই পানি সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালুত এবং তার সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহ্র সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বারবার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবিলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহ্র হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন। (২৫০) আর যখন তালুত ও তার সৈন্যবাহিনী শত্রুর সম্মুখীন হলো, তখন বলল, হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ—আর আমাদের সাহায্য কর সে কাফির জাতির বিরুদ্ধে। (২৫১) তারপর ঈমানদাররা আল্লাহ্র হুকুমে জালুতের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ্ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। আর তাকে যা চাইলেন শেখালেন। আল্লাহ্ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ্ একান্তই দয়ালু, করুণাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পূর্বাপর যোগসূত্র ঃ এখানে যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রতি উৎসাহ দানই বিশেষ উদ্দেশ্য। পূর্বের ঘটনাটিও তারই ভূমিকা। আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার বিষয়টিও তারই সমর্থন। সামনে তালুত ও জালুতের কাহিনী একই বিষয়ের সমর্থন করছে। তদুপরি উক্ত কাহিনীতে আল্লাহ্ তা'আলা কার্পণ্য ও উদারতার বিষয়টিও দেখিয়েছেন, যার আলোচনা পূর্ববর্তী وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ আয়াতে রয়েছে। দরিদ্রকে রাজা করা, আবার রাজার রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়া সবই তাঁর ইচ্ছা।

তালুত ও জালুতের কাহিনী ঃ হে সম্বোধিত ব্যক্তি, তুমি কি বনী ইসরাঈলের সে কাহিনী যা মূসা (আ)-এর পরে ঘটেছিল, অবগত হওনি (যার পূর্বেই তাদের উপর কাফির জালুত বিজয় অর্জন করে তাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জনপদ অধিকার করে নিয়েছিল) ? যখন তারা তাদের এক নবীকে বলল যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ্ নিযুক্ত করে দিন যাতে আমরা (তাঁর সাথে মিলে) আল্লাহ্র পথে (জালুতের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করতে পারি। সেই নবী বললেন, এমন কোন সম্ভাবনা আছে কি, যদি তোমাদের জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়, তবে তোমরা (সে সময়) জিহাদ করবে না ? তখন তারা বলল, এমন কি কারণ থাকতে পারে, যার জন্য আমরা আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করব না ? অথচ (জিহাদের একটি কারণও রয়েছে যে,) সে (কাফিররাই) আমাদেরকে নিজেদের আবাসভূমি এবং ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকেও বিতাড়িত করেছে। (কেননা, তাদের কোন কোন জনপদ কাফিররা দখল করে নিয়েছিল এবং তাদের ছেলে-মেয়েদেরকেও বন্দী করেছিল)। অতঃপর তাদেরকে জিহাদ করার আদেশ দেওয়া হলো। তখন

মাত্র ক'টি ছোট দল ছাড়া সবই বিরত রইল। (যেমন, সামনে তাদের জিহাদের উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে।) এবং আল্লাহ্ তা'আলা জালিমদেরকে (আদেশ অমান্যকারিগণকে) ভালভাবেই জানেন। (সবাইকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন) এবং তাদেরকে তাদের নবী বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তালুতকে তোমাদের বাদশাহ্ নিযুক্ত করেছেন। তারা তখন বলতে লাগল, তাঁর পক্ষে আমাদের উপর রাজত্ব করার কি অধিকার থাকতে পারে ? অথচ তাঁর তুলনায় রাজত্ব করার অধিকার আমাদেরই বেশি। আর তাঁকে আর্থিক সঙ্গতিও আমাদের চাইতে বেশি দেওয়া হয়নি (কারণ, তালুত ছিলেন দরিদ্র)। সেই নবী (উত্তরে) বললেন, (একে তো) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের তুলনায় তাঁকে নির্বাচন করেছেন (এবং নির্বাচনের ভাল-মন্দ আল্লাহ্ই বেশি অবগত) এবং (দ্বিতীয়ত রাজনীতি ও রাজ্য পরিচালনার) জ্ঞান এবং শারীরিক সামর্থ্যের দিক দিয়ে বেশি যোগ্যতা দিয়েছেন। (বাদশাহ্ হওয়ার জন্য বিদ্যা ও শারীরিক যোগ্যতাই অধিক প্রয়োজন, যাতে রাজ্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ভাল হবে এবং শারীরিক সামর্থ্যও এ অর্থে প্রয়োজন যে, পক্ষ ও বিপক্ষ সবার অন্তরে ভয়-ভীতির বিস্তার হবে) এবং (তৃতীয়ত) আল্লাহ্ তা'আলা (রাজত্বের মালিক) স্বীয় রাজত্ব যাকে ইচ্ছা দান করেন (কোন প্রশ্নের তোয়াক্কা করেন না) এবং (চতুর্থত) আল্লাহ্ তা'আলাই প্রাচুর্যদাতা (তাকে দৌলত দিতে অসুবিধা কি যে, সে সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ হচ্ছে) এবং জানেন (কে রাজত্ব করার যোগ্যতা রাখে)। আর (তারা যখন নবীকে বলল যে, যদি তাঁর বাদশাহ্ হওয়ার কোন প্রকাশ্য নিদর্শন আমরা দেখতে পাই, তবেই আমাদের মনে অধিক শান্তি ও দৃঢ়তা আসবে। তখন) তাদের নবী বললেন, তাঁর (আল্লাহ্র পক্ষ হতে) বাদশাহ্ নিযুক্ত হওয়ার নিদর্শন হচ্ছে এই যে, তোমাদের নিকট সেই সিন্দুকটি (তোমাদের আনয়ন ছাড়াই) এসে যাবে; যার মধ্যে শান্তি (ও বরকতের) বস্তু রয়েছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে। (অর্থাৎ তওরাত। বলা বাহুল্য, তওরাত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত গ্রন্থ)। এবং (তাতে রয়েছে) কিছু অবশিষ্ট বস্তু, যা হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারূন (আ) রেখে গিয়েছেন। (তাঁদের কিছু পোশাক ইত্যাদি)। এ সিন্দুকটি ফেরেশতাগণ নিয়ে আসবে। তাতেই (এভাবে সিন্দুকের আগমনেই) তোমাদের জন্য পূর্ণ নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক। অতঃপর যখন (বনী ইসরাঈলরা তালুতকে বাদশাহ্ মেনে নিল এবং জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হলো এবং) তালুত সৈন্য নিয়ে (নিজের স্থান বায়তুল মোকাদ্দাস্ থেকে আমালেকার দিকে রওয়ানা হলেন) তখন তিনি (নবীর মাধ্যমে ওহী দ্বারা অবগত হয়ে সঙ্গীদের) বললেন, এখন আল্লাহ্ তা'আলা (তোমাদের দৃঢ়তা ও স্থিরচিত্ততা সম্পর্কে) তোমাদের পরীক্ষা করবেন একটি নহর দ্বারা (যা পথেই পড়বে এবং কঠিন পিপাসার সময় তা তোমরা পার হবে)। সুতরাং যে ব্যক্তি তা থেকে (অতিমাত্রায়) পানি পান করবে তারা আমার দলভুক্ত নয়। আর যারা তা মুখেও না তুলবে (এবং প্রকৃত আদেশ তা-ই) সে আমার দলভুক্ত। কিন্তু যারা তাদের হাতে এক আঁজলা পান করবে (তবে এতটুকু রেহাই দেওয়া গেল। যা হোক, রাস্তার সে নহর পূর্ণ পিপাসার সময় পার হতে হয়েছে) তাই সবাই তা থেকে মাত্রাতিরিক্তরূপে পানি পান করতে আরম্ভ করলো। তাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক লোক তা' হতে বিরত রইল। (কেউ মোটেই পান করল না; আর কেউ কেউ এক আঁজলার বেশি পান

করেনি। সুতরাং তালুত এবং তাঁর সাথের মু'মিনগণ নহর অতিক্রম করলো। আর তাদের দলকে দেখলো); দেখা গেল, সামান্য কয়েকজন মাত্র রয়ে গেছে। (তখন কেউ কেউ পরস্পর) বলাবলি করতে লাগল, আজ (আমাদের দল এতো ক্ষুদ্র যে, এমতাবস্থায়) আমাদের মধ্যে জালুত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। (একথা শুনে) এসব লোক যাদের এ ধারণা ছিল যে, তারা আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে, বলতে লাগলো, অনেক (ঘটনা এরূপ ঘটেছে যে, অনেক) ছোট ছোট দল অনেক বড় বড় দলকে পরাজিত করেছে। (আসল হচ্ছে দৃঢ়তা) এবং আল্লাহ্ তা'আলা দৃঢ় ব্যক্তিদের সাথে থাকেন। আর যখন (তাঁরা আমালেকা অঞ্চলে পদার্পণ করলেন) এবং জালুত ও তার সৈন্যদের সামনে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন (বললেন) হে আমাদের পরওয়ারদিগার! তোমার পক্ষ থেকে আমাদের উপর (আমাদের অন্তরে) দৃঢ়তা দান কর (যুদ্ধের সময়) এবং আমাদেরকে এ কাফির জাতির উপর বিজয়ী কর। অতঃপর তালুত জালুতের বাহিনীকে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে পরাজিত করল এবং দাউদ (আ) (যিনি তখন তালুত-বাহিনীতে ছিলেন এবং তখনো নবুয়ত প্রাপ্ত হননি) জালুতকে হত্যা করলেন (এবং বিজয়ীর বেশে ফিরে এলেন)। আর (তারপর) তাঁকে (দাউদকে) রাজত্ব এবং হিকমত (হিকমত বলতে এ স্থলে নবুয়ত) দান করলেন। আর তাঁকে যা ইচ্ছা ছিল তাই শিক্ষা দিলেন। (যেমন, যন্ত্রপাতি ছাড়াই বর্শা তৈরি করা, পশু-পাখি এবং জীবজন্তুর ভাষা বোঝা, তারপর ঘটনার শুভাশুভ বর্ণনা করা প্রভৃতি)। আর যদি এরূপ না হতো যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন লোককে (যারা দাঙ্গাপ্রিয়) কোন কোন লোক দ্বারা (যারা সময় সময় ভাল কাজ করে তাদেরকে দাঙ্গা সৃষ্টিকারীদের উপর জয়ী না করতেন,) তবে দুনিয়ার শৃঙ্খলা (সম্পূর্ণভাবে) বিঘ্নিত হতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াবাসীর প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান (বলেই সময় সময় তাদের সংশোধন করেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

সেই বনী ইসরাঈলরা আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করেছিল বলে আমালেকার কাফিরদেরকে তাদের উপর চড়াও করে দেওয়া হয়েছিল। তখন তাদের সংশোনের চিন্তা হলো। এখানে যে নবীর কথা বলা হয়েছে, তিনি 'শামঈল' নামে পরিচিত।

اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ—বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি সিন্দুক পূর্ব থেকেই ছিল, তা বংশ-পরম্পরায় চলে আসছিল। তাতে হযরত মূসা (আ) ও অন্যান্য নবীর পরিত্যক্ত কিছু বরকতপূর্ণ বস্তুসামগ্রী রক্ষিত ছিল। বনী ইসরাঈলগণ যুদ্ধের সময় এ সিন্দুকটিকে সামনে রাখতো, আল্লাহ্ তা'আলা এর দৌলতে তাদেরকে বিজয়ী করতেন। জালুত বনী ইসরাঈলদেরকে পরাজিত করে এ সিন্দুকটি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ যখন এ সিন্দুক ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন অবস্থা দাঁড়াল এই যে, কাফিররা যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারী ও অন্যান্য বিপদাপদ। এমনিভাবে পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে অপারক ও অতিষ্ঠ হয়ে দু'টি গরুর উপর সেটি উঠিয়ে হাঁকিয়ে দিল। ফেরেশতাগণ গরুগুলোকে তাড়া করে এনে তালুতের দরজায় পৌছে দিলেন। বনী ইসরাঈলরা এ নিদর্শন দেখে তালুতের

রাজত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করল এবং তালুত জালুতের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন। তখন মৌসুম ছিল অত্যন্ত গরম।

قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ —এ পরীক্ষার কারণ আমার মতে এই যে, অনুরূপভাবে মানুষের জোশ ও উত্তেজনা অনেক গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু প্রয়োজনের সময় খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই এগিয়ে আসে। উপরন্তু তখন কিছু লোকের অসহযোগ অন্যান্য লোককেও বিচলিত করে। এসব লোককে দূরে সরানোই ছিল আল্লাহ্র ইচ্ছা। তাই তাদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন যা অত্যন্ত উপযোগী ছিল। কেননা, যুদ্ধের সময় দৃঢ়তা ও কষ্টসহিষ্ণুতারই বেশি প্রয়োজন। অতএব, পিপাসার তীব্রতার সময় পানি পাওয়া সত্ত্বেও পান করা থেকে বিরত থাকা দৃঢ়তার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে এ অবস্থায় অন্ধের মত ঝাঁপিয়ে পড়া অস্থিরতার লক্ষণ।

পরবর্তীতে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বর্ণনা করা হয়েছে যে, অতিমাত্রায় পানি পানকারিগণ শারীরিক দিক দিয়ে বেকার হয়ে পড়লো এবং তারা দ্রুত চলাফেরা করতে অপারক হয়ে গেল। রূহুল-মা'আনীতে ইবনে আবি হাতেমের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতিতে ঘটনার যে পরিণতি বর্ণিত হয়েছে তাতে বোঝা যায়, এতে তিন ধরনের লোক ছিল।

একদল অসম্পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। দ্বিতীয় দল পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের সংখ্যা কম বলে চিন্তা করেছে এবং তৃতীয় দল ছিল পরিপূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং নিজেদের সংখ্যালঘিষ্ঠতার কথাও চিন্তা করেন নি।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۵۲﴾

---

(২৫২) এগুলো হলো আল্লাহ্র নিদর্শন, যা আমরা তোমাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে থাকি। আর আপনি নিশ্চিতই আমার রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যেহেতু কোরআন-করীমের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে হুযূরে আকরাম (সা)-এর নবুয়ত প্রমাণ করা কাজেই যেখানে সামঞ্জস্য রয়েছে, সেখানে তার পুনরাবৃত্তি করে এক্ষেত্রে আলোচ্য কাহিনী সম্পর্কে যথাযথ সংবাদ দেওয়া যা তিনি কখনও কারো কাছে পড়েন নি, কারো কাছে শুনেননি কিংবা তিনি নিজেও দেখেন নি—এটাও একটা মু'জিযা, যা হুযূর আকরাম (সা)-এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে তাঁর নবুয়তের প্রমাণ উপস্থাপন করা হচ্ছে—

নবুয়তে মুহাম্মদীর দলীল ঃ এ (আয়াতসমূহ যাতে সে কাহিনীই বিবৃত হয়েছে) আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন, যা সঠিকভাবে আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাচ্ছি এবং (এতে প্রমাণ হয় যে,) তিনি নিঃসন্দেহে নবী।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

(২৫৩) এই রাসূলগণ—আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ তো হলো তারা, যার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন, আর কারও মর্যাদা উচ্চতর করেছেন এবং আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে প্রকৃষ্ট মু'জিযা দান করেছি এবং তাকে শক্তিদান করেছি 'রূহুল-কুদ্স'—অর্থাৎ জিবরাঈলের দ্বারা। আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর পয়গম্বরদের পিছনে যারা ছিল তারা লড়াই করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফির। আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো, কিন্তু আল্লাহ্ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কতিপয় নবী ও তাঁদের উম্মতের কিছু অবস্থা ঃ প্রেরিত এই রাসূলগণ (যাঁদের কথা إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ অংশে বলা হয়েছে) এমন যে, আমি তাদের মধ্যে কতিপয়কে ঊর্ধ্বে মর্যাদা দান করেছি। (যেমন) তাদের মধ্যে কেউ আছেন যাদের সাথে (ফেরেশতাদের মাধ্যম ছাড়াই) আল্লাহ্ (সরাসরি) কথা বলেছেন (অর্থাৎ মূসা [আ])। আবার কাউকে তাদের মধ্যে অতি উচ্চ-মর্যাদায় বরণ করেছি এবং আমি ঈসা ইবনে মরিয়মকে প্রকাশ্যে দলীল (মু'জিযা) দান করেছি এবং আমি তার সমর্থন রূহুল কুদ্স (অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল [আ])-এর দ্বারা করেছি (যিনি ইহুদীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য সব সময় তাঁর সাথে থাকতেন)। আর যদি আল্লাহ্র ইচ্ছা হতো, তবে (উম্মতের) যারা (ঐ নবীগণের) পরে এসেছে (কখনও ধর্মীয় মতানৈক্য করে) পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করতো না, তাদের কাছে (সত্য বিষয়ের) প্রমাণ (নবীদের মাধ্যমে) উপস্থাপিত হয়ে যাওয়ার পর। (যার প্রেক্ষিতে উচিত ছিল ধর্মকে গ্রহণ করা) কিন্তু (যেহেতু এতে আল্লাহ্ তা'আলার কিছু হিকমত ছিল, এজন্য তাদের মধ্যে ধর্মীয় মতৈক্য সৃষ্টি করেননি। ফলে) তারা পরস্পর (ধর্মীয় ব্যাপারে) ভিন্ন ভিন্ন দল (বিভক্ত) হয়ে গেছে। সুতরাং

তাদের মধ্যে কেউ ঈমান এনেছে আর কেউ কাফির রয়ে গেছে। (এমনকি এ মতানৈক্যের দরুন যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্যন্ত বেধে গেছে) আর যদি আল্লাহ্র ইচ্ছা হতো, তবে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা (স্বীয় হিকমত অনুযায়ী) যা ইচ্ছা (নিজের কুদরতে) তাই করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

(১) আয়াত تِلْكَ الرُّسُلُ-এর বক্তব্যে নবী করীম (সা)-কে এক প্রকার সান্ত্বনা দান করা উদ্দেশ্য। কেননা, তাঁর নবুয়ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরও অর্থাৎ যা اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও কাফিররা তা মেনে নিচ্ছিল না। ফলে এটি তাঁর পক্ষে দুঃখ ও অনুতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা একথা শুনিয়ে দিয়েছেন যে, ইতিপূর্বেও বিভিন্ন পদমর্যাদা সম্পন্ন বহু নবী অতিক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু কারোই সমগ্র উম্মত ঈমানদার হয়নি। কিছুসংখ্যক লোক আনুগত্য প্রদর্শন করেছে, আবার অনেক লোক বিরুদ্ধাচরণও করেছে। অবশ্য এতেও আল্লাহ্র বহু রহস্য রয়েছে, যদিও তা সবার বুঝে আসে না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এতটুকু বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, এর মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন বিশেষ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

(২) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আয়াতটিতে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণের মধ্যে কেউ কেউ অন্য নবী অপেক্ষা মর্যাদায় বড় ছিলেন, অথচ হাদীসে রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ لا تفضلوا بين انبياء الله।—অর্থাৎ "আল্লাহ্র নবীগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করো না।" তিনি আরো বলেছেন ঃ لا تخيروني على موسى—আমাকে মূসা (আ)-এর চাইতে বড় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করো না। আরো উক্ত হয়েছে لا اقول ان احداً افضل من يونس بن متى —"আমি বলতে পারি না যে, কেউ ইউনুস ইবনে মাতা অপেক্ষা উত্তম।"

এ হাদীসগুলোতে কোন নবীকে অন্য নবী অপেক্ষা উত্তম বলে মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কোরআনের আয়াত এবং এসব হাদীসে উল্লিখিত বক্তব্যের মধ্যে সৃষ্ট আপাত-বিরোধ সম্পর্কে বলা যায় যে, এসব হাদীসের অর্থ হচ্ছে, নিজেদের মনমত কোন নবীকে কোন নবীর ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া এবং এ ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা নিষিদ্ধ। কারণ বিশেষ কোন নবীর মর্যাদা অন্যের তুলনায় বেশি হওয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্র দরবারে তাঁরই মর্যাদা বেশি। বলা বাহুল্য, এ তারতম্য আল্লাহ্র দ্বারাই নির্ধারিত এবং একমাত্র তাঁরই জানা। মতামত কিংবা তুলনার মাধ্যমে এটা স্থির করার বিষয় নয়। তবে কোরআন ও হাদীসের দলীলের মাধ্যমে যদি কোন নবীর মর্যাদা অন্য নবী অপেক্ষা বেশি বলে অনুমিত হয়, তবে এতে বিশ্বাস রাখা দূষণীয় হবে না। মহানবী (সা)-এর এই বাণী ঃ

لا تخيروني على موسى এবং لا اقول ان احدا افضل من يونس بن متى হয়তো ঐ সময়ের যখন তাঁকে জানান হয়নি যে, তিনি সমস্ত নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরে ওহীর মাধ্যমে তাঁকে একথা জানিয়ে দেওয়া হলে তিনি সাহাবীগণের নিকট একথা প্রকাশও করেছেন। —(মাযহারী)

(৩) مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ —হযরত মূসা (আ)-এর সাথেই আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যম ব্যতীত কথা বলেছেন। কিন্তু তাও অন্তরালমুক্ত ছিল না। কেননা, সূরা শুরার আয়াতে مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ (কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলা বাস্তবসম্মত নয়)—আয়াতে অন্তরালমুক্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলার বিষয়টিকে নাকচ করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ্‌র কথা বলা অন্তরাল থেকেই হয়েছে। অবশ্য মৃত্যুর পরে কোন রকম অন্তরাল বা যবনিকা ছাড়াই কথাবার্তা হওয়া সম্ভব। তাই শুরার সে আয়াতটি পার্থিব জীবন সম্পর্কে প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٥٤﴾

(২৫৪) হে ঈমানদারগণ ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচাকেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফিররাই হলো প্রকৃত জালিম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে দেরি করা অনুচিত ঃ হে ঈমানদারগণ ! আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর, কিয়ামতের সে দিনটি আসার আগে যে দিন (কোন কিছুই নেক আমল বা সৎকর্মের পরিপূরক হতে পারবে না। কেননা, সেদিন) বেচাকেনাও চলবে না (যে, কোন বস্তুর বিনিময়ে নেক আমল ক্রয় করবে)। আর না (অমন) বন্ধুত্ব থাকবে (যে, কেউ তোমাদেরকে নিজের নেক আমল দিয়ে সাহায্য করবে) আর নাইবা (আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কারো) কোনও সুপারিশ (কার্যকর) হবে (ফলে তোমাদের আর সৎ কাজের প্রয়োজন হবে না)। কাফিররা (নিজের কর্মশক্তি এবং ধন-সম্পদ অস্থানে ব্যয় করে নিজের উপর) জুলুম করে। (তেমনিভাবে তারা শারীরিক ও অর্থনৈতিক আনুগত্য পরিহার করে পাপাচারের পথ অবলম্বন করে। কাজেই তোমরা তাদের মত হয়ো না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় ইবাদত এবং বৈষয়িক আচার-আচরণের বেশ কিছু বিধান এবং রীতিনীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোর বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মনের উপর চাপ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। যাবতীয় সৎ কাজের মধ্যে জানমাল ব্যয় করাটাই মানুষের কাছে সবচাইতে কঠিন মনে হয়। অথচ আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের অধিকাংশই জান অথবা মাল সম্পর্কিত। তাছাড়া অধিকাংশ মানুষই পাপে লিপ্ত হয়, এই জানের মহব্বত অথবা মালের প্রতি আসক্তির কারণেই। সুতরাং বলতে গেলে এ দু'টিই সমস্ত পাপের মূল উৎস। আর তা থেকে মুক্তি লাভই হলো যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগীর লক্ষ্য। কাজেই এসব বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর যুদ্ধ-বিগ্রহের আলোচনা একান্তই যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ শীর্ষক আয়াতে জানের মহব্বত ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী আয়াত ঃ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ -এর মধ্যে সম্পদের মোহ ত্যাগ করে—তাও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে বিলিয়ে দেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এরপরে বর্ণিত তালুতের কাহিনী দ্বারা একথা বোঝানো হয়েছে যে, মর্যাদা ও কর্তৃত্ব প্রাপ্তি ধন-সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়। এটা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। পরন্তু যারা জানের পরোয়া না করেই আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করে, তাদের নজীর এবং প্রতিফলও তালুতের ঘটনাতে বিধৃত হয়েছে। অতঃপর সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দিয়ে জীবনের প্রকৃত সাফল্য লাভ করার উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ ...أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ —অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর।

যেহেতু সম্পদ ব্যয় করার উপর অনেক ইবাদত ও মোয়ামেলাত নির্ভরশীল, তাই এ বিষয়টি সমধিক বিস্তারিতভাবে এবং গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী রুকূতেও বেশির ভাগ আলোচনা সম্পদ ব্যয় প্রসঙ্গেই করা হয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এখনই কাজ করার সময়। পরকালে কোন কাজ বা ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, আর বন্ধুত্বের খাতিরেও কেউ দেবে না। পক্ষান্তরে কেউ এসে সুপারিশ করে মুক্ত করবে, তাও সম্ভব হবে না; যতক্ষণ আল্লাহ্ নিজে না ছাড়বেন।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

(২৫৫) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া ? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সেসবই তিনি জানেন; তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা (এমন যে,) তিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব (যার কোনদিন মৃত্যু হতে পারে না। সমগ্র বিশ্বকে) তিনি রক্ষা (করেন) ও আয়ত্তে রাখেন। না, তাঁকে তন্দ্রা কাবু করতে পারে, না নিদ্রা (কাবু করতে পারে)। তাঁর রাজত্বের আওতায়ই সব কিছু, (যা কিছু) আসমান ও যমীনে রয়েছে। এমন কে আছে, যে ব্যক্তি তাঁর নিকট (কারো জন্য) সুপারিশ করতে পারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত ? তিনি জানেন (সমস্ত) সৃষ্টির, যাবতীয় অতীত ও বর্তমান অবস্থা। আর এ সৃষ্টিরাজির পক্ষে তাঁর জানা বিষয়গুলোর মধ্য থেকে কেউ কোন কিছুই নিজের জ্ঞান-সীমায় পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটা (জ্ঞানদান করতে তিনি) ইচ্ছা করেন ততটাই (পেতে পারে)। তাঁর সিংহাসনটি (এত বিরাট ও ব্যাপক যে,) সমস্ত আসমান ও যমীনকে নিজের বেষ্টনীতে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। আর আল্লাহ্র পক্ষে সে দু'টির (আসমান ও যমীনের) রক্ষণাবেক্ষণে কোনই অসুবিধা হয় না। তিনি মহান—মহীয়ান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতুল কুরসীর বিশেষ ফযীলত ঃ এ আয়াতটি কোরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত। হাদীসে এ আয়াতের অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত হয়েছে। মস্নাদে আহ্মদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) এটিকে সবচাইতে উত্তম আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূল (সা) উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোরআনের মধ্যে কোন্ আয়াতটি সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ? উবাই ইবনে কা'ব আরয করলেন, তা হচ্ছে আয়াতুল কুরসী। রাসূল (সা) তা সমর্থন করে বললেন ঃ হে আবুল মান্যার ! তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।

হযরত আবূযর (রা) রাসূল (সা)-এর কাছে জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! কোরআনের বৃহত্তম আয়াত কোন্‌টি ? তিনি উত্তরে বললেন, আয়াতুল-কুরসী।—(ইবনে-কাসীর)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, সূরা বাকারায় এমন একটি আয়াত রয়েছে, যা কোরআনের অন্য সব আয়াতের সর্দার বা নেতা। সে আয়াতটি যে ঘরে পড়া হয়, তা থেকে শয়তান বেরিয়ে যায়।

নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনাতে রয়েছে যে, হুযূরে আকরাম (সা) ইরশাদ করেছেন, "যে লোক প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না।" অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের ফলাফল এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে।

এ আয়াতে মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহুর একক অস্তিত্ব, তওহীদ ও গুণাবলীর বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহ্র অস্তিত্ববান হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাক্‌শক্তিসম্পন্ন হওয়া, তাঁর সত্তার অপরিহার্যতা, তাঁর অসীম-অনন্তকাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের

অধিকারী হওয়া, যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে কেউ কোন কথা বলতে না পারে, এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া, যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তার যাবতীয় বস্তুকে সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে কোন ক্লান্তি বা পরিশ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয় না এবং এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া কোন প্রকাশ্য কিংবা গোপন বস্তু কিংবা কোন অণু-পরমাণুর বিন্দু-বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে পারে না। এই হচ্ছে আয়াতটির মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এখন বিস্তারিতভাবে এর বাক্যগুলো লক্ষ্য করা যাক। এ আয়াতটিতে দশটি বাক্য রয়েছে।

প্রথম বাক্য ঃ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ —এতে 'আল্লাহ্' শব্দটি অস্তিত্ববাচক নাম। অর্থ, সে সত্তা যা সকল পরাকাষ্ঠার অধিকারী ও সব কিছু থেকে মুক্ত لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ —সে সত্তারই বর্ণনা, যে সত্তা ইবাদতের যোগ্য। 'ইলাহ্' সে সত্তা ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

দ্বিতীয় বাক্য ঃ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ আরবী ভাষায় حَىٌّ অর্থ হচ্ছে জীবিত। আল্লাহ্র নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দিয়েছেন যে, তিনি সর্বদা জীবিত ও বিদ্যমান থাকবেন; মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। قَيُّوْمٌ শব্দ 'কিয়াম' শব্দ হতে উৎপন্ন, ইহা ব্যুৎপত্তিগত আধিক্যের অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে অন্যকে বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। 'কাইয়্যুম' আল্লাহ্র এমন এক বিশেষ গুণ, যাতে কোন সৃষ্টি অংশীদার হতে পারে না। তাঁর সত্তা স্থায়িত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেননা, যে নিজের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী, সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কি করে করবে ? সে জন্যই কোন মানুষকে 'কাইয়্যুম' বলা জায়েয নয়। যারা 'আবদুল কাইয়্যুম' নাম বিকৃত করে শুধু 'কাইয়্যুম' বলে তারা গোনাহ্গার হবে।

আল্লাহ্র গুণবাচক নামের মধ্যে حَىٌّ وَقَيُّوْمٌ অনেকের মতে 'ইসমে-আযম'। হযরত আলী (রা) বলেছেন যে, বদরের যুদ্ধে আমি একবার চেয়েছিলাম যে, রাসূল (সা)-কে দেখবো তিনি কি করছেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, তিনি সিজদায় পড়ে يا حى - يا قيوم বলছেন।

তৃতীয় বাক্য ঃ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ — سِنَةٌ সীন-এর যের দ্বারা উচ্চারণ করলে এর অর্থ হয় তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব। نَوْمٌ পূর্ণ নিদ্রাকে বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পূর্ববর্তী বাক্যে 'কাইয়্যুম' শব্দে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর আশ্রয়েই বিদ্যমান। এতে করে হয়তো ধারণা হতে পারে যে, যে সত্তা এত বড় কার্য পরিচালনা করছেন, তাঁর কোন সময় ক্লান্তি আসতে পারে এবং কিছু সময় বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য থাকা দরকার। দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ্কে নিজের বা অন্য কোন সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করবে না, নিজের মতো মনে করবে না। তিনি সমকক্ষতা ও সকল তুলনার উর্ধ্বে। তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে এসব কাজ করা কঠিন নয়। আবার তাঁর ক্লান্তিরও কোন কারণ নেই। আর তার সত্তা যাবতীয় ক্লান্তি, তন্দ্রা ও নিদ্রার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

চতুর্থ বাক্য ঃ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত "لام" অক্ষর মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে, সেসবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির মালিক। যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

পঞ্চম বাক্য ঃ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ অর্থ হচ্ছে এমন কে আছে, যে তাঁর সামনে কারো সুপারিশ করতে পারে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত ? এতে কয়েকটি মাস'আলা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম হচ্ছে এই যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর মালিক এবং কোন বস্তু তাঁর চাইতে বড় নয়, তাই কেউ তাঁর কোন কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকারী নয়। তিনি যা কিছু করেন, তাতে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। তবে এমন হতে পারতো যে, কেউ কারো জন্য সুপারিশ করে। তাই এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ ক্ষমতাও কারো নেই। তবে আল্লাহ্‌র কিছু খাস বান্দা আছেন, যাঁরা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে পারবেন, অন্যথায় নয়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—রাসূল (সা) বলেছেন ঃ হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সমস্ত উম্মতের জন্য সুপারিশ করবো। একে 'মাকামে-মাহ্‌মুদ' বলা হয়, যা হুযূর (সা)-এর জন্য খাস; অন্যের জন্য নয়।

ষষ্ঠ বাক্য ঃ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা অগ্র-পশ্চাৎ যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত। অগ্র-পশ্চাৎ বলতে এ অর্থও হতে পারে যে, তাদের জন্মের পূর্বে ও জন্মের পরের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা আল্লাহ্‌র জানা রয়েছে। আর এ অর্থও হতে পারে যে, অগ্র বলতে সে অবস্থা বোঝানো হয়েছে, যা মানুষের জন্য প্রকাশ্য, আর পশ্চাৎ বলতে বোঝানো হয়েছে যা অদৃশ্য। তাতে অর্থ হবে এই যে, কোন কোন বিষয় মানুষের জ্ঞানের আওতায় রয়েছে কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। তাঁর জ্ঞান সে সমস্ত বিষয়ের ওপরই পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এ দুটিতে কোন বিরোধ নেই। আয়াতের ব্যাপকতায় উভয় দিকই বোঝানো হয়।

সপ্তম বাক্য ঃ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ অর্থাৎ মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের কোন একটি অংশ বিশেষকেও পরিবেষ্টিত করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেন, শুধু ততটুকুই সে পেতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টির অণু-পরমাণুর ব্যাপক জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের আওতাভুক্ত—এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। মানুষ অথবা অন্য কোন সৃষ্টি এতে অংশীদার নয়।

অষ্টম বাক্য ঃ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ অর্থাৎ তাঁর কুরসী এত বড়, যার মধ্যে সাত আকাশ ও যমীন পরিবেষ্টিত রয়েছে। আল্লাহ্ উঠা-বসা আর স্থান-কাল থেকে মুক্ত। এ ধরনের আয়াতকে মানুষের কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের সাথে তুলনা করা উচিত নয়। এর অবস্থা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা মানবজ্ঞানের ঊর্ধ্বে। তবে হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এতটুকু বোঝা যায় যে, আরশ ও কুরসী এত বড় যে, তা সমগ্র আকাশ ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে

রেখেছে। ইবনে কাসীর হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হুযূর (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কুরসী কি এবং কেমন ? তিনি বলেছেন, যার ইখতিয়ারে আমার প্রাণ, তাঁর কসম—কুরসীর সাথে সাত আকাশ ও সাত যমীনের তুলনা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেয়া একটি আংটির মত। অন্য এক বর্ণনাতে আছে যে, আরশের তুলনায় কুরসীও অনুরূপ।

নবম বাক্য ঃ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে এ দু'টি বৃহৎ সৃষ্টি, আসমান ও যমীনের হেফাজত করা কোন কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। কারণ, এই অসাধারণ ও একক পরিপূর্ণ সত্তার পক্ষে এ কাজটি একান্তই সহজ ও অনায়াসসাধ্য।

দশম বাক্য ঃ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ তিনি অতি উচ্চ ও অতি মহান। পূর্ববর্তী নয়টি বাক্যে আল্লাহ্র সত্তা ও গুণের পূর্ণতা বর্ণনা করা হয়েছে। তা দেখার এবং বোঝার পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে যে, সকল শান-শওকত বড়ত্ব ও মহত্ত্ব এবং শক্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। এ দশটি বাক্যে আল্লাহ্র 'যাত' ও সিফাতের পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾

---

(২৫৬) দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়েত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙবার নয়। আর আল্লাহ্ সবই শুনেন এবং জানেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইসলাম) ধর্মে (গ্রহণ করার ব্যাপারে) কোন বাধ্যবাধকতা (আরোপের কোন স্থান) নেই, (কেননা) হেদায়েত নিশ্চয়ই গোমরাহী হতে পৃথক হয়ে গেছে। (অর্থাৎ ইসলামের সত্যতা প্রকাশ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাতে জোর করার কোন স্থান নেই। 'ইক্রাহ্' বলা হয় অপছন্দনীয় কাজে কাউকে বাধ্য করাকে। আর ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য যখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে) কাজেই যারা শয়তানের প্রতি বিরূপ হবে এবং আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করবে) তারা অত্যন্ত শক্ত বৃত্তকে আশ্রয় করেছে। যা কোন প্রকারেই নষ্ট হতে পারে না। এবং আল্লাহ্ তা'আলা (বাহ্যিক) বিষয়েও অত্যন্ত শ্রবণকারী এবং (অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও) অত্যন্ত জ্ঞানের অধিকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামকে যারা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সেজন্য তাদেরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে কোন শক্ত দড়ির বেষ্টনকে সুদৃঢ়ভাবে ধরে পতন থেকে মুক্তি পায়। আর এমন দড়ির ছিঁড়ে পড়ার যেমন ভয় থাকে না, তেমনিভাবে ইসলামেও কোন রকম ধ্বংস কিংবা ক্ষতি নেই। তবে দড়িটি যদি কেউ ছিঁড়ে দেয় তা যেমন স্বতন্ত্র কথা, তেমনিভাবে কেউ যদি ইসলামকে বর্জন করে, তবে তাও স্বতন্ত্র ব্যাপার। —(বয়ানুল-কোরআন)

এ আয়াত দেখে কোন কোন লোক প্রশ্ন করে যে, আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। অথচ ইসলাম ধর্মে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?

একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এমন প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ ইসলামে জিহাদ ও কেতালের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য দেওয়া হয়নি। যদি তাই হতো, তবে জিযিয়া করের বিনিময়ে কাফিরগণকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইসলামের জিহাদ ও কেতাল ফেৎনা-ফাসাদ বন্ধ করার লক্ষ্যে করা হয়। কেননা, ফাসাদ আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয়, অথচ কাফিররা ফাসাদের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ তারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ফাসাদকারীকে পছন্দ করেন না।

এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদ এবং কেতালের মাধ্যমে এসব লোকের সৃষ্ট যাবতীয় অনাচার দূর করতে আদেশ দিয়েছেন। সেমতে জিহাদের মাধ্যমে অনাচারী জালিমদের হত্যা করা সাপ-বিচ্ছু ও অন্যান্য কষ্টদায়ক জীবজন্তু হত্যা করারই সমতুল্য।

ইসলাম জিহাদের ময়দানে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং অচল ব্যক্তিদের হত্যা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছে। আর এমনিভাবে সে সমস্ত মানুষকেও হত্যা করা থেকে বিরত করেছে, যারা জিযিয়া কর দিয়ে আইন মান্য করতে আরম্ভ করেছে।

ইসলামের এ কার্য পদ্ধতিতে বোঝা যায় যে, সে জিহাদ ও কেতালের দ্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না, বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অন্যায়-অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দিয়েছে। হযরত উমর (রা) একজন বৃদ্ধা নাসারা স্ত্রীলোককে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তখন সে স্ত্রীলোক উত্তর দিল, انا عجوز كبيرة والموت الى قريب আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা। শেষ জীবনে নিজের ধর্ম কেন ত্যাগ করবো? হযরত উমর (রা) একথা শুনেও তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন নি বরং এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ ধর্মে কোন বল প্রয়োগের নিয়ম নেই। বাস্তব পক্ষে ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ সম্ভবও নয়। কারণ, ঈমানের সম্পর্ক বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে নয়। আর জিহাদ ও কেতাল দ্বারা শুধু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রভাবিত হয়। সুতরাং এর দ্বারা ঈমান গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভবই নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ ও কেতালের নির্দেশ لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ আয়াতের পরিপন্থী নয়। —(মাযহারী)

اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ ؕ۬ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا
اَوْلِیٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۵۷﴾

(২৫৭) যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। সে তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا .... خٰلِدُوْنَ .

আল্লাহ্ তা'আলা সে সমস্ত লোকের অভিভাবক যারা ঈমান এনেছে। তাদেরকে তিনি (কুফরের) অন্ধকার থেকে বের করে (ইসলামের) আলোর দিকে আনয়ন করেন। আর যারা কাফির তাদের অভিভাবক হলো (মানুষ ও জিন) শয়তান। যে তাদেরকে (ইসলামের) আলো হতে বের করে (কুফরের) অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। এসব মানুষ (যারা ইসলাম ত্যাগ করে কুফর গ্রহণ করে) দোযখের বাসিন্দা হবে (এবং) তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইসলাম সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত এবং কুফর সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য। এতদসঙ্গে কাফির বা বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব করার বিপদ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, এরা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নেয়।

اَلَمْ تَرَ اِلَی الَّذِیْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِیْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ
اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّیَ الَّذِیْ یُحْیٖ وَیُمِیْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْیٖ وَاُمِیْتُ ؕ قَالَ
اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ یَاْتِیْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
فَبُهِتَ الَّذِیْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۲۵۸﴾

(২৫৮) তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ্ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন। ইবরাহীম

যখন বলল, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন সে কাফির হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সম্বোধিত) তুমি কি সে ব্যক্তির কাহিনী অবগত হওনি (অর্থাৎ নমরূদের) যে ব্যক্তি ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তর্ক করেছিল নিজের পালনকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে (নাউযুবিল্লাহ্ ! সে আল্লাহ্র অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছিল) এজন্য যে, আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন (অর্থাৎ তার উচিত ছিল রাজত্বের নেয়ামত পাওয়ার পর শুকরিয়া আদায় করা এবং ঈমান আনা। কিন্তু সে আল্লাহ্র অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে কুফরী করতে আরম্ভ করলো। আর এমনটি তখন আরম্ভ হয়েছিল) যখন (তার প্রশ্নের উত্তরে যে, আল্লাহ্র স্বরূপ কি) ইবরাহীম (আ) বলেছিলেন যে, আমার পালনকর্তা এমন যে, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। (জীবিত করা এবং মৃত্যু ঘটানো তাঁর ক্ষমতাধীন। সে জীবিত করা ও মৃত্যু ঘটানোর অর্থ বুঝেনি, তাই) বলতে লাগল (এ কাজ তো আমিও করতে পারি) আমিও জীবিত রাখি এবং মারি। [যাকে ইচ্ছা হত্যা করি, এটাই তো মারা। আর যাকে ইচ্ছা হত্যা থেকে রেহাই দেই। আর এটাই তো জীবিত রাখা। ইবরাহীম (আ) যখন দেখলেন যে, এ মোটা বুদ্ধির লোক, তাই এটাকে জীবন দান ও মৃত্যু দান মনে করে। অথচ জীবন দান অর্থ প্রাণহীন বস্তুতে প্রাণের সঞ্চার করা এবং মৃত্যু দান অর্থ প্রাণনাশ করা। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, সে জীবিত করা আর মৃত্যু ঘটানোর তাৎপর্যই বুঝে না। কাজেই] হযরত ইবরাহীম (আ) তখন (অন্য যুক্তির দিকে গেলেন) বললেন, (যাক) আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যকে (প্রত্যেক দিন) পূর্ব দিকে উদিত করেন, তুমি (মাত্র একদিন) পশ্চিম দিকে উদয় কর। এতে সে হতভম্ব হয়ে গেল। (সে কাফির আর কোন উত্তর দিতে পারলো না। এ যুক্তির পর তার উচিত ছিল হেদায়েত গ্রহণ করা। কিন্তু সে তার গোমরাহীতেই ডুবে রইল) এবং আল্লাহ্ তা'আলার (নিয়ম হচ্ছে) এমন পথহারাদেরকে হেদায়েত দান করেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাফির ব্যক্তিকে দুনিয়াতে মান-সম্মান এবং রাজত্ব দান করেন, তখন তাকে সে নামে অভিহিত করা জায়েয। এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রয়োজনবোধে তার সাথে তর্ক-বিতর্ক করাও জায়েয, যাতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।

কেউ কেউ এরূপ সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, সে হয়তো বলতে পারতো যে, যদি আল্লাহ্ বলতে কেউ থাকেন, তবে তিনিই পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত করুন। এর উত্তর হচ্ছে এই যে, তার অন্তরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একথা জেগে উঠলো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আছেন এবং পূর্ব দিক হতে সূর্য উদয় করা তাঁর কাজ এবং তিনি পশ্চিম দিক হতেও উদয় করতে পারেন। আর এ ব্যক্তি নবী হয়ে থাকলে অবশ্যই এমন হবে। আর এমন হলে বিশ্বময় এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি হয়ে

যাবে। তাতে না আবার লাভের পরিবর্তে ক্ষতি বেড়ে যায় ! যেমন, মানুষ এ মু'জিযা দেখে যদি আমার দিক থেকে ফিরে তার দিকে ঝুঁকে যায় ! সামান্য বাড়াবাড়িতে না আবার রাজত্বই চলে যায়। কাজেই সে উত্তরও দেয় নাই। তার কাছে এ প্রশ্নের কোন উত্তরও ছিল না। এ জন্য হতভম্ব হয়ে পড়ে। —(বয়ানুল-কোরআন)

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّ هِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ
هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ
لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ
فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ
وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ
نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى
كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٥٩﴾

(২৫৯) তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ি-ঘরগুলো ভেঙে ছাদের উপর পড়েছিল। বলল, কেমন করে আল্লাহ্ মরণের পর একে জীবিত করবেন ? অতঃপর আল্লাহ্ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ' বছর। তারপর তাকে উঠালেন ! বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল, আমি ছিলাম একদিন কিংবা একদিনেরও কিছু কম সময়। বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ' বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে—সেগুলো পচে যায়নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য নিদর্শন বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হলো, তখন বলে উঠল—আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ........ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۔

এমন কাহিনীও কি তোমরা জান (যে, এক লোক ছিল। একবার চলতে চলতে সে) এমন এক জনপদের উপর দিয়ে (এমনি অবস্থায়) অতিক্রম করল যে, তার বাড়ি-ঘরগুলো ছাঁদের

উপর পড়ে রয়েছে (অর্থাৎ প্রথমে ছাদ ভেঙে পড়েছে এবং পরে এর উপর ঘরগুলো পতিত হয়েছে অর্থাৎ কোন দুর্ঘটনার ফলে জনপদটি সম্পূর্ণ বিরান হয়ে গিয়েছিল এবং সমস্ত লোক মরে গিয়েছিল)। সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্ এ জনপদের মৃত ব্যক্তিদের কিভাবে (কিয়ামতের দিন) জীবিত করবেন। (তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ সকল মৃত ব্যক্তিকেই জীবিত করবেন। এতদসত্ত্বেও জীবিত করার ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে মনে এমন একটা ভাব সৃষ্টি হলো যে, মৃতের পুনর্জীবন দানের এই বিস্ময়কর ব্যাপারটা না জানি আল্লাহ্ পাক কিভাবে সম্পন্ন করবেন ! কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তো যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই যে কোন কাজ আনজাম দিতে পারেন। আল্লাহ্র ইচ্ছা হলো যে, এ দৃশ্যটি এ দুনিয়াতেই তাকে দেখিয়ে দেন। তাতে একটি দৃষ্টান্তও স্থাপিত হবে এবং এর দ্বারা লোকেরা হেদায়েতপ্রাপ্তও হবে। সুতরাং এজন্য) আল্লাহ্ পাক সে ব্যক্তিকে মৃত্যু দিয়ে একশ' বছর পর পুনরায় তাকে জীবিত করলেন (এবং পরে) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কতদিন এ অবস্থায় ছিলে ? সে উত্তর দিল, একদিন রয়েছি কিংবা একদিনের কিছু কম (সময়)। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, না; বরং একশ' বছর (তুমি এ অবস্থায়) ছিলে। (যদি তোমার শরীরের কোন পরিবর্তন না হওয়াতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে থাক, তবে) তোমার খাবারগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর যে, একটুও পচে-গলে যায়নি (এটি আমার একটি কুদরত)। এবং (দ্বিতীয় কুদরত দেখার জন্য) তোমার (বাহন) গাধাটির প্রতি লক্ষ্য কর (পচে-গলে) তার কি অবস্থা (হয়েছে) এবং আমি অতি সত্বর একে তোমার সামনে জীবিত করে দেখাবো এবং আমি তোমাকে এজন্য (মেরে পুনরায় জীবিত করেছি) যে, আমি তোমাকে আমার কুদরতের একটি নযীর স্থাপন করছি। (যাতে এ ঘটনার দ্বারা কিয়ামতের দিন জীবিত হওয়ার প্রমাণ দেওয়া যায়)। এবং (এখন সে গাধা) হাড়গুলোর দিকে দেখ; আমি এগুলোকে কিভাবে একত্রে সংযোজিত করছি। অতঃপর এতে মাংস লাগিয়ে দিচ্ছি; পরে তাকে জীবিত করছি ? (মোট কথা, এসব কাজ এভাবেই করে দেওয়া হবে)। অতঃপর যখন এসব অবস্থা উক্ত ব্যক্তিকে দেখানো হলো, তখন (সে উদ্বেলিত হয়ে) বলে উঠলো, আমি (অন্তরে) দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত কাজের পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهٖمُ رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ

قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ؕ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ

إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ

سَعْيًا ؕ وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦٠﴾

(২৬০) আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না ? বলল,

অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্যে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখি ধরে নাও ! পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক ; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর সে সময়ের (ঘটনার) কথা স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আ) (আল্লাহ্ তা'আলার কাছে) নিবেদন করছিলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার ! আমাকে (সে বিষয়টি) দেখাও যে, মৃতদেরকে (কিয়ামতে) কেমন করে জীবিত করবে (অর্থাৎ জীবিত করা তো নিশ্চিত, কিন্তু জীবিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে তা আমার জানা নেই, কাজেই তা জানতে মন চায়। এ প্রশ্নে কোন স্বল্পবুদ্ধি-ব্যক্তির মনে সন্দেহ হতে পারে যে, নাউযুবিল্লাহ্; ইবরাহীম (আ)-এর মনে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার ব্যাপারে একীন ছিল না ! সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এ প্রশ্নের অবতারণা করে ব্যাপারটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তাই এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে ইবরাহীম (আ)-কে বললেন—তুমি কি এতে বিশ্বাস কর না ? (তিনি উত্তরে) আরয করলেন— বিশ্বাস তো অবশ্যই করি কিন্তু এ উদ্দেশ্যে আরয করছি যাতে আমার অন্তর (নির্ধারিত পুনর্জীবন পদ্ধতি দেখে) প্রশান্তি লাভ করতে পারে (এবং অন্যান্য সম্ভাবনার ফলে যেন মনে নানা প্রশ্নের উদয় না হয়)। আদেশ হলো, তবে তুমি চারটি পাখি ধর। অতঃপর সেগুলোকে নিজের কাছে রাখ। (যাতে ভালভাবে সেগুলো তোমার সাথে পরিচিত হয়ে যায়) অতঃপর (সেগুলোকে জবাই করে কিমার মত সংমিশ্রিত করে নিয়ে কয়েক ভাগে বিভক্ত কর এবং নিজের ইচ্ছামত কয়েকটি বেছে নিয়ে) প্রত্যেক পাহাড়ে একটি একটি অংশ রেখে দাও। (এবং) পরে এগুলোকে ডাক। (দেখবে জীবিত হয়ে) তোমার কাছে ফিরে আসবে এবং এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা মহাপরাক্রমের (তথা কুদরতের) অধিকারী। (তিনি সবকিছুই করতে পারেন, কিন্তু তবু কোন কোন কাজ করেন না। তার কারণ এই যে,) তিনি বিজ্ঞ (ও) বটেন ! (আর প্রতিটি কাজই সে বিজ্ঞতা অনুযায়ী করে থাকেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিবেদন ও পুনর্জীবন দান প্রত্যক্ষকরণ ঃ এটি হলো তৃতীয় কাহিনী যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আরয করলেন, আপনি কিভাবে মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন, তা আমাকে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন, এরূপ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার কারণ কি ? আমার সর্বসময় ক্ষমতার প্রতি কি তোমার আস্থা নেই ? ইবরাহীম (আ) নিজের আস্থা বিবৃত করে নিবেদন করলেন, আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই আছে। কেননা, আপনার সর্বময় ক্ষমতার নিদর্শন সর্বদা, প্রতি মুহূর্তেই দেখতে পাচ্ছি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তার নিজের সত্তা থেকে শুরু করে এ বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এর প্রমাণ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মানব-প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে, এটা কি করে হবে,

না জানি এর প্রক্রিয়াটা কেমন ? মনের মাঝে এ ধরনের প্রশ্ন উদয় হওয়ার ফলে পূর্ণ প্রশান্তি লাভ হতে চায় না। নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) এরূপ নিবেদন করেছিলেন, যাতে মৃত ব্যক্তিকে জীবিতকরণ-সংক্রান্ত চিন্তা দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। অধিকন্তু মনে যাতে স্থিরতা আসে ; নানা প্রশ্নের জাল যেন অন্তরে বাসা বাঁধতে না পারে এবং মনের দৃঢ়তা যাতে বজায় থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবূল করলেন এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষ করাবার জন্য এক অভিনব ব্যবস্থা করলেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ও দূর হয়ে যায়। প্রক্রিয়াটি ছিল এই যে, ইবরাহীমকে চারটি পাখি ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে লালন-পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হলো, যাতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে যায় এবং ডাকামাত্র হাতের কাছে চলে আসে। তদুপরি তিনিও যেন সেগুলোকে ভালভাবে চিনতে পারেন। পরে নির্দেশ হলো, পাখিগুলোকে জবাই করে এর হাড়-মাংস, পাখা ইত্যাদি সবগুলোকেই কিমায় পরিণত কর, তারপর সেগুলোকে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজে পছন্দমত কয়েকটি পাহাড়ে এক একটি ভাগ রেখে দাও। তারপর এদেরকে ডাক। তখন এগুলি আল্লাহ্র কুদরতে জীবিত হয়ে দৌড়ে এসে তোমার কাছে পড়বে।

তফসীরে রূহুল-মা'আনীতে ইবনুল-মান্যারের উদ্ধৃতিতে হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাই করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সাথে হাড়, পাখার সাথে পাখা, মাংসের সাথে মাংস ও রক্তের সাথে রক্ত মিলে পূর্বের রূপ ধারণ করল এবং তাঁর কাছে দৌড়ে এসে উপস্থিত হলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন—হে ইবরাহীম ! কিয়ামতের দিন এমনিভাবে সবাইকে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একত্রিত করে এক মুহূর্তে সেগুলোতে প্রাণ সঞ্চারিত করে দিব। কোরআনের ভাষায় ঃ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا বলা হয়েছে যে, এসব পাখি দৌড়ে আসবে, যাতে বোঝা যায়, সেগুলো উড়ে আসবে না। কেননা, আকাশে উড়ে আসলে দৃষ্টির অগোচরে যেতে পারে এবং তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। পক্ষান্তরে মাটির উপরে দৌড়ে আসলে তা দৃষ্টির মধ্যে থাকবে। এ ঘটনাতে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের পরে পুনর্জীবনের এমন এক নিদর্শন হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দেখালেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়েরও অবসান হতে পারে। পুনর্জীবন এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে মুশরিকদের এটাই ছিল বড় প্রশ্ন। মানুষ মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যায়, আর এ মাটি বাতাসের সাথে কোথায় কোথায় উড়ে যায় ! আবার কখনো পানির স্রোতের সাথে গড়িয়ে যায়, কখনো বা বৃক্ষ ও শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আবার এর অণু-পরমাণু দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুকে একত্র করে তাতে প্রাণ সঞ্চার করার বিষয়টি সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। সব বিষয়কেই তারা নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওজন করতে চায়। তারা তাদের বোধশক্তির বাইরের কোন ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তাও করতে পারে না।

অথচ তারা যদি নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই একটু চিন্তা করে, তবেই বুঝতে পারবে যে, তাদের অস্তিত্ব সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুর একটা সমষ্টি। মানুষের জন্ম যে পিতা-মাতার মাধ্যমে হয়ে থাকে, যে খাদ্যে তাদের শরীর ও রক্ত গঠিত হয়, সেগুলোও বিশ্বের আনাচ-কানাচ

থেকে সংগৃহীত অণু-পরমাণুরই সংমিশ্রণ মাত্র। তারপর জন্মের পরে তার লালন-পালনে যেসব খাদ্য-খাবার ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যদ্দ্বারা তার রক্ত-মাংস গঠিত হয়, সে সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, তার খাদ্য সামগ্রীতে এমন একটি জিনিস রয়েছে, যা সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন অণু-পরমাণু দ্বারাই গঠিত। শিশু যে দুধ খায় তা কোন গাভী, মহিষ বা বকরীর অংশ বিশেষ। সংশ্লিষ্ট জীবগুলোতে এসব অংশ সে ঘাসের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে যা তারা খেয়েছে। আর এসব বস্তু না জানি কোন্ কোন্ দেশ থেকে এসেছে। আর না জানি বায়ু কোন্ কোন্ দেশ থেকে বিভিন্ন অণু-পরমাণুকে এগুলোর উৎপাদনের সাথে মিশিয়েছে। এমনিভাবে দুনিয়ার বীজ, ফল-মূল, তরি-তরকারি এবং মানুষের প্রত্যেকটি খাদ্য-সামগ্রী ও ঔষধ-পত্র যা তাদের দেহের অংশে পরিণত হয়, তা বিশ্বের কোন-না-কোন অংশ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি এবং অনুপম ও সুশৃঙ্খল পরিচালন-ব্যবস্থার মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে একত্রিত হয়েছে। যদি আত্মভোলা ও সংকীর্ণমনা মানুষ দুনিয়ার কথা বাদ দিয়ে শুধু নিজের দেহ সম্পর্কে গবেষণা করতে বসে, তবে দেখতে পাবে যে, তার অস্তিত্ব বিশ্বের এমনি অসংখ্য অণু-পরমাণুরই সংমিশ্রণ যার কিছু প্রাচ্যের, কিছু পাশ্চাত্যের, কিছু উত্তরাঞ্চলের আর কিছু দক্ষিণ জগতের। আজও বিশ্বজোড়া বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুকে আল্লাহ্র অতুলনীয় ব্যবস্থাপনায় তার দেহে একত্র করে দিয়েছেন। মৃত্যুর পরে সেসব অণু-পরমাণু পুনরায় বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে যাবে। তাহলে দ্বিতীয়বার এগুলোকে একত্র করা আল্লাহ্র পক্ষে তো কোন কঠিন কাজ হওয়ার কথা নয়, যিনি প্রথমবার এগুলোকে একত্র করেছিলেন।

আলোচ্য ঘটনার উপর কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর ঃ আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমত, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মনে এ প্রশ্নই বা কেন জেগেছিল ? অথচ তিনি আল্লাহ্র সর্বময় ক্ষমতার উপর বিশ্বাসীরূপে তৎকালীন বিশ্বে সর্বাধিক দৃঢ় ছিলেন !

এর উত্তর এই যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশ্ন কোন সন্দেহ-সংশয়ের কারণে ছিল না। বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতে মৃতদেহকে জীবিত করবেন, তা তাঁর সর্বময় ক্ষমতার জন্য কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু মৃতকে জীবিত করা মানুষের শক্তির ঊর্ধ্বে, তারা কখনো কোন মৃতকে জীবিত হতে দেখেনি। পরন্তু মৃতকে জীবিত করার পদ্ধতি ও রূপ বিভিন্ন রকম হতে পারে। মানুষের স্বভাব হচ্ছে এই যে, যে বস্তু সে দেখেনি তার অনুসন্ধান করার জন্য তার মনে একটা সহজাত কৌতূহল জন্ম নেয়। এতে তার ধারণা বিভিন্ন পথে এগিয়ে যেতে থাকে। তাতে চিন্তাজনিত কষ্টও সহ্য করতে হয়। এ চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে রেহাই পেয়ে অন্তরে স্থিরতা লাভ করাকেই 'ইতমিনান' বা প্রশান্তি বলা হয়। এই ইতমিনান লাভের উদ্দেশ্যই ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ প্রার্থনা।

এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, ঈমান ও ইতমিনান-এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঈমান সে ইচ্ছাধীন দৃঢ় বিশ্বাসকে বলে, যা মানুষ রাসূল (সা)-এর কথায় কোন অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অর্জন করে। আর 'ইতমিনান' অন্তরের সে দৃঢ়তাকে বলা হয় যা প্রত্যক্ষ কোন ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। অনেক সময় কোন দৃশ্যমান বিষয়েও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়, কিন্তু অন্তরের ইতমিনান বা প্রশান্তি লাভ হয় না এজন্য যে, এর স্বরূপ জানা থাকে না। ইতমিনান শুধু চাক্ষুষ দর্শনে লাভ হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী অবশ্যই ছিলেন; তবে প্রশ্নটি ছিল শুধু তার স্বরূপটি জানার জন্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) মৃতকে জীবিত করার স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে তাঁর মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে اَوَلَمْ تُؤْمِنْ অর্থাৎ তুমি কি বিশ্বাস কর না, বলার হেতু কি?

উত্তর এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক উত্থাপিত এ প্রশ্নটির দু'ধরনের অর্থ হতে পারে।

এক ঃ তিনি জীবিত করার স্বরূপ জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন। তবে মূল প্রশ্ন অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন না।

দুই ঃ পুনর্জীবিত করার ক্ষমতায় সন্দেহ কিংবা অস্বীকৃতি থেকেও এ প্রশ্ন জন্ম নিতে পারে। প্রশ্নের ভাষা এ সম্ভাবনার প্রতিকূল নয়। উদাহরণত কোন বোঝা সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস এই যে, অমুক ব্যক্তি এটি বহন করতে পারবে না। তখন আপনি তার অপারকতা প্রকাশ করার জন্য বললেন, দেখি, তুমি কেমন করে বোঝাটি বহন কর ! ইবরাহীম (আ)-এর প্রশ্নের এ ভুল অর্থও কেউ কেউ গ্রহণ করতে পারতো। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে বললেন اولم تؤمن —যাতে ইবরাহীম (আ) উত্তরে بلى 'হ্যাঁ, বিশ্বাস করি' বলে ভুল বোঝার অবকাশ থেকে মুক্ত হয়ে যান।

তৃতীয় ঃ প্রশ্ন এই যে, ইবরাহীম (আ)-এর এ প্রশ্ন থেকে অন্তত এতটুকু তো জানা গেল যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাসের পূর্ণ স্থিরতা ছিল না। অথচ বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা) বলেন, "যদি অদৃশ্য জগতের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দেওয়া হয়, তবে আমার বিশ্বাস ও স্থিরতা একটুও বৃদ্ধি পাবে না। কেননা, অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসের দ্বারাই আমার মধ্যে পূর্ণ স্থিরতা অর্জিত হয়েছে।" অতএব, কোন কোন উম্মতই যখন স্থিরতার এমন স্তরে উন্নীত রয়েছেন, তখন আল্লাহ্র খলীল ইবরাহীম (আ)-এর বিশ্বাসের স্থিরতা না থাকা কিরূপে সম্ভবপর ?

এ সম্পর্কে বুঝে নেওয়া দরকার যে, স্থিরতারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক প্রকার স্থিরতা আল্লাহ্র ওলী ও সিদ্দীকগণ অর্জন করেন। এর চাইতে উচ্চ স্তরের স্থিরতা পয়গম্বরগণ লাভ করেন। এর চাইতেও উচ্চস্তরের আরেকটি স্থিরতা আছে, যা বিশিষ্ট নবী বা রসূলগণকে 'মুশাহাদা' তথা প্রত্যক্ষকরণের মাধ্যমে দান করা হয়েছিল।

হযরত আলী (রা) স্থিরতার যে স্তরে উন্নীত ছিলেন, নিঃসন্দেহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এরও তা অর্জিত ছিল; বরং এর চাইতেও উচ্চস্তরের স্থিরতা—যা মকামে-নবুয়তের উপযুক্ত, তা তিনি লাভ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি উম্মতের মধ্যে যে কারো চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এরপর যে স্থিরতা তিনি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তা হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের স্থিরতা, যা বিশেষ পয়গম্বরকেই শুধু দান করা হয়েছে। উদাহরণত মহানবী (সা)-কে মি'রাজের মাধ্যমে বেহেশত ও দোযখ প্রত্যক্ষ করিয়ে এ বিশেষ স্থিরতায় পৌঁছানো হয়েছিল।

মোটকথা, এ প্রশ্নের কারণে এমন মন্তব্য করাও ঠিক নয় যে, ইবরাহীম (আ)-এর বিশ্বাসের স্থিরতা ছিল না। এক্ষেত্রে এটা বলা যায় যে, প্রত্যক্ষকরণ দ্বারা যে পূর্ণ স্থিরতা অর্জিত হয়, তখনো পর্যন্ত তা ছিল না। আর এরই জন্য তিনি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন !

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। পরাক্রমশালী হওয়ার মধ্যে সর্বশক্তিমানতা বিধৃত হয়েছে; আর প্রজ্ঞাময়

বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন বিশেষ হেকমতের কারণেই প্রত্যেককে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রত্যক্ষ করানো হয় না। নতুবা প্রত্যেককে এটা প্রত্যক্ষ করানো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু এতে 'ঈমান-বিল-গায়েব' তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে না।

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿২৬১﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا
يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿২৬২﴾ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ
يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿২৬৩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا
صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ۙ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ
وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿২৬৪﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا
وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿২৬৫﴾ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ
وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۙ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۙ وَأَصَابَهُ
الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿২৬৬﴾

(২৬১) যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত; যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ' দানা থাকে। আল্লাহ্ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। (২৬২) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। (২৬৩) নম্র কথা বলে দেওয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা ঐ দান-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট দেওয়া হয়, আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদশালী, সহিষ্ণু। (২৬৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না। সে ব্যক্তির মত, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত, যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্য। তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়; অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হালকা বর্ষণই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন। তোমাদের কেউ পছন্দ করে যে, তার একটি খেজুর ও আঙুরের বাগান হবে, এর তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে, আর এতে সর্বপ্রকার ফল-ফসল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌঁছবে, তার দুর্বল সন্তান-সন্ততিও থাকবে, এমতাবস্থায় এ বাগানে একটি ঘূর্ণিবায়ু আসবে যাতে আগুন রয়েছে, অনন্তর বাগানটি ভস্মীভূত হয়ে যাবে ? এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আল্লাহ্‌র পথে (অর্থাৎ সৎকর্মে) স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের ব্যয়-কৃত ধন-সম্পদের অবস্থা (আল্লাহ্‌র কাছে এমন) একটি বীজের অবস্থার মত, যা থেকে (মনে কর) সাতটি শীষ জন্মায় (এবং) প্রত্যেক শীষের মধ্যে একশ'টি করে দানা থাকে (এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সওয়াব সাতশ' পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন।) এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, এ বৃদ্ধি (তার আন্তরিকতা ও শ্রমের পরিমাণে) দান করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা সুপ্রশস্ত। (তাঁর কাছে কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি সবাইকে এ বৃদ্ধি দান করতে পারেন, কিন্তু সাথে সাথেই তিনি) মহাজ্ঞানী (ও বটে ! তাই নিয়তের আন্তরিকতা ইত্যাদি দেখে দান করেন)। যারা নিজেদের

ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, অতঃপর তা ব্যয় করার পর (যাকে দেয়, তাকে উদ্দেশ্য করে মুখে) অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং (ব্যবহার দ্বারা তাকে) কষ্ট দেয় না, তারা তাদের (কর্মের) সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে গিয়ে পাবে এবং (কিয়ামতের দিন) তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (যাচ্না্র সময় উত্তরে যুক্তিযুক্ত ও) ন্যায্য কথা বলে দেওয়া এবং (যাঞ্চাকারী অশোভন আচরণ দ্বারা বিরক্ত করলে কিংবা বারবার যাঞ্চা করে অতিষ্ঠ করলেও তাকে) ক্ষমা করা (বহুগুণে) শ্রেয়, ঐ দান-খয়রাত অপেক্ষা যার পর কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা (স্বয়ং) সম্পদশালী; (কারও ধন-সম্পদে তাঁর প্রয়োজন নেই। কেউ ব্যয় করলে নিজের জন্যই করে। এমতাবস্থায় কষ্ট দেবে কি কারণে ? কষ্ট দেওয়ার কারণে আল্লাহ্ তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না। কারণ, তিনি সহিষ্ণু (ও বটে !) হে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ করে কিংবা কষ্ট দিয়ে স্বীয় খয়রাত (-এ সওয়াব বৃদ্ধি)-কে বরবাদ করো না; সে ব্যক্তির মত যে (শুধু) লোকদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে (এবং স্বয়ং দান-খয়রাতের মূল সওয়াবকে বরবাদ করে দেয়) আর আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না (বিশ্বাস স্থাপন করার ধরন থেকে বোঝা যায় যে, এ ব্যক্তি মুনাফিক) অতএব, এ ব্যক্তির অবস্থা একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর (মনে কর) কিছু মাটি (জমেছে এবং মাটিতে কিছু তৃণলতা ও শিকড় গেড়েছে। অতঃপর তার উপর মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়) অনন্তর তাকে (যেমন ছিল, তেমনি) সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দেয়। (এমনিভাবে এ মুনাফিকের হাত থেকে যেন আল্লাহ্র পথে কিছু খরচ হয়ে গেলে বাহ্যত একে একটি সৎকর্ম বলে মনে হয় এবং এতে মনের মধ্যে সওয়াবের আশাও জাগে। কিন্তু তার নেফাক বা কপটতা তাকে সওয়াব থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। সেমতে কিয়ামতে) তারা স্বীয় উপার্জন সামান্যও হস্তগত করতে সক্ষম হবে না। (কেননা, উপার্জন অর্থ সৎকর্ম। তা হস্তগত হওয়া, অর্থ সওয়াব পাওয়া এবং সওয়াব পাওয়ার জন্য বিশ্বাস ও আন্তরিকতা শর্ত। অথচ এগুলো তাদের মাঝে নেই। কারণ, তারা যেমন রিয়াকার, তেমনি কাফির।) আর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে (কিয়ামতের দিন সওয়াবের গৃহ অর্থাৎ জান্নাতের) পথ প্রদর্শন করবেন না। (কেননা, কুফরের কারণে, তাদের কোন কর্মই গ্রহণীয় হয় না। গ্রহণীয় হলে এর সওয়াব পরকালে সঞ্চিত হতো এবং সেখানে পৌঁছে এর বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পেতো।) এবং তাদের ব্যয়কৃত সম্পদের অবস্থা, যারা স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে (যা বিশেষভাবে এ কর্ম দ্বারা হবে) এবং এ উদ্দেশ্যে যে, স্বীয় মনকে (এ কঠিন কর্মে অভ্যস্ত করে) সুদৃঢ় করে, (যাতে অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদন সহজ হয়। অতএব, তাদের ব্যয়কৃত সম্পদ ও সদকার অবস্থা) একটি বাগানের অবস্থার মত, যা কোন টিলায় অবস্থিত, (যার আবহাওয়া অনুকূল ও সুফলদায়ক) যাতে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়, অতঃপর (বাগানটি সুষম আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাতের দরুন) অন্যান্য বাগানের চাইতে কিংবা অন্যান্য বারের চাইতে দ্বিগুণ (চতুর্গুণ) ফসল দান করে এবং যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হালকা বর্ষণও (অর্থাৎ সামান্য বৃষ্টিপাতও) সেখানে যথেষ্ট। (কেননা,

তার মাটি ও অবস্থান ভাল) এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেন। (তাই আন্তরিকতা দেখলেই তিনি সওয়াব বাড়িয়ে দেন।) তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, তার একটি খেজুর ও আঙুরের বাগান হবে (অর্থাৎ তাতে বেশির ভাগ বৃক্ষ থাকবে খেজুর ও আঙুরের এবং) এর (বাগানের বৃক্ষের) তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত থাকবে (যার ফলে বাগানটি খুব সজীব ও সবুজ হবে এবং) এ ব্যক্তির তাতে (খেজুর ও আঙুর ছাড়া) আরও সর্বপ্রকার (উপযুক্ত) ফল সকল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌঁছবে (যা অধিক অভাব-অনটনের সময়) এবং তার সন্তান-সন্ততিও থাকবে, যাদের মধ্যে (উপার্জনের) শক্তি নেই (এমতাবস্থায় সন্তান-সন্ততির কাছেও সে শোনার আশা করতে পারবে না। সুতরাং বাগানটিই হবে তার জীবিকার একমাত্র উপায়)। অতএব, (এমতাবস্থায় এ ঘটনা হবে যে) এ বাগানে একটি ঘূর্ণিবায়ু আসবে, যাতে আগুন (অর্থাৎ দাহিকাশক্তি) রয়েছে, অনন্তর (তা দ্বারা) বাগানটি ভস্মীভূত হয়ে যাবে ? (জানা কথা যে, কেউ নিজের জন্য এমনটি পছন্দ করতে পারে না। অতএব, এ বিষয়টিও এরই সমতুল্য যে, কেউ কিয়ামতে ফলদায়ক হওয়ার আশায় খয়রাত করবে কিংবা অন্য কোন সৎকাজ করবে। কিয়ামতের সময়টিও হবে অত্যন্ত প্রয়োজনের মুহূর্ত। সেখানে এসব সৎকর্মই অধিকতর গ্রহণীয় হবে। অতঃপর এমন মুহূর্তে জানা যাবে যে, অনুগ্রহ প্রকাশ করা কিংবা যাচ্‌নাকারীকে কষ্ট দেওয়ার কারণে সব দান-খয়রাত বরবাদ কিংবা বরকতহীন হয়ে গেছে, তখন কতই না পরিতাপ হবে এবং কত কত আশার গুড়ে পড়বে বালি! অতএব, তোমরা যখন উদাহরণে বর্ণিত ঘটনাকে পছন্দ কর না, তখন সৎকর্ম বরবাদ করাকে কিরূপে মেনে নিচ্ছ ?) আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে বিভিন্ন নজির বর্ণনা করেন তোমাদের (অবগতির) জন্য, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর (এবং চিন্তা-ভাবনা করে তদনুযায়ী কাজকর্ম কর)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এটি সূরা বাকারার ৩৬তম রুকূ, যা ২৬২ নম্বর আয়াত থেকে শুরু হয়। এখনও এ সূরার পাঁচটি রুকূ বাকি রয়েছে। তন্মধ্যে শেষ রুকূতে সামগ্রিক ও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী চার রুকূতে ২৬২তম আয়াত থেকে ২৮৩তম আয়াত পর্যন্ত মোট ২১টি আয়াত। এগুলোতে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশ ও বক্তব্য পেশ করা হয়েছে; এসব নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে বর্তমান বিশ্ব যেসব অর্থনৈতিক সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে সেগুলোর সমাধান আপনা-আপনিই বের হয়ে আসবে। আজ কোথাও পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং কোথাও এর জবাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তিত রয়েছে। এসব নীতির পারস্পরিক সংঘাতের ফলে গোটা বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তপ্ত লাভায় পরিপূর্ণ হয়ে আগ্নেয়গিরির রূপ ধারণ করেছে। এসব আয়াতে ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্ণিত হয়েছে। এটি দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

(১) প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য অভাবগ্রস্ত, দীন-দুঃখীদের জন্য ব্যয় করার শিক্ষা—একে সদ্‌কা ও খয়রাত বলা হয়।

(২) সুদের লেনদেনকে হারাম করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ।

প্রথম দু'রুকূতে দান-খয়রাতের ফযীলত, তৎপ্রতি উৎসাহ দান এবং তৎসম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ দু'রুকূতে সুদভিত্তিক কারবারের অবৈধতা, নিষেধাজ্ঞা এবং ঋণদানের বৈধ পন্থার বর্ণনা রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর দান-খয়রাত আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এমন কতিপয় বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা দান-খয়রাতকে বরবাদ ও নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত করে দেয়।

এরপর বর্ণনা করা হয়েছে দু'টি উদাহরণ। একটি আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় দান-খয়রাতের এবং অপরটি অগ্রহণীয় ও ফাসেদ দান-খয়রাতের।

এ রুকূতে এ পাঁচটি বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে।

এসব বিষয়বস্তুর পূর্বে জানা দরকার যে আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করাকে কোরআন পাক কোথাও انفاق। শব্দে, কোথাও اطعام। শব্দে, কোথাও صدقة শব্দে এবং কোথাও ايتاء। الزكوة। শব্দ ব্যক্ত করেছে। কোরআনের এসব শব্দে এবং স্থানে স্থানে এদের ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, صدقة – انفاق ও اطعام। প্রভৃতি শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক। এগুলো সর্বপ্রকার দান-খয়রাত এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সর্বপ্রকার ব্যয়কেই বোঝায়, তা ফরয হোক, ওয়াজিব হোক কিংবা নফল ও মুস্তাহাব হোক। ফরয যাকাত বোঝাবার জন্য কোরআন একটি স্বতন্ত্র শব্দ ايتاء الزكوة। ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ বিশেষ সদকাটি আদায় করা ও ব্যয় করার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এ রুকূতে বেশির ভাগ انفاق। শব্দ এবং কোথাও صدقة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এখানে সাধারণ দান-খয়রাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেসব বিধান এখানে বিধৃত হয়েছে, সেগুলো সব রকম সদকা এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার সব প্রকারকে পরিব্যাপ্ত করেছে।

আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার একটি দৃষ্টান্ত ঃ প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, অর্থাৎ হজ্জ, জিহাদ কিংবা ফকীর, মিসকিন, বিধবা ও এতীমদের জন্য কিংবা সাহায্যের নিয়তে আত্মীয়-স্বজনদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন, কেউ গমের একটি দানা সরস জমিতে বপন করল। এ দানা থেকে একটি চারা গাছ উৎপন্ন হলো, যাতে গমের সাতটি শীষ জন্মাল এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। অতএব, এর ফল দাঁড়ালো এই যে, একটি দানা থেকে সাতশ' দানা অর্জিত হয়ে গেল।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার সওয়াব এক থেকে শুরু করে সাতশ' পর্যন্ত পৌঁছে। এক পয়সা ব্যয় করলে সাতশ' পয়সার সওয়াব হাসিল হতে পারে।

সহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, একটি সৎকর্মের সওয়াব দশ গুণ পাওয়া যায় এবং তা সাতশ' গুণে পৌঁছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ জিহাদ ও

হজ্জে এক দিরহাম ব্যয় করার সওয়াব সাতশ' দিরহামের সমান। মস্‌নদে আহমদের বরাত দিয়ে ইবনে-কাসীর হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

মোটকথা, এ আয়াত ব্যক্ত করছে যে, আল্লাহ্‌র পথে এক টাকা ব্যয় করার সওয়াব সাতশ' টাকা ব্যয় করার সমান পাওয়া যায়।

দান গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলী ঃ কিন্তু কোরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করার পরিবর্তে গম-বীজের দৃষ্টান্তের আকারে বর্ণনা করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কৃষক গমের এক দানা থেকে সাতশ' দানা তখনই পেতে পারে, যখন দানাটি উৎকৃষ্ট হবে—খারাপ হবে না, কৃষকও কৃষি বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল হবে এবং ক্ষেতটিও সরস হবে। কেননা, এ তিনটির মধ্যে একটি বিষয়ের অভাব হলেও হয় দানা বেকার হয়ে যাবে অর্থাৎ একটি দানাও উৎপন্ন হবে না কিংবা এক দানা থেকে সাতশ' দানার মত ফলনশীলও হবে না।

এমনিভাবে সাধারণ সৎকর্ম এবং বিশেষ করে আল্লাহ্‌র পথে কৃত ব্যয় গ্রহণীয় ও অধিক সওয়াব পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে ঃ (১) পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে হবে। কেননা, হাদীসে আছে—আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করেন না।

(২) যে ব্যয় করবে, তাকেও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সৎ হতে হবে। কোন খারাপ নিয়তে কিংবা নামযশ অর্জনের জন্য যে ব্যয় করে, সে ঐ অজ্ঞ কৃষকসদৃশ, যে বীজকে অনুর্বর মাটিতে বপন করে। ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়।

(৩) যার জন্য ব্যয় করবে, তাকেও সদকার যোগ্য হতে হবে। অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ব্যয় করলে সদ্‌কা ব্যর্থ হবে। এভাবে বর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযীলতও জানা গেল এবং সাথে সাথে তিনটি শর্তও জানা গেল যে, হালাল ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে, ব্যয় করার রীতিও সুন্নত অনুযায়ী হতে হবে এবং যোগ্য ব্যক্তি তালাশ করে ব্যয় করতে হবে। শুধু পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিলেই এ ফযীলত অর্জিত হবে না।

দ্বিতীয় আয়াতে দান-খয়রাতের নির্ভুল ও সুন্নত তরীকা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং যাকে দান করে, তাকে কষ্ট দেয় না, তাদের সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য তাদের কোন বিপদাশঙ্কা নেই এবং অতীতের কারণে তাদের কোন চিন্তা নেই।

সদকা গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলী ঃ এ আয়াতে সদ্‌কা কবূল হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। (১) দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং (২) গ্রহীতাকে ঘৃণিত মনে করা যাবে না অর্থাৎ তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করতে পারবে না, যাতে সে নিজকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব কিংবা কষ্ট পায়।

তৃতীয় আয়াতে قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ অর্থাৎ সদ্‌কা-খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত দু'টি শর্তের আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ্‌র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে কারও প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং দ্বিতীয়ত, যাকে দান করা হবে তার

সাথে এমন কোন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে যে, আর্থিক অক্ষমতা কিংবা ওযরের সময় যাচনাকারীর জওয়াবে কোন যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত অজুহাত বলে দেওয়া এবং যাচনাকারী অশোভন আচরণ করে রাগান্বিত করলে তাকে ক্ষমা করা বহুগুণে শ্রেয় সে দান-খয়রাতের চাইতে, যার পর দান গ্রহীতাকে কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং সম্পদশালী ও সহিষ্ণু। তিনি কারও অর্থের মুখাপেক্ষী নন। যে ব্যক্তি ব্যয় করে, সে নিজের উপকারের জন্যই করে। অতএব, ব্যয় করার সময় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষ্য রাখা উচিত যে, কারও প্রতি তার অনুগ্রহ নেই, নিজের উপকারের জন্যই সে ব্যয় করছে। দান গ্রহীতার পক্ষ থেকে কোনরূপ অকৃতজ্ঞতা অনুভব করলেও তাকে খোদায়ী রীতির অনুসারী হয়ে ক্ষমা করা দরকার।

চতুর্থ আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই অন্যভাবে আরও তাকীদসহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে, মুখে অনুগ্রহ প্রকাশ করে কিংবা আচার-ব্যবহার দ্বারা কষ্ট দিয়ে স্বীয় দান-খয়রাতকে বরবাদ করো না।

এতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যে দান-খয়রাতের পর অনুগ্রহ প্রকাশ কিংবা গ্রহীতাকে কষ্ট দেওয়ার মত কোন কাজ করা হয়, তা বাতিল এবং না করার শামিল। এরূপ দান-খয়রাতে কোন সওয়াব নেই। এ আয়াতে দান কবূল হওয়ার আরও একটি শর্ত বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন মসৃণ পাথরের উপর মাটি জমে যায় এবং তাতে কেউ বীজ বপন করে। অতঃপর এর উপর মুষলধারে বারিপাত হয়। ফলে মাটি কেটে গিয়ে পাথরটি সম্পূর্ণ মসৃণ হয়ে যায়। এরূপ লোক স্বীয় উপার্জন হস্তগত করতে সক্ষম হবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে পথপ্রদর্শন করবেন না। এতে সদকা-খয়রাত কবূল হওয়ার এশর্ত জানা গেল যে, নির্ভেজালভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পরকালের সওয়াবের নিয়তে ব্যয় করতে হবে—লোক দেখানো কিংবা নাম-যশের নিয়ত করা যাবে না। নাম-যশের নিয়তে ব্যয় করা ধন-সম্পদ জলাঞ্জলি দেওয়ারই নামান্তর। যদি পরকালে বিশ্বাসী মু'মিনও নাম-যশের উদ্দেশ্যে কোন দান-খয়রাত করে, তবে তার অবস্থাও তদ্রূপ হবে এবং বিনিময়ে কোন সওয়াবই সে পাবে না। এমতাবস্থায় এখানে لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ যোগ করে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে কাজ করা আল্লাহ্ তা'আলা ও কিয়ামতে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয়। লোক-দেখানো কাজ করা বিশ্বাসে ত্রুটির লক্ষণ।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে পথ-প্রদর্শন করবেন না। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার হেদায়েত ও আয়াত সব মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু কাফিররা এ সবের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এর পরিণতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তওফীক তথা সৎকাজের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে দেন। ফলে তারা কোন হেদায়েত কবূল করে না।

পঞ্চম আয়াতে গ্রহণযোগ্য দান-খয়রাতের একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। যারা স্বীয় ধন-সম্পদকে মনে দৃঢ়তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ কোন টিলায় অবস্থিত বাগানের মত। প্রবল বৃষ্টিপাত না হলেও হালকা বারিবর্ষণই যার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে খুব পরিজ্ঞাত আছেন।

এ উদাহরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, খাঁটি নিয়ত ও উপরোক্ত শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফযীলত অনেক। সৎ নিয়ত ও আন্তরিকতার সাথে অল্প ব্যয় করলেও তা যথেষ্ট এবং পারলৌকিক ফলাফলের কারণ।

ষষ্ঠ আয়াতে উপরোক্ত শর্তাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে দান-খয়রাত বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিষয়টি একটি উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ তোমাদের কেউ পছন্দ করবে কি যে, তার একটি আঙুর ও খেজুরের বাগান হবে, বাগানের নিচ দিয়ে পানির নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, বাগানে সব প্রকার ফল থাকবে, সে নিজে বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার দুর্বল ও শক্তিহীন ছেলে সন্তানও বর্তমান থাকবে, এমতাবস্থায় বাগানে অগ্নিবাহী ঘূর্ণিবায়ু এসে হামলা করবে এবং বাগান জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ? আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে তোমাদের জন্য নযীর বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

এ হচ্ছে শর্তবিরোধী দান-খয়রাতের উদাহরণ। এরূপ দান-খয়রাতের মাধ্যমে দাতা বাহ্যত পরকালের জন্য অনেক সম্পদ আহরণ করে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে এ সম্পদ কোন কাজেই আসে না।

এ উদাহরণে কয়েকটি অতিরিক্ত শর্ত যোগ করা হয়েছে; অর্থাৎ সে বৃদ্ধ হয়ে গেলে, তার সন্তান-সন্ততিও আছে এবং সন্তানগুলো অল্পবয়স্ক; ফলে দুর্বল ও শক্তিহীন। এসব শর্তের উদ্দেশ্য এই যে, যৌবনে কারও বাগান ও শস্যক্ষেত্র জ্বলে গেলে সে পুনরায় বাগান করে নেওয়ার আশা করতে পারে; কিংবা যার সন্তান-সন্ততি নেই এবং পুনরায় বাগান করে নেওয়ার আশাও নেই, বাগান জ্বলে যাওয়ার পরও তার পক্ষে জীবিকার ব্যাপারে তেমন চিন্তিত হওয়ার কথা নয়। একটিমাত্র লোকের ভরণ-পোষণ কষ্টেসৃষ্টে হলেও চলে যায়। পক্ষান্তরে যদি সন্তান-সন্ততিও থাকে এবং পিতার কাছে সহযোগিতা ও সাহায্য করার মত বলিষ্ঠ যুবক ও সৎ সন্তান-সন্ততিও থাকে, তবুও বাগান ধ্বংস হওয়ার মধ্যে তেমন বেশি চিন্তা ও ব্যথার কারণ নেই। কেননা, সে সন্তান-সন্ততির চিন্তা থেকে মুক্ত। বরং সন্তানেরা তার বোঝাও বহন করতে সক্ষম। মোটকথা, এ তিনটি শর্তই মুখাপেক্ষিতার তীব্রতা বর্ণনা করার জন্য যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ সে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে বাগান করলো, বাগান তৈরি হয়ে ফলও দিতে লাগল, এমতাবস্থায় সে বৃদ্ধ হয়ে পড়লো। তার সন্তান-সন্ততিও বর্তমান এবং সন্তানগুলো অল্প বয়স্ক ও দুর্বল। এহেন ঘোর প্রয়োজনের মুহূর্তে যদি তৈরি-বাগান জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তীব্র আঘাত ও অপরিসীম কষ্টেরই কথা। এমনিভাবে যে ব্যক্তি লোক-দেখানোর জন্য সদকা ও খয়রাত করলো, সে যেন বাগান করলো। অতঃপর মৃত্যুর পর সে ঐ বৃদ্ধের মত হয়ে গেল, যে

উপার্জন করার কিংবা পুনরায় বাগান করার শক্তি রাখে না। কেননা, মৃত্যুর পর মানুষের সৎ-অসৎ সব কাজকর্মই বন্ধ হয়ে যায়। ছা-পোষা বৃদ্ধ স্বভাবতই অতীত উপার্জন সংরক্ষিত রাখার প্রতি অত্যধিক মুখাপেক্ষী থাকে, যাতে বৃদ্ধ বয়সে তা কাজে লাগে। যদি এমতাবস্থায় তার বাগান ও অর্থ-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তার দুঃখ-দুর্দশার অবধি থাকবে না। এমনিভাবে লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে কৃত দান-খয়রাত ঘোর প্রয়োজনের মুহূর্তে তার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

পূর্ণ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সদ্কা ও খয়রাত আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে ইখলাস অর্থাৎ খাঁটি নিয়তে ও অন্তরে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করতে হবে; নাম-যশের জন্য নয়।

এখন সমগ্র রুকূর সবগুলো আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ্র পথে ব্যয় ও সদ্কা-খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত জানা যাবে।

প্রথমত, যে ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা হয়, তা হালাল হতে হবে। দ্বিতীয়ত, সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। তৃতীয়ত, বিশুদ্ধ খাতে ব্যয় করতে হবে। চতুর্থত, খয়রাত দিয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবে না। পঞ্চমত, যাকে দান করা হবে, তার সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে তাকে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়। ষষ্ঠত, যা কিছু ব্যয় করা হয়, খাঁটি নিয়তের সাথে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে—নাম-যশের জন্য নয়।

দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করার অর্থ এই যে, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার সময় কোন হকদারের হক নষ্ট না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বীয় পোষ্যদের প্রয়োজনীয় খরচাদি তাদের অনুমতি ছাড়া বন্ধ অথবা হ্রাস করে দান-খয়রাত করা কোন সওয়াবের কাজ নয়। অভাবগ্রস্ত ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করে সব ধন-সম্পদ খয়রাত করা কিংবা ওয়াক্ফ করে দেওয়া সুন্নাহ্র শিক্ষা পরিপন্থী। এ ছাড়া আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার হাজারো পন্থা রয়েছে।

সুন্নত দান এই যে, গুরুত্ব ও প্রয়োজনের তীব্রতার দিকে লক্ষ্য রেখে খাত নির্বাচন করতে হবে। ব্যয়কারীরা সাধারণত এ দিকে লক্ষ্য রাখে না।

তৃতীয় শর্তের সারমর্ম এই যে, নিজ ধারণা মতে কোন কাজকে সৎ কাজ মনে করে সেই খাতে ব্যয় করাই সওয়াব হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং খাতটি শরীয়তের বিচারে বৈধ ও পছন্দনীয় কিনা, তা দেখাও জরুরী। যদি কেউ অবৈধ খেলাধুলার জন্য স্বীয় সহায়-সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে দেয়, তবে সে সওয়াবের পরিবর্তে আযাবের যোগ্য হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়, এমন সব কাজের বেলায় এ কথাই প্রযোজ্য।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا

لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم

بِاٰخِذِيۡهِ اِلَّاۤ اَنۡ تُغۡمِضُوۡا فِيۡهِ ؕ وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيۡدٌ ﴿٢٦٧﴾

اَلشَّيۡطٰنُ يَعِدُكُمُ الۡفَقۡرَ وَيَاۡمُرُكُمۡ بِالۡفَحۡشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمۡ

مَّغۡفِرَةً مِّنۡهُ وَفَضۡلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ ﴿٢٦٨﴾ ۖۙ يُّؤۡتِى الۡحِكۡمَةَ

مَنۡ يَّشَآءُ ۚ وَمَنۡ يُّؤۡتَ الۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ اُوۡتِىَ خَيۡرًا كَثِيۡرًا ؕ وَمَا

يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ﴿٢٦٩﴾ وَمَاۤ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ نَّفَقَةٍ اَوۡ

نَذَرۡتُمۡ مِّنۡ نَّذۡرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيۡنَ

مِنۡ اَنۡصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ اِنۡ تُبۡدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۚ وَاِنۡ تُخۡفُوۡهَا

وَتُؤۡتُوۡهَا الۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنۡكُمۡ مِّنۡ

سَيِّاٰتِكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ ﴿٢٧١﴾ لَيۡسَ عَلَيۡكَ هُدٰٮهُمۡ

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ فَلِاَنۡفُسِكُمۡ ؕ

وَمَا تُنۡفِقُوۡنَ اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ

خَيۡرٍ يُّوَفَّ اِلَيۡكُمۡ وَاَنۡتُمۡ لَا تُظۡلَمُوۡنَ ﴿٢٧٢﴾ لِلۡفُقَرَآءِ الَّذِيۡنَ

اُحۡصِرُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ ضَرۡبًا فِى الۡاَرۡضِ يَحۡسَبُهُمُ

الۡجَاهِلُ اَغۡنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعۡرِفُهُمۡ بِسِيۡمٰهُمۡ ۚ لَا يَسۡـَٔلُوۡنَ

النَّاسَ اِلۡحَافًا ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيۡمٌ ﴿٢٧٣﴾ ع

اَلَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ بِالَّيۡلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً

فَلَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ۚ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ

يَحۡزَنُوۡنَ ﴿٢٧٤﴾

(২৬৭) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না; কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও ! জেনে রেখ আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, গুণী। (২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে, এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশি অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ। (২৬৯) তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান। (২৭০) তোমরা যে খয়রাত বা সদ্ব্যয় কর কিংবা কোন মানত কর, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সেসব কিছু জানেন। অন্যায়কারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২৭১) যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কিছু গোনাহ্ দূর করে দেবেন। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন। (২৭২) তাদেরকে সৎপথে আনার দায় তোমার নয়। বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপকারার্থে কর। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। (২৭৩) খয়রাত ঐসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ্র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে—জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফিরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাচঞা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত। (২৭৪) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাতে এবং দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্য তাদের সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন আশংকা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ ! স্বীয় উপার্জন থেকে উত্তম বস্তু (সৎ কাজে) ব্যয় কর এবং তা (উত্তম বস্তু) থেকে যা আমি তোমাদের (ব্যবহারের) জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি এবং অকেজো বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করো না, অথচ (এমন বস্তুই যদি কেউ তোমাদেরকে প্রাপ্যের বিনিময়ে কিংবা উপঢৌকনরূপে দিতে চায়, তবে) তোমরা কখনও তা নেবে না; কিন্তু চক্ষু বুঁজে (এবং

খাতিরে যদি নিয়ে নাও, তবে ভিন্ন কথা) এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন, (যে, তিনি এমন অকেজো বস্তুতে সন্তুষ্ট হবেন, তিনি) প্রশংসার যোগ্য (অর্থাৎ সত্তা ও গুণাবলীতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অতএব তাঁর দরবারে প্রশংসার যোগ্য বস্তুই পেশ করা দরকার)। শয়তান তোমাদিগকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে (অর্থাৎ যদি ব্যয় কর কিংবা উত্তম বস্তু ব্যয় কর, তবে দরিদ্র হয়ে যাবে) এবং তোমাদের মন্দ বিষয়ের (অর্থাৎ কৃপণতার) পরামর্শ দেয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সাথে ওয়াদা করেন (ব্যয় করলে এবং উত্তম বস্তু ব্যয় করলে) নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেওয়ার এবং বেশি দেওয়ার (অর্থাৎ সৎকাজে ব্যয় করা যেহেতু ইবাদত এবং ইবাদত গোনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়, তাই ব্যয় দ্বারা গোনাহ্ও মাফ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে দুনিয়াতেই এবং পরকালে সবাইকে ব্যয়ের প্রতিদান বেশি বেশি দান করবেন।) এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচুর্যময় (তিনি সবকিছু দিতে পারেন), সুবিজ্ঞ (নিয়ত অনুযায়ী ফল দান করেন। এসব কথা সুস্পষ্ট, কিন্তু এগুলো সেই বুঝে)। যার মধ্যে ধর্মের জ্ঞান রয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ধর্মের জ্ঞান দান করেন এবং (সত্য কথা হলো এই যে,) যাকে ধর্মের জ্ঞান দান করা হয় সে বিরাট কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। (কেননা, জগতের কোন নিয়ামত এ নিয়ামতের সমান উপকারী নয়।) বস্তুত উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান (অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী।) তোমরা যে কোন প্রকার ব্যয় কর কিংবা কোন রকম মানত কর, আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই সবকিছু জানেন এবং অন্যায়কারীদের (কিয়ামতে) কোন সাথী (সাহায্যকারী) হবে না। যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবুও ভাল, আর যদি গোপনে কর এবং (গোপনে) অভাবগ্রস্তদেরকে দিয়ে দাও, তবে গোপনে দেওয়া তোমাদের জন্য আরো উত্তম এবং আল্লাহ্ তা'আলা (এর বরকতে) তোমাদের কিছু গোনাহ্ও দূর করে দেবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কৃতকর্মের খুবই খবর রাখেন। (অনেক সাহাবী কাফিরদেরকে এ উদ্দেশ্যে খয়রাত দিতেন যে, সম্ভবত এ কৌশলে কিছু লোক মুসলমান হয়ে যাবে এবং রাসূলুল্লাহ্ [সা]ও এ মতই প্রকাশ করেছিলেন। তাই এ আয়াতে উভয় প্রকার সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ঃ হে মুহাম্মদ [সা]) তাদেরকে (কাফিরদেরকে) সৎপথে নিয়ে আসা আপনার দায়িত্বে (ফরয-ওয়াজিব) নয় (যে কারণে এত সূক্ষ্ম আয়োজন করতে হবে), কিন্তু (এটি তো) আল্লাহ্ তা'আলা (র কাজ) যাকে ইচ্ছা, সৎপথে নিয়ে আসবেন। (আপনার কাজ শুধু হেদায়েত পৌঁছে দেওয়া—কেউ হেদায়েতে আসুক বা না আসুক। হেদায়েত পৌঁছানো এ নিষেধাজ্ঞার উপর নির্ভরশীল নয় এবং (মুসলমানরা) তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, নিজ উপকারার্থেই কর। (এ উপকারের বর্ণনা এই যে,) তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না (সওয়াব হলো দানের অবশ্যম্ভাবী ফল। এ উদ্দেশ্যে যে কোন অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করলে তা অর্জিত হয়। এমতাবস্থায় মুসলমান অভাবগ্রস্তকেই বিশেষভাবে কেন দেওয়া হবে?) এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করছ, তার সবই (অর্থাৎ এর প্রতিদান ও সওয়াব) পুরোপুরি তোমরা (পরকালে) পেয়ে যাবে এবং তোমাদের জন্য মোটেও হ্রাস করা হবে না। (অতএব, প্রতিদানের

প্রতিই তোমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রতিদান সর্বাবস্থায় পাওয়া যাবে। কাজেই তোমাদের এ চিন্তা করা উচিত নয় যে,তোমাদের সদকা মুসলমানরাই পাবে—কাফিররা পাবে না। সদকা-খয়রাতের) প্রকৃত হকদার ঐ সকল গরীব লোক, যারা আল্লাহ্র পথে (অর্থাৎ ধর্মের কাজে) আবদ্ধ হয়ে গেছে (এবং ধর্মের কাজে বন্দী ও মশগুল হওয়ার কারণে) তারা (জীবিকার খোঁজে) দেশের কোথাও চলাফেরা করার (স্বভাবগতভাবে) শক্তি রাখে না (এবং) অজ্ঞ লোকেরা এদেরকেই ধনী মনে করে তাদের যাচ্ঞা থেকে বিরত থাকার কারণে। (তবে) তোমরা তাদেরকে তাদের (লক্ষণ ও) গতি-প্রকৃতি দেখে চিনতে পার। (কেননা, দারিদ্র্য ও উপবাসের কারণে তাদের মুখমণ্ডল ও শরীরে এক প্রকার দুর্বলতা অবশ্যই বিরাজ করে এবং এমনিতেও) তারা মানুষকে পথ আগলিয়ে ভিক্ষা করে না—(যাতে কেউ তাদেরকে অভাবগ্রস্ত বলে মনে করতে পারে। অর্থাৎ তারা ভিক্ষা চায়-ই না। কেননা, যারা চেয়ে অভ্যস্ত, তারা অধিকাংশ সময় পথ আগলিয়েই চায়) এবং (তাদের সেবার জন্য) তোমরা যা ব্যয় করবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা খুব পরিজ্ঞাত। (অন্যদেরকে দেওয়ার চাইতে তাদের সেবার সওয়াব অধিক দেবেন) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাতে অথবা দিনে (অর্থাৎ কোন বিশেষ সময় নির্দিষ্ট না করে) গোপনে ও প্রকাশ্যে (অর্থাৎ কোন বিশেষ অবস্থা নির্দিষ্ট না করে) তারা তাদের সওয়াব পাবে (কিয়ামতের দিন) স্বীয় পালনকর্তার কাছে। আর (সেদিন) তাদের কোন বিপদাশঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী রুকূতে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার বর্ণনা ছিল। এখন এর সাথেই সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচ্য রুকূর সাতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ....غَنِيٌّ حَمِيدٌ—শানে-নুযুল দৃষ্টে طيب শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'উৎকৃষ্ট'। কেউ কেউ দান করার জন্য নিকৃষ্ট বস্তু নিয়ে আসত; এর পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কোন কোন তফসীরকার শব্দের ব্যাপকতা দৃষ্টে এর অর্থ করেছেন 'হালাল'। কেননা, মাল পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট তখনই হয়, যখন তা হালালও হয়। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতে হালালেরও তাকীদ হবে। তবে প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ী অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, খয়রাতের মাল হালাল এবং উৎকৃষ্ট—দু'টোই হওয়া শর্ত। মনে রাখা দরকার যে, আয়াতে উৎকৃষ্ট মাল দেওয়ার নির্দেশ ঐ ব্যক্তির জন্য, যার কাছে উৎকৃষ্ট বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্দ ও নিকৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে ما كسبت এবং اخرجنا শব্দ দ্বারা বোঝা যায় যে, উৎকৃষ্ট বস্তু বিদ্যমান রয়েছে। আর لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ বাক্য দ্বারা বোঝা যায় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে অকেজো জিনিস ব্যয় করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির কাছে মূলতই উৎকৃষ্ট বস্তু নেই, সে এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। সে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করলেও গ্রহণীয় হবে।

مَا كَسَبْتُمْ শব্দ থেকে কোন কোন আলেম মাস'আলা চয়ন করেছেন যে, পিতা পুত্রের উপার্জন ভোগ করতে পারে, এটা জায়েয। কেননা, মহানবী (সা) বলেন ঃ اولادكم من طيب اكسابكم فكلوا من اموال اولادكم هنيئا—তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপার্জনের একটি পূত-পবিত্র অংশ। অতএব, তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে সন্তান-সন্ততির উপার্জন ভক্ষণ কর। —(কুরতুবী)

শস্যক্ষেত্রের ওশর-বিধি ঃ مِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ— বাক্যে اَخْرَجْنَا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওশরী জমিনে (যে জমিনের উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ ইসলামী বিধান অনুযায়ী সরকারী তহবিলে জমা দিতে হয়) যে ফসল উৎপন্ন হয়, তার এক-দশমাংশ দান করা ওয়াজিব। আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন যে, ওশরী যমীনে ফসল অল্প হোক বা বেশি হোক ওশর দেওয়া ওয়াজিব। সূরা আন'আমের اٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ আয়াতটি ওশর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশসূচক।

'ওশর' ও 'খেরাজ' ইসলামী শরীয়তের দু'টি পারিভাষিক শব্দ। এ দু'য়ের মধ্যে একটি বিষয় অভিন্ন। উভয়টিই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত কর। পার্থক্য এই যে, 'ওশর' শুধু কর নয়, এতে আর্থিক ইবাদতের দিকটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; যেমন—যাকাত। এ কারণেই ওশরকে 'যাকাতুল-আরদ' বা ভূমির যাকাতও বলা হয়। পক্ষান্তরে খেরাজ নিরেট কর। এতে ইবাদতের কোন দিক নেই। মুসলমানরা ইবাদতের যোগ্য ও অনুসারী। তাই তাদের কাছ থেকে ভূমির উৎপন্ন ফসলের যে অংশ নেওয়া হয়, তাকে 'ওশর' বলা হয়। অমুসলিমরা ইবাদতের যোগ্য নয়। তাই তাদের ভূমির উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে 'খেরাজ' বলা হয়। যাকাত ও ওশরের মধ্যে কার্যগত আরও পার্থক্য এই যে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পণ্যদ্রব্যের উপর বছরান্তে যাকাত ওয়াজিব হয়, কিন্তু ওশরী জমিনে উৎপাদনের সাথেই ওশর ওয়াজিব হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, জমিনে ফসল উৎপন্ন না হলে ওশর দিতে হয় না। কিন্তু পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ-রৌপ্যে মুনাফা না হলেও বছরান্তে যাকাত ফরয হবে। ওশর ও খেরাজের বিস্তারিত মাস'আলা বর্ণনার স্থান এটা নয়। ফিক্হ গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ....وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُوْلُوا الْاَلْبَابِ-

যখন কারও মনে এ ধারণা জন্মে যে, দান-খয়রাত করলে ফকীর হয়ে যাবে, বিশেষত আল্লাহ্ তা'আলার তাকীদ শুনেও স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করার সাহস না হয় এবং খোদায়ী ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানী ওয়াদার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন বুঝে নেওয়া উচিত যে, এ প্ররোচনা শয়তানের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এখানে এরূপ বলা ঠিক নয় যে, আমরা তো শয়তানের চেহারাও দেখিনি—প্ররোচনা ও নির্দেশ নেওয়া দূরের কথা। পক্ষান্তরে যদি মনে ধারণা জন্মে যে, সদ্কা-খয়রাত করলে গোনাহ্ মাফ হবে এবং ধন-সম্পদও বৃদ্ধি পাবে ও বরকত হবে, তখন মনে করতে হবে, এ বিষয়টি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ্র ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি সবার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং নিয়ত ও কর্ম সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

হিকমতের অর্থ ও ব্যাখ্যা ঃ يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ— 'হিকমত' শব্দটি কোরআন পাকে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা

করা হয়েছে। তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতে তফসীরকারগণের এ সম্পর্কিত প্রায় ত্রিশটি উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে ঃ প্রকৃতপক্ষে এগুলো প্রায় কাছাকাছি উক্তি। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই, অভিব্যক্তির পার্থক্য মাত্র حكمة শব্দটি احكام -এর ধাতু। এর অর্থ কোন কর্ম অথবা উক্তিকে তার গুণাবলীসহ পূর্ণ করা।

এ কারণেই বাহ্‌রে-মুহীতে হযরত দাউদ (আ) সম্পর্কিত সূরা বাকারার اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ —আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

والحكمة وضع الامور فى محلها على الصواب وكمال ذالك انما يحصل بالنبوة-

—হিকমতের আসল অর্থ প্রত্যেক বস্তুকে যথাস্থানে স্থাপন করা। এর পূর্ণত্ব শুধুমাত্র নবুয়তের মাধ্যমেই সাধিত হতে পারে। তাই এখানে হেকমত বলতে নবুয়ত বোঝান হয়েছে।

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে বলেন ঃ হেকমত শব্দটি আল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হবে সমগ্র বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান এবং নিখুঁত আবিষ্কার। অন্যের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হয় সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তদনুযায়ী কর্ম।

এ অর্থটিই বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোথাও এর অর্থ নেওয়া হয়েছে কোরআন, কোথাও হাদীস, কোথাও বিশুদ্ধ জ্ঞান, কোথাও সৎকর্ম, কোথাও সত্য কথা, কোথাও সুস্থ বুদ্ধি, কোথাও ধর্মের বোধ, কোথাও মতামতের নির্ভুলতা এবং কোথাও আল্লাহ্‌র ভয়। শেষোক্ত অর্থটি স্বয়ং হাদীসে উল্লিখিত আছে। বলা হয়েছে رأس الحكمة خشية اللّٰه —অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়ই প্রকৃত হেকমত।

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ আয়াতে হেকমতের ব্যাখ্যা সাহাবী ও তাবে তাবেয়ীগণ কর্তৃক হাদীস ও সুন্নাহ্ বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, আলোচ্য يؤت الحكمة আয়াতে পূর্ববর্ণিত সবগুলো অর্থই বোঝানো হয়েছে। —(বাহ্‌রে-মুহীত, ৩২০ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ড)

এ উক্তিই শব্দটির সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট অর্থবোধক। وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا বাক্য থেকেও এর দিকে ইশারা বোঝা যায়। কারণ, এর অর্থ হচ্ছে, যাকে হেকমত দেওয়া হয়েছে, তাকে প্রভূত মঙ্গল ও কল্যাণ দেওয়া হয়েছে।

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَّفَقَةٍ ... ... وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

কোন প্রকার ব্যয় বলতে সর্বপ্রকার ব্যয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে ; যে ব্যয়ে সব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং যে ব্যয়ে সবগুলোর কিংবা কতকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। উদাহরণত আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হয়নি বরং গোনাহর কাজে ব্যয় করা হয়েছে, কিংবা লোক-দেখানো ব্যয় করা হয়েছে অথবা ব্যয় করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে কিংবা হালাল ও উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করা হয়নি ইত্যাদি, সর্বপ্রকার ব্যয়ই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে 'মানত' শব্দের ব্যাপকতায় সর্বপ্রকার মানতই এসে গেছে। উদাহরণত আর্থিক ইবাদতের মানত। এ সাদৃশ্যের কারণেই ব্যয়ের সাথে মানতের উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দৈহিক ইবাদতের মানত; তা আবার শর্তহীন হোক কিংবা শর্তযুক্ত হোক, তা পূর্ণ করা হোক বা না করা হোক ইত্যাদি সর্বপ্রকার মানতই আয়াতে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে,

আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রকার ব্যয় ও সর্বপ্রকার মানত সম্পর্কেই পরিজ্ঞাত। তিনি এগুলোর প্রতিদানও দেবেন। সীমা ও শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে উৎসাহিত করা এবং লক্ষ্য না রাখার জন্য ভীতি-প্রদর্শন করার লক্ষ্যেই একথা শোনানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাদেরকে স্পষ্টভাবে শাস্তিবাণী শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে।

انْ تُبْدُوا الصَّدَقَات فَنعمَّا هِىَ ... ... وَاللّٰهُ بِماَ تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ •

বাহ্যত এ আয়াতে ফরয ও নফল সব রকম দান-খয়রাতকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রকার দানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই উত্তম। এতে ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় প্রকার উপকারিতাই বর্তমান রয়েছে। ধর্মীয় উপকারিতা এই যে, এতে রিয়া তথা লোক-দেখানোর সম্ভাবনা নেই এবং দান গ্রহণকারীও লজ্জিত হয় না। জাগতিক উপকারিতা এই যে, স্বীয় অর্থের পরিমাণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। গোপনীয়তা উত্তম হওয়ার মানে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম হওয়া। সুতরাং অপবাদ খণ্ডন করা, অন্যে তা অনুসরণ করবে এরূপ আশা করা ইত্যাদি কারণে যদি কোন স্থলে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম বিবেচিত হয়, তবে তা এর পরিপন্থী নয়।

يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ —গোপনে দান করার সাথেই গোনাহ্র কাফ্ফারা সম্পর্কযুক্ত নয়—শুধু এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য গোপনীয়তার পার্শ্বে একে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ গোপনে দান করার মধ্যে যদি তুমি কোন বাহ্যিক উপকার না দেখ, তবে বিষণ্ন হওয়া উচিত নয়। কেননা, তোমার গোনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করবেন। এটা তোমার বিরাট উপকার।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ... ... وَاَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ —এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দান-খয়রাতে আসলে তোমাদের নিয়তও থাকে নিজেদেরই উপকার লাভ করা এবং বাস্তবেও এর দ্বারা বিশেষভাবে তোমাদেরই উপকার হবে। এমতাবস্থায় দান-খয়রাত করলে তা শুধু মুসলমানকেই দেবে—কাফিরকে দেবে না, এ বিশেষ পথে এ উপকার লাভ করতে চাও কেন ? এটি অতিরিক্ত বিষয়। এর প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়।

এখানে আরও বুঝে নেওয়া দরকার যে, এ সদ্কা অর্থ নফল সদ্কা, যা যিম্মী কাফিরকেও দেওয়া জায়েয। এখানে সদ্কা বলতে ফরয সদ্কা বোঝান হয়নি। ফরয সদ্কা মুসলমান ছাড়া কাউকে দেওয়া জায়েয নয় —(মাযহারী)

মাস'আলা ঃ দারুল-হরবের কাফিরদেরকে কোন প্রকার দান-খয়রাত দেওয়া জায়েয নয়।

মাস'আলা ঃ যিম্মী কাফির অর্থাৎ যে দারুল-হরবের নয়, তাকে শুধু যাকাত ও ওশর দান করা জায়েয নয়। অন্য সব ওয়াজিব ও নফল সদ্কা দান করা জায়েয। আলোচ্য আয়াতে যাকাত অন্তর্ভুক্ত নয়।

لِلْفُقَرَاۤءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ...... فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ •

এখানে ফকীর বলতে ঐ সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন কাজ করতে পারে না।

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاۤءَ مِنَ التَّعَفُّف —এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন ফকীরকে যদি মূল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়, তবে এ কারণে তাকে ধনী মনে করা হবে না; বরং ফকীরই বলা হবে। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাত দান করাও দুরস্ত হবে।

—(কুরতুবী)

تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ —এতে বোঝা যায় যে, লক্ষণাদি দেখে বিচার করা অশুদ্ধ নয়। কাজেই যদি এমন কোন বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া যায়, যার দেহে পৈতা আছে এবং সে খতনাকৃতও নয়, তবে তাকে মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা যাবে না। —(কুরতুবী)

لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا —এ আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, তারা পথ আগলিয়ে সওয়াল করে না। কিন্তু পথ না আগলিয়েও সওয়াল করে না —এরূপ বোঝা যায় না। কোন কোন তফসীরকার তা-ই বলেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরকারদের মতে এর অর্থ এই যে, তারা মোটেই সওয়াল করে না— لانهم متعففون عن المسئلة عفة تامة কারণ, তারা সওয়াল করা থেকে নিজেদেরকে পুরোপুরি নিরাপদ দূরত্বে রাখে। —(কুরতুবী)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ —এ সপ্তম আয়াতে ঐ সকল লোকের বিরাট প্রতিদান ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, যাঁরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা রাতে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, দান-খয়রাতের জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, দিবারাত্রিরও কোন প্রভেদ নেই। এমনিভাবে গোপন ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, খাঁটি নিয়তে দান করতে হবে। নাম-যশের নিয়ত থাকলে চলবে না। প্রকাশ্যে ব্যয় করার কোন প্রয়োজন দেখা না দেওয়া পর্যন্তই গোপনে দান করার শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ। যেখানে এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে প্রকাশ্যে দান করাই শ্রেয়।

ইবনে-আসাকের-এর বরাত দিয়ে রূহুল-মা'আনীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) একবার দশ হাজার দিরহাম দিনে, দশ হাজার দিরহাম রাতে, দশ হাজার দিরহাম গোপনে ও দশ হাজার দিরহাম প্রকাশ্যে—এভাবে মোট চল্লিশ হাজার দিরহাম আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেন। কোন কোন তফসীরকার হযরত আবূ বকর (রা)-এর এ ঘটনাকে আয়াতের শানে-নুযুল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ আয়াতে শানে-নুযুল সম্পর্কে আরও বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٧﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ
لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾ وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ
تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ
فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٨١﴾

(২৭৫) যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে ঃ ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেওয়ারই মত ! অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (২৭৬) আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে। (২৭৭) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্য তাদের পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (২৭৮) হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। (২৭৯) অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না। (২৮০) যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (২৮১) ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে !

অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা সুদ খায় (অর্থাৎ গ্রহণ করে), তারা (কিয়ামতের দিন কবর থেকে) দণ্ডায়মান হবে না, কিন্তু যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয় (অর্থাৎ হতবুদ্ধি মাতালের মত দণ্ডায়মান হবে)। এ শাস্তির কারণ এই যে, এরা (অর্থাৎ সুদখোরেরা সুদের বৈধতা প্রমাণ করার জন্য) বলেছিল ঃ ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদের মত (কেননা, এতেও মুনাফা অর্জন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই বৈধ। কাজেই অনুরূপ যে সুদ, তাও বৈধ হওয়া উচিত)। অথচ (উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবধান রয়েছে। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা (যিনি বিধি-বিধানের মালিক) ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন ; (এর বেশি ব্যবধান আর কি হতে পারে ?) অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (এ সম্পর্কে) উপদেশ এসেছে এবং সে (এই সুদখোরী কুফরী বাক্য অর্থাৎ সুদকে বৈধ বলা থেকে) বিরত হয়েছে (এবং তাকে হারাম মনে করে সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ করছে, তার জন্য রয়েছে সুসংবাদ)। তবে যা কিছু (এ নির্দেশ নাযিলের) পূর্বে (নেওয়া) হয়ে গেছে, তা তার (অর্থাৎ বাহ্যিক শরীয়তে তার এ তওবা কবূল হয়েছে এবং নেওয়া অর্থের মালিক সে-ই) এবং তার (অভ্যন্তরীণ) ব্যাপার (অর্থাৎ সে মনেপ্রাণে বিরত হয়েছে, না কপটতা করে তওবা করেছে, তা) আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। (খাঁটি মনে তওবা করে থাকলে তা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, নতুবা না করার মতই হবে। তার প্রতি কুধারণা পোষণ করার অধিকার তোমাদের নেই)। এবং যারা (উল্লিখিত উপদেশ শুনেও এ উক্তি ও কর্মের দিকে) পুনরায় ফিরে আসে, তবে (তাদের এ কাজ স্বয়ং কবীরা গোনাহ্ তথা মহাপাপ হওয়ার কারণে) তারা দোযখে যাবে (এবং তাদের এ উক্তি কুফরী হওয়ার কারণে) তারা তথায় (দোযখে) চিরকাল অবস্থান করবে। (সুদ গ্রহণে আপাত দৃষ্টিতে টাকা-পয়সা বৃদ্ধি পেতে দেখা গেলেও পরিণামে) আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। (কখনও ইহকালেই সব ধ্বংস হয়ে যায়, নতুবা পরকালে ধ্বংস হওয়া তো সুনিশ্চিত। কেননা, সেখানে এ কারণে শাস্তি প্রদান করা হবে। এর বিপরীতে দান-খয়রাতে আপাত দৃষ্টিতে অর্থ হ্রাস পায় মনে হলেও পরিণামে) আল্লাহ্ তা'আলা দানকে বর্ধিত করেন। (কখনও ইহকালেই বৃদ্ধি করেন, নতুবা পরকালে বৃদ্ধি পাওয়া তো সুনিশ্চিত। কেননা, সেখানে এ কারণে অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে; যেমন পূর্বোল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে)। আর আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না (বরং অপছন্দ করেন,) কোন অবিশ্বাসীকে, (যে উপরোক্ত বাক্যের মত কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে এবং এমনিভাবে পছন্দ করেন না) কোন পাপীকে (যে উল্লিখিত কাজ অর্থাৎ সুদের অনুরূপ কবীরা গোনাহ করে)।

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, (বিশেষত) নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে সওয়াব রয়েছে এবং (পরকালে) তাদের কোন বিপদাশঙ্কা হবে না এবং তারা (কোন উদ্দেশ্য পণ্ড হওয়ার কারণে) দুঃখিতও হবে না।

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যেসব বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। (কেননা, আল্লাহ্‌র আনুগত্য করাই ঈমানের

দাবি) অতঃপর যদি তোমরা (একে কার্যে পরিণত) না কর, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের বিজ্ঞপ্তি শুনে নাও (অর্থাৎ তোমাদের বিরুদ্ধে এ কারণে জিহাদ ঘোষণা করা হবে) এবং যদি তোমরা তওবা করে নাও, তবে তোমাদের মূলধন (ফেরত) পেয়ে যাবে। (এ আইনের পর) তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করতে পারবে না, তোমাদের প্রতিও অত্যাচার করা হবে না। (অর্থাৎ তোমরা মূলধনও ফেরত পাবে না বা দিবে না, তা হবে না) এবং যদি (ঋণগ্রহীতা) অভাবগ্রস্ত হয় (এবং এ কারণে নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারে,) তবে (তাকে) সময় দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে, সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত। (অর্থাৎ যখন সে পরিশোধ করতে সক্ষম হবে সে সময় পর্যন্ত) এবং (সম্পূর্ণভাবে) ক্ষমা করে দেওয়াই তোমাদের জন্য আরও উত্তম, যদি তোমরা (এ সওয়াব ও বিনিময় সম্পর্কে) জ্ঞানবান হও।

(হে মুসলমানগণ,) ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্র কাছে হাযিরার জন্য প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্ম (অর্থাৎ কৃতকর্মের ফল) পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না (অতএব হাযিরার জন্য তোমরা স্বীয় কার্যকলাপ ঠিক রাখ এবং কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করো না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে 'রিবা' অর্থাৎ সুদের অবৈধতা ও তার বিধি-বিধান সম্পর্কিত বর্ণনা শুরু হয়েছে। এ প্রশ্নটি কয়েক দিক দিয়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে সুদের কারণে কোরআন ও সুন্নাহ্য় কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে সুদ বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। সুদের কবল থেকে মুক্তিলাভ করার পথে যেসব অসুবিধা ও জটিলতা বিদ্যমান, সেগুলোর তালিকা সুদীর্ঘ। তাই বিষয়টি কয়েক দিক দিয়েই আলোচনা সাপেক্ষ।

প্রথমে এ ব্যাপারে কোরআনী আয়াতের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ও সহীহ হাদীসসমূহের বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সুদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে এবং দেখতে হবে সুদ কোন্ কোন্ ব্যবসায়-বাণিজ্যে পরিব্যাপ্ত, এর অবৈধতা কোন্ রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল এবং এতে কি ধরনের অনিষ্ট বিদ্যমান ?

সুদের দ্বিতীয় দিক হচ্ছে যৌক্তিক ও অর্থনৈতিক। অর্থাৎ বাস্তবিকই কি সুদ বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতির নিশ্চয়তা দিতে পেরেছে ? একে উপেক্ষা করলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সাধারণ অর্থনীতির প্রাচীর কি ধসে যাবে, না গোটা ব্যাপারটাই শুধু আল্লাহ্ ও পরকালে অবিশ্বাসী মস্তিষ্কসমূহের উদ্ভট ফসল ? নতুবা সুদ ছাড়াও সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে—শুধু সমস্যার সমাধানই নয় ; বরং বিশ্বের অর্থনৈতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুদ বর্জনের উপরই নির্ভরশীল, সুদই বিশ্বের অর্থনৈতিক অশান্তি ও অস্থিরতার মূল ও প্রধান কারণ ?

দ্বিতীয়ত, এই আলোচনাটি একটি অর্থনৈতিক বিষয়। এর আওতায় অনেকগুলো মৌলিক ও আনুষঙ্গিক সুদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। কোরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এসব আলোচনাও কম দীর্ঘ নয়।

আলোচ্য ছয়টি আয়াতে সুদের অবৈধতা ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যে সুদখোরদের মন্দ পরিণতি এবং হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্ছনা ও ভ্রষ্টতার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা সুদ খায়, তারা দণ্ডায়মান হয় না; কিন্তু সেই ব্যক্তির মত,

যাকে কোন শয়তান-জ্বিন আছর করে দিশেহারা করে দেয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হাশরের ময়দানে কবর থেকে উঠা। সুদখোর যখন কবর থেকে উঠবে, তখন ঐ পাগল বা উন্মাদের মত উঠবে, যাকে কোন শয়তান-জ্বিন দিশেহারা করে দেয়।

এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, জ্বিন ও শয়তানের আছরের ফলে মানুষ অজ্ঞান কিংবা উন্মাদ হতে পারে। অভিজ্ঞ লোকদের উপর্যুপরি অভিজ্ঞতাও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। হাকীম ইবনে কাইয়্যেম জওযী (র) লিখেছেন ঃ চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকগণও স্বীকার করেন যে, মৃগীরোগ, মূর্ছারোগ কিংবা পাগলামি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। মাঝে মাঝে জ্বিন ও শয়তানের আছরও এর কারণ হয়ে থাকে। যারা বিষয়টি অস্বীকার করে, তাদের কাছে বাহ্যিক অসম্ভাব্যতা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ বর্তমান নেই।

আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সুদখোররা হাশরে উন্মাদ অবস্থায় উত্থিত হবে—কোরআন পাক সোজাসুজি একথা বলেনি, বরং পাগলামি ও অজ্ঞানতার বিশেষ একটি প্রকার উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ শয়তান আছর করে দিশেহারা করে দিলে যেভাবে উঠে, সেভাবে উঠবে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, অজ্ঞান ও পাগল ব্যক্তি মাঝে মাঝে যেমন চুপচাপ পড়ে থাকে তাদের অবস্থা তেমন হবে না ; তারা শয়তান কর্তৃক মাতাল করা লোকদের মত প্রলাপোক্তি ও অন্যান্য পাগলসুলভ কাণ্ড-কীর্তি দ্বারা পরিচিত হবে।

সম্ভবত এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, রোগবশত অজ্ঞান কিংবা পাগল হওয়ার পর চেতনাশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। এরূপ ব্যক্তিই কষ্ট কিংবা শাস্তি অনুভব করতে পারে না। সুদখোরদের অবস্থা এরূপ হবে না। তারা ভূতে-ধরা লোকের মত কষ্ট ও শাস্তি পুরোপুরিই অনুভব করবে।

এখন দেখতে হবে যে, অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে যে মিল থাকা দরকার, তা এখানে আছে কিনা। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যে শাস্তি কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে কোন অপরাধের কারণে দেওয়া হয়, তার সাথে অপরাধের অবশ্যই মিল থাকে। হাশরে সুদখোরদেরকে মাতাল অবস্থায় উত্থিত করার মধ্যে সম্ভবত এ বিষয়ের অভিব্যক্তি রয়েছে যে, সুদখোর টাকা-পয়সার লালসায় এমন বিভোর হয়ে পড়ে যে, কোন দরিদ্রের প্রতি তার মনে সামান্য দয়ারও উদ্রেক হয় না এবং লজ্জা-শরম তাকে বাধা দিতে পারে না। সে প্রকৃতপক্ষে জীবদ্দশায় অজ্ঞান ছিল। তাই হাশরেও তাকে এ অবস্থায় উঠানো হবে। অথবা এ শাস্তি দেওয়ার কারণ এই যে, সে যেহেতু দুনিয়াতে স্বীয় নির্বুদ্ধিতাকে বুদ্ধির আবরণে প্রকাশ করেছে এবং ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ আখ্যা দিয়েছে, তাই তাকে নির্বোধ করে উঠানো হবে।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ এর অর্থ হচ্ছে সুদ গ্রহণ করা ও সুদ ব্যবহার করা খাওয়ার জন্য ব্যবহার করুক কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি অথবা আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করুক। কিন্তু বিষয়টি 'খাওয়া' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই যে, বস্তু খেয়ে ফেলা হয়, তা আর ফেরত দেওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অন্য রকম ব্যবহারে ফেরত দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পুরোপুরি আত্মসাৎ করার কথা বোঝাতে গিয়ে 'খেয়ে ফেলা' শব্দ দ্বারা বোঝান হয়। শুধু আরবী ভাষা নয়, অধিকাংশ ভাষার সাধারণ বাকপদ্ধতিও তা-ই।

এরপর দ্বিতীয় বাক্যে সুদখোরদের এ শাস্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে। তারা দু'টি অপরাধ করেছে ঃ এক. সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে। দুই. সুদকে হালাল মনে করেছে এবং যারা

একে হারাম বলেছে, তাদের উত্তরে বলেছে ঃ "ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদেরই অনুরূপ। সুদের মাধ্যমে যেমন মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও মুনাফাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব, সুদ হারাম হলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো হারাম হওয়া উচিত।" অথচ কেউ বলে না যে, ক্রয়-বিক্রয় হারাম। এক্ষেত্রে বাহ্যত তাদের বলা উচিত ছিল যে, সুদও তো ক্রয়-বিক্রয়ের মতই। ক্রয়-বিক্রয় যখন হালাল তখন সুদও হালাল হওয়া উচিত। কিন্তু তারা বর্ণনাভঙ্গি পাল্টিয়ে যারা সুদকে হারাম বলতো, তাদের প্রতি এক প্রকার উপহাস করেছে যে, তোমরা সুদকে হারাম বললে ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম বল।

তৃতীয় বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ উক্তির জওয়াবে বলেছেন যে, এরা ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ ও সমতুল্য বলেছে, অথচ আল্লাহ্র নির্দেশের ফলে এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা একটিকে হালাল এবং অপরটিকে হারাম করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় উভয়টি কেমন করে সমতুল্য হতে পারে ?

এর জওয়াবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সুদখোরদের আপত্তি ছিল যুক্তিগত। অর্থাৎ মুনাফা উপার্জনই যখন উভয় লেনদেনের লক্ষ্য, তখন হারাম-হালালের ব্যাপারে উভয়টি একই রকম হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের যুক্তিনির্ভর আপত্তির জওয়াব যুক্তিগতভাবে পার্থক্য বর্ণনার মাধ্যমে দেননি ; বরং বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে জওয়াব দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সব কিছুর একমাত্র অধিপতি এবং বস্তুর লাভ-ক্ষতি ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি যখন একটিকে হালাল ও অপরটিকে হারাম করেছেন, তখন এতেই বুঝে নেওয়া যায় যে, তিনি যে বস্তুকে হারাম করেছেন, তার মধ্যে অবশ্যই কোন অনিষ্ট, ক্ষতি বা অপবিত্রতা রয়েছে—সাধারণ মানুষ তা অনুভব করুক বা না-ই করুক। কেননা, সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার পূর্ণ স্বরূপ ও লাভ-ক্ষতি পুরোপুরিভাবে একমাত্র ঐ মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞই জানতে পারেন যার জ্ঞান থেকে পৃথিবীর কণা পরিমাণ বস্তুও লুক্কায়িত নয়। বিশ্বের ব্যক্তিবর্গ ও সম্প্রদায়সমূহ নিজ নিজ লাভ-ক্ষতি জানতে পারলেও সমগ্র বিশ্বের লাভ-লোকসান পুরোপুরিভাবে জানতে পারে না। কোন কোন বস্তু কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের পক্ষে লাভজনক হয় কিন্তু গোটা জাতি কিংবা গোটা দেশের জন্য তাতে ক্ষতি নিহিত থাকে।

এরপর তৃতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি সুদের অর্থ অর্জন করেছিল, সুদ হারাম হওয়ার পর সে যদি ভবিষ্যতের জন্য তওবা করে নেয় এবং সুদ থেকে বিরত থাকে, তবে পূর্বেকার সঞ্চিত অর্থ শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী তারই অধিকারভুক্ত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, সে সর্বান্তকরণেই বিরত রয়েছে কি কপটতা সহকারে তওবা করেছে—তার এ অভ্যন্তরীণ ব্যাপারটি আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল থাকবে।

মনেপ্রাণে তওবা করে থাকলে আল্লাহ্র কাছে তা উপকারী হবে, অন্যথায় তা তওবা না করারই মত। তার প্রতি সাধারণ লোকদের খারাপ ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। যে উপদেশ শুনেও উপরোক্ত উক্তি ও কার্যে পুনরায় লিপ্ত হয়, তার এ কার্যে (সুদ গ্রহণ করা) গোনাহ্ হওয়ার কারণে সে দোযখে যাবে এবং তার এ উক্তিতে (অর্থাৎ সুদ ক্রয়-বিক্রয়েরই মত হালাল) কুফর হওয়ার কারণে সে চিরকাল দোযখে অবস্থান করবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। এখানে একটি বিশেষ সামঞ্জস্যের কারণে সুদের সাথে দান-খয়রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সুদ ও খয়রাত উভয়ের স্বরূপ যেমন পরস্পরবিরোধী, উভয়ের পরিণামও

তেমনি পরস্পরবিরোধী। আর সাধারণত যারা এসব কাজ করে, তাদের উদ্দেশ্য এবং নিয়তও পরস্পরবিরোধী হয়ে থাকে।

স্বরূপের বিরোধ এই যে, সদকা ও খয়রাতে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই নিজ অর্থ-সম্পদ অপরকে দেওয়া হয় এবং সুদে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই অপরের অর্থ-সম্পদ নিয়ে নেওয়া হয়। এ দু'টি কাজ যারা করে, তাদের নিয়ত ও উদ্দেশ্য পরস্পরবিরোধী হওয়ার কারণ এই যে, খয়রাতকারী ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও পরকালীন সওয়াবের জন্য স্বীয় অর্থ-সম্পদ হ্রাস কিংবা নিঃশেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পক্ষান্তরে সুদ গ্রহণকারী ব্যক্তি তার বর্তমান অর্থ-সম্পদকে অবৈধভাবে বৃদ্ধি করার উদগ্র বাসনা পোষণ করে থাকে। পরিণতির পরস্পর বিরোধিতা কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সুদ দ্বারা অর্জিত ধন-সম্পদ কিংবা তার বরকত মিটিয়ে দেন এবং খয়রাতকারীর ধন-সম্পদ কিংবা তার বরকত বাড়িয়ে দেন। সারকথা এই যে, যারা ধন-সম্পদের লোভ করে না, সম্পদ হ্রাসে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও তাদের ধন-সম্পদ কিংবা ধন-সম্পদের ফলাফল, বরকত ও উপকারিতা বেড়ে যায়।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদকে মেটানো আর দান-খয়রাতকে বর্ধিত করার উদ্দেশ্য কি ? কোন কোন তফসীরকার বলেন, এ মেটানো ও বাড়ানো পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুদখোরের ধন-সম্পদ পরকালে তার কোনই কাজে আসবে না; বরং তা তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে দান-খয়রাতকারীদের ধন-সম্পদ পরকালে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নেয়ামত ও শান্তিলাভের উপায়-উপকরণ হবে। এ ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট। এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সাধারণ তফসীরকারগণ বলেন ঃ সুদকে মেটানো এবং দান-খয়রাতকে বাড়ানো পরকালে তো হবেই, কিন্তু এর কিছু কিছু লক্ষণ দুনিয়াতেও প্রত্যক্ষ করা যায়।

যে সম্পদের সাথে সুদ মিশ্রিত হয়ে যায়, অধিকাংশ সময় সেগুলো তো ধ্বংস হয়ই, অধিকন্তু আগে যা ছিল, তাও সাথে নিয়ে যায়। সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা যায়। অজস্র পুঁজির মালিক কোটিপতি দেখতে দেখতে দেউলিয়া ও ফকীরে পরিণত হয়। সুদবিহীন ব্যবসায়-বাণিজ্যেও লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্তও হয়; কিন্তু গতকাল যে কোটিপতি ছিল, আজ সে পথের ভিখারী, এমন ক্ষতি শুধু সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। লোক সমাজে অসংখ্য বর্ণনা বিবৃতি এ ব্যাপারে সুবিদিত যে, সুদের মাল তাৎক্ষণিকভাবে যতই প্রবৃদ্ধি লাভ করুক, তা সাধারণত স্থায়ী হয় না। সন্তান-সন্ততি ও বংশধররা তা ভোগ করতে পারে না। প্রায়ই কোন-না-কোন বিপর্যয়ের মুখে তা ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত মা'মার (র) বলেন ঃ আমি বুযুর্গদের মুখে শুনেছি, চল্লিশ বছর যেতে না যেতেই সুদখোরের ধন-সম্পদে ভাটা আরম্ভ হয়ে যায়।

যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধন-সম্পদের ধ্বংস দেখা নাও যায়, তবুও তার উপকারিতা, বরকত ও ফলাফল থেকে বঞ্চনা নিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী। কেননা এটা সুস্পষ্ট যে, স্বর্ণ-রৌপ্য স্বয়ং উদ্দেশ্যও নয় এবং উপকারীও নয়। স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা কারও ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটে না, কিংবা শীত গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্য তা গায়ে জড়ানো কিংবা বিছানোও যায় না। তদুপরি এর উপার্জন ও সংরক্ষণে হাজারো কষ্ট স্বীকার করতে হয়। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতে এত সব কষ্ট স্বীকার করার কারণ এছাড়া অন্য কিছু নয় যে, স্বর্ণ-রৌপ্য এমন কতগুলো বস্তু অর্জন করার

উপায় যার সাহায্যে মানুষের জীবন সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয় এবং সে আরাম ও সম্মানজনক জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। মানুষ নিজে যে আরাম ও সম্মান অর্জন করেছে, তার সন্তান-সন্ততিও তা ভোগ করুক, এ বাসনা মানুষের স্বভাবজাত।

এগুলোই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপকারিতা ও ফলাফল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা ভুল হবে না যে, যে ব্যক্তি এসব উপকারিতা ও ফলাফল লাভ করতে সক্ষম হয়, তার ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে বেড়ে যায়; যদিও চর্মচক্ষে তা কম বলে মনে হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপকারিতা ও ফলাফল কম অর্জন করে, তার ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে হ্রাস পায় ; যদিও চর্মচক্ষে তা অধিক মনে হয়ে থাকে।

একথা উপলব্ধি করে নেওয়ার পর এবার সুদের কারবারে দান-খয়রাতের ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। আপনি প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারবেন যে, সুদখোরের ধন-সম্পদ যদিও ক্রমবর্ধিষ্ণু দেখা যায়, কিন্তু এ বর্ধিষ্ণুতা পাণ্ডুরোগীর দেহ ফুলে মোটা হয়ে যাওয়ারই মত। ফুলে যাওয়ার ফলে যে বর্ধিষ্ণুতা আসে তাও দেহেরই বৃদ্ধি, কিন্তু কোন সমঝদার মানুষই এ বর্ধিষ্ণুতাকে পছন্দ করতে পারে না। কেননা, সে জানে যে, এ বর্ধিষ্ণুতা মৃত্যুরই বার্তাবহ। এমনিভাবে সুদখোরের ধন-সম্পদ যতই ক্রমবর্ধমান দেখা যাক না কেন, সে এর উপকারিতা ও ফলাফল অর্থাৎ আরাম ও সম্মান থেকে সর্বদাই বঞ্চিত থাকে।

এখানে হয়ত কারও মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, আজকাল তো সুদখোরদেরই আধিপত্য বেশি। আরাম ও সম্মান তো দেখা যায় তাদেরই করায়ত্ত। দেখা যায়, তারাই প্রাসাদোপম বাড়ি-ঘরের মালিক। আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসের যাবতীয় সামগ্রীও তাদেরই হাতের মুঠোয়। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বসবাসের প্রয়োজনীয় বরং প্রয়োজনাতিরিক্ত আসবাবপত্রেরও তাদের অভাব নেই। নফর, চাকর এবং শান-শওকতের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম তাদেরই কাছে বিদ্যমান। কিন্তু চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে, আরামের সাজ-সরঞ্জাম তো কারখানায় নির্মিত এবং তা বাজারেও বিক্রয় হয়। স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে তা অর্জনও করা যায়। কিন্তু যার নাম আরাম ও শান্তি, তা কোন কারখানায় নির্মিত হয় না এবং বাজারেও বিক্রয় হয় না। তা এমন একটি রহমত যা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই আসে। অনেক সময় বিস্তর সরঞ্জাম সত্ত্বেও তা অর্জিত হয় না। একটি নিদ্রা-সুখের কথাই ধরুন। এর জন্য মনোরম বাসগৃহ নির্মাণ করা যায়, সুষম আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা যায়, আসবাবপত্র সুদৃশ্য ও মনোহরী করা যায় এবং ইচ্ছামত নরম বিছানা ও খাট যোগাড় করা যায়। কিন্তু এতসব সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় হলেই কি নিদ্রা অবশ্যম্ভাবী ? আপনার হয়তো এ অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু হাজারো মানুষ এ প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলবে—যাদের কোন বিপত্তির কারণে নিদ্রা আসে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সম্পদশালী সভ্য দেশ সম্পর্কিত কোন কোন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সেখানে শতকরা পঁচাত্তর জন মানুষ ঘুমের বটিকা ব্যবহার না করে ঘুমোতেই পারে না এবং মাঝে মাঝে বটিকাও তাদের ঘুম আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। ঘুমের সাজ-সরঞ্জাম আপনি বাজার থেকে কিনে আনতে পারেন। কিন্তু ঘুম কোন বাজার থেকে কোন মূল্যেই কিনে আনতে পারেন না। অন্যান্য আরাম এবং সুখের অবস্থাও তা-ই।

বিষয়টি বুঝে নেওয়ার পর সুদখোরদের অবস্থা পর্যালোচনা করুন। আপনি তাদের কাছে সবকিছু পাবেন কিন্তু আরাম ও সুখ পাবেন না। তার এক কোটিকে দেড় কোটি এবং দেড়

কোটিকে দু'কোটি করার চিন্তায় তাদেরকে এমন বিভোর দেখা যাবে যে, খাওয়া-পরা এবং বিবি-বাচ্চাদের প্রতি লক্ষ্য করারও সময় নেই। কয়েকটি মিল-কারখানা চলছে, ভিনদেশ থেকে জাহাজ আসে—এসব নানাবিধ চিন্তার জাল বোনার মধ্যেই তাদের সকাল থেকে বিকাল এবং বিকাল থেকে সকাল হয়ে যায়। আফসোস, এ জ্ঞান-পাগলরা সুখের সাজ-সরঞ্জামকেই সুখ মনে করে নিয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তারা সুখ থেকে অনেক দূরে পড়ে রয়েছে।

এ হচ্ছে তাদের আরাম ও সুখের অবস্থা। এখন এদের সম্মানের অবস্থাটিও দেখে নিন। বলা বাহুল্য, সুদখোররা কঠোরপ্রাণ ও নির্দয়। দরিদ্রদের দারিদ্র্য এবং স্বল্প পুঁজিওয়ালাদের পুঁজির স্বল্পতার সুযোগ গ্রহণ করাই তাদের পেশা। দরিদ্রদের রক্ত চুষে তারা তাদের নিজেদের উদর স্ফীত করে তোলে। তাই জনগণের অন্তরে তাদের প্রতি ইয্যত ও সম্ভ্রম থাকা অসম্ভব। নিজ দেশের মহাজন-ব্যবসায়ী এবং দুনিয়াজোড়া ছড়িয়ে থাকা ইহুদীদের ইতিহাস পাঠ করুন। তাদের সিন্দুক স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা যতই পরিপূর্ণ হোক না কেন, জগতের কোন কোণে এবং মানবগোষ্ঠীর কোন স্তরেই তাদের সম্মান নেই। বরং তাদের এ কর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই যে, দরিদ্র ও নিঃস্বলোকদের অন্তরে তাদের সম্পর্কে প্রতিহিংসা ও যুগপৎ ঘৃণারই সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিশ্বের সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ এ হিংসা ও ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ। শ্রম ও পুঁজির মধ্যকার সংগ্রামই বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে। কম্যুনিজমের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা এ হিংসা ও ঘৃণারই ফল। ফলে সমগ্র বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। এ হচ্ছে তাদের সুখ ও সম্মানের অবস্থা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সুদের ধন-সম্পদ সুদখোরের ভবিষ্যত বংশধরদের জীবনকেও কখনও সুখময় করে না। হয় তারা ধ্বংস হয়ে যায়, না হয় এর অমঙ্গলে তারাও ধন-সম্পদের সত্যিকার ফলাফল ভোগে বঞ্চিত হয়।

ইউরোপীয় সুদখোরদের দৃষ্টান্ত থেকে সম্ভবত কেউ ধোঁকা খেতে পারে যে, তারা তো সবাই সুখী ও সমৃদ্ধিশালী। তাদের বংশধররাও সমৃদ্ধিশালী হচ্ছে। কিন্তু প্রথমত, তাদের সমৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত চিত্র এইমাত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ! দ্বিতীয়ত তাদের অবস্থা হচ্ছে এরূপ ঃ মনে করুন, কোন আদমখোর অন্যান্য মানুষের রক্ত চুষে নিজ দেহের লালন-পালন করে এবং এ জাতীয় কতিপয় আদমখোর কোন এক মহল্লায় বসতি স্থাপন করেছে। আপনি কাউকে এ মহল্লায় নিয়ে গিয়ে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করান। দেখা যাবে, তারা সবাই সুস্থ, সবল ও প্রফুল্ল। কিন্তু একজন মানবতার মঙ্গলকামী জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু এ মহল্লাই দেখবে না। সে এদের বিপরীতে ঐসব বস্তিও দেখবে, যাদের রক্ত চুষে তাদেরকে অর্ধমৃত করে দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি আদমখোরদের মহল্লা এবং এসব বস্তির প্রতি লক্ষ্য করবে, সে কখনও মহল্লাবাসীদেরকে মোটাতাজা দেখে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবে না এবং সামগ্রিক দিক দিয়ে এদের কর্মকে মানব জাতির উন্নতির উপায়ও বলতে পারবে না ; বরং একে মানবতার বিপর্যয় ও ধ্বংস বলে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হবে।

এর বিপরীত দান-খয়রাতকারীদেরকে দেখুন। তাদের কখনও ধন-সম্পদের পিছনে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে দেখবেন না। সুখের সাজ-সরঞ্জাম যদিও তাদের কম, কিন্তু সাজ-সরঞ্জাম ওয়ালাদের চাইতে শান্তি, স্বস্তি এবং মানবিক স্থৈর্য তারা অনেকগুণ বেশি ভোগ করে থাকেন। বলা বাহুল্য, এটাই প্রকৃত সুখ। দুনিয়াতে প্রত্যেকেই তাদেরকে সম্মান ও ভক্তির চোখে দেখে থাকে।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ—মোটকথা, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। এ উক্তি পরকালের দিক দিয়ে তো সম্পূর্ণ পরিষ্কারই ; সত্যোপলব্ধির সামান্য চেষ্টা করলে দুনিয়ার দিক দিয়েও সুস্পষ্ট। হুযূর (সা)-এর এ উক্তির উদ্দেশ্যও তাই ঃ

ان الربٰوا وان كثر فان عاقبته تصير الى قل

অর্থাৎ সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর শেষ পরিণতি হচ্ছে স্বল্পতা —(মসনদে-আহমদ, ইবনে মাজাহ্)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ— অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাফির গোনাহ্গারকে পছন্দ করেন না।" এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা সুদকে হারামই মনে করে না, তারা কুফরে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্ত্বেও কার্যত সুদ খায়, তারা গোনাহ্গার, পাপাচারী।

তৃতীয় আয়াতে নামায ও যাকাতের নির্দেশের প্রতি অনুগত সৎকর্মশীল মু'মিনদের বিরাট পুরস্কার ও পরকালীন সুখ-শান্তি বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে সুদখোরদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি এবং লাঞ্ছনার কথা উল্লিখিত হয়েছিল। তাই কোরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুযায়ী এর সাথে সাথে ঈমানদার সৎকর্মী তথা নামায ও যাকাত আদায়কারীদের সওয়াব ও পরকালীন মর্তবা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ․

চতুর্থ অর্থাৎ এই আয়াতের সারমর্ম হলো, সুদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পর সুদের যেসব বকেয়া অর্থ কারও কাছে প্রাপ্য ছিল, এ আয়াতে সেগুলোর লেনদেনও হারাম করা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, সুদের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবে ব্যাপকভাবে সুদী কারবারের প্রচলন ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এর নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হলে মুসলমানরা যথারীতি সুদের কাজ-কারবার পরিত্যাগ করেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোকের বকেয়া সুদের দাবি তখনো অন্যদের উপর অবশিষ্ট ছিল। বনী সাকীফ ও বনী মখযুমের মধ্যে পরস্পর সুদের কারবার বহাল ছিল এবং বনী সাকীফের কিছু সুদের দাবি তখনও পর্যন্ত বনী মখযুমের উপর অবশিষ্ট ছিল। বনী মখযুম মুসলমান হওয়ার পর সুদের টাকা পরিশোধ করাকে অবৈধ মনে করতে থাকে। আবার এদিকে বনী সাকীফ তাদের প্রাপ্য সুদ দাবি করতে থাকে। কারণ, তারা মুসলমান ছিল না, কিন্তু মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। বনী মখযুমের বক্তব্য ছিল এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমরা যে হালাল উপার্জন করছি, তা সুদ পরিশোধে ব্যয় করবো না।

এ মতবিরোধের ঘটনাস্থল ছিল মক্কা মুকাররমা। তখন বিজিত হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে মক্কার শাসক ছিলেন হযরত মু'আয (রা)। অন্য রেওয়ায়েত মতে ইতাব ইবনে উসায়দ (রা)। তিনি নির্দেশ লাভের উদ্দেশ্যে ঘটনার বিবরণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট লিপিবদ্ধ করে পাঠালেন। এরই প্রেক্ষিতে কোরআন পাকের আলোচ্য এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এর সারমর্ম এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর সুদের পূর্ববর্তী সব কাজ-কারবার অবিলম্বে মওকুফ করে দিতে হবে। অতীত সুদও গ্রহণ না করে শুধু মূলধন আদায় করতে হবে।

এই ইসলামী আইন কার্যকর হলে মুসলমানরা তো তা মানতে বাধ্য ছিলই, যেসব অমুসলিম গোত্র মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ইসলামী আইন কবূল করে নিয়েছিল, তারাও এই আইন মেনে নিতে বাধ্য হলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বিদায়-হজ্জের ভাষণে এ আইন ঘোষণা করলেন, তখন একথাও প্রকাশ করলেন যে, এ আইন ব্যক্তি বিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ কিংবা মুসলমানদের আর্থিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে নয় ; বরং সমগ্র মানব সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই জারি করা হয়েছে। তাই আমি সর্বপ্রথম অ-মুসলমানদের কাছে মুসলমানদের প্রাপ্য বকেয়া সুদের বিরাট অংক মওকুফ করে দিচ্ছি। এখন তাদেরও নিজ নিজ বকেয়া সুদের অংক ছেড়ে দিতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। তিনি এ ভাষণে বলেন ঃ

الا ان كل ربٰوا كان فى الجاهلية موضوع عنكم كله لكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولاتظلمون واول ربٰوا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب كله.

অর্থাৎ জাহিলিয়ত যুগে সুদের যেস্‌ব লেনদেন হয়েছে, সবগুলোর সুদ ছেড়ে দেওয়া হলো। এখন প্রত্যেকেই মূলধন পাবে। সুদের অতিরিক্ত অংক পাবে না। তোমরা সুদ আদায় করে আর কারও উপর জুলুম করতে পারবে না এবং কেউ মূলধন পরিশোধ করতে অস্বীকার করে তোমাদের উপর জুলুম করতে পারবে না। সর্বপ্রথম যে সুদ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের প্রাপ্য সুদ। এ সুদের বিরাট অংক অমুসলিমদের কাছে প্রাপ্য ছিল। কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াতে এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত এবং বকেয়া সুদ ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে اِتَّقُوا اللّٰهَ (আল্লাহ্‌কে ভয় কর) আদেশ দ্বারা আয়াতটি শুরু করা হয়েছে। এরপর আসল বিষয়ের নির্দেশ বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমেই কোরআন পাক সমগ্র বিশ্বের অন্য সকল বিধানের তুলনায় এক অনন্য স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। মানুষের পক্ষে পালন করা কঠিন মনে হয়—যখনই এরূপ কোন আইন কোরআন পাকে বর্ণনা করা হয়েছে, তখনই আগে পরে আল্লাহ্‌র সামনে হাযিরা, হিসাব-নিকাশ এবং পরকালের শাস্তি অথবা সওয়াবের কথা উল্লেখ করে মুসলমানদের অন্তর ও মন-মানসকে তা পালন করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এরপর নির্দেশ শুনানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও অতীত সুদের অঙ্ক ছেড়ে দেওয়া মানবমনের পক্ষে কঠিন হতে পারত। তাই আগে اِتَّقُوا اللّٰهَ বলে এরপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ঃ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا অর্থাৎ বকেয়া সুদ ছেড়ে দাও। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করা এবং বিরুদ্ধাচরণ না করাই ঈমানের পরিচায়ক। নির্দেশটি পালন কষ্টসাধ্য ছিল বলেই নির্দেশের পূর্বে اِتَّقُوا اللّٰهَ এবং নির্দেশের পরে ان كنتم مؤمنين যুক্ত করা হয়েছে।

এরপর পঞ্চম আয়াতে এ নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে কঠোর শাস্তির কথা শুনানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি সুদ না ছাড়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কুফর ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তম গোনাহের কারণে কোরআন পাকে

এতবড় শাস্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ যদি তোমরা তওবা করে ভবিষ্যতের জন্য বকেয়া সুদ ছেড়ে দিতে কৃতসংকল্প হও, তবে তোমরা আসল মূলধন ফেরত পেয়ে যাবে। মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা কারও উপর জুলুম করতে পার না এবং কেউ মূলধন হ্রাস করে কিংবা পরিশোধে বিলম্ব করে তোমাদের উপরও জুলুম করতে পারবে না। আয়াতে আসল মূলধন দেওয়াকে তওবার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমরা তওবা কর এবং ভবিষ্যতে সুদ ছেড়ে দিতে কৃতসংকল্প হও, তবেই তোমরা আসল মূলধন পাবে।

এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, সুদ ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করে তওবা না করলে মূলধনও পাবে না। এ মাস'আলার বিবরণ এই যে, যদি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সুদকে হারামই মনে না করে, পরন্তু আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক সুদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য তওবা না করে, তবে এ ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ, ধর্মত্যাগী। ধর্মত্যাগীর ধন-সম্পদ তার মালিকানায় থাকে না। মুসলমান অবস্থায় সে যা উপার্জন করে, তা সরকারী ধনাগারে জমা হয়। তাই সুদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য তওবা না করা যদি হালাল মনে করার কারণে হয়, তবে আসল মূলধনও সে ফেরত পাবে না। পক্ষান্তরে যদি হারাম মনে করেও কার্যত সুদ থেকে বিরত না হয় এবং দল গঠন করে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তবে সে বিদ্রোহী। বিদ্রোহীরও সকল সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সরকারী ধনাগারে জমা করা হয়। যখন সে তওবা করে তখন আবার সহায়-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হয়। বস্তুত এ জাতীয় সূক্ষ্ম দিকগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই শর্তের আকারে বলা হয়েছে ঃ فَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ اَمْوَالِكُمْ—অর্থাৎ যদি তওবা না কর, তবে তোমাদের মূলধনও বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

এরপর ষষ্ঠ আয়াতে সুদখোরীর মানবতা বিরোধী কাণ্ডকীর্তির বিপরীতে পূত-পবিত্র চরিত্র এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি কৃপামূলক ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌلَّكُمْ ـ

—অর্থাৎ তোমার খাতক যদি রিক্তহস্ত হয় —ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হয়, তবে শরীয়তের নির্দেশ এই যে, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া পর্যন্ত সময় দেওয়া বিধেয়। যদি তাকে ঋণ থেকেই রেহাই দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্য আরও উত্তম।

সুদখোরদের অভ্যাস এই যে, খাতক নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হলে সুদের অংক আসলের সাথে যোগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার চালায় এবং সুদের হারও আগের চাইতে বাড়িয়ে দেয়।

এখানে শ্রেষ্ঠতম বিচারপতি আল্লাহ্ তা'আলা আইন প্রণয়ন করে দিয়েছেন যে, কোন খাতক বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে এবং ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাকে অতিষ্ঠ করা জায়েয নয় ; বরং তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। সাথে সাথে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত করেছেন যে, যদি এ গরীবকে ক্ষমা করে দাও তবে তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম।

এখানে ক্ষমা করাকে কোরআন পাক সদ্‌কা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের জন্য সদ্‌কা হয়ে যাবে এবং বিরাট সওয়াবের কারণ হবে।

এছাড়া আরও বলেছেন ঃ ক্ষমা করা তোমাদের জন্য উত্তম। অথচ বাহ্যত এতে তাদের ক্ষতি। কারণ, সুদ তো ছেড়েই দেওয়া হয়েছিল, এখন মূলধনও গেল। কিন্তু কোরআন পাক একে উত্তম বলেছেন এর কারণ দ্বিবিধ ঃ এক. এটা যে উত্তম, তা এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের পর চোখের সামনে এসে যাবে। তখন এ সামান্য অর্থের বিনিময়ে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত অর্জিত হবে। দুই. এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, দুনিয়াতেও এ কার্যের কল্যাণকারিতা প্রত্যক্ষ করা যাবে। অর্থাৎ তোমাদের ধন-সম্পদে বরকত হবে। বরকতের স্বরূপ এই যে, অল্প ধন-সম্পদ দ্বারা অধিক কাজ সাধিত হবে। এর জন্য ধন-সম্পদের পরিমাণ ও সংখ্যা বেড়ে যাওয়া জরুরী নয়। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এই যে, খয়রাতকারীদের ধন-সম্পদে অপরিসীম বরকত হয়। তাদের অল্প ধন-সম্পদ দ্বারা এত অধিকতর কাজ সাধিত হয় যে, হারাম মালের অধিকারীদের বিপুল পরিমাণ অর্থকড়ি দ্বারা তত কাজ সাধিত হয় না।

বরকতহীন ধন-সম্পদের অবস্থা এই যে, যে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়, তা অর্জিত হয় না কিংবা উদ্দেশ্য নয়—এমন কাজেই তা অধিক ব্যয়িত হয়ে যায়। যেমন, ঔষধপত্র, চিকিৎসা এবং ডাক্তারের দর্শনী ইত্যাদি। এসব কাজে ধনীদের বিস্তর অর্থ ব্যয় হয়ে যায়। গরীবদের এগুলোর দরকার খুব কমই হয়ে থাকে। প্রথমত, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সুস্থতার নেয়ামত দান করেন। ফলে চিকিৎসায় অর্থ ব্যয় করার বড় একটা প্রয়োজনই তাদের জন্য দেখা দেয় না। দ্বিতীয়ত, অসুস্থ হলেও মামুলী খরচেই তাদের জন্য সুস্থতা অর্জিত হয়ে যায়। এ হিসাবে নিঃস্ব খাতককে কর্জ মাফ করে দেওয়া বাহ্যত অলাভজনক দেখা গেলেও কোরআনের এ শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এ একটি উপকারী ও লাভজনক কাজ।

নিঃস্ব খাতকের সাথে নম্রতার শিক্ষাসম্বলিত সহীহ্ হাদীসসমূহের কতিপয় বাক্য শুনুন ঃ তিবরানীর এক হাদীসে আছে—যেদিন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া মাথা গুঁজবার কোন ছায়া পাবে না, সেদিন যে ব্যক্তি স্বীয় মস্তকের উপর আল্লাহ্র রহমতের ছায়া কামনা করে, তার উচিত নিঃস্ব খাতকের সাথে নম্র ব্যবহার করা কিংবা তাকে মাফ করে দেওয়া।

সহীহ্ মুসলিমেও এ বিষয়ের হাদীস রয়েছে। মসনদে আহ্মদের এক হাদীসে আছে—যে ব্যক্তি কোন নিঃস্ব দেনাদারকে সময় দেবে, সে প্রত্যহ দেনা পরিমাণ অর্থ সদ্কা করার সওয়াব পাবে। দেনার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সময় দেওয়ার জন্য হবে এ হিসাব। যখন দেনার মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায় এবং দেনাদার দেনা পরিশোধ করতে সক্ষম না হয়, তখন সময় দিলে প্রত্যহ দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ সদকা করার সওয়াব পাবে।

এক হাদীসে আছে —যে ব্যক্তি চায় যে, তার দোয়া কবূল হোক কিংবা বিপদ দূর হোক, তার উচিত নিঃস্ব দেনাদারকে সময় দেওয়া।

এরপর শেষ আয়াতে পুনরায় কেয়ামতের ভয়, হাশরের হিসাব-নিকাশ এবং সওয়াব ও আযাব উল্লেখ করে সুদ সংক্রান্ত এ আয়াত সমাপ্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۔

অর্থাৎ—ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সবাই আল্লাহ্র সামনে হাযিরার জন্য আনীত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান পাবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ অবতরণের দিক দিয়ে এটি সর্বশেষ আয়াত। এরপর কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এর একত্রিশ দিন পর হুযূর (সা) ওফাত পান। কোন কোন রেওয়ায়েতে নয় দিন পর হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর ওফাতের কথা বর্ণিত আছে।

এ পর্যন্ত সুদের বিধি-বিধান সম্পর্কিত সূরা বাকারার আয়াতসমূহের তফসীর বর্ণিত হলো। সুদের অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কোরআন পাকে সূরা বাকারায় সাত আয়াত, সূরা আলে-ইমরানে এক আয়াত এবং সূরা নিসায় দু'টি আয়াত বর্ণিত হয়েছে। সূরা রূমেও একটি আয়াত আছে, যার তফসীরে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ একেও সুদের অর্থে ধরেছেন এবং কেউ কেউ অন্যবিধ ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। এভাবে কোরআন পাকের দশটি আয়াতে সুদের বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে।

সুদের পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করার পূর্বে সূরা আলে-ইমরান, সূরা নিসা এবং সূরা রূমে উল্লিখিত অবশিষ্ট আয়াতসমূহের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যাও এ স্থলে করে দেওয়া সমীচীন মনে হয়। তাতে সবগুলো আয়াতই একত্র হওয়ার ফলে সুদের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে।

সূরা আলে-ইমরানের ১৩শ রুকূর ১৩০তম আয়াতটি এই ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٠

অর্থাৎ—"হে ঈমানদারগণ, তোমরা সুদ খেয়ো না দ্বিগুণ, চতুর্গুণ এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সফল হবে।"

এ আয়াত অবতরণের একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে। জাহিলিয়ত আমলের আরবে সুদ গ্রহণের সাধারণ রীতি ছিল এই যে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সুদের উপর বাকি দেওয়া হতো। মেয়াদ এসে গেলে দেনাদার যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে তাকে আরও সময় দেওয়া হতো। এমনিভাবে দ্বিতীয় মেয়াদেও যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হতো। সাধারণ তফসীর গ্রন্থসমূহে এবং বিশেষভাবে 'লুবাবুন্নুকূল' গ্রন্থে মুজাহিদের রেওয়ায়েতক্রমে এ বিবরণ উল্লিখিত আছে।

জাহিলিয়ত যুগের সে সর্বনাশা প্রথা বিলোপ করার জন্যই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ কারণেই আয়াতে اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً—(অর্থাৎ কয়েকগুণ অতিরিক্ত) বলে তাদের প্রচলিত পদ্ধতির নিন্দা এবং অপরের চরম সর্বনাশ সাধন করে স্বার্থ উদ্ধার করার ঘৃণ্য মানসিকতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে একে হারাম করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, কয়েকগুণ অতিরিক্ত না হলে সুদ হারাম হবে না। কেননা, সূরা বাকারা ও নিসায় যে কোন ধরনের সুদের অবৈধতা পরিষ্কার বর্ণিত হয়েছে; কয়েকগুণ বেশি হোক বা না হোক। এর দৃষ্টান্ত যেমন কোরআনের স্থানে স্থানে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا

অর্থাৎ—আমার আয়াতের বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করো না। এতে 'অল্প মূল্য' বলার কারণ এই যে, খোদায়ী আয়াতের বিনিময়ে যদি সপ্তরাজ্যও গ্রহণ করা হয়, তবে অল্প মূল্যই হবে। এর অর্থ এই নয় যে, কোরআনের আয়াতের বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করা তো হারাম,

বেশি মূল্য হারাম নয়। এমনিভাবে এ আয়াতে أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً শব্দটি তাদের লজ্জাকর পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এটি অবৈধতার শর্ত নয়।

সুদের প্রচলিত পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে একথাও বলা যায় যে, সুদের অভ্যাস গড়ে উঠলে সুদ শুধু সুদই থাকে না, বরং অপরিহার্যভাবে দ্বিগুণ চতুর্গুণ হয়ে ক্রমবর্ধিত অস্তিত্ব পেয়ে যায়। কারণ, সুদের যে অংক সুদখোরের মালের অন্তর্ভুক্ত হয়, সে অতিরিক্ত অংকটিও পুনর্বার সুদেই খাটানো হয়। ফলে সুদ কয়েকগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এ নিয়ম অব্যাহত থাকলে সুদের অংক أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً অর্থাৎ কয়েকগুণেরও কয়েকগুণ হয়ে যায়। এমনিভাবে প্রত্যেক সুদ পরিমাণে দ্বিগুণ চতুর্গুণই হয়।

সুদ সম্পর্কে সূরা নিসার দু'টি আয়াত এই ঃ

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۝ وَّأَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا .

অর্থাৎ—"ইহুদীদের এসব বড় বড় অপরাধের কারণে আমি অনেক পবিত্র বস্তু—যা তাদের জন্য হালাল ছিল—তাদের উপর হারাম করে দিয়েছি এবং তা এ কারণে যে, তারা অনেক মানুষের সুপথ প্রাপ্তির পথে অন্তরায় হয়ে যেত এবং তা এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করতো। অথচ তাদেরকে সুদ গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতো। আমি তাদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরি করে রেখেছি।"

এ দু'আয়াত থেকে জানা গেল যে, মূসা (আ)-এর শরীয়তেও সুদ হারাম ছিল। ইহুদীরা যখন এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন দুনিয়াতেও তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয় অর্থাৎ তারা জাগতিক লালসার বশবর্তী হয়ে হারাম খেতে শুরু করলে আল্লাহ্ তা'আলা কতক পবিত্র বস্তুও তাদের জন্য হারাম করে দেন।

সূরা রূমের ৪র্থ রুকূর ৩৯তম আয়াতে আছে ঃ

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ .

অর্থাৎ—"যে বস্তু তোমরা মানুষের ধন-সম্পদে পৌছে বেড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দাও, তা আল্লাহ্র কাছে বাড়ে না এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় যাকাত দিলে যাকাত প্রদানকারী আল্লাহ্র কাছে তা বাড়িয়ে নেয়।"

কোন কোন তফসীরকার 'রিবা' শব্দ এবং বেড়ে যাওয়ার অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ আয়াতকে সুদের অর্থে ধরে নিয়েছেন। তাঁরা এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ সুদ গ্রহণে যদিও বাহ্যত ধন-সম্পদের বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা বৃদ্ধি নয়। উদাহরণত কারও দেহ ফুলে গেলে বাহ্যত তা দেহের বৃদ্ধি বলে মনে হলেও কোন বুদ্ধিমানই একে পুষ্টি ও বৃদ্ধি মনে করে আনন্দিত হয় না। বরং একে ধ্বংসের পূর্বাভাসই মনে করে। এর বিপরীতে যাকাত ও সদকা দেওয়ার মধ্যে যদিও বাহ্যত ধন-সম্পদ হ্রাস পায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হ্রাস

নয়, বরং ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধির কারণ। উদাহরণত কেউ কেউ পেটের দূষিত বস্তু বের করার জন্য জোলাপ ব্যবহার করে কিংবা শিঙ্গা লাগিয়ে দূষিত রক্ত বের করে নেয়। তার ফলে বাহ্যত সে ব্যক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দেহে ভারশক্তির অভাব অনুভূত হয়। কিন্তু অভিজ্ঞজনের দৃষ্টিতে এ অভাব তার বল ও শক্তিরই অগ্রদূত।

কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতকে সুদ নিষেধাজ্ঞার অর্থে ধরেন নি। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় ধন-সম্পদ অপরকে আন্তরিকতা ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নয়, বরং প্রতিদানে আরও বেশি পাওয়ার নিয়তে দেয়, তা বাহ্যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেও আল্লাহ্র কাছে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। উদাহরণত অনেক সমাজে বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিতদের পক্ষ থেকে বর-কনেকে টাকা-পয়সা ও আসবাবপত্র দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। এগুলো উপঢৌকন হিসাবে নয়, বরং প্রতিদান গ্রহণের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়। এ দান যেহেতু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং নিজ স্বার্থে হয়ে থাকে, তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এভাবে ধন-সম্পদ বাহ্যত ক্রমবর্ধমান হতে থাকলেও আল্লাহ্র কাছে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। হ্যাঁ, আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য যে সব যাকাত ও সদকা দেওয়া হয়, তাতে বাহ্যত ধন-সম্পদ হ্রাস পেলেও আল্লাহ্র কাছে তা দ্বিগুণ-চতুর্গুণ হয়ে যায়।

এ তফসীর অনুযায়ী উল্লিখিত আয়াতের বিষয়বস্তু—وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ হয়ে যায়। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ আপনি প্রতিদানে অধিক ধন-সম্পদ অর্জন করার নিয়তে কারও প্রতি অনুগ্রহ করবেন না।

সূরা রূমের আলোচ্য আয়াতে বাহ্যত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য মনে হয়। প্রথম কারণ এই যে, সূরা রূম মক্কায় অবতীর্ণ। অবশ্য, এতে যদিও প্রত্যেকটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া জরুরী নয়; কিন্তু অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রবল ধারণা অবশ্যই জন্মে। আয়াতটি যদি মক্কায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে একে সুদ-নিষেধাজ্ঞার অর্থে ধরে নেওয়া যায় না। কেননা, সুদের নিষেধাজ্ঞা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এ আয়াতের পূর্বে উল্লিখিত বিষয়বস্তু দ্বারাও দ্বিতীয় ব্যাখ্যার অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ- ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ-

অর্থাৎ—"আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে, এটা তাদের জন্য উত্তম।"

এ আয়াতে শর্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিয়তে ব্যয় করা হলেই আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করা সওয়াবের কাজ হবে। অতএব, এর পরবর্তী আয়াতে এ শর্তের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, প্রতিদানে বেশি পাওয়ার নিয়তে যদি কাউকে ধন-সম্পদ দেওয়া হয়, তবে তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য দেওয়া হলো না। কাজেই এর সওয়াব পাওয়া যাবে না।

মোটকথা, সুদের অবৈধতার প্রশ্নে এ আয়াতটিকে বাদ দিলেও পূর্বোল্লিখিত আরও অনেক আয়াত বর্তমান রয়েছে। তন্মধ্যে সূরা আলে-ইমরানের এক আয়াতে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ সুদের

অবৈধতা বর্ণিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট সব আয়াতে সর্বাবস্থায় সুদের অবৈধতা ব্যক্ত হয়েছে। এ বিবরণ থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সুদ দ্বিগুণ-চতুর্গুণ হোক বা চক্রবৃদ্ধি হোক কিংবা একতরফা হোক সবই হারাম এবং হারামও এমন কঠোর যে, এর বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শোনান হয়েছে।

রিবা'র আরও কিছু ব্যাখ্যা

আজকাল সুদ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে কোরআন ও সুন্নাহ্তে যখন এর অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা দৃষ্টিগোচর হয় এবং এর স্বরূপ বোঝা ও বোঝান হয়, তখন সাধারণ মন-মানস এর অবৈধতা মেনে নিতে ইতস্তত করে এবং নানা রকম বাহানা সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই আলোচনাটিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে এর প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে পৃথকভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই এখানে এ সম্পর্কিত একটা ধারাবাহিক আলোচনার সূত্রপাত করা হচ্ছে।

প্রথম ঃ কোরআন ও সুন্নাহ্তে 'রিবা'র স্বরূপ কি এবং এর প্রকার কি কি ?

দ্বিতীয় ঃ রিবার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞার রহস্য ও উপযোগিতা কি ?

তৃতীয় ঃ সুদ বা 'রিবা' যতই মন্দ হোক না কেন, এটি বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি ও বাণিজ্য নীতির প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। যদি কোরআনী নির্দেশ অনুযায়ী একে পরিত্যাগ করা হয়, তবে ব্যাংক ও বাণিজ্যনীতি কিভাবে চালু থাকবে ?

'রিবা' শব্দের ব্যাখ্যা ঃ একটি বিভ্রান্তিকর ঘটনা ও উত্তর ঃ 'রিবা' আরবী ভাষার একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি এবং কোরআন অবতরণের পূর্বে জাহিলিয়ত যুগের আরবেও এ শব্দটি প্রচলিত ছিল। শুধু প্রচলিতই নয়, বরং রিবার লেনদেনও তখনকার সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। সুতরাং সূরা নিসার আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, 'রিবা' শব্দ এবং এর লেনদেন তওরাতের আমলেও সুবিদিত ছিল এবং তওরাতেও একে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

যে শব্দ প্রাচীনকাল থেকেই আরবে ও নিকটবর্তী দেশসমূহে সুবিদিত রয়েছে, যার লেনদেনেরও প্রচলন রয়েছে এবং যার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করার সাথে কোরআন পাক বলে যে, মূসা (আ)-এর উম্মতের জন্যও সুদ বা 'রিবা' হারাম করা হয়েছিল, তখন এটা জানা কথা যে, সেই শব্দের স্বরূপ এমন ধরনের কোন অস্পষ্ট বিষয় হতে পারে না যে, তাকে বুঝতে গিয়ে অহেতুক জটিলতা দেখা দেবে।

এ কারণেই অষ্টম হিজরীতে যখন সুদ বা 'রিবা'র অবৈধতা সম্পর্কে সূরা বাকারার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়, তখন কোথাও বর্ণিত হয়নি যে, সাহাবায়ে-কিরাম 'রিবা' শব্দের স্বরূপ বোঝার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দিগ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং মহানবী (সা)-এর কাছ থেকে অন্যান্য ব্যাপারের মত রিবার স্বরূপ সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। বরং দেখা গেছে যে, মদ্যপানের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে যেমন সাহাবায়ে কিরাম তা বাস্তবায়নে তৎপর হয়েছিলেন, তেমনি রিবার অবৈধতার বিধান নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই তাঁরা রিবার যাবতীয় লেনদেনও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অতীতকালের কাজ-কারবারে মুসলমানদের যেসব সুদ অ-মুসলমানদের কাছে প্রাপ্য ছিল, মুসলমানরা তাও ছেড়ে দেন। অ-মুসলমানদের যেসব মুসলমানদের কাছে সুদ প্রাপ্য ছিল, নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানরা তা পরিশোধে

অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এ মাস'আলা মক্কার প্রশাসকের আদালতে উপস্থিত হলে তিনি মহানবী (সা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। এর ফয়সালা সূরা বাকারার সংশ্লিষ্ট আয়াতে আল্লাহ্র তরফ থেকেই অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ অতীতকালের বকেয়া সুদের লেন-দেনও অবৈধ বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়।

এতে অ-মুসলমানদের পক্ষ থেকে এরূপ অভিযোগ উত্থাপনের অবকাশ ছিল যে, ইসলামী শরীয়তের একটি নির্দেশের কারণে তাদের এত বিপুল পরিমাণ অর্থ কেন মারা যাবে ? এ অভিযোগ নিরসনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, এ নির্দেশের আওতাধীন শুধু অ-মুসলমানরাই নয়—মুসলমানরাও। উভয়ের ক্ষেত্রেই এ নির্দেশ সমভাবে প্রযোজ্য। সেমতে সর্বপ্রথম মহানবী (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর বিরাট অংকের সুদ ছেড়ে দেওয়া হয়।

মোটকথা, রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার সময় 'রিবা' শব্দের ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা ছিল না—সকলের কাছেই তার প্রকৃত অর্থ সুবিদিত ছিল। আরবরা যাকে রিবা বলতো এবং যার লেন-দেন করতো, কোরআন তাকেই হারাম করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ বিধানকে শুধু নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই নয় —দেশের আইন হিসাবেও জারি করেন। তবে এমন কতকগুলো প্রকারকেও তিনি রিবার অন্তর্ভুক্ত করে দেন, যেগুলোকে সাধারণভাবে রিবা মনে করা হতো না। এসব প্রকার নির্ধারণের ব্যাপারেই হযরত ফারূকে-আযম (রা)-এর মনে খটকা দেখা দিয়েছিল এবং এগুলোর ব্যাপারেই মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেছেন। নতুবা আররবা যাকে রিবা বলতো, সেই আসল রিবা সম্পর্কে কারও কোন সন্দেহ ছিল না এবং কেউ এ নিয়ে কোন মতভেদও ব্যক্ত করেন নি।

এবার আরবে প্রচলিত 'রিবা' সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। তফসীরবিদ ইবনে জারীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন ঃ জাহিলিয়ত আমলে প্রচলিত ও কোরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা' হলো কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা। আরবরা তাই করতো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সুদ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হতো। হযরত কাতাদাহ্ এবং অন্যান্য তফসীরবিদ থেকেও এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। —(তফসীরে ইবনে-জারীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬২)

স্পেনের খ্যাতনামা তফসীরবিদ আবু হাইয়ান গারনাতী রচিত 'তফসীরে-বাহ্রে মুহীত-এ'ও জাহিলিয়ত আমলে প্রচলিত রিবার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি এরূপই বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ তারা অর্থ লগ্নি করে মুনাফা গ্রহণ করতো এবং ঋণের মেয়াদ যতই বেড়ে যেতো, ততই সুদ বাড়িয়ে দেওয়া হতো। এরাই বলতো যে, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মুনাফা নেওয়া যেমন জায়েয, তেমনি অর্থ ঋণ দিয়ে মুনাফা নেওয়াও তদ্রূপ জায়েয হওয়া উচিত। কোরআন পাক একে হারাম করেছে এবং ক্রয়-বিক্রয় ও রিবার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছে।

এ বিষয়বস্তুই তফসীর ইবনে কাসীর, তফসীরে কবীর ও রূহুল-মা'আনী প্রভৃতি বিশিষ্ট তফসীর গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের মাধ্যমে বর্ণিত রয়েছে।

ইবনে-আরাবী আহকামুল-কোরআনে বলেছেন ঃ

الرّبا فى اللغة الزّيادة و المراد به فى الاية كل زيادة لايقابلها عوض-(ص ١٠١ ج ٢)-

—অর্থাৎ অভিধানে 'রিবা' শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। আয়াতে রিবা বলতে প্রত্যেক এমন অতিরিক্ত পরিমাণকে বোঝান হয়েছে যার বিপরীতে কোন বিনিময় নেই। —(আহ্কামুল-কোরআন ঃ ২য় খণ্ড, ১০১ পৃঃ)

ইমাম রাযী স্বীয় তফসীরে বলেন ঃ 'রিবা' দু'রকম—ক্রয়-বিক্রয়ের রিবা ও ঋণের রিবা। জাহিলিয়ত যুগের আরবে দ্বিতীয় প্রকার রিবাই প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল। তারা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কাউকে অর্থ প্রদান করতো এবং প্রতি মাসে তার মুনাফা আদায় করতো। নির্দিষ্ট মেয়াদে আদায় না হলে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে মেয়াদও বাড়িয়ে দিত। জাহিলিয়ত যুগের সেই রিবাই কোরআন হারাম করেছে।

ইমাম জাস্সাস 'আহকামুল-কোরআন'-এ রিবার অর্থ বর্ণনা করে বলেন ঃ

هو القرض المشروط فيه الاجل وزيادة مال على المستقرض-

অর্থাৎ—এ এমন ঋণ, যা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এ শর্তে দেওয়া হয় যে, খাতক তাকে মূলধন থেকে কিছু বেশি পরিমাণ অর্থ দেবে।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) রিবার সংজ্ঞা বর্ণনা করে বলেন ঃ كل قرض جر نفعا فهو ربا
অর্থাৎ—যে ঋণ কোন মুনাফা টানে, তা-ই রিবা। —(জামে' সগীর)

মোটকথা, কাউকে ঋণ দিয়ে তার মাধ্যমে মুনাফা গ্রহণ করাই সুদ বা রিবা। জাহিলিয়ত আমলে তা-ই প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল। কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াত একে সুস্পষ্টভাবে হারাম করেছে। এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে-কিরাম এ কারবার পরিত্যাগ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) আইনগত বিধি-বিধানে একে প্রয়োগ করেন। এতে কোনরূপ অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থতা ছিল না এবং এ ব্যাপারে কেউ সন্দিগ্ধতারও সম্মুখীন হয়নি।

তবে নবী করীম (সা) কয়েক রকম ক্রয়-বিক্রয়কেও রিবার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আরবরা এগুলোকে রিবা মনে করতো না। উদাহরণত তিনি ছয়টি বস্তু সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এগুলো অদল-বদল করতে হলে সমান সমান এবং হাতে হওয়া দরকার। কম-বেশি কিংবা বাকি হলে তাও রিবা হবে। এ ছয়টি বস্তু হচ্ছে সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর ও আঙ্গুর।

আরবে কাজ-কারবারের কয়েকটি প্রকার 'মুযাবানা' ও 'মুহাকালা'[১] নামে প্রচলিত ছিল। সুদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এগুলোকেও সুদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। —(ইবনে-কাসীর)

এতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, বিশেষ করে উপরোক্ত ছয়টি বস্তুর মধ্যেই সুদ সীমাবদ্ধ, না এগুলো ছাড়া আরও কিছু বস্তু এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে ? হযরত ফারূকে আযম (রা) এ সব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েই নিম্নোক্ত উক্তি করেছিলেন ঃ

ان اٰية الربٰوا من اٰخر مانزل من القراٰن وان النبى صلى الله عليه وسلم قبض قبل ان يبينه لنا فدعوا الربٰوا والريبة * (احكام القراٰن

১. বৃক্ষস্থিত ফলকে বৃক্ষ থেকে আহরিত ফলের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাকে 'মুযাবানা' বলা হয় এবং ক্ষেতে অকর্তিত খাদ্যশস্য ; যথা—গম, বুট ইত্যাদিকে শুকনা পরিষ্কার করা খাদ্য যথা ঃ গম, বুট ইত্যাদির বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাকে 'মুহাকালা' বলা হয়। যেহেতু অনুমানে কম-বেশি হওয়ার আশংকা থাকে তাই এগুলো নিষিদ্ধ হয়েছে।

جصاص، ص ۱/ ۵۵۱ وتفسير ابن كثير بحواله ابن ماجه ص ۳۲۸ ج ۱)-

অর্থাৎ—সুদের আয়াত হচ্ছে কোরআন পাকের সর্বশেষ আয়াতসমূহের অন্যতম। এর পূর্ণ বিবরণ দান করার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাই এখন সতর্ক পদক্ষেপ জরুরী। সুদ তো অবশ্যই বর্জন করতে হবে, তদুপরি যেসব ব্যাপারে সুদের সন্দেহও হয়, সেগুলোও পরিহার করা উচিত্। —(আহ্কামুল-কোরআন, জাস্সাস, ইবনে-কাসীর)

ফারূকে আযম (রা)-এর উদ্দেশ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ঐসব প্রকারকেও রিবার অন্তর্ভুক্তিকরণ ছিল, যেগুলোকে জাহিলিয়ত যুগের আরবে সুদ মনে করা হতো না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এগুলোকে সুদের অন্তর্ভুক্ত করে হারাম করেছিলেন। আসল 'রিবা' বা সুদ যা সমগ্র আরবে সুবিদিত ছিল, সাহাবায়ে কিরাম যা ত্যাগ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সম্পর্কে আইন জারি করে বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন, সে সুদ সম্পর্কে ফারূকে আযমের মনে কোনরূপ খট্‌কা বা সন্দেহ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এরূপ চিন্তাও করা যায় না। কিন্তু সুদের যেসব প্রকার সম্পর্কে তিনি সন্দিগ্ধ ছিলেন, সেগুলোর ব্যাপারে তিনি সমাধান প্রদান করেন যে, যেসব ব্যাপারে সুদের সন্দেহ হয়, সেগুলোকেও পরিত্যাগ করতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজকাল কিছু সংখ্যক লোক, যারা পাশ্চাত্যের বাহ্যিক জাঁকজমক, ধনাঢ্যতা এবং বর্তমান বাণিজ্যনীতি ইত্যাদিতে সুদের প্রাধান্য বিস্তারের মোহে মোহগ্রস্ত, তারা ফারূকে আযমের উপরোক্ত উক্তির ব্যাখ্যা এই বের করেছে যে, রিবার অর্থই অস্পষ্ট ও অব্যক্ত ছিল। কাজেই এতে গবেষণার অবকাশ রয়েছে। তাদের এ অভিমত যে ভ্রান্ত, তার যথেষ্ট প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। 'আহ্কামুল-কোরআন'-এ ইবনে আরাবী এ শ্রেণীর লোকের কঠোর সমালোচনা করেছেন, যারা ফারূকে আযমের উপরোক্ত উক্তির ভিত্তিতে সুদের আয়াতকে অস্পষ্ট বলে অভিহিত করতে চেয়েছে। তিনি বলেন ঃ

ان من زعم ان هذه الاية مجملة فلم يفهم مقاطع الشّريعة فان اللّٰه تعالى ارسل رسوله الى قوم هو منهم بلغتهم وانُزل عليه كتابه تيسيرا منه بلسانه ولسانهم-والربا فى اللغة الرباوة والمراد به فى الاية كل زيادة لايقابلها عوض-

অর্থাৎ—যারা রিবার আয়াতকে অস্পষ্ট বলেছে, তারা শরীয়তের অকাট্য বিষয়সমূহ বুঝতে সক্ষম হয়নি। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে একটি মানবগোষ্ঠীর নিকট প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরই ভাষায় প্রেরণ করেছেন। স্বীয় গ্রন্থ সহজ করার জন্য তাদেরই ভাষায় তা অবতারণ করেছেন। তাদের ভাষায় 'রিবা' শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। আয়াতে ঐ অতিরিক্তটুকুকে বোঝানো হয়েছে, যার বিপরীতে কোন সম্পদ নেই বরং মেয়াদ আছে।

ইমাম রাযী তফসীরে কবীরে বলেন, রিবা দু'রকম ঃ (এক) বাকি বিক্রয়ের রিবা এবং (দুই) নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে বেশি নেওয়ার রিবা। প্রথম প্রকার জাহিলিয়ত যুগে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। সে যুগের লোকেরা এরূপ লেনদেন করতো। দ্বিতীয় প্রকার রিবা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অমুক অমুক বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশি করা রিবার অন্তর্ভুক্ত।

আহ্কামুল-কোরআন জাস্সাসে বলা হয়েছে ঃ রিবা দু'রকম—একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে এবং অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া। দ্বিতীয় প্রকারই ছিল জাহিলিয়ত যুগের রিবা। এর সংজ্ঞা এই

যে, যে ঋণে মেয়াদের হিসাবে কোন মুনাফা নেওয়া হয়, তা-ই রিবা। ইবনে-রুশদ 'বিদায়াতুল-মুজতাহিদ' গ্রন্থে তা-ই লিখেছেন। তিনি এ রিবার অবৈধতা কোরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমার দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

ইমাম তোয়াহাভী 'শরহে মা'আনিউল-আসার' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ কোরআনে উল্লিখিত 'রিবা' দ্বারা পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে সে রিবাকেই বোঝান হয়েছে , যা ঋণের উপর নেওয়া হতো। জাহিলিয়ত যুগেও একেই রিবা বলা হতো। এরপর রাসূল (সা)-এর বর্ণনা ও তাঁর সুন্নত থেকে অন্য প্রকার রিবার বিষয় জানা যায়, যা বিশেষ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের কম-বেশি করা কিংবা বাকি দেওয়ার পরিবর্তে নেওয়া হয়। এ রিবা হারাম হওয়া সম্পর্কেও অনেক সুপ্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু এ প্রকার রিবার বিস্তারিত বিবরণ না থাকার কারণে এতে কোন কোন সাহাবীর মনে খটকা দেখা দেয় এবং ফিকহ্‌বিদরা পরস্পরে মতভেদ করেন। (২৩২ পৃঃ, ২য় খণ্ড)

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) 'হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ্' গ্রন্থে বলেন ঃ "এক প্রকার হচ্ছে সরাসরি ও প্রকৃত সুদ এবং অন্য এক প্রকার প্রকৃত বা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ ও নির্দেশগত। সত্যিকার সুদ ঋণ দিয়ে বেশি নেওয়াকে বলা হয় এবং নির্দেশগত সুদ বলে হাদীসে বর্ণিত সুদকে বোঝান হয় অর্থাৎ কিছু সংখ্যক বিশেষ বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে বেশি নেওয়া। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لا ربا الا فى النسيئة অর্থাৎ রিবা বা সুদ শুধু বাকি দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর অর্থও তা-ই যে, সত্যিকার ও আসল সুদ, যাকে সাধারণভাবে সুদ মনে করা ও বলা হয়, তা বাকি দিয়ে মুনাফা নেওয়াকেই বলা হয়। এছাড়া যত প্রকার সুদ এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, সবগুলো নির্দেশগত সুদের অন্তর্ভুক্ত।

এ বর্ণনা থেকে কয়েকটি বিষয় ফুটে উঠেছে ঃ প্রথমত, কোরআন অবতরণের পূর্বে রিবা একটি সুপরিচিত বিষয় ছিল। ঋণের ওপর মেয়াদের হিসাব বেশি নেওয়াকে রিবা বলা হতো।

দ্বিতীয়ত, কোরআনে রিবার নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরাম তা বর্জন করেন। এর অর্থ বোঝা ও বোঝানোর ব্যাপারে কারও মনে কোনরূপ খটকা বা সন্দেহ দেখা দেয়নি।

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছয়টি বস্তু সম্পর্কে বলেছেন যে, এগুলোর পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়ের সমান হওয়া শর্ত। কম-বেশি হলে এবং বাকি দিলে রিবা হয়ে যাবে। এ ছয় বস্তু হলো সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর ও আঙুর। এ আইনের অধীনেই আরবে প্রচলিত 'মুযাবানা' ও 'মুহাকালা' ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ বক্তব্যের মাঝে বুঝবার ও চিন্তা-ভাবনার বিষয় ছিল এই যে, এ নির্দেশ বর্ণিত ছয়টি বস্তুর সাথেই সীমাবদ্ধ থাকবে, না অন্যান্য বস্তুতেও বিস্তার লাভ করবে ? যদি তাই করে, তবে তা কোন্ বিধি অনুসারে ? এ বিধির ব্যাপারে ফিকহ্‌বিদগণ চিন্তা-ভাবনা ও ইজতিহাদ করে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। যেহেতু এ বিধি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক বর্ণিত হয়নি, তাই হযরত ফারূকে আযম (রা) আফসোস করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেই এর কোন বিধি বর্ণনা করে দিলে কোনরূপ সন্দেহ বাকি থাকতো না। এরপর তিনি বলেছেন যে, যেখানে সুদের সন্দেহও হয়, সেখান থেকেও বেঁচে থাকা উচিত।

চতুর্থত, জানা গেল যে, আরবে পরিচিত সুদই ছিল আসল ও সত্যিকার 'রিবা' এবং একে ফিকহ্‌বিদগণ 'রিবাল-কোরআন' বা 'রিবাল-কর্জ' নামে অভিহিত করেছেন অর্থাৎ ঋণের উপর মেয়াদের হিসাবে মুনাফা নেওয়া। হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় প্রকার সুদ প্রথম প্রকারের সুদের সাথে যুক্ত এবং একই নির্দেশের আওতাভুক্ত। মুজতাহিদগণের মধ্যে যত মতভেদ হয়েছে, সব দ্বিতীয় প্রকার সুদের মধ্যেই হয়েছে। প্রথম প্রকার সুদ অর্থাৎ রিবাল-কোরআন যে হারাম, এ ব্যাপারে উম্মতে-মুহাম্মদীর মধ্যে কখনো কোন মতভেদ হয়নি।

আজকাল যে সুদকে প্রচলিত অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ মনে করা হয় এবং যে সুদের প্রশ্নটি এখানে আলোচনাধীন, সে সুদের অবৈধতা কোরআনের সাতটি আয়াত, চল্লিশটিরও বেশি হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

দ্বিতীয় প্রকার সুদ, যা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হয়, আজকাল এর ব্যাপক প্রচলন নেই। কাজেই এ নিয়ে আলোচনা করারও তেমন প্রয়োজন নেই।

এ পর্যন্ত কোরআন ও সুন্নাহ্‌তে সুদের স্বরূপ কি, তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সুদ সংক্রান্ত আলোচনায় এটিই ছিল প্রথম বিষয়বস্তু।

সুদ নিষিদ্ধকরণের তাৎপর্য ও উপযোগিতা ঃ এরপর দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, সুদের অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা কোন্ রহস্য ও উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল, এতে কি কি আত্মিক অথবা অর্থনৈতিক অপকারিতা রয়েছে, যে কারণে ইসলাম একে এত বড় গোনাহ্ সাব্যস্ত করেছে?

এ প্রসঙ্গে প্রথমে বুঝে নেওয়া দরকার যে, জগতের কোন সৃষ্ট বস্তু ও তার কাজ-কারবারই এমন নেই যে, যাতে কোন-না-কোন বৈশিষ্ট্য বা উপকারিতা নেই। সাপ, বিচ্ছু, বাঘ, সিংহ এমনকি সংখিয়ার মত মারাত্মক বিষের মধ্যেও মানুষের হাজারো উপকারিতা নিহিত রয়েছে।

চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ঘুষ ইত্যাদির মধ্যেও কোন-না-কোন উপকার খুঁজে বের করা কঠিন নয়। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়, যে জিনিসের মধ্যে উপকার বেশি এবং ক্ষতি কম, তাকে উপকারী ও উত্তম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে যেসব জিনিসের অনিষ্ট ও অপকারিতা বেশি এবং উপকারিতা কম, সেগুলোকে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়। কোরআন পাকও সুদ ও জুয়াকে হারাম করার সময় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এগুলোর মধ্যে গোনাহ্ ও মানুষের উপকার দুই-ই রয়েছে, কিন্তু গোনাহ্‌র পরিমাণ উপকারের তুলনায় অনেক বেশি। তাই এগুলোকে উত্তম ও উপকারী বলা যায় না, বরং ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক মনে করে এগুলো থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

'রিবা' অর্থাৎ সুদের অবস্থাও তদ্রূপ। এতে সুদখোরের সাময়িক উপকার অবশ্যই দেখা যায়। কিন্তু এর জাগতিক ও পারলৌকিক মন্দ পরিণাম এ উপকারের তুলনায় অত্যন্ত জঘন্য।

প্রত্যেক বস্তুর উপকার-অপকার ও লাভ-ক্ষতি তুলনা করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাছে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় হয়ে থাকে যে, যদি কোন বস্তুর উপকার অস্থায়ী ও সাময়িক হয় এবং অপকার দীর্ঘস্থায়ী কিংবা চিরস্থায়ী হয়, তবে একে কোন বুদ্ধিমান উপকারী বস্তুসমূহের তালিকায় গণ্য করতে পারে না। এমনিভাবে যদি কোন বস্তুর উপকার ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয় এবং ক্ষতি সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপে, তবে একেও কোন সচেতন মানুষ উপকারী বলতে পারে না। চুরি ও ডাকাতিতে চোর ও ডাকাতের উপকার অনস্বীকার্য। কিন্তু তা সমগ্র জাতির জন্য

ক্ষতিকর এবং তাদের শান্তি ও স্বস্তি বিনষ্টকারী। তাই কোন মানুষই চুরি-ডাকাতিকে ভাল বলে না।

এ ভূমিকার পর সুদের প্রতি লক্ষ্য করুন। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, এতে সুদখোরের সাময়িক ও অস্থায়ী উপকারের তুলনায় তার আত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি এত তীব্র যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি মানবতার গণ্ডির ভিতরে থাকতে পারে না। তার সাময়িক উপকারটিও শুধু তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত উপকার। কিন্তু এর ফলে গোটা জাতিকে বিরাট ক্ষতি ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার শিকারে পরিণত হতে হয়। কিন্তু জগতের অবস্থা বিচিত্র বটে। এখানে কোন বস্তু একবার প্রচলিত হয়ে গেলে তার যাবতীয় অনিষ্টকারিতা যেন দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যায় এবং শুধু তার উপকারিতাই লক্ষ্যপথে থেকে যায়—তা যতই নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন। এর ক্ষতি ও অনিষ্টের প্রতি অধিকাংশ লোকই দৃষ্টিপাত করে না,—যদিও তা অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক হয়।

প্রথা ও প্রচলন মানব মনের জন্য একটি সূক্ষ্ম বিষক্রিয়া, যা মানুষকে অচেতন করে দেয়। অনেক কম ব্যক্তিই প্রথা ও প্রচলন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে একথা বুঝতে চেষ্টা করে যে, এতে উপকার কতটুকু আর ক্ষতিই বা কতটুকু? বরং কারও সতর্ক করার দরুন যদি ক্ষতিগুলো কারও দৃষ্টিতে ধরাও পড়ে, তবুও প্রথা ও প্রচলনের অনুবর্তিতা তাকে সঠিক পথে আসতে দেয় না।

বর্তমান যুগে সুদ মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সমগ্র বিশ্ব এর রাহুগ্রাসে পতিত। এটি মানব স্বভাবের রুচিকে বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে মানুষ তিক্তকে মিষ্ট মনে করতে শুরু করেছে এবং যে বিষয়টি সমগ্র মানবতার জন্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ, তাকেই তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ভাবতে শুরু করেছে। আজ কোন চিন্তাবিদ এর বিপক্ষে আওয়াজ তুললে তাকে অপরিণামদর্শী অবাস্তব চিন্তাধারার লোক বলেই অভিহিত করা হয়।

কিন্তু যে চিকিৎসক কোন দেশে ব্যাপকাকারে মহামারী ছড়িয়ে পড়তে এবং চিকিৎসা ব্যর্থ হতে দেখে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, এ রোগ রোগই নয়; বরং সুস্থতা ও সাক্ষাৎ আরাম, সে প্রকৃত অর্থে চিকিৎসকই নয়; বরং মানবতার সাক্ষাৎ শত্রু। পারদর্শী চিকিৎসকের কাজ এ সময়েও এ ছাড়া অন্য কিছুই নয় যে, সে মানুষকে এ রোগ ও তার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং প্রতিকারের পন্থা বলতে থাকবে।

আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম মানব চরিত্র সংশোধনের দায়িত্ব নিয়ে আগমন করেছেন। তাঁদের কথা কেউ শুনবে কি না—তাঁরা এর পরওয়া করেননি। তাঁরা যদি মানুষের শোনার ও মান্য করার অপেক্ষা করতেন, তবে সারা বিশ্ব কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ থাকতো। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রচারকার্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন, তখন কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র মান্যকারী কে ছিল?

সুদকে যদিও বর্তমান অর্থনীতির মেরুদণ্ড মনে করা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব সত্য আজও কোন কোন পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিত স্বীকার করছেন। তাঁদের মতে সুদ অর্থনীতির মেরুদণ্ড নয়; বরং মেরুদণ্ডে সৃষ্ট এমন একটা দুষ্ট ক্ষত, যা অহরহ তাকে খেয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজকালকার অনেক বিচক্ষণ লোকও কোন সময় প্রথা ও প্রচলনের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে এদিকে লক্ষ্য করেন না যে, সুদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

কি ? দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাও এসব বিচক্ষণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করে না যে, সুদের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষ এবং গোটা জাতি দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার শিকার হয়ে যায়। দরিদ্র আরও দরিদ্র হতে থাকে এবং গুটিকতক পুঁজিপতি জাতির অর্থ দ্বারা উপকৃত হয়ে বরং বলা উচিত যে, জাতির রক্ত শোষণ করে স্ফীত হতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, যখন এসব বুদ্ধিজীবীর সামনে এ সত্যটি তুলে ধরা হয়, তখন তারা একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য আমাদেরকে পাশ্চাত্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুদের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করতে উপদেশ দেন এবং দেখাতে চান যে, তারা সুদভিত্তিক অর্থনীতির কল্যাণেই এমন সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। কিন্তু এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন নরখাদক সম্প্রদায় তাদের এ অভ্যাসের উপকারিতা দেখানোর জন্য আপনাকে নরখাদকদের মহল্লায় নিয়ে গেল এবং দেখাল যে, এরা কেমন মোটা-তাজা, সবল ও সুস্থ। এরপর সে প্রমাণ করে যে, এদের অভ্যাস-আচরণই অনুসরণীয় ও উত্তম আচরণ।

কিন্তু কোন সমঝদার লোকের সাথে এ ব্যক্তির মোকাবিলা হলে সে বলবে ঃ তুমি এ নরখাদকদের ক্রিয়াকর্মের বরকত এদের মহল্লায় নয়—অন্য মহল্লায় গিয়ে দেখ। সেখানে দেখবে, শত শত, হাজার হাজার নরকংকাল পড়ে রয়েছে। এদের রক্ত ও মাংস খেয়ে খেয়ে এ হিংস্ররা লালিত-পালিত হয়েছে। ইসলাম ও ইসলামী শরীয়ত কখনও এরূপ কার্যকে উপকারী বলে মেনে নিতে পারে না, যার ফলে সমগ্র মানব সমাজ বিপর্যয়ের শিকার হয় এবং কিছুসংখ্যক লোক ও তাদের তল্পীবাহকরা সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকে।

সুদের অর্থনৈতিক অনিষ্টকারিতা ঃ সুদের ফলে গুটিকতেক লোকের উপকার এবং সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয় —এ ছাড়া সুদের মধ্যে যদি অন্য কোন দোষ নাও থাকতো তবে এ দোষটিই সুদ নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। অথচ এতে এ ছাড়া আরও অর্থনৈতিক অনিষ্ট এবং আত্মিক বিপর্যয় বিদ্যমান রয়েছে।

সুদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির বিপর্যয় ঘটিয়ে বিশেষ একটি শ্রেণীর উপকার কিভাবে হয়, প্রথমে তাই দেখা যাক। সুদের মহাজনী ও অধুনালুপ্ত পদ্ধতি এমন বিশ্রী ছিল যে, বৃহত্তম মানব সমাজের ক্ষতি ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের উপকারের বিষয়টি যে কোন স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও বোঝা কঠিন ছিল না। কিন্তু আজকালকার নতুন প্রেক্ষাপটে যেভাবে মদকে মেশিনে পরিশোধিত করে, ডাকাতির নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে এবং ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার নতুন নতুন কৌশল বের করে এ সবগুলোকেই সভ্যতার খোলস পরিয়ে দিয়েছে—যাতে এদের অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিগোচর না হয়, তেমনিভাবে সুদের জন্য ব্যক্তিগত গদির পরিবর্তে যৌথ কোম্পানী গঠন করেছে—যাকে ব্যাংক বলা হয়। এখন জগদ্বাসীর চোখে ধূলি দেওয়ার জন্য বলা হয় যে, সুদের এ আধুনিক পদ্ধতি দ্বারা সমগ্র জাতির উপকার হয়। কেননা, যে জনগণ নিজ টাকা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে জানে না কিংবা স্বল্প পুঁজির কারণে করতে পারে না, তাদের সবার টাকা-পয়সা ব্যাংকে জমা হয়ে প্রত্যেকেই অল্প হলেও কিছু না কিছু মুনাফা পেয়ে যায়। বড় বড় ব্যবসায়ীরাও ব্যাংক থেকে সুদের উপর ঋণ নিয়ে বড় ব্যবসা করে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। এভাবে সুদ বর্তমানে একটি কল্যাণকর বস্তুতে পরিণত হয়েছে এবং গোটা জাতি এর দ্বারা উপকার পাচ্ছে।

কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে এটি একটি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। মদের দুর্গন্ধময় দোকানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেলে এবং পতিতাবৃত্তির আড্ডাগুলোকে সিনেমা ও নৈশ ক্লাবে রূপান্তরিত করে, বিষকে প্রতিষেধক এবং ক্ষতিকরকে উপকারীরূপে দেখাবার প্রয়াসে এ প্রতারণাকে কাজে লাগানো হয়েছে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের সামনে যেমন একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, চরিত্রবিধ্বংসী অপরাধসমূহকে আধুনিক পোশাক পরিয়ে দেওয়ার ফলে যেমন এসব অপরাধের ব্যাপকতা পূর্বের চাইতে বেড়েই গেছে, তেমনি সুদখোরীর এ নতুন পদ্ধতি — শতকরা কয়েক টাকা সুদ জনগণের পকেটে পুরে দিয়ে একদিকে তাদেরকে এ জঘন্য অপরাধে শরীক করেছে এবং অপরদিকে নিজেদের জন্য এ অপরাধের অসীম ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিয়েছে।

কে না জানে যে, জনগণ সেভিংস ব্যাংক ও পোস্ট অফিস থেকে যে শতকরা কয়েক টাকা সুদ পায়, তদ্দারা কিছুতেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না। তাই তারা ভরণ-পোষণের জন্য কোন মজুরি কিংবা চাকুরী খুঁজতে বাধ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে প্রথমত তাদের দৃষ্টি যায় না। যদি কেউ এদিকে মনোনিবেশও করে তবে গোটা জাতির পুঁজি ব্যাংকে জমা হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য যে আকার ধারণ করেছে, তাতে কোন স্বল্প পুঁজির অধিকারীর পক্ষে ব্যবসায়ে প্রবেশ করা স্বপ্ন-বিলাসের পর্যায়েই থেকে যায়। কেননা, যে ব্যবসায়ীর বাজারে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে এবং বড় কারবার আছে, ব্যাংক তাকেই বড় পুঁজি ঋণ দিতে পারে। দশ লক্ষের মালিক এক কোটি ঋণ পেতে পারে। সে তার ব্যক্তিগত টাকার তুলনায় দশগুণ বেশি টাকার ব্যবসা চালাতে পারে। পক্ষান্তরে স্বল্প পুঁজির অধিকারী ব্যক্তির কোন প্রভাব-প্রতিপত্তিই থাকে না এবং ব্যাংকও তাকে বিশ্বাস করে না যে, পুঁজির দশগুণ বেশি দিয়ে দেবে। এক লাখ দূরের কথা, তার এক হাজার পাওয়াই কঠিন। মনে করুন, কেউ এক লাখ টাকা ব্যাংকের পুঁজি খাটিয়ে দশ লাখ টাকার ব্যবসা করে। যদি তার শতকরা এক টাকা মুনাফা হয়, তবে তার নিজস্ব এক লাখ টাকায় যেন শতকরা দশ টাকা মুনাফা হলো। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি শুধু ব্যক্তিগত টাকা দ্বারা এক লাখ টাকার ব্যবসা করে, তবে এক লাখের মুনাফা শতকরা এক টাকাই হবে। এ মুনাফা তার প্রয়োজনীয় খরচাদির জন্যও হয়ত যথেষ্ট নয়। এদিকে বাজারে বড় পুঁজিপতি যে দর ও রেয়াতসহ কাঁচামাল পায়, ছোট পুঁজিপতি তা পায় না। ফলে স্বল্প পুঁজিওয়ালা পঙ্গু ও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। যদি তার কপাল মন্দ হয় এবং সেও কোন বড় ব্যবসায়ে প্রবেশ করে, তবে বৃহৎ পুঁজিপতিরা তাকে অনধিকার প্রবেশকারী মনে করে নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও বাজার এমন পর্যায়ে নিয়ে আসে যে, ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা আসল ও মুনাফা উভয়ই খুইয়ে বসে। ফলে বৃহৎ পুঁজিপতিদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

জাতির প্রতি এটা কত বড় অবিচার যে, গোটা জাতি প্রকৃত ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধু বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকবে! তারা বখ্শিশ হিসেবে যতটুকু ইচ্ছা তাদেরকে মুনাফা দেবে।

এর চাইতেও বড় দ্বিতীয় আর একটি ক্ষতির কবলে সারাদেশ পতিত হয়ে আছে। তা এই যে, উপরোক্ত অবস্থায় বৃহৎ পুঁজিপতিরাই দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের অধিকারী হয়ে যায়। তারা উচ্চতর মূল্যে বিক্রয় করে স্বীয় গাঁট মজবুত করে নেয় এবং জাতির গাঁট খালি করে দেয়। তারা মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য যখন ইচ্ছা মাল বিক্রি বন্ধ করে দেয়। যদি গোটা জাতির পুঁজি ব্যাংকের মাধ্যমে টেনে এসব স্বার্থপরদের লালন-পালন না করা হতো এবং সবাই ব্যক্তিগত

পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করতে বাধ্য হতো, তবে ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা এ বিপদের সম্মুখীন হতো না এবং এসব স্বার্থপর হিংস্ররাও গোটা ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্ণধার হয়ে বসতে পারতো না। ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের ব্যবসায়ের মুনাফা জমকালো হলে অন্যরাও সাহস করত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপক হয়ে যেত। এতে করে প্রত্যেকের পক্ষেই কিছু কিছু লোক নিয়োগ করার সুযোগ হতো। এতে অনেক বেকার সমস্যারও সমাধান হতো এবং বাণিজ্যিক মুনাফাও ব্যাপক হয়ে পড়ত। এছাড়া দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতেও এর নিশ্চিত প্রভাব পড়ত। কেননা, পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই ব্যবসায়ীরা কম মুনাফা অর্জনে সম্মত হয়। এ প্রতারণামূলক কর্মপদ্ধতি গোটা জাতিকে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত করে দিয়েছে এবং তাদের চিন্তাধারাকেও বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে তারা এ রোগকেই সুস্থতা মনে করে বসেছে।

ব্যাংকের সুদ দ্বারা জাতির তৃতীয় অর্থনৈতিক ক্ষতিও লক্ষণীয়। যার পুঁজি দশ হাজার এবং সে ব্যাংক থেকে সুদের উপর কর্জ নিয়ে এক লাখের ব্যবসা করে, যদি কোথাও তার পুঁজি ডুবে যায় এবং ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সে দেউলিয়া হয়ে যায়, তবে চিন্তা করুন, ক্ষতির শতকরা দশ ভাগ তার নিজস্ব এবং অবশিষ্ট শতকরা নব্বই ভাগই গোটা জাতির হয়েছে, যাদের পুঁজি ব্যাংক থেকে নিয়ে সে ব্যবসা করেছিল। যদি ব্যাংক নিজেই দেউলিয়ার ক্ষতি বহন করে, তবে ব্যাংক তো জাতিরই পকেট। পরিণামে এ ক্ষতি জাতিরই হবে। এর সারমর্ম হলো এই যে, যতক্ষণ মুনাফা হচ্ছিল, ততক্ষণ সে একা ছিল মুনাফার মালিক, তাতে জাতির কোন অংশ ছিল না এবং যেই ক্ষতি হলো, তখন শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষতি জাতির ঘাড়ে চেপে বসলো।

সুদের আরও একটি অর্থনৈতিক ক্ষতি এই যে, সুদখোর যখন অবক্ষয়ে পড়ে, তখন তার পুনরায় মাথা তোলার যোগ্যতা থাকে না। কেননা, ক্ষতি বরদাশত করার মত পুঁজি যে তার ছিলই না। ক্ষতির সময় তার উপর দ্বিগুণ বিপদ চাপে। একে তো নিজের মুনাফা ও পুঁজি গেল, তদুপরি ব্যাংকের ঋণও চেপে বসল। এ ঋণ পরিশোধের কোন উপায় তার কাছে নেই। সুদহীন ব্যবসায়ে যদি কোন সময় সমগ্র পুঁজিও বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে এর দ্বারা মানুষ ফকীর হয় না—ঋণী হয়।

১৯৫৪ সালে প্যাকিস্তানে তুলা ব্যবসায়ে কোরআনের ভাষায় 'মুহাক' তথা অবক্ষয়ের বিপদ দেখা দেয়। সরকার কোটি কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করে ব্যবসায়ীদেরকে সামাল দেন। কিন্তু কেউ এ ব্যাপারে চিন্তা করেনি যে, এটা ছিল সুদের অশুভ পরিণতি। তুলা ব্যবসায়ীরা এ কারবারের অধিকাংশ পুঁজি ব্যাংকের ঋণ থেকে বিনিয়োগ করেছিল। নিজস্ব পুঁজি ছিল নামেমাত্র। আল্লাহর মর্জিতে তুলার বাজারে এমন মন্দা দেখা দেয় যে, দর ১২৫ থেকে ১০ টাকায় নেমে আসে। ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের ঋণ পূর্ণ করার জন্য টাকা ফেরত দেওয়ারও যোগ্য ছিল না। তারা বাধ্য হয়ে তুলার বাজার বন্ধ করে দিল। সরকার ১০ এর পরিবর্তে ৯০ টাকা দরে মাল কিনে নিল এবং কোটি কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার করে ব্যবসায়ীদেরকে দেউলিয়াত্বের কবল থেকে উদ্ধার করে নিল। সরকারের টাকা কার ছিল ? দরিদ্র জনগণেরই। মোটকথা, ব্যাংকসমূহের কারবারের পরিষ্কার ফল এই যে, জনগণের পুঁজি দ্বারা গুটিকতেক লোক মুনাফা উপার্জন করে এবং ক্ষতি হয়ে গেলে তা জনগণের ঘাড়েই চাপে।

আত্মসেবা ও জাতি হত্যার আরও একটি অপকৌশল

সুদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির সর্বনাশ সাধন করে কতিপয় ব্যক্তির আত্মসেবার সংক্ষিপ্ত চিত্র পেশ করা হলো। এর সাথে আরও একটি প্রতারণা লক্ষণীয়। সুদখোররা যখন অভিজ্ঞতা দ্বারা

বুঝতে পারল যে, কোরআনের উক্তি يمحق الله الربو অক্ষরে অক্ষরে সত্য অর্থাৎ মালের অবক্ষয় আসা অবশ্যম্ভাবী, যার ফলে দেউলিয়া হতে হয়, তখন এসব অবক্ষয়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা দু'টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললো। একটি বীমা, অপরটি 'স্টক-এক্সচেঞ্জ'। কেননা, ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ার দু'টি কারণ হতে পারে। একটি দৈব-দুর্বিপাক যথা, জাহাজ ডুবে যাওয়া , অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি এবং অপরটি পণ্যদ্রব্যের দাম ক্রয়-মূল্যের নিচে নেমে আসা। বিনিয়োগকৃত পুঁজি যেহেতু নিজস্ব নয়—জাতির যৌথ সম্পদ, তাই উভয় অবস্থাতে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি কম এবং জাতির বেশি হয়। কিন্তু তারা এ অল্প ক্ষতির বোঝাও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য একদিকে বীমা কোম্পানী খুলেছে যাতে ব্যাংকের মত সমগ্র জাতির পুঁজি নিয়োজিত থাকে। দৈব-দুর্বিপাকে সুদখোরদের ক্ষতি হয়ে গেলে, বীমার মাধ্যমে সমগ্র জাতির যৌথ পুঁজি থেকে তাকে উদ্ধার করে নেওয়া হয়।

জনগণ মনে করে, বীমা কোম্পানীগুলো আল্লাহ্‌র রহমত, ডুবন্ত ব্যক্তির আশ্রয়স্থল। কিন্তু এদের স্বরূপ দেখলে ও বুঝলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এখানেও প্রতারণা ছাড়া কিছুই নেই। আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় সাহায্যের লোভ দেখিয়ে জাতির পুঁজি সঞ্চয় করা হয়, কিন্তু এর মোটা অংকের টাকা দ্বারা বৃহৎ ব্যবসায়ীরাই উপকৃত হয়। তারা মাঝে-মাঝে নিজেই স্বীয় ক্ষয়প্রাপ্ত মোটরে অগ্নিসংযোগ করে কিংবা কোন কিছুর সাথে ধাক্কা লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয় এবং বীমা কোম্পানী থেকে টাকা আদায় করে নতুন মোটর ক্রয় করে। শতকরা দু'-একজন গরীব হয়তো আকস্মিক মৃত্যুর কারণে কিছু টাকা পেয়ে যায়।

অপরদিকে দর কমে যাওয়ার বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা স্টক-এক্সচেঞ্জের বাজার গরম করেছে। এ বিশেষ প্রকার জুয়া দ্বারা গোটা জাতিকে প্রভাবান্বিত করা হয়েছে, যাতে মূল্য হ্রাসের কারণে যে ক্ষতির আশংকা রয়েছে, তাও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়।

এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংকের সুদ ও বাণিজ্য গোটা মানব সমাজের দারিদ্র্য ও আর্থিক দুরবস্থার কারণ। হ্যাঁ, গুটিকতেক ধনীর ধন-সম্পদ এর দৌলতে আরও বেড়ে যায়। জাতির ধ্বংস এবং গুটিকতেক লোকের উন্নতিই এর ফলশ্রুতি। এ বিরাট অনিষ্ট সাধারণ সরকারসমূহের দৃষ্টি এড়ায়নি। এর প্রতিকারার্থে তারা বৃহৎ পুঁজিপতিদের আয়করের হার বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এমনকি, সর্বশেষ হার টাকায় সাড়ে পনের আনা করা হয়েছে, যাতে পুঁজি তাদের হাত থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আবার জাতীয় তহবিলে পৌছে যায়।

কিন্তু সবাই জানেন যে, এ আইনের ফলেই সাধারণভাবে মিল-কারখানার হিসাবে জালিয়াতি হচ্ছে এবং সরকারের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য ও হিসাবাদি গোপন করার উদ্দেশ্যে অনেক পুঁজি গুপ্তধনের আকারে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

মোটকথা, ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে কয়েক ব্যক্তির হাতে আবদ্ধ হওয়া যে দেশের অর্থনীতির জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ, এ সম্পর্কে সবাই পরিজ্ঞাত আছেন। এ কারণেই আয়করের হার বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এ কর্মপন্থাও রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। রোগের আসল কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থতাই এর বড় কারণ। কাজেই এ প্রতিকার যেন در بہ بست ودشمن اندر خانہ بود অর্থাৎ শত্রুকে ভিতরে রেখেই গৃহের দরজা এঁটে দেওয়ার মত হয়ে গেছে।

ধন-সম্পদ বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত হওয়ার কারণ শুধু সুদের ব্যবসায় এবং জাতীয় সম্পদ দ্বারা একটা বিশেষ শ্রেণীর অন্যায় মুনাফাখোরী। যতদিন পর্যন্ত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সুদের কারবার বন্ধ করা না হয় এবং নিজ নিজ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করার নীতি প্রচলিত না করা হয়, ততদিন এ রোগের প্রতিকার অসম্ভব।

একটি সন্দেহ ও তার উত্তর ঃ এ স্থানে প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, ব্যাংকের মাধ্যমে গোটা জাতির পুঁজি সঞ্চিত হয়ে কিছু-না-কিছু উপকার তো জনগণেরও হয়েছে যদিও তা খুব কম। অবশ্য এটা সত্য যে, বৃহৎ পুঁজিপতিরা এর দ্বারা বেশি উপকৃত হয়েছে। তবে হ্যাঁ, যদি ব্যাংকে সম্পদ সঞ্চিত করার রীতি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে এর ফল আগেকার যুগের মতই হবে অর্থাৎ জনগণের সম্পদ গুপ্তধন ও গুপ্তভাণ্ডারের আকারে ভূগর্ভে চলে যাবে। এতে না জনগণের উপকার হবে, না অন্য কারো।

এর উত্তর এই যে, ইসলাম সুদ হারাম করে যেমন সমগ্র জাতির সম্পদ বিশেষ বিশেষ পুঁজিপতির হাতে আবদ্ধ হওয়ার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, তেমনি পুঁজি-করের আকারে যাকাত আরোপ করে প্রত্যেক ধনীকে সম্পদ স্থাবর অবস্থায় না রেখে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত রাখতে বাধ্য করেছে। কেননা, পুঁজি-করের আকারে যাকাত আরোপিত হওয়ার কারণে যদি কোন ব্যক্তি টাকা-পয়সা অথবা সোনা-রূপা মাটির নিচে পুঁতে রাখে, তবে প্রতি বছর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত খেতে যেতে তার মূল নিঃশেষ হয়ে যাবে। কাজেই প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই পুঁজিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত করে তদ্দ্বারা নিজে উপকৃত হতে, অপরের উপকার করতে এবং মুনাফা থেকেই যাকাত আদায় করতে বাধ্য হবে।

যাকাত একদিক দিয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির নিশ্চয়তা দেয় ঃ এ থেকে আরও জানা গেল যে, যাকাত প্রদানের মধ্যে যেমন জাতির অক্ষম শ্রেণীর সাহায্য করার মত বিরাট উপকার নিহিত রয়েছে, তেমনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি চমৎকার প্রক্রিয়া। কেননা, প্রত্যেকেই যখন দেখবে যে, নগদ পুঁজি আবদ্ধ রাখার ফলে মুনাফা তো দূরের কথা, বছরান্তে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে, তখন অবশ্যই সে এ পুঁজি কোন ব্যবসায়ে নিয়োজিত করার জন্য সচেষ্ট হবে। হারাম সুদ থেকে বাঁচার জন্য ব্যবসায়ের আকার-প্রকৃতি এরূপ হবে না যে, লাখো মানুষের পুঁজি দ্বারা শুধু এক ব্যক্তিই ব্যবসা করবে, বরং প্রত্যেকেই নিজে বিনিয়োগের চিন্তা করবে। বৃহৎ পুঁজিপতিরাও যখন নিজ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করবে, তখন ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা ব্যবসা ক্ষেত্রে ঐসব অসুবিধার সম্মুখীন হবে না যা ব্যাংক থেকে সুদের টাকা নিয়ে ব্যবসা করলে দেখা দেয়। এভাবে দেশের আনাচে-কানাচে প্রত্যন্ত এলাকাতেও ব্যবসা এবং বিভিন্নমুখী বিনিয়োগ প্রচেষ্টা ছড়িয়ে পড়বে এবং এর ফলে সর্বশ্রেণীর মানুষ উপকৃত হবে।

সুদের আত্মিক ক্ষতি ঃ এ পর্যন্ত সুদের অর্থনৈতিক ধ্বংসকারিতা বর্ণিত হলো। এবার সুদের কারবার মানুষের চারিত্রিক ও আত্মিক অবস্থার উপর কিরূপ অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

১. মানবচরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ হচ্ছে আত্মত্যাগ ও দানশীলতা অর্থাৎ নিজে কষ্ট করে হলেও অপরকে সুখী করার প্রেরণা। সুদের ব্যবসায়ের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে এ প্রেরণা লোপ

পায়। সুদখোর ব্যক্তি অপরের উপকার করা তো দূরের কথা, অপরকে নিজ চেষ্টায় ও নিজ পুঁজি দ্বারা তার সমতুল্য হতে দেখলে তাও সহ্য করতে পারে না।

২. সুদখোরেরা কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার পরিবর্তে তার বিপদের সুযোগে অবৈধ মুনাফা লাভের চেষ্টায় মত্ত থাকে।

৩. সুদ খাওয়ার ফলে অর্থলালসা বেড়ে যায়। সে এতে এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, ভাল-মন্দেরও পরিচয় থাকে না এবং সুদের অশুভ পরিণামের প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে।

সুদ ছাড়া কি কোন ব্যবসা চলতে পারে না ঃ সুদের স্বরূপ এবং এর জাগতিক ও ধর্মীয় অনিষ্টকারিতা বিস্তারিতভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এখন তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হলো এই যে, অর্থনৈতিক ও আত্মিক অনিষ্টকারিতা এবং কোরআন ও সুন্নাহ্তে এ সম্পর্কিত কঠোর নিষেধাজ্ঞা জানা গেল। কিন্তু বর্তমান যুগে সুদই হচ্ছে কাজ-কারবারের প্রধান অবলম্বন। সারা বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য সুদের উপরই চলছে। এ থেকে মুক্তি লাভের উপায় কি ? বর্তমান যুগে ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক বর্জন করার অর্থ ব্যবসায়ের তল্পিতল্পা গুটানো।

এবার জওয়াব এই যে, কোন রোগ যখন ব্যাপক হয়ে মহামারীর আকার ধারণ করে, তখন তার চিকিৎসা কঠিন অবশ্যই হয় ; কিন্তু নিষ্ফল কখনো হয় না। নিষ্ঠার সাথে যে কোন সংশোধন প্রচেষ্টাই পরিণামে সফল হয়। তবে এজন্যে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং সাহসিকতা অবশ্যই প্রয়োজন। কোরআন পাকেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ—আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের কোনরূপ সংকীর্ণতায় ফেলেন নি। তাই সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য এমন কোন কার্যকর ও ফলপ্রসূ পথ অবশ্যই রয়েছে, যাতে অর্থনৈতিক ক্ষতিও নেই, অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের দ্বারও রুদ্ধ হয় না এবং সুদ থেকে মুক্তিও পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা এই যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বর্তমান পদ্ধতি দেখে বাহ্য দৃষ্টিতে মনে করা হয় যে, সুদের উপরই ব্যাংক নির্ভরশীল; সুদ ছাড়া ব্যাংক চলতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা নিশ্চিতরূপে নির্ভুল নয়। সুদ ছাড়াও ব্যাংক ব্যবস্থা এমনিভাবে ফলপ্রসূ ও কার্যকরী ভূমিকা সহকারেই কায়েম থাকতে পারে; শুধু তাই নয় বরং আরও উত্তম উপকারী ভূমিকা নিয়েই তা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। তবে এর জন্য কিছুসংখ্যক শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ও কিছুসংখ্যক ব্যাংক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাঁরা নতুনভাবে এর পদ্ধতি নির্ধারণ করলে সাফল্য দূরে নয়। শরীয়তের নিয়মানুযায়ী ব্যাংক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ইনশাআল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করবে যে, এতে জাতির কিরূপ মঙ্গল সাধিত হয়। ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করার পদ্ধতি ও নীতি ব্যাখ্যা করার স্থান এটা নয়, তাই এ সম্পর্কে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে।[১]

কিছু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সুদের প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্যাংকের বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন করে এর ব্যবস্থা করা যায়। সুদের দ্বিতীয় প্রয়োজন অসহায় দরিদ্র লোকদের সাময়িক অভাব পূরণ করা। এর চমৎকার প্রতিকার ইসলামেই পূর্ব থেকে যাকাত ও ওয়াজিব সদকার আকারে

---

১. বেশ কিছু দিন পূর্বে কয়েকজন আলেমের পরামর্শক্রমে আমি সুদবিহীন ব্যাংক-ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটা পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। কোন কোন ব্যাংক-বিশেষজ্ঞ একে বর্তমান যুগে বাস্তবায়নযোগ্য বলেও স্বীকার করেছিলেন এবং কেউ কেউ একে শুরু করার জন্য উদ্যোগী ভূমিকাও গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সাধারণ ব্যবসায়ীদের আনুকূল্য এবং সরকারী মঞ্জুরির অভাবে চালু হতে পারেনি।

বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ধর্ম ও ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা আজকাল যাকাত ব্যবস্থাকেও পঙ্গু করে দিয়েছে। অসংখ্য মুসলমান নামাযের মত যাকাতের ধারে-কাছেও যায় না। যারা যাকাত দেয়, তাদের মধ্যে অনেক বৃহৎ পুঁজিপতি হিসাব করে পূর্ণ যাকাতও প্রদান করে না। যারা সম্পূর্ণ যাকাত প্রদান করে, তারা শুধু যাকাত পকেট থেকে বের করতেই জানে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা শুধু যাকাত পকেট থেকে বের করারই নির্দেশ দেননি—তা আদায় করারও নির্দেশ দিয়েছেন। প্রদত্ত যাকাত যথার্থ হকদারকে পৌঁছিয়ে তার অধিকারভুক্ত করে দিলেই যাকাত আদায় করা শুদ্ধ হতে পারে। সুতরাং চিন্তা করার বিষয় হলো, এমন মুসলমান কয়জন আছে, যারা যথার্থ হকদার খুঁজে তাদের কাছে যাকাত পৌঁছিয়ে দিতে যত্নবান। মুসলমান জাতি যতই গরীব হোক, যাদের উপর যাকাত ফরয, তারা প্রত্যেকেই যদি পুরোপুরি যাকাত প্রদান করে এবং বিশুদ্ধ পন্থায় স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তবে কর্জের তাগিদে সুদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন কোন মুসলমানেরই থাকতে পারে না। যদি শরীয়তের বিধি অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যায়, এর অধীনে বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানদের ধন-সম্পদের যাকাত এতে জমা হয়, তবে বায়তুলমাল থেকে প্রত্যেক অভাবগ্রস্তেরই অভাব পূরণ করা সম্ভব। বেশি টাকার প্রয়োজন হলে সুদবিহীন কর্জও প্রদান করা যেতে পারে। এভাবে বেকার ও কর্মহীনদের ছোট ছোট দোকান করে দিয়ে কিংবা কোন শিল্পকর্মে নিয়োগ করেও কাজে লাগানো যায়। জনৈক ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ঠিকই বলেছেন যে, মুসলমানরা যাকাত-ব্যবস্থার অনুবর্তী হয়ে গেলে তাদের মধ্যে কোন নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত লোক দেখা যাবে না।

মোটকথা, বর্তমান যুগে সুদকে মহামারী আকারে প্রসার লাভ করতে দেখে এরূপ মনে করা ঠিক নয় যে, সুদের ব্যবসা বর্জন করা অর্থনৈতিক আত্মহত্যার নামান্তর এবং এ যুগের লোক সুদের ব্যবসায়ের ব্যাপারে ক্ষমার্হ।

হ্যাঁ, এটা অবশ্য ঠিক যে, যতদিন সমগ্র জাতি কিংবা উল্লেখযোগ্য দল কিংবা কোন ইসলামী সরকার পূর্ণ মনোযোগ সহকারে এ কাজে সংকল্পবদ্ধ না হয়, ততদিন দু'-চার-দশজনের পক্ষে সুদ বর্জন করা কঠিন, কিন্তু ক্ষমার্হ তবুও বলা যায় না।

আমাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য দু'টি ঃ প্রথমত, মুসলমানদের বিভিন্ন দল ও সরকারসমূহকে এদিকে আকৃষ্ট করা। কেননা, তারাই এ কাজ যথার্থভাবে করতে পারে এবং তাদের উদ্যোগ শুধু মুসলমানদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকেই সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কমপক্ষে সবার জ্ঞান বিশুদ্ধ হোক এবং তারা রোগকে সত্যিকারভাবেই রোগ মনে করুক। কেননা, হারামকে হালাল মনে করা দ্বিতীয় গোনাহ্। এটা সুদের গোনাহ্র চাইতেও বড় ও মারাত্মক। তারা কমপক্ষে এ গোনাহে লিপ্ত না হোক। গোনাহে কিছু-না-কিছু বাহ্যিক উপকারও আছে। কিন্তু যেটা জ্ঞানগত ও বিশ্বাসগত গোনাহ্ অর্থাৎ হারামকে হালাল প্রমাণিত করার চেষ্টা করা, এটা প্রথম গোনাহ্র চাইতেও মারাত্মক এবং নিরর্থক। কেননা সুদকে হারাম মনে করা এবং স্বীয় গোনাহ্ স্বীকার করার মধ্যে কোন আর্থিক ক্ষতিও হয় না। এবং এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যও বন্ধ হয়ে যায় না। হ্যাঁ, অপরাধ স্বীকার করার ফল এটা অবশ্যই যে, কোন সময় তওবা করার তওফীক হলে সুদ থেকে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করা যাবে।

এ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই উপসংহারে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করছি। এগুলো সুদ সম্পর্কিত আলোচ্য আয়াতসমূহেরই বর্ণনা। উদ্দেশ্য, গোনাহ্ যে গোনাহ্ —এ অনুভূতি জাগ্রত হোক, এ থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা হোক, কমপক্ষে হারামকে হালাল করে এক গোনাহ্‌কে দুই গোনাহ্ না করুক। বড় বড় নেককার ও দীনদার মুসলমান রাত্রিবেলায় তাহাজ্জুদ ও যিকিরে অতিবাহিত করে। সকাল বেলায় যখন তারা দোকানে কিংবা কারখানায় পৌঁছে, তখন এ কল্পনাও তাদের মনে জাগে না যে, তারা সুদ ও জুয়ার কাজ-কারবারে লিপ্ত হয়ে কিছু গোনাহ্ করে চলছে।

সুদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী

১. রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ সাতটি মারাত্মক বিষয় থেকে বেঁচে থাক। সাহাবায়ে-কিরাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! সেগুলো কি ? তিনি বললেন ঃ (১) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে (ইবাদতে কিংবা বিশেষ বিশেষ গুণাবলীতে) অন্য কাউকে অংশীদার করা, (২) যাদু করা, (৩) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) এতীমের মাল খাওয়া, (৬) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং (৭) কোন সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা ! —(বুখারী, মুসলিম)

২. রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি আজ রাতে দেখেছি দু'ব্যক্তি আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে গেছে। এরপর আমরা সামনে অগ্রসর হলে একটি রক্তের নদী দেখলাম। নদীর মধ্যে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান। অপর এক ব্যক্তি নদীর কিনারে দণ্ডায়মান। নদীস্থিত ব্যক্তি যখন নদী থেকে উপরে উঠতে চায়, তখন কিনারের ব্যক্তি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে। পাথরের আঘাত খেয়ে সে আবার পূর্বের জায়গায় চলে যায়। অতঃপর সে আবার তীরে ওঠার চেষ্টা করে। কিনারের ব্যক্তি আবার তার সাথে একই ব্যবহার করে। মহানবী (সা) বলেন ঃ আমি স্বীয় সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমি এ কি ব্যাপার দেখছি ? তারা বলল, রক্তের নদীতে বন্দী ব্যক্তি সুদখোর। সে স্বীয় কার্যের শাস্তি ভোগ করছে। —(বুখারী)

৩. রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুদগ্রহীতা ও সুদদাতা—উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সাক্ষ্যদাতা এবং দলীল লেখকের প্রতিও তিনি অভিসম্পাত করেছেন।

সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ এরা সবাই গোনাহে সমান অংশীদার। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সাক্ষ্যদাতা ও দলীল লেখকের প্রতি অভিসম্পাত তখন যখন তারা জানে যে, এটা সুদের ব্যবসা।

৪. রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ চার ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন না এবং জান্নাতের নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করতে দেবেন না। এ চার ব্যক্তি হলো ঃ (১) মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, (২) সুদখোর, (৩) অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভক্ষণকারী এবং (৪) পিতামাতার অবাধ্যতাকারী। —(মুস্তাদরাক-হাকেম)

৫. নবী করীম (সা) বলেন, এক দিরহাম সুদ খাওয়া সত্তর বার ব্যভিচার করার চাইতে বড় গোনাহ্। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হারাম মাল দ্বারা যে মাংস গঠিত হয়, তার জন্য আগুনই যোগ্য। এরই সাথে কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, কোন মুসলমানের মানহানি করা সুদের চাইতেও কঠোর গোনাহ্। —(মসনদে আহ্মদ, তিবরানী)

৬. ব্যবহারযোগ্য হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন ঃ কোন জনপদে যখন ব্যভিচার ও সুদের ব্যবসায় প্রসার লাভ করে, তখন সে জনপদ যেন আল্লাহ্র শাস্তিকে আমন্ত্রণ জানায়। —(মুস্তাদরাক-হাকেম)

৭. রাসূলে করীম (সা) বলেন ঃ যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদের লেনদেন প্রচলিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতি ঘটান এবং যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুষ ব্যাপক হয়ে যায়, তখন তাদের উপর শত্রুর ভয় ও প্রাধান্য ছায়াপাত করে। —(মসনদে আহ্মদ)

৮. রাসূলে করীম (সা) বলেন ঃ মি'রাজের রাতে যখন আমরা সপ্তম আকাশে পৌঁছলাম, তখন আমি উপরে বজ্র ও বিদ্যুৎ দেখলাম। এরপর আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম, যাদের পেট একেকটি ঘরের ন্যায় ফোলা ও বিস্তৃত ছিল। তাদের উদর সর্প দ্বারা ভর্তি ছিল। সর্পগুলো বাইরে থেকেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এরা কারা ? তিনি বললেন ঃ এরা সুদখোর। —(মসনদে আহ্মদ)

৯. রাসূলুল্লাহ্ (সা) আওফা ইবনে মালেক (রা)-কে বললেন, যেসব গোনাহ্ মাফ করা হয় না, সেগুলো থেকে বেঁচে থাক। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে যুদ্ধলব্ধ মাল চুরি করা ও অপরটি সুদ খাওয়া। —(তিবরানী)

১০. রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তিকে তুমি কর্জ দিয়েছ, তার হাদিয়াও গ্রহণ করো না। সে কর্জের বিনিময়ে হাদিয়া দিতে পারে ; এমতাবস্থায় তা সুদ হবে। এ কারণে তার হাদিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারেও সাবধান হওয়া উচিত।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ط
وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ص وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ
فَلْيَكْتُبْ ج وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْـًٔا ط فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ
يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ط وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج
فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ
اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ط وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ
اِذَا مَا دُعُوْا ط وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ط

সূচী-পত্র

ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰۤى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ

تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْۤا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ

وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ۬ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ

وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (٢٨٢) وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ

تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى

اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ

اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ (٢٨٣)

(২৮২) হে মু'মিনগণ ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে ! লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ্ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেওয়া। এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশকম না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজের লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। দু'জন সাক্ষী কর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর—যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা একে লিখতে অলসতা করো না, তা ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধ করা আল্লাহ্র কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক অধিক সুষ্ঠু রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পরে হাতে হাতে আদান-প্রদান কর তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত না করা হোক। যদি তোমরা এরূপ কর তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহ্কে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।

(২৮৩) আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করা! তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে খুব জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান করবে (মূল্য বাকি থাকুক কিংবা যে বস্তু ক্রয় করবে, তা হাতে পাওয়ার আগে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করার অবস্থায়) তখন তা (অর্থাৎ ঋণ আদান-প্রদানের দলীল-দস্তাবেজ) লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের (পরস্পর) মধ্যে (যে) কোন লেখক (হোক, সে) ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে (অর্থাৎ কারও খাতির করে বিষয়বস্তুর মধ্যে হেরফের করবে না) এবং লেখক লিখতে অস্বীকারও করবে না যেমন আল্লাহ্ তাকে (লেখা) শিক্ষা দান করেছেন তার উচিত লিখে দেওয়া এবং (লেখককে) ঐ ব্যক্তি (বলে দেবে এবং) লেখাবে যার দায়িত্বে ঋণ ওয়াজিব থাকবে। (কেননা, দলীল-দস্তাবেজের সারকথা ধারের স্বীকারোক্তি। কাজেই যার দায়িত্বে ধার, তার স্বীকারোক্তিই জরুরী)। আর (লেখানোর সময়) সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং এর (ঋণের) মধ্যে বলতে গিয়ে যেন কণামাত্রও ত্রুটি না করে। অতঃপর যার দায়িত্বে ঋণ, সে যদি দুর্বলবুদ্ধি (অর্থাৎ নির্বোধ কিংবা পাগল) হয় অথবা দুর্বল দেহ (অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা অক্ষম বৃদ্ধ) হয় অথবা (অন্য কোন কারণে) নিজে বর্ণনা করার (ও লেখানোর) শক্তি না রাখে (উদাহরণত সে মূক —লেখক তার ইশারা-ইঙ্গিত বুঝে না অথবা সে ভিন্ন দেশের অধিবাসী এবং ভিন্নভাষী—লেখক তার ভাষা বুঝে না), তবে (এমতাবস্থায়) তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখিয়ে দেবে এবং তোমাদের পুরুষের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী (-ও) করে নেবে। (শরীয়ত মতে দাবি প্রমাণের আসল ভিত্তিই হচ্ছে সাক্ষী।) দলীল-দস্তাবেজ এ জাতীয় ব্যাপারে ধর্তব্য নয়। স্মরণ রাখার সুবিধার্থে দলীল লেখা হবে। কেননা, লিখিত বিষয় দেখে ও শুনে স্বভাবতই পূর্ণ ঘটনা মনে পড়ে যায়। যেমন, কোরআনেই সত্বর তা বর্ণিত হবে ঃ (অতঃপর যদি দু'জন পুরুষ সাক্ষী পাওয়া না যায়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী নিযুক্ত হবে,) ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা (নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে) পছন্দ কর (এবং একজন পুরুষের স্থলে দু'জন মহিলা এ কারণে প্রস্তাব করা হয়েছে) যাতে দু'জন মহিলার মধ্যে কোন একজনও (সাক্ষ্যের কোন অংশ মনে করতে কিংবা বর্ণনা করতে) ভুলে গেলে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয় (এবং স্মরণ করানোর পর সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু পূর্ণ হয়ে যায়।) এবং যখন (সাক্ষী হওয়ার জন্য) ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদেরও অস্বীকার না করা উচিত। (কারণ, এভাবে স্বীয় ভাইয়ের সাহায্য হয়) এবং তোমরা এ (ঋণ)-কে (বারবার) লিখতে বিরক্তিবোধ করো না, তা (ঋণের ব্যাপারে) ছোট হোক কিংবা বড় হোক। এ লিপিবদ্ধ করা আল্লাহ্‌র কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে এবং সাক্ষ্যকে সুষ্ঠু রাখে এবং (লেনদেন সম্পর্কে) তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। (তাই লিপিবদ্ধ করাই ভাল) কিন্তু যদি তোমরা নিজেদের মধ্যে কোন নগদ লেনদেন কর, তবে তা লিখে তোমাদের

উপর কোন অভিযোগ (ও ক্ষতি) নেই এবং (এতেও এতটুকু অবশ্যই করবে যে, এরূপ) ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ (সম্ভবত আগামীকাল কোন ব্যাপার হয়ে যাবে। উদাহরণত বিক্রেতা বলতে পারে যে, সে মূল্যই পায়নি কিংবা এ বস্তু সে বিক্রয়ই করেনি। অথবা ক্রেতা বলতে পারে যে, সে বিক্রীত বস্তু ফেরতদানের ক্ষমতাও নিয়েছিল কিংবা এখন পর্যন্ত বিক্রীত বস্তু পুরোপুরি তার হস্তগত হয়নি) এবং (আমি পূর্বে যেমন লেখক ও সাক্ষীকে লেখা ও সাক্ষ্যদানে অস্বীকার করতে নিষেধ করেছি, তেমনিভাবে তোমাদেরকেও জোরের সাথে বলছি যে, তোমাদের পক্ষ থেকে) কোন লেখক ও সাক্ষীকে কষ্ট না দেওয়া উচিত। (উদাহরণত নিজের কোন উপকারের জন্য তাদের উপকারে বিঘ্ন সৃষ্টি করা) আল্লাহ্কে ভয় কর (যেসব কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন, তা করো না) এবং আল্লাহ্ তা'আলা (অর্থাৎ তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ এই যে,) তোমাদেরকে (প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান) শিক্ষাদান করে এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। (তিনি অনুগত ও অবাধ্যকেও জানেন—প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন)। এবং যদি তোমরা (ঋণের লেনদেন করার সময়) প্রবাসে থাক এবং (দলীল-দস্তাবেজ লেখার জন্য সেখানে) কোন লেখক না পাও, তখন (স্বস্তিলাভের উপায়) বন্ধকী বস্তু, যা (দেনাদারের পক্ষ থেকে) ঋণদাতার অধিকারে দিয়ে দেওয়া হবে এবং যদি (এ সময়ও) একে অন্যকে বিশ্বাস করে (এবং অন্যকে বন্ধক রাখার প্রয়োজন মনে না করে,) তবে যাকে বিশ্বাস করা হয় (অর্থাৎ দেনাদার) তার উচিত অন্যের প্রাপ্য (পুরোপুরি) পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করা (এবং তার প্রাপ্য আত্মসাৎ না করা) এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না এবং যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে খুব পরিজ্ঞাত (অতএব, কেউ গোপন করলে আল্লাহ্ তা'আলার তা জানা থাকবে। তিনি শাস্তি দেবেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধার-কর্জের ক্ষেত্রে দলীল লেখার নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে লেনদেন সম্পর্কিত আইনের জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। এক কথায় এটাকে চুক্তিনামা বলা যেতে পারে। এরপর সাক্ষ্য-বিধির বিশেষ ধারা উল্লিখিত হয়েছে।

আজকাল লেখালেখির যুগ। লেখাই মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি চৌদ্দশত বছর পূর্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তখন দুনিয়ার সব কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য মুখে মুখেই চলতো। লেখালেখি এবং দলীল-দস্তাবেজের প্রথা-প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম কোরআন পাক এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছে ঃ

اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۔

অর্থাৎ—"তোমরা যখন পরস্পরের নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ধার-কর্জের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও।"

এতে প্রথম নীতি এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ধার-কর্জের লেনদেনে দলীল-দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করা উচিত—যাতে ভুল-ভ্রান্তি অথবা কোন পক্ষ থেকে অস্বীকৃতির কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তখন কাজে লাগে।

দ্বিতীয় মাস'আলা বর্ণিত হয়েছে যে, ধার-কর্জের ব্যাপারে মেয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার-কর্জের লেনদেন জায়েয নয়। কেননা, এতে কলহ-বিবাদের

দ্বার উন্মুক্ত হয় ! এ কারণেই ফিকহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ মেয়াদও এমন নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে কোনরূপ অস্পষ্টতা না থাকে। মাস এবং দিন-তারিখসহ নির্দিষ্ট করতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্ট মেয়াদ, যেমন ধান কাটার সময় নির্ধারিত করা যাবে না। কেননা, আবহাওয়ার পরিবর্তনে ধান কাটার সময় আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে। যেহেতু সে যুগে লেখার ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং আজও ব্যাপক প্রচলনের পর পৃথিবীর অধিকাংশ লোক লেখা জানে না, তাই আশংকা ছিল যে, লেখক কিসের স্থলে কি লিখে ফেলবে ! ফলে কারও ক্ষতি এবং কারও লাভ হয়ে যাবে। এ আশংকার কারণেই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ —অর্থাৎ এটা জরুরী যে, তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে।

এতে একদিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, লেখক কোন একপক্ষের লোক হতে পারবে না; বরং নিরপেক্ষ হতে হবে —যাতে কারও মনে সন্দেহ বা খট্‌কা না থাকে। অপরদিকে লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যের ক্ষণস্থায়ী উপকার করে নিজের চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে উচিত হবে না। এরপর লেখককে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে অস্বীকার করবে না।

এরপর দলীল কোন্ পক্ষ থেকে লিখতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ —অর্থাৎ যার দায়িত্বে দেনা, সে লেখাবে। উদাহরণত এক ব্যক্তি সওদা কিনে মূল্য বাকি রাখলো। এখানে যার দায়িত্বে দেনা হচ্ছে, সে দলীলের বিষয়বস্তু লেখাবে। কেননা, এটা হবে তার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি বা অঙ্গীকার পত্র। লেখানোর মধ্যেও কমবেশির আশংকা থাকতে পারে। তাই বলা হয়েছে ঃ

وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا — অর্থাৎ সে তার পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করবে এবং দেনা বিন্দুমাত্রও কম লেখাবে না। লেনদেনের ব্যাপারে দেনাদার ব্যক্তি কখনও নির্বোধ অথবা অক্ষম, বৃদ্ধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, মূক অথবা অন্য ভাষাভাষী হতে পারে। এ কারণে দলীলের বিষয়বস্তু বলে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তাই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার পক্ষ থেকে তার কোন অভিভাবক লেখাবে। পাগল ও নাবালেগের তো অভিভাবক থাকেই। তাদের সব কাজ-কারবার অভিভাবক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মূক এবং অন্য ভাষাভাষীর অভিভাবকও এ কাজ করতে পারে। যদি তারা কাউকে উকিল নিযুক্ত করে, তাতেও চলবে। এ স্থলে কোরআন পাকের 'ওলী' শব্দটি উভয় অর্থই বোঝায়।

সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী মূলনীতি ঃ এ পর্যন্ত লেনদেনে দলীল লেখা ও লেখানোর জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, দলীলের লেখাকেই যথেষ্ট মনে করবে না ; বরং এতে সাক্ষীও রাখবে—যাতে কোন সময় পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে আদালতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফয়সালা হতে পারে। এ কারণেই ফিকহ্‌বিদগণ বলেছেন যে, লেখা শরীয়তসম্মত প্রমাণ নয়, তাই লেখার সমর্থনে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকলে শুধু লেখার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা যায় না। আজকালকার সাধারণ আদালতসমূহেও এ

রীতিই প্রচলিত রয়েছে। লেখার মৌখিক সত্যায়ন ও তৎসমর্থনে সাক্ষ্য ব্যতীত কোন ফয়সালা করা হয় না।

সাক্ষী সংখ্যা ঃ এরপর সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণত (১) সাক্ষী দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হওয়া জরুরী। একা একজন পুরুষ অথবা শুধু দু'জন মহিলা সাধারণ লেনদেনের সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট নয়।

সাক্ষীদের শর্তাবলী ঃ (২) সাক্ষীকে মুসলমান হতে হবে مِنْ رِّجَالِكُمْ শব্দে এদিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। (৩) সাক্ষীকে নির্ভরযোগ্য 'আদিল' হতে হবে, যার কথার উপর আস্থা রাখা যায়। ফাসেক ও ফাজের (অর্থাৎ পাপাচারী) হলে চলবে না। مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে।

শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা গোনাহ্ ঃ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যখন কোন ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী করার জন্য ডাকা হয়, তখন সে যেন আসতে অস্বীকার না করে। কেননা, সাক্ষ্যই হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং বিবাদ মেটানোর উপায় ও পন্থা। কাজেই একে জরুরী জাতীয় কাজ মনে করে কষ্ট স্বীকার করবে। এরপর আবার লেনদেনের দলীল লিপিবদ্ধ করার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে ঃ লেনদেন ছোট হোক কিংবা বড় হোক —সবই লিপিবদ্ধ করা দরকার। এ ব্যাপারে বিরক্তিবোধ করা উচিত নয়। কেননা, লেনদেন লিপিবদ্ধ করা সত্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে, নির্ভুল সাক্ষ্য দিতে এবং সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকতে চমৎকাররূপে সহায়তা করে। হ্যাঁ, যদি নগদ লেনদেন হয় —বাকি না হয়, তবে তা লিপিবদ্ধ না করলেও ক্ষতি নেই। তবে এ ব্যাপারেও কমপক্ষে সাক্ষী রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সময় মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। উদাহরণত বিক্রেতা মূল্য প্রাপ্তি অস্বীকার করতে পারে কিংবা ক্রেতা বলতে পারে যে, সে ক্রীতবস্তু বুঝে পায়নি। এ মতবিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য কাজে লাগবে।

সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার মূলনীতি ঃ আয়াতের শুরুতে লেখকদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন লিখতে ও সাক্ষী হতে অস্বীকার না করে। এমতাবস্থায় তাদেরকে হয়তো মানুষ বিরক্ত করে তুলতে পারতো। তাই আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ لَا شَهِيدٌ —অর্থাৎ কোন লেখক বা সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না করা হয়। অর্থাৎ নিজের উপকারের জন্য যেন তাদের বিব্রত না করা হয়। এরপর বলা হয়েছে ঃ وَإِنْ تَفْعَلُوْا فَإِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ —অর্থাৎ তোমরা যদি লেখক বা সাক্ষীকে বিব্রত কর, তবে এতে তোমাদের গোনাহ্ হবে।

এতে বোঝা গেল যে, লেখক কিংবা সাক্ষীকে বিব্রত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হারাম। এ কারণেই ফকীহ্গণ বলেন ঃ লেখক যদি লেখার পারিশ্রমিক দাবি করে কিংবা সাক্ষী যাতায়াত খরচ চায়, তবে এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। তা না দেওয়াও তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত করার শামিল এবং অবৈধ। ইসলাম বিচার ব্যবস্থায় যেমন সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছে এবং সাক্ষ্য গোপন করাকে কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, তেমনি এ ব্যবস্থাও করেছে, যাতে কেউ সাক্ষ্য দেওয়া থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য না হয়। এ দ্বিমুখী সতর্কতার ফলেই প্রত্যেক মামলায় সত্যবাদী ও নিঃস্বার্থ সাক্ষী পাওয়া যেত এবং নিষ্পত্তি দ্রুত, সহজ ও ন্যায়ানুগ হতো। বর্তমান বিশ্ব এ কোরআনী নীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। ফলে সমগ্র বিচার ব্যবস্থা ভণ্ডুল হয়ে গেছে।

ঘটনার আসল ও সত্য সাক্ষী পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই সাক্ষ্যদান থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ এই যে, যার নাম সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়, পুলিশী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা হলে রোজই সময়ে-অসময়ে থানা পুলিশ তাদের ডেকে পাঠায়। মাঝে মাঝে কয়েক ঘন্টা বসিয়ে রাখে। দেওয়ানী আদালতসমূহেও সাক্ষীর সাথে অপরাধীর মত ব্যবহার করা হয়। এরপর রোজ রোজ মোকদ্দমার হাজিরা পরিবর্তিত হয়। তারিখের পর তারিখ পড়ে। বেচারা সাক্ষী নিজ কাজ-কারবার, মজুরি কিংবা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। অন্যথা হলে পরোয়ানা জারি করে গ্রেফতার করা হয়। তাই কোন ভদ্র ও ব্যস্ত মানুষ কোন মামলার সাক্ষী হওয়াকে আযাব বলে মনে করে এবং যথাসাধ্য এ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। তবে শুধু পেশাদার সাক্ষীই এসব ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যাদের কাছে সত্য-মিথ্যার কোন পার্থক্য নেই। কোরআন পাক এ সম্পর্কিত মৌলিক প্রয়োজনাদি গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করে এসব অনিষ্টের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে। আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ — অর্থাৎ আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নির্ভুল নীতি শিক্ষা দেন। এটা তাঁর অনুগ্রহ। আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত। এ আয়াতে অনেক বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন ফিকহ্বিদ এ আয়াত থেকে বিশটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা বের করেছেন। কোরআন পাকের সাধারণ রীতি এই যে, আইন বর্ণনা করার আগে ও পরে আল্লাহ্-ভীতি ও প্রতিদান দিবসের ভীতি স্মরণ করিয়ে মানুষের মনকে নির্দেশ পালনে উদ্বুদ্ধ করে। এই রীতি অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত আল্লাহ্-ভীতি দ্বারা শেষ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে কোন কিছু গোপন নয়। তোমরা যদি কোন অবৈধ বাহানার মাধ্যমেও বিরুদ্ধাচরণ কর, তবুও আল্লাহ্কে ধোঁকা দিতে পারবে না।

দ্বিতীয় আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত বাকির ব্যাপারে যদি কেউ বিশ্বস্ততার জন্য কোন বস্তু বন্ধকে নিতে চায়, তাও করতে পারে। কিন্তু এতে مَقْبُوضَةٌ শব্দ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বন্ধকী বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া তার জন্য জায়েয নয়। সে শুধু ঋণ পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত একে নিজের অধিকারে রাখবে। এর যাবতীয় মুনাফা আসল মালিকের প্রাপ্য।

দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি কোন বিরোধ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান রাখে, সে সাক্ষ্য গোপন করতে পারবে না। যদি সে গোপন করে, তবে তার অন্তর গোনাহ্গার হবে। অন্তর গোনাহ্গার বলার কারণ এই যে, কেউ যেন একে শুধু মুখের গোনাহ্ মনে না করে। কেননা, অন্তর থেকেই প্রথমে ইচ্ছা সৃষ্টি হয়। তাই অন্তরের গোনাহ্ প্রথম।

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾

(২৮৪) যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে, সব আল্লাহ্‌রই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যা কিছু জমিনের বুকে রয়েছে, সব (সৃষ্ট বস্তু) আল্লাহ্‌রই। (যেমন, স্বয়ং আসমান এবং জমিন তাঁরই। তিনি যখন মালিক, তখন স্বীয় মালিকানাধীন বস্তুসমূহের জন্য সর্বপ্রকার আইন রচনা করার অধিকার তাঁরই রয়েছে। এতে কারও কথা বলার অবকাশ নেই। উদাহরণত এক আইন এই যে,) তোমাদের অন্তরে যেসব (ভ্রান্ত বিশ্বাস, অশালীন চরিত্র কিংবা পাপ কাজের ইচ্ছা ও কৃতসংকল্প হওয়া সম্পর্কিত) বিষয় আছে, সেগুলোকে যদি তোমরা (মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে) প্রকাশ কর (উদাহরণত মুখে কুফরী বাক্য উচ্চারণ কর কিংবা অহংকার, হিংসা ইত্যাদি প্রকাশ কর বা যে পাপ কাজ করার ইচ্ছা ছিল, তা করেই ফেল) অথবা (মনের মধ্যেই) গোপন রাখ, (উভয় অবস্থাতে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছ থেকে (অন্যান্য পাপ-কাজের মত সেগুলোর) হিসাব গ্রহণ করবেন। অনন্তর (হিসাব গ্রহণের পর কুফর ও শির্‌ক ছাড়া) যাকে (ক্ষমা করার) ইচ্ছা, ক্ষমা করবেন এবং যাকে (শাস্তি দেওয়ার) ইচ্ছা, শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়েই পরিপূর্ণ শক্তিমান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে সাক্ষ্য প্রকাশ করার নির্দেশ ও গোপন করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত সেই বিষয়বস্তুরই পরিশিষ্ট। এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, সাক্ষ্য গোপন করা হারাম। তোমরা যদি ঘটনা জেনেও তা গোপন কর, তবে সবর্জ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ এর হিসাব গ্রহণ করবেন। এ ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইকরামা (রা), শা'বী (র) ও মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে। —(কুরতুবী)

শাব্দিক ব্যাপকতার দিক দিয়ে আয়াতটি ব্যাপক এবং যাবতীয় বিশ্বাস, ইবাদত ও লেনদেন এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি তা-ই। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সকল সৃষ্টির যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব গ্রহণ করবেন। যে কাজ করা হয়েছে এবং যে কাজের শুধু মনে মনে সংকল্প করা হয়েছে, সে সবগুলোরই হিসাব গ্রহণ করবেন। বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনে উমর (রা)-এর ভাষ্যে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন মু'মিনকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করা হবে এবং আল্লাহ্ তাকে এক এক করে সব গোনাহ্ স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করবেন ঃ এ গোনাহ্‌টি কি তোমার জানা আছে ? মু'মিন স্বীকার করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ আমি দুনিয়াতেও তোমার গোনাহ্ জনসমক্ষে প্রকাশ করিনি, আজও তা ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর নেক কাজের আমলনামা তার হাতে অর্পণ করা হবে। কিন্তু কাফির ও মুনাফিকদের পাপকাজসমূহ প্রকাশ্যে বর্ণনা করা হবে।

অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ আজকের দিনে গোপন বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হবে এবং গোপন ভেদ প্রকাশ করা হবে। আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ শুধু তোমাদের প্রকাশ্য গোনাহ্‌সমূহ লিপিবদ্ধ করেছে। আমি এমন

সব বিষয়ও জানি, যা ফেরেশতারা জানে না। এগুলো তারা তোমাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করেনি। এখন আমি বর্ণনা করছি এবং হিসাব নিচ্ছি। আমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করব এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। অতঃপর মু'মিনদেরকে ক্ষমা করা হবে এবং কাফিরদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। —(কুরতুবী)

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

ان الله تجاوز عن امتى عما حدثت انفسها ما لم يتكلموا اويعملوا به (قرطبى)

"আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের ঐসব বিষয় ক্ষমা করেছেন, যা তাদের মনের কল্পনায় সীমাবদ্ধ থাকে—মুখে ব্যক্ত করে না অথবা কার্যে পরিণত করে না।"

এতে বোঝা যায় যে, মনের ইচ্ছার জন্য কোনরূপ শাস্তি দেওয়া হবে না। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ এ হাদীসটি জাগতিক বিধি-বিধান সম্পর্কিত। তালাক, ক্রীতদাস মুক্তকরণ, কেনা-বেচা, দান ইত্যাদি শুধু মনে মনে ইচ্ছা করলেই হয় না, যে পর্যন্ত মুখে প্রকাশ কিংবা কার্যে পরিণত করা না হয়। আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা পারলৌকিক বিধি-বিধান সম্পর্কিত। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ এবং হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা যায় না।

এ প্রশ্নের জওয়াবে আলেমগণ বলেন ঃ যে হাদীসে অন্তরের গোপন বিষয় ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে, সে হাদীসের অর্থ হচ্ছে অনিচ্ছাকৃত কুচিন্তা ও কুধারণা। যেগুলো কোনরূপ ইচ্ছা ছাড়াই মনে জাগরিত হয়। অনেক সময় বিপরীত ইচ্ছা করলেও এগুলো মনে জাগ্রত হতে থাকে। এ উম্মতের এ জাতীয় অনিচ্ছাকৃত কুধারণা ও কুমন্ত্রণা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করেছেন। পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াতে ঐ সব ইচ্ছা ও নিয়ত বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ স্বেচ্ছায় অন্তরে পোষণ করে এবং তা কার্যে পরিণত করার চেষ্টাও করে। এরপর ঘটনাক্রমে কিছু বাধার সম্মুখীন হওয়ার কারণে কার্যে পরিণত করতে পারে না। কিয়ামতের দিন এ জাতীয় ইচ্ছা ও নিয়তের হিসাব নেওয়া হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন; যেমন পূর্বোল্লিখিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের ভাষায় ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় প্রকার ধারণা অন্তর্ভুক্ত। তাই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম অত্যধিক চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। তাঁরা ভাবতে থাকেন যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কুচিন্তার জন্যও যদি পাকড়াও করা হয়, তবে কারো পক্ষে কি মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে ? তাঁরা এ ভাবনার কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করলেন। তিনি বললেন ঃ যে নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তা মেনে নিতে কৃতসংকল্প হও এবং বল ঃ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا অর্থাৎ আমরা নির্দেশ শুনলাম ও মেনে নিলাম। সাহাবায়ে-কিরাম তা-ই করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে সামর্থ্যের বাইরে কার্যভার অর্পণ করেন না।

এর সারমর্ম এই যে, অনিচ্ছাকৃত কুচিন্তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। এরপর সাহাবায়ে কিরাম স্বস্তি লাভ করেন। 'এ হাদীসটি মুসলিম শরীফে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত রয়েছে। —(কুরতুবী)

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যেসব কাজ ফরয কিংবা হারাম করা হয়েছে, তন্মধ্যে কিছু মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ এবং চুরি, জেনা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কিছু কাজ মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, ঈমান ও বিশ্বাসের যাবতীয় শাখা-প্রশাখা। কুফর ও শিরক সর্বাধিক হারাম ও অবৈধ। এগুলোও মানুষের অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। উত্তম চরিত্র; যথা— বিনয়, ধৈর্য, অল্পে তুষ্টি, দানশীলতা ইত্যাদি। এমনিভাবে কুচরিত্র; যেমন—হিংস্রতা, শত্রুতা, দুনিয়া-প্রীতি, লোভ ইত্যাদি অকাট্য হারাম বিষয়গুলোর সম্পর্কও মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে নয়, বরং অন্তরের সাথে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতে যেমন বাহ্যিক কাজ-কর্মের হিসাব গ্রহণ করা হবে, তেমনিভাবে অভ্যন্তরীণ কাজ-কর্মেরও হিসাব নেওয়া হবে এবং ভুল-ত্রুটির কারণেও পাকড়াও করা হবে। আয়াতটি সূরা বাকারার শেষভাগে বর্ণনা করার মধ্যে বিরাট রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে। কেননা, সূরা বাকারা কোরআন পাকের সর্বাপেক্ষা বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সূরা। আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের বিরাট অংশ এতে বিবৃত হয়েছে। এ সূরায় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ও আনুষঙ্গিক এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নির্দেশাবলী ; যথা —নামায, রোযা, কিসাস, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ, পবিত্রতা, তালাক, ইদ্দত, খুলা, শিশুকে দুগ্ধপান করানো, মদ ও সুদের অবৈধতা, ঋণ, লেনদেনের বৈধ ও অবৈধ পন্থা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই হাদীসে এ সূরার নাম 'সেনামুল-কোরআন' অর্থাৎ 'কোরআনের সর্বোচ্চ অংশ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে 'ইখলাস' বা আন্তরিক নিষ্ঠা। অর্থাৎ কোন কাজ করা কিংবা কোন কাজ থেকে বিরত থাকা খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই হতে হবে। এতে নাম-যশ অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্য শামিল থাকতে পারবে না।

'ইখলাস' বা অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব কাজ-কর্মের বিশুদ্ধতা এরই উপর নির্ভরশীল। তাই সূরার শেষে এ আয়াতের মাধ্যমে মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, ফরয কাজ করা এবং হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে মানুষের সামনে তো প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে গা বাঁচানো যায়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী। তাঁর দৃষ্টিতে কোন কিছু গোপন নয়। তাই যা কিছু করবে, এ প্রত্যয়ের সাথে করবে যে, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব অবস্থাই লিপিবদ্ধ করছেন। কিয়ামতের দিন সবগুলোরই হিসাব দিতে হবে।

কোরআন পাক মানুষের মধ্যে এ অনুভূতিই সৃষ্টি করতে চায়। তাই প্রত্যেক বিধি-নিষেধের শুরুতে কিংবা শেষে আল্লাহ্‌ভীতি ও আখিরাতের চিন্তার মতো এমন একটা অনুভূতির সৃষ্টি করে দেয়, যা মানুষের অন্তরে অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করতে থাকে। তাই মানুষ রাতের আঁধারে কিংবা নির্জনেও কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে ভয় পায়।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ

بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟

وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾ لَا يُكَلِّفُ

اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۭ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۭ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۥ وَاغْفِرْ لَنَا ۥ وَارْحَمْنَا ۥ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

(২৮৫) রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে, যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবূল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা ! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (২৮৬) আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তা-ই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তে যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা ! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ। হে আমাদের প্রভো ! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিয়ো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

রাসূল (সা) বিশ্বাস রাখেন ঐসব বিষয় সম্পর্কে (অর্থাৎ বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে) যা তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ কোরআন) এবং (অন্য) মু'মিনরাও (এ বিশ্বাস রাখে। অতঃপর কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশ্বাস রাখলে কোরআনে বিশ্বাস রাখা বলা হবে, এর বিবরণ দান করা হয়েছে) সবাই (রাসূল ও অন্য মু'মিনগণও) বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি (যে, তিনি বিদ্যমান আছেন ; তিনি এক এবং সত্তা ও গুণাবলীতে সম্পূর্ণ।) এবং তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি এবং তাঁর আসমানী গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি (যে, তাঁরা পয়গম্বর এবং সত্যবাদী। পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাস রাখা এভাবে যে, তারা বলে,) আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কারও সাথে (বিশ্বাস রাখার ব্যাপারে) পার্থক্য করি না (যে, কাউকে পয়গম্বর মনে করবো এবং কাউকে মনে করবো না) তারা সবাই বলে যে, আমরা

(আপনার নির্দেশ) শুনেছি এবং (এগুলো) সানন্দে মেনে নিয়েছি। আমরা আপনার ক্ষমা কামনা করি যে, আপনি আমাদের পালনকর্তা এবং আপনারই দিকে (আমাদের সবাইকে) প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (অর্থাৎ আমি পূর্বের আয়াতে বলেছি যে, অন্তরে গোপন বিষয়াদিরও হিসাব গ্রহণ করা হবে; এর অর্থ অনিচ্ছাকৃত বিষয়াদি নয়; বরং শুধু ইচ্ছাধীন বিষয়াদি। কেননা,) আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে (শরীয়তের বিধি-বিধানের) দায়িত্ব ন্যস্ত করেন না (অর্থাৎ এসব বিধি-বিধানকে ওয়াজিব কিংবা হারাম করেন না) কিন্তু যা তার সাধ্যের (ও ক্ষমতার) মধ্যে থাকে। সে সওয়াবও তারই পায়, যা সে ইচ্ছাকৃতভাবে করে এবং সে শাস্তিও তারই পাবে, যা সে ইচ্ছায় করে (এবং যা সাধ্যের বাইরে, সে বিষয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়নি। যে বিষয়ের সাথে ইচ্ছার সম্পর্ক নাই, তার জন্য সওয়াব ও শাস্তি কিছুই হবে না। কু-চিন্তা সাধ্যের বাইরে। তাই তার অন্তরে জাগরিত হওয়াকে হারাম এবং জাগরিত হতে না দেওয়াকে ওয়াজিব করেন নি.)। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দায়ী করবেন না, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি। হে আমাদের প্রভো ! এবং (আমরা আরও প্রার্থনা জানাই যে,) আমাদের উপর (দায়িত্ব পালনের) এমন কোন গুরুভার (ইহকালে কিংবা পরকালে) অর্পণ করবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব, কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়ী করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বর্ণিত আয়াতদ্বয়ের বিশেষ ফযীলত ঃ আলোচ্য আয়াত দু'টি সূরা বাকারার শেষ আয়াত। সহীহ্ হাদীসসমূহে এ আয়াত দু'টির বিশেষ ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কেউ রাতের বেলায় এ আয়াত দু'টি পাঠ করলে তা তার জন্য যথেষ্ট।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা—রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'টি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ করেছেন। জগৎ সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলা স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এশার নামাযের পর এ দু'টি আয়াত পাঠ করলে তা তাহাজ্জুদ নামাযের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। মুস্তাদ্‌রাক হাকেম ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'টি আয়াত দ্বারা সূরা বাকারা সমাপ্ত করেছেন। আরশের নিম্নস্থিত বিশেষ ভাণ্ডার থেকে এ দু'টি আয়াত আমাকে দান করা হয়েছে। তোমরা বিশেষভাবে এ দু'টি আয়াত শিক্ষা কর এবং নিজেদের স্ত্রীলোক ও সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দাও।

এ কারণেই হযরত ফারুকে আযম ও আলী মুর্তজা (রা) বলেন, আমাদের মতে যার সামান্যও বুদ্ধিজ্ঞান আছে, সে এ দু'টি আয়াত পাঠ করা ব্যতীত নিদ্রা যাবে না। এ আয়াতদ্বয়ের অর্থগত বৈশিষ্ট্য অনেক। তন্মধ্যে একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এই যে, সূরা বাকারার অধিকাংশ বিধি-বিধান সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। যথা বিশ্বাস, ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র সামাজিকতা ইত্যাদি। সর্বশেষ এ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে অনুগত মু'মিনদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় বিধান শিরোধার্য করে নিয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যা এ আয়াতদ্বয়ের পূর্ববর্তী আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের মনে দেখা দিয়েছিল। প্রশ্নটি ছিল এই —যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ —অর্থাৎ 'তোমাদের অন্তরে যা আছে; প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় যেসব কাজ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার হিসাব নেবেন। অনিচ্ছাকৃত কুচিন্তা ও ত্রুটি বিচ্যুতি এর অন্তর্ভুক্তই ছিল না। কিন্তু আয়াতের ভাষা বাহ্যত ব্যাপক ছিল। এতে বোঝা যেত যে, অনিচ্ছাকৃত ধারণারও হিসাব নেওয়া হবে। এ আয়াত শুনে সাহাবায়ে কিরাম অস্থির হয়ে গেলেন এবং রসূল (সা)-এর কাছে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এতদিন আমরা মনে করতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব হবে। মনে যেসব অনিচ্ছাকৃত কল্পনা আসে, সেগুলোর হিসাব হবে না। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, প্রতিটি কল্পনারও হিসাব হবে। এতে তো শাস্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয়। মহানবী (সা) আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানতেন, কিন্তু উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না, বরং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে আপাতত আদেশ দিলেন যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, তা সহজ হোক কিংবা কঠিন—মু'মিনের কাজ তো মেনে নেওয়া। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেক আদেশ শুনে তোমাদের একথা বলা উচিত ঃ

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ—"হে আমাদের পালনকর্তা ! আমরা আপনার নির্দেশ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রভো ! যদি নির্দেশ পালনে আমাদের কোন ত্রুটি বা ভুল হয়ে থাকে, তবে তা ক্ষমা করুন। কেননা, আমাদের সবাইকে আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ মত কাজ করলেন ; যদিও তাঁদের মনে এ খটকা ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কুচিন্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'টি আয়াত নাযিল করেন। প্রথম আয়াতে মুসলমানদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, যে আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে-কিরামের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। প্রথম আয়াতটি হচ্ছে ঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ - لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ .

অর্থাৎ রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ বিষয়ের প্রতি, যা তাঁর কাছে তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মহানবী (সা)-এর প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে 'রসূল' শব্দ ব্যবহার করে তাঁর সম্মান ও মহত্ত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরপর বলেছেন ঃ وَالْمُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ রাসূল (সা)-এর যেমন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর প্রতি বিশ্বাস আছে তেমনি সাধারণ মু'মিনদেরও রয়েছে। এতে প্রথমে পূর্ণ বাক্যে রাসূল (সা)-এর বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে, এরপর মু'মিনদের বিশ্বাস পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বর্ণনাভঙ্গিতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও আসল বিশ্বাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সকল মুসলমান অভিন্ন, কিন্তু

বিশ্বাসের স্তরে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশ্বাস প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শ্রবণের ভিত্তিতে এবং অন্য মুসলমানগণের বিশ্বাস 'অদৃশ্য বিশ্বাস' এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখার ভিত্তিতে।

এরপর মহানবী (সা) ও অন্য মু'মিনদের অভিন্ন ও সংক্ষিপ্ত ঈমানের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি, পূর্ণতার যাবতীয় গুণে তাঁর গুণান্বিত হওয়ার প্রতি, ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি এবং আল্লাহ্ তা'আলার গ্রন্থাবলী ও পয়গম্বরগণের সকলেরই সত্য হওয়ার প্রতি।

এরপর বলা হয়েছে যে, এ উম্মতের মু'মিনগণ পূর্ববর্তী উম্মতগণের মত আল্লাহ্ তা'আলার পয়গম্বরগণের মধ্যে প্রভেদ করবে না যে, কাউকে পয়গম্বর মানবে এবং কাউকে মানবে না। যেমন, ইহুদীরা হযরত মূসা (আ)-কে এবং খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে পয়গম্বর মানে, কিন্তু শেষ নবী (সা)-কে পয়গম্বর মানে না। এ উম্মতের প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার কোন পয়গম্বরকে অস্বীকার করে না। এরপর সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুখে এ বাক্য বলেছিলেন :

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ঐ সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াত থেকে দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল যে, অন্তরের গোপন ধারণার জন্য দায়ী করা হলে আযাব থেকে কিরূপে বাঁচা যাবে! বলা হয়েছে لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কাজের আদেশ দেন না। কাজেই অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব কল্পনা ও কুচিন্তা অন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, এরপর সেগুলো কার্যে পরিণত করা না হয়, সেসব আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মাফ। যেসব কাজ ইচ্ছা করে করা হয়, শুধু সেগুলোরই হিসাব হবে।

এর বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, মানুষের যেসব কাজকর্ম হাত, পা, চক্ষু, মুখ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোকে 'বাহ্যিক কাজকর্ম' বলা হয়। এগুলো দু'প্রকার : এক, ইচ্ছাধীন —যা ইচ্ছা করে করা হয়; যেমন ইচ্ছা করে কথা বলা, ইচ্ছা করে কাউকে প্রহার করা ইত্যাদি। দুই, অনিচ্ছাধীন, যা ইচ্ছা ছাড়াই ঘটে যায়। যেমন, এক কথা বলতে গিয়ে অন্য কথা বলে ফেলা অথবা কাঁপুনি রোগে অনিচ্ছাকৃতভাবে হাত নড়ে যাওয়ার কারণে কারও ক্ষতি হয়ে যাওয়া। এখানে লক্ষণীয়, বিশেষভাবে ইচ্ছাধীন কাজ-কর্মেরই হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তি হবে—অনিচ্ছাকৃত কাজের আদেশ মানুষকে দেওয়া হয়নি এবং সেজন্য সওয়াব বা আযাব হবে না।

এমনিভাবে যেসব কাজকর্ম মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোও দু'প্রকার। এক. ইচ্ছাধীন। যেমন, ইচ্ছা করে অন্তরের কুফর ও শিরকের বিশ্বাস পোষণ করা কিংবা জেনে-বুঝে ইচ্ছা সহকারে নিজেকে বড় মনে করা অর্থাৎ অহংকার করা কিংবা মদ্যপানে কৃতসংকল্প হওয়া। দুই. অনিচ্ছাধীন। যেমন, ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মনে কুধারণা আসা। এ ক্ষেত্রেও হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তি শুধু ইচ্ছাধীন কাজের জন্যই হবে —অনিচ্ছাধীন কাজের জন্য নয়।

কোরআনে বর্ণিত এ ব্যাখ্যার ফলে সাহাবায়ে কিরামের মানসিক উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। আয়াতের শেষে এই বিষয়বস্তুটি আরও ফুটিয়ে তোলার জন্য বলা হয়েছে : لَهَا مَا كَسَبَتْ

وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ—অর্থাৎ মানুষ সওয়াবও সে কাজের জন্যই পাবে, যা স্বেচ্ছায় করে এবং শাস্তিও সে কাজের জন্যই পাবে যা স্বেচ্ছায় করে।

এখানে সন্দেহ দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের সওয়াব অথবা আযাব হয়, যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজ করে —যা দেখে অন্যরাও এ সৎকাজে উদ্বুদ্ধ হয়, যতদিন পর্যন্ত অন্যেরা এ সৎ কাজ করতে থাকবে, ততদিন এর সওয়াব প্রথম ব্যক্তিও পেতে থাকবে। এমনিভাবে, যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ প্রবর্তন করে, ভবিষ্যতে যত লোক এ পাপ কাজে লিপ্ত হবে, তাদের সমান পাপ প্রথম প্রচলনকারী ব্যক্তিরও হতে থাকবে। হাদীস দ্বারা আরও প্রমাণিত আছে যে, কেউ যদি নিজের সওয়াব অন্যকে দিতে চায়, তবে অন্য ব্যক্তি এ সওয়াব পায়। অতএব, বোঝা গেল যে, ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের সওয়াব কিংবা আযাব হয়।

এ সন্দেহ নিরসনকল্পে বলা যায় যে, প্রথমাবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে ঐ কাজের সওয়াব কিংবা আযাব হবে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করে। অতএব, পরোক্ষভাবে এমন কোন কাজের সওয়াব কিংবা আযাব হওয়া এর পরিপন্থী নয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করেনি। উপরোক্ত দৃষ্টান্তসমূহে একথা সুস্পষ্ট যে, প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সওয়াব কিংবা আযাব হয়নি, বরং অন্যের মধ্যস্থতায় হয়েছে। এছাড়া মধ্যস্থতার মধ্যে তার কার্য ও ইচ্ছার প্রভাব অবশ্যই রয়েছে। কেননা, যে ব্যক্তি কারও উদ্ভাবিত ভাল কিংবা মন্দ পথ অবলম্বন করে তার মধ্যে প্রথম ইচ্ছাকৃত কাজের প্রভাব থাকে; যদিও প্রথম ব্যক্তি এ প্রভাবের ইচ্ছা করেনি। এমনিভাবে কেউ কোন ব্যক্তিকে সওয়াব তখনই পৌঁছায়, যখন সে তার প্রতি কোন অনুগ্রহ করে থাকে। এ হিসাবে অপরের কাজের সওয়াব এবং আযাবও প্রকৃতপক্ষে নিজের কাজেরই সওয়াব ও আযাব।

উপসংহারে কোরআন পাক মুসলমানদেরকে একটি বিশেষ দোয়া শিক্ষা দিয়েছে। এতে ভুল-ভ্রান্তিবশত কোন কাজ হয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলা হয়েছে ঃ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا— "হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে দায়ী করো না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি।" এরপর বলা হয়েছে ঃ

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ

অর্থাৎ—"হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের উপর ভারী ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের (বনী ইসরাঈলদের) উপর অর্পণ করেছিলে এবং আমাদের উপর এমন ফরয কাজ আরোপ করো না, যা সম্পাদনের শক্তি আমাদের নেই।"

: এর অর্থ সেসব কঠিন কাজ-কর্ম, যা বনী ইসরাঈলের উপর আরোপিত ছিল। যেমন, নাপাক বস্ত্র ধৌত করলে পাক হতো না, বরং নাপাক অংশ কেটে ফেলতে হতো কিংবা পুড়িয়ে ফেলতে হতো এবং নিজেকে হত্যা করা ব্যতীত তাদের তওবা কবূল হতো না। কিংবা অর্থ এই যে, দুনিয়াতে আমাদের উপর আযাব নাযিল করো না ; যেমন বনী ইসরাঈলের কু-কর্মের জন্য আযাব নাযিল করেছ। এসব দোয়া যে আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেছেন, তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে প্রকাশও করেছেন।

ولله الحمد اوّله واخره وظاهره وباطنه وهو المستعان -

ইফা—২০১১-২০১২—প্র/০৩(রা)—৫,২৫০

সূচী-পত্র

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন

প্রথম খণ্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন